সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

চতুর্দ্দশ বর্ষ।

১৩১০

কলিকাতা;

২৯ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৯ নং সিমলা ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-যন্ত্রে" মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

অ

আ

উ

ক

গ

সাহিত্য, ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

আকাশ-কুসুম।

'আকাশ-কুসুম' নামটা একটু উপন্যাসী ধরণের হইল না? পাছে পাঠকপাঠিকাগণ প্রতারিত হন, এই আশঙ্কায় স্বস্তিবাচনেই সতর্ক করিতেছি যে, এই প্রবন্ধে তাঁহাদের উপন্যাস-পাঠ-প্রত্যাশা আকাশ-কুসুমেই পর্য্যবসিত হইবে। তবে প্রবন্ধটি নিতান্ত শুষ্ক বোধ নাও হইতে পারে; কেন না, জলই ইহার একমাত্র সম্বল!

'আকাশ-কুসুম' আর কিছুই নয়,—উহা এক প্রকার 'বরফ'; কিন্তু কি প্রকার, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় এক কথায় বুঝাইবার উপায় নাই। সুতরাং বুঝাইতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে একটু ভাষাতত্ত্বের অবতারণা করিতে বাধ্য হইতেছি।

সাধারণতঃ সকলেরই জানা আছে যে, জল জমিয়া 'বরফ' হয়। ঐ এক 'বরফ' নামেই সর্ব্ব প্রকারের তারল্যরহিত জলীয় পদার্থ অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা বাঙ্গালা ভাষার একটা বিশেষ ত্রুটি বলিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি পৃথক পৃথক্ শব্দ ছিল, কিন্তু সেগুলিকে আমরা এক বরফেরই প্রতিশব্দ বলিয়া বুঝিতে শিখিয়া গোলযোগ করিয়াছি। 'সাহিত্য-পরিষদ্' ইহার কোনও প্রতিকার করিয়াছেন কি না, আমার অদ্যাপি জানিবার সুযোগ হয় নাই; কিন্তু যদি না করিয়া থাকেন, আমি সবিনয়ে এ বিষয়ে পরিষদকে অবহিত হইতে বলি। ইংরাজীতে ঐ শ্রেণীর পদার্থসমূহের জন্য frost, hoar-frost, snow ও ice,—এতগুলি নাম আছে। ইহাদের কোনটি অপর কাহারও প্রতিশব্দ নয়। বাঙ্গালা ভাষায় এক বরফই সম্বল, কেবল কোথাও কোথাও frost বুঝাইতে 'পালা' শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল বাঙ্গালা ভাষারই যে এরূপ দুর্দ্দশা, এমন নয়। ভারতবর্ষের সকল ভাষাতেই এই ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে। তামিল ও তেলেগু ভাষায় উপরিলিখিত পদার্থ-সমূহবোধক একটিও শব্দ নাই; কেন না, দাক্ষিণাত্যে ঐ জাতীয় পদার্থ অতি বিরল। আজ কাল যে ice সর্ব্বত্র সুপরিচিত, মান্দ্রাজ অঞ্চলে উহার ইংরাজী নামই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্র ভাষায় বাঙ্গালার ন্যায় ঐ বরফ ও 'পালা' শব্দদ্বয়ই সম্বল হইয়া দাড়াইয়াছে; তন্মধ্যে বরফ শব্দটি ভারতীয় কোনও ভাষারই নিজস্ব নয়;—উহা পারস্য ভাষা হইতে গৃহীত।

আমাদের ভাষাসমূহে এরূপ অপূর্ণতা ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে, উপরি-লিখিত ইংরাজী শব্দগুলিতে বাষ্প বা জলের যে সকল রূপান্তর বুঝায়, আমরা সচরাচর তাহা দেখিতে পাই না, বা দেখিলেও বুঝিতে পারি না। কিন্তু এক্ষণে আমাদের অনেকেই কেবল স্বদেশের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। নিত্যই দূর দেশান্তরে যাইতে হইতেছে। তত্তৎ স্থানের নৈসর্গিক ব্যাপারসমূহ প্রত্যহই ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে, বহু স্থানের নৈসর্গিক ঘটনার বিবরণ ইংরাজী সংবাদপত্রের স্তম্ভে নিত্য পাঠ করিতে হইতেছে, অথচ মাতৃভাষায় তাহাদের সম্বন্ধে মনোভাব প্রকাশ করিবার উপায় নাই। যদি ভাষাকে জীবিত রাখিতে হয়, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুষ্টিসাধনও নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐ চারিটি ইংরাজী শব্দের প্রতিশব্দ কি কি স্থির করা যাইতে পারে।

সংস্কৃত ভাষায় হিম, হিমানী, তুষার ও তুহিন, এই চারিটি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারিটির একার্থবোধক রূপে প্রয়োগ করিয়া আমরা কেবল ভাষা-শক্তির অপব্যবহার করিতেছি। ঐ চারিটি শব্দকে চারিটি পৃথক পদার্থ-বোধক মানিয়া লওয়া সমীচীন মনে করি। কোনটিকে কাহার প্রতিশব্দ ধরা যাইবে, সে বিষয়ে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। আমি এই প্রবন্ধে কেবল প্রস্তাব করিতেছি মাত্র।

Frostএর প্রতিশব্দ পালা গ্রাম্যভাষায় প্রচলিত থাকিলেও, উহার জন্য একটা সংস্কৃতমূলক শব্দ থাকা বৈজ্ঞানিক ভাষার নিমিত্ত বাঞ্ছনীয়। আমি উহার জন্য হিম শব্দ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে একটা সামান্য আপত্তি উঠিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অখণ্ডনীয় নয়। আপত্তি এই যে, হিমের জন্যই যে হিমালয়ের নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে frost প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু হিমালয়ের পাদপ্রদেশে,—যাহাকে সচরাচর তেরাই বলে,—তথায় frostএর খুবই প্রাদুর্ভাব। ভারতের আর্য্যগণ সর্ব্ব-প্রথমে হিমালয়ের দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী সমতলপ্রদেশে উপনিবেশস্থাপন করিয়া-ছিলেন। উঁহাদের ঐ প্রদেশের পক্ষে সুতরাং তেরাই-ই উত্তর সীমা ছিল, তাহার পরই পর্ব্বত। উঁহারা দেখিলেন, শীতকালে তেরাইয়ে ভয়ানক শীত, আর তাহারই জন্য খুব frost হয়; ঐ সময় উত্তরের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অতি শীতল বায়ুও প্রবাহিত হয়; সুতরাং উঁহারা সহজে বুঝিলেন যে, হিমালয়েই হিম অর্থাৎ frostএর আদি কারণ, কাজেই পর্ব্বতের নামকরণ করিলেন

'হিমালয়'। নামকরণের পূর্ব্বে, হিমালয়ে হিম হয় কি না, তাহার অনুসন্ধান করা আর্য্যেরা আবশ্যক মনে করেন নাই। পালাকে হিম বলিবার একটি হেতুবাদ এই যে, যে ঋতুতে পালার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার নাম হিম ঋতু বা হেমন্ত কাল রাখা হইয়াছে।

হিমের সংহতি, আতিশয্য, বা বিস্তৃতি অর্থে হিমানী শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত। অতএব হিম শব্দকে frost-বোধক ধরিলে হিমানী শব্দ hoar frost অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। হিমানী ও তুষার সাধারণতঃ প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখন পুঁজি লইয়া গোলযোগ, তখন প্রতিশব্দের বাহুল্য পরিহার করিতে হইবে। এই জন্য আমি প্রস্তাব করি যে, তুষার শব্দ কেবলমাত্র sonw বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হউক। পতনশীল অবস্থার তুষারকেই তুহিন বলিলে ভাল হয়। পতিত ও স্তূপীকৃত অবস্থার জ্ঞাপনার্থ তুষার শব্দের ব্যবহারই সমীচীন। নবগ্রহস্তোত্রে চন্দ্র "দিব্যশঙ্খতুষারাভ" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। এ স্থলে যে ঐ তুষার শব্দ দ্বারা snow বুঝাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার হেতু sonw-র স্বরূপ হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

এক্ষণে ice লইয়াই গোলযোগ। আমার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু মনে হয়, যেন ঠিক্ iceএর প্রতিশব্দ সংস্কৃত ভাষায় আদৌ ছিল না। সুতরাং ice বুঝাইবার নিমিত্ত হয় পারস্য ভাষার ঋণস্বীকার করিতে হইবে, নতুবা সর্ব্বসম্মতিক্রমে নূতন শব্দের প্রণয়ন করিতে হইবে। ঋণস্বীকার করিতে ঠিক ঋণ বলিয়া আপত্তি না তুলিলেও একটা আপত্তি এই যে, খাঁটি পারস্য ভাষায় iceএর প্রতিশব্দ 'য়খ্'। য়খ্ শব্দ বাঙ্গালায় চলিত হওয়া সম্ভব, বা বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারি না। বাঙ্গালার কোনও শব্দের আদিতে 'য়'-র ব্যবহার হয় না। আর 'য়খের' ঐ 'খ'ও বড় কম পাত্র নয়। পূর্ণমাত্রায় উহার মর্য্যাদা রাখিতে হইলে বাগ্‌যন্ত্রের অনেক ব্যায়ামের পর কণ্ঠের নিম্নতম প্রদেশ হইতে উচ্চারণ করিতে হয়; বাঙ্গালার 'খই' বা 'মাখনের খ-এর মত য়খের 'খ' ভালমানুষটি নয়। বস্তুতঃ কোমলকান্ত বঙ্গভাষায় এই কণ্ঠোচ্চার্য্য খ-এর স্থান নাই; স্থান হওয়াও উচিত নয়। ice বুঝাইতে 'বরফ' শব্দ মানিয়া লইতে পারিলে বেশ সুবিধাই হইত, কেন না, সাধারণ ভাষায় ঐ অর্থেই বরফ শব্দের প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে, আর ঐ প্রচলন একেবারে রহিত করাও বোধ করি অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু বড়ই দুঃখের

বিষয় যে, তাহা হইলে উহার প্রয়োগ লইয়া পারস্য ভাষার সহিত চিরকাল বিরোধ থাকিয়া যায়; কারণ, উক্ত ভাষায় ঐ বরফ শব্দ snow বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, iceএর জন্য নূতন শব্দ-প্রণয়ন না করিলে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। ice দেখিতে কাচ বা স্ফটিকের ন্যায়। এই জন্য জলবোধক কোনও শব্দের সহিত স্ফটিকবোধক কোনও শব্দের যোজনা করিলে iceএর প্রতিশব্দ গঠিত হইতে পারে। আমি এই প্রবন্ধে ice বুঝাইতে 'আপস্ফটিক' শব্দ ব্যবহার করিব। ice অর্থে 'হিমশিলা' শব্দের প্রয়োগ বোধ করি কোথাও দেখিয়াছি, কিন্তু ice বাস্তবিক হিমের শিলা নয়। শব্দটি আদৌ পছন্দসই নয়, কিন্তু আর কিছু ভাবিয়া পাইতেছি না।

এক্ষণে জলের উক্ত চারি অবস্থা বা রূপান্তরের উৎপত্তি ও পার্থক্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

হিম (frost) প্রকৃতপক্ষে পরিদৃশ্যমান পদার্থ নয়। শৈত্যের আতিশয্যে উদ্ভিজ্জে ও অন্যান্য আর্দ্র পদার্থে যে বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, হিম বা পালা বলিলে তাহাই বুঝিতে হইবে। ঐ বিকৃতির জন্য একা শৈত্য দায়ী নয়; কারণ, তাহা হইলে হিমালয়শিখরে অত্যধিক বিকৃতি দেখিতে পাইতাম; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিমালয়ে হিম অতি বিরল। অতিশয় শীতে উদ্ভিজ্জের অভ্যন্তরস্থ জলীয় অংশ জমিয়া যায়। সেই অবস্থায় হঠাৎ প্রখর রৌদ্র লাগিলে উহাদের সাধারণধর্ম্মানুসারে পত্রাদি হইতে বাষ্পরূপে জলের অপচয় অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অথচ অবশিষ্টাংশের জমাটবাধা জল সঞ্চলনশক্তিরহিত হওয়ায় উহার স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত উপরে উঠিতে অপারগ হয়; ইহাতে ইহাই দাঁড়ায় যে, পত্রপল্লবাদি কোমল অঙ্গগুলি অচিরাৎ ম্লান, শিথিল, শুষ্ক হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে কখন কখন অনেক গুল্মের এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যে উদ্ভিদে জলীয় অংশ যত অধিক, হিম কর্ত্তৃক তাহার তত অধিক অনিষ্ট হয়। হিমালয়ে শীতকালে একাদিক্রমে দারুণ শীত পড়ে বটে, কিন্তু সে সময়ে তথায় রৌদ্রের প্রাখর্য্য থাকে না, সুতরাং 'পালা' পড়ে না। যে উদ্ভিদ শীতকালে তুষার দ্বারা আবৃত থাকে, হিমে তাহার অনিষ্টসম্ভাবনা একেবারেই নাই। অথচ 'বরফে' গাছ মরে, এই ধারণা সাধারণ লোকের মনে বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ 'বরফ' শব্দের অবাধ প্রয়োগেই ত যত গোল!

হিমের ন্যায় হিমানীরও রাত্রেই উৎপত্তি হয়—শৈত্যের অতিশয্যই ইহার মূল। আমাদের দেশে শীতকালে প্রভাতে ঘাসের উপরে যে শিশিরবিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়, হিমানী উহারই রূপান্তরমাত্র। প্রভেদ এই যে, হিমানী তারল্যরহিত অতিসূক্ষ্ম দানার সমষ্টি। তৃণাদির শীতলস্পর্শ পত্রাদিতে বাষ্প-ভারাক্রান্ত বায়ুস্পর্শ হইলে, ঐ বাষ্পের কিয়দংশ প্রথমে জলরূপে পরিণত হয়; তখন উহাকে শিশির বলা হয়; কিন্তু তৎক্ষণাৎ জমিয়া গেলে উহাই হিমানী-রূপ প্রাপ্ত হয়। বঙ্গের সমতল অংশে বোধ করি কোথাও এই হিমানী দৃষ্ট হয় না; অত্যুচ্চ পর্ব্বতেও ইহা বিরল; তাহার কারণ এই যে, পাহাড়ের বায়ু শীত-কালে অতিশয় শুষ্ক থাকে। এই শুষ্কতানিবন্ধন তখন লোকের হাত পা ওষ্ঠ প্রভৃতি ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। শুষ্ক বায়ু হইতে শিশির বা হিমানীর উৎপত্তি হইতে পারে না। শৈত্যাধিক্য ও জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্য্যই হিমানীর উৎপত্তির কারণ। এই জন্য শিলং, কর্সিয়ং, অলমোড়া প্রভৃতি অনুচ্চ পার্ব্বত্য স্থানসমূহে ও তেরাই প্রদেশে শীতকালে প্রায় প্রত্যহ হিমানী দৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্তৎ স্থানে উহাকেই লোকে 'বরফ' বলিয়া থাকে।

হিম, হিমানী বা শিশির 'পড়ে' না। উহাদের সম্বন্ধে 'পড়া' বলা বোল্‌তার কামড়ানর ন্যায় নিতান্ত অলীক। হিন্দুস্থানীরা আরও একটু উপরে যায়,—উহারা বলে, "ততাইয়ানে কাট্ খায়া",— বোলতায় কামড়াইয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। বোলতা কিন্তু পুচ্ছের হুলটিমাত্র ফুটাইয়া দেয়। তাহার মুখ দষ্ট স্থান হইতে ঠিক্ ততটা ব্যবধানে থাকে, যতটা তাহার শরীরের দৈর্ঘ্য। অন্ততঃ শিশির সম্বন্ধে আমাদেরও একটু বাড়াবাড়ি আছে। অনেকে শীত-কালে সন্ধ্যার পর কোথাও যাইতে হইলে ছাতা মাথায় দিয়া যান, কেন না, শিশির 'পড়ে'! পতনশীল পদার্থ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উপরে নাসিকা থাকিতেও মস্তক অপেক্ষা গুম্ফে কেন অধিক শিশির জমিতে দেখা যায়, কি আশ্চর্য্য, উঁহারা তাহা ভাবিয়া দেখেন না!

তুষার (snow) বা তুহিন কিন্তু সত্য সত্যই পড়ে। বস্তুতঃ, শিশিরের সহিত হিমানীর যে সম্বন্ধ, বৃষ্টিবারির সহিত তুষারেরও সেই সম্বন্ধ, উৎপত্তিপ্রকরণ একই, কেবল স্থানভেদে রূপভেদ। হিম, শিশির ও হিমানীকে ভৌতলিক বলিতে পারা যায়; কেন না, ভূতলসংলগ্ন একটা কিছুকে অবলম্বন না করিয়া উহারা জন্মিতে পারে না। কিন্তু বৃষ্টি ও তুহিন নাভসিক। ঊর্দ্ধে, বায়ুমণ্ডলেই উহাদের সৃষ্টি। শিশিরের ক্ষুদ্র কণিকাসমূহ একত্রিত হইয়া যেমন একটি বড়

বিন্দুর উৎপাদন করে,—আকাশে মেঘসংপৃক্ত জলকণিকার কতকগুলি একত্রিত হইয়া সেইরূপ বৃষ্টিবিন্দু গঠিত হয়। যদি মেঘ বেশী উপরের না হয়, তবে বিন্দু-গুলি অতিশয় সূক্ষ্ম দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন দেখুন না প্রথম বর্ষায়। বায়ুর সহিত উড়িয়া উড়িয়া ফঁুই ফঁুই বৃষ্টি হইতে থাকে, বৃষ্টি বলিয়াই অনুভব হয় না; অথচ বাহিরে গেলে বস্ত্রাদি বিলক্ষণ আর্দ্র হয়। পক্ষান্তরে, ভাদ্রের বৃষ্টি। তড়্‌-বড়্‌ তড়্‌-বড়্‌ করিয়া সুবৃহৎ বিন্দুগুলি এতই বেগে ও জোরে পড়িতে থাকে যে, গাত্রে লাগিলে বেদনা অনুভূত হয়। ইহারা অনেক দূরের পথিক। আসিতে আসিতে বায়ুপথে অনেক বিন্দুকে 'আত্মসাৎ করিয়া অত পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, ও বহু উর্দ্ধ হইতে পতনবশতঃ অত বেগ ও বলের সঞ্চয় করিয়াছে।

তুহিন হিমানীর ন্যায় তারল্যরহিত সূক্ষ্ম শুভ্র কণিকা, কিন্তু আরও সূক্ষ্ম, আরও শুভ্র ও অতিশয় লঘু। জলকণিকা-অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া পরস্পরের সংমিশ্রণে কলেবরবৃদ্ধি করিতে তুষারকণিকার সময়ে কুলায় নাই—তৎক্ষণাৎ জমিয়া তুষারে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া দানাগুলিকে পৃথকই থাকিতে হইবে, এমন নয়; কিন্তু সে কথা পরে বলিব। ঐ সূক্ষ্ম লঘু তুহিন-কণাসমূহ বায়ুতাড়িত হইয়া নিঃশব্দে পড়িতে থাকে। কিন্তু পড়া বলিলে যে একটু গুরুত্ব ব্যঞ্জিত হয়, সেইটুকু বাদ দিয়া এই পড়া বুঝিতে হইবে। এই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওড়াও আছে। ঠিক্ যেন আকাশময় কাপাসতুলা উড়িতে থাকে। যদি তুমি কখন সুরভি বকুল বা শেফালিকা তরুর তলে বসিয়া উহাদের ফুলের পতনের আঘাত অনুভব করিয়া থাক, তবে তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত এইটুকু বলিতে পারি যে, তুষারপাতের আঘাত তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ শতগুণ লঘু। দেবগণের পুষ্পবৃষ্টির যদি কিছু ভিত্তি থাকে, তাহা নিশ্চয়ই তুষার-পাত। বৃষ্টির সময় যেমন দূর হইতে শোঁ শোঁ ও নিকটে আসিলে টুপ্‌টাপ্‌ বা ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ হয়, তাহার লেশমাত্রও নাই;—কেবল তুষারকণিকা-গুলির বায়ুভেদজনিত অতি, অতিমৃদু একটি সুঁই সুঁই শব্দ কাণ পাতিয়া শুনিলে একটু যেন অনুভূত হয়। চাহিয়া দেখ, মুহূর্ত্তমধ্যে ধরণী শুভ্র কার্পাস-বসনে আবৃত হইয়াছেন। তরু, লতা, গুল্ম, তৃণ, গৃহ, গোষ্ঠ, প্রাঙ্গণ, পাষাণময় কর্কশ গিরিচূড়া,—সমস্তই শুভ্র। কর্কশতা, কাঠিন্য, পারুষ্য ও মলিনতা একেবারেই যেন পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। যে স্থানটি বন্ধুর ছিল, তাহা ক্রমে সমতল হইয়া উঠিল;—যেখানে কোণা ছিল, সেখানটা বেশ সুগোল হইয়া গেল;—যাহা সোজা ছিল, তাহা একটু ঝুঁকিয়া পড়িল। অমন যে অচল

শিখর, সেও যেন সজীব হইয়াছে; কেন না, তাহারও যেন ক্ষণে ক্ষণে গাত্র-স্পন্দন হইতেছে—কোমলতা, ধবলতা, লঘুতা ও শৈত্যের আতিশয্যে সেও যেন থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। আজন্ম ঊর্দ্ধবাহু মহাযোগী তরুরাজিও এ সময়ে চিরাভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া ঐ চঞ্চল আকাশকুসুম লইয়া মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ক্রীড়ায় মত্ত। স্তবকে স্তবকে তুষারগুচ্ছ নিঃশব্দে পত্র হইতে পত্রান্তরে, তথা হইতে শাখাপ্রশাখাদিতে, ক্রমে কাণ্ডদেশে, অলকাশিখরে গুহ্যকশিশুদিগের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে অবতরণ করিতেছে, আর লঘুভারবিমুক্ত পল্লবগুলিকে তালে তালে নাচাইয়া বনতরুগণ যেন সেই দেবনর্ত্তনের সহিত 'সঙ্গত' করিতেছে।

অবশ্য ইহা বৃষ্টিরই রূপান্তর, কিন্তু সম্পূর্ণ আর্দ্রতাবর্জ্জিত। বাহিরে যাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই। তোমার স্কন্ধে, পৃষ্ঠে, বা আর যেখানে যেখানে তুষার একটু বসিতে স্থান পাইবে, সেইখানেই এক একটি ক্ষুদ্র তুষারস্তূপ উপচিত হইবে—অথচ অঙ্গবস্ত্র ভিজিবে না, বা ভারবোধ হইবে না। একটু গা ঝাড়া দিলে তুবড়ী বাজির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় তুষারগুচ্ছগুলি চারি দিকে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।

কিন্তু উহাই চূড়ান্ত নয়। এত ক্ষণ আমরা যে প্রতিমা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, এখনও যে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। স্বর্ণমুকুট প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও যে উহাতে মণিমাণিক্যের সংমিলন হয় নাই। রঙ্গমঞ্চের সমস্তই সুসজ্জিত, কিন্তু এখনও যে দীপাবলী প্রজ্বলিত হয় নাই। সহসা কে যেন বৈদ্যুতিক আলোকের সংযোজক বোতামটি টিপিয়া দিল। চকিতের মধ্যে মেঘবিমুক্ত হইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ বিভাবসু শুভ্রবসনা পৃথিবীকে দেখিয়া একটিবার প্রাণ ভরিয়া হাসিলেন। কি চমৎকার ইন্দ্রজাল! যাহা এতক্ষণ কেবল শুভ্র ছিল, তাহা নিমেষমধ্যে সুমার্জ্জিত রজত ও হীরকে পরিণত হইল,—দশ দিক শুভ্র কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। আলোক, আলোক, কেবলই আলোক, অথচ কেমন সে স্নিগ্ধ আলোক! রবিকিরণ তুষার-কণিকাসমূহে প্রতিভাত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধনুর ধূপছায়া রঙ্গে অতি চঞ্চলভাবে ঝিকিঝিকি করিতে লাগিল। স্বর্গের আলোক বুঝি বা এইরূপই। বাস্তবিক, মানুষের পক্ষে স্বর্গশোভার কল্পনা যদি কোথাও কখনও সম্ভব হয়, তবে তাহা এই তুষারক্ষেত্রে ও তুষারপাত-সময়েই সম্ভব। যিনি প্রকৃতির এই চটুলকেলি জীবনে সর্ব্বপ্রথম দেখিবেন,

নিতান্ত নীরসহৃদয় হইলেও, তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ পর্যন্ত চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিমুগ্ধ ও নির্বাক হইয়া থাকিতে হইবে। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার নয়নপ্রান্ত আর্দ্র হইবে। বস্তুতঃ তুষারপাত যেন প্রকৃতিদেবীর নিভৃতে চিত্তবিনোদ-সহায় সুকুমার কলা; উহার সুষমার সহিত ক্লেদ-কলুষিত পৃথিবীর আর কোনও শোভাই উপমিত হইতে পারে না।

'আকাশ-কুসুম' কেবলই কি রূপক? না, তাহা নয়। তুষার প্রকৃতই কুসুম। সদ্যোজাত তুষার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহা ষড়দলনিবদ্ধ শুভ্র কুসুমের মতই দেখায়। কুসুম ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও বস্তুর সহিত উহার স্বরূপের তুলনা হইতে পারে না। ততোধিক লঘু, সুন্দর, উজ্জ্বল, কোমলস্পর্শ ও ক্ষণস্থায়ী। অতিক্ষুদ্র তুষারকণাসমূহ ঐরূপ পুষ্পাকারে পরস্পর সংলগ্ন হয় বলিয়াই বায়ুভর করিয়া আকাশে উড়িতে থাকে। অনেকগুলি ক্ষুদ্র হীরক-খণ্ড একত্র সংযোজিত করিলে উহাদের সমষ্টি শুভ্র দেখায়, অথচ হীরক স্বয়ং স্বচ্ছ। তুষারকণিকাও পৃথক্ অবস্থায় সুস্বচ্ছ, কিন্তু ঐরূপ পুষ্পাকারে মিলিত হইলে শুভ্র দেখায়। মিলিত হইবার সময় বহুলপরিমাণে বায়ু অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায়। ঐ বায়ুই আকাশ-কুসুমের শুভ্রতা ও লঘুতার একমাত্র কারণ।

এখন কেবল আপস্ফটিক (ice) অবশিষ্ট। ইহার বিষয়ে অধিক লেখা আবশ্যক মনে করিতেছি না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, পাঠক পাঠিকা-দিগের মধ্যে সকলেই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত আপস্ফটিক দেখিয়াছেন,—এই দারুণ গ্রীষ্মে অনেকেই নিত্য ব্যবহার করিতেছেন, সুতরাং উহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আমার প্রবন্ধ পড়িবার প্রবৃত্তি কাহারও হইবে না। মর্য্যাদায়ও আপস্ফটিক সর্ব্বনিম্ন। যাহাকে মানুষ অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার আবার মর্য্যাদা কি?

স্বাভাবিক আপস্ফটিক সাধারণতঃ তুষার হইতেই উৎপন্ন হয়। তুষার-স্তূপ হইতে অন্তর্নিবিষ্ট বায়ু নিষ্কাশিত হইলেই, উহার কতকগুলি মিলিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। উহাই আপস্ফটিক। যেখানে যেখানে তুষারের বড় বড় স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই উপরের তুষারের ভারে ঐ প্রকারে নিম্নস্তরে বায়ুর নিষ্কাশন ও কণিকাদিগের সংযোজন ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহা হইতে পরে আপস্ফটিকপ্রবাহ (glacier) উৎপন্ন হয়। তুষার গতিশীল নয়, কিন্তু স্ফটিকপ্রবাহ মন্থর হইলেও অদম্যগতি। হিমালয়ের উচ্চ শিখরসমূহ চির-তুষার-মণ্ডিত। তন্নিম্নে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর শীতকালে তুষারপাত হয়

বটে, কিন্তু গ্রীষ্মাগমে উহা গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। যে স্থান হইতে আর গলে না, সেই সেই স্থানের উপত্যকাসমূহে আপস্ফটিকপ্রবাহ চিরবিরাজমান। এই প্রবাহই এক একটি গিরিনদীর জনকস্বরূপ। নিম্ন সীমা রৌদ্র ও উত্তপ্ত বায়ুর সংস্পর্শে সর্ব্বদাই গলিতে থাকে। তথা হইতেই জলপ্রবাহের প্রারম্ভ।

শীতপ্রধান দেশে শীতকালে তড়াগাদির জলের উপরিভাগেও অল্পাধিক আপস্ফটিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ স্ফটিকস্তর দ্বারাও প্রকৃতি অনেক কাজ করাইয়া লন, কিন্তু সে সকলের আলোচনা এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

বিদ্যাভূষণী 'মনসা'।

চট্টগ্রামে 'বাইশ-কবি' ও 'ষট্-কবি' নামে পরিচিত দুইখানি মনসার পুঁথিই সমধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। 'বাইশ-কবি' মনসা বাইশ জন কবির প্রণীত, এবং 'ষট্-কবি' ছয় জন কবির রচিত। শ্রাবণ মাসে বিষহরী পূজা উপলক্ষে উক্ত দুই পুঁথির একতর হিন্দুর গৃহে গৃহে পঠিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত পুঁথিখানি অত্যন্ত বৃহৎ; তাহা পাঠ করা বিশেষ শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। বোধ হয়, এই কারণেই পরে সংক্ষিপ্তাকারে 'ষট্-কবি মনসা' রচিত হয়। এই উভয় পুঁথির রচয়িতৃগণ সকলে একদেশী বা একপ্রদেশবাসী নহেন। বিভিন্ন দেশীয় কবিগণ মিলিত হইয়া কিরূপে এরূপ একখানি গ্রন্থের রচনা করিলেন, তাহা ভাবিবার দেখিবার বিষয় বটে। কিন্তু এই দুইখানি পুঁথি অদ্য আমাদের আলোচ্য নহে; সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

চট্টলের দক্ষিণাংশে উক্ত পুঁথিগুলির পরিবর্ত্তে আর একখানি গ্রন্থের অধিকতর সমাদর দৃষ্ট হয়। উহার প্রকৃত নাম 'মনসা-মঙ্গল'; কিন্তু ইহা সাধারণতঃ 'বিদ্যাভূষণী মনসা' নামে অভিহিত হয়। গ্রন্থের রচয়িতার নাম

রামজীবন বিদ্যাভূষণ; এই কারণে প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে বিশেষ করিবার জন্য উহার ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

আকারে পুঁথিখানি অত্যন্ত বৃহৎ;—উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত ১২৯ পত্রে ইহা পরিসমাপ্ত। প্রতিলিপিখানি অল্প দিন পূর্ব্বে লিখিত হইলেও, গ্রন্থের রচনা আধুনিক নহে। পুঁথির দুই স্থানে ইহার রচনাকালজ্ঞাপক নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি আছে:—

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসা-মঙ্গল রামজীবন রচিত॥

সুতরাং 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই সূত্রানুসারে রচনাকাল ১৬২৫ শকাব্দ পাওয়া যাইতেছে; অর্থাৎ, ইহা প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে।

কবি রামজীবন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ চট্টগ্রাম—বাশখালী থানার অন্তর্গত 'রাণীগ্রাম' নামক গ্রামে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ৺হরিরাম চৌধুরী মহাশয় এই গ্রামেরই অধিবাসী। অদ্যাপি তাঁহার বংশ বিশেষ সম্পন্ন আছেন। গ্রন্থারম্ভে কবি লিখিয়াছেন:—

অল্প বয়স মোর দ্বিজকুলে জাত।
পণ্ডিত না হম্ মুই কহিলু সভাত॥
মনসার নামমাত্র হৃদয়ে ভাবিয়া।
মহাসিন্ধু খেবা দিছি উড়ুপ লইয়া॥
জনক আজ্ঞার জান গঙ্গারাম খ্যাতি।
তাহান চরণ বন্দো করিয়া ভকতি॥
তাহান অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ।
করজোড়ে তান পদে করম বন্দন॥
গুরুর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
গ্রামেশ্বরী দেবী বন্দো যে গ্রামে বসতি॥

ইহা হইতে কেবল তাঁহার পিতৃনাম ও খুল্লতাতের নাম জানা যায়। পুঁথি-রচনার সময় তাঁহার বয়স অল্প ছিল, উদ্ধৃত অংশে তাহারও উল্লেখ আছে।

হতভাগ্য চট্টগ্রামে সাহিত্যব্যবসায় কত কঠিন, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না। নিজে না করিলে অপরের দ্বারা কোন কাজই সম্পন্ন করিয়া লইবার উপায় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা একরূপ সখের কাজ; অথচ দেখা যায়, এ কার্য্য উদর-চিন্তা-শূন্য লোকদিগের যোগ্য ও গ্রহণীয় হইলেও, যত অল্প-

চিন্তা-বিষধর-দংশন-কাতর শ্রীহীন ব্যক্তিরাই ইহাতে উন্মত্ত! এই প্রবন্ধের অধম লেখকও শেষোক্ত শ্রেণীর এক জন। দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া প্রত্নতত্ত্ব-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, বাঙ্গালার অনেক লেখককেই প্রায় চিরজীবন একাদশী করিতে হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই! এই কবির বিবরণ-সংগ্রহের জন্য আমরা কত জনকেই না বিফল অনুরোধ করিয়াছি! কিন্তু মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার এমন দুর্ভাগ্য যে, এ পোড়া দেশে কেহ সংকার্য্যের সহায় হয় না। এই কারণে পাঠকগণকে আমরা এতদ্বিষয়ে আর কোনও সমাচার দিতে পারিলাম না। লোকমুখে শ্রুত হইয়াছি যে, এক্ষণে কবির বংশে কেহ জীবিত নাই।

ইঁহার রচিত ও ১১৮৫ মঘীর লিখিত "সূর্য্য-চরিত্র পাঞ্চালী" নামক আর একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাহার রচনাকাল "ইন্দু রাম ঋতু বিধু শক" অর্থাৎ ১৬১১ শকাব্দ। পূর্ব্বে যে কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কতক অংশ এই সূর্য্য-চরিতেও লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু ভণিতাতে তিনি কোথাও তাঁহার 'বিদ্যাভূষণ' উপাধির ব্যবহার করেন নাই। তাই মনে হয়, সূর্য্যচরিত-রচনাকালে তিনি উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই। সাধারণতঃ টোলের পণ্ডিতগণ প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে উপাধিলাভ করিয়া থাকেন। মনসা-মঙ্গলখানি ১৪ বৎসর পরে বিরচিত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং ১৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৬১১ শকাব্দার অর্থাৎ সূর্য্যচরিত্র-রচনাকালে তাঁহার বয়স অন্ততঃ কুড়ি বৎসর হইয়াছিল,—অনুমান করিলে, ১৫৯১ শকে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, স্থূলভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। *

আমাদের কবি 'বিদ্যাভূষণ'-উপাধি-ধারী, সুতরাং বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি, তাহাতে আর কথা কি? অনেক স্থলে 'উপাধিব্যাধিরেব' হইয়া থাকে, কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থ-পাঠে মনে হয়, এই উক্তি আমাদের বিদ্যাভূষণ কবির প্রতি

---

* বলিতে ভুলিয়াছি, লখিন্দরের পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে অপর এক কবির ভণিতি দেখা যায়, তাহা এই :—

'পদ্মার চরণবন বন্দিয়া শিরএ।
জীয়ান প্রসঙ্গ দ্বিজ গৌরচন্দ্র কয়॥'

এতদ্ভিন্ন দুইটি পূর্ণ ধুয়ায় কবিচন্দ্র ও শিবচরণ দাস নামক আরও দুই কবির ভণিতি পাওয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম, কবি স্বীয় গ্রন্থে অন্যের রচিত ঐ দুইটি ধুয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিজ গৌরচন্দ্র সম্বন্ধে মীমাংসা কি?—লেখক।

প্রযুক্ত হইতে পারে না। তাঁহার যথেষ্ট কবিত্বশক্তি ও ভাষাজ্ঞান ছিল। তাঁহার রচনা সর্ব্বত্রই হাস্যরসে ও কৌতুকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। তাঁহার ভাষা কোমল, মধুর ও মর্ম্মস্পর্শিনী। বহু বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান ছিল, গ্রন্থপাঠে তাহা সহজেই জানা যায়। কবি জ্যোতিষশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন, বোধ হয়। টোলের উপাধি-ধারী পণ্ডিতগণ বড়ই নীরস ও 'অরসিক' বলিয়া বিখ্যাত; আমাদের কবি সেই শ্রেণীর নহেন। তিনি পণ্ডিত হইলেও বৈষ্ণবমতানুযায়ী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। প্রত্যেক ছন্দের আরম্ভের পূর্ব্বে তিনি যে এক একটি 'ধুয়া' সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাই আমাদের উক্ত কথার সাক্ষ্য। 'ধুয়া' এই গ্রন্থে 'ঘোষা' নামে পরিচিত। তাঁহার গ্রন্থে বিবিধ ছন্দের অবতারণা আছে; তন্মধ্যে 'লাচারিগুলি' ত্রিপদী ছন্দোবিশেষ, এবং 'লাচারি ভাটিয়ালগুলি' পয়ার। ধুয়ার শেষে "সেবকের ইতি ভন্তা." বা শুধু "ইতি ভন্তা" লিখিত আছে। ধুয়াগুলি তদ্রচিত কি না, জানি না। কিন্তু তাহাদের সমাবেশে তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ধুয়াগুলি দূরাগত বীণাধ্বনিবৎ কর্ণে মধুবর্ষণ করে। বলিতে কি, নিজে উপভোগ না করিলে তাহাদের লালিত্য মাধুর্য্য কথায় প্রকাশিত করা যায় না। আমরা পাঠকগণকে সে রসের আস্বাদে বঞ্চিত করিব না। কয়েকটি ধুয়া এই,—

(১) নিবেদন করি রে নাথ! নিবেদন করি।
কি করিব তোমার প্রেমে আমি যদি মরি॥
শয়নে স্বপনে মোর ঝুরে দুইটা আখি।
মৈলে নি তোমারে পাব জীতে যেন দেখি॥

(২) প্রাণসখি গো, কাখে কলসী লৈয়া যমুনা যাইও।
বিধিএ নির্ম্মাইছে রূপ নয়ান ভরি চাইও॥

(৩) একে গৌরা নীলমণি, মোর গোরা চান (চান্দ)।
ভুবন ভুলাইলে গৌরা দিয়া হরিনাম॥

(৪) বাঁশী বাজেত রে!
নিশবদে শুন, শুনিয়া ঐ ধ্বনি, কুলের কামিনী,
ঘরে সান্ধাইতে নারে পুন রে॥

(৫) আমি আর কালিন্দীতীরে যাব না।
যদি যাই কদমতলে চাব না॥

(৬) উপায় না দেখি হরি, তোমার শীতল পদ বিনে।
তুয়া নাম করিছি সার, তুমি যদি কর পার,
করুণা না হইল এত দিনে॥

(৭) দঢ় নাকি মধুপুরে যাইবা ওরে শ্যাম।
হেলাএ রাধার প্রাণি লৈবা॥

এমন ধুয়া অনেক; আর কত উদ্ধৃত করিব? দুঃখের বিষয়, ধুয়াগুলি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয় নাই।

পাঠকগণ মনসা-ঘটিত ব্যাপারের নায়কনায়িকাগণের চিত্র দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" দেখিয়াছেন। মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির তদ্বিষয়ে প্রয়াস পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় দুরাশামাত্র। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই গ্রন্থখানি পূর্ব্ব-পরিচিত গ্রন্থরাজি অপেক্ষা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে। বরং কবি বামজীবন কোনও কোনও কবি অপেক্ষা অংশবিশেষে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হাস্য রসের রচনায় তিনি সমধিক নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। 'কাজির দুর্গতি' ও 'গোদের সহিত বিপুলার মিলনে' তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। পাঠকগণকে এই গ্রন্থের দুই স্থান হইতে নমুনাস্বরূপ কিয়দংশ উপহার দিতেছি।—

(১) হর-পার্ব্বতীর কন্দল।

ক্রোধ করি মহেশ্বরে বোলে পুনর্ব্বার।
এথ কেনে মোর সনে কর অহঙ্কার॥
মিথ্যা কাজে মন্দ বোল সহিতে না পারি।
তোর ঘিনে (ঘৃণায়) মাগি খাইমু হৈয়া দেশান্তরী॥
এ ঘর সম্পত্তি মোর নাই প্রয়োজন।
আজ্ঞা কৈলা বৃষ নন্দি করহ সাজন॥
তুণের কাম নহি করে বসি থাকে ঘর।

* * * * * *

যেই মাগি পাম্ মায়ে পুতে বসি খায়।
কন্দল করিবার মনে থাকে সর্ব্বদায়॥
আধা পেটি খাই মুই জনম গোমাইলু।
তবো (তবু) এ বেটির নামে ভাল না পাইলু॥
বিধাতাএ করিছে মোরে জনমভিখারী।

নারী বেটি মন্দ বোলে কি করিতে পারি ॥
কার ঘরে নারী নাই কেবা এমন করে।
বিষ খাইতে চাইলু মুই এ বেটির ডরে ॥
মায়ে পুতে আনন্দে থাকৌক তিন জন।
বৃষ আন ভিন্ন দেশে করিমু গমন ॥

(২) মনসা-কর্তৃক চান্দের দুর্গতি।

অস্ত গেল তপন উদিত নিশীশ্বর।
জল হোতে উঠিলেন রাজা চন্দ্রধর ॥
ধীরে ধীরে চলি গেলা আপনার ঘর।
কলাবনে রৈল গিয়া বৃক্ষের উপর ॥
দৈবযোগে সেই দিন হৈছে রবিবার।
পোরলি খাইতে ইচ্ছা হৈল সোণকার ॥
এক দাসী তথা গেল আনিতে পোরলি।
পত্র যদি লড়য়ে উপরে ভূত বলি ॥
অন্ধকারে হস্ত দি, তুলিল গোটা পাঁচ।
তুলিতে তুলিতে গেল আমগাছের পাশ ॥
উভা হৈ বসিছে চান্দু * * * *।
পোরলি বলিয়া দাসী হইল সন্তোষ ॥
দুই হাতে টানে দাসী ছিঁড়িবার তরে।
মৈলু মৈলু বোলি চান্দু ঝাম্প দিয়া পড়ে ॥
তা দেখিয়া দাসীর যে ভূত হেন জ্ঞান।
বাড় বাড় বলি ডাকে ভয়ে কম্পমান ॥
তথা হোতে চন্দ্রধর কলাবনে ধায়।
পাছে পাছে দাসীগণে তাহারে লড়ায় ॥
কত দূরে লাগল পাইল চন্দ্রধর।
মুড়িয়া পিছার বাড়ি মারে মাথার উপর ॥
মুই মুই বোলি চান্দু ডাকে উতরোল।
মার মার বোলে দাসী নাহি শুনে বোল ॥
চরণে প্রহার করে মারে বজ্র বাড়ি।
ছয় বধূ আসিয়া পুড়িল ভূতের দাড়ি ॥

চান্দের এই দুর্গতিতে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই দুঃখিত হইবার কথা। সুতরাং দৃশ্যান্তর উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহাদের দুঃখবৃদ্ধি অনাবশ্যক।

আর এক স্থান হইতে কবির ব্যবহৃত একটি নূতন ছন্দের নমুনা দিতেছি; তাহা হইতে কবির রহস্যপ্রিয়তাও প্রতিপন্ন হইবে। বিপুল দেবপুরী হইতে লখিন্দরকে লইয়া আসিবার পর :—

আর এক আইল বুড়ী,
বয়সে বছর এ ছয় কুড়ি,
দোলিয়াছে দুইটি কপোল।
ত্বরিতগমনে চলিয়া যায়,
হাটিতে না পারে পাছার খায়,
নয়ান বহিয়া পড়ে লোল॥

পাকান কুন্তল ভগন কটি,
হাতেতে লইয়াছে পাকনা লাঠী,
কাকলিতে আর হাত দিয়া।
ত্বরায় মুখেতে না আইসে কথা,
লখাইরে দেখিয়া নাড়িছে মাথা,
ধীরে ধীরে বাথানে চাহিয়া॥

আর যত যুবাগণ,
বুড়ীরে বোলএ ঘন,
বুড়াকালে এথ সাধ আছে।
লাজেরে নাহিক ভয়,
যুবাকালের কথা কয়,
তা শুনিয়া বোলে বুড়ী পাছে॥

যেবা মোরে বোলে বুড়ী,
কিল মারিম আঠার কুড়ি,
বুড়া বুড়া না বোলিয় মোরে।
নয়ান ভরিয়া লখাইরে চাম্,
যেবা লয় বুড়ীর নাম,
বুড়ার নিছনি দিমো তারে॥

সকলেই জানেন, লখিন্দর ছাড়া চন্দ্রধরের আরও ছয়টি পুত্র ও চৌদ্দখানি ডিঙ্গা ছিল, কিন্তু তাহাদের নামগুলি কেহ জানেন কি? এই গ্রন্থে পুত্রগণের নাম পাওয়া যায়;—শিবানন্দ, কীর্ত্তিবাস, দুর্গাধর, দুর্গাদাস, ভবশঙ্কর ও মণিরাজ। ডিঙ্গাগুলির নাম,—মধুকর, হাকিনী, একাকিনী, পাণিধার, শঙ্খচূর, দুর্গাবর, বড়ধুম, ছুটিধুম, চাম্পাধার, ধুতুরার ফুল, পাটন পাগল, স্বর্ণধার, বিজয়া-সাগর ও রক্তধার।

ভাষালোচনার পক্ষে এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিম্নে আমরা কতকগুলি অপ্রচলিত ও প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ উদ্ধৃত করিতেছি।

লাগ—উপযুক্ত। ইংরাজীর "Like father, like son" এর 'like' শব্দের সহিত এই শব্দটির খুব সাদৃশ্য আছে। পারস্য 'লায়েক' শব্দের অপভ্রংশ।

'পদ্মা বোলে এই কথা নহে তোমার লাগ।'

ভোগে—ক্ষুধায়। আজ পর্য্যন্ত মুসলমানেরা ইহা ব্যবহার করেন 'ক্ষুধার্ত্ত' অর্থে 'ভুখিল' শব্দেরও প্রচলন আছে।

'ভোগে মোর পোড়ে গা, চলিতে না চলে পা,
শীতে অঙ্গ করে ধড়ফড়।'

অবগতি—উপস্থিত।

'সোনকার সাক্ষ্যাতে হইল অবগতি।'

উলা—(১) নামা, (২) উদয় হওয়া। বানানে 'ঊ'কারও হইতে পারে।

১। 'জলেতে উলিয়া দোহে করিলেক স্নান।'

২। 'তা শুনিয়া সূর্য্য উলিবারে কহে সতী।'

শেষোক্ত অর্থ আজও এই দেশে প্রচলিত আছে।

মৌগ—মাগ বা মাগী—স্ত্রী।

'সঞ্জর উঠিলে তার রৌদ্রে থুইয়া গা।
অতি ক্রোধ হৈলে তার মৌগেরে বলে মা॥'

আহর—'অক্ষর' শব্দের অপভ্রংশ।

'কান্দিবে দুই চারি আহর লোকাচার ডরে।'

এক্কনি—এমনি—অমনি, বিনামূল্যে।

'এক্কনি পাইলে বিহা করিমু নিশ্চয়।'

গাবুরাল বা গাভুরাল—গর্ব্ব।

'শুন শুন রাখোয়াল, তোরার এথ গাভুরাল।'

শব্দটি 'গাভুরালী'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র।

ছালন—ব্যঞ্জন। মুসলমানের ব্যবহৃত শব্দ।

কপিলা—স্ত্রী।

'শুনি তার কপিলা গেল পাকোয়ান শালাৎ।'

পাকোয়ান=পিষ্টক বিশেষ।

কৈল—'কলহ' শব্দের অপভ্রংশ।

'প্রতিদিন দণ্ডে পলে বাঝাইত কৈল্।
পাড়ার নিছনি গেল প্রেত বেটি মৈল্॥'

বাঝাইত=বাধাইত।

মার্গ—নিতম্ব দেশ।

'তৃণের কাম নাহি করে বসি থাকে ঘর।
মাগিতে মাগিতে মোর মার্গে গেল্ ছর॥'

ঘিণে—ঘৃণায়।

'তোর ঘিণে মাগি খাইমু হৈয়া দেশান্তরী।'

কোরে—(ক্রোড়ে?) নিকটে।

'গোগরীর কোরে কার ডিঙ্গা চৌদ্দখান।'

লোপ—মাছকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বঁশীতে যে 'আধার' দেওয়া হয়। টোপ।

'বঁশী বানাইআছি লোহা আনী মনে।
মহিষ মারিয়া লোপ দিয়াছি যতনে॥'

নাটোয়া—নর্ত্তক।

'এক পণ কড়ি মুই ভাঙ্গ কিনি খাইমু।
আর এক পণ দিয়া নাটোয়া নাচাইমু॥'

আরা—অন্য। cf 'আরা (আড়া) পাড়া।'

'আরার আগে বড় তুমি আমার আগে শিশু।'

দড়—প্রতিজ্ঞা। এই শব্দ হইতে 'দড়াইমু' ক্রিয়ার উৎপত্তি।

'এই মোই দড় কৈলু তোমার সাক্ষাৎ।
বুকে ছেল হানি প্রাণি করিমু নিপাৎ॥'

উয়ারি মেহারি—কি?

'ঘর দ্বার হারলামি উয়ারি মেহারি।
অবশেষে হারিলু ঘরের পঞ্চনারী॥'

'উয়ারি' (বা উহারি) অনেক স্থলে 'গৃহ' অর্থে প্রযুক্ত দেখিয়াছি। যথা,—

'বাজএ নানান বাদ্য শিবের উয়ারি।'

অন্নিত—অন্নপ্রাণ।

'ক্রোধে বোলে শূলধারী, শুন রে ডোমের নারী,
তুই বেটি বড়ই অন্নিত।'

মাতিয়া—কথা কহিয়া।

'ন মাতিয়া রহ এবে মুখে লজ্জা জানি।'

পাটা—('পাটা'র ন্যায়) প্রশস্ত।

'দূরেতে চলিছ তোর কেমন পাটা বুক?'

শারিমু—উৎপাটন করিব।

'আজু ধরি শারিমু তোর জত পাকা দাড়ি।'

আচাভুয়া—(?)

'গোপদাড়ি শারি মুখ কৈল আচাভুয়া।'

অথান্তর—বিপদ, দুর্গতি।

'আজু নিশি দেখ আর কার অথান্তর।'

বাৎ—বাদ—শেষ। পারস্য 'বা আদ্'।

'যদি না চেয়াই পাছে সন্ধ্যা হয়ে বাৎ।'

লাড়া—মুণ্ডিত।

'লাড়া মাথা মোচরি ফেলিল উভৎ করি।'

মুকল—মুক্ত, অবিন্যস্ত।

'আউলাইয়া মাথার কেশ, মুকল হইছে ভেশ,
বোলে বিধি বিড়ম্বে আমারে।'

আখু—ইন্দুর। (সংস্কৃত শব্দ।)

'পদ্মার বচনে নেতা আখু-রূপ ধরি।
চান্দুর পাতের অন্ন সব নেয়ি হরি॥'

গাভর (গাভুর)—এতদ্দেশে সাধারণতঃ 'চাকর'কে 'গাভুর' বলা হয়। বিশিষ্ট ভদ্রসমাজে এখন তৎপরিবর্ত্তে 'চাকর' ব্যবহৃত হয় মাত্র। এই শব্দেই 'আলি (আলী)' প্রত্যয় করিয়া 'গাভুরালী' নিষ্পন্ন হইয়াছে।

'গাভর সকল কান্দে মাথে হাত দিয়া।'

দখল—মহল। 'বাহির দখলে চান্দু আছে হৃষ্টমনে।'

লাড়ামুড়া—(বৃক্ষাদি) পরিশূন্য, নষ্ট।

'বাগিচা দেখিল গিয়া হৈছে লাড়ামুড়া।'

মুড়িয়া—পুরাতন ও ভগ্ন। শব্দটি 'মুড্রিয়া' রূপে লিখিত।

'মুড়িয়া পিছার বাড়ি মারি দিল খেদাইয়া।'

সাউধানী—সদাগর-পত্নী। সাউধ=সাধু, স্ত্রীলিঙ্গে ঐ রূপ। কখন কখন 'সাউধাইন' হয়। আর একটি শব্দ আছে,—'বেহাই' ((বৈবাহিক), স্ত্রীলিঙ্গে 'বেহাইন'।

'আনন্দে সখীর সনে বসিছে সাউধানী।

"চতুরা স্ত্রীলোক" অর্থে চট্টগ্রামে "নেকাইন স্ত্রীলোক" এইরূপ বাক্য প্রচলিত আছে।

হের—ইহা এখন পদ্যে 'দেখ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেকালে [এবং এখনও চট্টগ্রাম নেজামপুর অঞ্চলে) সম্বোধনে ব্যবহৃত হইত। ইহা এখন: 'হে' রূপে পরিণত হইযাছে।

'আদেশিল মালী হের শুনহ বচন।'

সইয়ালা—স্ত্রীলোকের বন্ধুত্ব। দীনেশ বাবু অনুমান করেন, এই শব্দ হইতে 'সল্লা' (পরামর্শ) শব্দ আসিয়াছে। এই 'য়ালা'-প্রত্যয়ান্ত শব্দ আরও আছে ;—বেহাইয়ালা, জামাইয়ালা।

ওরৈসা—উড়িষ্যা দেশ। তৎকালে এই দেশের নাম ঐরূপই ছিল, বোধ হয়। মনে হইতেছে, আর একটি প্রাচীন পুঁথিতে 'ওড়েস্যা' দেখিয়াছি।

আলোচনাযোগ্য এমন আরও বহু শব্দ রহিয়া গেল ; সবগুলির উল্লেখের স্থান আমাদের নাই। আর কতকগুলি শব্দ এখন একরূপ সুপরিচিত, তজ্জন্য তাহাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না ; কেবল তাহাদের নামমাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম ঃ—

পৈতা—উপবীত ; তথি—তথায় ; লড়—দৌড় ; ঢেকা—ধাক্কা ; তেতৈ—তেঁতুল ; ভৈন—ভগ্নী ; ওর—শেষ ; ছাওয়াল—ছেলে ; কসল্লা—যন্ত্রণা ; গৰ্দ্দনি—ঘাড় ; পোখরি—পুকুর ; লেঙ্গুর—লেজ ; তভো—তবু ; ডাঙ্গর—বড় ; বেকা—বক্র ; নিয়রে—নিকটে ; পোঝা—বোঝা, সম্ভবতঃ 'পুঞ্জ' শব্দ-জাত। কুহরা—মোরগ ; লুড়িয়া—লুটিয়া ; বার্ত্তন বা বার্ত্তনি—(বার্ত্তা

দেওয়া) নিমন্ত্রণ; ঝোটা—চুলের খোপা; ঝাটাই—ঝটতি, শীঘ্র; আই—মা; সমসর—সমান; উভ—খাড়া; সাতাই—সৎমা; পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে; খুয়ায়—যোগ্য হয়; সরমজান—সামগ্রী; আধুনিক 'সরঞ্জাম'; সমাই—সকল, 'সমূহ' শব্দ-জাত।

আনন্দের বিষয় যে, "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" বঙ্গের নানা স্থানের প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দাদির সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায়, শীঘ্রই এইরূপ জাতিচ্যুত বহুল শব্দ সংগৃহীত হইবে। আমরাও চট্টগ্রামী শব্দের সংগ্রহে ব্যাপৃত আছি।

ব্যাকরণঘটিত নিয়মাদি সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক। এই গ্রন্থে সর্ব্বত্রই—

(১) কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২) 'তোমরা' ও 'তোরা' এই পদগুলি 'তোম্রা' ও 'তোড়া' রূপে লিখিত।

(৩) 'আমি' ও 'তুমি'র বহুবচন 'আমারা' ও তোমারা।

(৪) 'আমাদিগকে' ও 'তোমাদিগকে'র স্থলে 'আমারারে' ও 'তোমারারে' ব্যবহৃত।

(৫) ভবিষ্যতী ক্রিয়ার অন্তে 'মু' বা 'ম্' ব্যবহৃত, যথা ;—

[ক] এমনি পাইলে বিহা 'করিমু' নিশ্চয়।

[খ] কিল্ গাবিম্ আঠার কুড়ি।

(৬) 'করিতেছ' 'শুনিতেছ' ইত্যাদি স্থলে 'করসি', 'শুনসি' ইত্যাদি প্রযুক্ত।

(৭) সে=তে; যথা—'তে পূজিলে পূজিব সংসার'। এই দেশে মৌলিক কথাবার্ত্তায় তুচ্ছার্থে সে=তে, সে (স্ত্রীং)=তাই, সম্ভ্রমার্থে সে=তাঁই, (মুসলমান মতে 'তেঁই') তাঁর=তান, তার (স্ত্রীং)=তাইর, (মুসলমান-মতে 'তেইর') আমাদের=আমরার বা আমারার, তোমাদের=তোমরার বা তোমারার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৮) নামপুরুষে উত্তমপুরুষের ক্রিয়া প্রযুক্ত।

(৯) অনেক স্থলে তোর=তোহর, মোর=মোহর, আমার=আহ্মার ও তোমার=তোহ্মার রূপে প্রযুক্ত।

(১০) গুণন্তি, করন্তি, বোলন্তি ইত্যাদিরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ খুব অধিক।

(১১) করিলাম, গেলাম ইত্যাদির স্থলে করিলু, করিলুম্, গেলু, গেলুম্ ইত্যাদি।

(১২) পাই, যাই ইত্যাদির স্থলে পাম্, যাম্ ইত্যাদি।

(১৩) সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন প্রায়ই লুপ্ত; যথা,—'এই মোই [মুই] দঢ় কৈলু তোমার সাক্ষ্যাত [সাক্ষাতে]।

(১৪) 'জন্য' অর্থে 'রে'-র প্রয়োগ; যথা—'দেখি আনন্দিত সাধু স্নানেরে গমন।'

(১৫) 'দিয়াছি' ইত্যাদির স্থলে 'দিয়াছে'-র' প্রয়োগ অধুনা চট্টগ্রামে তৎস্থলে 'দিয়াছম্' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

(১৬) পদান্ত মিলাইবার সুবিধার্থ ক্রিয়াবিশেষে 'ও'-এর সংযোগ;

[১] কাহার বনিতা হও,
এথা কেনে রহিছও।

অপরাপর স্থলে এই ও'-এর পরিবর্ত্তে 'হ' প্রায় সকল প্রাচীন পুঁথিতেই [এবং এখনও] ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পুঁথিতে কিন্তু সর্ব্বত্রই 'ও' প্রযুক্ত—

শ্রীবিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য ভণে।
সেবক নায়ক করও (করহ) কল্যাণে॥

এই পুঁথিতে 'আওয়াস' শব্দটি বহু স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য অনেক পুঁথিতেও ইহার ব্যবহার আছে। আমাদের মতে, ইহা 'আবাস' শব্দেরই উচ্চারণ-ভেদ-জাত অপভ্রংশ তদ্ভিন্ন ইহার কোনও স্বতন্ত্র মূল নাই। 'ব'-এর উচ্চারণ অন্তঃস্থ ধরিলেই 'আবাস' সহজেই 'আওয়াস' হয়। নিম্নোদ্ধৃত বাক্য-গুলির আলোচনা করিলে এই অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হইতে পারে।—

(১) নমস্কার করি কাজি চলিল আবাস।

(২) নেতার সঙ্গতি গেলা আপনা আওয়াস।

(৩) শুনি সোণা চলি আইল জালুল আওয়াস।

(৪) বিষাদ ভাবিয়া আইলা ওঝার আবাসে।

কিন্তু এই 'ব'-এর উচ্চারণ এক স্থানে অন্তঃস্থ, আর এক স্থানে আর একরূপ, লিখিবার কারণ কি, বুঝা কঠিন বটে।

মনসা-পুঁথির সমালোচনা করিতে গিয়া মনসা সম্বন্ধে দুটি কথা না বলিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

চট্টগ্রামের অধিবাসিগণের বিশ্বাস, মনসা ও চাঁদ সদাগরের ব্যাপার এই চট্টগ্রামেই ঘটিয়াছিল। কেবল আন্তরিক বিশ্বাস নয়, অনেকে ঘটনার স্থানাদিরও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। মনসা-পুঁথির 'চম্পকনগর' এখানে 'চাঁপাতলী' নামে পরিচিত। ইহার পার্শ্বেই 'গুণদ্বীপ' নামক গ্রাম। তাহাই নাকি 'গুর্জ্জরী' বা 'গুঞ্জরী'। চাঁপাতলীতে চাঁদ সদাগরের প্রকাণ্ড দীঘি আজও বর্ত্তমান। সমুদ্রগামী নাবিকেরা আজও তাহার জলপান করে। তাহার নিকটেই গুঞ্জরীর ঘাট ও নেতা ধোপানীর ঘাট প্রদর্শিত হয়। প্রবাদ এই যে, তাহার অত্যল্প ব্যবধানে 'বৈরাগ' নামক গ্রামে কালু কামারের ভিটা ও লখিন্দরের লোহার বাসরঘর অবস্থিত ছিল। কালু কামারের তথাকথিত ভিটা আমরা দেখিয়াছি। তথায় নাকি আজও ভূগর্ভে লোহার গুঁড়ি পাওয়া যায়।

এক সময়ে সমুদ্র যে উক্ত স্থান সকলের অত্যন্ত নিকটে বহমান ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লোকের বিশ্বাসও এইরূপ।

শ্রীআবদুল করিম।

বৈশাখী।

১

পল্লীগ্রামে বাস। কুলীনের সন্তান। বসতবাটী মন্দ ছিল না। অতি উচ্চ সারি সারি আম্রবৃক্ষ ও শ্যামল দুর্ব্বাদলে সুশোভিত উদ্যান। প্রায় পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর ভূমি। সবৎসা গাভী প্রায় ত্রিশটি। শৈশবাবধি খাঁটি গোদুগ্ধ পান করিয়া ও আদরে প্রতিপালিত হইয়া উন্নত, সুচিক্কণ, সবল দেহ। অনায়াসে দশ ক্রোশ হাঁটিয়া শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতাম। বাটীর অনতিদূরে বিশাল স্বচ্ছ পুষ্করিণী, সেখানে অবগাহন করিয়া

মধ্যে মধ্যে দেহক্লান্তি দূর করিতাম। গ্রীষ্মাবকাশে কখন কখন তটস্থিত আম্র-কাননে বসিয়া নূতন উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মিলনস্থল বাছিয়া পাঠ করিতাম। অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কোথায় এবং কাহার সহিত, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত বিশ বৎসর বয়সেও করিয়া উঠিতে পারি নাই। শুনিয়াছিলাম, বৰ্দ্ধমান জেলায় শ্বশুরালয়।

যাহা হউক, শীঘ্রই জানিতে পারিলাম। পিতার মৃত্যুর পর আমিই পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর, উদ্যান ও বসতবাটীর সম্পূর্ণ অধিকারী হইলাম। কলেজের পড়াও বন্ধ হইয়া গেল। বন্ধুগণ বলিলেন, এ হেন স্বাধীন ও সুখের জীবন সস্ত্রীক ভোগ না করা মহাপাপ। অগত্যা অনেক অনুসন্ধান ও ব্যয় করিয়া আমার বাল্যবিবাহিতা সহধর্ম্মিণী মন্দাকিনী দেবীকে বৰ্দ্ধমান জেলার শ্বশুরালয় হইতে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মন্দাকিনী এই নূতন ঘটনায় কিছু আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া অধোবদনে অবগুণ্ঠনাবৃতাবস্থায় আমার সহিত নীরবে নূতন জীবন পত্তন করিতে বসিয়া গেল।

আমার প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা প্রভৃতি অপূর্ব্ব বিষয়ের চর্চ্চা অতি অল্প ছিল, সুতরাং বৰ্দ্ধমান হইতে আসিতে আসিতে দুই একবার গলদঘর্ম্ম ও একবার সামান্য একটু আতঙ্কও হইয়াছিল। রক্তের চাঞ্চল্য ও প্রথম হইতে একটু অভ্যাস না থাকিলে প্রথম প্রেমের অভিনয় সহজেই কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। শারীরিক ও মানসিক উপাদান সকলের সমান হয় না। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, রেলের গাড়ীতেই প্রেমের সঞ্চার হইবে, কিন্তু যখন বাস্তুভিটায় পদার্পণ করিয়াও সঞ্চারের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, তখন হতাশ হইয়া পড়িলাম। মন্দাকিনী হতাশ হইয়াছিল কি না, জানি না।

মন্দাকিনী সুন্দরী। মন্দাকিনী একটু লিখিতে পড়িতে জানে। মন্দাকিনীকে সকলেই ভালবাসিল। বাড়ীর মধ্যে ছিলেন কেবল আমার সেকালের পিসী মহামায়া 'দেব্যা'। তাঁহার নাম কেহই জানিত না; কিন্তু পিতা ঠাকুরের উইলে পিসীমাতার অংশে শাম্‌লী গাভী পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সূত্রে লোকসমাজে তাঁহার নাম প্রচারিত হয়। লজ্জায় পিসীমাতা সে গাভী লইলেন না। পিসীমাতা বলিলেন, "ছি, ছি, নরোত্তমের (অর্থাৎ আমার পিতার) কি আসন্নকালে বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল?" ইহা বলিয়াই কাঁদিয়াছিলেন। সকলে অনেক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাঁহার নাম-প্রচার করিয়া ৺নরোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়, বংশে যে বিশেষ কোনও কলঙ্ক

রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে ; এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও নিতান্ত মন্দ ছিল না ; তবে আসন্নকালে চতুর্দ্দিক স্থির রাখা সুকঠিন।

পিসীমাতাও মন্দাকিনীকে ভালবাসিলেন। আমিও সকলের ন্যায় মন্দাকিনীর গুণে বদ্ধ হইলাম ; এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদিগের মধ্যে কখন কোন কলহ হয় নাই। কখনও হয় ত মন্দা সন্ধ্যার পরে আম্র-কাননে গিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আসিত (এরূপ আমার সন্দেহ হইয়াছিল) ; কিন্তু তাহার কোন কারণ ছিল না। স্নেহলালিত বালিকা-জীবন, শৈশবের সহচরী, জনকজননীর স্নেহ মমতা প্রভৃতি দূরে রাখিয়া আসিলে কাহার না একটু লুকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা হয় ?

২

কিন্তু এ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। যদি কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে যে, হয় ত মন্দাকিনী পিত্রালয়ে অবস্থানকালে লুকাইয়া হৃদয় অন্য কাহাকেও দিয়াছিল, সেটাও ভুল। সে হৃদয়ে পাপচ্ছবি কখনই প্রতিবিম্বিত হয় নাই। সে হৃদয় নিষ্কলঙ্ক। সেখানে দীর্ঘনিশ্বাসের অঙ্কুর কোথা হইতে আসিল, তাহা মানবচরিত্রের একটি কঠিন প্রহেলিকা। হয় ত বসন্তসমাগমে যেমন মলয়পবন বহে, সেইরূপ জীবনে যৌবনবসন্ত আসিলে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতির তারতম্য হয়। তবে মন্দাকিনীর স্বামিসন্নিধানে থাকিয়াও জীবনের বোধ-হয়-কোন-আশা-মিটিল-না, রকমের ভাবটা দেখিলে মধ্যে মধ্যে একটু কষ্ট হইত।

প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। মন্দাকিনীর যত্নে ও পরিশ্রমে সংসারটা এক প্রকার টিঁকিয়াছিল। কিন্তু আমি নিজে পূর্ব্বেকার সরল রেখা হইতে কিছু এ দিক ও দিক হেলিতে দুলিতে লাগিলাম।

সকলেই বলিল, "অনেক দিন হইয়া গেল, কিন্তু ঘনশ্যামের একটি পুত্র সন্তান হইল না।" কুলীন ব্রাহ্মণের বংশরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ হেন বংশ সহসা লুপ্ত হইলে হুগলী জেলায় সদ্‌ব্রাহ্মণ পাওয়া দায় হইয়া পড়িবে। এই আসন্ন বিপদ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমেই বন্ধুগণ প্রস্তাব করিলেন যে, পূর্ব্বপ্রথা-অনুসারে আমার পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। সময় কাহারও হাতধরা নয়, এবং একবার গেলে আর আসে না, অতএব আলস্যে পড়িয়া একটি বিবাহের

সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়াটা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কথাটা লইয়া ঘোর তর্ক বিতর্ক হইয়া গেল। লেখাপড়া শিখিলেই একটু ন্যায়বিচারশক্তি আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। আমি তাহারই উপর ভর দিয়া সকলকে বুঝাইলাম যে, আমার পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন নাই।

আমার রূপের ও যৌবনের তৃষ্ণা মিটিয়াছিল। সেবা যত্ন পরিচর্য্যা প্রভৃতি কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। মন্দার ন্যায় স্ত্রী দুর্লভ। অমন স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী ঘরে থাকিতে আবার বিবাহ কেন?

সকলে ঘাড় নাড়িয়া কহিল যে, কথাটা আমি ভাল করিয়া বুঝি নাই। একটা গাভী থাকিলেও গৃহস্থ দুই তিনটা গাভী সংগ্রহ করে। বিশেষতঃ যখন পুত্রার্থ ভার্য্যার প্রয়োজন, এবং পিণ্ডার্থ পুত্রের প্রয়োজন, তখন স্বতঃই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভার্য্যাই পিণ্ডের মূলধন; যতই বর্দ্ধিত করিবে, পিণ্ডের সার্থকতা তত অধিকপরিমাণে উপলব্ধ হইবে। এরূপ শাস্ত্রীয় বচন ও প্রমাণ স্বত্বেও এ কালের যুবা পুরুষ যে প্রণয় প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন, তাহা ঘোর পরিতাপের বিষয়! অহো!

তর্কে পরাস্ত হইয়া আমি মন্দাকিনীর নিকট গেলাম।

গৃহের এক কোণে বসিয়া মন্দাকিনী আমার পুরাতন কোটের জীর্ণ অংশ সংশোধন করিতেছিল। আমি ধীরে ধীরে কথাগুলি তাহাকে বুঝাইলাম।

মন্দাকিনীর শুষ্ক ম্লান মুখে হাসি ফুটিল। আমি কিছু আশ্চর্য্য হইলাম।

আমি। ইহাতে তুমি রাগ করিবে না?

মন্দা। আমার এক জন সাথী হইবে, সে ত আহ্লাদের বিষয়।

আমি। তবে ভালবাসার ভাগটা?

মন্দা। যে সম্পত্তি নাই, তাহার আবার ভাগ কিসের? তুমি সুখে থাক, এবং সুখী হও, তাহা হইলে আমার মনের দুঃখ যায়। আর সত্য কথা বলিতে কি, আমি একাকিনী আর থাকিতে পারি না।

আমি। আর ভবিষ্যতের ব্যয়?

মন্দা। সুখের জন্য অনেকে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করে। সঞ্চয় করিবার আমার কি আছে? যদি ভবিষ্যতে ব্যয় সম্বন্ধে আমি বোঝা হইয়া পড়ি, তবে যথাবিহিত উপায় করিব।

এই বলিয়া মন্দাকিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মন্দ মন্দ সান্ধ্য বায়ু বহিতেছিল। তাহার সহিত জীবনের আগামী অঙ্কের সুখস্বপ্ন, আশা, ভয়,

প্রেতচ্ছায়ার ন্যায় অন্ধকারে মিশিতেছিল। ক্রমে গৃহ অন্ধকার হইয়া আসিল। আমি নিঃশব্দে অনেক ক্ষণ পালঙ্কে বসিয়া রহিলাম। মন্দাকিনী কি করিতেছিল, জানি না। কিন্তু তখনও সে ঘর হইতে যায় নাই। পুষ্করিণীর পাড়ে আম্রবৃক্ষে পেচক ডাকিয়া উঠিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মন্দাকিনী, তুমি কোথায়?" কেহ উত্তর দিল না। সে ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছিল, বোধ হয়

৩

পুত্রার্থ যে নূতন ভার্য্যা বিবাহ করিলাম, তাহার নাম 'বৈশাখী'।

এমন নাম আপনারা পূর্ব্বে বোধ হয় শুনেন নাই। বৈশাখীর ১লা বৈশাখে জন্ম হয়। দারুণ গ্রীষ্মপ্রযুক্ত বৈশাখীর পিতা মাতা অন্য কোন সুশ্রাব্য ও সুমধুর নাম খুঁজিয়া পায় নাই।

বৈশাখীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর, কিন্তু দেখিতে বালিকার ন্যায়। গঠন মন্দ নয়। কেহ বলিত, নিখুঁত সুন্দরী; কেহ বলিত, কদাকার। যেমন পত্র-প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী হইতে পারেন না, তেমনই স্ত্রীর রূপ সম্বন্ধে পরের মতের উপর নির্ভর করিয়া স্বামী চলিতে পারে না। আমার মতে, বৈশাখী দেখিতে বেশ, কিন্তু বোধ হয়, একটু পাগলের ছিট ছিল। তজ্জন্য পিতা মাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা পর্য্যন্ত দায়ী নহেন। বোধ হয়, আমার ও তাহার, উভয়েরই কর্ম্মফল।

বন্ধুবর্গ মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াই অপসৃত হইলেন। আমি রঙ্গালয়ে একাকী বৈশাখী ও মন্দাকে লইয়া রহিলাম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমার প্রণয় সম্বন্ধে কিছুই অভিজ্ঞতা ছিল না। মন্দাকিনী এ পক্ষের সাহায্যার্থ আসরে অবতীর্ণ হইল।

এরূপ প্রায় ঘটিয়া থাকে, এবং উপন্যাসেও দেখা যায়। স্বামীর সুখের জন্য স্ত্রীর আত্মত্যাগ চিরপ্রসিদ্ধ। অবশ্য, এ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই, কিন্তু ভারতে রমণী-চরিত্র অতুলনীয়।

ক্রমে ক্রমে মন্দাকিনীর দৌলতে আমি ভালবাসার সরল ও বক্র প্রণালী-গুলি আয়ত্ত করিলাম, এবং তাহা বৈশাখীতে আরোপিত করিলাম।

ক্রমে ক্রমে হাহুতাশ, বিরহদমন, মানভঞ্জন, ক্রন্দন, অভিশাপ ও সাধারণতঃ প্রণয়লীলার অঙ্গগুলি অভ্যস্ত হইয়া গেল।

আহ্লাদে একদিন মন্দাকিনীর হাত ধরিয়া বলিলাম, "মন্দা, তুমি যদি

এত জান, তবে পূর্ব্বে শিখাও নাই কেন ?”

মন্দাকিনী ধীরে ধীরে হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, “পূর্ব্বে এত আগ্রহ কোথায় ছিল ?”

মনে মনে মন্দাকে ধন্যবাদ দিলাম। বলিলাম, “মন্দা, তুমি বেশী লেখাপড়া শিখিলে বালিকাবিদ্যালযের এক জন সর্ব্বাগ্রগণ্য শিক্ষয়িত্রী হইতে পারিতে।”

এইরূপে মন্দাকিনীর আত্মত্যাগের সহিত বৈশাখীর প্রতি আমার প্রেম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল

কিন্তু বৈশাখীর হৃদয়ের কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। সে সময় পাইলেই পুষ্করিণীর পাড়ে বসিয়া আপন মনে বকিত।

এত বড় চেষ্টা পণ্ড হইলে সকলেরই মনে অবসাদ উপস্থিত হয়। জীবন একরূপ সুখে কাটিতেছিল। জীবনস্রোত কখনও কোনও বাধা পায় নাই। ক্রমে বিরক্তি ও একটা অকারণ বৈরাগ্যের ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল।

আমি বলিতাম, “বৈশাখী। তুমি পাগল!”

বৈশাখী তাহাতে হাসিত, এবং আমি ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতাম।

মন্দাকে বলিতাম, “বৈশাখী কেমন কেমন।” মন্দাকিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। তাহাতেও ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতাম।

জীবনসমস্যার শেষ পাদপূরণ করিতে বসিয়াছিলাম। মানব-জীবনের আদি অন্ত স্থিরভাবে বিচার করিতে গেলে অনেক অধ্যয়ন আবশ্যক। আমি ক্রমে দর্শনশাস্ত্র ও পুরাণাদির আলোচনা করিতে বসিলাম।

যখন গভীর নিশীথে তিমিরাবৃত গৃহে জীবাত্মার শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতাম, তখন বৈশাখী নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইত। প্রেমের অযথা আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বৈশাখীর অনেকটা শান্তির আশা হইয়াছিল।

কিন্তু মন্দাকিনী ঘুমাইত না।

আমি বলিলাম, “মন্দা, তোমার ঘুম হয় না, তুমি বৈশাখীর নিকট শুইয়া থাকিও, ঘুমাইতে পারিবে।”

উত্তর না শুনিয়াই আমি পুরাতন পাঠগৃহে রাত্রিযাপনের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম।

ক্রমে ভাবিলাম, এই দুইটা জঞ্জাল লইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

শাস্ত্র উত্তর করিলেন, “আত্মজ্ঞান।”

ভাবিলাম, এ আত্মাকে একবার দেখিতে হইবেই ; দুঃখের বিষয়, আত্মা সম্বন্ধে পল্লীগ্রামে সচরাচর কেহই কোনও খবর দিতে পারে না। ইচ্ছা হইল, সহরে যাই

ইত্যবসরে বাকি জলকর ও পথকরের দায়ে নিষ্কর ভূমি বিক্রীত হইয়া গেল। বিবাহের ঋণে ভিটা-বিক্রয় হইবার উপক্রম হইল।

৪

পিণ্ডের এ পর্য্যন্ত কোন যোগাড় হইল না, উপরন্তু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের সহিত নিজের হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হইল। বন্ধুবর্গের অমূল্য পরামর্শ সহসা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে হয় ত এরূপ অচিন্তনীয় দুরদৃষ্ট ভোগ করিতে হইত না ; কিন্তু বন্ধুবর্গ বুঝাইয়া বলিলেন যে, সংসারে সুখ দুঃখ বিধির লিপি অনুসারে ঘটিয়া থাকে ; তাহাতে মানবের কোনও হাত নাই। এ বিবাহে ভালও হইতে পারিত, মন্দও হইতে পারিত। যেরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতে অচিরাৎ পুত্রসন্তানের মুখ দেখিয়া হয় ত আমি কাশীবাসী হইতে পারিতাম ; তবে হঠাৎ গৃহে আগুন লাগিল, হঠাৎ কোনও বিপদ উপস্থিত হইল, হঠাৎ গাভী মরিয়া গেল, কিংবা হঠাৎ স্ত্রীর মৃতবৎসা রোগ দেখা দিল, এ সব দৈব ; ইহার জন্য বন্ধুগণ দায়ী নহেন। আমি শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম ; তাহার বলে বুঝিতে পারিলাম যে, হয় ত বিশ্বে সবই অদৃষ্ট, কিংবা কিছুই অদৃষ্ট নহে। খানিকটা নিবার্য্য, এবং খানিকটা অনিবার্য্য, ইহা কখনই হইতে পারে না। তবে যাহার যত দূর শক্তি, তত দূর সে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলে। যাহা আপাততঃ ঘটিল, হয় ত সেটা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতাম। কিন্তু আবার ভাবিলাম, সে বুদ্ধি ত ছিল, তবে খরচ করি নাই কেন ? কে আসিয়া আমার বুদ্ধিভ্রংশ করিল ? শাস্ত্র উত্তর দিলেন "জীবাত্মা !" এই জীবাত্মার উপর আমার ক্রমেই একটা জাতক্রোধ জন্মিল।

পিসীমা কোথায় ? তিনি যদিও কুলীনের ঘরে বহুবিবাহ অনেক দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি কি ভাবিয়া বৈশাখীর বিবাহের কিছু দিন পরে বীরভূম জেলায় তাঁহার কোনও দূরসম্পর্কীয়া বৃদ্ধা ভগ্নীর মরণকালে সেবা করিতে গিয়াছিলেন।

পরামর্শদাতা কেহই নাই। মন্দাকিনীর নিকট গেলাম, কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া মন্দাকে আমার বিপদের কথা বলিলাম। মন্দাকিনীর মুখমণ্ডল বিষাদ-ছায়ায় মলিন হইয়া গেল।

মন্দা। আমার কিছু গহনা আছে, বিক্রয় করিয়া বিষয়টা রাখ।

আমি। যে খরিদ করিয়াছে, সে আর বিক্রয় করিবে না। সুবিধায় পাইলে কে এক শত টাকায় পঞ্চাশ বিঘা ছাড়িয়া থাকে? নিষ্কর ভূমি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। জলকর প্রভৃতি দেনা শোধ করিয়া আমার অবশিষ্টাংশ ত্রিশ টাকা প্রাপ্য।

মন্দা। তবে উপায়?

আমি। তোমার গহনাতে কেবল নূতন বি[illegible]হের [illegible] টাকা দেনা শোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আমার হস্তক্ষেপ অবৈধ

মন্দা। অবৈধ কেন? আমার যাহা আছে, সবই তোমার বৈশাখী আমার ভগ্নী। তাহার দায়, তোমার দায়, আমার দায়, সবই সমান।

আমি। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। ভবিষ্যৎ?

মন্দাকিনী ভবিষ্যৎ শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মন্দা! সবই অন্ধকারগর্ভে। এখন কেবলমাত্র উপায় চাকুরীর অন্বেষণ। শীঘ্র জুটিবে না। জুটিলেও অতি অল্প বেতনের সম্ভাবনা। যত দিন কিছু স্থির না হয়, তত দিন উপায়?

মন্দা। আমি বাপের বাড়ী যাই।

আমি। বৈশাখী?

মন্দা। তোমার সঙ্গে যাইবে।

আমি। আপাততঃ কোথায় থাকিবে? বোধ হয় তাহাকেও বাপের বাড়ী যাইতে হইবে।

মন্দা কিছু ইতস্ততঃ করিয়া চারি দিকে চাহিল। যেন মনের কোনও কথা বলিতে চাহিয়া বলিল না। অবশেষে বলিল, "আমার একটা কথা আছে।"

আমি। কি?

মন্দা। বৈশাখীর মনের স্থিরতা নাই। মাথারও স্থিরতা নাই। আমার ইচ্ছা, তুমি যত শীঘ্র পার, তোমার নিকটে লইয়া যাইও।

আমি। কেন? বৈশাখীর উপর তোমার কোনও সন্দেহ হয়?

মন্দা। কিসের সন্দেহ! তবে নারী-চরিত্র চঞ্চল। তোমার ও বৈশাখীর উভয়ের মঙ্গলের জন্য কথাটা বলিলাম। মনে রাখিও।

তৎপরদিন মন্দাকিনী আমার পদধূলি লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

বোধ হয়, অনেক কাঁদিয়াছিল। এবং বোধ হয়, যেন আজীবনের আক্ষেপ-গাথা হতাশ জীর্ণকন্থাবৎ হৃদয়টুকু লইয়া অতি কষ্টে আমার পানে চাহিয়াছিল। বৈশাখী পিত্রালয়ে পদার্পণ করিয়া একবার বলিল, "আচ্ছা, এস।"

৫

অনেক চেষ্টাতেও একটা ভাল চাকরী মিলিল না। অবস্থা ঘোরতর মন্দ দেখিয়া আর্মেণীঘাটে ষ্টীমার-ডেকে বায়ুসেবন করিতে গেলাম।

জীবনের আদি অন্ত ভাবিয়া লইব, এমত চেষ্টা করিতেছিলাম। ধীরে ধীরে হরিদাস বাবু হুঁকা হস্তে ষ্টেশন হইতে আমার নিকটে আসিয়া একটা সেকালের সম্ভাষণ করিলেন।

হরিদাস বাবু এককালে সহপাঠী ছিলেন।

হরিদাস। কি হে? গলাটা এখন কেমন?

আমি সেকালে গাহিতে পারিতাম।

আমি। উষ্ট্রের মত।

হরিদাস। সাংসারিক অবস্থা?

আমি। উষ্ট্রশালার মত।

হরিদাস। তোমার উষ্ট্রবচন রাখিয়া দিয়া একটা গাও

কি করি, মনের দুঃখে একটা গাহিলাম।

হরিদাস। তোমার মন ভাল নাই।

আমি। না।

হরিদাস। কেন?

আমি সংক্ষেপে জীবনের কথা হরিদাস বাবুকে বলিলাম। তিনি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "একটা চাকরী খালি আছে।"

আমি। কোথায়?

হরিদাস বাবু বুঝাইয়া বলিলেন, "হিজলি খালের কোনও লকের টোল বাবুর এক জন সহকারী কেরাণীর আবশ্যক। কোম্পানী তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। বেতন ত্রিশ টাকা। যে হেতু আমি এল. এ. পাশ, এবং হরিদাস বাবুর তাহাতে অনেকটা হাত ছিল; তিনি বলিলেন, একটু চেষ্টা করিলে চাকুরিটি হইতে পারিবে।

তাহাই হইল।

১লা বৈশাখ ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম। জলপথে যাত্রা পূর্ব্বে কখনই করি নাই। বিবাহের কর্ম্মসূত্রে ও পুত্রার্থ, কিংবা পিণ্ডার্থ, তাহাও করিতে

হইল। প্রভাতবাতাহত নদীতরঙ্গ যাত্রিগণকে ইঙ্গিত করিতেছিল। অসংখ্য জীবাত্মার ন্যায় অসংখ্য সূর্য্যকিরণ তরঙ্গশীর্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া নাচিতেছিল, এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া যাইতেছিল। কত যাত্রী আসিল। কেহ স্থানপরিবর্ত্তনে, কেহ বায়ুপরিবর্ত্তনে, কেহ বা এ জন্মের মত দেহপরিবর্ত্তনে সারি সারি অস্থাবর সম্পত্তি হস্তে করিয়া ডেকে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। সকলেই সাথী। কেহ গাহিতেছিল। কেহ পুরাতন তাস লইয়া জুড়ি বাঁধিয়া গ্রাবু খেলিতে বসিয়া গেল।

আমার নিকটেই একটি বৈষ্ণব বসিয়াছিল। তাহার তামাকুসেবনের উৎসাহ দেখিয়া আমি এক ছিলিম সাজিয়া দিলাম।

বৈষ্ণব। আপনি বড় সৌভাগ্যবন্ত পুরুষ।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠিক তাই।"

বৈষ্ণব তাহার বড় বড় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "আমি সে কথা বলিতেছি না। সাংসারিক হিসাবে সুখ দুঃখ, অদৃষ্ট দুরদৃষ্ট আছে, কিন্তু যাহার আত্মচৈতন্য হয়, সেই সম্পূর্ণ সৌভাগ্যবান।"

আমি। আমার আত্মচৈতন্য হইয়াছে?

বৈষ্ণব। না। শীঘ্রই হইবে।

আমি। আত্মচৈতন্য কিরূপে হয়?

বৈষ্ণব। আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

আমি। আত্মা কি দেখা যায়?

বৈষ্ণব। মনে মনে দেখা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। জ্ঞান সম্পূর্ণ হইলে যাহার উপলব্ধি হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান।

আমি। জ্ঞান সম্পূর্ণ কিসে হয়?

বৈষ্ণব। দুঃখে, কষ্টে, বৈরাগ্যে, ভক্তিপথে; তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ নাই; নির্দ্দিষ্ট সময় নাই।

আমি। আমার আপাততঃ জ্ঞানের মূল্য দেখিতেছি ত্রিশ টাকার চাকুরী।

বৈষ্ণব। ওটা অবশিষ্ট অজ্ঞানের মূল্য। আপনার জ্ঞান পূর্ব্বজন্মে অনেকটা হইয়া গিয়াছে, এ জন্মে সেই কারণে কর্ম্মচাঞ্চল্য বড় নাই। তবে যাহা কিছু আছে, তাহা শেষ অঙ্কমাত্র।

আমি। আমারও আত্মাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কবে দেখা পাইব?

বৈষ্ণব। যেদিন—যেদিন—নারী-প্রকৃতির ও মানব-প্রকৃতির অসারতা দেখিতে পাইবেন।

আমি। তখন কি হইবে?

বৈষ্ণব। সে অতি ভয়ানক কথা। যাহা হউক, সেদিন আমার সহিত দেখা হইবে।

আমি। পরম বাধিত হইলাম। অনেক মহাপুরুষ বাক্যব্যয় করিয়া চলিয়া যান। আপনার পুনরবতীর্ণ হইবার বার্ত্তা শুনিয়া আমার আশার সঞ্চার হইল।

তৎপরদিন হিজলী খালে ষ্টীমার পঁহুছিল। আমি কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলাম।

বলা বাহুল্য, টোলের বড় বাবুর বড় বড় দাড়ী, এবং তাহা হইতেও বড় বড় কথা। আমি আত্মপরিচয়-প্রদানের পূর্ব্বেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জানি জানি, একালের 'এলে' 'মেলে' পাশ কোনই কাজের নয়: এখন তুমি বহি খাতা বুঝিয়া লও।"

বহিখাতা বুঝিয়া লইলাম, কিন্তু বুঝিতে অনেক দিন গেল। যখন বুঝিলাম, তখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত। টোল-ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আসিয়া বহি খাতা পরিদর্শন করিলেন। তাঁহার মন্তব্যের সার এই যে, বহি খাতা 'ঝুঠা'। নৌকা প্রভৃতির আয়তন অনুসারে টোল অর্থাৎ মাশুল আদায় হইত। সেই আয়তনের মোটের সহিত অন্য নিকটবর্ত্তী লকের মোটের সহিত মিল হয় নাই। যখন আমার বহিখাতায় বর্ণিত আয়তনের মোট কম, তখন তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, তিন মাসের মধ্যে প্রায় ৫০০৲ টাকা আমি চুরি করিয়াছি।

আমি বলিলাম, "সাহেব, আমি দরিদ্র, নির্দ্দোষ। যাহা বড় বাবু বলিয়াছেন, আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এবং সব টাকাই আমি প্রত্যহ তাঁহার হস্তে দিয়াছি।"

সাহেব। আমি সমস্ত বিষয় তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি। বড় বাবুর তোমার উপর সম্পূর্ণ চক্ষু রাখা উচিত ছিল; কিন্তু চোর তুমি, তোমাকে আমি পুলিসে দিব।

ইহা বলিয়াই সাহেব আমার বিরুদ্ধে "চার্জ্জসীট" প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অপরাধের তালিকা একই,—জাল বহি রাখিয়া তহবিল ভাঙ্গা।

অবশেষে স্থির হইল, গেঁয়োখালি মোকামে এঞ্জিনীয়র সাহেবের তদন্ত শেষ

হইলে আমার সম্বন্ধে যাহাই হউক একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে।

গেঁয়োখালি যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই মন্দাকিনী ও বৈশাখী উভয়কেই টেলিগ্রাম করিলাম।

শ্রাবণের বারিধারা মাথায় করিয়া গেঁয়োখালি উপস্থিত হইলাম। থানার অনতিদূরে একটি বাজারে উড়িষ্যাযাত্রীদিগের চটীর এক কোণে অপরাধীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

তদন্ত চলিতে লাগিল।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে নিশাকালে আমার কুটীরের সম্মুখে একটি আগন্তুক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ইছাপুরের কেহ থাকেন?"

আমি বলিলাম, "থাকি।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি আপনার স্ত্রী মন্দাকিনী দেবীকে সঙ্গে লইয়া অদ্য প্রাতঃকালে এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। তিনি মৃত্যুশয্যায়।"

আমি বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের মুখের দিয়া চাহিয়া রহিলাম। জীবন-গ্রন্থি একে একে শিথিল হইতেছিল।

আগন্তুক ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, মন্দাকিনী টেলিগ্রাম পাইয়া অনেক অনুসন্ধান ও ব্যয় করিয়া এখানে আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাহার সম্পর্কে মাতুল। মন্দাকিনী আজ তিন দিন উপবাসিনী। যেখানে তাঁহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেখানে জনকতক উড়িষ্যাযাত্রী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়। তাহারা সকলেই মরিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীও রোগাক্রান্তা হইয়াছে। কোন ডাক্তার পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

আমি তাড়াতাড়ি সাহেবের অনুমতি লইয়া মন্দাকিনীর বাসস্থানের দিকে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে একটি অট্টালিকার সম্মুখে দেখি, বৈশাখীর ভ্রাতা দণ্ডায়মান!

তাহার নিকট শুনিতে পাইলাম, বৈশাখীর ভ্রাতা তিন দিবস পূর্ব্বে সেখানে আসিয়াছে, এবং বৈশাখীর পিতার কোনও পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু জমীদার শ্যামচাঁদ বাবুর সাহায্যে আমার মোকদ্দমার তদ্‌বির হইতেছে।

আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৈশাখী ভাল আছে ত?"

ভ্রাতা। আছে।

আমি। সে কোনও সংবাদ আমাকে দেয় নাই কেন? আমি তাহাকে

ত অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছি।

ভ্রাতা। বৈশাখী স্বয়ং এখানে।

আমি। তবে আমার সঙ্গে একবার দেখা করিবার অবসর জুটিয়া উঠে নাই ?

ভ্রাতা। সে সংবাদ শ্যামচাঁদ বাবু জানেন।

কিছুক্ষণ পরেই শ্যামচাঁদ বাবুকে দেখিলাম। হৃষ্টপুষ্ট যুবাপুরুষ, এবং বর্ষাকাল সত্ত্বেও মনোহর বেশ। তিনি জুতায় কাদা লাগিবার ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া আমাকে একটা ছোট নমস্কার করিলেন।

আমার মোটেই ভাল লাগিল না। আমি তাঁহাকে আমার গন্তব্য স্থানের পরিচয় দিয়া শীঘ্র মন্দাকিনীকে দেখিতে গেলাম।

দেখিলাম, কর্দ্দমের উপর ক্ষীণালোকে আমার ফটোগ্রাফখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া মুমূর্ষু মন্দাকিনী। আমি ক্ষীণ কাতর কম্পিত স্বরে ডাকিলাম, "মন্দা !"

মন্দাকিনীর উত্তর পাইলাম না। যখন বৈদ্য আসিল, তখন আমি প্রস্তরের ন্যায় মন্দাকিনীর অতুলনীয় কর্দ্দমলুণ্ঠিত দেহের দিকে চাহিয়াছিলাম মাত্র।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কম্পিতকরে মন্দার অঞ্চল হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন, "এই যথাসর্ব্বস্ব সম্বল লইয়া মন্দাকিনী এখানে আসিয়াছে।" আমি বৈদ্যকে সেই নোট দিলাম।

"আপনি যদি ইহাকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারেন, তবে ইহা আপনারই ; এবং ভবিষ্যতের জীবনও আপনার নিকট বাঁধা থাকিবে।"

বৈদ্য নাড়ী দেখিয়া কাতরভাবে বলিল, "আপনি আসিবার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকটির আত্মা ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছে।"

আমি নোটখানি প্রদীপের শিখায় পুড়াইলাম। প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিলাম। মন্দাকে কোলে লইতে গেলাম, পাইলাম না।

তখন গভীর নিশীথিনী। সেই মলপরিপূর্ণ কর্দ্দমের উপর দেহ লুটাইয়া আমি আবার ডাকিলাম, "মন্দা !—কোথায় তোমার আত্মা ?—"

বোধ হয়, তখন আমি উন্মত্ত—মন্দাকে পাইলাম না। সে গিয়াছে, না, আমি অন্ধ ? তাহার শবদেহ কোথায় ?

৭

তিন দিবস পরে জ্ঞান হইয়াছিল। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার শিয়রে বসিয়া।

আমার স্মৃতি জাগরূক হইল। বৃদ্ধের নিকট শুনিতে পাইলাম, আমিও বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, এবং সকলে আমাকে শব মনে করিয়া খালের অপর পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়াছিল।

আমি। মন্দার সৎকার করিল কে?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিলেন। তিনি ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া কুটীরে কাহাকেও দেখিতে পান নাই। বোধ হয়, মুর্দ্দাফরাস মন্দাকে ও আমাকে—উভয়কেই শব মনে করিয়া অন্য শবের সহিত ফেলিয়া দিয়াছিল। মন্দাকিনীর দেহ জোয়ারে ভাসিয়া গিয়াছে।

বৈশাখী ও শ্যামচাঁদ বাবু কোথায়? বৃদ্ধের নিকট শুনিলাম, তাহারা আমাকে মৃত মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই শ্যামচাঁদ বাবুর তদ্বিরে তহবিল তছরূপ মোকদ্দমা হইতে আমি অব্যাহতি পাইয়াছিলাম।

শুনিয়া আহ্লাদ হইবার কথা।

আমি বলিলাম, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার লাসটা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, সে জন্য আপনি ধন্যবাদের পাত্র, এবং শ্যামচাঁদ বাবু সৎকারের আয়োজনটা না করিযাই আমার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া প্রস্থান করিয়া প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ। আপনার যে প্রকার শরীরের অবস্থা, দেশে গেলে হয় না?

আমি স্থির ও কঠিন ভাষে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, আপাততঃ আমি কোনও বন্ধুর আলয়ে যাইব। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হরিনামস্মরণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

সকলেই চলিয়া গেল। আমার সকলের সহিত পার্থিব সম্বন্ধ ঘুচিল। আমি নীল আকাশের তলে নদীতটে বিমল বায়ু সেবন করিতে করিতে বিকট হাস্য করিলাম।

•

জলের মধ্যে আকাশের ছায়া, তাহারই সহিত আমার প্রতিবিম্ব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুই কি আত্মা?"

ধীরে ধীরে ছুরিকা বাহির করিলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িল, "এখনও আত্মজ্ঞান হয় নাই।" বোধ হয়, আরও কোন অদৃষ্ট অবশিষ্টাংশ বাকী আছে। ঠিক তাহাই।

মনে মনে বুদ্ধির বলিহারী দিয়া সমুদ্রগামী একখানি ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম।

জাহাজের কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

আমি। কুলি।

সাহেব। কয়লার কাজ করিবে?

আমি বলিলাম, "অবশ্য।"

সেই জাহাজে রহিয়া গেলাম। জাহাজ, চাঁদবালি ও সাগরসঙ্গমে যায়, এবং তথা হইতে আসে। সানন্দে কয়লার বোঝা ডেক হইতে অগ্নিকুণ্ড পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিতাম।

জীবনে কি ছিল? সেই ত রথের উপর ভগবান, এবং নিম্নে জীর্ণ চক্র। কর্ম্মের দড়িতে ভগবানকে বাঁধিয়া যে টানিতেছে, আমাদিগকেও সেই চক্র-রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ভক্তি ও জ্ঞানের জোর কোথায়? কেবল পুরাতন তৈলবিহীন চক্রের শুষ্ক কর্কশ আর্ত্তনাদ ও আক্ষেপ। উর্দ্ধে বৃদ্ধ জরদগব ভগবান পরমাত্মা, এবং নিম্নে কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ জীবাত্মা। চক্র ঠেলিয়া উর্দ্ধে তুলে,—কাহার বাবার সাধ্য?

মরিতে গিয়াও নিস্তার নাই। তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মরিবার এখন সাধ নাই, তাহাও বলা গেল। কি যেন বাকি আছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল কেবল এঞ্জিন হইতে ডেক এবং ডেক হইতে এঞ্জিনের অগ্নিকুণ্ড।

একদিন জাহাজের সেরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার চেহারা ভদ্রলোকের ন্যায়, তুমি কখনই কুলীর কর্ম্ম কর নাই; এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল কেন?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি আত্মাকে দেখিব।"

সেরাঙ্গ। আত্মা কি জাহাজে দেখা যায়?

আমি। কোথায় আত্মার দর্শন হয়, তাহা কি বলা যায়? আমাদের শাস্ত্রে স্তম্ভে, স্ফটিকে, এমন কি, নারিকেলের মধ্যে আত্মা দেখা যায়।

সেরাঙ্গ। যেদিন দেখিবে, আমাকে বলিও।

আমি। আচ্ছা।

ক্রমে শীত আসিল। আমি জীর্ণ কম্বলখানি মুড়ি দিয়া আত্মার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলাম। ক্রমে সাগরসঙ্গমদর্শনাভিলাষী যাত্রীর দল বাড়িতে লাগিল। প্রসিদ্ধ সাগরের মেলায় অনেক যাত্রী আমাদিগের জাহাজে আরোহণ করিত। আমি তাহাদিগকে দেখিতাম।

আমার স্বার্থ কি?

আকাশে খেচর, জলে হাঙ্গর কুম্ভীর তাকাইয়া থাকে, তাহাদিগেরই বা স্বার্থ কি?

জঠরযন্ত্রণার নিবৃত্তি হইলেও জীবের অন্য অশেষ যন্ত্রণা আছে। পশু হইতে মানবেই সে যন্ত্রণার সমধিক বিকাশ।

জীবনের নীরবতা ও শান্তির মধ্যেও যন্ত্রণা ও পিপাসা আছে।

উদ্দেশ্যহীন জীবনের মধ্যেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা আছে।

আমার কোনটা ছিল, তাহা জানি না। যে জলে আমার মন্দাকিনী ভাসিয়াছিল, সেই জলের উপর থাকিতেই কি এত সাধ হইয়াছিল? ইহাই কি মায়া?

৮

বৈশাখী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। জাহাজের পশ্চিম দিকে আঁধার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আকাশে নক্ষত্র ক্ষীণালোকে জ্বলিতেছিল। কত যাত্রী ডেকে শয়ন করিয়াছিল আমি প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনের দিকে জোয়ারের গতি দেখিতে গেলাম।

এই চতুর্দ্দশীর জোয়ারে মন্দাকিনীর দেহ ভাসিয়া গিয়াছিল।

সহসা গ্যাসের আলোকে কামরার মধ্যে দুইটি চিত্র দেখিলাম। চঞ্চল-যৌবনা বৈশাখী শুইয়া, এবং তাহার পদপ্রান্তে শ্যামচাঁদ বাবু মানভঞ্জনরত।

বোধ হয়, ইহাই দেখা বাকি ছিল। প্রেমের বাজারে অনেক প্রাণী সাধ করিয়া আসে যায়। ঐ যে দুইটি প্রাণী, উহাদেরও ত সাধ আছে?

ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, রাক্ষসী নিশি। সাগরসঙ্গমে জাহাজ ছুটিতেছে, জীবের জীবনও ছুটিতেছে। ইহাদিগের গতিরোধ করে, কাহার সাধ্য? তবে পাপস্রোত রুদ্ধ কে করিবে? ভগবান কোথায়?

ছুরিকা বাহির করিয়া রক্তপূর্ণনয়নে ক্যাবিনের দিকে ছুটিলাম। সে দিক নিঃশব্দ, জনহীন।

হঠাৎ প্রতিধ্বনি হইল, "আহা মারিও না; উহাদেরও ত জীবনে সাধ আছে!"

সে ধ্বনি করুণাপূর্ণ, বড়ই মধুর!

শক্তির গতি রুদ্ধ হইল। নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রকিরণের ন্যায় একটি রেখা অন্ধকারে দেখিতে পাইলাম। সেই রেখাতে নয়ন আরোপিত করিয়া দেখিলাম, যেন অদূরে মন্দাকিনীর শীর্ণ প্রতিমা দাঁড়াইয়া আমাকে বারণ করিতেছে, "মারিও না।" এই কি মন্দার প্রেতদেহ?

স্তম্ভিত হইয়া বসিলাম। পূর্ব্ব দিক হইতে ঝঞ্ঝা-বায়ু বহিতেছে। অন্ধকারে প্রেতমূর্ত্তি বিলীন হইল।

আমি ডাকিলাম, "মন্দা! যাইও না!" কিন্তু ছায়াদেহ চলিয়া গেল।

আমার ত জীবনে সাধ নাই, উহাদের যেন আছে। তবে আমি জোয়ারে ভাসিয়া যাই না কেন?

ছুরিকা উত্তোলন করিলাম।

সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া ডাকিলাম, "আত্মা! তোমাকে রক্ষা কর!"

বোধ হইল, অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা সম্মুখে!

বজ্র মুষ্টিতে আত্মাকে ধরিলাম। "আজ তোমাকে রাখে কে?" ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় আত্মা হাসিয়া কহিল, "আমি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অরূপ।"

আমি। তবে তুমি একাকী দেহ হইতে বাহির হইয়া চলিলে কোথায়?

আত্মা। ভেদ তোমার "মনে"।

আমি। আত্মহত্যা করে কে?

আত্মা। মন।

আমি। আমার মন, না, তোমার মন?

আত্মা। বুঝিয়া লও।

আমি। কিন্তু তোমাকে ছাড়িব না। তোমার আদি অন্ত দেখিব।

আত্মা। তুমি আমার অর্দ্ধেক জয় করিয়াছ, অতএব আমি অর্দ্ধ-অঙ্গ-হীন!

আমি। বাকি অর্দ্ধেক কোথায়?

আত্মা। মায়াবিক্ষেপ। তুমি এখনও মন্দাকিনীর মায়া ও স্নেহে আবদ্ধ!

আমি। ভাল, দেখি সে মায়া বিদূরিত হয় কি না।

ছুরিকা লইয়া হৃদয়ে আরোপিত করিলাম। কিন্তু বাহুতে শক্তি পাইলাম না। স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা কোমল মৃণালবৎ দুইখানি বাহুর স্পর্শ অনুভব করিলাম। চতুর্দ্দিক বিমল পরিমলে ভরিয়া গেল। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া বীণার সুমধুর ঝঙ্কার কর্ণকুহর পরিপ্লুত করিল।

কতক্ষণ সে সুখ ভোগ করিয়াছিলাম, মনে নাই। জ্ঞান হইলে দেখিতে পাইলাম, সাগরসঙ্গমে কুটীরের মধ্যে শয়ন করিয়া আছি। শিয়রে আমার মন্দাকিনী বসিয়া সেবা করিতেছে।

বোধ হইল, স্বপ্ন। আবার দেখিলাম। না, সবই সত্য। কুটীরের দ্বারে পূর্ব্বপরিচিত বৈষ্ণব দাঁড়াইয়া।

তিনি মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "বৎস, আজ তুমি বৈষ্ণবীশক্তি দ্বারা কাল জয় করিয়াছ, তুমি যথার্থই সৌভাগ্যবান। তোমার জীবন এখনও শেষ

হয় নাই। প্রেম ও করুণার বলে তুমি চারিটি জীবের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করিয়াছ। কিছুদিন ভোগ কর। বাসুদেব তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। আমি আজ চলিলাম। ঐ যে মঠ দেখিতেছ, উহা আমার স্থাপিত। ধনের অভাব নাই। ঐ মঠে হরিহরসেবায় কালযাপন কর। যে হরিহরের মধুর ও রুদ্র শক্তি প্রেম ও করুণায় গাঁথিয়া গলায় পরিধান করিয়াছে, সে আমার প্রিয়।”

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চলিয়া গেল।

মঠে গিয়া মন্দাকে হৃদয়ে লইলাম। উভয়ে হরিহরের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিলাম। সংসার কি সত্য সত্যই শ্মশান? বোধ হইল, না।

আর বৈশাখী? সে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া গেল।

দুই বৎসর পরে সেই মঠে পুরাতন বন্ধু হরিদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরিদাস। কি হে! তুমি ঘনশ্যাম না?

আমি। অবশ্য।

হরিদাস। গান টান ভুলিয়া গিয়াছ?

আমি। মোটেই না। উপরন্তু একটা প্রেমের হিল্লোলে ভাসিতেছি।

হরিদাস। তবে গলাটা এখন উষ্ট্রের মত নয়?

আমি। না; এখন অনেকটা গরুড় পক্ষীর মত।

আনন্দে গাহিলাম। দিগ দিগন্ত হইতে মধুরধ্বনি আসিয়া সেই গানের সহিত যোগদান করিল।

কিন্তু পিণ্ডের যোগাড় করিতে পারিলাম না, সেই জন্য মনে ক্ষোভ রহিয়া গেল। পিণ্ডগুলি খাইয়া বসিয়াছিলাম।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি।

১লা জানুয়ারি, ১৮৯৪; ১৮ই পৌষ, ১৩০০। আজ ইংরাজী বৎসরের প্রথম দিন। সখা-সম্পাদক নবকৃষ্ণ বাবু ডায়েরিখানি উপহার দিয়াছেন। কিন্তু নববর্ষের প্রারম্ভে প্রথম দিনে এই ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠায় কি লিখিয়া রাখিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। এই দীন

দরিদ্র ক্রিয়াকর্ম্মবিহীন জীবনের কোন চিহ্ন বা relic কোথাও রাখিয়া যাইতে আর বাসনা নাই। এখন নীরবে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় এই সংসার-প্রপঞ্চের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাই। বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, আশা, সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে। আছে কেবল স্মৃতি। তাই সেই স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার নিমিত্ত বিগত বৎসরের যাহা চিরস্মরণীয় ঘটনা, তাহাই এই নূতন বৎসরের প্রারম্ভে একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। সনেট্‌টি গত বৎসরের রচনা বটে, কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন ইহা আমার কাছে শতবার পাঠান্তেও নিত্য নূতন ও জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হয়। এই স্মৃতিময় সঙ্গীত জীবনসঙ্গীতের ন্যায় বহন করিয়া যেন অন্তিমে সেই পরমপুরুষের চরণতলে গিয়া সমর্পণ করিতে পারি।

"হেরিনু অপূর্ব্ব দৃশ্য" ইত্যাদি।

১৯শে ও ২০শে পৌষ। পৌষ মাসের "সাহিত্য" মুদ্রিত হইতেছে। রবীন্দ্র বাবুর "মানসী" নামক কবিতাপুস্তকের সমালোচন দেখিলাম। এমন * * * সমালোচনা কখনও পাঠ করিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। ইহা প্রকৃত সমালোচকের স্বাধীন মতের অভিব্যক্তি নহে, অন্ধ ভক্তের স্তুতিমাত্র। লেখক মহাশয় সমালোচনায় হাত না দিয়া মানসী-মঙ্গল কাব্য লিখিলে তাঁহার উদ্দেশ্য বোধ হয় অধিকতর সুসিদ্ধ হইত। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, বাঙ্গালা দেশে এখনও প্রকৃত স্বাধীন সমালোচনার সাক্ষাৎ পাইলাম না। * * * আমার বোধ হয়, তাঁহার আদর্শ দেবতা মনে মনে হাসি সংবরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্র বাবু যে নিজের দৌড় বুঝেন না, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার প্রতিভা আছে প্রতিভার গতি সর্ব্বত্র; পরকেও যেমন বুঝে, আপনাকেও তেমনি।

যে দীপ লইয়া জগতের—বিশ্বের অতুল রহস্যপ্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, তাহা কি নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়? আমার বিশ্বাস এই, যে কবি পরের ন্যায় নিজের আত্মাটিকেও বিশ্লেষণ করিতে পারেন না, তাঁহার প্রতিভা অসম্পূর্ণ। Self-consciousness of Genius বলিয়া যে কথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

ভক্ত ও গোঁড়া মহাশয়দিগের অযথা ও অসংযত স্তুতিবাদে কাব্য-রাজ্য উচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে। কে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে?

২১শে পৌষ। কোন্নগর হইতে ২॥০ টার ট্রেণে কলিকাতায় যাইয়া * * ভায়ার ব্যাঙ্কের কাজ সারিয়া দিলাম। সন্ধ্যার সময় সু—র সহিত সাক্ষাৎ। পৌষ মাসের সাহিত্য দেখিলাম। সম্পাদক মহাশয় নব্যভারতে প্রকাশিত আমার "যুগল কবিতা" সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন কবিতাটির বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া "পুরাতন"টিকে "নূতনের"ই ক্ষীণতর প্রতি-ধ্বনি বলিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় Miltonএর Allegro এবং *Penseroso* এবং Tennysonএর Nothing will die এবং All things will die কবিতা পাঠ করেন নাই। এই প্রকার কবিতায় কোন একটি হৃদয়-ভাবের দুই পরস্পরবিপরীত ভাগ বর্ণিত হইয়া থাকে। সম্পাদক অপক্ষপাতে উভয় কবিতা পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিতেন, "নূতন"কে পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত "পুরাতনে"র প্রয়োজন আছে। একটিকে ছাড়িয়া দিলে আর একটির সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয়।

২২শে পৌষ। স্কুলে নূতন শ্রেণী গঠিত হইয়াছে। কয়েক দিবস এক প্রকার বিশ্রাম ভোগ করিয়া আবার পুরাতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।

পঞ্চীবাম্যের (১) অত্যন্ত সর্দ্দি দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার জন্য মনটা মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। প্রথম ২৷৩ মাস মনে করিয়াছিলাম, আর পুরাতন মায়ায় বদ্ধ হইব না; কিন্তু এখন ত আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। কেমন অজ্ঞাতসারে সে আমার হৃদয়টিকে ক্রমশঃ অধিকার করিয়া বসিতেছে। স্নেহ, ভালবাসা, মায় মানুষের প্রধান অবলম্বন,—স্বীকার করি। হৃদয়ের এই স্বর্গীয় বৃত্তিগুলি না থাকিলে জীবনের চরমউদ্দেশ্য "কর্ম্ম" কোন মতে সাধিত হয় না, তাহাও জানি, কিন্তু যখন ডোর ছিন্ন হইয়া যায়, তখনকার সেই যাতনা ত সহজে সহ্য হয় না! তবে সহিষ্ণুতাই মহত্ত্ব। হায় ভগবান! আমাকে সহিষ্ণু করিও। কুসুমের মত দুর্ব্বল করিও না।—কিন্তু তাহার অসহিষ্ণুতাতে কি মহত্ত্ব নাই? কে বলিবে?

২৩শে পৌষ। শনিবারে ২॥০টার গাড়ীতে কলিকাতায় গিয়া শুনিলাম, সু—র বাড়ীতে নবীন বাবুর (কবিবর নবীনচন্দ্র সেন) আসিবার কথা আছে। কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিতে থাকিতেই ছয়টার সময় নবীন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই প্রথম জিজ্ঞাসা—"তবে আমোদের programme-টা কি রকম হবে বল দেখি? সার্কাস, থিয়েটার কোথায় কি আছে

---

(১) স্বর্গীয় কবির শিশুপুত্র।—সাহিত্য-সম্পাদক।

বল ?” কিন্তু ভগবান কবিবরের মাথাটা ধরাইয়া দিলেন। পরদিন রবিবারের উপর সমস্ত বরাত দিয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করা গেল। তখন নানা কথোপকথন আরম্ভ হইল। তিনি পুরীতে অবস্থানকালে সেখানকার স্নানযাত্রার মেলায় যে সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—তিনি ডিপুটী—যে সকল অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিলেন। প্রকৃতিটি বেশ সরল ও ভাবপ্রবণ। কিন্তু অত বড় এক জন কবির পক্ষে তাঁহার মাত্রাতিশায়ী সারল্য ও * * বচনপ্রবাহ আমার কাছে কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইল।

২৪শে পৌষ। * * * হী—বাবুর সহিত অনেক দিন দেখা হয় নাই। সন্ধ্যার সময় সাক্ষাতের উদ্দেশে বাহির হইলাম। আবার সেই শ্যামবাজার অভিমুখে যাইতেছি। মনটা হঠাৎ কেমন চমকিয়া উঠিল। জীবনে কি বিষম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা যেন মনেই ছিল না, সহসা যেন মনে পড়িয়া গেল। হী—বাড়ীতে নাই। প্রবেশকালে সু— ও উ—বাবুকে দেখিলাম। তাঁহারা দুই জনে থিয়েটারে প্রবেশ করিলেন। আমি অনুরুদ্ধ হইয়াও প্রথমতঃ গেলাম না বটে, কিন্তু তখনি আবার চু—বাবুর সহিত দেখা হওয়াতে তিনি আর ছাড়িলেন না। নলিনাবিকাশ ও বাবু অভিনয়ের বিষয়। প্রথমটি ভাল লাগিল না, গানগুলি ও নাচ মন্দ নহে। দ্বিতীয়টিতে ২।১ স্থলে নির্দ্দোষ হাস্যরসের অবসর থাকিলেও, উহা নিতান্ত কুরুচিপূর্ণ ও অতিরঞ্জিত বোধ হইল। বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দের হৃদয়টা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়াই এই সকল ছাই ভস্মের প্রশার হয়। থিয়েটারের বাহ্যিক পারিপাট্য ও playerদিগের অভিনয়চাতুর্য্যের অনেকটা উন্নতি দেখি বটে, কিন্তু প্রকৃত নাটক এখনও দেখিলাম না।

২৫শে পৌষ। কোন্নগরে আসিয়া আবার সেই পুরাতন কাজ। কাজ কর্ম্মে আর মন যায় না! এখন মনে হয়, বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবি, অথবা প্রিয়তম বন্ধুদিগের সহিত দিবানিশি বাক্যালাপ ও সাহিত্যচর্চ্চা করি। কিন্তু ভাবনার ত অন্ত নাই, আর দিবানিশি বন্ধুদের সান্নিধ্যই বা কিরূপে ঘটে? সকল চিন্তার চেয়ে অর্থচিন্তা যে গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। নিজের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন অতি সামান্য বটে, কিন্তু যাহারা আমার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের বিষয় কেমন করিয়া উপেক্ষা করি? হে মা জগৎজননি! ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে চলিল, এখনও এই পোড়া মনটাকে বশ করিতে পারিলাম না কেন? যাহা চাই, তাহা যদি নিতান্তই পাইবার নহে, তবে যাহা পাই, তাহাকেই চাহিতে শিখি না কেন? এই নিদারুণ সংসারভার,

এই বিষম-ব্যথা আমি আর বহন করিতে পারি না মা। আজ যদি তোমার কোলে গিয়া নিরাপদে শান্তিশয়নে শুইতে পারি, তবে আর কাল চাহি না। এই দীর্ণ জীর্ণ জর্জ্জরিত জীবনে তোমার কোন্ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে? এখনি কেন ডাকিয়া লও না মা! এই অধমের উপর যাহাদের ভার দিতেছ, তাহাদের কাহাকেও ত রাখিতে পারিতেছি না। আমার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক ইহাদের জন্য তুমি কি খুঁজিয়া পাইতেছ না?

২৬শে পৌষ। Byronএর Dream শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিলাম। কবি স্বপ্নে দুইটি প্রেমিক প্রেমিকার পরিণামকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কবিতা-টিতে নিরাশ প্রেমের কেমন একটা অস্ফুট বিষাদময় ছায়া যেন জড়িত রহিয়াছে। তাঁহার ভাষায় কোনপ্রকার ছায়ান্ধকার দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এই সুস্পষ্ট ভাষার অভ্যন্তরে কুয়াসাবৃত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার নিজজীবনের একটা নিরাশারূপ বিস্ফুলিঙ্গ যেন মৃদু মৃদু ঝলসিয়া উঠিতেছে। প্রেমিকের পরিণাম এ স্থলে উন্মত্ততা—জগতের চক্ষে যাহা উন্মত্ততা—তাহার কি চমৎকার ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন। তিনি বলেন—What is it but the telescope of truth? কিন্তু সে সত্য কি? তাহা এই—

—With the stars
And the quick Spirit of the Universe
He held his dialogues, and they did teach
To him the magic of their mysteries.

&c. &c. &c.

২৭শে পৌষ। এখানে একা ভাল লাগে না বলিয়া গতকল্য কলি-কাতায় যাইয়া সন্ধ্যার সময় সু—র গৃহে দুই একটি বন্ধুর সহিত ২১ ঘণ্টা এক রকম বেশ কাটাইয়াছিলাম; তবে সু— নিজে উপস্থিত ছিলেন না, এই যা দুঃখ। পণ্ডিত * * * কবিরত্ন মহাশয় সাহিত্যের নিমিত্ত * * * নামধেয় একটি প্রবন্ধ দিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইল। তিনি কবিতা তত ভাল বুঝেন বলিয়া বোধ হইল না। পুরস্কারলাভার্থ লিখিত রচয়িত্রীর কোন প্রবন্ধে শকুন্তলার কোটেশন দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই মোহই পণ্ডিতমহাশয়ের বর্ত্তমান গ্রন্থ-সম্পাদনের কারণ। তিনি যে কয়টি কবিতার অসংযত প্রশংসা করিলেন, তাহাদের পক্ষপাতী হইতে না পারিলেও, আমি

স্বীকার করি যে, উক্ত কবিতাপুস্তকে ২।৩টি ভাল কবিতা আছে। "একা" ও "ভুল না আমায়," এই দুইটি আমার বেশ লাগিয়াছে। সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় কি বলেন, দেখা যাক্। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Laodomia শীর্ষক কবিতা নূতন করিয়া পাঠ করিলাম। অমর কবি ইহাতে অমর প্রেমের কি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন! ইন্দ্রিয়বিলাস প্রেমের সর্ব্বস্ব নহে—উহার অঙ্গীভূত কোন বৃত্তিও নহে। প্রকৃত প্রেম শান্ত, উদার, গভীর, স্বার্থশূন্য। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উহার একটা আনুষঙ্গিক মোহমাত্র।

"প্রাণের মিলন চাহে দেহের মিলন"—কথাটা মানব-হৃদয়ের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক বটে; কিন্তু উহাতে মানুষের চিরন্তন আদর্শ দেবত্বের লেশমাত্র নাই। আমরা মানুষ অশরীরী অস্তিত্ব কল্পনায় কোনওরূপে চিত্রিত করিতে পারি, প্রাণের ভিতর ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারি না। দেহের উপরেই আমাদের যত মমতা;—কোনও বিষয়ে উহাকে সহজে বাদ দিয়া কাজ করিতে পারি না। তাই কবি প্রাণের মিলনে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে দেহের মিলনও চাহিয়াছেন। প্রাণের মিলন—আত্মার মিলন যদি প্রকৃষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিতাম, তবে আমরাও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত বলিতে শিখিতাম—

"Know, virtue were not virtue if the joys
Of sense were able to return as fast
And surely as they vanish."

২৯শে পৌষ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি সনেট বোধ হয় এতদিন আমার চক্ষে পড়ে নাই। আজ সেটি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। কবি বলিতেছেন,—সংসারে এমন এক দল বিহগধর্ম্মী কবি আছেন, যাঁহারা আপনাদের কবিতার বাসা শূন্যমার্গে সুবিধা ও সম্পদরূপ বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু উহা স্থায়ী হয় না,—দুই দিনে পড়িয়া গিয়া, মাটীতে মাটী হইয়া, বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হয়। কিন্তু—

—To the solid ground
Of nature trusts the Mind that builds for aye;
Convinced that there, there only, she can lay
Secure foundations.

এই বিহগধর্ম্মী কবিদিগের অত্যাচারে বাঙ্গলা সাহিত্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি স্থানান্তরে ইহাঁদিগকে "কমলবিলাসী" নামে অভিহিত করিয়াছি। কবি William Morris এই দলভুক্ত হইতে অভিলাষী হইয়া

ইহাদের নাম দিয়াছেন—Idle singers of an empty day. ইঁহারা নিজ হৃদয়নিবদ্ধ অস্বাস্থ্যকর বিষময় ভাবের ঘোরে পড়িয়া গিয়া, নিরুদ্দেশ নদী বাহিয়া কোন্ নিরুদ্দেশ দেশে যে "নিরুদ্দেশ যাত্রা" করেন, তাহা আমরা সংসারী লোক কিছুই ঠাহর করিতে পারি না। কবে বাঙ্গলা কবিতায় নিরুদ্দেশের স্থলে একটা উদ্দেশ্যের সন্ধান পাইব?

১লা মাঘ। ট্রেণে কলিকাতায় গিয়া দেখিলাম, পঞ্চুরামের বড়ই অসুখ। * * তাহার জন্য কি যে করিব, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। আমার পাপেই কি সে এত কষ্ট পাইতেছে? ভগবান! এ পাপের শাস্তি যাহা দিবে, আমাকেই দাও না কেন? আমি অকাতরে তাহা বহন করিব। কিন্তু এই হতভাগ্যের জীবনে যে একটি অতি ক্ষুদ্র অবলম্বন দিয়াছ, তাহার উপর এত নিষ্ঠুরতা কেন? * * *

হে ভগবান! তোমার নিকট এই প্রার্থনা, তাহাকে সুস্থ রাখিও। সে আমার অতীত ও বর্ত্তমানের একমাত্র বন্ধন।

২রা মাঘ। সকালে সু—র বাটীতে রবি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। "সোনার তরীর" কথা উত্থাপিত হওয়াতে তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি তাঁহার প্রথম ও শেষ কবিতার সামঞ্জস্য করিতে পারি নাই। তিনি বলেন,—"উহাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকিতে পারে, আমি তাহা আগে বুঝিতে পারি নাই। একটু সম্বন্ধ অবশ্যই আছে।" আমার বোধ হয়, দুইটি কবিতার ভাব ও গঠনের সামঞ্জস্য করিয়া উহাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিশদ করিয়া দিলে, কবি তাহার কাব্যের কতকটা উন্নতি করিতে পারিতেন। গোড়ার কবিতার অর্থ যে কি, তাহা ত আজিও বুঝিলাম না। কবিতার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠককে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ফেলিয়া দিয়া, কেবল দুই চারিটা ললিত ও সরল কথার সঙ্গীত শুনাইয়া কি ফল?—রবি বাবুর ভাষার উপর আধিপত্য দিন দিন বাড়িতেছে * * * "প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্ত্তব্য," "প্রলয় ত বিধাতার চরম আনন্দ," "রাজার সতর্ক দৃষ্টি পড়ুক সর্ব্বত্র" ইত্যাদি লাইনে ছন্দের ঝঙ্কার আদৌ নাই ইহা তিনিও স্বীকার করিলেন; আর বলিলেন, "অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে আমি একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা ঠিক নহে;—আমার ভ্রম।" বাস্তবিক কবিতার ভাষা সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই পথ ভুলিয়া যান। "পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারা-ভরা," "নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর"—প্রভৃতি দুই চারিটা স্বর্গীয় ঝঙ্কার

কেবল যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়ে।

য—ভায়ার নিমন্ত্রণে রবিবারে মধ্যাহ্ন-ভোজন তাঁহার সহিতই সম্পন্ন হইল। বিলাত-প্রত্যাগত নূতন সিবিলিয়ান —বাবু এই নিমন্ত্রণের উপলক্ষ। —র প্রকৃতিটি সেইরূপ সরল ও স্নেহময়; যুগান্তরের পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি যে আমাদের সেই —ই রহিয়াছেন, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। আশা করি, তিনি রাজকর্ম্মে সুখ্যাতি লাভ করুন, আর স্বদেশের অশেষ হিত-সাধন করিতে সক্ষম হউন।

৩রা মাঘ। সোমবার সকালে ৮টার গাড়ীতে কর্ম্মস্থলে আসিলাম। এখানে আসিয়া কেবল স্বার্থচিন্তা, আর বিরলে বসিয়া কবিতা-পাঠ, অথবা রচনা। এখানে এমন বন্ধু কেহ নাই, যাঁহার সহিত দুই চারি দণ্ড কথা কহিয়া শান্তিলাভ করিতে পারি।

হৃদয়ের বর্ত্তমান ভাবরাশি 'প্রত্যাগত' ইতিশীর্ষক একটি কবিতায় লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সহজে সক্ষম হইতেছি না। মাথা হইতে কবিতা, কল্পনা, ভাষা যেন সকলই ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। হায়! অবশেষে আমার একমাত্র সান্ত্বনার স্থলও কি লুপ্ত হইয়া যাইবে?

৪ঠা মাঘ। আমার পুরাতন বন্ধু, * * * অদ্য ৩টার সময়—তিন বৎসরের পর সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে এত দিন পরে আমাকে মনে করিয়াছেন, ইহাতে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। শৈশবের, যৌবনের পরিচিত বন্ধু সমুদয় কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে জীবনের অবকাশের ভিতর দিয়া কদাচিৎ একবার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আবার অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই জীবন-যাত্রায় কত লোকের সান্নিধ্যে আসিয়াছি, কত লোকের সহিত আলাপ-পরিচয়, আবার কত জনের সহিত হয় ত বন্ধুত্বও জন্মিয়াছে কিন্তু তাহাদের সকলের মুখ আজ আর একবারও ত দেখিতে পাই না। সকলকে মনে করিয়াই কি রাখিতে পারিয়াছি? হয় ত তাহাদের অনেককেই এ জগতে জলে স্থলে শূন্যে আর কোথাও দেখিতে পাইব না। মানুষ ঠিক নৌকা কি ভাসা ভর ন্যায় এই জীবন-নদী বাহিয়া চলিয়া যায়। বর্ত্তমানের উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গগুলি পশ্চাতে অতীত-গর্ভে সঙ্গে সঙ্গেই মিলাইয়া যাইতেছে। কিয়ৎকাল পরে কোনখান দিয়া কে গিয়াছে, হয় ত তাহার চিহ্নমাত্রও খুঁজিয়া মিলিবে না।

৫ই মাঘ। বৈকালে কলিকাতায় যাইয়া সন্ধ্যার পর সু—র সহিত

হী—বাবুর বাড়ীতে গমন করিলাম। তিনি সু—র মুখে আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রথম শুনিলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রশান্তকে হারাইবার কথা উল্লেখ করিলেন। আমি তাঁহার সহিত বেশী কিছু কথা কহিতে পারিলাম না। যে অবস্থা, যে হৃদয় লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতাম, তাহা ত আর নাই; এখনকার কথাবার্ত্তা কিরূপ হইবে, তাহা যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

হী— Indian Relief Society সম্পর্কে যে সকল কাজ করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক প্রশংসার্হ। তিনি বঙ্গের একটি উজ্জ্বল রত্ন। এইমাত্র তাঁহার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন চিরদিন এইরূপ নীরবে, আড়ম্বরশূন্য হইয়া, দেশের মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ হন। আমি নিতান্ত অধম, অকিঞ্চিৎকর; কোনও কার্য্যেই মন বাঁধিতে পারি না। তবে, Those also serve who only stand and wait," মহাকবির এই অমর উক্তিতে যা কতকটা ভরসার কথা আছে।

৬ই মাঘ। "প্রত্যাগত" কবিতা আটটি stanzaয় সমাপ্ত হইয়াছে। আজ সমস্ত দিবস কেবল মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছি। মাঝে মাঝে উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করিয়াও যেন মনের তৃপ্তি হইতেছে না। জগৎজননী প্রকৃতির নিকট যে প্রার্থনা করিতেছি, তাহার সাফল্যের কোনও পরিচয় ত পাইতেছি না। তবে হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু হইয়াছে, বোধ হয়। এক একবার ভাবিয়া ভাবিয়া, আবৃত্তি করিয়া, অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছি না। হায় মা বিশ্বজননী! আমি কি তোমার বিশ্ব-রূপ এই জীবন্ত মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, ইহারই মহিমাকীর্ত্তন করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ নিরাপদে যাপন করিতে পারিব না? তুমি স্বয়ং স্বহস্তে যে গৃহ ভাঙ্গিয়াছ, মানুষে আবার কেন তাহাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে? আবার কি সেই পুরাতন লীলার অভিনয় করিতে হইবে? আমি কিছুই স্থির করিতে পারি না, মা। দিন দিন বিষম সংশয়-জালে জড়াইয়া পড়িতেছি। তুমি এইবার আমার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ কর; আর আমাকে সন্দেহে দোলাইও না। একবার দেখ মা!—

"হৃতসুখ, নষ্টগৃহ, দীর্ণ-জীর্ণ-হিয়া,
প্রকৃতি, জননী, আমি এসেছি ফিরিয়া!"

———

ক্রমশঃ।

জলধি।

এ ঘোর আবেগরাশি অর্পিয়া তোমার বুকে,
নিশ্চিন্ত আছেন যিনি গভীর সুষুপ্তিসুখে,—
তারে কি জাগাতে তব এ গুরু গর্জ্জন-গান?
চির দিন চিররাত্রি নাহি তিল অবসান—
উদ্গিরিত ফেনরাশি যেন কার্পাসের মেলা,
আছাড়িয়া ক্ষোভে রোষে আস্ফালিয়া ভাঙ্গ বেলা;
উত্তাল তরঙ্গরাশি ছুটে এসে মাথা কুটে
নিষ্ফল আক্রোশে ফুলি' শৈলপাদে পড়ে লুটে;
অচল অটল গিরি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া,
গর্জ্জনে ক্রন্দনে শত গলে না ত বিন্দু হিয়া!
দুরন্ত বালিকা যেন হস্তপদ আছাড়িয়া
কভু কাঁদ, কভু হাস, কভু পড় লুটাইয়া!
অটল ভূধর স্থির স্থবির জনক সম,
অকম্পিত, দেখে চেয়ে মনোরম পরাক্রম।
প্রশান্ত মাতার সম ও তব উৎপাত খেলা
অবিরাম অবিশ্রাম সহিছে জননী বেলা!
কিবা তুমি উন্মাদিনী, কে কৈল পাগল তোরে,
প্রশান্ত গম্ভীর হিয়া কে দিল চঞ্চল ক'রে?
সুনীল দিগন্ত ওই সাদরে বেষ্টিয়া হিয়া
দিয়াছে সুনীল হৃদি নীল হৃদে মিশাইয়া!
তবু তুমি উন্মাদিনী কি চাও কাহারে পেতে?
সুনীল অঞ্চলে তোর শিশু রবি উঠে প্রাতে—
—প্রদানে কিরণরাশি, পুলকে জগত ভোর,
তাই মর মাথা কুটে, ধরণী সপত্নী তোর,
ছুটে এস গ্রাসিবারে শত শত ফণা তুলি
সপত্নী-বিদ্বেষে শেষে উর্ম্মিলে উন্মত্ত হ'লি?—

কিবা, আজও দেবাসুরে মন্থন করিছে তোরে,
প্রোথিত মন্থন-দণ্ড নীলগিরি নীল-নীরে,—
তাই উত্থিত ঘর্ঘর ঘোর বিকীরিত ফেনোচ্ছল!
উন্মত্ত অধীর তাই—প্রশান্ত সুনীল জল!
অমরে অমৃত দিলি, নীলকণ্ঠে হলাহল,
অধীর উন্মত্ত সিন্ধু! নরে কি দিবি গো বল!

সূর্য্য-পূজা।

ভীতি-বিস্ময়াদি-ভাবোদ্দীপক প্রাকৃত পদার্থমাত্রকেই দেবতা বলিয়া গ্রহণ করা অব্যাবৃত প্রাকৃত লোকের স্বভাবসিদ্ধ। সূর্য্য জগতের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও রক্ষার কারণ; তাই তিনি সবিতা। ঈদৃশ তেজোময় শক্তিমান্ পদার্থ দেবত্ব গ্রহণ করিবেন, আশ্চর্য্য কি? সবিতার মহিমা ও উপাসনা বেদে প্রকটিত হইয়াছে। সূর্য্য-পূজা যে প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উৎকলের কোণার্কমন্দির তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্য-পূজা বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, অনেকে মনে করেন। সূর্য্যদেবের ধ্যানপ্রণামাদি প্রাত্যহিক সন্ধ্যাপূজার অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে; অর্ঘ্যাদিদানে সূর্য্যদেবের অর্চনা অন্নাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্রিয়ার অঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সূর্য্য-পূজাও কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামে প্রতি বৎসর অনেক পল্লীতে সূর্য্য-পূজা হইয়া থাকে। সবিতৃদেব উত্তর দিকের অঙ্কাশ্রয় করিয়া এই পূজা গ্রহণ করেন। কোন তিথিবিশেষের সহিত এ পূজার সম্বন্ধ নাই। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের শেষ রবিবারে পূজার নিয়ম প্রচলিত।

বাড়ীতে সূর্য্য-পূজা দিবার কথা প্রায় শুনা যায় না। অনেক হিন্দু পল্লীতে গ্রামের বাহিরে একটি করিয়া স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে "সূর্য্যখোলা" বা

"সূর্য্যাতলা" বলে। সন্নিকটস্থ পল্লীবাসীদিগের পূজা ঐ খোলাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দু ব্যতীত অন্যধর্ম্মীকে এই পূজা দিতে দেখা যায় না। পূজারি সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ। সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি গঠিত হয় না। প্রায় সর্ব্বত্রই ঘটস্থাপন করিয়া পূজা হয়। চক্রশালায় দুই এক স্থলে প্রোথিত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ডের গাত্রে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিকীর্ণজ্যোতিঃ-সম্পন্ন চক্রাকার একখানি মুখ বই আর কিছুই নয়। পঞ্জিকায় অনেক সময় সূর্য্যগ্রহের যে ছবি দেওয়া হয়, তাহারই অনুরূপ। পূজার সময় ঐ মূর্ত্তি তৈলে অভিষিক্ত করিয়া রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হয়। কোন কোন স্থানে ভূমিতে ঐরূপ আকৃতি টানিয়া লইবার কথাও শুনা যায়।

স্ত্রী, পুরুষ, ইতর, ভদ্র, সকলেই সূর্য্যব্রত গ্রহণ করিতে পারে ও করিয়া থাকে। পূজাদিবসে প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রতীদিগের অবগাহন নিতান্ত আবশ্যক। জলে থাকিয়া সূর্য্যোদয়দর্শন ও সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া উঠিতে হয়। কোন কোন স্থানে সূর্য্যোদয়দর্শনাপেক্ষায় যতক্ষণ জলে থাকিতে হয়, ততক্ষণ এক পদে দাঁড়াইয়া থাকিবার নিয়ম আছে। তৎপরে ব্রতীরা স্ব স্ব পূজার সামগ্রী লইয়া খোলায় উপস্থিত হন, অথবা পূজোপহার লোক দ্বারা প্রেরণ করেন।

পূজারি ব্রাহ্মণ সবিতার জন্মস্থান পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া পূজায় বসেন। ব্রতীদিগের সংখ্যানুসারে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন পুরোহিত থাকায়, একাধিক পূজারিকে খোলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিতে দেখা যায়। আবাহন, স্থাপন, ধ্যান, স্তব, প্রণাম ইত্যাদি সহ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতসী, অপরাজিতায় যেমন তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাভা দুর্গা প্রসন্না, জবাকুসুমসঙ্কাশ সবিতাও তেমনই জবাকুসুমে পরি-তৃপ্ত। পূজারি ব্রাহ্মণ একে একে ব্রতীদিগের পূজা শেষ করেন। পূজার সময় ব্রতী কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া সূর্য্যদেবকে দর্শন করিতে থাকেন। পূজান্তে স্থাপিত ঘট সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করেন, এবং আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিদায় হন। সূর্য্য-পূজায় ছাগবলির কথাও দুই এক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়।

চক্রশালা প্রভৃতি কোন কোন স্থানে সূর্য্য-পূজার সহ সামান্যাকারে চন্দ্র-পূজাও করিতে দেখা যায়। পূজারি এক এক ব্রতীর সূর্য্য-পূজা শেষ করিয়া চন্দ্রদেবকে পাদ্য অর্ঘ্য ও গন্ধ পুষ্প দিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। চন্দ্র-পূজার জন্য বিশেষ কোন আয়োজন করিতে হয় না।

সূর্য্য-পূজা সাধারণতঃ আয়ু ও আরোগ্য কামনায় উৎযাপন করা হয়। শাস্ত্রে বলে, "আরোগ্যং ভাস্করাৎ ইচ্ছেৎ।" অনেকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে, পুত্র-কামনায় এই ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূজান্তে সূর্য্যদেবে নিবেদিত কদলী ভক্ষণ করিলে সুরূপ সুস্থকায় সুত জন্মে, অনেক স্ত্রীলোকের বিশ্বাস আছে। কুমারীরা রাঙ্গা বর পাইবার লোভে সূর্য্যের স্তব করে।

ব্রতীদিগকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হয়। মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সূর্য্যাস্তের সময় পুনরায় স্নান করা আবশ্যক। সূর্য্যাস্ত-স্নানের সময় ব্রতী জলন্তবহ্নিযুক্ত ধুনুচী দক্ষিণ হস্তে উঁচু করিয়া রাখিয়া ডুব দিয়া থাকেন। সূর্য্য-পূজার সময় যে বহ্নিতে ধুনা পোড়ান হয়, এই ধুনুচীতে অন্ততঃ তাহার কিছু ছাই থাকা আবশ্যক। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, সবিতা দিনান্তে স্বীয় তেজ হুতাশনে নিহিত করেন। প্রদোষে সবহ্নি ধুনুচী হস্তে অবগাহন যে ঐ শাস্ত্রোক্তির স্মারক নহে, কি করিয়া বলিব? সন্ধ্যার পর ব্রতী ফলমূলাদি জলযোগ করিতে পারেন।

চট্টগ্রামে যে যে স্থানে "সূর্য্যতলা" আছে, সেইখানেই পূজাবাসরে ছোট বড় এক একটি মেলা হইয়া থাকে। ইহাকে "সূর্য্যতলার মেলা" বলে। মেলা দু'দিন থাকে। পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত লোকসমাগম বেশী হয় না। পূজা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে শেষ হইতে প্রায় কোথাও দেখা যায় না। মেলায় হিন্দু মুসলমান সকলেই যোগ দেয়। ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যা কোন কোন মেলায় অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল প্রকারের পণ্যদ্রব্যাদি মেলায় আসে। চট্টগ্রামের যে যে স্থানে সূর্য্যতলার মেলা হয়, তন্মধ্যে জ্যৈষ্ঠ-পুরার মেলাই প্রসিদ্ধ। সহর হইতে জ্যৈষ্ঠপুরা ১০।১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। সহরের অনেক দোকানদার জিনিসপত্র সরবরাহ করেন। অনেক দূর হইতে লোক মেলা-দর্শনে গিয়া থাকেন। জ্যৈষ্ঠপুরার পরে ফতোয়াবাদ (সহরের ৬ মাইল উত্তরে), নওয়াপাড়া (১০ মাইল পূর্ব্বে), চক্রশালা (১০।১২ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে), হালিসহর (৬।৭ মাইল দক্ষিণে) প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের মেলার নাম শুনা যায়। এতদ্ভিন্ন দেয়াং পাহাড় প্রভৃতি অনেক স্থলে পল্লীগ্রামের হাটের মতন সামান্য মেলা হয়। এইরূপ ছোট ছোট মেলাতেই আবালবৃদ্ধবনিতা ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়।

মগধেশ্বরীর পূজার ন্যায় সূর্য্য-পূজাও চট্টগ্রামের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সূর্য্য-পূজায় সাধারণের উৎসাহ ও ভক্তির অভাব নাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

আকবর ও আলিবর্দ্দী।

মোগলকেশরী ভারতসম্রাট্ আকবর বাদশাহের উদারনীতি জাতিনির্ব্বিশেষে ভারতবাসীর হৃদয়ে শান্তিসুখের সঞ্চার করিয়াছিল। বিশেষতঃ হিন্দুগণকে তিনি নানাপ্রকার অধিকার প্রদান করিয়া যেরূপ মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা ভারত-ইতিহাসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জিজিয়া কর রহিত করিয়া তিনি হিন্দুদিগের নিকট হইতে অক্ষয় আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং যাত্রিকরের অপ্রচলন করায় হিন্দুগণ প্রতিনিয়ত তাঁহার মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিত। তদ্ব্যতীত যাহাতে হিন্দুসন্তানগণ যুদ্ধকালে দাসরূপে ব্যবহৃত হইতে না পারে, তদ্বিষয়েও তিনি নিষেধাজ্ঞার প্রচার করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না; বিশেষতঃ, তিনি হিন্দুদিগের অনেকপ্রকার আচার ব্যবহারের প্রশংসা করিতেন, এবং নিজেও তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই জন্য এরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন। হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার উদারভাব-প্রদর্শনের জন্যই হিন্দুরা যে তাঁহাকে আপনাদের বলিয়া ঘোষণা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ তাহারই সমর্থন করিতেছে। ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্করে বা অল্প করে ভূমিপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়া, ও স্থলবিশেষে গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার নিষেধ-আজ্ঞা দিয়া তিনি হিন্দুদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল হিন্দুদিগের প্রতি উদারভাব প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য তিনি অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে ও স্বীয় পুত্রদিগকে রাজপুতগণের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বংশীয়গণও তাঁহার আদর্শের অনুগামী হইয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুদিগের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ তাঁহার ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কি সৈনিকবিভাগ, কি শাসনবিভাগ, কি রাজস্ববিভাগ, কি মন্ত্রণাবিভাগ, সর্ব্বত্রই তিনি মুসলমানদিগের সহিত

সমভাবে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মানসিংহ, বীরবল, তোড়র-মল্লের নাম কে না অবগত আছেন? ইঁহারা যে আকবরের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন, তাহাও ইতিহাসপাঠকমাত্রই অবগত আছেন। হিন্দুদিগের প্রতি এইরূপ উদারভাব-প্রদর্শনের ফলে তাঁহার রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিবশতঃ তিনি বল-পূর্ব্বক সতীদাহাদিনিবারণেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলতঃ, আকবর বাদশাহ উদারনীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দুদিগকে যেরূপ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া-ছিলেন, ভারতে কোন মুসলমান সম্রাট সেরূপ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বংশীয়গণ তাঁহার নীতির অনুসরণ করিয়া কিছু দিন মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দাম্ভিক সম্রাট আরঙ্গজেবের কুনীতিতে মোগল সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া পরে তাহার ধ্বংসের পথ বিস্তৃত হইয়া উঠিল।

যে নীতি অবলম্বন করিয়া আকবর বাদশাহ ভারতে মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিয়াছিলেন, সেই নীতি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলার এক জন নবাব, হিন্দুজাতি, বিশেষতঃ বাঙ্গালীগণের, আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় আলিবর্দ্দী খাঁ মহবৎজঙ্গ। আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট বাঙ্গালী যেরূপ ঋণী, আকবরের নিকট সমগ্র হিন্দুজাতি সেরূপ ঋণী কি না সন্দেহ। যদিও আকবরের প্রবর্ত্তিত উদারনীতি আলিবর্দ্দীর সময় পর্য্যন্তও মোগল সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া, তাঁহার সে বিষয়ে বিশেষ কোন মৌলিকতা নাই, তথাপি তিনি বাঙ্গালীকে যে সমস্ত অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আর বাঙ্গলার ইতিহাসের কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। আকবরের ন্যায় তাঁহার রাজত্বে হিন্দুজাতি বা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এমন কি, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সহিত হোলি-উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন! আলিবর্দ্দীর এইরূপ উদারভাব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দীনের নিকট হইতে গৃহীত হইলেও, তিনি স্বীয় মহত্ত্বপ্রভাবে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দুপর্ব্বোপলক্ষে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবার বন্ধ থাকিত। হিন্দু জমীদারগণ ব্রাহ্মণ ও দেবতাদিগের জন্য যাহা উৎসর্গ করিতেন, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিত। আলিবর্দ্দীর পূর্ব্ব হইতে এই নিয়ম থাকিলেও, তাঁহার সময় যে ইহা বহুল-

পরিমাণে প্রচলিত হয়, মহারাণী ভবানী ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুক্তহস্ততা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সে সময়ে ব্রহ্মণপণ্ডিতেরা সরকার হইতে যে বৃত্তি পাইতেন, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রচলিত ছিল। হিন্দুদিগের কঠোর আচার ব্যবহারেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল; সরকারের আদেশ ব্যতীত সতীদাহাদি সম্পাদিত হইতে পারিত না। মিষ্টার হল্‌ওয়েল্ আলিবর্দ্দীর সময়ের একটি সতীদাহ সম্বন্ধে ঐরূপ লিখিয়াছেন। রাজপদে মুসল্‌মানের সহিত হিন্দুরা সমভাবে নিযুক্ত হইতেন। এ বিষয়ে তিনি আকবর বাদশাহের ন্যায় অসীম উদারতাই দেখাইয়াছিলেন। রাজস্ববিভাগে ও মন্ত্রণাবিভাগে পূর্ব্ব হইতে হিন্দুগণ নিযুক্ত হইলেও, শাসন ও যুদ্ধ বিভাগে হিন্দুগণ ও বাঙ্গালীগণ বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালীদিগকে শাসন ও সৈনিক বিভাগে নিযক্ত করিয়া আপনার অপরিসীম ঔদার্য্য ও মহত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে চায়েন রায় প্রভৃতি রাজস্ববিভাগে, জগৎশেঠ মন্ত্রণাবিভাগে, এবং জানকীরাম, দুর্ল্লভরাম প্রভৃতি শাসন ও যুদ্ধবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম যাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আলিবর্দ্দী তাহাদিগকে একবারে সৈনিক বিভাগের পক্ষে অনুপযুক্ত মনে করেন নাই। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশ বারংবার মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সেই আক্রমণে বঙ্গদেশের জমীদার ও প্রজাগণ অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল। যদিও শান্তিসংস্থাপনের জন্য আলিবর্দ্দী কিছু কিছু করভার বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তথাপি জমীদার ও প্রজাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকায়, এবং বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় তাহারা সে করভারকে গুরুতর মনে না করিয়া অম্লানবদনে তাহার বহনে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইউরোপীয় বণিক্‌গণের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্নদৃষ্টি থাকিলেও, তিনি তাহাদিগের অধিকারলোপের জন্য চেষ্টা করেন নাই। তিনি এইরূপ উদারভাবে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তাঁহার রাজ্যমধ্যে মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ও আফগানবিদ্রোহ উপস্থিত হইলেও, প্রজাগণ তন্মধ্যেই শান্তিসুখ অনুভব করিয়াছিল, এবং সেই শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে উড়িষ্যার কতক অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে উড়িষ্যা অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; কারণ, দুই একবার মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক গুরুতররূপে আক্রান্ত হইলেও, তিনি বহুবার

তাহাদিগকে বঙ্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে উড়িষ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঔদার্য্য ও মহত্ত্বে তিনি যে আকবরের সমকক্ষ ছিলেন, তাহা সকলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি আকবর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন;—সেটি তাঁহার নৈতিক চরিত্র। তিনি আপনার একমাত্র ভার্য্যা ব্যতীত কখনও অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্যমাত্র অনুরাগও প্রদর্শন করেন নাই। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ঐরূপ নৈতিক চরিত্রে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে তিনি ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া তাঁহার পক্ষে ঐরূপ চরিত্রবল-প্রদর্শন তত বিস্ময়কর না হইতে পারে; কিন্তু আলিবর্দ্দীর চরিত্রবল যে সর্বথা প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি আকবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আলিবর্দ্দীর জীবনের প্রধান কলঙ্ক, তাঁহার প্রভুপুত্র সরফরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। ইহাতে তিনি প্রায় মীরজাফরেরই তুল্য। তবে তাঁহার পরিবারবর্গ সরফরাজ কর্ত্তৃক উত্যক্ত হওয়ায় তিনি যেরূপ সত্বর সরফরাজের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মীরজাফরের পরিবারবর্গ সিরাজ কর্ত্তৃক সেরূপ ভাবে উৎপীড়িত হন নাই। মীরজাফরের প্রতি সন্দিহান হইয়া সিরাজ শেষে মীরজাফরের পরিবারের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একটি দোষ মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের গুপ্তহত্যা। রাজনৈতিক ব্যাপার বলিয়া তাহার যে একেবারে সমর্থন করা না যায়, এমন নহে। যদি আমরা উক্ত ঘটনাকে দোষজনক মনে করি, তাহা হইলে যে মহাপুরুষের পূজার জন্য আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই মহাপুরুষ শিবাজী কর্ত্তৃক আফজল খাঁর হত্যাটির কথাও আমাদিগকে স্মরণ করিতে হয়। দুটি ঘটনায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও উদ্দেশ্য যে একরূপ ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আকবর সম্বন্ধে ঐরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি রাজা মানসিংহকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবাদের মূল থাকিলে, তাহা যে অতীব ভয়াবহ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আকবরের উদারনীতির ন্যায় আলিবর্দ্দীর উদারনীতিতে হিন্দুগণ বিশেষতঃ বাঙ্গালীগণ যে উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আলিবর্দ্দীর পরবর্ত্তী নবাবগণ সে নীতিরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কতক তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতায়, এবং কতক

বাঙ্গালী জাতির বিশ্বাসঘাতকতায় দেশমধ্যে অশান্তি উপস্থিত, এবং পরে বঙ্গরাজ্য ইংরাজদিগের করতলগত হয়। যে জাতির জন্য আলিবর্দ্দী খাঁ ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছিলেন, তাহারাই বিশ্বাসঘাতী হইয়া পরে তাঁহার বংশধরকে ঘাতকের শাণিত তরবারির বলি-স্থানীয় করিয়াছিল। তাই মনে হয় যে, এ জাতি কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারিবে কি না, তাহা সেই বিশ্বনিয়ন্তাই বলিতে পারেন। তবে আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য যে, তাহার ফলে বঙ্গে ও ভারতে যে রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা যে অধিকতর শান্তিময়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সহযোগী সাহিত্য।

ভ্রমণ।

ফরাসীর চক্ষে বারাণসী।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক পিয়ের লোটী কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পর্য্যটন করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার ভ্রমণকাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পার্লেমেণ্টের বিখ্যাত আইরিশ সদস্য শ্রীযুক্ত টি. পি. ওকোনর একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রে লোটীর ভ্রমণ-কাহিনীর সমালোচন ও অংশবিশেষের সারসংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে বারাণসী-বর্ণনার সারসঙ্কলন করিলাম।

সুপ্রসিদ্ধ বারাণসী ক্ষেত্র আমাদের বহু পাঠকেরই সুপরিচিত, এই সুবিখ্যাত তীর্থ বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্গমও নহে, সুতরাং এই তীর্থকাহিনী বর্ণনা দ্বারা যে পাঠকের নিকট কোন নূতন বিষয়ের, কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘটনার বা দৃশ্যের অবতারণ করা যাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। যাহা চিরপুরাতন, পিয়ের লোটী তাহাতেই হৃদয়ের আগ্রহ ও একাগ্রতা, বিস্ময়াকুল নেত্রের নির্নিমেষ দৃষ্টি ঢালিয়া দিয়া, তাহাকে এমন নূতন ভাবে দেখিয়াছেন যে, তাহার বর্ণনাটি পাঠ করিতে করিতে পাঠকের মানসনেত্রের সম্মুখে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী অতীত গৌরব ও আধুনিক সৌন্দর্য্যের সহিত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং তাহার বর্ণনার প্রত্যেক ছত্রে সহস্র মন্দির মঠে মুকুটিত, শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের সম্মোহন শব্দসমন্বয়ে আরাধিত, ধূপ চন্দন গন্ধ মাল্যে সুরভিত বারাণসীর মধুর স্মৃতি অনভ্যস্ত বিদেশী দর্শককে কি ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখক বলিতেছেন, পূতসলিলা ভাগীরথী বারাণসীর জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। বিশ্বেশ্বর শিবের সহিতই ইহার তুলনা চলিতে পারে;—এই ভাগীরথী যেমন ইহলোকের অবলম্বন, তেমনই পরলোকেরও আশ্রয়স্বরূপ। বর্ষার কয়েক মাস এই তরঙ্গিণী কি ভীষণ দুর্দ্দমনীয় স্রোতে প্রবাহিত হয়! কোনও শক্তির সে স্রোতের প্রতিরোধ করিবার সাধ্য নাই। তখন ভাগীরথীতটসংস্থাপিত সমুচ্চ পাষাণপ্রাচীর সেই স্রোতোবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে; প্রাচীরের কোন অংশ নদীগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়ে; কোন অংশ বা জলের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নদীতীর হইতে যে সকল গৃহ দূরে দূরে অবস্থিত, কেবল তাহারাই নিরাপদ। কিন্তু নগরটি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, নগরের কেন্দ্রস্থলটি এই নদীর দিকেই আকৃষ্ট, ধনী বা নির্ধন প্রত্যেক ব্যক্তির বাসগৃহ, দেবমন্দির, ব্রাহ্মণগণের সুপবিত্র আবাস, সকলেরই দৃষ্টি যেন এই রহস্যময়ী বেগবতী পূতসলিলা স্রোতস্বিনীর অভিমুখে; এই নদীর জল যেন সকলের সঞ্জীবনী শক্তি। অট্টালিকাসমূহ হইতে বাহির হইয়া দলে দলে লোক নদীতীরে সম্মিলিত হয়। নদীতীর হইতে জলপ্রান্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য প্রস্তরময় সোপান আছে। এই বিরাট সোপানমালায় প্রভাত হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত জনসমাবেশ লক্ষিত হয়;—তাহাদের কেহ মুসাফির, কেহ ফলবিক্রেতা, কেহ গাভীর খাদ্যবিক্রেতা, ফুলবিক্রেতার ত সংখ্যাই নাই, তাহারা যাহার দেখা পায়, তাহারই কাছে মালা বিক্রয় করিতে চাহে; ধার্ম্মিক লোকেরা এই মালা কিনিয়া ভক্তিভরে ভাগীরথীপ্রবাহে নিক্ষেপ করেন।

নৌকাবক্ষে বসিয়া নদীতীরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। অনুকূল স্রোতে নৌকা ছুটিয়া চলিল। দেখিলাম, এক দিকে তিনটি অগ্নিকুণ্ড, আর ধূম উঠিতেছে না, কিন্তু কুণ্ডে আগুন গন্‌গন্ করিতেছে। এই অগ্নিকুণ্ড কয়টি দেখিয়াই মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। কুণ্ড দীর্ঘ কিন্তু সংকীর্ণ, মৃতের দেহ দাহ করিবার চিতা। এই বারাণসীধামে অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ও গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া মনুষ্যের জীবনের সদ্গতি হয়। চিতাগুলি অতি ক্ষুদ্র, তাহা অতি ধীরে ধীরে জ্বলে। আমরা হিন্দু মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'চিতাগুলি এমন খারাপ কেন?' উত্তরে জানিতে পারিলাম, অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারতেও জীবন ও মৃত্যু উভয়ের উপরই দারিদ্র্যের অধিকার আছে। মাঝি বলিল, 'সাহেব! ও গরীবের চিতা। গরীবরা ত আর বেশী কাঠ কিনিতে পারে না, কম কাঠেই পুড়াইতে হয়; তাহার উপর কাঠগুলি ভিজে।' কি ক্ষোভের কথা! সন্ধ্যা হইল। চিতাবহ্নি হইতে দৃষ্টি ফিরিল, মন উপাসকমণ্ডলীর বন্দনা-গীতির দিকে আকৃষ্ট হইল। সূর্য্যাস্তকাল হইতে বারাণসী ও গঙ্গাতীরের দৃশ্য অপরূপ! প্রকাণ্ড পাষাণময় সোপানের উপর দিয়া নদীবক্ষে ব্রাহ্মণের স্রোত চলিয়াছে; তাহারা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতেছে। যে প্রস্তরময় সোপান কিছু কাল পূর্ব্বে জনহীন ছিল, এখন তাহা জনপূর্ণ। সহস্র সহস্র দারুময়ী বেদী ও ডোঙ্গায় চড়িয়া লোকে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছে; কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সকলেরই চিন্তা— যাহা কিছু পার্থিব, নশ্বর, দৃশ্যমান, তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া, অদৃশ্য জগতে চিন্ময়স্বরূপ অনন্ত পুরুষের ধ্যানে প্রসারিত হইতেছিল। দেখিলাম, ঠিক সেই সময়ে আর দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তির অন্তর্জলি করা হইতেছে;—জীবিত ও মৃত ঠিক একই সময়ে এই পবিত্র নদীজলে শুদ্ধিকামনা

করিতেছে। পাঁচ ছয় জন লোক বস্ত্রাবৃত অবস্থায় সোপানের উপর একত্র হইয়া চিতাবহ্নির দিকে নিম্নদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; যাহাদের মৃতদেহ ধীরে ধীরে দগ্ধ হইতেছে, ইহারা তাহাদেরই আত্মীয়। একটি চিতার খুব নিকটে দুই জন বৃদ্ধা দণ্ডায়মানা। এই চিতাটি অতি ক্ষুদ্র, দেখিয়া অতি দরিদ্রের চিতা বলিয়া বোধ হইল। মাঝি বলিল, 'ইহা একটি দশ বৎসরের ছেলের চিতা। অল্প কাঠ সংগ্রহ করিয়া শবদাহ করিতে আসিয়াছে।'—দেহটি জ্বলিতে আরম্ভ করিল। কুণ্ডলীকৃত ধূম আত্মীয়গণের নিকট উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নির তেজ কিছু মন্দীভূত হইলে, নিকটবর্ত্তী লোকেরা বংশদণ্ড দ্বারা অগ্নিরাশি প্রদীপ্ত করিতেছে। এক দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন্দির ও প্রাসাদের চূড়াসমূহ শীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশের অভিমুখে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে, তাহাদের অচঞ্চল ভাব, তাহাদের উচ্চতা, তাহাদের বিশালতা ও গাম্ভীর্য্য, আর এক দিকে ঐ ক্ষুদ্র দুইটি চিতায় সংকীর্ণ ভূখণ্ডে দুইটি দরিদ্রের প্রাণহীন দেহ—সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির দৃশ্য!

দাহের জন্য আর একটি মৃতদেহ আসিল। অত্যন্ত নীচজাতীয় অর্দ্ধ উলঙ্গ ছয় জন লোক বাঁশের মাচায় তাহা বহন করিয়া লইয়া আসিল। এই মৃতদেহের সহিত অন্য লোক নাই, কেহ তাহার জন্য কাঁদিতেছে না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাহার পাশ দিয়া নদীতে স্নান করিতে নামিল, তাহারা মহানন্দে নদীর জলে নাচিতে লাগিল, অন্য কোনও দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। এই বারাণসীধামে আত্মারই গৌরব, প্রাণ দেহত্যাগ করিলে সে দেহের প্রতি আর কেহ লক্ষ্য করে না। গরীবেরা এই মৃতদেহের সঙ্গে আসিয়াছে, মৃতদাহ করিবার উপযুক্ত অর্থ তাহাদের সঙ্গে নাই, পাছে শ্মশানরক্ষকগণ শবটির দাহ না করিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করে, এই ভয়ে তাহারা আসিয়াছে।

আর একটি চিতা সজ্জিত দেখিলাম। মৃতের কোনও আত্মীয় নিকটে উপস্থিত নাই, অনেক কাঠ আনীত হইয়াছে, পুষ্পরাশিতে মৃতদেহ সমাচ্ছন্ন, মূল্যবান বস্ত্রে শবদেহটি আবৃত। কোনও ধনবানের কন্যার এই মৃতদেহ, আমরা মৃতদেহটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য নদীকূলে নৌকা ভিড়াইলাম। আমাদের চারি দিকের জলরাশি ভক্তনিক্ষিপ্ত পুষ্পরাশিতে ঢাকিয়া গিয়াছে; চারি দিকে অসংখ্য ফুল ভাসিতেছে, এই পুষ্পগন্ধ পূতিগন্ধের সহিত মিশিয়া একটি মিশ্র গন্ধ উত্থিত হইতেছে।

সন্ধ্যাকালে অন্ধকার গাঢ় হইলে ভাগীরথীর এই দৃশ্য। কিন্তু যখন রাত্রি প্রভাত হয়, তখনই ভাগীরথীর দৃশ্য অপূর্ব্ব গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আদি যুগ হইতে সূর্য্যোদয় কাল ব্রাহ্মণগণের নিকট অত্যন্ত বরেণ্য ও পবিত্রতাপূর্ণ, সেই সময়ই দৈনিক উপাসনার সময়। এই সময় বারাণসীর সমস্ত লোক নদীতে স্নান করিতে আসে; পুষ্পে, মাল্যে, নৌকায় ও পঙ্কীতে নদী আচ্ছন্ন হয়; পাষাণসোপানের ঊর্দ্ধদেশে তরুণ অরুণের প্রথম কিরণসম্পাতমাত্র পুণ্যভূমি বারাণসীর প্রত্যেক অধিবাসী নিদ্রাত্যাগ করে, পুরুষেরা গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বিবিধ বর্ণের বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া নদীজলে অবতরণ করিতে থাকে, শুভ্রবস্ত্র-মণ্ডিত রমণীদল ঝকঝকে পিত্তল-কলস কক্ষে লইয়া

মলের শব্দে চতুর্দিক ঝঙ্কারিত করিয়া নদীতে নামিতেছে, নদীজলে পুষ্প ও মাল্য নিক্ষেপ করিতেছে। রাত্রে যে সকল পক্ষী স্তম্ভ ও গৃহচূড়ায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা জাগিয়া ইতস্ততঃ উড়িতেছে, ডাকিতেছে, স্নানার্থিগণের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ;—তাহারা জানে, কেহ তাহাদিগকে স্পর্শও করিবে না। দেবমন্দির ভক্তবৃন্দের স্তবপাঠে মুখরিত হইয়া উঠিল ; কাঁশর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ; প্রভাতসূর্য্যের কিরণ নরনারীগণের মুখমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উলঙ্গ বালকগণ হাত-ধরাধরি করিয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ও পুরোহিতগণও সেখানে সমবেত হইলেন। সারি বাঁধিয়া গরুর দল চলিতে লাগিল ,—ভক্তেরা তাহাদের মুখে ফুল ও তৃণশস্য প্রদান করিতে লাগিল। এই পশুরাও যেন কোনও সংস্কারবলে জানিতে পারিয়াছে,—দেবতার উপাসনার সময় উপস্থিত ! নদীতীরে ছাগ ও মেষপাল চলিয়াছে , শাখামৃগের দল ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। উত্তপ্ত সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে চরাচর বিধৌত , অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে ; শীতল নৈশ শিশির শুকাইয়া গিয়াছে। দেবমন্দিরসমূহের দ্বার জানালা উন্মুক্ত হইয়াছে, বাতায়নপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি-সমূহ দেখা যাইতেছে। প্রাচীন প্রাসাদসমূহ যেন নবীন দেখাইতেছে। প্রাসাদশিখর ও মন্দির-চূড়াগুলিতে স্বর্ণভাতি প্রতিফলিত হইতেছে।

অসংখ্য ব্রাহ্মণ নদীকূলে সোপানের উপর ফুল ও মালা রাখিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিতেছে ; শ্বেত, পীত নানাবর্ণের বস্ত্র নানা স্থানে স্তূপীকৃত ; কতক বা বাঁশের 'আড়া'য় ঝুলিতেছে। অর্দ্ধ-উলঙ্গ মনুষ্যগুলির পীতাভ দেহ কি সুন্দর ! ক্ষীণদেহ বা পরিপুষ্টদেহ লোক সকল নদীজলে কটি পর্যান্ত মগ্ন করিতেছে ; রমণীগণ গললগ্নীকৃতবস্ত্রে বলয়বেষ্টিত হস্তে জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছে ,—প্রথমে তাহারা কেশরাশি জলে ছাড়িয়া দিতেছে, তাহাদের বক্ষে ও স্কন্ধে পবিত্র জল ছড়াইয়া দিতেছে। চতুর্দিকে ভক্তগণ নদীজলে পুষ্পমালা নিক্ষেপ করিতেছে, প্রণাম করিতেছে, ঘট ও কলস পূর্ণ করিয়া জল তুলিতেছে, কেহ গণ্ডূষ ভরিয়া জল তুলিয়া তাহা বিন্দু বিন্দু করিয়া পান করিতেছে। এই জনস্রোতে যাহারা অর্দ্ধোলঙ্গভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের দেখিয়া কাহারও মনে কোনরূপ কুভাবের উদয় হইতেছে না ,—এ সময় সকলের মন এমন একটি পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ থাকে। তাহারা যেন পরস্পরকে দেখিতেও পাইতেছে না , কেবল এই নদী, আর ঐ তরুণ সূর্য্যদেব. তাঁহার হিরন্ময় কিরণ ও উজ্জ্বল প্রভাতই তাহাদের নয়নসমক্ষে প্রতিভাত। এই প্রভাতকাল কেবল বিস্ময়াকুল প্রশংসমান নেত্রে চাহিয়া থাকিবার জন্য। স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া রমণীগণ ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিতেছেন, তাঁহাদের দীর্ঘ মুক্ত কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত, পরিধানে নানাবর্ণের বস্ত্র, স্কন্ধে কলস লইয়া অনাবৃত বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া তাহা ধরিয়া চলিয়াছেন ; দেখিয়া বোধ হয়, যেন প্রাচীন গ্রীসের এক একটি ভাস্করমূর্ত্তি। পুরুষেরা ভাগীরথীতীরে বসিয়া ফোঁটা তিলক কাটিতেছে, কেহ বা শিবের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের অভিপ্রায়ে দেহে ভস্মলেপন করিতেছে ; অনেকেই ধ্যানস্থ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

এখানেও মৃতদেহ ও চিতার অভাব নাই, কিন্তু চিতানল প্রজ্বলিত হয় নাই। প্রভাতের এই আহ্নিক, তর্পণ ও পূজার্চ্চনায় সময়টি অতিবাহিত করিবার জন্য সকলেই অপেক্ষা

করিতেছে। ঐ যে জলের ধারে এক জন যোগী বসিয়া আছেন, দেহ নিশ্চল, যেন একটি পুত্তলিকা, তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন;—কোটরগত চক্ষু স্থির, যোগী পদ্মাসনে উপবিষ্ট, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, ললাটে শিবনামাঙ্কিত ছাপা, চক্ষু দুটি সূর্য্যের দিকে প্রসারিত, মুখে স্বর্গীয় আনন্দ উদ্ভাসিত। এই যোগীর পার্শ্বে একটি সবলদেহ যুবক অনাবৃতদেহে গণ্ডূষ-জল লইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার গৈরিক বস্ত্রে ছড়াইয়া দিতেছে। স্তবগাথা উঠিয়া যোগীর সমাধিস্বপ্ন মাধুর্য্যপূর্ণ করিতেছে। দুইটি হর্ষোৎফুল্ল হাস্যময় বালক যন্ত্র বাজাইতেছে। যোগীর পার্শ্ব দিয়া যে সকল পুরুষ ও রমণী যাইতেছেন, তাঁহারা একবার দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন;—প্রণামের সময় তাঁহাদের মুখ হাস্যপ্রফুল্ল হইতেছে, উভয় হস্ত সংযুক্ত হইতেছে; কিন্তু যোগীর ধ্যানভঙ্গের আশঙ্কায় কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

যোগীর মৃত্যু হইয়াছে, তিনি অনেকক্ষণ মরিয়াছেন, তাঁহার মুখ সূর্য্যদেবের দিকে ফিরান, যাহাতে নবোদিত সূর্য্যের রশ্মি তাঁহার মুখে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহারই জন্য মুখ ঘুরাইয়া রাখা হইয়াছে। এই লোকটির মৃতদেহের দাহ হইবে না, যোগী জনের মৃতদেহ দাহ করিবার আবশ্যক হয় না। ভাগীরথীগর্ভে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হইবে। চারি দিকে আনন্দ ও জয়ধ্বনি, যোগীর সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহার আত্মা জন্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে; জীবন ও মৃত্যুর গহ্বর হইতে তাহা উদ্ধার লাভ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে সমাগত কুকুর, কাক ও অন্যান্য পক্ষিগণকে অনাবৃতদেহ যুবক প্রহরী ধীরে ধীরে দূরে সরাইয়া দিতেছে; অতি ধীরে,—কারণ, এখানে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু নির্লজ্জ কাক পুনঃপুনঃ ফিরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে; কারণ, শবদেহ বিগলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কাক যোগীর গণ্ডদেশ তাহার কৃষ্ণবর্ণ পক্ষের দ্বারা স্পর্শ করিতেছে; যোগী যেন ধ্যানমগ্ন, ভগবৎপ্রেমে সমাধিস্থ,—মৃত্যুর পরও তাঁহাকে এইরূপ দেখাইতেছে।

দিবসে ও রাত্রিকালে সুপবিত্র বারাণসীধামের দৃশ্য এইরূপ।

প্রভাত-বায়ু।

সম্প্রতি Lancet নামক পত্রে প্রভাতবায়ু সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে নূতন জ্ঞাতব্য কথা আছে বলিয়া, আমরা উহা ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম।

রাসায়নিকদিগের কল্যাণে আমরা বহুদিন হইতেই জানি, বায়ু কি কি উপাদান সম্ভূত, শুধু তাই নয়, ইহাও তাঁহাদের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত যে, বায়ুর সেই উপাদানগুলির ভাগ সর্ব্বদা সকল অবস্থায় সমান থাকে—তা' সে বায়ু উচ্চ পর্ব্বতের হউক, বা ভূতলের সমুদ্রতটবাহী হউক; শস্পশ্যাম পল্লীক্ষেত্রে মুক্তগতিই হউক, অথবা গৃহজনাকীর্ণ বাধাপূর্ণ নগরীপথে রুদ্ধগতিই হউক। সুতরাং এই উপপত্তি অনুসারে, "বায়ু-পরিবর্ত্তনে" ("a change of air") কেন যে দেহীর হিতলাভ হয়, রসায়ন তাহার উত্তরদানে অসমর্থ।

বায়ুর উপাদান।

সকলেই জানেন, উষার সমীর কত শুদ্ধ মধুর, কেমন ক্লান্তিনাশক, আবার দিনমানে বায়ুর সে সকল মনোহর ধর্ম্ম কোথায় অন্তর্হিত হয়। প্রভাতের এই স্নিগ্ধ বাতাস আর অন্য সময়ের তপ্ত বাতাসে অনেক পার্থক্য। কিন্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণে উপাদানিক কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না। পরন্তু, এ কথাটিও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাত্রি ও দিনের নিয়মিত আবর্ত্তনে অনেক নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন নিয়ত ঘটিতেছে। রজনীমুখে বায়ুর উত্তাপ ক্রমশঃ কমিয়া যায়, আবার সূর্য্যোদয়ে বায়ু উত্তপ্ত হইতে থাকে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, কতক জলীয়াংশ (Moisture) বায়ু কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে পরিত্যক্ত ও গৃহীত হইতেছে। ইহাও সকলের অজ্ঞাত নহে যে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি রাসায়নিক ও তাড়িত ক্রিয়া বিকাশ পায়।

কারণ-নির্দ্দেশ ; শিশির।

উক্ত কারণেই হয় ত সাধারণ জলের অপেক্ষা শিশিরবিন্দুর শৈত্যসম্পাদক শক্তি অধিকতর। প্রাণীর জীবনস্বরূপ জল বলিয়াই, শিশির সঞ্জীবন-গুণসম্পন্ন নহে; পরন্তু, অনুপ্রাণিত করিবার বিশিষ্ট শক্তি শিশিরে আছে। জল হইতে শিশিরের এই স্বাতন্ত্র্য কেন? কারণ, শিশিরে অতিরিক্ত মাত্রায় Oxygen থাকে, এবং ইহার উৎপত্তির সময় Peroxide of Hydrogenও কতকটা উদ্ভূত হয়। ইহারই ফলে, সম্ভবতঃ, প্রাতঃসমীর এমন মনোহর ও তেজস্কারী। বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে বায়ুর যে এই সঞ্জীবন ধর্ম্ম তিরোহিত হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল ঐ অতিরিক্ত Oxygen, Ozone, বা Peroxide of Hydrogen (ইহাদের মধ্যে যেটাই হউক) নষ্ট হইয়া যায়।

আওতায় তৃণ।

ঘনপত্র বৃক্ষের তলে ('আওতায়') তৃণদল সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না—ইহা সকলেরই জানা আছে। সাধারণতঃ ইহার এই কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় যে, সেই বৃক্ষ মাটির সমস্ত পুষ্টিসাধন রস নিজেই শোষণ করিয়া লয়, কিংবা তৃণপুঞ্জকে প্রয়োজনীয় রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করে। কিন্তু এ সকল ব্যাখ্যার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। আমাদের মতে ইহার প্রকৃত কারণ অন্যরূপ; বৃক্ষের নিম্নস্থ তৃণগুলি এই জীবনদায়ী শিশিরে অভিসিঞ্চিত হইতে পারে না বলিয়াই, যথেষ্ট বৃষ্টি ও দিবালোকের অভাব না থাকিলেও, উহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। শিশিরই সম্ভবতঃ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর স্বাস্থ্যের জন্য সমধিকপরিমাণে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে "স্তবমালার"

"শিশিরবিন্দুসম তোমার করুণা দেব!
ঢাল ঢাল ইহাদের শিরে।"

মনে পড়ে না কি?

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। চৈত্র। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "কাব্যযুগ" পুরাতত্ত্ববিষয়ক সন্দর্ভ। এই সংখ্যায় ভূমিকামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক সত্যকামী ও সুপণ্ডিত, অধিকন্তু তিনি প্রাচীন ভারতে শ্রদ্ধাশীল। আশা করি, বহুবিতর্কজটিল কাব্যযুগে প্রবেশ করিয়া তিনি পথ হারাইবেন না। লেখক বলিতেছেন, "উপাদানের অভাবে সৌতিবিবৃত মহাভারত এবং প্রচলিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হইতেই, জ্ঞেয় কাব্যযুগের আরম্ভ ধরিয়া লইতে হইতেছে।" উপসংহারে দেখিতেছি, "সুবিধার হিসাবে প্রথমতঃ রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে কোনখানি অগ্রে রচিত হইয়াছিল, এই কথার যথাসাধ্য বিচারের পর, উভয় গ্রন্থের রচনাকাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।" বহুকাল পূর্ব্বে অধুনালুপ্ত "কল্পদ্রুমে" রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। আশা করি, লেখক তাহা দেখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তীর "খাসিয়া জাতি" প্রবন্ধটি বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক,—ভাষার মাধুর্য্য ও লিপিকৌশল থাকিলে আরও মনোরম হইত। "পাশ্চাত্যদেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা" নামক উপাদেয় প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর বিরচিত। লেখক বলেন, "ইউরোপবাসীদিগের ভিতর সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা হইবার নিম্নলিখিত তিনটি কারণ প্রধান,—১—ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক; ২—হিন্দু আইন-সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার। ৩—ভাষাতত্ত্বনির্ণয়।" আর একটি মুখ্য কারণ যে ইউরোপের স্বভাবসিদ্ধ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা, তাহাতে সন্দেহ নাই। "যে ইংরাজ সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করেন, তাঁহার নাম উইল্‌কিন্স। তিনি ভগবদ্গীতা সর্ব্বপ্রথম ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। * * * অধ্যাপক কাওয়েল সাহেব কলিকাতার সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ হইতে অবসর লইয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি হিন্দুদিগের দর্শন ও বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ভালরূপে পাঠ করিয়াছিলেন ও তৎসম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন।" অধ্যাপক কাওয়েল বাঙ্গলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার কৃত কবিকঙ্কণচণ্ডীর ইংরাজী অনুবাদ সম্প্রতি 'এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণ্যালে' প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমদাগোবিন্দ চৌধুরীর "গিলগিটের পুরাতন রাজ্যশাসনপ্রথা" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য "ব্রহ্মবালিকা ও তাহার প্রণয়কাহিনী" প্রবন্ধে কেবল 'কাহিনী' লিখিয়াই নিরস্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ উদ্ভট তর্কের অবতারণা ও মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। 'এক ঢিলে দুই পাখী শিকার করিবার' মত একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া লেখকের ভাষা ও সিদ্ধান্তের পরিচয় দিতেছি।—"রমণী ত শত্রু নহে ভোগবাসনাই শত্রু। সুতরাং নীতিমার্গে কাহারও পদস্খলন হইলে নারী যে তাহাকে পেছন হইতে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়াছে এ কথা যেমন খাটে না তেমনই পুরুষকে সুপথপ্রবণ করিয়াছে বলিয়া প্রশংসার পাত্র সে হইতে পারে না।" আমেন! কিন্তু দুর্ব্বল বাঙ্গালীর ক্ষীণ ভাষা এত ধাক্কা সহিয়া বাঁচিবে ত? লেখক আর এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"স্বাস্থ্যে সে চিরলোভমান।" 'চিরলোভমান' কি ব্রহ্মদেশীয় 'ঙ্গাপ্পি'র মত কোনও অপরূপ পদার্থ? যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গলা লেখেন, তাঁহাদের নিকট সমগ্র বঙ্গ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, এবং সম্পাদকগণের ঋণের পরিমাণ তদপেক্ষা আরও অধিক, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু মাসিকপত্রকে বাধিত করিবার পূর্ব্বে মাতৃভাষার একটু অনুশীলন—বাঙ্গলা-রচনার অন্ততঃ একটু চর্চ্চা করিলে হয় না? শুকদেব গোস্বামী ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন। এ কালের বাঙ্গালীও কলম ধরিয়াই 'লেখক' হন। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, সুতরাং আমরা নাচার। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর "প্রাচীনকালের জন্তু" প্রবন্ধটির এই সূত্রপাত,—চিত্রখানি

বেশ। "পুরাতত্ত্বের কয়েকটি কথায়" শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডল ২য় অনুবাক্ ২য় ঋক) 'আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্নেঃ' দেখিতে পাওয়া যায়। জননীগণ অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করুন। ইহার কি অর্থ হইবে, সন্তানশালিনী রমণী স্বামীর অনুগমনা করিবে? সম্ভব, কারণ অপুত্রকন্যকা রমণীর পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার পক্ষে তৎকালে কোনও অন্তরায় ছিল না। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর স্বমতের সহিত সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া প্রক্ষিপ্ত মতবাদের আশ্রয় লইয়াছেন। ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোনও ঐ মতবাদী। তাঁহারা বলেন, বস্তুতঃ উক্ত ঋকের পাঠ, আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্রে (জননীগণ অগ্রে যোনি অর্থাৎ গৃহ প্রবেশ করুন)। ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ পশ্চাৎকালপ্রবর্ত্তিত প্রথা সমর্থনের জন্য 'অগ্রে' শব্দকে 'অগ্নে' করিয়া দিয়াছেন।" এই অদ্ভুত মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"পরিবর্ত্তন কথিত ও লিখিত উভয় কালেই সহজসাধ্য সন্দেহ নাই।" তাঁহার সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ দশ বিশ কোটী হিন্দুর মনে একটু সন্দেহ থাকিতে পারে। ক্ষীণতম অনুমান ও বিন্দু-পরিমাণ সন্দেহের প্রমাণে 'ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্' ব্রাহ্মণগণকে ধূর্ত্ত বলিতে পারেন, জালিয়াৎ মনে করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তান চারু বাবু প্রত্নতত্ত্বের এই অপরূপ রত্নকণা রাজপথের আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ না করিয়া 'প্রবাসী'র 'পাগড়ী'তে পরাইয়া দিলেন কেন? বিলাতী বুট লেহন করিবার প্রবৃত্তি এ দেশ হইতে কবে লুপ্ত হইবে, তাহা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

উদ্বোধন। চৈত্র; ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। শ্রীম—রচিত "স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচারকার্য্য" প্রবন্ধটি প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। লেখক অসাধারণ পরিশ্রমে স্বর্গীয় মহাপুরুষ বিবেকানন্দের প্রকৃত ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। বিবেকানন্দের জড়মূর্ত্তির প্রতিরূপ নয়, তাঁহার ভাবনার, সংস্কারের, বিশ্বাসের জীবন্ত ছবি। বিশ্বাসী ভাবুক ভক্তের স্বচ্ছ মানস দর্পণে স্বর্গীয় স্বামীর যে স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহাই প্রতিফলিত দেখিতেছি। আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—"দেশের লোকের কিরূপে দারিদ্র্য-দুঃখবিমোচন হয়, তাহাদের কিসে সৎশিক্ষা হয়, কিসে তাহাদের ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, এই জন্য স্বামী সর্ব্বদা ভাবিতেন। কিন্তু তিনি দেশের লোকের জন্য যেরূপ দুঃখিত ছিলেন, আফ্রিকা-বাসী নিগ্রোর জন্যও সেইরূপ দুঃখিত থাকিতেন। শ্রীমতী নিবেদিতা বলেন, স্বামী যখন দক্ষিণ United States মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে আফ্রিকাবাসী (Coloured man) মনে করিয়া গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন, ইনি তাহা নহেন, ইনি হিন্দু সন্ন্যাসী ও বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ, তখন তাঁহারাই অতি সমাদরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'স্বামী, যখন আমরা তোমাকে বলিলাম, 'তুমি কি আফ্রিকাবাসী?' তখন তুমি কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে কেন?' স্বামী বলিলেন, 'কেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রো কি আমার ভাই নয়?' অর্থাৎ স্বদেশবাসী কি জগৎ ছাড়া? নিগ্রোকেও যেমন ভালবাসা, স্বদেশবাসীকেও সেইরূপ ভালবাসা, তবে তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকা, তাই তাদের সেবা আগে। এরি নাম অনাসক্ত হয়ে সেবা। এরি নাম কর্ম্মযোগ। সকলেই কর্ম্ম করে, কিন্তু কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। সব ত্যাগ করে ভগবানের অনেক দিন ধরিয়া নির্জ্জনে ধ্যান চিন্তা না করিলে এরূপ স্বদেশের উপকার করা যায় না। 'আমার দেশ' বলিয়া নয়, তাহা হইলে তো মায়া হইল;' 'তোমার (ঈশ্বরের) এরা,' তাই এদের সেবা করিব। তোমার আদেশ, তাই দেশের সেবা করিব; 'তোমারই এ কাজ,' আমি তোমার দাস, তাই এই ব্রতপালন করিতেছি, সিদ্ধি হউক অসিদ্ধি হউক, সে তুমি জান; আমার নামের জন্য নয়, এতে তোমার মহিমা প্রকাশ হইবে।" লেখকের সহিত আমরাও বলি, ইহাই 'যথার্থ স্বদেশহিতৈষিতা—Ideal Patriotism' ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "স্বামী বিবেকানন্দের পত্র" উপাদেয় বস্তু। তাঁহার উপদেশ বাঙ্গালীর পক্ষে সুপথ্য, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

পূর্ণিমা। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। "গদাই পুরুত" ও "মৃত্যুর পর" এখনও চলিতেছে। এক "হুগলী-কাহিনী" প্রবন্ধেই এই তিন সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই বিপুল প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ আছে। "জগন্নাথদেবের পুরীদর্শন" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাঞ্জিলাল বলিতেছেন,—"এই আনন্দবাজারের মাহাত্ম্য দেখিয়া অনেকে মনে করেন, ইহা বুদ্ধদেবের কীর্ত্তির পরিচায়ক; কিন্তু অপর দিকে দেখিতে গেলে ইহা হিন্দুহৃদয়ের সাম্য ও উদারতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।" কিন্তু হিন্দুর অন্যান্য তীর্থে 'হিন্দু-হৃদয়ের সাম্য ও উদারতা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যায় না কেন, লেখক তাহার কোনও কারণ-নির্দ্দেশ করেন নাই। আজ কাল রচনায় হিন্দুহৃদয়ের যতটা সাম্য ও উদারতা দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুর প্রকৃত জীবনে যদি তাহার অস্তিত্ব থাকিত!

নব্যভারত। চৈত্র। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেনের "কুমারসম্ভব" নামক প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। লেখকের একটি সিদ্ধান্ত এই,—"কেহ মনে করিবেন না, তিনি পার্ব্বতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যদি রূপে মুগ্ধ হইবার পাত্র হইতেন, তবে কামও ভস্মীভূত হইতেন না, পার্ব্বতীরও এত কঠোর তপস্যা করিতে হইত না। যদি একটি কদাকার লুব্জ-(ন্যুব্জ ?)-দেহ কুব্জপৃষ্ঠ রমণীও হইতেন, তাহা হইলেও মহাদেব তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতেন, সন্দেহ নাই; কারণ মহেশ্বর পার্ব্বতীর গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।" হায় কুমারসম্ভব! আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কবল হইতে তোমারও নিস্তার নাই! শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "বিক্রমপুরে বসন্ত" 'নব্যভারত'র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই গোবিন্দচন্দ্র দাস কি আমাদের চিরপ্রিয় সেই 'প্রেম ও ফুলে'র সুবিখ্যাত কবি? তাঁহার কি এমন অধঃপাত সম্ভব? যে ব্যক্তি আপনার মাতৃভাষার এমন ঘৃণাজনক বীভৎস কুৎসিত কল্পনার আরোপ করিতে পারেন, তিনি আমাদের অস্পৃশ্য। প্রবীণ সম্পাদক এই পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনায় 'নব্যভারত'কে কলঙ্কিত করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না। 'নিজের ছাগল' বলিয়া যদি 'ল্যাজের দিকে কাটিয়া' থাকেন, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ নাচার।

নবপ্রভা। চৈত্র। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "গীতার আবিষ্কার" পড়িয়া সুখী হইতে পারিলাম না। রহস্য-রস অতি অল্প,—নিষ্ঠুর বিদ্রূপের বিষ বড় তীব্র। ইহাতে প্রশান্ত হাস্যরসের অবকাশ নাই। রসি-কবির নিকট আমরা 'কোতরা গুড়' চাহি না, ফুলের মধুর প্রত্যাশা করি। মধুর বদলে হুলের খোঁচা কেন? তবে যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু রাজীবলোচনের মত বলেন,—

"চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত,
মৌমাছি খোঁচা যদি না রৈত?"

তাহা হইলে আমরা নিরুত্তর। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "সুবন্ধু" সুপাঠ্য প্রবন্ধ,—কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। "রাজা বল্লাল সেন" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রতিপন্ন করিতেছেন,—বল্লাল সেন কায়স্থ ছিলেন। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "ভৌতিকতত্ত্ব" প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য কি, বুঝিতে পারিলাম না।

ভীখণ।

বাঙ্গালার কোন এক অখ্যাত অজ্ঞাত গাঁয়ে
জন্মেছিল মোদের নায়ক ;
পিতা তার সে গ্রামের বয়োবৃদ্ধ মাতব্বর
সম্পন্ন কৃষক।

কোন্ সনে, কোন্ ক্ষণে জন্মিল ভীখণ মিঞা,
লেখে না তা কোন ইতিহাসে ;
তবু সে সর্ব্বস্বধন একটি আনন্দময়
স্নেহের আবাসে।

শিশুকালে মাতৃহীন, পিতার আছুরে ছেলে,
এইমাত্র জানি তার কথা ;
যায় নি সে বিদ্যালয়ে, পড়ে নি সে নীতিবোধ,
শিখে নি সভ্যতা।

তবুও সে বড় হ'ল, অবশেষে প্রেমে প'ল,—
বিস্ময়ের কথা তত নয়,
সহৃদয় ছিল যুবা, হারায়ে ফেলিল তাই
চপল হৃদয়।

দীন প্রতিবেশি-কন্যা, সোহাগী বালার নাম,
সেই তার মনের মানুষ ;
প্রেম ক্রমে বেড়ে গেল, মানিল না আর শেষে
লাজের অঙ্কুশ।

দুই জনে এক সাথে যুক্তি করে তলে তলে,
দু' জনাই জানিল তা বেশ,—
যদি না মিলন হয়, তবে আর এ জীবনে
সুখ নাই লেশ!

লাজ শঙ্কা এড়াইয়া জানা'ল পিতার কাছে
সব কথা একদা ভীখণ ;

গৃহকর্ত্তা ঘৃণারোষে করিলেন নামঞ্জুর
তার আবেদন।
সোহাগীর বংশদোষ, পাকাপণা, দুঃসাহস
বুড়ার আছিল চক্ষু-শূল ;
যুবা কিন্তু তারি মাঝে দেখিত আপন স্বর্গ,—
নিস্তারের মূল !
ফিরিবে পিতার মন—ভাবিয়া ভীখণ ক্লেশে
সংবরিল প্রথম উচ্ছ্বাস ;
সোহাগীর প্রাণে কিন্তু জাগা'ল জিঘাংসা সেই
প্রথম নৈরাশ।
ভীখণের বৃদ্ধ পিতা অচিরে পড়িল যবে
ভয়ঙ্কর সন্নিপাত-জ্বরে,
সোহাগী জানিয়া তাহা হাসিল বিষের হাসি
অন্তরে অন্তরে।
কে জানিবে এত কাণ্ড ?—চাপা মেয়ে বড় পটু
সংবরিতে হৃদয়-উচ্ছ্বাস,
কিন্তু সে ছিল না দক্ষ বানায়ে বিনা'যে কিছু
করিতে প্রকাশ।
অবশেষে এক দিন রোগীর টিপিয়া নাড়ী
বৈদ্য মুখ বাকাইল ভারি,
ভীখণে নিভৃতে ল'য়ে কহে পল্লী-ধন্বন্তরী
ঘন শির নাড়ি'—
"আর বেশী দেরি নাই।" ভীখণ পড়িল বসি' ;
কি জানি কি ভাবি' অবশেষে
মুমূর্ষুর শয্যা-পাশে দাঁড়াইল অশ্রু মুছি'
ম্লানমুখে এসে।
পুত্রেরে ইঙ্গিতে ডাকি', হাত তার বুকে রাখি',
কাতর নয়নে স্নেহ ভরি'
কহিল জড়িতকণ্ঠে,—"রহিল তোমারি সব,
দে'খ যত্ন করি ;

আর এক অনুরোধ, ঘরে এনো বধূ, কিন্তু
সোহাগীরে করো না বিবাহ ;
বাপের এ শেষ কথা মনে যেন থাকে, বাপু,
শুভ যদি চাহ !”
আর সরিল না কথা ; মুমূর্ষুর সর্ব্ব দেহে
ছেয়ে এল ঘন অবসাদ ;
অন্তিম নিমেষ বৃদ্ধ ফেলিল, শোকার্ত্ত পুত্রে
করি’ আশীর্ব্বাদ।
শোকের হঠাৎ ঝড়ে প্রণয়ের বাধা তরী
ভেসে গেল বহু—বহু দূরে ;
আবার ফিরিল যবে, বসিল সে হৃদয়ের
সারা কূল জুড়ে !
কিন্তু দুটি মুগ্ধ হিয়া মিলিল একদা যবে
বিবাহের অটুট বন্ধনে,
ভীখণের ক্ষুদ্র প্রাণ অজ্ঞাতে উঠিল কাঁপি’
সে মঙ্গল-ক্ষণে ;—
প্রত্যক্ষ করিল শূন্যে পিতার ভ্রুকুটী যেন,
শুনিল দারুণ অভিশাপ ;
বিবাহ বসিল নবা শুভদিনে হাসিমুখে,
বুকে চাপি’ তাপ।
স্মৃতি হ’তে ধু’য়ে গেল সে তাপ নিঃশেষে শেষে
প্রণয়ের স্নিগ্ধ পরশনে ;
চলিত প্রেমের চর্চ্চা অবিরাম কোণে পড়ি’
সোহাগী-ভীখণে।
জানা’ল প্রিয়ারে নবা কথা-ছলে, ঘটিল যা
শুভ দিনে অশুভ ব্যাপার,
পড়িতে লাগিল হাসি’ সোহাগী তা শুনি’, হাসি
থামে না তাহার !
কহিল,—“পুরুষ তুমি হয়েছিলে এই লাগি ?—
বিদ্যা সাধ্য জানা গেল সব !

সোহাগী বিষম মেয়ে, ভীখণ জানিত তাহা,
রহিল নীরব।
ভীখণের এই গুণে নাহি ছিল স্বামী স্ত্রীতে
কোন কালে কলহের ভয় ;
নিরীহ পতিরে বাক্যে যে পত্নী জ্বালায়, সে ত
ডাকিনী নিশ্চয় !
ছিল বটে ভারি মিল মনে মনে দুই জনে,
এরূপ ত বহু স্থলে থাকে ;
দম্পতিতে ঘটে নাই মতান্তরে মনান্তর
এক মিলে লাখে !
যাঁরা যুগ যুগ ধরি' পল্লীর সংবাদপত্র,
তাঁদেরি বিশেষ করুণায়,
ভীখণের স্ত্রৈণ নাম নানা অলঙ্কার সনে
রটিল পাড়ায় !
আপত্তি ছিল না কিছু যুবার তাহাতে, আরো,
করিত সে গর্ব্ব-অনুভব ;
কি করে নিন্দুকদল ? মাগিল অগত্যা ক্লেশে
শেষে পরাভব !
এইরূপে কাটে দিন ; অল্পেই সন্তুষ্ট যুবা,
নাই চেষ্টা, নাহি করে শ্রম ;
সংসারে অলক্ষ্মী এল, তবু তার নাহি দৃষ্টি,
নাহি ঘুচে ভ্রম।
সোহাগীর তাড়া খেয়ে ভীখণ জাগিত কভু,
সে শুধুই ক্ষণিক উৎসাহ ;
কাণাকাণি হ'ত কিন্তু—ভীখণের কাল,—এই
রূপসী-বিবাহ !
তবু কেটে যেত দিন, নাহি হ'ত অনাটন
তার ক্ষুদ্র সচ্ছল সংসারে,
সদ্য ভাগ্যবিপর্য্যয় যদি না ফেলিত তারে
অকূল পাথারে।

পৈত্রিক যা জোত জমী প্রায় সব নিয়ে গেল
অকস্মাৎ নদীর ভাঙ্গন ;
এ দিকে বাকীর লাগি' পাটোয়ারী করে তাড়া,
তর্জ্জে মহাজন।
বাস্তু ভিটা আর কিছু সামান্য নীরস জমী
কেবল রহিল অবশেষ ;
খামার উজাড় হ'ল, নগদ অমিত ব্যয়ে
হইল নিঃশেষ।
শেষকালে খত দিয়ে গ্রামবাসী কোনো এক
পরিচিত ব্রাহ্মণের কাছে
গোটা ঋণ লয়ে তবে শোধিল খুচুরা ধার ;
উপায় কি আছে ?
এর মধ্যে দুটি কন্যা জন্মিয়াছে ভীখণের,
তারা যেন ভীখণের প্রাণ ;
রুগ্ন শীর্ণ মেয়ে দুটি খর্ব্ব করেছিল শুধু
মাতৃ-অভিমান।
"তোরা ছেলে ন'স বলে" সোহাগী বকিত যবে,
ভীখণের হ'ত ভারি রাগ,
মেয়েদের বুকে টানি' করিত তখন আরো
দ্বিগুণ সোহাগ।
জুটে না দুধের কড়ি, বৈদ্যের দক্ষিণা আদি
রুগ্ন শীর্ণ কন্যা দুটি তরে ;
দরিদ্রের ভগবান, তাঁরো আশীর্ব্বাদে যেন
কিছু নাহি ভরে !
দেখেনি দুখের মুখ, প্রসন্ন প্রফুল্ল যুবা,
দুঃখ তারে করিল প্রাচীন ;
হাসি গেল, রঙ্গ গেল,—এত দিনে সত্য সত্য
হইল সে দীন।
সেই ঋণদাতা বিপ্র কহিলেন একদিন,—
"ভীখণ, কহিতে পাই লাজ,

বহু দিন পড়ে' আছে টাকাটা তোমার কাছে,
দিলে হ'ত কাজ।"
ভীষণ কহিল,—"যদি করিয়াছ উপকার,
ক্ষম মোরে আরো কিছু দিন।"
এত বলি' বহু কষ্টে সংবরিল আঁখি-জল
অভিমানে দীন।
বিপ্র ফিরাইলা মুখ; সে কি অশ্রু সংবরিতে?
হেসে কিন্তু গেলেন চলিয়া।
হেন কালে দাঁড়াইলা গ্রামের হরিশ মৈত্র
"ভীষণ!" বলিয়া।
দাদাঠাকুরেরে দেখি' ভীষণ সেলাম করি,
আস্তে ব্যস্তে চৌকি দিল টানি;
ভীষণে আশিষি' বিপ্র কহিলেন বহুবিধ
সান্ত্বনার বাণী।
অবশেষে কাছে ঘেঁসে চুপি চুপি কহিলেন,
"যুক্তি মোর রাখিও গোপনে,
তুমি সে ব্রাহ্মণ-পাশে কবে ধার করেছিলে,—
পড়ে কিছু মনে?
না পড়ুক, মোর মনে আছে সব, সাক্ষী ছিনু
খতপত্র লেখা যবে হয়;
দেখেছি হিসাব ক'রে, সে খতের নাই ম্যাদ,
করিও না ভয়।
অস্বীকার কর ঋণ, দায় হ'তে বাচ যদি,
শেষে মোরে যাহা হয়, দিও;
এ গ্রামে সবাই মোর মন্ত্রণায় উঠে বসে,
মোর কথা নিও।"
ভীষণ উঠিল গর্জ্জি',—"ঠাকুর, এখনি উঠ,
আসিও না আঙ্গিনায় মোর;
দীন ব'লে ভাবিয়াছ এত হীন তুমি মোরে,—
হ'ব আমি চোর?

কুটিলকটাক্ষে চাহি' সরিয়া পড়িলা দ্বিজ
মানে মানে শেষে কোন মতে ;
ভেবেছিলা বুঝি বিজ্ঞ,—এত বড় গণ্ডমূর্খ
নাহি ভূভারতে !
এ দিকে ভীখণ শেখ জমী আর হাল-গরু
ধীরে ধীরে করিল বিক্রয় ,
জানা'ল না কারে কিছু' ঋণের সমস্ত কড়ি
করিল সঞ্চয়।
যে দিন সমস্ত টাকা দেখিল হয়েছে জড়,
হাসিয়া সে মাতাইল বাড়ী ;
সোহাগী ভাবিল—বুঝি যা কিছু আছিল বুদ্ধি,
তাও গেল ছাড়ি' !
পরদিন অতিপ্রাতে উত্তমর্ণ বিপ্রপাশে
ভীখণ দাঁড়াল হাসি নিয়া ;
মুদ্রাগুলি রাখি' কাছে,—"তোমার স্নেহের ঋণ
শুধিব কি দিয়া !"
বিপ্র কহিলেন,—"থাম, দলীলটা দেখি আগে,
প্রাপ্য মোর হইয়াছে কত ,"
লাগিলা কষিতে অঙ্ক, পরিপক্ক সাবধান
হিসাবীর মত।
সহসা চমকি' উঠি' কহিলেন,—"মিছে শ্রম,
ম্যাদ গেছে, দেখিতেছি খতে ;
নিতে ত পারি না টাকা, ইহাতে নিষেধ আছে
হিন্দুশাস্ত্র মতে।"
সরল বিধর্ম্মী যুবা অবাক্ রহিল চাহি' ;
কহিল, "এ বিধি অভিনব,
তব কাছে ঋণী আমি, এ টাকা লইতে কেন
বাধা হবে তব ?"
হাসিয়া কহিলা বিপ্র,—"ম্যাদ গেছে,—ছল উহা ;
আমারি চক্রান্ত সে সকল ;

জীবনের স্বাদ মোর এসেছে ঘনা'য়ে যে রে,
তা ত নহে ছল!
আমিও যে তাঁর কাছে বহু ঋণে ঋণী আছি,
শুধিতে কি সাধ্য আছে মোর?
দয়ায় নির্ভর শুধু, দয়া মায়া তাঁরি বিধি,
দ্বিধা কেন তোর?
করিস্ না অবহেলা ক্ষুদ্রের এ উপকার!"
—এত বলি' ধরিলেন হাত;
ভীষণ রহিল স্তব্ধ, করিতে লাগিল শুধু
ঘন অশ্রুপাত।
সহসা পড়িল পদে, পারিল না ঠেলিবারে
মহাত্মার অযাচিত দান;
ভাষা কোন পাইল না কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের
আত্মহারা প্রাণ!
গৃহে ফিরি' গৃহিণীরে বলিল সকল কথা
বার বার মুছি অশ্রু-বারি;
সোহাগী শুনিল সব, গলিল না, টলিল না
সে অদ্ভুত নারী।
ভীষণ ভাবিল—এই দান-গ্রহণের লাগি'
ক্ষুণ্ণ হইয়াছে প্রিয়া মম;
তারো প্রাণে ছিল কি না, সেই অনুকম্পা কৃপা
চাপি' ভার সম!
ভাবিল সে—দৈন্যদশা ঘুচা'তে হইবে আগে;
ঋণ শোধা তারি শোভা পায়,
যারে দয়া দেখাবার সুযোগ না পায় কেহ;
কেহ নাহি চায়!
প্রথম অর্জ্জন-ফল সমর্পিব মহাত্মারে,
তবে পূর্ণ হবে কৃতজ্ঞতা;
তার পরে আছে মোর পরিবার, পরিজন,
আপনার কথা।

ধার্ম্মিকের পুণ্য অর্থ করি যদি পরিপাক

ঔদাস্যে আলস্যে এইরূপে।

ধর্ম্মে সহিবে না তাহা, করিবে সে পলে পলে

দগ্ধ মোরে চুপে।

অলস ভীখণ কাজে সহসা উঠিল মাতি',

কর্ত্তব্য হইল স্থির শেষে

ব্যাপারী নেয়ের দলে ভাগী হ'য়ে যাবে চ'লে

ব্যাপারে বিদেশে।

আসিল যাত্রার দিন, লইয়া অর্দ্ধেক পুঁজি,

বাকী সব সঁপি গৃহিণীরে,

বিদায় লইল কাঁদি', কন্যা দুটি কোল হ'তে

নামাইয়া ধীরে।

সোহাগী কহিল,—"গিয়ে পাঠা'য়ো খবর কিন্তু,

বিদেশে রহিও সাবধানে।"

ভীখণ চলিয়া গেল ফিরে ফিরে চেয়ে চেয়ে

প্রিয় গৃহ পানে।

শিশুরা উঠিল কাঁদি', সোহাগী ভু'লায়ে দোঁহে

রেখে দিল ঘুম পাড়াইয়া।

বহু দিন গেল চলি', ভীখণ দিল না চিঠি;

এল না ফিরিয়া।

চৈতালি আসিল ঘরে, আমগাছে কুঁড়ি এল,

ফল ফ'লে পেকে' গেল ঝ'রে;

সমস্ত আকাশ শেষে ঢেকে গেল কালো মেঘে,

নদী গেল ভ'রে।

গেল রথ, মহরম—পল্লীর উৎসব কত,

শীত গেল, বসন্ত ফুরা'ল;

কত পিক ডেকে ম'ল, কত বেলা ঝ'রে প'ল,

চামেলী শুকা'ল;

বুধীর বাছুর হ'ল, পরাণের বিয়ে গেল;

আরো কত ঘটিল ঘটনা।

ভীখণ এল না তবু, সোহাগী বৃথায় দিন
করিছে গণনা।
তার পরে, সেই নৌকা আসিল ফিরিয়া গাঁয়ে,
সে নেয়েরা ফিরে এল দেশে ;
সোহাগীরে পত্র দিয়ে, "ভীখণ ভালই আছে"
জানাইল এসে।
ভীখণ লিখেছে লিপি,—কত ঘরকন্না কথা
জানিতে চেয়েছে বারে বারে,
কত বড় হইয়াছে মেয়ে দুটি তার এবে,
খোঁজে কি না তারে !
পাঠায়েছে হৃদয়ের সমস্ত মমতা প্রেম
খালি ক'রে যেন চিঠি মাঝে,
লিখেছে, ফিরিবে শীঘ্র, আসিতে পারেনি শুধু
ঠেকে গিয়ে কাজে।
বাবার খবর জানি' মেয়ে দুটি এক দণ্ডে
শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল মাকে,
সোহাগী পড়া'য়ে চিঠি জবাব লিখায়ে তার
পাঠাইল ডাকে।
যেমন প্রত্যহ যায়, তেমনি হেসেলে গেল,
কিন্তু আর পারে না কুলাতে,
ভীখণ আসিবে কবে ? এ দিকে সমস্ত পুঁজি
লাগিল ফুরা'তে।
লিখিল অনেক পত্র—দৈন্যদশা জানাইয়া,
কিন্তু কোন পেল না জবাব।
ভীখণের কোথা অর্থ ?—ভাবিল ফিরিব দেশে,
লিখে তা কি লাভ ?
দারিদ্র্যের বিভীষিকা বসিল চাপিয়া ক্রমে
সোহাগীরে ঘিরে চারি ধার ;
হেন কালে যা ঘটিল, ক্ষুদ্র গ্রামখানি তাহে
হ'ল তোলপাড় ।—

পল্লীজমীদার-কন্যা স্নান ক'রে ঘরে গেল,
ফেলে' গেল ভুলে স্বর্ণহার।
সোহাগী আসিয়া ঘাটে দেখিতে পাইল তাহা,
লোভ হ'ল তার ;
ভাবিল সে, ভাল মন্দ কি আছে কপালে কার,
কেহ তাহা বুঝিতে কি পারে ?—
ভবিষ্যতে কোন দিন দেখিতে বা পাবে কাজ
বহুমূল্য হারে।
হার ছড়া লুকাইয়া ঘরে সে রাখিল তুলে ;
তার পরে নিত্যকার মত
গৃহকাজে দিল মন। এ দিকে সে শূন্য ঘাটে
খোঁজ হ'ল কত ;
জলে স্থলে তন্ন তন্ন খুঁজি' সবে অবশেষে
হারাইল ভরসা পা'বার।
সোহাগীর কতবার মনে হ'ল—ফিরে দিই
কৌশলে সে হার।
যদিও সে ছোটবেলা ছোট-খাট হেন কাজ
অসঙ্কোচে করেছে বিস্তর,
তবু গুরু অপরাধ—ইহাই প্রথম তার
বড় হ'লে পর ;
প্রথম দুষ্কার্য্য তরে তাই অনুতাপ গ্লানি
সহিল সে অন্তরে অন্তরে ;
দারিদ্র্যের বিভীষিকা রাখিল প্রবোধি' তারে
প্রলোভন ধরে'।
এ প্রবোধ ছিল তার—দরিদ্র ভীখণ এসে
প্রশংসিবে তাহার চাতুরী।
সে চরিত্রে মোহ শুধু দেখেছিল মূঢ়া, কিন্তু
দেখে নি মাধুরী !
এ দিকে করিল যাত্রা ভীখণ আপন দেশে,
ব্যাপারে হয়েছে বহু ক্ষতি ;

মূলধন খোয়াইয়া, পুঁজি-পাটা চুকাইয়া,
সহিয়া দুর্গতি,
ফিরিছে সে গৃহপানে ;—তবুও তাহার প্রাণে
আনন্দের খুলেছে ফোয়ারা,
প্রিয়া আর কন্যাদের লভিছে মিলনসুখ
স্বপ্নে মাতোয়ারা !
মূল্য দিয়া পারে নাই ক্রয় করিবারে কিছু,
আসে নাই তবু রিক্তকরে,
এনেছে সুন্দর দুটি উপল সেখান হ'তে
শিশু দুটি তরে !
শুক্লা সপ্তমীর শশী যখন ডুবিয়া গেল,
তখন সে পেল নিজগ্রাম ;
পথে নাই জন প্রাণী, ডাকিছে আঁধারতলে
ঝিল্লী অবিশ্রাম।
সবল সাহসী যুবা সহসা উঠিল কাঁপি',
যেন কারো ছায়া দেখি' কাছে,
চলিল সে ছায়ামূর্ত্তি ঘন অন্ধকারে মিশে
ভীখণের পাছে !
ভীখণ চলিল দ্রুত, ছায়াও দৌড়িল সাথে
শেষে তারি পিতৃ-রূপ ধরি' ;
মিলাইল অন্ধকারে, ভীখণের অন্তরাত্মা
উঠিল শিহরি' !
অবিলম্বে উত্তরিল আপানার গৃহাঙ্গনে
ভীখণ, প্রিয়ারে ডাকি' ধীরে ;
পালিত কুকুর জাগি' সেই শব্দে চীৎকারিয়া
ছুটিল বাহিরে।
সোহাগী তখনো ছিল জাগিয়া শয্যায় শু'য়ে,
ডাক শুনি চকিতহৃদয়ে
আস্তে ব্যস্তে দ্বার খুলি' বাহিরে আসিল উঠে
দীপ হাতে ল'য়ে।

উল্লাসে উচ্ছ্বাসে কিছু পারিল না সুধাইতে,
হাতের প্রদীপ গেল পড়ি’,
তা’ না হ’লে ভীখনের রুক্ষ শুষ্ক মুখ দেখি’
উঠিত শিহরি’।
সোহাগী ছুটিয়া গেল গৃহে জ্বালাইতে দীপ,
কাঁপিতেছে তখনো ভীখণ,
মুছিয়া ললাটঘর্ম্ম, নিশ্বাস ফেলিয়া, যত্ন
বাঁধিল সে মন।
পশি’ গৃহমাঝে যবে হেরিল ঘুমা’য়ে আছে
কন্যা দুটি গলাগলি করি,’
চেয়ে চেয়ে, শুধু চেয়ে শান্তি যেন এল ছেয়ে
তার প্রাণ ভরি’!
জাগাতে চাহিল ডাকি’ সোহাগী তাদের যবে,
ভীখণ করিল নিবারণ,—
“কাল্ই ত গো হ’বে দেখা, ভাঙ্গা’বে ওদের ঘুম
কেন অকারণ?”—
বিরহিযুগলে হ’ল নিমেষে কতই কথা,
লেখা-জোখা নাই কিছু তার;
ভীখণ কহিল হাসি’—“হারায়েছি সব পুঁজি,
এই ত ব্যাপার!
এখনও যদি পাই আর কিছু মূলধন,
সব ক্ষতি কুলা’য়েও শেষে
বহু লাভ হ’তে পারে; কিন্তু ঋণ পাব না’ক
কারো কাছে দেশে।”
সোহাগী কহিল,—“যদি পারি দিতে হাতে হাতে
মূলধন, কি দিবে দাসীরে?”
“দিব এই”—বলি’ সেও হাতে হাতে দিল কিছু
লুব্ধা প্রেয়সীরে।
সোহাগী সিন্দুক খুলি’ আনিল বাহির করি’
ঝল্ মল্ সুবর্ণের হার,

জানাইল অকপটে কেমনে সে পেল তাহা,
হ'য়ে নির্ব্বিকার !

—অকস্মাৎ চমকিয়া ভীষণ সরিল দূরে,
দ্বার খুলি' বাহিরিল বেগে ;

সোহাগী ছুটিল পাছে, সঘনে কাঁপিছে বুক
শঙ্কার আবেগে !

"কি করিলি ! কি করিলি !"—চীৎকারি' উঠিল যুবা
ঘন ঘন কর হানি' শিরে ;

সোহাগী কহিছে,—"যদি ক'রে থাকি অপরাধ,
ক্ষম অভাগীরে।"

প্রিয়া তার ক্ষুদ্র চোর,—অভিমানী ভীষণেরে
এ স্মৃতিতে করিল পাগল ;

ভুলিতে চাহিল যুবা, ভুলিতে নারিল তাহা
করি' কোন ছল।

সেই ছায়ামূর্ত্তি-স্মৃতি সহসা স্মরণে এল,
নয়নে জ্বলিল তীব্র তাপ ;

শূন্যে মুষ্টি হ'ল বদ্ধ, বাহিরিল অসম্বদ্ধ
বিলাপ প্রলাপ।

ভূতলে সোহাগী পড়ি' করিতেছে অনুনয়
জড়া'য়ে চরণ দুই হাতে,

ছুটিল উন্মত্ত যুবা অকস্মাৎ প্রেয়সীরে
ঠেলি' পদাঘাতে।

তখনি বালিকা দুটি চীৎকারি' উঠিল স্বপ্নে,
আপনি ঘুমা'ল পুনরায় ;

ভীষণ আঁধারে একা মিলায়ে মিশায়ে গেল
কে জানে কোথায় !

পদানত পতি পাশে সোহাগী লাঞ্ছনা, ঘৃণা
কোন কালে পায় নাই হেন ;

—অপমানে অভিমানে ফুলিতে লাগিল বালা
ক্রুদ্ধ ফণী যেন।

কহিল,—“কি ক্ষতি ? যাও, কিছু দুঃখ নাহি মোর,
ভালবাসা যাও যদি ভুলি’ ;
ভেব না এমন মোরে, তোমার আঘাতে আমি
হ’য়ে যাব ধূলি !”
এত বলি’ ত্রস্তে উঠি’ গৃহে পশি’ সশব্দে সে
রুধি’ দিল গৃহের দুয়ার ;
ভুলিতে নারিল তাহা, বুকে চাপি’ রয়েছে যে
অপমান-ভার,
সারাটি রজনী জাগি’ শয্যায় লুটিল পড়ি’
তারি মর্ম্মান্তিক যাতনায়।
প্রভাতে সমান তেজে আরম্ভিল গৃহকাজ
নিত্যকার প্রায়।
হা ভীখণ, তুমি উচ্চ ! এই ভাব, এ গৌরব
সোহাগী কি বহিতে না পারে ?
নারী কি রে নর-দেবে দূর হ’তে পূজা দেয়,
প্রাণ দিতে নারে ?
সে কি চাহে ধূলার মানবে, যার আছে ক্রটী,
অপূর্ণতা আছে বহু ঠাঁই ;
তারে তারা বুঝে, ভজে ;—তার ভাগ্যে জড়ায়ে কি
দহে,—হয় ছাই ?
হেথা সোহাগীর দম্ভে শ্রান্তি এল ; ভালবাসা
তখনো তাহারে ছাড়ে নাই ;
কিন্তু আপনার চেয়ে কেহ তার প্রিয় নয়,
হ’ল জয়ী তাই !
বক্ষ ভেদি’ কারো কথা উঠিতে চাহিত যবে,
সোহাগী চাপিত মুখ তার ;
তবু কারো প্রতীক্ষায় ছিল বহু দিন ;—সে ত
ফিরিল না আর !
ভীখণ যে এসেছিল, এ কথা সোহাগী ছাড়া
কোন দিন জানিল না কেহ ;

সে যে আর বেঁচে নাই, এ বিষয়ে কারো কোন
ছিল না সন্দেহ।
মেয়ে দুটি ল'য়ে পরে সোহাগী নূতন বরে
হাসিমুখে স'পিল পরাণ;
ভীষণের আলোচনা গ্রাম হ'তে একেবারে
পাইল নির্ব্বাণ।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

বাজে খরচ।

১

পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের অজীর্ণ রোগ হয়। এক বৎসরের পর অন্য বৎসর ভেড়ার পালের মত একে একে চলিয়া গেল, কিন্তু চাটুর্য্যের অজীর্ণ রোগ সারিল না।

চল্লিশের কোঠায় পদার্পণ করিয়া চাটুর্য্যের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হইল। উভয়ের অনুকম্পায় চাটুর্য্যে বুঝিতে পারিলেন যে, বাজে খরচই অজীর্ণ রোগের কারণ।

কিন্তু এ কথা কাহাকেও বলিলেন না।

কোন গূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম হইলে, জীবশরীরে একটা না একটা লক্ষণ প্রকাশ পায়। হরিহরেরও তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ, হরিহর সামান্য কারণেই চটিতে আরম্ভ করিলেন।

চাটুর্য্যের চুল পাকিতে আরম্ভ করিল। শরীরের মসৃণ চর্ম্ম শুষ্ক ও বিলোল ভাব ধারণ করিল। সকলে বলিল, "মধ্যমনারায়ণ তৈল মাখ, এবং মকরধ্বজ খাও।"

চাটুর্য্যে বলিলেন, "চুল পাকিলে এবং চর্ম্ম শুষ্ক হইলে কিছু আসে যায় না। অতএব বাজে খরচের আবশ্যকতা নাই।" ইহা বলিয়াই পুনরায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পাকাচুলের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল।

দেহের গঠন ও আবরণের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত চাটুর্য্যে হাফ্ বুট ছাড়িয়া স্থায়িভাবে ঠন্‌ঠনিয়ার চটি ধরিলেন। মৎস্য ছাড়িয়া নিরামিষ, দুগ্ধ ছাড়িয়া দধি ও ঘোল, গয়ার তামাক ছাড়িয়া বিষ্ণুপুরের চারি সের দরের তামাক, ফরাসডাঙ্গার ধুতি ছাড়িয়া মোটা থান, কোমল শয্যা ছাড়িয়া কেবল কম্বল, এবং সংসারের কচকচি ছাড়িয়া কেবল শিবের স্তোত্র লইয়া চাটুর্য্যে নূতন জীবনের পত্তন করিলেন।

চাটুর্য্যের গৃহিণী বাপের বাড়ী গিয়াছিল। এক মাসের মধ্যে স্বামীর জীবনে এহেন ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু দিশাহারা হইয়া পড়িল।

রমাসুন্দরী বলিল, "যখন সবই ছাড়িলে, তখন আমাকে ছাড়িয়া একটা ঝি লইয়া ঘর সংসার কর।"

যদিও রমাসুন্দরী অনেক রাগে এ কথা বলিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন অশ্লীলতার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং চাটুর্য্যে প্রথমে ভাবিলেন, কথাটা মন্দ নয়, অনেক বাজে খরচ কমিয়া যাইবে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিয়া দেখিলেন, সেটা কোন কাজের কথা নয়।

সুতরাং একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া চাটুর্য্যে বলিলেন, "সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন বড় কঠিন কাজ, চালাকীর কথা নয়। একটু ধীর হও, এবং ভাবিয়া দেখ, ভবিষ্যতের দিকে তাকাও, মানবজন্মের উদ্দেশ্য কি, তাহাও বুঝিতে চেষ্টা কর।"

রমাসুন্দরীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে তদ্দণ্ডেই দুই টাকা বার আনা পাচককে, এবং এক টাকা তের আনা ঝিকে চুকাইয়া দিয়া, চাটুর্য্যের শীর্ণ সংসারবৈরাগ্যজীর্ণ পা দুখানি কোমল করতল দ্বারা টিপিতে গেল।

চাটুর্য্যে বলিলেন, "আমার সেবা করিবার কোন দরকার নাই; আগে আত্মসেবা, আত্মদৃষ্টি ও আত্ম-অবলম্বন শিক্ষা কর।"

রমাসুন্দরী বলিল, "তবে আমার মাথার বেণীটা খুলিয়া দাও।"

বেণীবন্ধন খুলিতে চাটুর্য্যের তিন ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। খোকা দুগ্ধ না পাইয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অতএব "বডি" খুলিবার আর সময় হইল না।

চাটুর্য্যে মনে করিলেন, "ঝিটা আরও দুই দিন থাকিলে ভাল হইত। এ সব যন্ত্রণা আমার ভোগ করা অসম্ভব।"

কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না। আরও চটিয়া গেলেন। তাহাতে কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না।

২

রমাসুন্দরীর ভ্রাতা যদুনাথ প্রাতঃকালে চাটুর্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দেশে রওনা হইল। যাইবার সময় সে চাটুর্য্যের প্রতি একটু কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,

"দিদিকে একটু দেখ্‌বেন, বাপের বাড়ীতে কখনও কষ্ট পায় নাই, আর বিশেষতঃ এই সময় প্লেগ রোগে অনেক লোক মরিতেছে।"

হরিহর চাটুর্য্যে চটিয়া লাল হইলেন।

"তোমরা প্লেগের কি বোঝ ভায়া? এই দেখ, পূর্ব্বে এক একটা সংসারে কত আত্মীয় কুটুম্ব রোগে মারা পড়িত,—আজ ছেলে, কাল পিতা, পরশু শ্যালক প্রভৃতি; কিন্তু গেল দশ বৎসরের মধ্যে কয়টা লোককে মরিতে দেখিয়াছ? ইহা কেবল বিশ্বনাথের কৃপা বলিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কৃপাবৃদ্ধি হইলে ক্রমে বংশবৃদ্ধি হইয়া যাইবে, তখন লোকে খাইবে কি? কাজেই হঠাৎ অধিক সংখ্যায় মৃত্যু হইতেছে। যাহা হউক, আমি ইতিপূর্ব্বেই 'লাইফ ইন্সিওর' করিয়াছি, কোন ভয় নাই।"

যদু চলিয়া গেলে চাটুর্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম আসিয়া বলিল, তাহার স্কুলের বেলা হইতেছে, এখনও হাঁড়িতে ভাত চড়ে নাই।

চাটুর্য্যে। কেন?

রাম। মাছ আসে নাই।

চাটুর্য্যে। তোমরা মাছ ছাড়িয়া দাও না কেন?

রাম। তরকারীও নাই।

চাটুর্য্যে আবার চটিলেন। "তোমার মাকে কে বলিয়াছিল যে, ঝিকে ছাড়াইয়া দাও? এত বড় সংসারে একটা চাকর না রাখিলে চলিবে কেমন করিয়া?"

যাহা হউক, চাকর নিযুক্ত না করিয়া চাটুর্য্যে স্বয়ং মাধব বাবুর বাজারে গেলেন, এবং মৎস্য তরকারী প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। ইত্যবসরে রাম বৈঠকখানা ফাঁকা পাইয়া পিতার বাক্স হইতে পাঁচ টাকা চুরি করিল।

চাটুর্য্যে ফিরিয়া আসিলে রমা মাছ কুটিতে বসিল, এবং চাটুর্য্যে খোকাকে বাহিরে আনিয়া দৈনিক হিসাব মিলাইতে বসিলেন।

দেখিলেন, পাঁচ টাকা দশ আনা কম্‌তি পড়িতেছে। ক্রমেই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে খোকা চেষ্টাপূর্ব্বক দোয়াতের কালি শুভ্র বিছানায় ঢালিয়া ফেলিল।

দুই বৎসরের বালকের এবংবিধ গর্হিতাচরণ দেখিয়া চাটুর্য্যে খোকার পৃষ্ঠ-দেশে একটা কঠিন ওজনের চাপড় মারিলেন। আদরের খোকা জীবনসংগ্রামে এই সর্ব্বপ্রথম চড় খাইয়া প্রথমতঃ নীলবর্ণ হইয়া গেল, এবং তৎপরে মাণিক-তলার দীঘি ব্যাপিয়া একটা 'রীড-পাইপে'র মত চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্রমেই রমাসুন্দরী ও পাড়ার লোক জুটিল। চাটুর্য্যে বেগতিক দেখিয়া অনাহারে চটিজুতা পায়ে আপিসে গেলেন। পুত্র রাম না খাইয়া খোকার পৃষ্ঠদেশে কনক-ধুতুরার প্রলেপ দান ও গরম সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিতে বসিল, এবং মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া খোকার যন্ত্রণার সহিত চিত্রাতেতালায় মাত্রা দিতে লাগিল।

বিড়াল মৎস্য খাইয়া গেল; এক জন সমদুঃখিনী প্রতিবাসিনী আসিয়া এক বাটী তৈল চুরি করিয়া লইয়া গেল; রাম স্কুলে "লেটে" গিয়াছে বলিয়া হেড-মাষ্টার স্মরণার্থ চারি আনা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

সে রাত্রিকালে কে কোথায় শুইয়া থাকিল, তাহা বলা যায় না; কিন্তু ফলে শ্মশানভীতির মত একটা ভাব প্রাঙ্গণে খেলা করিতে লাগিল। প্রদীপও জ্বলে নাই।

৩

প্রাতঃকালে শিবস্তোত্র পঠিত না হওয়াতে শিবলোকে ভক্তিলহরীর অভাব হইয়া-ছিল কি না, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সারা দিনরাত্রি উপবাসের পর সপরিবার "চাটুর্য্যে অ্যাণ্ড সন্‌স্" কোম্পানীর ক্ষুধার জ্বালায় কাহারও দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না।

এরূপ স্থলে কেন্দ্রস্থান আক্রমণই বৈজ্ঞানিকী প্রথা। হরিহর চাটুর্য্যে চটি খুলিয়া রমাসুন্দরীর ঘরে গেলেন।

অবশ্যই প্রথমে খোকার প্রতি পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার ও স্ত্রীর প্রতি পশুবৎ আচরণ প্রভৃতি যথাবিনীতভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া, এবং অধীনতা, অজীর্ণরোগ প্রভৃতির বিশেষ কারণ দর্শাইয়া, এবং প্রত্যেকবারই কেন্দ্রস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াও চাটুর্য্যে নিরুৎসাহ হইলেন না। ক্রমে আধ্যাত্মিকতা, কর্ম্মভোগ প্রভৃতি বৃহৎ রকমের দার্শনিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াও যখন কোন ফল দর্শিল না, তখন হস্তধারণ ও "খোকার মাথা খাও" এবং "আমার মাথা খাও" প্রভৃতি মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা উপায়ে অবশেষে চাটুর্য্যে রমাসুন্দরীর সহিত একটা আপাততঃ ছোট খাট রকমের সন্ধি স্থাপন করিলেন।

সন্ধির সর্ত্তের মোতাবিক চট্টোপাধ্যায়কে মাছ কুটিতে হইল, খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইতে হইল, বাজার ত করিতেই হইল। তবে এ যাত্রা বাটনা বাটিতে হইল না।

চাটুর্য্যে চারিটি অন্ন মুখে দিয়া আপিসে গেলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেলা তিনটার সময় পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। অজীর্ণরোগীর হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা কল্পনাতীত। অতএব চাটুর্য্যে সঙ্গে একটা পয়সাও আনেন নাই। পূর্ব্বে কোন কোন বন্ধু পাণ্টা ভদ্রতার খাতিরে দুই চারি পয়সার জলখাবার চাটুর্য্যেকে দান করিত, কিন্তু এখন মূল ভদ্রতার প্রস্রবণ বাজে খরচ রুদ্ধ হইয়া যাওযাতে সে সুখ আর কপালে ঘটিল না। কাজেই আট আনার জলখাবার ধার করিয়া এক বেলাতেই চাটুর্য্যে গলাধঃকরণ করিলেন।

এ কথা চাটুর্য্যে কাহাকেও বলিলেন না।

সন্ধ্যার সময় বাটী আসিয়া পুনরায় গৃহকর্ম্মরত চাটুর্য্যের ঘন ঘন উদ্গার উঠিতে লাগিল। বাজারের জলখাবার খাইয়া এরূপ দুরদৃষ্ট সঞ্চয় করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, এবং পাছে মূল কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই কারণ হরিহর ভাত খাইতে বসিলেন।

রাত্রি দশটার সময় রমাসুন্দরী বলিল, তাহার জ্বর হইয়াছে। প্লেগের সময় হঠাৎ জ্বর একটা বিশেষ আতঙ্কের কথা, সুতরাং বাক্যব্যয় না করিয়া চাটুর্য্যে ডাক্তার ডাকিতে গেল। ডাক্তার বলিলেন, এখনও লক্ষণ বুঝা যাইতেছে না; পরদিন দেখিয়া যাহা হয় স্থির করিবেন, অদ্য কেবল দুই টাকা দর্শনী ও অষ্ট আনার ঔষধেই চাটুর্য্যে পার পাইলেন।

রুগ্নার শুশ্রূষার নিমিত্ত একটা ঠিকা ঝি ডাকিতে হইল। ঝির সম্মুখে রন্ধন ও মাছ কুটা প্রভৃতি নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত পাচক ও চাকরের পুনরধিষ্ঠান হইল।

চাটুর্য্যে অনেকটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু যখন দ্বিপ্রহর নিশীথে ঘুমন্ত খোকার ও অর্দ্ধঘুমন্ত রমাসুন্দরীর শিয়রে জাগিয়া চাটুর্য্যে অদৃষ্ট-জঞ্জালের কথা ভাবিতে লাগিলেন, তখন পুনরায় তাঁহার অগ্নিমান্দ্য ও বায়ু বর্দ্ধিত হইল। ভাবিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ মরিয়া গেলে আপদ চুকিয়া যায়।

কাজেই পাকাচুলের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল।

৮

এইরূপ অবস্থাগত স্পন্দনে ক্রমে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের জ্ঞানের বিকাশ

হইতে লাগিল, এবং তিনি অচিরাৎ দুই একটি সার সত্যের আবিষ্কার করিলেন। তাহা এই :—

১। বাজে খরচ বৃদ্ধি পাইলে অজীর্ণতাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

২। অজীর্ণতা কমাইতে গেলে বাজে খরচ বাড়াইতে হয়।

সুতরাং

৩। বাজে খরচ বাড়াইলে অজীর্ণতার হ্রাসও হয়, এবং বৃদ্ধিও হয়।

ইহার মধ্যে কতটুকু সত্য এবং কতটুকু অসত্য, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, চট্টোপাধ্যায় যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না।

সংসারে স্বীয় মতের পোষকতা করিলে সকলেরই আনন্দ হয়; কিন্তু জগতের নিয়ম এই যে, কেহই কাহারও মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করে না।

পরদিন যখন পত্নীর জ্বরের অনেকটা উপশম দেখা গেল, তখন চাটুর্য্যে বলিলেন, আর ডাক্তারকে ডাকিয়া কাজ নাই।

রমাসুন্দরী কোন কথা না কহিয়া ভাত খাইতে বসিয়া গেলেন।

চাটুর্য্যে বলিলেন যে, ভাত খাওয়াটা উচিত নয়। এ মতভেদের ঐক্য হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। শেষে নিরুপায় হইয়া পুনরায় দুই টাকা দর্শনী দিয়া ডাক্তারকে ডাকিতে হইল। ফলে, ডাক্তার বাবুর মতে ভাত খাওয়াই সুসিদ্ধ হইল।

মতভেদ হইলেই খরচ বাড়িয়া যায়। তাহা কে না জানে? শাসনপ্রণালী, দেশের আয় ব্যয়, পূর্ত্তবিভাগ ও বহুতর বিরাট ব্যাপারে মতভেদ হইলে কত কমিশন বসিয়া থাকে, কত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং এই সামান্য মতভেদে যে দুই টাকা খরচ হইয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু যে অন্তর্নিহিত অনলরাশি চাটুর্য্যে মহাশয়কে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা ত দুই টাকায় নিভিল না! কাজেই চাটুর্য্যে ক্রমশঃ একটা রবিবার পাইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

চাটুর্য্যে কোনও সূত্রে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রামই পাঁচ টাকা বাক্স হইতে চুরি করিয়াছিল। এ বিষয় রামের নিকট উত্থাপন করা নিতান্ত কাপুরুষতা মনে করিয়া রামের মাতার নিকটই উত্থাপিত করিলেন।

রামের মাতা রামকে তাহা জানাইল। রাম স্বীয় চরিত্রমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি ত বাবার মত আপিসে ঘুস লই না।"

"তবে রে ব্যাটা!" বলিয়া চাটুর্য্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। রামও দৌড়িল। রাম একালের ছেলে। ফুটবল ও হাড়ুডু প্রভৃতি খেলিতে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। সুতরাং দুই লাফে সে কালীমন্দির পার হইয়া চোরবাগানে সহপাঠী অধরের বাটীতে আশ্রয় লইল।

চাটুর্য্যে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন, এবং রমাসুন্দরীকে ধিক্কার দিলেন। দ্বাপরের পিতৃসত্যপালনরত রামচন্দ্রের সহিত কলির রামের শোচনীয় পার্থক্য ও বঙ্গদেশের অধঃপতন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

গৃহিণী বলিল, "বাছা হয় ত দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছে।"

চাটুর্য্যেরও তাহাই সন্দেহ হইল; এবং রমাসুন্দরীর ক্রন্দন দেখিয়া সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। ক্রমে তিনি স্থির করিলেন যে, রামকে মাসে মাসে কিছু না দিলে সে যে চুরি করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

৫

রাম স্বীয় কোদণ্ড শরাসন প্রভৃতির উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া নিঃশব্দে সন্ধ্যাকালে বাটী আসিল, এবং দুই বেলার মাছের ঝোল, তরকারী ও দুগ্ধ একেবারে নিঃশেষ করিয়া একখানা বটতলার নভেল বিছানার প্রচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে বাহির করিয়া, এবং সম্মুখে পাটীগণিতখানি খুলিয়া রাখিয়া, মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিল।

রমাসুন্দরী ভাবিল, বাছা কত কষ্টেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে। অন্য ঘরে চাটুর্য্যে ভাবিতেছিলেন, মানব কত কষ্টেই সংসারের অসারতা উপলব্ধি করে।

এমন সময় একখানা ঠিকাগাড়ী আসিয়া চাটুর্য্যের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

'চট্টোপাধ্যায় কোন অভিনব বিপদের আশঙ্কা করিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন, এবং ল্যাম্পপোষ্টের গ্যাসের আলোকে দেখিতে পাইলেন যে, এক জন যুবাপুরুষ গাড়ীতে বসিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর নম্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

যুবক। ২৪নং কোন্‌টা?

চাটুর্য্যের আতঙ্ক বাড়িল। তিনিই ২৪নং বাটীর ভাড়াটিয়া। অতএব আগন্তুক নিশ্চয়ই তাঁহারই অতিথি-রূপে অবতীর্ণ।

যুবক গাড়ী হইতে নামিয়া বহির্ভাগের কড়া ধরিয়া নাড়া দিল।

চাটুর্য্যে। কে হে?

যুবক। হরিহর চাটুর্য্যের এই বাসা?

চাটুর্য্যে। তুমি কে?

যুবক। তুমি কে বল না? চাটুর্য্যে মহাশয়কে ডাকিয়া দাও। আমি বিনোদ।

বিনোদ চাটুর্য্যের পিতৃব্যতনয়। অনেক দিন ডিব্রুগড়ে কাঠের ব্যবসা করিতেছিল।

চাটুর্য্যে। কি আশ্চর্য্য! বিনোদ? এই প্লেগের সময় কলিকাতায় আসা ভাল হয় নাই।

বিনোদ একটা শূন্য নমস্কার করিয়া ঘরে গেল, এবং গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চাটুর্য্যেকে বুঝাইল যে, তাহার বড় বিপদ উপস্থিত। অর্থাৎ, তাহার প্রায় চারি হাজার টাকার স্লীপার (কাঠের কড়ি) রিজেক্ট (reject) হইয়া গিয়াছে। সাহেবের এই অন্যায় অমঞ্জুরীর কারণ তাহাকে অনেক টাকার ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হইবে।

চাটুর্য্যে। এখন উপায়?

বিনোদ। বিপদহারী মধুসূদন এবং গিল্যাণ্ডার্স কোম্পানীর বড় বাবু।

উভয়ের মধ্যে কাহারও সহিত চাটুর্য্যের আপাততঃ সদ্ভাব ছিল না।

চাটুর্য্যে বুঝাইলেন যে, কারবার করিতে গেলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, এবং সংসারে সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম ফল ভোগ করে, তাহাতে অন্য লোকের হস্তক্ষেপ করা মূঢ়তামাত্র। ইহার ফলে একটির স্থলে দুইটি মারা যায়। তাঁহার পরামর্শে বিনোদের পক্ষে সেই রাত্রিকালেই কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল; নচেৎ এক দিকে প্লেগ ও অন্য দিকে হতাশ্বাস আসিয়া বিনোদকে আক্রমণ করিতে পারে।

বিনোদ কিন্তু তাহাতে মোটে কান না দিয়া বড় বৌর সহিত পরামর্শ করিতে গেল। চাটুর্য্যে ক্রমে চটিতে লাগিলেন।

তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, সংসারে পাপের স্রোত রুদ্ধ করা মানবের অসাধ্য, এবং ইহার জন্য ঈশ্বর সম্পূর্ণ দায়ী। এই যে কংগ্রেসের দল, ইহারা কিছুই বুঝে না, এবং মিথ্যা দলবদ্ধ হইয়া পাপ বাড়াইতেছে।

বিনোদের সমাগমেও যে চাটুর্য্যের বাটীতে একটা কংগ্রেসের মত বিদ্রোহীর দল বাড়িয়া গেল, তাহা তৎক্ষণাৎ চাটুর্য্যে বুঝিতে পারিলেন।

৬

বিনোদের আগমনে খরচ বাড়িয়া গেল, এবং সময়ে অসময়ে বাটীতে

বিদ্রোহীদিগের একটা গোপনীয় অধিবেশন হইত, তাহাও চাটুর্য্যে আফিস হইতে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন।

চাটুর্য্যে মনে মনে ভাবিলেন, "আমি শালা খাটিয়া মরি, এবং ইহারা জলখাবার ও পান উড়াইয়া আমার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করে।"

সেই দিন গৃহিণীর হস্তে বাজার-খরচ ফেলিয়া দিয়া চাটুর্য্যে বলিলেন যে, মাসের আর দশ দিন আছে, তাঁহার নিকট সম্বল পাঁচ টাকা মাত্র—এই তাহা।

রমাসুন্দরী বিনীতস্বরে বুঝাইল যে, চাটুর্য্যের শরীর ক্রমে খারাপ হইতেছে। এবং সকলের মতে তাঁহার হাওয়া বদলান উচিত।

চাটুর্য্যে। তোমরা নারীজাতি, অতএব গোমূর্খ। আমি অর্দ্ধবেতনে ছুটী লইলে পেট চলা দায় হইবে, সেটা ত তোমরা বুঝ না, কেবল অপব্যয় করিয়া অবস্থার প্রলয় ঘটাও।

ক্রমেই চাটুর্য্যের রাগ বাড়িয়া গেল, এবং সংসারে কতকগুলি ব্যাপার স্কন্ধে চাপিলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না, তাহাও ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। এমন আর কয় দিন চলিবে? বিশেষতঃ, মহামারী রোগের সময় যদি এইরূপ ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকে, তবে সংসারধর্ম্ম পালন করা অসম্ভব। কাজেই চাটুর্য্যে মহাশয়কে সকলকে ফেলিয়া এক দিকে চম্পট দিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত।

এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব নূতন ভাব চাটুর্য্যের মস্তিষ্কে ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিল, এবং সে রাত্রি তাঁহার ঘুম হইল না। ইহার জন্য তাঁহার গৃহিণী যে সম্পূর্ণ দায়ী, তাহাতে চাটুর্য্যের কোন সন্দেহ রহিল না।

ক্রমে শিবস্তোত্রের উপর হরিহর চটিয়া গেলেন, এবং বৃথা শরীরকে কষ্ট দিয়া আত্মত্যাগ যে একটা গণ্ডমূর্খের কাজ, তাহা বুঝিলেন।

দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে চাটুর্য্যে ডাকিলেন, "নব!"

ভৃত্য নব আসিলে পুনরায় বলিলেন, "দুই পয়সার গাঁজা লইয়া আয়।"

ভৃত্য পূর্ব্বেই চাটুর্য্যের অনবধানতার সুযোগ পাইয়া দুই এক পয়সার গাঁজা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল; তাহারই কিছু দুই পয়সার দরে চাটুর্য্যে মহাশয়কে দিল।

গঞ্জিকা টানা চাটুর্য্যের পূর্ব্বে অভ্যাস ছিল না। কিন্তু গঞ্জিকার আস্বাদন পূর্ব্বে অনেক সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঞ্জিকার উগ্রতেজে চাটুর্য্যের ক্রোধ অধিকতর উদ্দীপ্ত হইল। কোটরস্থ চক্ষু পাকাইয়া চাটুর্য্যে একবার সংসারটাকে শাসাইয়া লইলেন, এবং ক্রমে নেশা-বিজড়িত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যূষে পাড়ার লোকে সকলে জানিতে পারিল যে, হরিহর চট্টোপাধ্যায়

ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রলাপ বকিতেছেন, এবং দুই এক জন বলিল, তাঁহার বাহিরের ঘরে একটা ইঁদুর মরিয়া আছে।

সকলে বলিল, এ পাড়ায় এই প্রথম "প্লেগকেস্," এবং দুই এক জন সপরিবারে চম্পট দিল।

৭

"ওঃ! আমি ভগ্নহৃদয়। Broken heart--B. H.! শ্রীযুক্ত হরিহর চাটুর্য্যে B. H.; ওহে ডাক্তার! ভাষাতত্ব বোঝ?"

চাটুর্য্যে প্রলাপ বকিতেছেন।

ডাক্তার। আপনি চুপ করুন।

চাটুর্য্যে। ভাষাতত্ব বুঝিয়া দেখুন—ব্রোকন্—ব্রকন—বকন—ভগ্ন—হার্ট—হারীত—হৃৎ—হৃদয়—ইংরাজী কিংবা বাঙ্গলায় উভয়েরই সাঙ্কেতিক চিহ্ন—B. H.; যেমন তুমি এম্. বি., আমি তেমনই B. H.—আমার ঔষধে কি হইবে? আমার জলপটীতে কি হইবে? হৃদয়ে জলপটী দিতে পার ডাক্তার? না,—তাহাতে নিউমোনিয়ার ভয়। এই যে কোটি কোটি ভারতসন্তানের হৃৎপিণ্ড ভাঙ্গিয়া গলা ও কুঁচকীতে সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার কি অন্য কোন উপায় আছে? কেবল হৃৎপিণ্ডের চিকিৎসা কর।

ডাক্তার ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন। বিনোদ ও রমাসুন্দরী আসিয়া শয্যার পার্শ্বে বসিল।

রাম অদূরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। চাটুর্য্যে ভগ্নস্বরে বলিলেন, "বাছা রাম, সত্য বল, তুমি পাঁচ টাকা চুরি করিয়া কি করিয়াছিলে?"

রাম। বাবা, আমার অপরাধ হইয়াছে—আমি থিয়েটার দেখিয়াছিলাম।

চাটুর্য্যে। থিয়েটারে ত এক টাকা লাগে—আর বাকি চার্?

রাম। আরও চারি জন বন্ধুকে দেখাইয়াছিলাম।

চাটুর্য্যে বলিলেন, "বেশ ভাল কৈফিয়ৎ বাবা—রাম! কিন্তু দেখ, আমার দশা দেখ। পিতৃহারা হইয়া ঐ পাঁচ টাকার মূল্য বুঝিতে পারিবে। এই মরণবাক্য স্মরণ রাখিও বাবা রাম!

"আর রমা!—ইহ জন্মে বোধ হয়—হয় ত তুমি মনে করিতেছ আমার মরিবার পূর্ব্বেই তুমি মরিবে—কিন্তু সেটা শক্ত—জ্ঞানের উদয় না হইলে কেহ যথার্থ মরিতে চায় না। এবং তুমি আমার মত দুটি সন্তানের মায়ায় বদ্ধ—মায়ার নামই অজ্ঞান—শিবস্তোত্র দেখ।

"যাহা হউক, এখন কিছু রসগোল্লা আমাকে আনাইয়া দাও। সংসারধামে আমার এই শেষ সাধ।

দুই এক জন প্রাতিবাসী দূর হইতে সঙ্কেত করিয়া বলিল, "রোগীর যাহা ইচ্ছা খাইতে দাও, এবং যাহা ইচ্ছা করিতে দাও, প্লেগ বড় ভয়ানক রোগ।"

তৎক্ষণাৎ বাগবাজার হইতে এক টাকার রসগোল্লা আসিল। চাটুর্য্যে আরক্ত-নয়নে শয্যা হইতে উঠিয়া ঝাড়া এক ঘণ্টা স্নান করিলেন, এবং সমস্ত রসগোল্লা-গুলি পার করিলেন। অতঃপর এক ছিলিম গয়ার তামাক সাজিয়া খাইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ঝাড়া সপ্তঘণ্টা ঘুমাইলেন।

তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, এবং কুল্‌পীর বরফওয়ালা শ্যাম বৎসরের প্রথম হাঁক্ দিতেছে।

সকলেই জানিতে পারিল, রসগোল্লা খাইয়া চাটুর্য্যের প্লেগ সারিয়াছে। কেবল নব বুঝিল, এ কেবল গঞ্জিকার গুণ।

৮

পর দিন চাটুর্য্যে সম্পূর্ণ অজীর্ণরোগমুক্ত হইলেন, এবং সাধের পত্নী রমাসুন্দরীর হস্তের অন্নব্যঞ্জনাদি খাইলেন। বিনোদও ত্রিশ টাকা খরচ করিয়া তাহার সীপারের ব্যবসায় পুনর্জ্জীবিত করিল, এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইল না।

বিনোদ ও চাটুর্য্যে উভয়েই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, বাজে খরচ অন্যান্য খরচ হইতেও জীবনধারণার্থ আবশ্যক।

চাটুর্য্যে। কি জান ভাই, অদৃষ্টের ফেরাফের অপূর্ব্ব রহস্য। তাহার মধ্যে মানব আপনার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে গিয়া উর্ণনাভের জালে মক্ষিকার ন্যায় পড়িয়া যায়।

সন্ধ্যাকালে যখন ও পাড়ার স্বামীজি চাটুর্য্যেকে দেখিতে আসিলেন, তখন স্বামীজি বলিলেন, "চাটুর্য্যে, তোমার উপর ঈশ্বরের অনুকম্পা অনেক—কি করিয়া বাঁচিলে বল ত ? বোধ হয় অহিফেন খাইতে—না ?"

চাটুর্য্যে। অহিফেন পূর্ব্ব হইতে খাইতাম, কিন্তু আরও কিছু বাজে খরচ করিয়া গাঁজা খাইয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। এটা কাহাকেও বলিবেন না। দুইটাই প্লেগের ঔষধ।

স্বামীজি। আর কিছু নয় ত ?

চাটুর্য্যে। আর শিবের স্তোত্র।

গোকুল-মঙ্গল।

এই প্রাচীন পুঁথিখানি ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ, বা তদবলম্বনে রচিত গ্রন্থ। বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে এই প্রথম ইহার নাম বিঘোষিত হইল। মূলের সহিত ইহার সাদৃশ্য বা পার্থক্য কিরূপ, সময় ও সুযোগের অভাবে আমরা তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না। আমরা কেবল বাঙ্গলা পুঁথিখানির সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিব।

বঙ্গভাষায় ভাগবতের আরও কয়েকখানি অনুবাদগ্রন্থ আছে; যথা,—গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ভাগবত আচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, দ্বিজ লক্ষ্মীনাথের কৃষ্ণমঙ্গল, এবং জয়নারায়ণের রাধাকৃষ্ণ-বিলাস। এখনও কত পুঁথি গৃহস্থের ঘরে কাষ্ঠচাপে আবদ্ধ থাকিয়া কীটকুলের আহার্য্যে পরিণত হইতেছে, কে জানে? প্রথম ও শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় পূর্ব্বেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; দ্বিতীয়খানি "সাহিত্য-পরিষদে"র কৃপায় খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে; এবং তৃতীয়খানি আজও আমাদের বাক্স-মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া স্বীয় অদৃষ্টের প্রতীক্ষা করিতেছে। সমালোচ্য গ্রন্থখানি অদ্যাবধি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই।

এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যাবদীয় লীলা অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-চরিত সম্বন্ধে বাঙ্গালায় এমন বিস্তৃত গ্রন্থ আর আছে কি না, বলা যায় না। পূর্ব্বে যে কয়খানি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত তুলনায় এই গ্রন্থখানি আকারে অনেক বড় বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রন্থ-রচনা কবির অসাধারণ অধ্যবসায় ও শ্রমসহিষ্ণুতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন, তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়।

গ্রন্থমধ্যে ভণিতির স্থলে "ভক্ত রামদাস" এই নাম ভিন্ন গ্রন্থকারের আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি "ভক্ত" শব্দ ছাড়িয়া একটি স্থলেও "রামদাস" ভণিতি দিয়া যান নাই। যেখানে "রাম" শব্দের যোগে ভণিতি দিবার সুযোগ পান নাই, সেখানে "ভক্তদাস" লিখিয়াছেন, তথাপি সমাক্ষরযুক্ত "রাম-দাস" লেখেন নাই। ইহা হইতে আমরা অনুমান করি, "ভক্তরাম" পদের গঠন অবিশুদ্ধ বোধ হইলেও, তাহাই রচয়িতার নাম ছিল। সেকালে ইহা অপেক্ষা কত অদ্ভুত নাম লোকসমাজে প্রচলিত ছিল, ভাবিয়া দেখিলে, ভক্তরাম নামে বিস্মিত হইবার অবকাশ থাকে না।

গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম—আনোয়ারা গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, গ্রন্থখানি তদীয় পিতামহ ৺রামদাস সেন মহাশয়ের রচিত। তাঁহার এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ কেবল তাঁহার পিতামহের গভীর সাহিত্যানুরাগিতার কথা ভিন্ন তিনি আর কিছু বলিতে পারেন না। তাঁহাদের বংশ বিশেষ প্রাচীন। সেন-বংশ পূর্ব্বকালে অতি-সমৃদ্ধ ও বিদ্যালোকসম্পন্ন ছিল। এই বংশে পূর্ব্বে দুই জন কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। এক জন মুক্তারাম সেন "সারদামঙ্গল" ও অপর ব্রজলাল সেন "চণ্ডীমঙ্গল" নামক কাব্যের রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই গগন বাবুর কথায় আমাদের একটু আস্থা জন্মে বটে, কিন্তু তথাপি এই গ্রন্থখানিকে তাঁহার পিতামহের রচনা বলিয়া কোনরূপে স্বীকার করা যায় না। তাঁহার পিতামহ কেবল দুই পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। কিন্তু এই গ্রন্থের ভাষা বহু প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। ইহা আনোয়ারায় সেনবংশীয় লোকের রচনা, ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা গগন বাবুর পিতামহ রামদাস সেন মহাশয়ের রচনা না হইয়া * উক্ত ব্রজলাল ও মুক্তারাম সেনের সমকালবর্ত্তী খুল্লতাত ভ্রাতা রামদাস সেনের রচনা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমাদের এই অনুমান সত্য হইলে, পুঁথিখানি প্রায় দুই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা হইয়া পড়ে। ভাষার আলোচনা দ্বারাও এই অনুমানের সমর্থন হয়, পাঠকগণ পরে তাহা দেখিতে পাইবেন।

গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ৩—২৩৩ পত্র পর্য্যন্ত বর্ত্তমান, অবশিষ্ট পত্রগুলির অভাব। যাহা আছে, তাহাতেই গ্রন্থখানি এত বিরাট যে, ইহার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে ভয় হয়! বর্ত্তমান শেষ পত্রেই যখন কৃষ্ণের বাল্যলীলার বর্ণনা, তখন না জানি কত পত্রে গ্রন্থের সমাপ্তি হইয়াছে! এত বড় গ্রন্থের প্রতিলিপি বড় বেশী হইয়াছিল, এমন মনে করা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে আর একখানি প্রতিলিপির অস্তিত্ব-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; সেই প্রতিলিপিখানি সংগৃহীত হইলে, গ্রন্থকার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের

---

* গগনবাবুর মুখে তাঁহার পিতামহের নাম 'রামদাস সেন' শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহাদের কুলজীতে তৎস্থলে 'রামরাম সেন' দেখা যায়। বলিয়া রাখা ভাল, এই বংশের কেহ এখন 'দাস' উপাধি ব্যবহার করেন না। বিষয়টি সমস্যাপূর্ণ,—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।—লেখক।

নির্ণয় হয় কি না, দেখিব। সংগৃহীত প্রতিলিপিখানি অনুমান ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি অতি সুন্দর। ভাষার প্রাচীনত্ব ও গ্রন্থের বিরাটত্ব সত্বেও পাঠ করিতে বসিলে বিরত হইতে ইচ্ছা হয় না। গ্রন্থকারের রচনা সর্ব্বত্রই মধু-বর্ষণ করিয়াছে। শব্দসমাবেশের কৌশলে, পদের লালিত্যে, বিবিধ নূতন ছন্দের ঝঙ্কারে, সর্ব্বোপরি কোমল ও করুণ ভাব-নিচয়ের সন্নিবেশে গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও মোহনীয় সৌন্দর্য্যের আকরস্বরূপ হইয়াছে। এমন সুন্দর গ্রন্থ প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল, আমাদের কত সৌভাগ্য! ইহার নিকট পূর্ব্ব-পরিচিত সমস্ত কৃষ্ণ-চরিত গ্রন্থগুলি হার মানিবে, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। যাহা হউক, পাঠকগণকে আমরা নিম্নে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। এই গ্রন্থে যে সকল রাগ রাগিণী ও ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলি আর কোনও প্রাচীন পুঁথিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থ-ধৃত রাগ-রাগিণী-সম্বদ্ধ গীতগুলি "পদাবলী" সাহিত্যের মধুমাখা সুরে গঠিত ও অমৃতময়ী ভাষায় গ্রথিত। আমরা তন্ময়-চিত্তে গীত-গুলির রসাস্বাদ করিয়াছি। রচনা সর্ব্বত্রই সহজ, সুস্পষ্ট। ভাষা নিতান্ত অনুগতা দাসীর মত কবির লেখনীর অনুসারিণী। ভাষার জন্য কবিকে কোথাও অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ইহা হইতেই কবিকে বঙ্গভাষায় অসাধারণ অধি-কারী বলিয়া স্থির করা যায়।

মাতৃস্নেহের কি অপূর্ব্ব মহিমা! সন্তানের সামান্য ক্রন্দনে মার অন্তরে কি দারুণ যন্ত্রণা হয়, তাহা মাতা ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে? যশোদা রাণীর অবস্থা-বর্ণনায় সেই মাতৃস্নেহের চিত্র দেখুন।—

ব্রজের ছন্দ।

আঙ্কার বাচা কেনে কান্দে রে!
মাএর বাছা কান্দে কেনী।
খাও বাছা ক্ষীর ননী।
কান্দ্য নারে নীলমণি।
আঁকুল হইল মাএর প্রাণি।
মুক্রি কেনে আপনা খাইলুম।
শিশু লইআ এথা আইলুম।
কি কারব কথা (কোথা) জাব।
কথা (কোথা) গেলে বাচা না কান্দিব।

হেদে গো বিমলা ধনি।
কান্দে কেনে যাদুমণি।
কান্দে কানু রাইর কোলে।
স্তন খাও রাণী বোলে।
কান্দ্য না নাগর হরি!
মরিমু যশোদা নারী।
ভক্তরাম দাসে ভণে।
কান্দে কানু আপন মনে॥

রাগ সিন্ধুরা।

কাণু কেনে কান্দে সৈরে বাচা কেনে কান্দে।
না জানি কপালে মোর কি আছে নির্বন্ধে॥
সখিরে মুই কেন আইনুম এথা আপনা খাইয়া।
কি জানি কি হেতু মোর কান্দেন কানাইআ।
বাচার কান্দনে মোর হিআ জাএ ফাটি।
শরীর না সয় মোর জাদুর আউটি॥
জাদুয়ার বালাই লই মরি জাই রাণী।
মাএর মাথা খাও যদি কান্দ নীলমণি॥
দাস ভক্তরামে বোলে শুনহ যশোদা।
তোহ্মার ছাল্যা কান্দে রাণি মনে পাইআ বেথা।

সন্তানের মিথ্যা অভিমানকে বেদবাক্য মনে করিবার লোক মা ভিন্ন এই ভূমণ্ডলে আর কেহ নাই; তাই আমরা দেখি, কৃষ্ণের অভিমানে যশোদা রাণী মূর্চ্ছিতা হইতেছেন;—

চতুর্দ্দশ দণ্ড ভানু, বন্ধনে আকুল তনু।
বন্ধন জ্বালাএ আকুল হৈআ, কান্দএ মা পানে চাইআ।
শুন মাতা কহি তোরে, না রৈব তোহ্মার ঘরে।
এ ধিক জীবন মোর, মাএ বোলে ননীচোর।
জাইমু না আর গোপপাড়া, বলব তারা এ ননীচোরা।
আহ্মার মাতা নহে রাণী, নিশ্চয় এহা আমি জানি।
রাণী যদি মাতা হৈত, মুখ চাহিআ ননী দিত।
মুনি কহিআছে মোরে, আহ্মার মাতা মধুপুরে।
বন্ধনজ্বালা সহিতে নারি, ছাড়্যা দেঅ গোপনারী,
গোকুলেতে ভিক্ষা করি, দিব তোহ্মার ননীর কড়ি।

কানুর বাক্য শুন্যা রাণী, মূর্চ্ছা হৈল সুবদনী।
দাস ভক্তরামে ভণে, শোকে দগধে রাণীর মনে॥

অন্য স্থান হইতে তিনটি গীত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা পাঠ করিয়া কেহই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না;—

ভাঙ্গা গীত।

রসবতি ইন্দুমুখি চাহ আহ্মা পানে গো।
যেন কমলছাড়া হৈলে অলি ধৈরজ্জ না মানে গো। ধু
আহ্মাকে ছাড়িআ, গৃহে যাও ধনি,
কঠিন তোর হিয়া গো।
মনে পৈল্যে ধনি, চিত্ত বুঝাইব
কার পানে চাহিআ গো॥
তুআ নাম লই, বাজাই মুরড়ি,
গোধেনু রাখিএ গোঠে গো।
না দেখিআ তোহ্মা, কেমনে রহিব,
ও মোর মনে উঠে গো॥

ভাকা জাত।

রাই বোলে প্রাণ কৃষ্ণচন্দ্র আব বধিবে জানি গো
প্রেমানল দিআ কুল ছাড়াইলা
প্রাণি লইতে চাহ কি না গো। ধু
তুয়া প্রেমে ঠেকি, জাতি পতি ছাড়ি,
কলঙ্ক করিলু সার গো।
প্রাণি তোকে দিয়া, সুধা (শুধু) তনু জাইতে,
চরণ না চলে ঘরে গো।
আর কি না সাধ, আছে ব্রজচন্দ্র
হইব তুয়া মনের মত গো।
বোল যোগী হইআ, তুয়া সঙ্গে জাই,
জাতি কুল করি হত গো।
রাই প্রণামিয়া, ভক্তরামে গাএ,
তাহা শুন ব্রজেশ্বরি গো।
যুক বিদারিয়া, তোহ্মারে রাখিতে
সেই সাধ করে হরি গো॥

ভাঙ্গা গীত।

ও ললিতা গোঠে জাইছে নন্দের কিশোরা ওরে।
দেখ অঙ্গের ঠাণ, নিন্দিআছে চান্দ,
দিয়া বংশীর সান আখির ঠারে॥ ধুয়া।
আমা পানে চাহিআ, মুরড়ি বাজাইয়া,
চলিআছে ধাইয়া, ধেনুর পাছে।
দেখি চিকন কালা, গলে বনমালা,
যেন ইন্দুকলা, মেঘের মাজে॥
চলে নীলমণি, করেতে পাচনি,
পূর্ণ ইন্দু জিনি সখি-সঙ্গে।
মেঘে জিনি তনু, করে মোহন বেণু,
গোঠে হাকে ধেনু মনোরঙ্গে॥
শুন প্রাণ-সই, তোরে মর্ম্ম কই,
মোর প্রাণ ঐই পাঁপহরা।
কহে ভক্তদাস, বন্দি পীতবাস,
বুঝে রাধার আশ গোপকান্তা॥

সাধারণ পয়ার ছন্দের রচনার নমুনাও একটু দ্রষ্টব্য ;—

কেশরী জিনিআ মাজা অতি-মনোহর।
মৃণাল জিনিআ ভুজ দেখিতে সুন্দর॥
নাসাএ বেসর দোলে গলে রত্নহার।
গগনমণ্ডলে যেন নক্ষত্রসঞ্চার॥
করে হেম-কঙ্কণ বাহুতে বাজুবন।
শিথেতে সিন্দূর যেন শোভিছে অরুণ॥
নয়নে কজ্জল অতি করিছে উজ্জ্বল।
জলদ জিনিয়া যেন কুটিল কুন্তল॥ ইত্যাদি।

এইরূপ সহজ ও সুন্দর রচনা সর্ব্বত্র। আর উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। গ্রন্থে রাগ-রাগিণী ও ছন্দোনিবদ্ধ রচনাই অধিক বেশী ; এই জন্য গ্রন্থখানি আরও মনোরম হইয়াছে।

ভাষার আলোচনা করিয়া আমরা এই গ্রন্থে যে বিশেষত্ব ও নূতনত্ব দেখিয়াছি, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

প্রিয়—স্ত্রীলিঙ্গে অধুনা 'প্রিয়া' হয়, কিন্তু সেকালে 'প্রিয়ণি'ও হইত। যথা,—

অকস্মাৎ মুনি দেখি হরের 'পৃঞখি'।
বিস্ময় হইয়া চিত্তে হরের ঘরনী॥

বালি—প্রাচীন সাহিত্যে 'বালক' অর্থে 'বালা' শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। তখন 'বালা'র স্ত্রীলিঙ্গে 'বালি' ব্যবহৃত হইত। যথা :—

কমলসৌরভ গেলে না আসিব অলি।
পশ্চাতে হাবাইবে কান্তা বৃকভানুর 'বালি'॥

ভাজি—ভ্রাতৃ-জায়াকে চট্টগ্রামে হিন্দুগণ 'ভইজ' ও মুসলমানগণ 'ভাজি' সম্বোধন করেন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ে 'ভাউজ'ও ব্যবহৃত হয়। 'ভ্রাতৃজায়া' হইতেই এই সকল শব্দের উৎপত্তি, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে 'ভাজি'র ব্যবহার আছে। যথা :—

জানি ভাই ক্রোধ হই কুবোল বোলিছে।
মহদাএ বোলে, 'ভাজি' কি না দুঃখ হেছে॥

মোরার—'মোর' শব্দের বহুবচনে। 'মোদের' আধুনিক সৃষ্টি। সেইরূপ 'আমি'র বহুবচনে 'আমারা' (ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'আমারার') প্রযুক্ত হইত।

কানু 'মোরার' প্রাণধন, কানু সে জীবন।

আছেন—সম্ভ্রমার্থে এইরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ অধুনা সীমাবদ্ধ হইয়াছে। তখন সেরূপ কোনও নিয়ম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। দৃষ্টান্তগুলির বিচার করুন, বুঝিতে পারিবেন।

(১) দাস ভক্তরামের খেদ 'আছেন' বিশেষ।
(২) গোবিন্দবচনে রামের 'দগধেন' হিআ।

বিশেষ্যের স্থলে বিশেষণের প্রয়োগ করিতেও প্রাচীন কবিগণ সঙ্কোচ বা ভয় করিতেন না, তাহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। ফলতঃ তাঁহারা ব্যভিচারের একশেষ করিয়া গিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) শিশুর 'আকুল' দেখি কানুআর সুন্দরী।
(২) বিপিন হাবাইআ যেন মৃগের 'অস্থির' (অস্থৈর্য্য)।

তুচ্ছার্থে ক্রিয়াপ্রয়োগে অধুনা যেমন বাঁধাবাঁধি নিয়ম হইয়াছে, সেকালে তেমন ছিল না। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত-ধৃত ভাষা এখন আমরা প্রয়োগ করিতে পারিব কি ?

অমৃত 'খাইছ' তোরা রাখি ব্রজরাজ।

পাদপূরণার্থ প্রায়ই 'না' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা :—

(১) গৃহে আব কি 'না' লইআ ?

(২) আম 'না' গাছেতে, কোকিলা কুহরে,
ডালিম গাছেতে শুয়া।—চট্টগ্রামের প্রাচীন পদাবলী।

সম্প্রসারণার্থ সপ্তম্যন্ত বিভক্তির যোগ না করিয়া অনেক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অধুনা ইহা অদ্ভুত বিবেচিত হইবে। যেমন,—

রাধা বোলে কংসভয়ে লুকায় 'বনএ' (বনে)।

নামপুরুষের ক্রিয়াও এইরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে। যথা,—করে=করএ। অধুনা এইরূপ ক্রিয়া 'য়' দিয়া লিখিত হয়, যথা—'করয়'; ইহা বাস্তবিক সঙ্গত নহে। 'করএ' ইত্যাদি রূপ হওয়াই উচিত।

প্রশ্ন বুঝাইতে অধুনা 'কি' ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে 'নি' ব্যবহৃত হইত। প্রায় সকল কবিই ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—

শুনিছ 'নি' গোঠের বৃত্তান্ত ?

'কিছু' অর্থে অনেক স্থলে 'কিন্তু' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—

ব্যাসে বোলে একচিত্তে শুন ধরাপতি,
কৈতে কার শক্তি আছে গোবিন্দ প্রভৃতি ॥
'কিন্তু' সে কহিতে পারি শুন মহাশয়।
শুনিলে গোবিন্দলীলা পাপনাশ হএ ॥

উত্তমপুরুষে নামপুরুষের ক্রিয়া-ব্যবহার যে কেবল এই কাব্যে আছে, এমন নহে; চণ্ডীদাসের 'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনে'ও তাহা দেখাইয়াছি।

আহ্মি জদি মরিআ 'জাবে'।
বন্ধুআ কার নাম লবে ॥

যে স্থলে অধুনা আমরা 'করি' ব্যবহার করি, তখন সে স্থলে, করম, করোম, করুম বা করোঁ (করো) ব্যবহৃত হইত। কথাবার্ত্তায় এখনও কোন কোন দেশে 'করুম' শুনা যায়। 'করোমি' রূপান্তরিত হইয়াই ক্রমে উক্ত রূপে পরিণত হইয়াছে, দেখিলেই বুঝা যায়।

সম্প্রসারণার্থ কতকগুলি শব্দে বর্ণবিশেষ নিরর্থক সংযুক্ত হইয়াছে; তাহাতে শব্দগুলি অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। যেমন ;—আউগে (আগে), আউট (আট), আওয়াস (আবাস), মোহর (মোর), তোহর (তোর) ইত্যাদি।

এত দিন জানিতাম, 'মাইকেলী' ক্রিয়া নামে প্রসিদ্ধ ক্রিয়াগুলির একমাত্র

উদ্ভাবয়িতা আমাদের স্বর্গীয় কবি মধুসূদন। কিন্তু তাঁহার বহুপূর্ব্বে আমরা ঐরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছিল, দেখিতেছি। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখুন :—

(১) রূপ দেখি 'বিচলএ' আঁখি।
(২) তাহা দেখি যশোদার 'পুলকএ' হিআ॥
(৩) সরোবরমধ্যে যেন পুষ্প 'প্রফুল্লিছে'।

নিম্নে কতকগুলি শব্দের অর্থ সহ দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইতেছে।

সম্বব—স্বভাব।

নিজের সম্বব মোরা ছাড়িতে না পারি।
সর্পজাতি হই মোরা কাল বিষ ধরি॥

বচস্কর—আজ্ঞাবহ। (?)

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেব তুআ 'বচস্কর'।
গোপগণ বোলে আজ্ঞা কর দামোদর।
মোরা যাব গোপবংশ তুয়া 'বচস্কর'॥

উত্তর—সংবাদ।

শিশু দেখি লাম্ফ দিআ আইল হলধর।
রাম বোলে কহ শিশু গোঠের 'উত্তর'।

উতার—নামাও; রাখ।

আগে আসি মোর আগে 'উতার' পসার।

তাকিত—শীঘ্র।

কানু বোলে দান কেনে না দেঅ 'তাকিত'।

বাহনা—ছলনা।

কানু বোলে তোহ্মা লাগি কদমতলে থানা।
রাধাএ বোলে নিলজ কানু করহ 'বাহনা'॥

আদালতী ভাষায় 'টাল বাহনার' খুব প্রচলন আছে।

সেঅতি—জল-সেচনী?

জল হিঁচে (সিঁচে) ইন্দুরেখা 'সেঅতি' করে ধরি।

ধাউরালী—চতুরালী, না, দুষ্টামি?

(১) রাখালের চরিত্র ছাড়, শীঘ্র মোরে পার কর,
'ধাউরালী' ছাড়হ কানাই।
(২) ছাড় 'ধাউরালী' নন্দের কালা। ব্রজভুমে তোরে না বোলে ভালা॥

সযাল—সকল।

যাহার উদর মাঝে; 'সয়াল' সংসার আছে,
কানু নাকি আক্কার তনয়।

কেঁয়ার—কপাট। (চট্টগ্রামী শব্দ)।

'কেঁয়ার' ভিরি আহিরনারী বৈসে ঘরে।

পাজাল—সন্ধান, উদ্দেশ ?

কথাকারে গেছে শিশু না পাএ 'পাজাল'।
মনে বড় চিন্তা পাএ নন্দের দুলাল॥

অথান্তর—বিপদ ; (এখানে) অন্যায়।

না জানি করিলুম নাথ এথ 'অথান্তর'।

এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ আছে। কোন কোন স্থলে 'অসম্ভব' অর্থও হয়।

গোপথ—গবাক্ষ ?

'গোপথে' গোবিন্দরূপ নিরখে নাগরী।

অসকাল—সন্ধ্যা, বেলাবসান।

(১) হইআছে 'অসকাল' অস্তাগিত ভানু।
(২) চল ঘরে যাই ভাই 'অসকাল' হইছে।

আকুত—অভিপ্রায়।

রাধার 'আকুত' বুঝি প্রভু নরহরি।
পুনি পন্থ নিরোধিলা নন্দের মুরারি॥

ভ্রান্তা—ভ্রান্তি, মোহ।

এই রূপে ভজ কৃষ্ণ দূরে করি 'ভ্রান্তা'।

দাউরে—দ্রবীভূত হয়।

(১) চন্দ্র অধরে যখন মুরলিতে সান।
যুবতীর প্রাণ হরে 'দাউরে' পাষাণ॥
(২) 'দাউরে' দারুণ শিলা, আকুল হৈলুম গোপবালা,
ঘরে যাব কাহার পরাণ॥

গিরি—'গৃহী' শব্দের অপভ্রংশ।

কানু বোলে আগে কেবা পাঠাইআ চোর।
'গিরিরে' ডাকিআ বোলে ধরিতে তস্কর॥

উপরোধ—বিরোধ।

সম্প্রতে থাকিয়া দোহে না কর বিরোধ।
দুই রাজা শান্ত হও তেজ 'উপরোধ'॥

তেঁঅ—তথায়, তন্নিকটে।

শুনিআ যে সদাশিব কর জোড় 'তেঁঅ'।

তাহু—তাহে, তাহাকে।

কিন্তু সে অমৃত ধনি খাইছলি রাহু।
বিষ্ণুচক্রে দুই খণ্ড করিলেক 'তাহু'॥

নিম্নলিখিত শব্দগুলি আজও চট্টগ্রাম প্রদেশে ব্যবহৃত হয়; একান্ত পরিচিত বলিয়া দৃষ্টান্ত দিলাম না। তভো—তবু; বিটল—বদ্জাত; জড়—একত্র; গুমান—দর্প; গোইন=গভীন=গভীর; মরে—মোরে; লুকি—অদৃষ্ট, লুকায়িত। ঝাট—শীঘ্র; পো=পোআ=ছেলে; গোয়ার—গোঁয়ার; নিকড়িয়া—কড়িশূন্য, মূল্যহীন; তোমাথুন—তোমা হইতে; স্থান—স্নান; বিতিল=গঞ্চিল, গত হইল; তানা=তাহানা—তাঁহারা; বেঙ্কা—বক্র; ছান্যা—ছেলে; মেলানি—বিদায়; অনামূলে—বিনামূল্যে; হিআ—হিয়া।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত :—

সন্ধানিআ—সন্ধানী।

আপনে জানির বড় 'সন্ধানিআ' কানু।

নিকড়িআ—মূল্যহীন।

'নিকড়িআ' বনফুলে গাথিআ দিআছ গলে।

জাদুআ—জাদু।

পালিতুম জাদুআ ধন, সাতপাঁচ করে মন।

দেখসিয়া—দেখ আসিয়া।

রাধাএ বোলে 'দেখসিয়া' প্রাণের শ্রীমতী।
ললিতাএ বোলে রাধা ভ্রম কর মতি॥

কন্দলুআ, কপটিআ, ভাইআ প্রভৃতি শব্দের আর দৃষ্টান্ত দিলাম না।

নেয়, দেয় প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি পূর্ব্বে নেহি, দেহি রূপে ব্যবহৃত হইত। এখনও আমরা উত্তমপুরুষে নেই, দেই ব্যবহার করি।

'কেন' শব্দের 'কেনে' ব্যবহারও আছে; আর এক নূতন মূর্ত্তি দেখা গেল; যেমন :—কেনি।

ভক্তরামে কহে রাণী, ভয় কারে কর 'কেনি'।

পুত্র কন্যার মঙ্গলার্থ ধনদৌলত উৎসর্গ করিবার রীতি আজও বর্ত্তমান। এই রীতিরেই 'নিছনি' বলা হয়। এই শব্দটি লইয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয় 'সাধনা'য় অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। দাতব্য দ্রব্যটি নিছিয়া ও পুঁছিয়া দিতে হয় বলিয়া, ইহাকে 'পোছনি নিছনিও' বলিয়া থাকে। যথা :—

হেম হীরা রত্ন দিল 'পোছনি নিছনি'।

কোন প্রায়—কেমতে।

'কোন প্রায়' জীব সখা সত্য বোল তুহ্মি।

লোহ—জল।

নয়ানে পড়এ 'লোহ', কান্দ্যা রাম হৈল মোহ।

দহ—জলাশয়বিশেষ।

কানু বোলে দেখিয়াছি 'দহ' আছে এথা।
জল খাইবারে আহ্মি যাইবম তথা।

সম্ভবতঃ, এই শব্দ হইতেই চট্টগ্রামে পার্ব্বত্য জলাধারকে 'ঢেবা' বা 'ঢেওয়া' বলা হয়।

উলা—নামা।

(১) নব যুবা রামাগণ জলেতে 'উলিছে'।
(২) আগে জলে 'উলহ' শ্রীহরি।

চট্টগ্রামে এই শব্দ 'উদয় হওয়া' অর্থে নিত্য ব্যবহৃত। এই অর্থে এই কাব্যেও প্রয়োগ আছে :—

প্রভাত সময় হৈল গগনে 'উলে' ভানু।

তাতা—উত্তপ্ত হওয়া।

চলিতে না পারে হরি 'তাতিআছে' বালি।

সিট—স্বর।

শুনিআ বাঁশীর 'সিট', চলে ধেনু নেই দিঠ।

মুড়া—উনানে আগুন জ্বালিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা কতগুলি শুষ্ক খড় একত্র করিয়া ধরে; সেই খড়ের সমষ্টিকেই 'মুড়া' বলে।

করে লই বুড়ী তৃণের 'মুড়া', আগুন জ্বালিবারে বসিল বুড়া।

ঠেঠ—তর্কবাগীশ।

গোপ মাইআ 'ঠেঠ', দান দেআ ঘাট।

বোধ হয়, এই শব্দ হইতেই 'তর্ক' অর্থে চট্টগ্রামের 'ঠেঠ্যালাম' উৎপন্ন।

খোয়—খোহা, শিশির।

শতেক যোজন দেহ, যেন অন্ধকার ‘খোয়’,
নিজ সনে চলে নাগপতি।

‘চোখণ্ড’—পৃথিবী?

মুকুটির ঘাএ ভাঙ্গে অসুরের মুণ্ড।
ভূমিতে পড়িআ অসুর কাঁপএ ‘চোপণ্ড’॥

আখা—উনান।

তৃণ কাষ্ঠ দিআ অগ্নি করিল ‘আখাএ’।

ধামালী—খেলা।

মুনি বোলে গোয়ালিনী পাতিছ ‘ধামালী’।

এই শব্দের বহু রূপ ধামাই, ধাবাই, ঢামারি, ধামারি।

উপ—কিরূপ বাঁশী?

শ্রীদাম লবঙ্গ পুরে বীণা বাঁশী ‘উপ’।

তছু—তথায়।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি এখন অত্যন্ত সাধারণ:—কোঅরা—কুমার; আই—মা; অউদল—আলুমালু; ভালি—ভাল; হুরুস্থূল—হুলস্থূল; হোনে—হইতে; সাফুটিআ—আঁটিয়া; বাহিরাইল—বাহির হইল, বা ফিরিল, (এই শব্দই সম্ভবতঃ ‘বাহুড়িল’ রূপ ধারণ করিয়াছে।)—এক্ষণ—এখন; কেক্ষণ—কেমন; মেরি—মোর (যথাঃ—তুআ সঙ্গে কাজ্য না যুয়াএ মোরি।) বওধি—বুড়া (যথাঃ—মুই সে বওধি নারী রূপ হেরি তোর।) সমাই—সকল; ‘সমূহ’ হইতে উৎপন্ন কি? পেখি—দেখি; জগতে (মুসলমানী ‘জকাত’?)—কর; (যথা, রাধা বোলে কোন্ রাজার জগাত সাধ হরি?) মুকাও—মুক্ত কর।

নিম্নোদ্ধৃত বাক্যত্রয়ে শুধি, তরল ও লাছা, এই শব্দত্রয়ের অর্থ কি?

(১) শুধি হোন্তে গোবিন্দেরে পালঙ্গে শোআইল।
(২) তুয়া ব্যাজ দেখি মুই হইনু তরল।
আর দণ্ডেক ব্যাজ হইত ভক্ষিতু গরল॥
(৩) এ বোলিআ নরহরি নৌকাএ দিছে লাছা।
ত্রস্ত হইয়াছে সুবদনী ডুবে নাএর পাছা॥

যতিরক্ষার খাতিরে পদ্যে অনেক স্থলে শব্দবিশেষকে সম্প্রসারিত করিতে হয়। এতদুদ্দেশ্যে ‘হ’ বর্ণের যত প্রয়োজন, আর কোন বর্ণের তত নহে। ‘হ’ বর্ণের স্থান এখন ‘ও’ বর্ণ দ্বারা অধিকৃত।—করিহ=করিও, ইত্যাদি।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' দেশ বিদেশ হইতে প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহারা এই সুন্দর পুঁথিখানির সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন কি? "গোকুল-মঙ্গল" যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদের কলঙ্কের সীমা থাকিবে না।

শ্রীআবদুল করিম।

হাজারার অধিবাসী।

গৃহসামগ্রী, স্ত্রীপুরুষ, বিবাহসংস্কার।

হাজারার অধিবাসিগণের গৃহসামগ্রী ও তৈজসপত্রের কথা বলি। তাহার গৃহে দুই তিন প্রস্থ শয্যা, কতকগুলি ক্ষুদ্র, নেয়ারের খাটের মত বোনা টুল, গোটাকতক চরকা, বস্ত্রাদি ও পশম রাখিবার জন্য দুই তিনটি চুবড়ি, আর একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত 'মঠ' (শস্যাধার) দেখিতে পাওয়া যায়। সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে যে মঠগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এত বড় যে, তাহাতে পঞ্চাশ মণেরও অধিক শস্যের অনায়াসে স্থান হইতে পারে। আমাদের দেশের এক একটা গোলা আর কি? জমীদারেরা আবার মঠে সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহাদের উদর বৃহৎ, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য অনেক অধিক শস্যের আবশ্যক, তাই তাঁহারা শস্য রাখিবার জন্য এক একটা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

চারপাই বা খাটগুলি দড়ি দিয়া বোনা; শয্যার উপকরণ কতকগুলি, গুধ্ড়ি (কাঁথা) আর কম্বল। ধনিগৃহে যে সকল চারপাই দেখা যায়, তাহা দড়ি দিয়া বোনা নহে, চর্ম্মবস্ত্র দিয়া নির্ম্মিত। কেহ কেহ মৃগয়ালব্ধ পশুচর্ম্মে তাহা আবৃত করিয়া থাকে। এই প্রকার খাটকে 'কর্ক্কর খাট' বলে। কন্যাদানকালে বরকন্যাকে যে সকল সামগ্রী দান করা হয়, 'কর্ক্কর খাট' তন্মধ্যে প্রধান।

গৃহস্থেরা ঘর দ্বার প্রত্যহ মার্জ্জনা করে, সেই জন্য তাহা পরিচ্ছন্ন দেখায়। ইহাদের ভোজনপাত্রগুলি অধিকাংশই মৃণ্ময়। ধাতুপাত্রের মধ্যে কেবল বদনা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সম্পন্ন গৃহস্থ বা ধনীর গৃহে তাম্রনির্ম্মিত থালা

ঘটি বাটি প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে। গৃহের প্রাঙ্গণ প্রায় পাঁচ ফিট উচ্চ দীর্ঘ প্রাচীরে বেষ্টিত; তাহার ছাদে আখড় থাকে। পুরস্ত্রীগণ সেখানে পাক করে ও কাটনা কাটে; এক পাশে গোমেষাদি গৃহপালিত পশু আবদ্ধ থাকে। ইংরাজ-রাজত্বে সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত অন্তঃপুরের এই অংশের উন্নতি হইয়াছে।

ইহারা খাটের উপর বসিয়াই পরম আরামে আহারকার্য্য সম্পন্ন করে। সাধারণতঃ ইহারা ডাল ভাত রুটিই আহার করিয়া থাকে। 'ছাজ্ ঘোল' ইহাদের সর্ব্বপ্রধান পানীয়। ইহারা অত্যন্ত মৃগয়ানুরক্ত, এবং সকলেই মাংস-ভোজী।

গৃহজাত 'গজি' (গড়া) কাপড় নীলে ছোপাইয়া উহারা পরিধান করে। বস্ত্র দুই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;—মোটা কাপড়ের নাম 'খাদাড়'; খাদাড় কার্পাসসূত্রে নির্ম্মিত হয়। খুব সরু সূতায় রেশমী পাড় দিয়া যে উৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার নাম 'সুসি'; তাহাতে পাজামা প্রস্তুত হয়। পুরুষেরা সাধারণতঃ ঢিলা পায়-জামা ও আংরাখা পরিধান করে। মাথায় যে পাগড়ী ব্যবহার করে, তাহা পনের হইতে বিশ হাত দীর্ঘ একখানি বস্ত্র; তাহা মাথায় বাঁধিয়া দিব্য আরামে সময়ক্ষেপ করিতে পারে। শীতকালে ইহারা মেষ-পশমের সূতা কাটিয়া কম্বল প্রস্তুত করিয়া তাহাই ব্যবহার করে। মিসওয়ালী ও উত্তর হিমালয়ের গুজর জাতি ভিন্ন সকলেই কোট ও শুভ্র পাগড়ী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পঞ্জাব-জাত নীলবর্ণের লুঙ্গিও অনেকে পাগড়ীর মত ব্যবহার করে; কিন্তু তাহার ব্যবহার খুব সাধারণ নহে; উৎসবকালেই তাহা লোকের মাথায় বিরাজিত দেখা যায়।

স্ত্রীলোকেরা সচরাচর লম্বা কোর্‌তা ও ঢিলা পায়জামা ব্যবহার করে। কোর্‌তার বক্ষঃস্থলে যথেষ্টপরিমাণে রেশমের কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকের কেশগুলি বেণীবদ্ধ, বেণীর সংখ্যা দুই একটি নহে, শত শত বেণী একত্র বদ্ধ! কেশসংস্কারে তাহাদের এতই সময় লাগে যে, বৎসরের মধ্যে দুইবারও তাহারা কেশসংস্কারের অবসর পায় না। বেণীগুলি লম্বাভাবে গুচ্ছাকারে আবদ্ধ, তাহা হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। বেণীর মুখাগ্রে বিবিধ বর্ণের রেশম বা কার্পাসসূত্রের ঝাঁপা ঝুলিতে থাকে। ইহারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিবার জন্ম এক প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহার নাম চুন্নী; 'চুন্নী' দরকার পড়িলে অব-গুণ্ঠনে পরিণত হয়। স্থানে স্থানে ইহার অনেক বিভিন্ন নাম আছে;—কেহ বলে 'দোসাট্টা', কেহ বলে 'ভোসান', কেহ বা 'সিনবা' বলে। এখন অনেকেই

বিলাতী কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মলমলের পাগড়ী ও লংক্লথের কোর্‌তা ও চাদর ইহাদের প্রীতিকর হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। গবর্মেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ, এ দেশে প্রত্যেক বৎসর তিন চারি লক্ষ টাকার বিলাতী কাপড় আমদানী হইতেছে। উত্তর হিমালয়ে পট্টু-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছাগ ও মেষের লোমের সূত্রে পট্টুর বয়ন হয়। ইহা যেমন গরম, তেমনই দীর্ঘস্থায়ী; কসান প্রদেশে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ দেশে পঞ্জাব প্রদেশে প্রচলিত চর্ম্মপাদুকাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর হিমালয়ে এক প্রকার ঘাসের জুতা প্রস্তুত হয়; গুজর জাতি ও দরিদ্র পর্ব্বতীয়েরা এই জুতা পায়ে দেয়। সমস্ত দেশ শীতকালে যখন বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন এই জুতার ব্যবহার আবশ্যক হয়। শীতকালে কোন কোন স্থানে লেপের ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু উত্তর হিমালয়ের শীত লেপের অকাট্য, সুতরাং তূলার পরিবর্ত্তে পশমের ব্যবহার আবশ্যক হইয়া উঠে। যে জাতি মেষপালন ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক চিরদিন পর্ব্বত-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করে, তাহাদিগকেই গুজর বলে।

এ দেশের কৃষকেরা প্রতিদিন তিনবার আহার করে। শীতকালের প্রাভাতিক আহার খুব সকালেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বেলা দশটার পূর্ব্বে হয় না। মধ্যাহ্নে জলপান (টিফিন) করে। তাহার পর ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় পর্য্যাপ্তরূপে পানভোজন করিয়া থাকে। যব, মেজ, বাজরা, মকাই ও আটার রুটী প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধ ও মাখনের সহিত তাহা ভোজন করে। গোধূমের আটার রুটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও অদৃষ্টে জোটে না। তরকারীর মধ্যে শাক সবজী; ডাল ও মাংস ধনী লোকের ভাগ্যেই জোটে। লাউ, আলু, কুমড়া প্রভৃতি তরকারী, কিসমিস, আঙ্গুর, আনার, বটঞ্চী, খোবানী ও সদ্দা এ দেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। কিসমিস ভিন্ন অন্য কোন মেওয়া আফগানিস্থানের মেওয়ার ন্যায় সুস্বাদ নহে। কাচা সদ্দা আমাদের দেশের চালকুমড়ার মত। ভাল ধান এ দেশে একেবারেই উৎপন্ন হয় না; অগত্যা আমাদিগকে বহুমূল্যে পেশোয়ারী চাউল ক্রয় করিতে হইত। মেজ নামক শস্যের পায়স বড়ই মুখপ্রিয়। এখানে মিষ্টান্নের মূল্য অত্যন্ত অধিক বলিয়া সাধারণে অন্য মিষ্টান্নের পরিবর্ত্তে মধু ব্যবহার করে। ইহাতে পাঠকগণ বুঝিতেছেন, মধু এখানে কিরূপ প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হয়। "মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" এ কথা এখানে খাটে না। লবণ ও তৈল ব্যতীত অধিকাংশ খাদ্য-দ্রব্যই জমীদারের ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে ইহাদের ভোজের

ব্যাপারে বিশেষ সমারোহের পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশের মুসলমানেরা গোপনেও সুরাপান করে না; কিন্তু হিন্দু ও শিখ মহাশয়দিগের প্রকাশ্যে সুরাপানে কিছুই আপত্তি নাই। হরিপুর ও এবটাবাদের সোনারেরা ও শিখরা আফিঙ্গের গুণে বিশেষ মুগ্ধ। আমাদের দেশের সনাতন গুলি ও চণ্ডু এখানে ভিন্ন নামে ও ভিন্ন পরিচ্ছদে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া বড় আনন্দলাভ করিলাম! মুসলমানেরাই এ বিষয়ের প্রধান শিক্ষানবীশ।

এ দেশের পুরুষেরা স্ত্রীজাতিকে গৃহপালিত পশুর ন্যায় মনে করে। কিঞ্চিৎ অধিক আদর করে, এইমাত্র প্রভেদ। তাহাদিগকে সর্ব্বদা দাসীর কার্য্য করিতে হয়; অথচ আমাদের হিন্দুর গৃহে দাসীর কার্য্যের মধ্যেও যে গৌরব আছে, এখানে তাহা নাই। তথাপি গৃহস্থ স্ত্রীহীন হইলে আপনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য মনে করে। ব্যক্তিগত অসুবিধাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। দ্বিচারিণীকে এ দেশে সমাজচ্যুত হইতে হয় না। দক্ষিণ হাজারার নিম্নতলবাসিগণ স্ত্রীলোকদিগের সহিত অপেক্ষাকৃত সদ্ব্যবহার করে। সূতা কাটা, তাঁত বোনা, শস্য খাদ্যোপযোগী করা, স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কার্য্য। কিন্তু সুদূর উত্তর হিমালয়ে গৃহকার্য্যের সহিত পশুচারণ, ঘাস কাটা ও ক্ষেত্রে হলচালন ব্যতীত সকল কার্য্যই তাহাদিগকে করিতে হয়। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের কুললক্ষ্মীরা অবসরকাল সূচিকর্ম্মে ক্ষেপণ করেন। ইহাদের মধ্যে এখনও লেখাপড়ার চর্চ্চা প্রবেশ করে নাই। পাতিব্রত্য ধর্ম্মে ইহাদের যথেষ্ট আস্থা আছে। কিন্তু সোয়াৎ প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা স্বামীর প্রতি সেরূপ ভক্তিমতী নহে। সোয়াতী পুরুষেরাও স্ত্রীলোককে অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। সোয়াতী ও উত্তমাঞ্জাই প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা নিখুঁত সুন্দরী। তানাওলী, গুজর ও যাদুন-বংশীয় (ইহারা কি যদু-বংশীয়?) রমণীগণ যেমন সুন্দরী, সেইরূপ বলিষ্ঠা। সোয়াতীরা এই শেষোক্ত জাতি হইতে স্ত্রীসংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহারা অপরিচিত পুরুষ দেখিলে অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়। যদুবংশীয় স্ত্রীলোকেরা ঘরাটে (জলে চালান জাঁতা) দিবারাত্রি শস্য চূর্ণ করিয়া থাকে। সর্ব্বদা বাহিরে বাস করে বলিয়াই বোধ হয় ইহাদিগকে ব্যভিচারিণী হইতে দেখা যায়। দিলজাক-জাতীয় স্ত্রীলোকেরা যেন বারনারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তুরুক-জাতীয় স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত স্বাধীনা। তাহাদের পুরুষেরা যেমন অলস, তেমনই অকর্ম্মণ্য; দিবারাত্রি তাহারা নেশায় 'চুর' হইয়া থাকে। তুরিন-বংশীয় স্ত্রীলোকেরা সমাজ ও

গৃহের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; পুরুষের উপর তাহাদের প্রভুত্ব দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

ইহারা প্রায় সকলেই মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের মর্ম্মের সহিত ইহাদের কোনও পরিচয় নাই। বাহিরের আবর্জ্জনা—অর্থাৎ দেশপ্রচলিত সংস্কার লইয়াই তাহারা অহোরাত্র ব্যস্ত। ইহারা জ্ঞান, শিক্ষা, সমাজনীতি, বা ধর্ম্মনীতির কোনপ্রকার উন্নতি করিতে চাহে না; কোন নিয়মেও ইহারা আবদ্ধ নহে। সুতরাং নিতান্ত বর্ব্বর জাতির ন্যায় জীবনযাপন করে। হাজারা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অধীনে আসিলে রাজকর্ম্মচারিগণ ইহাদিগকে নিয়মাবদ্ধ করিতে বিশেব চেষ্টা করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারিগণের বিশেষ চেষ্টায় এখন এখানে যে ভাবে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আশা হয়, বহুকালপ্রচলিত দুর্নীতি ও কলুষিত প্রথা ক্রমেই ইহাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইবে। পঞ্জাবের শিক্ষা ও নীতি ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং অনতিকালমধ্যে এ দেশের আচার ব্যবহার যে অন্যান্য দেশের ন্যায় সুসংস্কৃত ও সুসঙ্গত হইবে, তাহার যথেষ্ট আশা করা যায়। ইহারা মুসলমান-দিগের যে সকল সামাজিক প্রথার পালন করে, তাহার মধ্যে বিবাহ ও বিবাহভঙ্গ, এই দুইটিই প্রধান। আমাদের দেশের মুসলমানগণের ন্যায় ইহারাও বিবাহকে নিকা ও বিবাহভঙ্গকে তালাক্ কহে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭। ১৮ বৎসরবয়স্ক পুরুষের সহিত ১২। ১৪, বড় জোর ১৬ বৎসরের স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়। বহুবিবাহপ্রথা মুসলমানধর্ম্ম-সঙ্গত হইলেও, এ দেশে সাধারণের মধ্যে তাহা প্রচলিত নাই; কেবল বহুপুত্র-কামনাকারী সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণই বহু পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। তুরকী-খেল, ওসমানজাই ও যাদূনেরা এইরূপ বহুবিবাহের পক্ষপাতী। এই সকল জাতি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়। যুদ্ধে বহুসংখ্যক নরহত্যা ঘটে; সুতরাং জনসংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার জন্য বহুদারপরিগ্রহ ইহারা আবশ্যক মনে করে। পূর্ব্বকালে পরাজিত জাতির মধ্য হইতে ইহারা স্ত্রীসংগ্রহ করিত; এখন আর তাহা তেমন দেখা যায় না; তবে এমন লোক প্রায় দেখা যায় না, যে দুইটি স্ত্রী গ্রহণ না করিয়াছে। অন্যান্য জাতির তুলনায় তুরকীখেল-জাতীয় লোকের সংখ্যা অল্প। ইহারা অত্যন্ত ব্যভিচারী। সর্ব্বদাই অন্যের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করে। ওসমানজাইদিগের অপেক্ষা যাদূনদিগের প্রকৃতি শান্ত। তাহারা বহুবিবাহে বিরত। সোয়াতীদিগের মধ্যে বহুবিবাহ

অত্যন্ত অধিক; ইহাদের মধ্যে আবার যাহারা সঙ্গতিপন্ন, তাহারা কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি ব্যাবহারিক, কোন প্রকার রীতিরই মর্য্যাদা রক্ষা করে না। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পতির প্রসন্নতা লাভ করে। সে সকল স্ত্রীলোককে অধিকাংশ সময়ই বাহিরে বাহিরে কাটাইতে হয়; ইহাতে তাহাদের চরিত্রদোষ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; এমন কি, বিবাহের পূর্ব্বেও অনেককে বহু পুরুষের সংস্রবে থাকিতে দেখা যায়।

অতঃপর বিবাহসংস্কার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা যাউক। পাত্র পাত্রী মনোনীত হইলে আমাদের দেশে যেমন পাকা দেখার নিয়ম আছে, এ দেশেও সে প্রথা বর্ত্তমান আছে। এ দেশে তাহাকে 'ইজ্ৰীব কবুল' বা 'সারা জোয়ার' বলে। যখন পাত্রপক্ষীয় লোক পাত্রীর পিতার গৃহে উপস্থিত হইয়া বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপিত করে, তখন আত্মীয়কুটুম্বগণকে সমারোহপূর্ব্বক ভোজন করাইতে হয়। ভোজনান্তে পরিতৃপ্তমনে সকলে বৈঠকে উপবিষ্ট হইলে কন্যাপক্ষের নাপিত একখানি সুবৃহৎ পিত্তলের থালা আনিয়া তাহাদের সম্মুখে ধারণ করে; তখন বরকর্ত্তা আপনাদের সমস্ত অলঙ্কারাদি সেই থালের উপর সাজাইয়া দেয়। নাপিত অলঙ্কারপূর্ণ থালা লইয়া অন্দরে পাত্রীর মাতার সম্মুখে স্থাপন করে। কন্যার জননী থালা হইতে সমস্ত অলঙ্কার তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা কন্যাকে ভূষিতা করেন। তাহার পর থালা ফিরাইয়া দিয়া বরকর্ত্তার নিকট বলিয়া পাঠান, "গহনা বড় অল্প হইয়াছে, আরও চাই।" তখন বরকর্ত্তা ও তাঁহার সহচরেরা কন্যাকর্ত্তার সহিত তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হয়; এবং এই যুক্তি উপস্থাপিত করে যে, "আমাদের যাহা দিবার, তাহা দিয়াছি; তোমরা পাত্রকে কি দিবে, দাও।" সুখের বিষয়, এই বিবাদ হাতাহাতিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই, পাত্রীপক্ষ দানের উপযোগী যৌতুকাদি সেই বৈঠকে লইয়া আসে। যে যাহা কিছু দিতে ইচ্ছা করে, তাহা তাহাকে সেই থালেই সাজাইয়া দিতে হয়।

এই প্রকার আদান প্রদান কার্য্যে কন্যার পিতারই জয়! কারণ, তিনিই বরের পিতার নিকট হইতে অনেক অধিক অর্থ নিষ্কাশন করিয়া লইয়া থাকেন। তাহা কন্যা-বিক্রয়ের শুল্ক বলিয়াই আমাদের মত বিদেশীর নিকট প্রতীত হয়। তবে বাঙ্গালা দেশে আজকাল ভদ্র বরের পিতা যেরূপ কশাই-সুলভ আচরণে অভ্যস্ত হইয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, এ রাজ্যে সেরূপ কশাই-গিরি আয়ত্ত হইতে এখনও বিস্তর বিলম্ব আছে। কারণ, ইহারা এখনও সভ্য হয় নাই।

পাত্র ও পাত্রীর বিবাহসম্বন্ধ এইরূপে পাকা হইলে, কন্যাপক্ষ হইতে বৈঠকের সভ্যগণের মধ্যে সরবত-বিতরণ আরব্ধ হয়। অতঃপর পাকা দেখা। পাকা দেখা শেষ হইলে কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তার সহিত মিলিয়া তিনবার উচ্চৈঃস্বরে 'ইজাব কবুল' 'সারা জোয়াব' বলিয়া ঘোষণা করে। অতঃপর বিবাহের দিন স্থির হয়।

সকল জাতির মধ্যেই বিশেষ সমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যে পক্ষ হইতে যে যৌতুক আসে, তাহা স্ত্রীধনরূপে গণ্য হয়। পাত্র বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া পাত্রীর জন্য ধন, অলঙ্কার, বস্ত্র ও দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষী প্রদান করে। কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় সে সমস্ত সঙ্গে লইয়া যায়। সম্প্রদানকালে বিবাহসভায় আত্মীয়, স্বজন ও গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত লোক জন উপস্থিত থাকেন; তাঁহারা বিবাহের সাক্ষী বলিয়া পরিগণিত হন। স্ত্রীধনের উপর পত্নীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। সেই সকল স্ত্রীধন স্ত্রী স্বামীকে দান করিতে পারে, অপরকেও বিক্রয় করিতে পারে। বিবাহ-কালে স্বামী অঙ্গীকার করে যে, তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক, তৃতীয়াংশ, বা সিকি স্ত্রী নিজসম্পত্তিরূপে পরিগণিত করিবে। তাহার মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য এই সম্পত্তি সংরক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিবাহসভাতেই সকলকেই 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' মনে করিতে হয়। আজ কাল এ দেশের মুসলমান-সমাজে ধনলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল।

আমাদের হিন্দু ক্ষত্রিয়সমাজে বিবাহকালে যে বিধি প্রবর্ত্তিত দেখা যায়, সীমান্ত প্রদেশেও সেই বিধি বর্ত্তমান আছে। মহাবীর অর্জ্জুনকে লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী দেবীর পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যেও সেই প্রথা বর্ত্তমান আছে। বর সশস্ত্র অশ্বারোহণে বিবাহ করিতে আসে। কন্যাপক্ষ হইতে কোনও প্রকাশ্য স্থানে লক্ষ্য রক্ষিত হয়। তাহা ভেদ করিতে পারিলে তবে বিবাহ সম্ভব হয়। বর ক্রমান্বয়ে তিন বারেও যদি লক্ষ্যভেদ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে প্রস্থান করিতে হয়। এই প্রথা দেখিয়া অনুমান হয়, হাজারা জাতি পূর্ব্বে হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিল; ভারতে মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ে মুসলমান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বপ্রথা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

ভিন্নজাতীয়ের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইলে পাত্রকে যথেষ্ট 'মেহর মিসিল' (যৌতুক) দিতে হয়; এবং পাত্রকে সেই জাতীয় রীতি

অনুসারে বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু ওসমানজাই জাতির মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত নাই। কন্যা-সম্প্রদানকালে নগদ শুল্ক গ্রহণ করা ইহাদের সমাজে বড়ই কলঙ্কজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। যাদুনবংশীয়দিগের মধ্যে আরও একটি অপূর্ব্ব প্রথা প্রচলিত দেখা যায় ;—তাহারা কন্যাকে বরগৃহে লইয়া গিয়া সম্প্রদান করিয়া আসে।

হিন্দুদিগের ন্যায় এ দেশের মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহের কোনও কড়াক্কড় নিয়ম নাই। বর কনে পরস্পর শুভদৃষ্টি করিয়া সকলের সম্মুখে পতিপত্নী-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই বিবাহ হইয়া যায়।

এ দেশে বিবাহকালে আর একটা অতি কদর্য্য প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। দরিদ্র হইতে ধনবান পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা পুরুষসভায় আসিয়া অসঙ্কোচে বরযাত্রীদিগকে এমন কদর্য্য ভাষায় 'সিট্‌নি' (গালিগালাজ) করিয়া থাকে যে, তাহা শুনিলে লজ্জায় সেখান হইতে পলাইয়া আসিতে হয়। এ দেশের পুরুষেরা এই কদর্য্য প্রথার নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। পূর্ব্বে বিবাহকালে নৃত্যগীতের প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত ; সুখের বিষয়, এ দেশের লোক এই প্রথার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া ক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিতেছে। বিবাহে বহু আড়ম্বর ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ কথা মুসলমান-দিগের সম্বন্ধেই খাটিয়া থাকে। হিন্দুদিগের প্রথা এখনও অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই জন্যই বিবাহের ব্যয়ে অনেক হিন্দুকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় ; পিণ্ডের উপায় করিতে গিয়া অন্নমুষ্টি হইতেও অনেক সময় ইহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয়।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি।

৭ই মাঘ। রাত্রে গায়ে দিবার লেপখানা দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল ; সকালে ঘণ্টা খানেক ধরিয়া তাহাই শেলাই করিলাম। এখানে গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত বড়ই এলোমেলো। কোনও মতে কেবল দিনগুলাকে জীবনের গৃহ হইতে আবর্জ্জনার মত ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছি।

কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Peel Castleএর প্রতিকৃতির উপর কবিতা অনেক দিনের পর আবার পাঠ করিলাম। প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের যে বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি, কবি তাহার কি চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন! কবির বন্ধু তাঁহাকে Castleএর যে অবস্থার ছবিখানি উপহার দিয়াছিলেন, তাহা এই ঘোর সংসার-সাগরে নিপতিত দুঃখশোকসন্তপ্ত মনুষ্যমাত্রেরই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। দুঃখ যখন অনিবার্য্য, তখন প্রকৃত বীরের ন্যায় উহাকে উপেক্ষা ও সহ্য করা ব্যতীত আমাদের আর কি উপায় আছে?

"চৌদিকে ঝটিকা ঝঞ্ঝা তরঙ্গ আঘাত,
তুচ্ছ সবে করহ গণন।"

দুঃখই দুঃখের পরিণাম নহে।

কবি নিজেই তাহা বলিয়া দিয়াছেন;—

"Such sights or worse, as one before me here,—
Not without hope we suffer and we mourn."

"না হও নিরাশ ওরে ভক্তিমান্!
মোচন আছ রে আপদে।"

৮ই মাঘ। শনিবার সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় নবীন বাবুর সহিত দেখা হইল। কথাবার্ত্তা অধিকাংশই তাঁহার নূতনপ্রকাশিত "কুরুক্ষেত্র" কাব্য সম্বন্ধে। উহার সমালোচনায় কে কি কথা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে কিছু অধিক মাত্রায় মনোযোগী দেখিলাম। * * * * তাঁহার অমিত্রাক্ষর রচনায় বিরাম-যতির বৈচিত্র্যের অভাবের কথা আমি উল্লেখ করিলাম। তিনি বলেন, "লেখনীর মুখে যাহা আইসে, তাহাই বসাইয়া যাই; অপর কোনও বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ দিই না।" আমার বোধ হয়, লেখকদিগের ইহা একটা বিষম ভ্রম। শব্দ ও ছন্দ নির্ব্বাচন করিয়া তবে কবিতায় বসাইতে হয়। সকল বিষয়েই বৈচিত্র্যের পিপাসা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। যিনি অপরাপর রচনার ন্যায় কাব্যেও সে পিপাসা চরিতার্থ করিবার দিকে লক্ষ্য করেন না, তাঁহার লেখা লোকের তত মনোহারী হয় না। ইংরাজ মহাকবি মিল্‌টন্ ও আমাদের মাইকেলের অমিত্রাক্ষর রচনা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। আমাদের সকলেরই এই সকল মহান আদর্শের পথে বিচরণ করা কর্ত্তব্য।

৯ই মাঘ। প্রায় সমস্ত দিন সু-চন্দ্রের বাটীতে অবস্থান। * * * সুলেখক শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে অদ্য প্রথম দেখিলাম। বয়সের

তুলনায় শরীরটা কিঞ্চিৎ বেশী জীর্ণ বলিয়া বোধ হইল। ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার 'ম্যালেরিয়া-মঠে' অবস্থানের ফল। ঠাকুরদাস বাবু দুঃখ করিতেছিলেন যে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান পাঠকেরা, যে সকল কবিতার সহজে অর্থগ্রহ হয় না, তাহারই সবিশেষ অনুরাগী। যে কবিতার আদৌ কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই, কেহ কেহ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করেন। পাঠক-নামের উপযুক্ত অথচ এরূপ মতাবলম্বী লোক আমার চক্ষে বড় পড়ে নাই। তবে ঠাকুরদাস বাবুর মত আমরাও বলি যে, আমাদের সু—চন্দ্রকে কখনও কখনও এই দোষাক্রান্ত দেখিতে পাই। সু—র দলভুক্ত আর একটি, আমাদের নিতান্ত প্রিয় প্রিয় বন্ধু ন—বাবু। আমাদের বিশ্বাস এই, কবি যে ভাবকে বিশদ করিয়া একটা জীবন্ত গঠন প্রদান করিতে পারেন না, তাহা তাঁহার নিজেরই ভাল আয়ত্ত হয় নাই। তবে, ঘটি বাটির অর্থও বুঝাইতে হয়, এমন অগাধবুদ্ধি পাঠকও আছেন!

১০ই মাঘ। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এক খণ্ড "কোয়ার্টার্লি রিভিউ" পত্রিকায়, গোল্ডস্মিথের জীবনবৃত্ত-সমালোচনা পাঠ করিতে করিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা পাইলাম।—"His habit was first to set down his ideas in prose and, when he had turned them carefully into rhyme, to continue retouching the lines with infinite pains to give point to the sentiment and polish to the verse." তাহার পর চরিতাখ্যায়ক Forsterএর কথার সমর্থন করিয়া সমালোচক বলিতেছেন;—The bulky ore can seldom obtain currency, however rich the vein. Those who extract and collect the gold, no matter how thinly it may have been originally spread, will ever be the writers most prized by the world." বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে এই কথাটার বিশেষ আলোচনা হওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছি। বাঙ্গালার বর্ত্তমান কবিদিগের মধ্যে অনেকেই ভাষার বিষয়ে বিলক্ষণ উদাসীন। ইহা সুলক্ষণ নহে। গতকল্য কবিবর নবীনচন্দ্রের "বুদ্ধদেব" * কাব্যের খানিকটা কাপী দেখিলাম। ইহা পেন্সিলে লিখিত। কবি গর্ব্ব করিয়া বলিলেন,—"দেখুন, ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে আমি এই দীর্ঘ পরিচ্ছেদটি (নিষ্ক্রমণ) লিখিয়াছি। ইহাতে একটি লাইনও পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাইবেন না। লেখনী যেমন লিখিয়াছে, মুদ্রাকরও তেমনই ছাপিতেছে। কাটাকুটি করা আমার অভ্যাস নহে।" জুপি-

* পরে "অমিতাভ" নামে প্রকাশিত হয়।—সাহিত্য-সম্পাদক।

তারের মস্তিষ্ক হইতে যুদ্ধদেবতা মার্সের মত যাঁহাদের কবিতা একবারে সম্পূর্ণ সাজে বাহির হইয়া আইসে, কাটাকুটি করা তাঁহাদের প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত জগতে এরূপ দৈবপ্রতিভাশালী কবি ত দেখিলাম না। * * * জগতে স্থায়ী আনন্দের ও সান্ত্বনার উপাদান হইবে মনে করিয়া যে কাব্য সাধারণ-সমক্ষে প্রচারিত করিতেছি, তাহার পংক্তি সমুদায় ঘণ্টায় কাহনের হিসাবে কখনও বাহির হইতে পারে না। আমি গোল্ডস্মিথের মত অতটা করিতে বলি না; কিন্তু রচনার গাম্ভীর্য্য ও স্থায়িত্বের জন্য যত্ন পরিশ্রম ধীরতা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাই বলিতেছি।

১১ই মাঘ। গোল্ড্স্মিথের জীবনবৃত্তের সমালোচনা পাঠ করিলাম। জীবনচরিত-পাঠে আমি যত আনন্দ পাইয়া থাকি, কবিতা ভিন্ন আর কিছুতেই তত সুখানুভব করি না। মহাপুরুষদিগের জীবন অশেষশিক্ষাপ্রদ। কিন্তু, কেবল শিক্ষাই আমার এই আত্যন্তিক অনুরাগের কারণ নহে। ইহাঁদিগের জীবনগত ঘটনাবলী, কোন্ অবস্থায় পড়িয়া ইঁহারা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের কত দূর সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছিলেন, এই সকল অবগত হইতে হৃদয়ে স্বভাবতঃই একটা আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ইহাঁদের দোষ দুর্ব্বলতাগুলিকেও ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। সাহিত্যসেবিগণ জগতের নিমিত্ত যে অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়া থাকেন, জগৎ তাহার উপযোগী কৃতজ্ঞতা কবে দেখাইতে পারিয়াছে? গোল্ড্স্মিথের প্রথম জীবন কি কষ্টেই অতিবাহিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় প্রতিভা হৃদয়ে ধারণ করিয়াও তাঁহাকে সামান্য উদরান্নের উদ্দেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। আমার কখনও কখনও মনে হয়, কবিগণ অনেক সময়েই আপনাদের দুর্দ্দশার জন্য আপনারাই দায়ী। গোল্ড্স্মিথের জীবন তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই যে সংসার সম্বন্ধে একবারে উদাসীন হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। কবিই হউন, আর অ-কবিই হউন, সকলেরই বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর আধিপত্যলাভে প্রয়াসী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

১২ই মাঘ। কবিবর ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ "ওয়াই" নামক নদীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"How oft
In darkness and amid the many shapes

Of joyless daylight; when the fretful stir
Unprofitable, and the fever of the world
have hung upon the beatings of my heart,
How oft, in spirit, have I turned to thee !"

আমারও ত দিবস নিরানন্দে কাটিতেছে, সংসারব্যাধি আমাকেও ত রীতিমত আক্রমণ করিয়াছে! আমি কি কাহাকেও সম্বোধন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতে পারি না? এমন কি কেহ নাই, জগতের উত্তপ্ত প্রান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে, যাহার চরণ-তলে আসিয়া বিশ্রামলাভ করিয়াছি? সে আর কেহই নহে; সে কেবল তুমি! তুমি সেই "মাতৃসম মাতৃভাষা"। মা আমার! এই ক্ষীণশক্তি নিতান্ত দীন-দরিদ্রকে তুমি যে তোমার পদ-সেবার অধিকারী করিয়াছ, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার। আমি অন্য লাভের প্রয়াসী নহি। তোমার অমর মুখমণ্ডলে আমি নিত্য নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছি। দিনে দিনে তোমার হৃদয়গত জ্যোতিরাশি জগতে বিকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সেই স্বর্গীয় আলোকে আমার তমসাবৃত জীবন দিনে দিনে উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে, এই আশাতেই প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছি। তোমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতী সন্তানদিগের মধ্যে স্থান পাইব, এমন উচ্চ আশা করি না, মা! তুমি কেবল এই আশীর্ব্বাদ করিও, যেন এই যৎসামান্য শক্তি, যাহা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা অপব্যয়িত না হয়। মৃত্যুর পর লোকে যদি এই অধমের নামমাত্রও মনে না করে, ক্ষতি নাই; কিন্তু মা! সে যথাসাধ্য তোমার সেবা না করিয়াই মরিয়াছে, এ কথা শুনিলে লোকান্তরেও আমার শান্তি হইবে না।

১৩ই মাঘ। মহাকবি মিল্টনের সমালোচনায় স্যামুয়েল জন্‌সন্ বলিয়াছেন,—"Finding blankverse easier than rhyme, Milton was desirous of peresuading himself that it is better."

আমার বোধ হয়, সমালোচক অমিত্রাক্ষরের প্রকৃতি ঠিক ধরিতে পারেন নাই। ইহা যে মিত্রাক্ষর রচনার অপেক্ষা সহজ, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। মিত্রাক্ষর রচনায় অনেক সময় শব্দের মিল ঠিক বজায় করিয়া দিতে পারিলেই কবির কার্য্য যেন শেষ হইয়া যায়; রচনার অপর কোনও দোষ থাকিলে, তাহা মিলের সৌন্দর্য্যে চাপা পড়িয়া যাইতে পারে। অমিত্রাক্ষরে তাহা হইবার যো নাই। মিত্রাক্ষরের একটা সামান্য নিয়মের দায়

হইতে উদ্ধার হইলাম বটে, কিন্তু তাহার স্থলে এ যে কঠোরতর নিয়মের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। শব্দের মিলন তত কঠিন কাজ নহে। অমিত্রাক্ষর রচনায় এক পঙ্ক্তি হইতে অপর পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত বাক্যকে টানিয়া লইতে হইলে আগাগোড়া যে একটা সুরের ও ঝঙ্কারের মিল রক্ষা করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তাহা বাস্তবিকই বিশেষ কষ্টসাধ্য। যে সকল মহাজনের সুরজ্ঞান শব্দজ্ঞানের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে, তাঁহারা ভিন্ন সে কার্য্য আর কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। আর একটা কথা, মিত্রাক্ষরের যে একঘেয়ে ভাব, তাহা মহাকাব্যের বা উদ্দীপনাপূর্ণ রচনার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। বোধ হয়, এই জন্যই, আমাদের রবীন্দ্রনাথ আজ কাল মিত্রাক্ষরের ভিতর অমিত্রাক্ষরের পদ্ধতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা প্রশংসার্হ।

১৪ই মাঘ। হায়! এত কাল একত্র থাকিয়াও আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। কি করিলে তুমি সুখী হইতে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। তুমি আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পাও নাই বলিয়া দুঃখ করিতে; আজ তুমি মৃত্তিকা-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছ; আজ ত সকলই দেখিতে পাইতেছ। তুমি আমাকে নূতন সংসারে সংসারী করিয়া অবসর লইতে চাহিয়াছিলে; তুমি বোধ হয় ভাবিতে, তোমাকে লইয়া আমার সকল অভাব, সকল শূন্যতা পূর্ণ হয় নাই; আমিও বোধ হয় কখনও কখনও তাহাই ভাবিতাম। কিন্তু আজ তোমাকে হারাইয়া যে চারি দিক শূন্য হইয়া গিয়াছে। অন্তর বাহির, সকলই মরুময়। আজ তুমি অবশ্যই বুঝিতেছ, তুমি তোমার নিজেরই অজ্ঞাতসারে এই জীবনের কতটা স্থান অধিকার করিয়াছিলে। কিন্তু আমি তোমাকে দূষিব না; তুমি বোধ হয় আমাকে সুখী করিবে ভাবিয়াই চলিয়া গিয়াছ। এখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া হয় ত নিজেই অনুতপ্ত হইতেছ। আমি মনে মনে জানিতেছি, আমিই তোমার নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধী। তোমার কাছে ক্ষমা চাহিবার পূর্ব্বেই তুমি পলায়ন করিয়াছ। আজ আমার এই দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া তুমি কি আমাকে মার্জ্জনা করিবে না? এই জীবন-পথের এখনও কত দূর অবশিষ্ট আছে, তাহা ত জানি না! সেই দীর্ঘ পথে, এইরূপ ঘোর অন্ধকার বাহিয়া, আমি কি প্রকারে কালযাপন করিব! কি উন্মত্ততাই তোমার জুটিয়াছিল। আমি কি এতই নরাধম, তোমার শেষ মুহূর্ত্তের একটা কথারও অধিকারী হইলাম না। কে জানে, হয় ত কিছু রাখিয়া গিয়াছিলে। তাহাতেও লোকে আমায় বঞ্চিত করিল।

হায় হায়! কাহার অভিশাপে আমার জীবনটা একবারে বন্ধনবিহীন নিরুদ্দেশ্য হইয়া পড়িল? মনে হয়, বেশী দিন যেন আর ভুগিতে হইবে না। আয়ুমূল ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে।

১৫ই মাঘ। কলিকাতায় যাইয়া সন্ধ্যার সময় হী—বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার সহিত প্রায় দুই ঘণ্টা কাল নানাপ্রকার কথোপকথনে বেশ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। তিনি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুস্তিকাকারে মুদ্রিত একটি বক্তৃতা দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যসমূহের বেশ একটু ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে হী—র সহিত আমার যতটা মতের মিল হয়, এত আর কাহারও সহিত হয় না। অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে আমি যাহা মনে করি, তিনিও তাহাই বলেন। একটা বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার একমত হইয়া উঠে না। তিনি রবীন্দ্রনাথকে Herric, Carew প্রভৃতির দলে ফেলিয়া দিতে চান। আমার বোধ হয়, তিনি রবীন্দ্রের নূতনপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থসমূহ পাঠ করেন নাই বলিয়াই তাঁহার মনের এই ভাবটা এখনও পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। "বসুন্ধরা"র ন্যায় কবিতা এলিজাবেথীয় যুগের প্রসাদভোগী কোনও কবিই লিখিতে পারিতেন কি না, নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। রবীন্দ্রের হৃদয়ের যে উদারতা, তাহা তাঁহাদের কাহারও ছিল না। তাঁহারা কেবল খুঁটিনাটী লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু রবীন্দ্র অনেক সময় উন্মুক্তপক্ষ চাতকের ন্যায় আকাশের প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া আইসেন।

১৬ই মাঘ। সমস্ত দিবস সু—চন্দ্রের বাটীতে অবস্থান। বন্ধুবর ন—বাবু আসিয়াছেন। রবিবারের সাহিত্য-আসরে যাঁহাদের আগমন স্বভাবতঃ প্রত্যাশা করি, তাঁহাদের মধ্যে কেবল অক্ষয় বাবু ও আমার স্নেহময় নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না। তাই বোধ হয় আজিকার আসরটা মাঝে মাঝে কেমন ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। তবুও সে সভার যে আনন্দ, তাহা এ জন্মে ভুলিবার নয়।

মাঘ মাসের "সাধনা"য় রবিবাবুর "বিদায়-অভিশাপ" শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কথোপকথনের আকারে লিখিত কচ ও দেবযানীর বিদায়দৃশ্য। রবিবাবু মিত্রাক্ষরের সহিত অমিত্রাক্ষরের পদ্ধতি মিশাইয়া আজ কাল যেরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বেশ প্রীতিপ্রদ। "বসুন্ধরা"র পর ইহা বাহির হওয়াতে আমি রবীন্দ্রের ভাষা ও ছন্দের অবনতি

মনে করিতেছিলাম। কিন্তু শুনিলাম, ইহা "বসুন্ধরা"র বহু পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং কবিতার ভাষা সম্বন্ধে তিনি যে দিন দিন উন্নতি করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কবিতায় "ধর্ম্ম জানে প্রতারণা করি নাই" ইত্যাদি গদ্যময় পংক্তি এবং যতি ও শব্দবিন্যাসের দোষ অনেক স্থলে দেখিলাম। কিন্তু ঠাকুর-কবির স্বভাবসুলভ সুন্দর বর্ণনা ও সহজ কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবিতাটি পড়িতে বিরক্তিবোধ হয় না। ব্রাহ্মণতনয় কচ স্বার্থময় প্রেমের উপর কর্ত্তব্যের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, এবং দেবযানীর কঠোর অভিশাপের বিনিময়ে যে উদার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহাই এই কবিতার বর্ণনীয়। উদ্দেশ্যের জন্য যতটুকুর প্রয়োজন, কবিতাটিকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। কচের চরিত্র মহাভারত হইতে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

১৭ই মাঘ। কেহ কেহ বলেন, মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পদ্ধতির একত্র সংমিশ্রণ রবীন্দ্র বাবুর নিজের উদ্ভাবিত। ঠাকুর-কবি যে অনেক বিষয়ে, অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষায়, নূতনত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার সকল প্রণালীর পক্ষপাতী না হইলেও, আমি স্বীকার করি। কিন্তু বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাঁহার উপাসকদিগের একটু সাবধান হইয়া মতপ্রকাশ করা উচিত। এক জন ইংরাজ সমালোচক, "There is nothing new under the Sun" এই প্রবাদবাক্যের প্রমাণস্বরূপ বলিয়াছেন যে, ইংরাজী সাহিত্যে এই মিশ্রিত পদ্ধতির বয়স তিন শত বৎসরেরও অধিক হইয়া গেল। মান্ধাতার আমলের জন্ চল্‌খিল্ হইতে আরম্ভ করিয়া লে হণ্ট, কীট্‌স্, শেলী, ব্যারী করণওয়াল প্রভৃতি অনেকেই এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন। আর, আমাদের দেশেও ইহা নিতান্ত নূতন নহে; মাইকেলের কবিতার স্থানে স্থানে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়; হেমচন্দ্র সে কথা মহাকবির "মেঘনাদ"-সমালোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন। তার পর, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী (নির্ব্বাসিতের বিলাপ) কবিবর নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালী লেখকগণও ইহার বহুল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও রবীন্দ্রনাথ যে ইহাকে দিন দিন মার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া আনিতেছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমার বোধ হয়, ঠাকুর-কবি বৈষ্ণব পদকর্ত্তা-দিগের মোহ অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন। তবে, বাঙ্গালায় বৈষ্ণবদিগের পর আর কবি জন্মায় নাই, তাঁহার এ মতটা এখনও আছে কি না, বলিতে পারি না।

১৮ই মাঘ। "স্বপ্নদৃশ্য" নামধেয় সনেটটি সু— ছাপাইতে দিয়াছেন কি না, জানিবার জন্য লিখিলাম। পঙ্কুর সংবাদও পাঠাইতে বলিয়াছি। শিশুটির চিন্তা দিন রাত মনকে আকুল করিয়া তুলে। * * * নানাপ্রকার বিপদব্যাধির অন্ধকারের মধ্য দিয়া সেই ক্ষীণ অসহায় দীপালোকটিকে কি উপায়ে বাঁচাইয়া লইয়া যাইব, ভাবিতে গেলে প্রাণ চমকিয়া উঠে। বিধির মনে যাহা আছে, তাহাই হউক। * * * *

আমার কুটীর।

আমার এই কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে,—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ও পারে!
ভোরের বেলা উঠ্‌লে রবি শত রঙ্গের মেলা,
ইন্দ্রধনু-বসনখানি পরেন রাণী বেলা!
শুভ্র ফেনের আঁচলখানি গরবেতে ফুলে'
কূলে কূলে দুলে' দুলে' লুটায় পদমূলে!

আমার এই কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে,—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ও পারে!
আঙ্গিনার সম্মুখেতে বিস্তারিত বেলা,—
তরঙ্গিত বালুর স্তূপে কড়ি-ঝিনুক-মেলা!
ছোট বড় গণ্ডশিলা প'ড়ে জলের তীরে,—
করী যেন করভ সাথে নেমেছে নীল নীরে!

আমার এই কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে,—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ও পারে!

ঘন তালী-বনের মাঝে সরু পথের রেখা,
সুন্দরী-সীমন্তে যেন সিন্দুরের রেখা!
বাতাস সদা মাতাল যেন উঠে' প'ড়ে ছুটে;
নারিকেলের কুঞ্জগুলি আকুল মাথা কুটে'!

আমার এই কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে,—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ও পারে!
ধীবরদের নৌকাগুলি কালো টীপের মত
ঢেউয়ের সাথে লুকোচুরী খেল্‌ছে অবিরত;
উপলে রচিত গুহা—ঢেউয়ের তীব্র বেগে,
তারি মাঝে বসে' বসে' স্বপ্ন দেখি জেগে'!

আমার এই কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে'—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ও পারে!
ধূ-ধূ ধূ-ধূ বারি-রাশি, হু-হু হু-হু গান,—
তারি মাঝে হারিয়ে ফেলে' মুগ্ধ সরল প্রাণ
অন্য-মনে থাকি চেয়ে বালুর 'পরে বসে;
মাথার উপর ফুটে তারা, সন্ধ্যা নেমে আসে!

আমার এই কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে,—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ও পারে!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সহযোগী সাহিত্য।

মহামতি রাণাড়ে।

মহামতি রাণাডে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই মহাত্মার জীবনব্যাপী সাধনের স্মৃতি সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরে চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে না কি? অদ্য কল্যবেণীর বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় বোম্বাইবাসী ভক্তগণ তাঁহার অশেষ গুণগ্রামের আলোচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তথায় চিপোলীন, বদেশকর, রাণাডের সুযোগ্য শিষ্য মাননীয় গোখেল মহোদয় মৃত্যুকালে রাণাডের অসাধারণ কর্ম্মানুরাগ ও অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধে যে মহনীয় কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। বাক্-চতুর বাঙ্গালী আমরা তাহা হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। সেই আশায় গোখেল মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ "সাহিত্যের" পাঠকগণের জন্য অনূদিত হইল।

গোখেল মহোদয় বলেন, স্বর্গীয় ধীমান রাণাডে জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানবিতরণে চিরজীবন যে অনন্যসাধারণ উৎসাহ ও আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কেবল অশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিবার অলৌকিক শক্তি নয়, কর্ম্মই তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল—কর্ম্মেই তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন। কর্ত্তব্য পালন আগ্রহই তাঁহার মহচ্চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব। আত্মমতবাদ তাঁহার নিকট অনাদরণীয় ছিল না; বিপথে নিয়োজিত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি দেখিয়াও তিনি হতাশ হইতেন না, কিন্তু কর্ম্মে বিরাগ দেখিলে তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিতেন—চরিত্রের সে দোষ হইতে উদ্ধার পাওয়া, তাঁহার মতে, বড়ই দুঃসাধ্য। দায়িত্বকে ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান না করিলে তিনি স্বয়ং কোনও কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার অনুষ্ঠিত বাহ্যকলাপই কি অল্প? গুরুতর রাজকার্য্য সম্পাদিত করিয়া তিনি দেশের জন্য একাকী যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, ছয় জন একত্র মিলিয়া তাহা করিয়া উঠিতে পারে না। দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি, এই সকলের অনুশীলনেই তিনি সমান আনন্দ লাভ করিতেন। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া "পুণা সার্ব্বজনিক সভার" পরিচালক থাকিয়া তিনি নিজের অসাধারণ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। সভার সর্ব্বোত্তম পুস্তকগুলি ও Quarterly Journal-এর তদানীন্তন অধিকাংশ প্রবন্ধই তাঁহার লিখিত। সামাজিক সংস্কার লইয়া তিনি পাঠ্যাবস্থার পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব্বাহ্ন অবধি নিরন্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। অশ্রান্তভাবে লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া, তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া ও উপদেশ দিয়া তিনি দেশের সমস্ত সংস্কার-ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ও সহায় থাকিতেন। তিনিই Social Conference-এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কারেও তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ পরম উপাদেয়। তাঁহার রচিত ভারতের অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় রচনাগুলি

পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি কিরূপ চিন্তাশীল ছিলেন। পুণাতে কয়েক বৎসর যাবৎ যে শিল্পসমিতির অধিবেশন হইত, তিনি তাহার এক জন প্রধান 'মুরুব্বি' ছিলেন। গত বিশ বৎসরের মধ্যে পুণাতে যে সকল শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় আন্দোলন ও উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহার অধিকাংশই রাণাডে মহাশয়ের উদ্দীপনায়, উপদেশে ও সহায়তায় সাধিত হইয়াছিল। তিনি একখানি 'মহারাষ্ট্রের ইতিহাস' লিখিতেছিলেন—আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি এক জন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন, সে ক্ষেত্রেও তাঁহার বক্তৃতা দেখিয়া স্বর্গীয় Vice Chancellor বিচারপতি ক্যাণ্ডি শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাকে অসংখ্য পত্র লিখিতে হইত। ভারতের সকল প্রদেশ হইতে প্রত্যহ তাঁহার নিকট প্রায় বিশখানি চিঠি আসিত, তিনি সকলগুলি পড়িয়া উত্তর দিতেন—তুচ্ছ সাংসারিক কথা হইতে গভীর রাজনীতির কথাও সে সকল পত্রে থাকিত। ভারতের যে কোনও প্রদেশে তিনি এক জন প্রকৃত কর্ম্মীর পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারই সহিত আলাপ করিয়া তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন। কিন্তু আমরা তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্রের অসাধারণ প্রসার দেখিয়া যত না বিস্মিত হই, তাঁহার ঐকান্তিকতায় ততোধিক মুগ্ধ হই।

দুঃখবাদ (Pessimism) আমাদের বঙ্গদেশে বড় প্রবল। সংসারকে দুঃখের আগার ভাবিয়া যাঁহাদের মন চিরবিষণ্ণ, পার্থিব উন্নতির পথে তাঁহারা তেমন অগ্রসর হইতে পারেন না। দুঃখবাদ মানুষকে চিন্তাকুশলী ও পরদুঃখকাতর করে বটে, কিন্তু নৈরাশ্য ও অকর্ম্মণ্যতায় দুঃখবাদীর মানসিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়। অথচ, সৃষ্টিতত্ত্বের প্রণিধানে দুঃখবাদই অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দুঃখবাদকে শিরোধার্য্য করিয়াও যে সুমহান্ কর্ম্মবীর ছিলেন, সে তাঁহার অমানুষিক মনঃশক্তির ফল। সাধারণ মানব দুঃখবাদের অবসাদকর গুরুভারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে—দুঃখবাদ মানবকে নিবৃত্তির পথে টানিয়া লইয়া যায়। পরন্তু, Optimism অর্থাৎ সুখবাদ মানুষকে নিরন্তর কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। ধরিত্রীকে সুখের নিলয় ভাবিলে মনে বল আসে,—কর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ জন্মে। মহামতি রাণাডে সুখবাদী ছিলেন।

গোখেল বলিয়াছেন, রাণাডের মানসিক প্রকৃতি বিশেষ সুস্থ ও আশাকুল ছিল। তাই তিনি ভারতের দূরতম প্রদেশের কোথাও উন্নতির চিহ্নমাত্র দেখিলে উৎসাহিত হইতেন। আমার মনে হয়, কর্ম্মে অবিচলিত অনুরাগ ছিল বলিয়াই, রাণাডে সুখবাদী ছিলেন। যাহারা নিষ্কর্ম্মা, যাহারা কর্ম্মের প্রভাব ও গৌরব বুঝে না, তাহারাই দুঃখবাদী হয়। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের দেশের লোক যদি একাগ্র-চিত্তে কর্ম্মেরই শরণ লয়, তাহা হইলে তাহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবেই। তাঁহার মতে কর্ম্মই জাতীয় উন্নতির একমাত্র সহায়। নিজের কর্ম্মময় জীবনের সমুজ্জ্বল-আদর্শ দ্বারা তিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, কর্ম্মীর মন কখনই নিরাশার গুরুভারে অবনমিত হইতে পারে না। প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে একদিন সামাজিক সমিতির (Social conference) প্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, "যখন প্রধান প্রধান সমাজ-সংস্কারকগণ কেবল অন্তঃসারশূন্য সভাধিবেশন ও প্রস্তাবনির্দ্ধারণ

যাঁরা কোন কাজ হয় না বলিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তখনও কি নিমিত্ত সমিতির কার্য্যে আপনার এমন ধীর বিশ্বাস রহিয়াছে ?" রাণাডে মহোদয় আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সভার কার্য্য অনর্থক নয়; এই সকল সংস্কারকের মনে তেমন অকৃত্রিম বিশ্বাস নাই।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পুনশ্চ বলিলেন, "দুই এক বৎসর অপেক্ষা কর। আজ Congressএর নামে যে এত উৎসাহ, একদিন সকলে সেই Congress সম্বন্ধেও এই প্রশ্নই উত্থাপিত করিবে,—ইহা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি। আমাদের সমস্ত জাতিটির এই প্রধান বিশেষত্ব যে, এক বিষয়ে লাগিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি বা উদ্যম আমাদের একবারে নাই।" রাণাডে স্বয়ং স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, ধৈর্য্যময় যত্ন বিনা কোন বৃহৎকার্য্যে সফল হওয়া অসম্ভব। তাঁহার একটি মন্তব্য আমার মনে আজও স্পষ্ট জাগরূক রহিয়াছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শোলাপুর ও বিজাপুরে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। আমি তখন সার্ব্বজনিক সভার সম্পাদক। আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া, উক্ত দুইটি জেলার তৎকালিক অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ ও তথ্য দিয়া, গভর্মেণ্টের নিকট একখানি আবেদনপত্র পাঠাই। কিন্তু গবর্মেণ্ট সেই আবেদনপত্রের উত্তরে আমাদিগকে কেবলমাত্র দুইটি ছত্রে পত্রখানির প্রাপ্তিস্বীকার করেন। আমি এই উত্তর পাইয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছিলাম। পরদিন সান্ধ্যভ্রমণকালে রাণাডেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গবর্মেণ্ট উপেক্ষাভরে যদি প্রাপ্তিস্বীকারমাত্র করিয়া, আমাদের প্রাণের আবেদন ব্যর্থ করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমাদের এত কষ্টস্বীকারের কি প্রয়োজন ?" তিনি বলিলেন, "দেশের ইতিহাসে আমাদের আবেদনের প্রয়োজনীয়তা কি, তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই। গবর্মেণ্টকে নামমাত্র এই সকল আবেদন পাঠান হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণের নিকটই আমরা আবেদন করিয়াছি, সাধারণ লোকে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিতে শিখুক, ইহাই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অল্প দিনে সাধিত হইতে পারে না, কারণ, রাজনীতিচর্চ্চা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন। পক্ষান্তরে গবর্মেণ্ট যদি কেবলমাত্র আমাদের আবেদনপত্রের বিষয়টি কি, তাহাই দেখেন, তাহা হইলেও আমাদের লাভ।"

হিতজনক কার্য্য যতই সামান্য হউক না কেন, প্রয়োজন হইলে, রাণাডে স্বহস্তে সমস্ত সম্পন্ন করিতেন,—রাণাডের চরিত্রগত এই একটি বিশেষত্ব ছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনপদ্ধতি পুণাতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। আমি তখন সেখানে ছিলাম। তাহার পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল কার্য্য সরকারী লোক দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত; রাণাডের একান্ত ইচ্ছা, নূতন সভায় দেশের প্রজারাও সভ্য হইয়া নগরীর কার্য্যে যোগদান করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, পুণার এক জন প্রসিদ্ধ অধিবাসী স্বর্গীয় কুন্তে সরকারী পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তিনি রাণাডের এক জন বিশেষ বন্ধু ও সহপাঠী। কুন্তে একজন সুনিপুণ বাগ্মী। প্রজাপক্ষের বিরুদ্ধে (সুতরাং রাণাডের বিরুদ্ধেও) তিনি বক্তৃতার বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। দলাদলি বেশ চলিতে লাগিল। কুন্তে প্রত্যেক সভাতেই রাণাডেকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন একটি গৃহস্থের বাড়ীর হলে সভা আহূত হয়। কুন্তে তথায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। হলের এক প্রান্তে বক্তা, অন্য প্রান্তে দ্বারের

দিকে বসিয়া আমরা বক্তৃতা শুনিতেছিলাম। বক্তৃতারম্ভের কিছু পরে সহসা রাণাডের প্রশান্ত মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল,—তিনি আমাদের সহিত বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াই কুন্তে রাণাডের দিকে (এবং ফলতঃ সমস্ত শ্রোতৃবর্গের দিকে) পশ্চাৎ করিয়া দুই চারি কথা বলিয়াই অকস্মাৎ বসিয়া পড়িলেন। কুন্তের এই আচরণ দেখিয়া, রাণাডে তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভভাবে তাঁহারই পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। সভাভঙ্গের পর, রাণাডে তাঁহাকে স্বীয় শকটে একত্র যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কুন্তে রূঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি তোমার গাড়ীতে যাইতে চাহি না।" তিনি নিজের গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। রাণাডে কিন্তু নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিলেন, তাঁহারই শকটে উঠিয়া বলিলেন, "ভাল, তুমি যদি আমার গাড়ীতে না যাইতে চাও, আমিই তোমার গাড়ীতে তোমার সঙ্গে যাই, চল। ইহার পর, কুন্তে আর রাণাডের সঙ্গ পরিহার করিতে পারিলেন না। সেই দিনই উভয়ের মনোমালিন্য মিটিয়া গেল; কুন্তে আর কখনও রাণাডের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। রাণাডের সেই বিনয়, সেই দৈন্যময় সাধুতা ভুলিবার নয়। তাঁহার জ্ঞানবত্তা, মনের স্থিরতা, স্বদেশপ্রীতি ও নিরলস কর্ম্মের কথা বলা হইল। তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্য ও ঈশ্বরে বিমল ভক্তিও অল্প ছিল না। ধর্ম্মের অনুশীলনে তিনি এত দূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুণ্যময় দেবোপম মূর্ত্তির সম্মুখে কেহ নীচ-চিন্তাকে মনে স্থান দিতে সাহসী হইত না। আমি আর একটিমাত্র লোককে জানি যাহার পূতচরিত্রের প্রভাব এইরূপ—তিনি আর কেহ নহেন, দাদাভাই নাওরোজী—। স্বার্থত্যাগে ও অহঙ্কারবর্জ্জনে রাণাডের চিত্ত অগ্নিশুদ্ধ হিরণ্যের ন্যায় মহিমোজ্জ্বল হইয়াছিল। পত্র লিখিয়া কেহ তাঁহার নিকট হইতে উত্তর পায় নাই, এ অভিযোগ আমি কদাপি শুনি নাই। কোন প্রার্থী তাঁহার দ্বার হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিত না। নিজের প্রশংসা শুনিয়া তিনি একদিনও গর্ব্বিত হন নাই। শত্রুপক্ষ নিন্দা করিলে, তিনি নীরবে তাহা শুনিতেন; তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত, সেগুলি সমস্ত তিনি মনোযোগসহকারে পড়িতেন। অন্তরের বেদনা বা অসন্তোষ তিনি বাহিরে প্রকাশ করিতেন না—তাঁহার সৌম্যমুখে চিরপ্রসন্নতা বিরাজিত ছিল। বিনয়ের অবতার রাণাডে এইরূপে কর্ম্ম-যোগের দ্বারা স্বীয় চিত্তশুদ্ধি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের পর আমি তাঁহার সহিত দেশে ফিরিতেছিলাম। গাড়ীতে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেহ ছিল না। রাত্রি প্রায় চার ঘটিকার সময় মৃদুগীতশব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিলাম,—আমার পূজার্হ সঙ্গী বসিয়া বসিয়া করতালিসহকারে তুকারামের দুটি 'অভঙ্গ' গাহিতেছেন। এই মহনীয় দৃশ্যে আমি আনন্দে শ্রদ্ধায় বিহ্বল হইয়া উঠিয়া বসিলাম। তন্ময় ভক্ত তখন অলৌকিক ঐকান্তিকতার সহিত পুরুষোচিত কণ্ঠে গাহিতেছিলেন ;—

"যে জন শ্রান্ত ও আর্ত্ত জনের বন্ধু, তিনিই প্রকৃত সাধু, ভগবান স্বয়ং তাঁহাতে অধিষ্ঠান করেন।

"অহঙ্কার ত্যাগ কর; সাধুজনের শরণ লও; প্রেমময়ের সহিত সাক্ষাৎলাভের ইহাই সহজ পথ।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর "বীজাপুর" একটি সুপাঠ্য ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সোম "আমাদের জাতীয় সাহিত্য-আলোচনার আবশ্যকতা" প্রতিপন্ন করিতেছেন। এই প্রবন্ধের অনেক প্রসঙ্গ আলোচনার যোগ্য। প্রবন্ধটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও সুশৃঙ্খলে গ্রথিত হইলে লেখকের বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য হইতে পারিত। মতামত কখনও সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে না। লেখকের সকল মত আমরাও গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তিনি বিস্তৃতভাবে সাহিত্যের লক্ষণনির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—"আমাদের দেশ বিলাত নহে—আমাদের দেশের জলবায়ু ও আর্ত্তব বৈচিত্র্য, আমাদের বৃক্ষলতা, আমাদের পাহাড় পর্ব্বত, আমাদের নদনদী, আমাদের পশুপক্ষী, আমাদের কীটপতঙ্গ, সর্ব্বোপরি আমাদের বালকবালিকা, আমাদের যুবকযুবতী, আমাদের বৃদ্ধবৃদ্ধা, আমাদের গৃহসজ্জা, আহার বিহার, আচারনীতি ধর্ম্ম,—কিছুই বিলাতের মত নহে। অথচ এই সকলই কল্পনার লীলাভূমি, এই সকল অবলম্বনেই কল্পনার স্ফূর্ত্তি। যে সকল গুণ সাহিত্যে থাকিতেই হইবে, তাহার বিকাশের ক্ষেত্রই যখন স্বতন্ত্র, তখন সাহিত্যের আকার জাতিবিশেষে স্বতন্ত্র হইবেই।" দেশভেদে জাতিভেদে প্রকৃতিভেদে সাহিত্যের 'আকার' বা জড় শরীর বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহার চৈতন্য, আত্মা,—স্বরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', সে বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারি না। হিমালয় ও আল্পস্ ভিন্ন বটে, কিন্তু চিরতুষারকিরীটী পর্ব্বত দেখিয়া মানবের মনে যে আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়, তাহা দেশবিশেষে বিভিন্ন নহে। সে আনন্দের প্রকৃতি সর্ব্বত্র সমান। সহস্র বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানব সাধারণের মধ্যে যেমন একটা সাধারণ শারীরিক সাদৃশ্য ও মূলগত মানসিক সাম্য বিদ্যমান, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানবের সাহিত্যেও সেইরূপ একটা সাধারণ সাম্য আছে, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যায়। তাই জার্ম্মান্ কবি গেটে বল্কলপরিধানা শকুন্তলার হৃদয়স্পন্দন অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাই বঙ্কিমচন্দ্র গাউনপরিহিতা মিরাণ্ডার হৃদয়সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সাহিত্য জাতিবিশেষের মনঃকল্পিত সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যাহা জগতের, তাহা কোনও জাতির নিজস্ব হইতে পারে না। সাহিত্যের লক্ষ্য বিশাল 'মানবতা', সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা নহে। মানবতা সমুদ্র, জাতীয়তা গোষ্পদ। রডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর মত যাহারা গোষ্পদে ডুবিয়া মরিতে উদ্যত, তাহাদের নকলে আমাদের আদর্শ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ করিব কেন? শ্রীযুক্ত

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "প্রাচীন কালের জন্তু" একটি সুখপাঠ্য সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ" উল্লেখযোগ্য।

প্রদীপ। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এক নিশ্বাসে "রামায়ণী কথা" শেষ করিয়াছেন। দীনেশ বাবুর মতে,—"অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত রামায়ণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইখানি পৃথক্ কাব্যে পরিণত করা যাইতে পারে।" বেদব্যাস বেদের বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং নজীরের অভাব নাই। দীনেশবাবু যদি রামায়ণকে 'দুইখানি পৃথক কাব্যে পরিণত' করিয়া চিরস্মরণীয় ও চিরজীবী হইতে পারেন, তাহাতে কাহার কি আপত্তি? তাহার পর,—"একখানি অযোধ্যাকাণ্ডেই আরব্ধ ও অযোধ্যাকাণ্ডেই পরিসমাপ্ত,—বিষয় রামবনবাস। আর একখানি আরণ্যকাণ্ডে আরব্ধ ও লঙ্কাকাণ্ডে পরিসমাপ্ত,—বিষয় সীতার উদ্ধার। এই দুই অংশের সঙ্গে কাব্যগত কোন স্বাভাবিক বন্ধন লক্ষিত হয় না।" 'কাব্যগত স্বাভাবিক বন্ধন' কি বস্তু, লেখক বোধ করি তাহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন,—"রামবনবাসের পর সীতাহরণ ও তাঁহার উদ্ধার হইয়াছে, ইহাতে সাময়িক পৌর্ব্বাপর্য্যের সংস্রব আছে, কিন্তু কাব্য হিসাবে এই দুই ঘটনা পরস্পর নিরপেক্ষ।" আমরা এই সূক্ষ্মতত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিলাম না। তথাপি স্বীকার করি, রামায়ণের এই অদ্ভুত বিভাগ সম্পূর্ণ নূতন ও মৌলিক! বীজের সহিত বৃক্ষের ও বৃক্ষের সহিত ফলের সম্বন্ধও বোধ করি দীনেশবাবু স্বীকার করিবেন না। কেন না, ফলের সহিত বৃক্ষের বৃন্ত-রূপ একটা 'বন্ধন' দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা 'স্বাভাবিক' কি না, হলপ্ করিয়া দীনেশবাবুকে কে বলিতে পারে? আর বীজের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ বাঁধিবার মত 'স্বাভাবিক বন্ধন'-রজ্জু ও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, বীজে ও বৃক্ষে সম্বন্ধ নাই! আবিষ্কারটি অতি অদ্ভুত, অধ্যাপক বসুর আবিষ্কার নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কিন্তু উপায় কি? "রামায়ণী কথার" আর একটি সত্য আছে;—বিশ্লেষণ করিতে করিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিয়া ফেলিলে শেষে 'কিছুই' থাকে না, সব উবিয়া যায়, কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধটি মজুদ থাকে। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী "বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ছন্দ" প্রবন্ধে ১৩০৮ সালের চৈত্র-সংখ্যক "সাহিত্যে" প্রকাশিত শ্রীনিবাস বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীনিবাস বাবুর ওকালতী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই স্বতঃসিদ্ধ উকীলটির একটি মন্তব্যের নমুনা দিব। গোস্বামী বলিতেছেন,—"হঠাৎ রবিবাবুও একবার 'মনোসাধে' বাঁশী বাজাইয়াছিলেন, আর কোন কোন প্রতিবাদীর ব্যাকরণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল!" 'মনোসাধে'র দংশনেও যে ব্যাকরণ না কাঁদে, সে কি মূক নহে মহাশয়? যদি বোপদেব গোস্বামীর 'মুগ্ধবোধের মত বিহারীলাল গোস্বামী একখানি 'কবিবোধ' ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহা হইলে 'প্রতিবাদীর ব্যাকরণকে' সাহারায় নির্ব্বাসিত করা যায়। যত দিন তাহা না হইতেছে, ততদিন কাঁদুনে ব্যাকরণ কাঁদিয়া মরুক; বিহারী বাবু একটু ধৈর্য্য ধরুন।

পূর্ণিমা। বৈশাখ। আমরা মনে করিয়াছিলাম, গত বর্ষের শেষ সংখ্যায় "হুগলী-কাহিনী" সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এ সংখ্যায় তাহার পুনরাবির্ভাব দেখিতেছি। সাময়িকের সহিষ্ণুতা ও সীমা লঙ্ঘিত হইতেছে না? "সমর" একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

বিশেষ নূতন তথ্য দেখিলাম না। শ্রীম-কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" বৈশাখী পূর্ণিমার বিমল জ্যোৎস্না। পূর্ণিমায় আর তেমন মাসিক সাহিত্য সমালোচনা দেখিতে পাই না কেন? সে মুন্সীয়ানায় সম্পাদক আমাদের বঞ্চিত করিতেছেন কেন? পূর্ণিমার যে তাহাই প্রধান আকর্ষণ।

নব্যভারত। বৈশাখ? শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "চট্টগ্রামে মহামুনির মেলা" একটি সুখপাঠ্য রচনা।—অনেক জ্ঞাতব্য কথার সমাবেশ আছে। শ্রীম—কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" হিতকারী। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার "উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য কি কল্পনা?" নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধের উপসংহারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"৫৪০ হইতে ৫৬০ পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের কথা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।" এরূপ প্রবন্ধ আর একটু বিস্তৃত হইলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর রায়ের "পৃথিবীর গতি" একটি বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। লেখকের ভাষা আশাপ্রদ, বলিবার প্রণালীও জটিল নহে। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞানানভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইবার নহে। লেখক যদি সাধারণ পাঠকের জন্য সহজ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সাহিত্যের উপহার হইতে পারে।

বঙ্গদর্শন। বৈশাখ। "ভোরের পাখী" বাক্যের বুদ্বুদ। কবিতা না ছড়া, বলিতে পারি না। "রাজকুটুম্ব" প্রবন্ধের মর্ম্ম এই যে, ইংরাজের বুট পরিপাক করিতে করিতে ভারত-বাসী 'মনুষ্যত্বচর্চ্চা' করুক। বুটের স্পর্শে মনুষ্যত্ব যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহার উপায় কি? অধ্যাপকের রচিত "অশোকের অনুশাসনে" নূতন কথা নাই। তবে অধ্যাপক পুরাতন কথা গুছাইয়া বলিয়াছেন বটে। "চৈত্রের গান" একটি সুমিষ্ট কবিতা। কবিতা-টির স্থানে স্থানে নিপুণ বীণার মধুর ঝঙ্কার বিরল নহে।—

"ছায়ায় আজি তরুর মূলে ঘাসের 'পরে নদীর কূলে
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—
দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারাণি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলান তান।"

মনে হয়, কবিতাটি এত বিস্তৃত না হইলে আরও ভাল হইত। ইহার সহিত অর্থ-"বিহীন কথার ছন্দ" কোন মতে শোভন হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর ফরাসী লেখক ডোরিয়াকের রচনা হইতে "অনুতাপিনী সন্ন্যাসিনী" অনূদিত করিয়াছেন। গল্পটি মন্দ নহে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন বিবরণ" নামক ঐতিহাসিক রচনাই এবারকার বঙ্গদর্শনের প্রধান প্রবন্ধ। সূচনায় যাহা সূচিত দেখি-লাম, তাহা আশাপ্রদ। "নৌকাডুবি" একটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাস। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের "রাজকন্যা" গদ্যে 'কি-জানি কেন' ধরণের কবিতা।

বান্ধব। বৈশাখ। "আনন্দ-লহরী বা যোগবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা" পদার্থ কি, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। "কিশোর গৌরাঙ্গ" চৈতন্যদেবের জীবনচরিত। নূতন কথা দেখিলাম না। বাঙ্গলায় চৈতন্যচরিতের অসদ্ভাব নাই; যদি নূতন বক্তব্য না থাকে, তবে "কিশোর গৌরাঙ্গের" অবতারণা কেন? শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর "পান সম্বন্ধে দু' চারি কথা" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বান্ধবের হাতে পানের খিলি,—মন্দ কি? সাময়িক সাহিত্যের 'ক্রমবিকাশ"—বটে। "স্বামী না ত কি?" যদি 'নবন্যাস' হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। এ বিড়ম্বনা কেন? "ছায়াদর্শন" ভৌতিক ব্যাপারের বিবরণ। ভূতের গল্পগুলি দেখিতেছি রবারের ন্যায়; যতই টানা যায়, ততই বাড়ে। ভাষাকে কেমন করিয়া ফেনাইতে হয়, পুনঃপ্রচারিত "বান্ধব" এ যাত্রা তাহার নমুনা দিতেছেন। "ছায়াদর্শন" ও "কিশোর গৌরাঙ্গ" তাহার প্রমাণ। এ সংখ্যার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আশা করি, ভবিষ্যতে "বান্ধবকে" পূর্ব্বভাবে অনুপ্রাণিত দেখিব।

চিকিৎসা-সম্মিলনী। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চিকিৎসা-সম্মিলনীর পুনঃপ্রচার দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। "মকরধ্বজ ও তাহার ব্যবহারপ্রণালী," "কবিরাজী পাচন" প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। "স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ" সাধারণ পাঠকের উপযোগী। গঙ্গাধরের জীবনবৃত্ত অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইলে আমরা সুখী হইব। স্পষ্টবাদী সম্পাদকের মন্তব্যগুলি মুখরোচক বটে, কিন্তু চিকিৎসাবিষয়ক পত্রে আমরা তাঁহার কবিরাজী অভিজ্ঞতারই আশা করিয়া থাকি।

উদ্বোধন। বৈশাখ। মহীশূরের স্বর্গীয় মহারাজকে স্বামী বিবেকানন্দ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এই সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই পত্রে সংক্ষেপে আমেরিকার ও ভারতের সামাজিক অবস্থার তুলনায় আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের এখন কর্ত্তব্য কি, স্বামীজী এই পত্রে তাহারও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত স্বামী সারদানন্দের "জীবন ও মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা" চিন্তাশীলতার পরিচায়ক উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার হিন্দু সন্ন্যাসী যে ভাবে দেখিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

সুধা। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর "শক্তিবাদ", অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থের "ভাষাবিচার" ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার কাহিনী" উল্লেখযোগ্য। "ভাষাবিচারে" লেখক এখনকার মাসিকপত্র হইতে বিকৃত ও ভ্রমপূর্ণ ভাষার নমুনা দিয়াছেন। কিন্তু কোনও মাসিকপত্রের নাম করেন নাই। আমাদের মতে, নামগোপন করিয়া লেখক ভাল করেন নাই। এক ক্ষুরে সকলের মস্তক মুণ্ডন করিবার আবশ্যক কি?

পৌত্র-লাভ

কহিলেন উমাপদ,—"শোন নিরুপম,
বহুকাল আছি বেঁচে, ঘনাইছে দিন;
তুমি একমাত্র পুত্র,—বড় সাধ মনে,
তোমার সন্তান দেখি' দুই চক্ষু মুদি
বুড়া বুড়ী দোঁহে মোরা; গৃহলক্ষ্মী আনি'
সঁপি দিই তাঁর হাতে সংসারের ভার।"
নিরুত্তর নিরুপম রহিল দাঁড়ায়ে
অবনতমুখে, শেষে কহিল বিনয়ে,
"বিবাহে প্রবৃত্তি নাই!"—অনিচ্ছা বিবাহে?—
বিস্মিত ব্রাহ্মণ ত্রস্তে করিলা উত্তর;
"নব্য যুবকের দল জানি এই মন্ত্রে
হয়েছে দীক্ষিত এবে, যুক্তি তাঁহাদের
বিবাহ দারিদ্র্য আনে! কিন্তু বাপু, তুমি,
তুমি ত ধনীর ছেলে; তুমিও কি ভাব,
বিবাহেরে বিভীষিকা? শোন যাহা বলি;—
পিতার প্রার্থনা—না, না, আদেশ তাঁহার,
আনন্দে সম্মতি দাও আনন্দ-উৎসবে।
আমি প্রৌঢ়, তুমি যুবা, আমি বুঝি ভাল
কিসে তব শুভাশুভ; পিতৃভক্ত তুমি,
করিও না অবহেলা পিতার আদেশ।"
নিরুপম মাগি' নিল সপ্তাহ সময়।
দু' দিন হ'ল না পার, ভোজনের কালে,
গৃহিণী সহাস্যমুখে কহিলা পতিরে,—
"নিরু মোরে বলিয়াছে জানাতে তোমায়,
পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য! এক ভিক্ষা তার,
কন্যা-নির্ব্বাচন ভার লইবে সে নিজে;

তাও সে করেছে স্থির—আর কেহ নহে,
সে মোদের কন্যা-স্নেহে পালিতা অমলা।
তোমার বন্ধুর মেয়ে, বংশে ভাল তা'রা;
কন্যাসম আছে গৃহে, বধূ হয়ে র'বে।
অমলা পরের হ'বে এই ভাবি' দোঁহে
হয়েছি কাতর কত! কি আশ্চর্য্য কথা,
এমন উপায় আছে ভাবি নি তা আগে।"
ঝাড়িয়া হাতের অন্ন উঠিলা ব্রাহ্মণ,
"নিরুপম! নিরুপম!" ডাকিলা গম্ভীরে;
সে মূর্ত্তি সে ক্লিষ্ট স্বর গৃহিণীর প্রাণে
আনিল অজ্ঞাত কম্প! অদূরে দাঁড়ায়ে
নিরুপম কম্প্রবক্ষে উন্মুখশ্রবণে,
নরঘাতী যেন শুনিছে বিচারফল
বিচারক-মুখে!—দাঁড়াইল হেঁটমুখে
পিতার নিকটে। কহিলেন উমাপদ,—
"এ কি সত্য তবে?" উত্তরিল নিরুপম,
"ভালবাসি; পাইয়াছি ভালবাসা তার।"
কহিলেন প্রৌঢ়,—"ভালবাসা শুধু নেশা,
যৌবনের চপলতা, খেয়ালের ঢেউ
মুহূর্ত্তে অশান্ত হয়ে গ্রাসে আসি' কূল,
শেষে শ্রান্ত শান্ত হ'য়ে ফিরে সে কাঁদিতে।
শিক্ষিত সুধীর তুমি। ফিরাও হৃদয়!
অমলা কমলা সম রূপগুণান্বিতা,
সে তোমার স্নেহপাত্রী, পিতৃবন্ধু-সুতা
পিতৃব্যকন্যার মত! শাস্ত্র ও সমাজ
দিবে দণ্ড অভিশাপ হেন সম্মিলনে!"
উত্তরিল নিরুপম সতেজে এবার,—
"আমি নাহি মানি শাস্ত্র; জীর্ণ সমাজেরে
করি ঘৃণা!" ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহিলা ব্রাহ্মণ,—
"তুমি না মানিতে পার; আমি আছি বেঁচে!

আমি মানি শাস্ত্র আর সমাজবন্ধন!"
উত্তরিল নিরুপম,—নিরাশা-প্রেরিত
অশান্ত উদ্ভ্রান্ত ক্রোধে,—"শিশু নহি মোরা;
আমরা স্বাধীন! যত ক্ষণ গুরুজন
উদার সদয়, সম্মানের যোগ্য তাঁরা;
অনুজ্ঞা তাঁদের যত ক্ষণ ন্যায়-গণ্ডি
না করে লঙ্ঘন দর্পে, প্রতিপাল্য তাহা।"
অনুগত পুত্র মুখে হেন প্রত্যুত্তর
করেন নি উমাপদ প্রত্যাশা কখনো,
ক্ষণেক অবাক্ রহি' ক্ষুব্ধ রুদ্ধস্বরে
কহিলেন,—"করিও না গৃহ কলঙ্কিত,
আজি—এই দণ্ডে যাও, যথা ইচ্ছা তব!"
তখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য মাথার উপরে
করিতেছে অগ্নিবৃষ্টি, প্রমত্ত পবন
হাহা হাসি' ধূলি মাখি' করিতেছে খেলা,
শাখা-অন্তরাল হ'তে কপোত-যুগল
তুলিয়াছে করুণ কাকলি; সেই ক্ষণে
অভুক্ত অস্নাত এক উদ্ভ্রান্ত যুবক
পল্লীপথ দিয়া দ্রুত হ'ল নিরুদ্দেশ।
"ব্রাহ্মণী!"—ডাকিলা বিপ্র; কহিলা গম্ভীরে;
"হেন কুলাঙ্গার তরে যদি কেহ কর
অপব্যয় বিন্দু অশ্রু, ক্ষমা নাহি তার।"
গৃহিণী সরলা ভীরু পতি-অনুগতা,
জানিতেন ভাল মতে পতির স্বভাব;
চিরদিন পতি-আজ্ঞা ধীর নম্র ভাবে
এসেছেন নিঃশব্দে পালিয়া; বহুক্লেশে
দারুণ শোকের বেগ করিলেন রোধ।
তবু শূন্য অন্তঃপুরে ক্ষুণ্ন মাতৃস্নেহ
পলে পলে সংযমের পাষাণ প্রাচীরে
খুঁড়িতে লাগিল শির; কিশোরী অমলা,

কীটদষ্ট স্থকুমার বিজনবাসিনী
বনমল্লিকার মত লাগিল শুকাতে ;
গভীর বিষাদ সেই হৃষ্টা প্রগল্‌ভারে
করিল গম্ভীর। বাহিরে এখন তার
গৃহকার্য্যে নিপুণতা হ'ল স্ফুটতর ;
ক্ষত পিতৃ-অভিমানে দীর্ণ মাতৃস্নেহে
সযত্নে সে দিতেছিল সেবার প্রলেপ !
অন্তর্য্যামী শুধু লইলেন সে নারীর
অন্তরের ভার ; প্রতিদিন তাঁর দ্বারে
উঠিতে লাগিল কোন ভগ্ন হৃদয়ের
করুণ প্রার্থনা ছন্ন গৃহহারা তরে।
কিছু দিন গেল চলি'। উমাপদ চুপে
নগরপ্রবাসী এক রাজোপাধিধারী
ধনি-পুত্র সনে করিলেন অমলার
সম্বন্ধ সুস্থির। অমলা জানিল সব,
বুঝিল সকলি ; তার তরে মৃত্যুপাশ
হয়েছে রচিত ! স্বেচ্ছায় সে দিল ঝাঁপ ;
তবু পারিল না কহিবারে কোন কথা
সদ্য-অপমানবিদ্ধ আত্ম-অভিমানী
পিতার অধিক সেই পিতৃবান্ধবেরে।
হয়ে গেল পরিণয় কখন কেমনে,
জানে না অমলা ! শুভদিনে উমাপদ
দাম্ভিক বর্ব্বর শঠ বৈবাহিক-করে
হইলেন অকারণে বিষম লাঞ্ছিত ;
হয়ে গেল দুই দলে অনন্ত বিচ্ছেদ !
উদাসীন অশ্রুহীন চলিল অমলা
ছাড়ি' চিরপ্রিয় গৃহ পতিগৃহ পানে।
সেই পাংশু শুষ্ক মুখ দেখিল যাহারা—
ভাবিল, এ সধবা কি শ্মশানযাত্রিণী !
উমাপদ গলদশ্রু সংবরিয়া ক্লেশে

পশিলেন ঘরে; গৃহিণী উঠিলা কাঁদি;
পতিপত্নী অনাহারে রহিলা সে দিন!
সাত বৎসরের পরে—একদা প্রত্যূষে
শয্যা ত্যজি' উমাপদ আসিলা বাহিরে,
হেরিলেন সবিস্ময়ে,—ভূষণবিহীনা
এলোকেশী শুক্লাম্বরা অনবগুণ্ঠিতা
মোহিনী রমণী-মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে অঙ্গনে,
কোলে অভিরাম শিশু; স্বপ্ন-শিশু কোলে
মূর্ত্তিমতী ঊষা যেন অতিথি দুয়ারে!
চমকি' চিনিলা তারে; উঠিলা কাঁদিয়া,—
"অমলা, বিধবা তুই! পুণ্যবতী প্রিয়া!
তুমি চলে গেছ স্বর্গে; আমি আজো আছি
সহিবারে সংসারের ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত!"
অমলার অবরুদ্ধ শোকের পাথার
উঠিল উচ্ছ্বসি'। কোলে চমকিত শিশু,
অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে উঠিল কাঁদিয়া।
অমলার আগমনে গৃহের শৃঙ্খলা
আবার আসিল ফিরে; বৃদ্ধের জীবনে
শিশু আসি অভিনব আনন্দ আনিল!
সে বিদ্রোহী প্রথমতঃ নাহি দিল ধরা,
শেষে ধীরে ধীরে শিশুসঙ্গলালায়িত
বিরহী বঞ্চিত হিয়া নিল তারে জিনি'!
অমিয়-মধুরকণ্ঠে 'দাদা!' সম্বোধন,
কচি বাহুযুগে সেই গাঢ় আলিঙ্গন
বৃদ্ধের সকল জ্বালা দিল জুড়াইয়া।
ভাবিতেন উমাপদ—যদি নিরুপম
পিতারে করিত ক্ষমা! যদি সে ফিরিত!
অনুতপ্ত পিতা করেছিলা বহু স্থানে
নিরুদ্দেশ পুত্র লাগি' বিফল সন্ধান;
ধীরে ধীরে তার আশা করেছিলা ত্যাগ।

একদিন অতর্কিত সৌভাগ্যের প্রায়,
নিরুপম নিজ গৃহে বহুদিন পরে,
পিতারে প্রণাম করি' দাঁড়াইল আসি'।
শিরে শিখা, করে গীতা কমণ্ডলু,—তার
হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগ করিল প্রচার।
সুখ-স্বপ্নাবিষ্টসম রহিলেন চাহি'
হরষে বিস্ময়ে পিতা; জিজ্ঞাসি' কুশল,
কহিলা নিশ্বাস ফেলি,—"মাতৃহীন তুমি!
বৎস, সে আজ থাকিত যদি! মৃত্যুকালে
তোমার নামটি তার ছিল জপমালা!"
অশ্রু মুছি' নিরুপম জানা'ল পিতারে,—
মাতৃবিয়োগের বার্ত্তা বহুদিন আগে
পেয়েছে সে লোকমুখে। কহিলেন বৃদ্ধ,—
"আমি অপরাধী পিতা, ক্ষমা কর মোরে!"
উত্তরিল নিরুপম,—"সব দোষ মোর,
পিতার অবাধ্য পুত্র দিল বহু ক্লেশ!"
শেষে জানাইল ধীরে, একান্ত সঙ্কোচে,—
"একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত পিতৃ-অভিমতে
দারপরিগ্রহ করি' গৃহধর্ম্ম করা;
শাস্ত্রে লেখে, গুরুবাক্য বেদ হ'তে গুরু;
যৌবনে গৃহস্থাশ্রম প্রশস্ত কেবল।"
বৃদ্ধ ভাবিলেন, আজ সুখ-দেবতার
সবটুকু আশীর্ব্বাদ তাঁরি অধিকারে!
হেন কালে বুড়ার সে নয়নের মণি,
চারি বৎসরের ছেলে নাচিতে নাচিতে
"দাদা!" "দাদা!" বলি' কক্ষে আসিল ছুটিয়া;
থমকি' দাঁড়াল; শেষে "বাবা!" বলি' বেগে
যেমন আসিবে কাছে, ত্রস্ত নিরুপম
ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়া তারে করিল নিশ্চল।
দাদার স্নেহের কোলে ফিরে এল শিশু,

মুখ লুকাইয়া উঠিল ফুকারি' কাঁদি'।
আঁধার রহস্যে ক্ষীণ বিদ্যুতের শিখা
জ্বলিল বারেক। ডাকিলেন উমাপদ,—
"অমলা, বহিরে এস!"—গৃহকর্ম্ম মাঝে
অমলা নিমগ্ন ছিল,—নিরুপমে হেরি'
কক্ষে পশি' চমকিয়া দাঁড়াল থমকি'।
কহিলেন উমাপদ,—"কন্যাধিক স্নেহে
পালিয়াছি আশৈশব তোমারে অমলা,
ভাঁড়ায়ো না আজি মোরে, বল সত্য করি',
নিরুপম সনে এই অজ্ঞাত শিশুর
জন্ম-রহস্য কি আছে কোন সূত্রে বাঁধা?"
ক্ষণেক নীরব রহি' সহসা অমলা
নতজানু হ'য়ে সব করিল প্রকাশ;
বহি' সহি' গুরু ভার, বহুদিন পরে,
শ্রান্ত যথা একে একে রাখে তা নামায়ে!
—কেমনে বিবাহ-অন্তে পক্ষকাল মাঝে
হ'ল সে বিধবা; শেষে কেমনে কখন
দেখিল সে নিরুপমে—অকূল পাথারে
অনন্ত নির্ভর! বাহিরিল তার সনে
বিমুক্ত বিশাল বিশ্বে চির অনাবৃত!
জন্মিল নির্দ্দোষ শিশু কলঙ্কে মণ্ডিত।
অমলা থামিল ত্রস্তে, লাজ-বজ্রাহতা
রহিল দাঁড়ায়ে স্থির নিস্পন্দ নীরব!
নিরুপম নতমুখে রহিল বসিয়া,
দেখিল, অমলা কিছু করিল গোপন,—
বিবাহের আশা দিয়ে সে তারে যেমনে
করিল ছলনা পরে; কিছু দিন গেলে
যেরূপে বিরক্ত শ্রান্ত দিত সে তাহারে
নির্দ্দয় লাঞ্ছনা; সে ত সেদিনের কথা,
শিশু পুত্র সনে তারে আসিল সে ফেলি'

নিশীথে চোরের মত; সে সব অমলা
করিল গোপন কেন, কার মুখ চাহি',
নিরুপম বুঝি' তাহা, মনে মনে শুধু
হাসিল নিঠুর হাসি।—পিতার নিকটে
সে এমন আনন্দের গৌরবের দিনে
অতর্কিতে অপদস্থ হ'য়ে, অমলায়ে
নীরবে দহিতেছিল তীব্র অভিশাপে!
হায় নারী, ভালবাসা ভোল না তোমরা,
কর্ত্তব্য-আবর্ত্তে তারে রাখ ঊর্দ্ধে ধরি'।
পুরুষ দুঃস্বপ্ন ব'লে ঝেড়ে ফেলে' তাহা
অনায়াসে মিশে যায় কর্ম্মকোলাহলে!
    এত ক্ষণ উমাপদ সংজ্ঞাহীনসম,
শুনিতেছিলেন সব; আপনা সংবরি'
কহিলেন পুত্রে চাহি',—"শোন নিরুপম,
এ শুদ্ধা নারীরে তুমি আনিয়াছ টানি'
পঙ্কের গলিত স্তরে; এ শুভ্র শিশুরে
করিয়াছ দুর্নিবার কলঙ্কমণ্ডিত!"
সহসা থামিলা বৃদ্ধ,—চপল বালক
জড়ায়ে ধরেছে কণ্ঠ; করি' অনুভব
শিশুর সে সুখস্পর্শ কহিলা প্রাচীন,—
"ক্ষমিব তোমারে তবু; কিন্তু অমলারে
বিবাহ করিতে হ'বে ধর্ম্ম সাক্ষী করি';
নহে, ত্যজ্য পুত্র তুমি! এই পুত্র তব,
পৌত্র মোর, হবে মোর জলপিণ্ডদাতা;
বিষয় ইহারে দিব তোমারে লঙ্ঘিয়া।"
পুত্রে নিরুত্তর হেরি' লাগিলা কহিতে,—
"মূঢ় আমি নিয়তিরে চাহিনু খণ্ডিতে,
অদৃশ্য অভাবনীয় গতি-সূত্র ধরি'
আপনারে করিল সে সবল সফল।
বৃদ্ধ হইয়াছি আমি, আজি দ্বন্দ্ব ছাড়ি'

আনন্দে করিনু সন্ধি ক্রুদ্ধ ভাগ্য সনে।"
উত্তরিল নিরুপম,—"অসম্ভব কথা;
পুত্রবতী পতিতা এ বিধবার সনে
বিবাহে সমাজ শাস্ত্র হ'বে প্রতিকূল!"
কহিলেন পিতা,—"তোমার সে চিন্তা নাই,
আমি আছি বেঁচে! যে শাস্ত্র সমাজ হয়
এ বিবাহে প্রতিকূল, কে মানে তাহায়?"
"আমি মানি শাস্ত্র আর সমাজবন্ধন!"—
উত্তরিল পুত্র তেজে।—"তবে দূর হও!"—
গর্জ্জিয়া উঠিলা বৃদ্ধ।—সে দিন নয়নে
যে তেজ ফুটিয়াছিল, সপ্তবর্ষ পরে
সে নয়নে সেই জ্যোতি!—তখন বাহিরে
উঠিয়া এসেছে ঝড়; মেঘদল মাঝে
নিরুদ্দেশ-যাত্রা তরে পড়ে গেছে ত্বরা,
উঠে গেছে কোলাহল; উতলা বাতাস
করিতেছে শঙ্খনাদ; রহস্যের কোণে
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিতেছে প্রলয়-আলোক!
কাল-বৈশাখীর সেই বিষম দুর্য্যোগে
নিরুপম হ'য়ে গেল গৃহের বাহির।
কক্ষ মাঝে তিন জন নিশ্চল নীরব!
গৃহভিত্তি ক্ষণে ক্ষণে লাগিল কাঁপিতে,
পলে পলে অন্ধকার লাগিল ঘনাতে,
ডাকিতে লাগিল বজ্র। কচি বাহু দিয়া
আলিঙ্গন দৃঢ় করি' ভীত শিশু ধীরে
বারেক ডাকিল,—"দাদা!"—গভীর নির্ঘোষে
বাহিরের বজ্রনাদ দিল প্রত্যুত্তর!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

শিক্ষা-তত্ত্ব।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিকট বঙ্গ-সাহিত্য কি পরিমাণে ঋণী, তাহা সাহিত্য-পরিষদের ও দীনেশ বাবুর কৃপায় এখন সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকার্য্য সমাপ্ত হইতে এখনও বহু দিন অতিবাহিত হইবে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আরও কত কীর্ত্তি-চিহ্ন প্রকাশিত হইবে, কে বলিতে পারে? বলিতে কি, বৈষ্ণব-সাহিত্যই বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। এই মহার্হ রত্নগুলি লোকের অবহেলায় বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে দেখিয়াও তাহা-দের উদ্ধারকল্পে এখনও সকলে চেষ্টিত হইতেছেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। দুই চরি জনের দ্বারা এই বিশাল বঙ্গের প্রচীন লুপ্তপ্রায় সাহিত্যের উদ্ধার কখনই হইতে পারে না। যুগে যুগে কোন্ দেশে কি গ্রন্থ বিরচিত হইয়া অনাদৃত ও অজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধানলাভ দুই চারি জনের শক্তিতে কুলাইবে কেন? সময় থাকিতে থাকিতে মাতৃ-ভাষানুরাগী ব্যক্তিগণ এই সাধু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া মাতৃস্বরূপা মাতৃভাষার কলঙ্ককালিমার অপনোদনে বদ্ধপরিকর হউন।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদে গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয়ের ভেদ থাকায়, সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যকে এক শ্রেণীর মনে করা যায় না। এই প্রবন্ধের শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানি বোধ হয় কোনও সম্প্রদায়বিশেষের হিতার্থ বিরচিত। ইহার নাম এই প্রথম বিশ্রুত হইল কি না, জানি না। অদ্য সংক্ষেপে পাঠকবৃন্দকে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শুনাইব।

ইহা একখানি ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ,—পত্রাঙ্কবিহীন কতকগুলি পত্রের সমষ্টি। পদসংখ্যা প্রায় ২০০। আদর্শ-প্রতিলিপিতে লিখিত হইবার তারিখ না থাকিলেও, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তাহা সহজেই বলা যায়। ভাষায় সর্ব্বত্রই প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্নাদি পরিস্ফুট দেখা যায়।

এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম কবি অদ্বৈতচন্দ্র। স্থানে স্থানে ভণিতির স্থলে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন:—

(১) কবি অদ্বৈতচন্দ্রে বোলে দিন বৃথাএ গেল।
শিক্ষাতত্ত্ব বস্তুজ্ঞান আমাতে না হৈল॥

মম প্রতি নবকৃষ্ণ রহিলা কোথায়।
অন্তিম কালে রাখ মোরে তোমার রাঙ্গা পায়॥

(২) কবি অদ্বৈতচন্দ্রে বোলে, নবকৃষ্ণর পদতলে,
দিবা মোরে স্থান বৃন্দাবনে।
আমি বড় দুঃখী অতি, তুমি বিনে নাই গতি,
গতি রতি ঐ রাঙ্গা চরণে॥

(৩) এই মতে শিক্ষা ধর্ম্ম করিবা যাচন।
কবি অদ্বৈতচন্দ্রে গ্রন্থ করিল রচন॥
আমি অতি মূঢ়মতি দিন গেল বৃথা।
গুরু নবকৃষ্ণ আমার রহিয়াছে কোথা॥
তুমি বিনে আমার জে কোন বন্ধু নাই।
কৃপা করি শ্রীচরণে মোরে দেও ঠাই॥

ইহা দ্বারা নবকৃষ্ণ নামক কোন সাধুকে কবির গুরু বলিয়া জানা যায়। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থ হইতে তাঁহার আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই নবকৃষ্ণ কে, কেহ জানেন কি? অদ্বৈতচন্দ্র-নামধেয় কবিও বোধ হয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে একাধিক আছেন। গ্রন্থারম্ভে কবি আবার এইরূপ বন্দনা গাহিয়াছেন;—

দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ বন্দম সানন্দে।
মধ্যেতে বন্দম প্রভুর চরণারবিন্দে॥
অদ্বৈত-চরণ বন্দম ভক্তিমন্ত ধীর।
যার প্রেমে মহাপ্রভু হইয়াছে অস্থির॥
রায় রামানন্দ বন্দম প্রভুর প্রিয় আর।
ছয় গোসাঁইর পাদপদ্মে করি নমস্কার॥
ক্রমে ক্রমে ব্রজবাসী বন্দিলাম কতুকে।
নবদ্বীপ-বাসী বন্দম মনের জে সুখে॥
দয়া কর মুই অধমেরে চৈতন্য গোসাঁই।
তব কৃপাএ শিক্ষাতত্ত্ব রচিবারে চাই॥
ভক্তিহীন ভাবহীন জ্ঞানবিবর্জ্জিত।
শিক্ষাতত্ত্ব বস্তু কিছু নাহি মম চিত॥
ছয় গোসাঁইর বাক্য আর মনের উল্লাস।
শিক্ষাতত্ত্ব গ্রন্থ আমি করিলাম প্রকাশ॥

বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমাদের অভিজ্ঞতা না থাকায়, উক্ত বিবরণ হইতে আমরা

কোন সারোদ্ধার করিতে পারিলাম না। বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর উপর সে বিচারের ভার অর্পণ করিয়া আমরা বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রন্থখানি কঠিন বৈষ্ণবতত্ত্ব-সম্বন্ধী। ইহাতে শিক্ষাগুরুর মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রদায়-বিশেষের পূজ্য গ্রন্থে অন্যের অধিকার থাকা স্বাভাবিক নহে; বিশেষতঃ, বিধর্ম্মী আমাদের ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম-পরিজ্ঞানের সুযোগই নাই। গ্রন্থের অনেক স্থান বুঝিতে হইলে বৈষ্ণবদিগের সাধন ও ভজন-প্রণালীতে জ্ঞান থাকা চাই; গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকেও আবার অনেক স্থান বোধগম্য হইবার নহে। এই কারণে গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্মবোধে ও রসগ্রহণে আমরা অক্ষম। নিম্নে আমরা কতকটা স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে প্রদর্শন করিতেছি :—

সেই জন ভাগ্যবান সংসারের মাঝে।
তেঁই জন শিক্ষা লৈল সৎগুরুর কাছে।
নিত্যানন্দ অনুগত শিক্ষা যে বা লয়।
নিত্যের যাচক কায়া নয়ানে দেখয়।
নিত্যানন্দময় রাধা রস পরকিয়া।
রাধা রাম এক স্বরূপ দেখ বিচারিয়া।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে রাধা নিত্যানন্দ হয়।
তার সঙ্গে মহাপ্রভু রস আস্বাদয়।
নিত্যানন্দের এক দেহ দুই ভাগ হৈল।
রাধার রূপে অনঙ্গ যেন জন্মিল আসিয়া।
নিত্যানন্দ শক্তি হৈতে আনন্দের ধাম।
নিত্য শক্তির দ্বারায় প্রভুর জুড়াএ মনস্কাম।
পরকিয়া রসে দোঁহে বাসে নিরন্তর।
অনঙ্গ রূপেতে রহে প্রেমের সঞ্চার।
প্রেমরসে এক বস্তু জগতে আছএ।
প্রেমের স্বরূপ হই কৃষ্ণকে ভজয়।

কামনাবর্জ্জিত হইলে সাধন নহে পূর্ণ;
কাম-গন্ধ না থাকিলে দেহ হয়ে শূন্য।
শূন্য দেহে কৃষ্ণের যে ভজন না হয়।
শুদ্ধ পাঠ পড়িয়া যে যথা তথা কহে।

বীজ ছাড়া দেহের জে কোন কার্য্য নাই।
কামে বীজে উপাসনা সবে হবে ভাই॥
কাম-বীজ গায়ত্রী জে যাঁর দেহে আছে।
তাঁর দেহ শূন্য নহে ভুবনে বিরাজে॥
সেই বীজে গাছের জে অঙ্কুর পল্লব হএ।
ডাল প্রকাশিআ চৌদ্দ ভুবন ব্যাপয়ে॥
শাখা উপশাখা আদি বাড়এ বিস্তর।
তাহা দেখি মহাপ্রভু আনন্দ অন্তর॥
মালী হৈয়া সেই শাখা করহে পালন।
মালীরূপা শিক্ষাগুরু জানিয় বাবণ॥

ত্রিপদী-ছন্দের একটু নমুনা প্রদর্শন করি,—

শিক্ষা-গুরু পদ, অমূল্য সম্পদ,
জে করে বিপদনাশী,
যাহার কৃপাতে, মিলয়ে সাক্ষাতে,
প্রেমচিন্তামণি রাশি॥
তার কৃপা হৈলে, ব্রজধান মিলে,
দেখিব নআন ভরি।
আরোপে থাকিআ, দেহ মন দিআ,
চরণ সেবন করি॥
আরোপে আকৃতি, পুরুষ প্রকৃতি,
দেখিব সহস্রাকারে।
স্থানের নির্ণয়, দেও পরিচয়,
তবে সে তাহারে মিলে॥ ইত্যাদি।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে গ্রন্থের রচনাপ্রণালী কিরূপ, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুতরাং ভাষা সম্বন্ধে আর কিছু না বলিলেও চলে। গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। সমগ্র পুঁথি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিরচিত। যতিভঙ্গাদি দোষ প্রায় লক্ষিত হয় না। প্রতিলিপির আধুনিকতা দেখিয়া মনে হয়, নকল করিবার সময় গ্রন্থের ভাষা অনেক সংস্কৃত ও মার্জ্জিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত। 'পরিষদ' একা কত কাজ করিবেন? আমাদের মাসিক সাহিত্যের সম্পাদকগণ কৃপা করিলে অনেক ক্ষুদ্র বিলুপ্তপ্রায় পুথি ধ্বংস হইতে রক্ষিত হইতে পারে। আশা করি, আমাদের

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে কি না, মাননীয় সম্পাদকগণ একবার ধীরচিত্তে তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। আমাদের দেশের ধনাঢ্যগণ এ বিষয়ে উদাসীন; দরিদ্র সাহিত্যসেবিগণের ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা নাই; দুর্ভাগ্য বঙ্গভাষা কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে?

শ্রীআবদুল করিম।

হিন্দুদের শাস্ত্র।

['আরেশ্-ই-মহাফিল' অবলম্বনে লিখিত।]

হিন্দু জাতির অসংখ্য শাস্ত্র আছে। এই বিদ্যাসমূহের পারগমন বা তলস্পর্শ কেহ করিতে পারে না। অধিকাংশ শাস্ত্রের মূল বেদ। হিন্দুদের সমুদায় ধর্ম্মমত বেদ-মূলক। এরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, আদিতে পৃথিবীতে জল ব্যতীত কিছু ছিল না; কেবল বিষ্ণু ছিলেন। তিনি এক অক্ষয় ডুম্বুর বৃক্ষের পত্রোপরি ভাসমান ছিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুর নাভিতে এক পদ্মের সৃষ্টি করিলেন। এই পদ্ম হইতে চতুর্ম্মুখ চতুর্ভুজ নরাকৃতি ব্রহ্মার উদ্ভব হইল। ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদের উৎপত্তি হয়। হিন্দুরা এই জন্য ব্রহ্মার আদেশকে তাহাদের ধর্ম্মের মূল বলিয়া বিশ্বাস করে। ব্রহ্মার পুত্র ম্যানো (মনু) হইতে উপনিষদের উদ্ভব হইয়াছে! উপনিষদে এক পরমেশ্বরের তত্ত্ব নানা প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। উপনিষদ্ বেদের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। মনুর পুত্র ও পৌত্রগণ বেদ হইতে ছয়টি শাস্ত্রের সঙ্কলন করিয়া প্রচার করেন। এই ছয়টি শাস্ত্র পরমেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব নানা প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। ইহাতে পরমার্থতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র, সমুদায়ই আছে। শাস্ত্রগুলির মত প্রায় একরূপ, কোন কোন বিষয়ে সামান্যমাত্র মতপার্থক্য অনুভূত হয়। সামান্যতঃ সেগুলি দর্শনশাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (১) দর্শনশাস্ত্র—

(ক) ন্যায়দর্শন—ছয় দর্শনের মধ্যে ন্যায়দর্শন একখানি দর্শন। গৌতম মুনি এই দর্শনের প্রণয়নকর্ত্তা। ন্যায়দর্শনের মত এই যে, এই জগতে কার্য্য,

কারণ ও কর্ত্তা ব্যতীত কিছু নাই। জগৎকর্ত্তা কারণ ব্যতীত কিছু করিতে পারেন না, কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র। তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মাইবার সৃষ্ট বস্তুর সাধ্য নাই। কুম্ভকার নিজের ইচ্ছায় ঘট নির্ম্মাণ করে। মৃত্তিকার বা ঘটের ঘটনির্ম্মাণ বিষয়ে তাহাকে কোন উপদেশ দিবার সাধ্য নাই। সেইরূপ সৃষ্টি-কর্ত্তার ইচ্ছার উপর কোন কথা বলিবার সৃষ্ট বস্তুর ক্ষমতা নাই।

(খ) বৈশেষিকদর্শন—দ্বিতীয় দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন। কণরদ নামক (কণাদ) ঋষি এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। কণাদ বলেন, কার্য্যের ফলবত্তা কালের উপর নির্ভর করে। অসময়ে বীজবপন করিলে ফল পাওয়া যায় না। কালের উপাসনা করা উচিত।

(গ) সাংখ্যদর্শন—তৃতীয় দর্শনের নাম সাংখ্যদর্শন। কপিল মুনি সাংখ্য-দর্শনের প্রণয়নকর্ত্তা। এই শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করিলে সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। কপিল বলেন, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা ক্ষণস্থায়ী; যাহা দর্শন-স্পর্শনাদির বিষয় নয়, তাহা অবিনশ্বর। আত্মা অনশ্বর, কিন্তু মনুষ্যদেহ নশ্বর।

(ঘ) পাতঞ্জলদর্শন—চতুর্থ দর্শনের নাম পাতঞ্জলদর্শন। এই শাস্ত্র শিখিলে পরের মনের কথা জানা যায়! পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। নিজের শরীরকে এত লঘু করিতে পারা যায় যে, জল ও বায়ুরাশির উপর দিয়া গমনের সামর্থ্য জন্মে। মহর্ষি পতঞ্জলি এই দর্শনের প্রণেতা।

(ঙ) বেদান্তদর্শন—পঞ্চম দর্শনের নাম বেদান্ত। ব্যাসদেব বেদান্তের প্রণেতা। এই দর্শনের মত এই যে, এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। যদিও পৃথিবী ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি পার্থিব পদার্থজাত তাঁহা হইতে ভিন্ন নয়। জলের তরঙ্গ যেমন জল হইতে অভিন্ন, এবং সূর্য্যের আলোক যেমন সূর্য্য হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ এই জগৎ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন।

(চ) মীমাংসাদর্শন—ষষ্ঠ দর্শনের নাম মীমাংসাদর্শন। এই দর্শনের প্রণেতার নাম জৈমিনি। জৈমিনির মতে কর্ম্ম সমুদায়ের কারণ। কৃষক যেমন বীজবপন করে, তেমনই ফল পায়; সেইরূপ, দারিদ্র্য, ধনবত্তা, পাপপুণ্য, স্বর্গ নরক, সমস্তই স্বকৃত কর্ম্মের ফলমাত্র।

এই সমুদায় দর্শনশাস্ত্র ব্যতীত, হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র নামে আর কতকগুলি শাস্ত্র আছে। ব্রহ্মার পুত্রগণ, বেদ হইতে তৎসমস্তের সঙ্কলন করিয়াছেন। হিন্দুদের যাবতীয় আচার ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

চারি বর্ণ, যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। চারি আশ্রম ; যেমন, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থিত হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য, পূজা, দান, উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাদমীমাংসা, বিচার প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার ধর্ম্মশাস্ত্রের মতানুসারে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।

(২) ব্যাকরণবিদ্যা—ব্যাকরণ না শিখিলেও আরবী ভাষা শিখিতে পারা যায়, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ না জানিলে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান জন্মে না। হিন্দুরা বলেন, যিনি স্বীয় মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, সেই শেষনাগ ব্যাকরণের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। (গ্রন্থকার যে পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল)। বহুসংখ্যক মনীষী ব্যক্তি অসংখ্য গ্রন্থের রচনা করিয়া সংস্কৃতভাষাশিক্ষার পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন।

(৩) হার্দ্দপুরাণ—হিন্দুদের একবিধ শাস্ত্রের নাম হার্দ্দ পুরাণ। এই শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে পরলোক ও তত্রগত আত্মার অবস্থা, স্বর্গ, নরক, সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবরণ, ঋষিগণ ও রাজগণের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়।

হার্দ্দ শব্দের অর্থ কি অষ্টাদশ ?

(৪) একরূপ শাস্ত্রের নাম কর্ম্মবেবেক (কর্ম্মবিবেক)। এই শাস্ত্র জানিলে পূর্ব্বজন্মের কোন পাপে অন্ধত্ব, বধিরত্ব, খঞ্জত্ব, কুষ্ঠাদি রোগ, দারিদ্র্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহা, এবং কি করিলে তৎসমস্তের উপশম হয়, তাহা বলিতে পারা যায়।

(৫) এক শাস্ত্রের নাম লীলাবতী। ইহা গণিতবিদ্যা। এই বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কঠিন কঠিন গাণিতিক ও জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার সমাধান করিতে পারেন।

(৬) বৈদ্যকশাস্ত্র—এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সমুদয় শরীরের অবস্থা, সন্ধিস্থানের তত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগের নিদান ও চিকিৎসা জানেন। যদিও ব্যাসদেব এই শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা, তথাপি অন্যান্য বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক ইহার প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

(৭) জ্যোতিষবিদ্যা—এই বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহগণের অবস্থান, মনুষ্যের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উপর গ্রহগণের প্রভাব, এবং গ্রহনক্ষত্রজনিত মানবীয় দুর্ভাগ্যের অপনোদনের উপায় জানেন। কেহ কেহ বলেন, সূর্য্য হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে; কেহ কেহ বলেন, বেদসমুদ্র হইতে এই শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে।

(৮) সামদারক-(সামুদ্রিক)-বিদ্যা—এই বিদ্যায় শিক্ষিতগণ করতল, মস্তক ও শরীরের রেখা ও আকার দেখিয়া লোকের ভবিষ্যৎ ভাগ্য বলিতে পারেন।

(৯) শাকানবিদ্যা (শাকুনবিদ্যা)—এই বিদ্যা জানা থাকিলে পশু পক্ষী প্রভৃতির স্বর শুনিয়া ও আকাশাদি দেখিয়া মনুষ্যসাধারণের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

(১০) স্বরবিদ্যা—স্বরবিদ্যা শিখিলে, মনুষ্যের বাম ও দক্ষিণ নাসার নিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া তাহাদের তৎকালীন ভাল মন্দ বলিতে পারা যায়।

(১১) আগমবিদ্যা—আগমবিদ্যাবলে ইন্দ্রজালের উৎপাদন করিতে পারা যায়। মন্ত্রবলে লোকের শরীরে পীড়ার উৎপাদন করিতে পারা যায়। জিনেরা মনুষ্যের চিরশত্রু। সলোমনের আমলে তাহারা কিয়ৎপরিমাণে দমিত হইয়াছিল। এখন পুনরায় তাহারা অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। আগমবিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে জিনেরা সর্ব্বদাই অবনতমস্তক থাকে। আগমিকেরা কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন, লোককে ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, বন্ধুগণকে সুখী করিতে পারেন; এমন কি, নির্দ্ধনকেও ধনশালী করিবার ক্ষমতা রাখেন।

(১২) গাড়ুবিদ্যা (গারুড়বিদ্যা)—এই বিদ্যার ক্ষমতায় সর্প-বৃশ্চিকাদি বশীভূত হয়, তাহাদের দংশনের চিকিৎসা করা যায়, এবং ইচ্ছামাত্র যে কোন সর্পকে নিকটে আনা যায়। এই বিদ্যায় দক্ষতা জন্মিলে সর্পজাতির সমস্ত তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়।

(১৩) ধানক (ধনুর্বিদ্যা)—এই বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণের শরচালনায় নৈপুণ্য জন্মে। তাঁহারা শরীরের শক্তি অনুসারে দূরে শরক্ষেপ করিতে পারেন।

(১৪) রত্নপর্চ্চা (রত্নপরিচয়বিদ্যা)—এই বিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রত্ন, মণি, মাণিক্য ও মহার্হ প্রস্তরসমূহের দোষগুণ, উৎপত্তিস্থান ও মূল্য প্রভৃতি অবগত থাকেন।

(১৫) বাস্তুবিদ্যা—এই বিদ্যা জানিলে সর্ব্বপ্রকার গৃহনির্ম্মাণকৌশল, পুষ্পোদ্যাননির্ম্মাণপ্রণালী ও জলাশয়াদি-খননের নিয়মে অভিজ্ঞতা জন্মে।

(১৬) রসায়নবিদ্যা—এই অদ্ভুত বিদ্যাবলে ধাতুমাত্রের ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, এবং ভস্ম হইতে স্বর্ণ রৌপ্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে পারা যায়!

(১৭) ইন্দ্রজালবিদ্যা—এই বিদ্যা যাঁহারা শিক্ষা করেন, তাঁহারা পৃথিবী বিমোহিত করিতে পারেন। নিজের দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরদেহে প্রবেশ করিতে পারেন।

(১৮) গান্ধর্ব্ববিদ্যা—এই বিদ্যা শিখিলে সুন্দররূপে গান করিতে, নাচিতে ও বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া বাজাইতে পারা যায়। এই বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ছয়টি পুরুষ স্বর ও ত্রিশটি স্ত্রী স্বরের (রাগিণীর?) তত্ত্ব অবগত থাকেন। স্বরগণের আরোহ অবরোহ প্রণালী ও তাহাদের মধ্যে অবান্তর ভেদ সূক্ষ্মরূপে জানিতে পারেন।

(১৯) নটবিদ্যা—যাহারা এই বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহারা নানারূপ বাজি দেখাইতে পারে; যুবাকে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধকে যুবা করিতে পারে; একটি বালককে কোলে করিয়া বাঁশের উপর উঠিতে পারে; বিনা রজ্জুতে মালা গাঁথিতে পারে; একটা দড়ীর উপর দিয়া দৌড়িতে পারে।

(২০) গজশাস্ত্র—এই শাস্ত্র শিক্ষা করিলে হস্তীর সম্বন্ধে কোন তত্ত্বই অজ্ঞাত থাকে না। হস্তীর জাতি, উদ্ভবস্থান, রোগ ও চিকিৎসা, সমস্তই এই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

(২১) শালাতর-(শালিহোত্র)-বিদ্যা—অশ্বজাতি সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই বিদ্যা শিখিলে জানিতে পারা যায়।

এই একবিংশতি বিদ্যার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিয়াছেন। গ্রন্থকার হিন্দু শাস্ত্রের অনেক অদ্ভুত ও উদ্ভট ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, তিনি হিন্দুদের গুণগ্রাহী ছিলেন। হিন্দুদের শাস্ত্রগুলির সম্বন্ধে যে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র প্রকৃত ও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হউক, কিয়দংশে বিশুদ্ধ বটে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দুর্ঘটনা।

১

জীবনে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই, ঘটিবার সূত্রপাতও হয় নাই, এবং শীঘ্র ঘটিবে; তাহার সম্ভাবনা বড় কম ছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, বৃদ্ধা মাতার মুখ চাহিয়া কায়ক্লেশে দিনপাত করিতাম। বহু বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াও একটা ভাল চাকুরী জুটে নাই; সে জন্য বিধাতার কোন দোষ লক্ষ্য না করিয়া আপাততঃ বিবাহের চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য একটা ছোট খাট রকমের বৈরাগ্যের বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। একটি অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান বন্ধু ছয় আনা মূল্যের ভগবৎগীতা (সটীক) কিনিয়া দিয়াছিলেন; তাহা হইতেই জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য মধ্যে মধ্যে সংগ্রহ করিতাম। কাহারও সহিত বাদ বিসংবাদ ছিল না। মোটামুটি কর্ম্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়া প্রায় অকর্ম্মা হইয়া এ দিক ও দিক ছুটিয়া বেড়াইতাম। যদি পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের কোন গোড়া অদৃষ্টচক্রে নিহিত না থাকিত, তবে বোধ হয় এক রকম সুখে ইহজন্মটা কাটাইতে পারিতাম।

কিন্তু—

কিন্তুর অর্থ এই যে, যাহা ঘটে, তাহা অদৃষ্ট; যাহা না ঘটে, সেটাও অদৃষ্ট। আমি চাহি বড়মানুষ হইতে, যদি না হই, সেটাও অদৃষ্ট। "হে ভগবান, আমি কিছুই চাহি না", ইহা বলিলেও যদি কিছু ঘটে, তাহাও অদৃষ্ট। ভগবানের বিধান এই যে, সকলে উত্তম মধ্যম কিছু কিছু পায়; অতএব "না" বলিলে চলিবে না। সুতরাং বেশ দেখা যাইতেছে, অদৃষ্ট একটা বৃহৎ ব্যাপার। আমি অদৃষ্ট বিশ্বাস করিতাম। বিশ্বাস করাটাও অদৃষ্ট। বন্ধুবর্গ বলিতেন, "তবে কি তুমি কোন কর্ম্ম করিবে না? চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? হে পার্থ, কর্ম্ম কর, কর্ম্ম না করিলে তোমার দিনপাত হইবে না", ইত্যাদি। আমার বোধ হয়, স্বয়ং ভগবান অদৃষ্টের বহুদূরত্ব অনুভব করেন নাই। আমি যদি ইচ্ছা করিলেই কর্ম্ম করিতে পারিতাম, তবে আর রক্ষা কি? কর্ম্ম করিবার উদ্বেগ, উদ্যমশীলতা, প্রবৃত্তি, সবই অদৃষ্ট। অর্থাৎ, আমাদের দেহখানি একটা জড়ভরত। যদি কোন মহারথী অনুগ্রহ করিয়া চালান, তবে চলিবে, নচেৎ বৃথা। যতই বুঝাও, যতই বক, আমার কিন্তু এ বিষয়ে একটা ঘোরতর বিশ্বাস আছে।

এইরূপে ঘোর অদৃষ্টবাদী হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় মা অযোধ্যায়

যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মাতৃস্নেহ সকলেরই আছে, কিন্তু আমার একটু অধিক রকমের ছিল। শৈশবাবধি মাতাই লালনপালন করিয়াছিলেন, এবং পিতার অভাবে ভিক্ষা করিয়া এবং ধনী কুটুম্ববর্গের পদসেবা করিয়া আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মার আশীর্ব্বাদ-শক্তি-প্রভাবে বোধ হয় এত দিন আমি টিঁকিয়া ছিলাম, এবং মধ্যে মধ্যে সেটা সত্য বলিয়া বোধ হইত। মাতুলালয়ের কোন সম্পর্কীয় লোক অযোধ্যায় আমাকে একটা চাকুরী দিতে পারিতেন, ও সেই সূত্রে সেই আশায় মাতা দুই দিন পরেই সেখানে চলিয়া গেলেন। কেন জানি না, রেলওয়ে ষ্টেশনে মাতার নিকট বিদায় লইয়া বাটী আসিবার সময় একটা মহাশূন্যতা অনুভব করিতে লাগিলাম।

কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই মনের মধ্যে একটা গোলযোগ হয়। যাহারা দেহের মধ্যে থাকিয়া এই গোলযোগের সূত্রপাত ঘটায়, হয় ত তাহারা ত্রিকালজ্ঞ, কিংবা তাহাদিগের সহিত দুর্ঘটনা ও অদৃষ্ট প্রভৃতির গূঢ় সম্বন্ধ আছে। দুঃখের বিষয়, মন অন্যান্য বিষয়ে আকৃষ্ট থাকায় সচরাচর সকলে এই অন্তঃপ্রসূত ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে চাহিয়া দেখে না, কিন্তু অন্য কোন কর্ম্ম না থাকিলে মন এই গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া কখন কখন তাহা অনুভব করে। আমিও বোধ হয় তাহাই করিয়াছিলাম।

কত শত মন্দিরে আরতি হয়, ঢাক ঢোল বাজে, কাঁসর ঘণ্টা নিনাদিত হয়, কিন্তু তাহাতে কয়টা লোক মন্দিরে গিয়া আরতি দেখে? মনের মধ্যে যদি একটা ডঙ্কাও বাজে, তথাপি কাহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গে?

অতএব শীঘ্রই চারিটি আহার করিয়া পাড়ায় তাস খেলিতে গেলাম, এবং যথাসাধ্য পরনিন্দা করিয়া রাত্রিকালে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

২

অযোধ্যা হইতে মার পত্র পাইলাম যে, তিনি বন্ধুবর্গের সহিত নিরাপদে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং আমার একটা চাকুরীরও যোগাড় করিয়াছেন। খবর পাইবামাত্র চাঁদনি হইতে ভাল শার্ট, জুতা, আয়না, ক্রুশ প্রভৃতি কিনিয়া ফেলিলাম; এবং পূর্ব্বর্বর্ণিত বৈরাগ্যের বাঁধটা একেবারে না ভাঙ্গিয়া আপাততঃ একটা পথ খুলিয়া দিলাম।

পথিমধ্যে "হালুটারিসের" রোসেড ও মিঠাপানের আস্বাদন অনুভব করিয়া একেবারে বহুবাজারে আসিয়া দুই শিশি কুন্তলীন সংগ্রহ করিলাম। সন্ধ্যাকালে হিন্দু হোটেল হইতে দস্তরমত চপ্, কট্‌লেট্, প্রভৃতির অডার

দিয়া ষ্টার থিয়েটারে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলাম। এক দিনেই সঞ্চিত ধনের অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হইয়া গেল। অপরার্দ্ধ অযোধ্যা পর্য্যন্ত যাইবার মধ্য শ্রেণীর ভাড়ার জন্য রাখিয়া দিলাম।

এমন সময় মাতার একখানা টেলিগ্রাম পাইলাম। তিনি কলিকাতায় আসিয়া আমার বিবাহ দিয়া একেবারে পুত্রবধূর সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

কথাটা মন্দ নহে। কিন্তু পাত্রীটি আমার তত মনোমত ছিল না। পূর্ব্বে হয় ত ছিল; কিন্তু এক শত টাকার চাকুরী পাইয়া একটা হাবা সাদাশিধা বালিকার পাণিগ্রহণ করাটা যুক্তিসিদ্ধ কি না, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিল। নলিনী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদরের কন্যা, এবং আমার প্রতিবেশিনী। আমার উপর তাহার টান থাকা নিতান্তই সম্ভব; কেন না, অন্নবস্ত্রের কষ্ট পূর্ব্বে থাকিলেও, রূপে, গুণে ও শীলতায় পাড়ায় আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কেহই ছিল না। হরি মুখুর্য্যে হয় ত একটু দেখিতে ভাল, কিন্তু লেখাপড়া জানে না, এবং তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমার সহিত বিবাহ দিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখন নিশ্চয়ই রাজি হইবেন, এবং বিবাহপ্রস্তাব নামঞ্জুর করিলে যদি নলিনীর হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়, সেই দুর্ভাবনায় অনেকটা ইতস্ততঃ করিয়া অর্দ্ধ শিশি কুন্তলীন কুঞ্চিত কেশদামে ঢালিয়া দিলাম।

আহারাদি সমাপ্ত করিয়া থিয়েটার দেখিতে গেলাম, এবং প্রত্যাবর্ত্তনান্তে রাত্রিকালে দক্ষিণবাতাসে কেশনিঃসৃত সুগন্ধি তৈলের সুবাসে নলিনী কুমুদিনী প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিয়া সকালেই পঞ্জাব মেলে মাতার আগমন-প্রতীক্ষায় হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেক লোক আসিল, গেল; কিন্তু মাকে দেখিতে পাইলাম না। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু মা কোথাও নাই।

কিছু উদ্বিগ্ন হইলাম। টেলিগ্রামখানি খুলিয়া দেখিলাম যে, পূর্ব্বের দিন মধ্যাহ্নকালে গোরখপুর হইতে রওনা করা হইয়াছে। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী কোন ট্রেণ ফেল না হইলে কথিত পঞ্জাব-মেলে না আসিবার কোনও কারণই ছিল না। সমস্ত দিন হাবড়ায় অপেক্ষা করিয়া অন্যান্য মেলট্রেণ ও প্যাসেঞ্জার ট্রেণগুলি দেখিলাম। মাতা আসিয়া পঁহুছিলেন না।

আমাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া একটি ভদ্রলোক বলিলেন, "তুমি কাহার অপেক্ষা করিতেছ?"

আমি তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলায় এবং টেলিগ্রামখানি তাঁহার হস্তে

দিবার পর তিনি কিছু সকরুণ ও গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিলেন। তিনি ষ্টেশনের বুকিংক্লার্ক।

তিনি বলিলেন, "তোমার এই ফের্‌তা মেলে বরাবর মোকামাঘাট পার হইয়া শোণপুরে যাওয়া উচিত। শোণপুরে কিংবা বনওয়ারীচকে নামিয়া তোমার মাতার অনুসন্ধান করিও।"

আমি। কেন মহাশয়?

বুকিংক্লার্ক। কল্য রাত্রিকালে বেঙ্গল-নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের পথে ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বনওয়ারীচকের এক মাইল দূরে 'কলিশন্‌' হইয়া প্রায় তিন চারি শত লোক মারা গিয়াছে। টেলিগ্রাম দেখিয়া বোধ হয়, তোমার মাতাও গোরখপুর হইতে সেই গাড়ীতে আসিতেছিলেন।

আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া রেলিং ধরিয়া রহিলাম।

৩

যাহাদের মা গিয়াছে, তাহারা দুঃখীর দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। এ জগতে স্নেহ মায়া মমতার আধার কেবল মাতাই ছিলেন। তাহা উৎপাটিত হইল। সেই সঙ্গে জগতের সম্বন্ধও গেল!

কেবল রহিল স্মৃতি। সেই স্মৃতির সহিত এই দুর্ঘটনার সম্বন্ধ জড়িত হইল। সেই আনন্দময় মুখের জ্যোতি এখন অমানিশার অন্ধকারে। সেই স্নেহভরা নয়নের সকরুণ দৃষ্টি, সেই শীর্ণ দেহে সন্তানের জন্য আজীবন ক্লেশস্বীকার,—সকলই মনে পড়িতে লাগিল। হয় ত এতক্ষণ দেহ শৃগাল কুক্কুরে লইয়া গিয়াছে। হয় ত ব্রাহ্মণোচিত সংকারও হইবে না। হয় ত তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থার আর্ত্তনাদ, ছিন্ন হস্তপদের ভীষণ যন্ত্রণা কেহই জানিতে পায় নাই। পাইলেও কে সেই অজানিত দেশে শ্মশানে দুঃখীর যন্ত্রণামোচন করিতে গিয়াছে?

কেহ কেহ বলিল, অধিক লোক মরে নাই। মায়াবিনী আশা আসিয়া বলিল, মাতা হয় ত বাঁচিয়া আছেন। তিনি কি পাপ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অপমৃত্যু হইবে?

একবস্ত্রে সমস্ত রাত্রি ও সমস্ত দিন অনাহারে চলিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরে বনওয়ারীচকে পঁহুছিলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম যে, ঘটনাস্থলে একটিও মৃতদেহ নাই।

ষ্টেশন হইতে ঘটনাস্থলে ছুটিলাম। সেখানে কতকগুলি গাড়ীর ভগ্নাবশেষমাত্র রহিয়াছে। কতকগুলি লোক মৃত পিতা পুত্র প্রভৃতিকে স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে

কাঁদিতেছে। দুই একটি আলোক মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। দুই একটি কুক্কুর একটি শবদেহের অবশিষ্ট হস্তখানি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল। আমি দৌড়িয়া গেলাম। মার হস্ত নয় ত ? না।

সকলে বলিল, ছুটাছুটী করা বৃথা। যাহারা অৰ্দ্ধমৃত, তাহাদিগকেও শকটে লইয়া কোন অজ্ঞানিত স্থানে প্রোথিত করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি আরও ছুটিয়া গেলাম। সেই ভীষণ অন্ধকারে বালুকাস্তূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়া মা মা করিয়া প্রাণপণে ডাকিলাম। নৈশ বায়ু বেগে বহিতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রাণীর উত্তর পাইলাম না।

আবার কেহ কেহ আসিয়া বলিল, কয়েকটি আহত যাত্রীকে রেলওয়ে কোম্পানী শোণপুরে ও মজঃফরপুরে চালান দিয়াছে। তাড়াতাড়ি বালুকা হইতে উঠিলাম। কিন্তু হায় ! হাতে আর একটিও পয়সা নাই।

দুই দিন পূর্ব্বে বেশভূষা, সুগন্ধি ও থিয়েটারে যে টাকা ব্যয় করিয়াছিলাম, তাহা থাকিলে আর এখন এ বিপদে পড়িতাম না।

আপনাকে ধিক্কার দিয়া ক্রোধে মস্তকের কেশ উৎপাটন করিতে লাগিলাম। "মা ! একটি টাকার জন্য এখন ভাল করিয়া তোমার অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না !"—মস্তক ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত বহিতে লাগিল।

সেই রক্তাক্ত হস্তে একখানি প্রস্তর তুলিয়া লইলাম। যে জীবনে এত অসারতা, যে জীবন দয়া মমতা স্নেহের প্রতিদান দেয় না, সন্তানের সে জীবন রক্ষা করা পাপ !

সহসা কাহার করস্পর্শে আমার জ্ঞান হইল।

যেন কেহ বলিল, "ভাই ! তুমি টাকা চাও, এই লও।" আমি ভাষা শুনিয়া বুঝিলাম, সে কোন হিন্দুস্থানী বালিকা।

সে পুনরায় বলিল, "আমি ব্রাহ্মণকন্যা, ভাল বাঙ্গলা জানি না, কিছু কিছু জানি ; আমার পিতার মৃতদেহ এখানে দুই দিন পড়িয়া আছে, সংকার করিবার কেহ নাই। বালুকার পার্শ্বে পড়িয়া ছিল, তাই 'দস্যুরা' লইয়া যায় নাই। তুমি ব্রাহ্মণ, আমার পিতার দেহসংকারের সাহায্য কর, আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব।"

আমি। তুমি একটি বাঙ্গালী বিধবা ব্রাহ্মণীর শব এখানে দেখিয়াছ ? সে আমার মা।

বালিকা। আমি সকলকেই দেখিয়াছি। কোন বাঙ্গালী বিধবা ব্রাহ্মণী

এ গাড়ীতে ছিল না। ঈশ্বরের কৃপায় আপনার মাকে হয় ত আপনি পাইবেন, কিন্তু আমার পিতা গিয়াছেন, আমি পাইব না। এ স্থলে আপন পর তফাৎ রাখিয়া আমার উপর একটু দয়া করুন।"

৪

সেই নৈশ অন্ধকারে বালিকার হৃদয়ভেদী কোমল কথায় মায়ার আবরণ উন্মুক্ত হইয়া স্বর্গীয় করুণা-জ্যোতি দেখিতে পাইলাম।

সেই জ্যোতি স্ফুরিত হইয়া হৃদয়ে সহানুভূতি জাগরূক করিল। এত দিন যাহা চিন্তা করিয়া পাই নাই, যাহা বুঝিয়াছি মনে করিয়াও বুঝি নাই, তাহা সেই বালিকার সকরুণ স্বর বুঝাইয়া দিল।

আমি বলিলাম, "অনাথা! তুমি দাঁড়াও, তোমার পিতার যথাবিহিত সৎকার আমি অগ্রে করিব।"

তখন শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বালুকাস্তূপের উপর রাখিলাম। উষার সময় শবদাহ হইয়া গেল।

প্রভাতকিরণে দেখিলাম, বালিকার অতুলনীয় মূর্ত্তি। বালিকা বলিল,—

"আপনি আমার ভাই, কোন লজ্জা করিবেন না। আমি অযোধ্যার মহাদেব মিশ্রের কন্যা। বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া কলিকাতায় কালীদর্শনে যাইতেছিলাম। আমার সঙ্গে সাত হাজার টাকা আছে, ইহা লইয়া আপনার মাতার অনুসন্ধান করুন। আমি সঙ্গে সঙ্গে যাইব। আমাকে কলিকাতায় মাতুলালয়ে পঁহুছাইয়া দিবেন। পিতার যথাবিহিত সৎকারে আমার ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে। যে আমার ধর্ম্মরক্ষা করে, সে আমার গুরু; অতএব আমি আপনার পদযুগল চুম্বন করিলাম।"

বালিকা তাহাই করিল। আমি অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া তাহাকে ষ্টেশনে লইয়া গেলাম। বহু লোক সংগ্রহ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া মাতার অনুসন্ধান করিলাম। কত হাঁসপাতালে গেলাম। কিন্তু কোথাও মাতাকে দেখিতে পাইলাম না।

বালিকা বলিল, "আমার মনে লইতেছে, আপনার মা এ গাড়ীতে আসেন নাই।"

আমি। তোমার কথা সত্য হউক। কিন্তু তাহা কখনও সম্ভবে না। হয় ত তাঁহার শব নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে, কিংবা কোন অজ্ঞানিত স্থানে প্রোথিত করিয়াছে।

বালিকা মুক্তহস্তে আমাকে টাকা দিতে লাগিল; কিন্তু সকলই বৃথা হইল।

আমি বলিলাম, "তুমিই সুখী, জগতে যাঁহাকে ভালবাসিতে, তাঁহার মরণের সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছ, কিন্তু আমি অভাগা।"

বালিকা আমার দুঃখেও কাঁদিল, তাহার পিতার বিয়োগেও কাঁদিল।

হতাশহৃদয়ে কলিকাতায় পঁহুছিলাম। প্রথমে দুঃখের সঙ্গিনী সেই ব্রাহ্মণ-কন্যাকে তাহার মাতুলালয়ে লইয়া গেলাম।

শুনিলাম, বালিকার পিতা অত্যন্ত ধনী লোক ছিলেন। কন্যা সেই অতুল বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

বালিকার মাতুল আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি আমাকে কয়েক সহস্র টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন।

আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, দরিদ্র হইলেও এই সামান্য উপকারের প্রতিদান লইয়া আমি ব্রাহ্মণত্ব লুপ্ত করিতে চাহি না। আমি অনাহারে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

মাতার সেকালের একখানি জীর্ণ কন্থা লইয়া ভূতলে শয়ন করিলাম। তখন রাত্রি একটা। পাড়ার কেহ জাগিয়া নাই। আমি নিঃশব্দে আসিয়াছিলাম। বাটীর চাকর পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই।

কিছু ক্ষণ পরে ভৃত্য জগা ডাকিল, "দাদাবাবু! আপনি কত ক্ষণ এসেছেন? মা যে আপনার জন্য ভাবিয়া সারা।"

হঠাৎ দুর্দ্দম্য রক্তস্রোত শিরা বাহিয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করিল। আমি বলিলাম, "জগা! মা কে রে?"

জগা আশ্চর্য্য হইয়া রহিল। তখন মাতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি আসিয়া আমার হাত ধরিল। মা বলিলেন, "বিপিন! তুই কি মদ খেয়েছিস?"

৫

আমি বলিলাম, "মা! সত্য সত্য বল, তুমি বাঁচিয়া আছ?"

মা। তুই কি পাগল হয়েছিস? তোর চক্ষু যে রক্তবর্ণ! এ দু' দিন তুই কোথায় ছিলি? আমি সকল কথা মাকে বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি স্নেহভরে আমাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। মা ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি গোরখপুরে আসিয়া সেখান হইতে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দেখিতে গিয়াছিলাম, তাই দুই দিন দেরী হইয়া গিয়াছে। আমার পুনরায় টেলিগ্রাম না করা ভুল হইয়াছে। সেটা আমার মনে ছিল না।"

আবার মায়া বর্ণে বর্ণে জীবনসূত্র লইয়া নূতন সংসার গ্রথিত করিতে লাগিল। কিন্তু স্মৃতির মধ্যে যে একান্ত একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা দেখিতে পাইল না।

মায়া আমাকে পুনরায় দর্পণ ধরাইয়া কেশবিন্যাসে রত করিল, কিন্তু সেই কেশাগ্রভাগে জগতের অসার নির্ম্মমতা অসিতবরণে প্রতিভাসিত হইল। আমি ভয়ে দর্পণ ছাড়িয়া দিলাম।

আবার নলিনীর সহিত বিবাহের কথা! আবার সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ ছবি!

কিন্তু সেই শ্মশানের মাতৃশোক ও সেই সুবর্ণপ্রতিমার পিতৃবৎসলতা স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত হইয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিল।

মাতা আমার স্বভাবের একটা পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেক বুঝাইলেন। "বাবা, তুমি দেরী করিলে চাকুরীটি হইবে না; আর কত দিন এমন করিয়া থাকিবে?"

আমি অন্যমনে কালীঘাটে চলিয়া গেলাম। সেদিন শিবচতুর্দ্দশী। অতিশয় জনসমাগম দেখিয়া নদীতীরে গেলাম।

জোয়ার আসিয়াছে। দেখিলাম, প্রদীপহস্তে দুই চারিটি স্ত্রীলোকের সহিত সেই বালিকা অন্ধকারে শিবপূজা করিতেছে।

বোধ হইল, তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ। জগতের কল্যাণের জন্য মধুরকণ্ঠে বালিকা মন্ত্র উচ্চারণ করিল। বোধ হইল, সে আরও বলিল, "আমার ভইয়ার মঙ্গল হউক।"

আমি কম্পিতপদে সেই দিকে গেলাম। সে দেখিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। আমি তাহাকে হৃদয়ে ধরিলাম।

ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম, মরণ, জীবন,—বোধ হয় সকলেরই গোড়া শ্মশান, শেষও শ্মশান। ইহাদের পার্থক্য বড় বুঝিতে পারি না।

সে বলিল, "ভাই!" আমার বোধ হইল, যেন মাতৃস্নেহ ফিরিয়া পাইলাম। আবার মায়া অন্য বর্ণে আসিয়া আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিল। বালিকার চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া গেল। আমি হৃদয়ের আবেগে তাহার চক্ষু দুটি চুম্বন করিয়া তাহাকে নারীসুলভ লজ্জায় সাজাইলাম।

বালিকার সঙ্গিনীগণ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমি পাগলের ন্যায় ফিরিয়া আসিলাম।

তৎপরদিন বালিকার মাতুল বিরিঞ্চি মিশ্র মহাশয় হতাশ ভাবে আসিয়া মাতাকে বুঝাইলেন যে, মহাদেব মিশ্রের কন্যা আমাকেই বিবাহ করিবে, তাহাতে যদি জাতি যায়, তাহাও স্বীকার।

লক্ষ টাকার বিষয় পাইলে জাতি মারে কাহার সাধ্য? আমি মাকে বলিলাম, "ইহাই মাতৃভক্তির পুরস্কার।"

কিন্তু আমরা বিষয় সম্পূর্ণ ভোগ করিলাম না। প্রায় বার আনা হত ও আহতের পরিবারবর্গের দুঃখমোচনার্থ দান করিলাম।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি।

৩

১৯শে মাঘ। ইংরাজ কবি কীটসের কয়েকটি সনেট ও গীতিকবিতার আলোচনা করিলাম। কীট্‌সের ন্যায় কোমল ও প্রেমপ্রবণ হৃদয় প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার মৃদু-মধুর স্বপ্নময় কল্পনার স্পর্শে হৃদয়-রাজ্যের অতিসুকুমার সূক্ষ্মতম ভাবগুলিও যেন জীবন্ত ও মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। তাঁহার কাব্যমধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় না যে, পৃথিবীর মাটীর উপর বসিয়া লেখার অক্ষরে উহাদিগকে পাঠ করিয়া যাইতেছি। মনে হয়, যেন কোন সুবর্ণময় মেঘপুরীতে চিরসমুজ্জ্বল উষালোকে চিরসমুৎসারিত-পুষ্পসৌরভের অভ্যন্তরে, তাঁহারই বর্ণিত দেবপ্রতিমাগুলির ন্যায় স্বাধীনহৃদয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছি। বসুন্ধরার শোক-দুঃখতাপময় জীবনসংগ্রামের কথা যেন বহু দিন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি; কাব্যে কল্পনায় মানব-হৃদয়ের মাঝে স্বত-উচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষায় এত দিন ধরিয়া যে সুখ সৌন্দর্য্যের রাজ্য সৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল, যেন কোন ইন্দ্রজালবলে আমরা অকস্মাৎ তাহারই অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এতটা মোহ ও ভাবপ্রবণতা জগতের বাস্তব অবস্থার কত দূর উপযোগী, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। চারি দিকে কল্পনার প্রাচীর গঠন করিয়া মেঘ-শয়নে শুইয়া বাসনার সুখস্বপ্নে এ জীবন যাপন করিবার অবসর কোথা? নিদ্রাতুর চক্ষু বুজিতে না বুজিতে সংসার-প্রহরীর কঠোর কশাঘাত আমাদিগকে যে নিরন্তর জাগাইয়া তুলিতেছে! এই উদাসীন কল্পনাপ্রিয়তা পৃথিবীর বর্ত্তমান

অবস্থার বড় উপযোগী নহে। তাই সমালোচক হ্যাজ্‌লিটের সহিত আমিও বলি, "Keats wanted manly strength and fortitude to reject the temptations of singularity in sentiment and expression." যাহা পাইবার নহে, তাহার কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া, যাহা চক্ষের উপর দেখিতেছি, তাহাকেই কাব্যের ভিত্তি করা কর্ত্তব্য।

"মেঘমালার" শেষ গল্পটি যত শীঘ্র পারি, শেষ করিতে হইবে। বহিখানি এই বৎসরের মধ্যেই ছাপাইতে পারিলে অনেকটা তৃপ্তিলাভ করা যায়। এখন ত "সাহিত্য-চর্চ্চা" ও পুস্তক-প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুতেই সুখ দেখিতে পাই না। হায়! মানুষ এত কাল ধরিয়া যে সুখের কল্পনা করিয়া আসিতেছে, তাহা কি সে কখনও পাইবে না? যে অবস্থায় রহিয়াছি, তাহার কথা বলিতেছি না; বর্ত্তমান অবস্থায় সুখ কেবল সুখত্যাগে, বীরপুরুষের ন্যায় দুঃখের দহনে ও উপেক্ষায়। কিন্তু ইহা ত আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। দার্শনিক মতের বিরোধী হইলেও আমরা দুঃখহীন নিত্য সুখের অধিকারী হইতে চাই। সে সুখে তীব্রতা থাকিবে না সত্য; কিন্তু তীব্রতা ত বাঞ্ছনীয় নহে। দুঃখের নিবৃত্তিই আমাদের অভীপ্সিত, সুখের সম্ভোগ আকাঙ্ক্ষিত নহে। মানুষ চিরদিন ধরিয়া আশাই করিতেছে, আশা সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা ত আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। তবে, পরজগতের উপর আমাদের একটা স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে। আর উহা না থাকিলেও জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। এখানে যাহা কিছু মিলিল না, তাহাই সেই ভবিষ্য জগতের উপর বরাত দিয়া রাখিতেছি; এ সংসারে অন্য উপায় আর কি আছে? হায়! কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী লক্ষ লক্ষ আকাঙ্ক্ষা অভিযোগ লইয়া সেই বিশ্বজননীর সিংহাসনাভিমুখে ছুটিয়া যাইতেছে; তিনি যদি সকলের সকল বাসনা চরিতার্থ করিয়া দেন, সে কি উদার আনন্দ! সে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ!

২১শে মাঘ। টমাস্ মূরের "Paradise and the Hury" এবং আরও দুই একটি কবিতা পাঠ করিলাম। মূরের অনেক কবিতায় বাহিক অলঙ্কার ও চাকচিক্যের আধিক্য থাকিলেও, স্থানে স্থানে একটু বেশ গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাসের কথায়, তাঁহার সেই কবিতাগুলিকে "যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ" বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। আমার বোধ হয়, "সাহিত্যে"র ভূতপূর্ব্ব প্রিয় কবি বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন কতকটা এই টমাস্ মূরকে অনুকরণ করিয়াই কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অনুকরণে চিরদিন

যাহা হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু মূরের অলঙ্কার-বাহুল্যের অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র; তাঁহার অন্তরনিহিত গাম্ভীর্য্যের অনুকরণে সক্ষম হয়েন নাই। সেই কারণে, সেন-কবির রচনা অনেক স্থলেই হাস্যাস্পদ ও ব্যঙ্গোক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার অলঙ্কারের ভাণ্ডার যে খুব বিস্তৃত, তাহাও নহে; কিন্তু যে কয়খানি পুঁজি, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া, তিনি সর্ব্ববিধ কবিতার শরীরে তাহা পরাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মানস-প্রসূতা কবিতা-রূপসী যখন সাধারণের সমক্ষে বাহির হইয়া আইসেন, কখনও দেখিতে পাই, রূপসীর অঙ্গের গহনাগুলি এত ঢিলা যে, পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে! কখনও বা জোর-জবরদস্তি-পূর্ব্বক পরিহিত একখানা সঙ্কীর্ণ কঙ্কণের কাঠিন্যে, অথবা গলবিলম্বিত গজমতির গুরুত্বে সুন্দরীর শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে; আমরা দুঃখ করিব কি, আগেই হাসিয়া ফেলি। কবিতার জন্যই অলঙ্কার, অলঙ্কারের জন্য কবিতা নহে, ইহা তাঁহার বুঝা উচিত।

২২শে মাঘ। * * * কলিকাতায় গিয়া পঞ্চুরামকে দেখিলাম। সে দিন দিন কেমন চালাক চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। আজ কাল আমার বর্দ্ধমান শ্বশুর সহিত তাহার প্রণয়টা কিছু মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিতেছে। সে বুঝিতে পারিলে তাহাকে বলিতাম, এতটা উচ্ছৃঙ্খল প্রেম বড় সুখের নহে! অন্ততঃ আমার পক্ষে কতকটা আপত্তিজনক। কারণ, তাহার আলাপের আতিশয্যে প্রায় প্রত্যেক বারেই দুই চারিগাছি আমার দেহের আজন্ম-বন্ধন বিস্মৃত হইয়া তাহার অঙ্গুলির সঙ্গ লইয়া চলিয়া যায়। * * * মাঘ মাসের "সাহিত্যে" চুনীবাবুর অনুবাদিত হায়েনের "দুটি তারা" দেখিয়া আমার নিজের "দুটি তারা"র কথা মনে পড়িয়া গেল।

২৪শে মাঘ। সু—চন্দ্র সেদিনকার পত্রে তাঁহার বাঞ্ছিতের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি এই অনন্ত-অভাব-পরিপূর্ণিত জগতে পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না! আমার কথা এই, একটা কল্পিত ছবি গঠন করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষায় জীবনটাকে দুর্ব্বহ করায় কোন ফল নাই। তাহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত মূর্খতার পরিচায়ক। যাহা পাই, তাহাকেই আদর্শের ছাঁচে যথাসাধ্য গড়িয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। যদি কৃতকার্য্য না হই, তাহাতেই বা দুঃখ কিসের? কর্ত্তব্যের প্রতিপালনে সাধ্যমত কোন ত্রুটী না হইলেই যথেষ্ট। সংসারে আসিয়া যদি আত্মবলিদানই দিতে হয়, সেও ত

পরম সৌভাগ্যের কথা। এই বিশাল জগতে কয় জন সে শুভাদৃষ্টের অধিকারী হইতে পারে? জগৎ যাঁহার সৃষ্ট, তিনিই তাহার জন্য দায়ী। কে বলিতে পারে যে, আমার আত্মনাশে তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছারই কার্য্য হইতেছে না? নূতন পন্থার আবিষ্কার সকলের ভাগ্যে কি ঘটিয়া উঠে? পিতৃপিতামহগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, যদি তাহারই কেবল অনুকরণ করিয়া যাইতে পারি, তাহাও বাঞ্ছনীয়। যদি না পারি, তাহাতেও ক্ষতি নাই। কারণ, আমার বিশ্বাস,—

"There is a divinity that shapes our ends,
Rough hew them as we might."

Shakespere.

২৫শে মাঘ। জানুয়ারী মাসের "সখা"য় প্রতিমূর্ত্তি সমেত শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিলাম। ছবিখানি সুন্দর হইয়াছে। আমি শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবুকে কখন দেখিয়াছি কি না, মনে হয় না; যদিও দেখিয়া থাকি, তখন বোধ হয় চিনিতাম না। প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে তাঁহার প্রতিভার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার সাহিত্যসমাজে বঙ্কিম বাবুর নিকটে বঙ্গবাসী কতটা ঋণী, তাহা বালকগণকে বুঝাইয়া দিয়া সম্পাদক মহাশয় তাহাদিগকে প্রতিভার পূজা করিতে এখন হইতে শিখাইয়া দিতেছেন, ইহাতে আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি। কারণ, বাঙ্গালীর বয়স বাড়িলে তাহার সমালোচনার প্রবৃত্তিটা এত দূর উগ্র হইয়া উঠে যে, সে আর কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে চাহে না। শৈশবে শিক্ষা পাইলে এই পীড়া কতকটা প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্য বাদ দিয়া, বাল্যাবস্থার শিক্ষা-বিষয়িণী বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ব্যতীত, সম্পাদক মহাশয় কি বঙ্কিম বাবুর আর কোন গুণাবলী খুঁজিয়া পাইলেন না? বালকদিগের পাঠ্য পত্রিকায় কাহারও জীবনচরিত প্রকাশ করিতে হইলে, তিনি কি কি পুস্তক লিখিয়াছেন, অথবা কয় দিবসে বা কয় ঘণ্টায় ক,খ, শিখিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া, তাঁহার কোন কোন গুণাবলী বালকগণের অনুকরণীয়, তাহারই বিশেষ প্রসঙ্গ করা উচিত।

২৬শে মাঘ। আজ দুই তিন দিবস ধরিয়া জার্ম্মান কবি হীনের কবিতার আলোচনা করিতেছি। হীনের স্বদেশে তাঁহার যে প্রসিদ্ধির কথা শুনিতে পাই, বিশেষতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গালী কবি-মহলে তাঁহার যে পূজার পরিচয় পাই, দুঃখের সহিত বলিতেছি, আমি ততটা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। হীনের কবিতাগুলি নিরবচ্ছিন্ন প্রেমমূলক। কিন্তু, তিনি সেই অমর প্রেমের

এমন যে কোন নূতন আদর্শ আমাদের চক্ষে ধরিতে পারিয়াছেন, তাহা ত দেখিতে পাইলাম না। পরন্তু বিষয়ের বৈচিত্র্যাভাবনিবন্ধন তাঁহাকে অনেক স্থলে কষ্টকল্পনা ও কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। স্কচ্ কবি বার্ণস্-এর কবিতাও প্রধানতঃ প্রেমমূলক। কিন্তু তাঁহার প্রণয়-সঙ্গীতের যে অপকট সারল্য এবং স্বাভাবিকতা, তাহা হীনের কাব্যে সকল সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রেম ভালবাসা মানুষের একটা স্বর্গীয় প্রবৃত্তি বটে, কিন্তু যে কবি প্রেমের উচ্চ পবিত্র এবং মহত্তর অঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া উহাকে কেবল ইন্দ্রিয়বিলাস ও শারীরিক আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করিতে চাহেন, তাঁহার রচনা মানবসাধারণের ক্রমোন্নতির কত দূর উপযোগী, তাহা নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। তবে, হীনের কবিতায় যে প্রেমের উচ্চ-ভাব মূলেই নাই, এ কথাও বলিতেছি না। ইংরাজীতে অনুবাদিত সঙ্গীতগুলি পাঠ করিয়া মূলের ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না, কিন্তু কয়েকটি কবিতায় তাঁহার ভাবে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি নাই।

২৭শে মাঘ। জেমস্ রসেল্ লাওয়েল প্রণীত কবিবর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের জীবনী এবং কাব্য-সমালোচনা পাঠ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলাম, "He (Wordswarth) wrote too much to write always well ; for it is not a great Xerxes-army of wards, but a compact Greek ten thousand that march safely down to posterity." আমাদের বাঙ্গালার বর্ত্তমান প্রতিভাশালী কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে ও লাওয়লের এই সারগর্ভ বাক্যগুলি ঠিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দিবসের সমস্ত সময়টা হাতে থাকিলেই যে চব্বিশ ঘণ্টা কেবল কবিতা লিখিয়াই কাটাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আর লিখিলেই যে তাহা সংসারের কোন কাজে লাগিতে পারে, এরূপ আশা করাও বিড়ম্বনা। যিনি প্রতিভা লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, সেই প্রতিভার সার্থকতা কিসে হয়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারিত করেন। অনেকে হয় ত একেবারে তাহা পারিয়া উঠেন না, লিখিতে লিখিতে বয়সের আধিক্যে তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু কি বলিতে চাই, বা কি বলিতেছি, এ জ্ঞান পাইবার জন্য কাহাকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয় না। জগতের লোককে বলিবার যদি কিছু থাকে, তাহা সহস্রবার, সহস্র প্রকারে, একটু-আধটু, ভাষা-ভাষা-রূপে বলায় কোন উপকারই দেখা যায় না। মানুষের আর কি কাজ কর্ম্ম নাই যে, আমি কি একটু কথা বলিতে চাই, তাহাই জানিবার নিমিত্ত তাহারা আমার রাশি-রাশি রচনা লইয়া

নিরন্তর ব্যস্ত হইয়া থাকিবে? সুতরাং যিনি মানবসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চান, যিনি আপনার প্রতিভার চরিতার্থতা-লাভের প্রয়াসী, তাঁহার বক্তব্য কথাগুলি বলিবার উপযোগী একটা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি খুঁজিয়া লওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ জীবনের উত্তরার্দ্ধে এই তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার অমূল্য রত্ন Laodamia সম্বন্ধে তাঁহার কথা এই, "It cost me more trouble than almost any thing of equal length I have ever written."

২৮শে মাঘ। Lowellএর কয়েকটি কথা আমার মনে লাগিয়াছে বলিয়া এইখানে উদ্ধৃত করিয়া রাখিলাম।—

"Wordsworth never quite saw the distinction between the eccentric and the original. For what we call originality seems not so much any thing peculiar, much less any thing odd, but that quality in a man which touches human nature at most points of its circumference, which reinvigourates the consciousness of our own powers by recalling and confirming our own unvalued sensations and perceptions, gives classic shape to our own amorphous imaginings and adequate utterance to our own stammering conceptions or emotions. The poet's office is to be a Voice not of one crying in the wilderness to a knot of already magnetised acolytes, but singing amid the throng of men and lifting their common aspirations and sympathies (as first clearly revealed to themselvs) on the wings of his song to purer ether and a wider reach of view."

* * * *

২৯শে মাঘ। শনিবার সু—র গৃহে অক্ষয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ডিপুটি বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন। আর উপস্থিত ছিলেন আমাদের রসিকচূড়ামণি তু—* * * শ্রীমতী বেসেণ্ট সম্বন্ধে কোন ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত একটা প্যারাগ্রাফ আমি যে ভাবে যেরূপ "কাকুর" সহিত অনুবাদ করিতেছিলাম, তাহা শুনিয়া সু— আমাকে অতি

সুসভ্য ভাষায় যে দুই চারিটা গালি দিলেন, তাহাতে আমার মনটা কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত ও দুঃখিত হইয়া উঠিল। তিনি আমার রুচির দোষ দিলেন, কিন্তু সচরাচর কথাবার্ত্তায় তিনি নিজের যেরূপ কদর্য্য রুচির পরিচয় দিয়া থাকেন, সে কথাটা ভাবিয়া আমার অনুবাদের উপর মন্তব্য করা তাঁহার উচিত ছিল। পবিত্রতা শ্লীলতা সম্বন্ধে সু—কে আমি বোধ হয় এখনও দশ বৎসর শিক্ষা দিতে পারি।

৩০শে মাঘ। আজ আমাদের বড়বাবু একেবারেই অদৃশ্য। একবার দেখা দিয়া তখনই India clubএর জলবিহারে যাত্রা করিলেন। আমরা কয়েক জন মিলিয়া কয়েক ঘণ্টা তাস খেলিলাম; কিন্তু আমার প্রিয়তম বন্ধুদের সাক্ষাৎ না পাইয়া আজিকার দিবসের ভাগটা আমার ভাল লাগে নাই। * * * বিকালে অক্ষয় বাবুর উদ্দেশে তাঁহার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কিন্তু তাঁহাদের গলির সম্মুখে (বোধ হয় তাঁহাদেরই) সরস্বতী ঠাকুর লইয়া এত জনতা দেখিলাম যে, আর অগ্রসর না হইয়া ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার পর সাহিত্যের আসরে চু—বাবুর দেখা পাইয়া কতকটা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। চু—ভায়া কাশীপুরে পুষ্পপ্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বন্ধুদের এমনই স্নেহ যে, সেখানে যাইবার জন্য আমার আন্তরিক ইচ্ছার কথা জানিয়াও আমাকে একটা সংবাদ দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমার বাসনা হৃদয়ে উত্থিত হইয়া সেইখানেই লীন হইয়া গেল। যদি বাঁচি, তবে আগামী বৎসরে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। "পুষ্পমেলা" দেখিবার জিনিস, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১লা ফাল্গুন। সমালোচক-শ্রেষ্ঠ মেথু আর্নোল্ডের "Heines Graves" নামধেয় কবিতা পাঠ করিলাম। রচনার দু' এক স্থলে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যে ছন্দে ইহা গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট তত মনোহারী বলিয়া মনে হইল না। তাঁহার লিখিত সমালোচনাসমূহে যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, কাব্যে তাহার নিতান্ত অভাব না হউক, বড় বেশী নাই। বর্ত্তমান কবিতাটিতেও তাঁহার কবিত্ব অপেক্ষা সমালোচনার শক্তি অধিকতর সুস্পষ্ট। তিনি হীনের জীবনের যে keynote ধরিয়াছেন, তাহা যে যথার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। হীনের কবিতা অধিকাংশ প্রেমমূলক বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় না, উহা কেবল ইন্দ্রিয়-বিলাস। হীনের হৃদয়ে যে প্রকৃত বিশ্ববিজয়ী প্রেমের অভাব ছিল, তাহা

তাঁহার অপরাপর গ্রন্থের আলোচনা করিলে আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। "Hollow and dull are the great, And artists envious, and the mob profane."—আর্‌নোল্ড বলেন, হীন আমাদিগকে এই কথা বলিতেই আসিয়াছিলেন; তাই তিনি জগতের সহস্র অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও উহাকে ভালবাসিতে না শিখিয়া, উহার উপর কঠোর বিদ্রূপ ও ঘৃণার বাণ বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে, যে কবি জগতের ভালবাসা এবং সম্মানলাভের প্রয়াসী, এ প্রথা তাঁহার অবলম্বনীয় নহে। আর যিনি জগতের নিকট কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না, কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে নিজ হৃদয়ের বিরাগ-বিষ উদ্গিরণ করিয়া যাইতে চান, তাঁহাকেও প্রকৃত প্রেমপ্রবণ ও হৃদয়বান কবি Tennysonএর নিম্নলিখিত স্বর্গীয় কথাটি শুনাইতে চাই, "It is better to fight for the good than to rail at the ill."

২রা ফাল্গুন। এই দুঃখময় জীবনের এত দিন কি প্রকারে কাটিল, আর অবশিষ্ট কয়টা দিবসই বা কিরূপে কাটিবে, আজ তাহাই ভাবিতেছি। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা লইয়া সংসারের রঙ্গভূমে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন এই শীর্ণ হৃদয়ের পানে চাহিয়া কি দেখিতেছি? আশাহীন, উৎসাহহীন, শূন্য শ্মশানবৎ। শান্তি সুখের সন্ধানে আজীবন ঘুরিয়া বেড়াইলাম, যাহা খুঁজিতেছি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। জন্মাবধি যে দুঃখভোগ করিয়াছি, তাহাতে যে শিক্ষার কিছুই নাই, এ কথা বলিতেছি না। শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সে কঠোর শিক্ষা হৃদয়ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিতে পারিলাম কই? জীবনে পরিচয় দিবার মত একটা কিছুই করিতে পারিলাম না, ইহাই আমার আক্ষেপের কারণ। কবিতাই আমার চিরজীবনের উদ্দেশ্য; কিন্তু তাহাতেও ত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছি না। যে সকল মহাপুরুষ কবিতার সেবা করিয়া, জগতের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সুদৃঢ় যশোমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় সাধনা করিতে পারিলাম কই? উৎসাহ যে কিছুতেই নাই। তাই ভাবিতেছি, জীবন-পথের এত দূর যে ভাবে গিয়াছে, বাকী পথও যদি এইরূপে অতিবাহিত হয়, তবে আর সান্ত্বনার স্থল কোথায় রহিল? হায় মা জন্মভূমি! তোমার সন্তানগণ যাহা লইয়া গৌরব করিতে পারে, এমন কিছু একটা মহত্তর কর্ম্ম কি আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না?

ক্রমশঃ।

রাজযোগ।

১। অসাধারণ বুদ্ধি।

জীবের হিতার্থ, আত্মহিতার্থ এবং মাসিকপত্র প্রভৃতির হিতার্থ বুদ্ধি ব্যয় করা উচিত। বুদ্ধিব্যয় না করিলে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। জ্ঞান কর্ম্মক্ষেত্রে আরোপিত করিলেই বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায়। অনেকে জ্ঞান ও বুদ্ধির পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া দেখেন না। কেহ কেহ বলেন, হাকিমে ও উকীলে যাহা পার্থক্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানে তাহাই। যাহাই হউক, পার্থক্যবিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা দর্শনকার, তাঁহারাই কেবল ইহার সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারেন।

প্রাতঃকালে উঠিলেই বোধ হয়, বুদ্ধির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আত্মসংবরণ করা সুকঠিন। অনেকে জানেন, সেকালের এক জন হাকিম স্বীয় বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তারা, এত বুদ্ধি কেন মা ?" প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে ; তদানীন্তন জ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে একালের জ্ঞানের প্রসারতা বিরাট বলিয়া উপলব্ধি হয়।

রাত্রিকালেও বুদ্ধি ঘুমায় না, দিবাভাগে ত মোটেই না। স্বপ্নাধিক্য প্রভৃতি বুদ্ধিসত্তার প্রমাণ। প্রত্যূষে বুদ্ধি গাত্রোত্থান করে না। বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া সূর্য্যদেব ও গৃহিণী উভয়েই চটিয়া লাল হন। কিন্তু বুদ্ধি হাসিয়া খুন ! আমি যদি ঘুমাইয়া থাকি, তাহাতে তোমরা চট কেন ? গৃহকর্ম্মের ভার তোমাদের। তুমি সূর্য্য ! তোমার কাজ তুমি করিয়া যাও। তুমি গৃহিণী ! গৃহিণীই থাক। আমার সহিত বাদ বিসংবাদ কেন ?

অতএব, যাহাদিগের বুদ্ধি আছে, তাহারা প্রত্যূষে উঠে না। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করা শাস্ত্রে বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তখনকার অবস্থা ও এখনকার অবস্থা এক নহে। তখন গোপগণ উষাকালে গোদুগ্ধ দোহন করিত ; অতএব ঋষিগণ চুপ করিয়া প্রত্যূষেই ঘটি ঘটি দুগ্ধ ও গোটা গোটা নারিকেলের লাড়ু খাইয়া প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেন। ইহার ফল, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি। এখন প্রত্যূষে উঠিলে চার দুগ্ধ পাওয়া যায় না, এক ছিলিম তামাকুর জন্য দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়। এ হেন সময়ে ভৃত্য ও

পরিবারবর্গকে বিরক্ত করিয়া রিপুর উত্তেজনা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি ঈশ্বরচিন্তার কথা বল, তাহার জন্য গাত্রোত্থান আবশ্যক নহে। প্রথমে একবার ঘুম ভাঙ্গে। তখন সংসারের অবস্থা নিদ্রার সহিত ধীরে ধীরে মনশ্চক্ষুর সম্মুখীন হয়। "বল, যাই কি থাকি?" বুদ্ধি বলে, "থাক!" আবার কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা। নির্জ্জন অবস্থায় জাগিয়া থাকা গৃহস্থের পক্ষে হানিকারক। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া-পীড়িত স্থানে প্রত্যূষে উঠিলে প্লীহা যকৃত প্রভৃতি চটিয়া যায়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বায়ু প্রবল থাকে। তখন কদাচ পরিবারবর্গের সহিত বাক্যালাপ করা উচিত নহে। এরূপ সময় ঘুমন্ত প্রাণিগণের কাঁচা ঘুম ভঙ্গ করিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিলে প্রায় কলহ বাধে। প্রাতঃকালের কলহ অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয়। রোগীর পক্ষে কিন্তু স্বতন্ত্র বিধান। রোগী প্রত্যূষে ইচ্ছা করিলে মিক্‌শ্চারের শেষ দাগ চুপি চুপি গ্লাসে ঢালিয়া খাইতে পারেন, কিন্তু কাহাকেও না তুলিয়া তৎক্ষণাৎ আবার শুইয়া পড়া উচিত, এবং শুইয়া শুইয়া কেবল ইহাই চিন্তা করিবেন, "কেহ কারো নয়, কেহ কারো নয়।"

উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করা প্রাতঃকালে নিষিদ্ধ। ইহাতে কোন ফল নাই; কেন না, সে সময় যাহা চিন্তা করা যায়, সমস্ত দিনে তাহার একটিও ফলে না। তবে গায়কগণ, যদি প্রতিবাসী না চটে, তান্‌পুরা কিংবা হার্ম্মোনিয়ম লইয়া গলা সাধিতে পারেন।

প্রাতঃকালে ভ্রমণ গাধার বোঝা বহা মাত্র। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানও তাহাই। প্রাতঃকালের বায়ু, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, প্রায়ই দূষিত হয়। "প্রভাতবাতাহতিকম্পিত" প্রভৃতি বচন সেকালের। সেকালের বায়ু ও একালের বায়ুতে, সেকালের উপবন ও একালের সহরে অনেক তফাৎ। যত কদাচারী স্ত্রীপুরুষ প্রাতঃকালে উঠিয়া বেড়ায়, এবং গঙ্গাস্নানে মত্ত হয়। ইহারা বৈদ্যনাথ, মধুপুর প্রভৃতি পবিত্র-স্থানের বায়ুও কলুষিত করিরা ফেলিয়াছে। সেকালে প্রায়ই পবিত্রাচারী পুরুষগণ প্রাতঃস্নান করিতেন। এখনকার বিধান স্বতন্ত্র। তবে জনশূন্য স্থানে মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, তাহাতেও কোন ফল নাই। আমার দুই এক জন বন্ধু প্রাতঃকালে অধিক ভ্রমণ করিয়া অল্পবয়সেই মারা গিয়াছেন। ভ্রমণে ও স্নানে শরীরের ক্ষয় হয়। সেই ক্ষয় লক্ষ্য করিলেই ভাবনা বৃদ্ধি পায়, এবং অবশেষে লোকটা দুর্ভাবনায় মারা যায়।

প্রাতঃকাল হইতে আহারের সময় পর্য্যন্ত বায়ু উত্তেজিত থাকে। যাহা

দিগের প্রাতরাশের সংস্থান নাই, তাঁহারা আহারের পূর্ব্বে যেন বাটীতে থাকেন না। পাড়ায় পাড়ায় একটা করিয়া আড্ডা রাখা বিধেয়। যাঁহাদিগের বুদ্ধি আছে, তাঁহারা ইহার সার্থকতা অনুভব করিতে পারিবেন। আহার করিয়াই অবশ্য কর্ম্মস্থানে যাইতে হইবে, এবং কর্ম্মস্থান হইতে আসিয়া পুনরায় আড্ডায় যাওয়া উচিত। এরূপ করিলে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার অনেকটা নিবৃত্তি হয়।

যাহারা গৃহে বসিয়া থাকে, তাহারা জীবের মধ্যেই গণ্য নহে। যাহারা সন্ধ্যাকালে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহারা অতি মূর্খ। তবে মুমূর্ষু ও মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে বিধান স্বতন্ত্র। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি কেহই গৃহে বসিয়া থাকে না। স্থির তারকাগুলি (fixed stars) এক স্থানে বসিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারা স্ত্রীলোক। শাস্ত্রে তাহারা দক্ষের কন্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বুদ্ধির চিন্তাই আহার। চিন্তার আহার পঞ্চ ইন্দ্রিয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আহার ভগবান্ যাহা যোগাইবেন, তাহাই। ইহাই শাস্ত্রের সার। অতএব দেখা যাইতেছে, ভগবান্ যদি ইহার মধ্যস্থ দুইটি আধার উঠাইয়া লইতেন, তবে বুদ্ধি ভগবানকেই আহার করিত। যদি কিছুই না যোগাইতেন, তবে সংসারে কেবল ভগবানই থাকিয়া যাইতেন, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিত না। যদি বুদ্ধি ও চিন্তা না থাকিত, তবে পশু থাকিয়া যাইত মাত্র।

কোন আদিম সময়ে কেবল ভগবানই ছিলেন। তিনি নিদ্রাভঙ্গের পর ক্ষুধা-গ্রস্ত হইয়া দেখিলেন, বিশ্বে কিছুই নাই। ইহাই সৃষ্টির প্রারম্ভ।

বটে কি না? আমরা যখন দেখি, খাইবার আর কিছুই নাই, তখন কি করি? গৃহিণীকে ডাকি। অতএব, ভগবান্ তাঁহার গৃহিণীকে ডাকিলেন (প্রকৃতি)।

এমন সময় যদি আমরা বলি, "ওগো! খাইব কি?" তখন গৃহিণী কি বলেন? "আমার মাথাটা আছে, খাও!"

ভগবান প্রকৃতির মাথা খাইলেন। অর্থাৎ, অহঙ্কারের (মাথায় থাকে) প্রকাশ হইল। আমাদিগেরও তাহাই হয়, এবং আরও কিছু হয়; অর্থাৎ রাগ, মোহ প্রভৃতি। ভগবানেরও তাহাই হইল, অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল। ইহারা সকলেই মূল, অর্থাৎ "তন্মাত্র"। এবং ইহারাই চড়টা, চাপড়টা, হুড়াহুড়িটা, বাক্যটার গোড়া। অর্থাৎ, ইহা হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির বিকাশ হইল।

বুদ্ধি থাকিলে যোগবাশিষ্ঠের সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝিতে কত সময় লাগে?

আবার দেখুন, গৃহিণীর মাথা ত সত্য সত্যই খাওয়া যায় না। কাহার বাবার

সাধ্য? স্বয়ং ভগবান্ ইচ্ছা করিলে কি প্রকৃতি হজম করিতে পারেন! বৃথা প্রয়াস! অতএব হতাশভাবে উদরজ্বালা-নিবৃত্তির উপায় কল্পনা করা যায় মাত্র।

সেই কল্পনাটা অশ্বডিম্বের ন্যায়। সারা দিন কল্পনা করিয়াও এক কপর্দ্দকও জুটে না। শাস্ত্রে আছে,—কল্পনা করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু সেটা রক্ষা করিলেন (এ স্থলে বিষ্ণু, অর্থাৎ বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি মাতৃস্থানীয়া), এবং রুদ্র তাহা ক্রমে ক্রমে চুরি করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এই রূপ চলিতেছে। মোট কথা, বেদান্ত বলেন, আগাগোড়াই মিথ্যা। বোধ হয়, ঠিক তাই।

তবে মিথ্যা হইলেও কষ্টটা যায় কোথা? বুদ্ধি থাকিলে মিথ্যাকে সত্য করা যায়, এবং সত্যকে মিথ্যা করা যায়।

আমি সারা দিন মাথা খাটাইয়া ডিম্ব সংগ্রহ করিতেছি, সেই দরিদ্রের কপর্দ্দক কত যত্নে গৃহিণী, মাতা, ভগ্নী সকলেই রক্ষা করিতে যত্নবতী; কিন্তু রন্ধ্র দিয়া রুদ্র আসিয়া ডিম্বগুলি খাইয়া ফেলিতেছেন! তাহার খোঁজ রাখে কে?

যখন আহারতত্ত্বের গোড়াতেই এত গোলযোগ, তখন ইহার মীমাংসা করা ধৃষ্টতামাত্র। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আহারের সহিত ঘন ঘন শীতল জল পান করেন। খাঁটি দুগ্ধে যেমন অনেক জল মিশাইলেও বিশ্বস্ত গয়লার গুণে খাঁটি বলিয়াই গৃহীত, গলাধঃকৃত ও সমভাবে পুষ্টিদায়ক হয়, সেইরূপ অধিক জল খাইলে অল্প আহারেই মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে। জলের গুণে ভারতবর্ষে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষসত্ত্বেও রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে পারে নাই।

আমরা প্রায় দেখিতে পাই যে, অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষগণ অধিকমাত্রায় জলপান করেন, এবং অধিকমাত্রায় বহুমূত্ররোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বৃহস্পতিরও দশা তাহাই। ইহাতে যে তাঁহারা হেয় হইলেন, তাহা নহে। উহা একটা লক্ষণ মাত্র, যেমন পুরুষের গোঁফ। গোঁফ এমন কিছু সুশ্রী আভরণ নহে, অথচ উহা একটা সর্ব্ববাদিসম্মত সুলক্ষণ। দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য। শুক্রাচার্য্য জল না খাইয়া মদ ধরিয়াছিলেন, ফলে একদিন অধিকমাত্রায় বিভোর হইয়া প্রিয় শিষ্য কচকে গোটা চাট্ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার কন্যা দেবযানীর বিরহ উপস্থিত হইল (কচ দেবযানীর betrothed); শুক্রাচার্য্য ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন, কচ তাঁহার উদরে (Epigastrium); আপনারা জানেন, অন্ননালী দ্বারা উদরে কোন জীব প্রবিষ্ট হইলে তাহারা

এমন মূর্খ যে, উপরেই হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে থাকে, নিম্নে যাইতে চাহে না। ঊর্দ্ধগামিত্ব জীবের বিশেষণ। নিম্নগামিত্ব জড়ের। অতএব, যে সময় শুক্রাচার্য্য ধ্যানস্থ, সে সময় Theosophical Doctrine মতে কচের নিম্নস্থ চতুর্দ্দেহ Quarseruary নিম্নগামী, এবং উপরিস্থ ত্রিদেহ (Traiangle) ঊর্দ্ধগামী। শুক্রাচার্য্য এই ব্যাপার দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা, আমি বৃহস্পতির ন্যায় গোরু নহি, চালাকী রাখিয়া দাও।" ইহা বলিয়াই পুনরায় গোটা কচকে উদ্গির্ণ করিয়া দেবযানীর সহিত বিবাহ দিলেন, এবং দৈত্যবংশও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

শাস্ত্রের এই অসাধারণ জ্ঞানের বচন হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহাদিগের সংস্থান নাই, তাঁহারা কেবল জল খাইবেন ও বংশলোপের চেষ্টা করিবেন; এবং যাঁহাদিগের মদ খাইবার সংস্থান আছে, তাঁহারা শুক্রাচার্য্যের ন্যায় বংশরক্ষা করিবেন।

তবে শুক্রাচার্য্যের অবস্থা যদি ভবিষ্যতে বৃহস্পতিরূপে পরিণত হয়, তাহা অতীব শোচনীয়। এরূপ (Metamorphosis) আণবিক-পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তন-বাদের (Evolution) প্রতিষেধ, এবং ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, এবংবিধ জীব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য, অবিশ্বসনীয়, এবং হেয়। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইবার পর কোন ভদ্রবংশীয় দেবতা তাঁহার নিকট যান নাই।

ব্যায়াম প্রভৃতির মধ্যে নিদ্রাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বায়ুর প্রাবল্যে ইদানীং প্রায় কাহারও নিদ্রা হয় না। অনেক ভ্রমণে, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডায়, এবং অনেক ঔষধসেবনেও দেখা গিয়াছে, সুনিদ্রা হয় না। অতএব, নিদ্রার চেষ্টা একটা বৃহৎ ব্যায়াম। বালক প্রভৃতির সংসার-চিন্তা থাকে না; অতএব, শারীরিক পরিশ্রমে স্বভাবতঃই নিদ্রা আসে। বুদ্ধিমানের পক্ষে স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোক ও শিশুগণ জীবজন্তুর ন্যায় শীঘ্রই সন্ধ্যাকালে ঘুমায়। পরিণতবয়স্ক বুদ্ধিমান্ প্রায় ঘুমান না। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, স্বপ্নাধিক্যও বুদ্ধিমানের একটি লক্ষণ। ইহাতে বুঝা যায় যে, কেবল স্বল্পাহার নহে, স্বল্পনিদ্রাও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়া থাকে।

দর্শনশাস্ত্রমতে বুদ্ধি অমর। The thinker is immortal। এটা যদি ভাল করিয়া দেখা যায়, তবে পুনর্জন্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে গোলযোগ থাকে না। বুদ্ধি যে অমর, তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে, সে অনাহারে বাড়ে, এবং Vice versa বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই অজীর্ণরোগ হইয়া থাকে। যাহারা আহারের উপর প্রত্যাশা করিয়া থাকে না, তাহারাই শাস্ত্রমতে দীর্ঘজীবী; এবং আহার না পাইয়াও যাহা বর্দ্ধিত হয়, তাহারা নিশ্চয় অমর। এ স্থলে আহার

অর্থে স্থূল আহার। চিন্তা প্রভৃতি সূক্ষ্ম আহার কাহাকেও যোগাইতে হয় না। ইহা আপনা-আপনিই লাঙ্গুল নাড়িলে আসে। বুদ্ধির গোড়ায় একটা ল্যাজ আছে, তাহার নাম মন; ইহার স্বভাবই লাঙ্গুল-সঞ্চালন। এই সঞ্চালন নির্জ্জনে করিলে কষ্টকর হয়; অতএব বাক্য দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া জনসমাজে জ্ঞানবায়ু প্রবহমান করিতে পারিলে বুদ্ধির সার্থকতা হয়। এইরূপে দেখা যায় যে, মানব যত বৃদ্ধ হয়, তত বুদ্ধি বাড়ে, এবং মরণের সময় বুদ্ধি লোপ পাইলেও সে বুদ্ধি যায় কোথায়? দেহের ভগ্নাবশেষেও যখন বুদ্ধি বাড়ে, তখন দেহের অবসানে তাহা আরও বাড়িবে। যেমন অগ্নি নিভিবার সময় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, এবং নিভিয়া গেলেও অগ্নির অস্তিত্ব অন্তর্হিত হয় না; অর্থাৎ বায়ু কিংবা ঈশ্বরে নিহিত থাকে; সেইরূপ অমুকের অসাধারণ বুদ্ধি যে দেহের সহিত বিলীন হইয়া একেবারে জগৎ হইতে লোপ পাইল, তাহা সম্ভবপর নহে। আণবিক হিসাবে দেখিতে গেলেও ইহা বুঝিতে হইবে যে, যদিও পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তথাপি আবার নিহিত সংস্কার-বলে ভাল জল, সাদা পথ, কাল চক্ষুরূপে উদিত হয়। এই যে নিহিত সংস্কার, তাহা নিশ্চয়ই কোথায়ও থাকে। অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জগতের এই বুদ্ধিসমষ্টি যেখানে ঝুলিয়া আছে, সেটা অতি ভীষণ স্থান; তথাপি তাহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ নাই।

আবার লক্ষ্য করিয়া দেখুন, বালকদিগের বুদ্ধি অধুনা বৃদ্ধগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। বালিকার আরও শ্রেষ্ঠ। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, যেমন নরলোকে বাল্য-বিবাহ হইতেছে, সেইরূপ দ্যুলোকে বৃদ্ধবিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। বুদ্ধিগণ বৃদ্ধ হইয়া এ দেহ ছাড়িবার পর স্বর্গে গিয়া পুনশ্চ বৃদ্ধা কিংবা যুবতী বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত হন। পুরাকালে ইহা ছিল না; অতএব ভূতের উপদ্রব বেশী ছিল, এবং প্রায়ই মূর্খ বালক বালিকা জন্মিত। এখন বাবার সাধ্য নাই, পুত্রের সম্মুখে দাঁড়ায়! কেন না, পুত্রের বুদ্ধি এবং কন্যার বুদ্ধি পিতামাতার বুদ্ধি অপেক্ষাও পরিপক্ক, এবং চতুর্দ্দশ পুরুষের বুদ্ধি হইতে আরও পরিপক্ক। অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, পাঁচ শত টাকার তোড়ায় কখনও লক্ষ টাকার অবস্থিতি সম্ভবনীয় নয়।

দ্যুলোক হইতে এবম্প্রকারে পুনর্জ্জন্মের যে একটা ব্যাপার চলিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। বিজ্ঞ ও সুধীগণ তৎসম্বন্ধে বহু গবেষণা করিতেছেন, এবং ভরসা করা যাইতে পারে যে, শীঘ্রই ইহার একটা মীমাংসা হইবে।

বুদ্ধির অমরত্বের অনুকূলে পূর্ব্বাবধি একটা চলিত বচন আছে, "বেঁচে থাক বাবা!"

সকলেই জানেন, বুদ্ধি দুই প্রকার। জড় এবং সূক্ষ্ম। জড়-বুদ্ধিতে জড়-বিজ্ঞান জানা যায়, সূক্ষ্ম-বুদ্ধিতে সূক্ষ্মজগৎ প্রতিভাত হয়। কতকগুলা একত্র জড় হইলে জড়, যেমন শূকরের পাল। ভেদজ্ঞান হইলেই জড় বহুধা হইয়া সূক্ষ্ম হয়। মনের পরমাণুগুলি বোধ হয় দেহ হইতে সূক্ষ্ম; কেন না, মন না থাকিলে যদি এক ডজন লোককে বাঁধিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের গ্রীষ্মেও গৃহের মধ্যে ফেলিয়া রাখা যাইত, কেহই চটিত না। কিন্তু ভেদজ্ঞান থাকাতে মনঃশালী দুই জনও একত্র থাকিতে পারে না। বুদ্ধি থাকিলে সে সঙ্গে থাকিয়াও অন্তরে নিদারুণ পর। মুখে হাসি, অন্তরে নির্গুণবক্রত্ব, বুদ্ধিমানের লক্ষণ। বাল্যকালাবধি এই ভেদজ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেখানে জানিতে হইবে যে, কলহপ্রবৃত্ত বালকগুলি পুরাতন-ঘৃতপ্রসূত। যদি ইহার ব্যত্যয় ঘটে, অর্থাৎ যদি বালকদিগের মধ্যে সহানুভূতি আত্মত্যাগ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা কাঁচাবুদ্ধির পরমাণু দ্বারা গঠিত, এবং খাঁটি দেশী, কলমের নহে।

এই সূত্রে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, পুরাকালের ন্যায় এখন সবল, সুস্থ, দীর্ঘকায় মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিতেছে না, এবং সেরূপ ভক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরও হ্রাস হইতেছে। ইহাতে অনেকে ক্রমোন্নতিবাদের উপর সন্দেহ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ইহা মোটেই সন্দেহের বিষয় নহে, এবং যাহা বলা হইয়াছে, তাহারই সাপেক্ষ। দেহ যত দীর্ঘ, সবল ও সুস্থ হয়, লোকটা তত শান্ত, ধীর ও সাহসী হয়; অতএব তাহার বুদ্ধি সোজা, একখানা বংশযষ্টির মত। পরিপক্ব বুদ্ধি বহুচক্রানুবর্ত্তিত ঊর্ণনাভের জালের ন্যায়। তাহার অবস্থিতির জন্য একটা গোলকধাঁধার মত মস্তিষ্কগৃহ চাহি। এরূপ মস্তিষ্ক সচরাচর সুস্থ সবল দেহে সম্ভবে না। অতএব অসাধারণ বুদ্ধি প্রায়ই রুগ্ন ক্ষীণ দেহে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। যেমন স্বর্গে শীর্ণকায় দেবগণ রাজনীতিবিশারদ, সেইরূপ মর্ত্ত্যধামেও। উভয় লোকেই অসুরগণের ও আসুরিক-প্রবৃত্তি নরগণের একই অবস্থা।

অসাধারণ বুদ্ধি ধর্ম্মের পক্ষপাতী। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ কি, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। যে কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের সার্থকতা উপলব্ধ হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। যদি চুরি করিয়া বুঝা যায় যে, চুরি করা মহাপাপ, তবে চুরি করা ধর্ম্ম। এই মত এক দলের। ইহারা প্রবৃত্তিমার্গী। আবার অন্যমতে

লোভসংবরণই ধর্ম্ম। ইহারা নিবৃত্তিমার্গী। গীতায় উক্ত আছে, ভগবানের নিকৃষ্টা প্রকৃতি চুরি করায়, এবং উৎকৃষ্টা প্রকৃতি নিবৃত্তি করায়। যখন ভগবান্ অপেক্ষা মানুষ কখনই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না, তখন এককালে সকলকে চুরি করিতে হইবেই, এবং উত্তরকালে সে প্রবৃত্তি লোপ পাইবেই। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ সুবিধামত চুরি করেন, এবং সুবিধা না হইলে ঘোরতর আত্মসংযমী হন। ইহা নিন্দনীয় নহে, এবং ইচ্ছা করিলেই যে সকলে পারে, তাহা নহে। কদাচ কখন গুরুর কৃপায় হয়।

এক সঙ্গে হাস্য ক্রন্দন, প্রেম কলহ, খাদ্য অখাদ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সংসারের প্রত্যেক সৃষ্টিমধ্যে দেখা যায়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। বহুরূপিত্বই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, এবং উহা হইতেই জানিতে হইবে যে, বুদ্ধি ইন্দ্রধনুর ন্যায় পরিপক্ব হইয়া আসিয়াছে। সাতটি বর্ণ সমান ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

আপনারা জানেন, সাতটি (অন্ততঃ দুইটি) স্ত্রী যাহার আছে, সে সৌভাগ্যবান্ স্বামী; কোন না কোন সময়ে শেষে একটারই উপর অবলম্বন করিয়া স্বর্গলাভ করেন। স্বর্গে যাইবার রাস্তা কেবল একটি, এবং আসিবারও একটি। ঠিক দিল্লী-পঞ্জাব লাইনের মত। প্রথম ষ্টেশনের গোড়ায় অনেক লাইন থাকিলেও মৃত্যুর পর একটিমাত্র ধরিয়াই স্বর্গে যাইতে হইবে। "এক এব সুহৃদ্ ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।" অতএব, যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, দেহরূপী রথের চাকা মোটের মাথায় লাইনে ফিট্ হওয়া চাই।

পূর্ব্বজন্মে এইরূপ রথে চড়িয়া স্বর্গে যাইবার সময় দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, কৈলাসপর্ব্বত-ষ্টেশনে ফীমেল্ কম্পার্টমেণ্ট হইতে অনকতক স্ত্রীবুদ্ধি মাথা বাহির করিয়া হাসিতেছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম,—তাঁহাদিগের লক্ষ্য একটি বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য। তিনি খরচা সংকুলান না হওয়াতে যুবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কেবল একাকীই স্বর্গে যাইবার জন্য ব্যস্ত। আমি বলিলাম, "আপনারা হাসিবেন না, স্বয়ং যুধিষ্ঠির এইখানে পাঞ্চালীকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; সকলেই স্বার্থপর।"

বুদ্ধি থাকিলে শীঘ্র কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। বুদ্ধি না থাকিলে বুদ্ধদেবের ন্যায় পরদুঃখকাতরতার বোঝা ঘাড়ে করিতে হয়।

স্বীয় কর্ম্মসমাধা এবং পরের বোঝা স্কন্ধে লওয়া, ইহারই মধ্যে যে সীমা (যেমন ধানের আইল) আছে, তাহারই উপর দিয়া একদৌড়ে শ্যামল হরিৎক্ষেত্র পার হইয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের ওস্তাদী। সংসারে কি করিতে মানব

আসে, এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে দেখিলেই তাহার উত্তরের মীমাংসা করা যাইতে পারে।

অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষই ফাঁকি দিয়া আরাম করিতে আসে। এইরূপ সকলেই সকলকে ফাঁকি দিতে গেলেই কাজেই বুদ্ধির উপর সমস্ত কৌশলটা দাঁড়ায়। বাঘে খাজনা দেয় না, কিন্তু ব্যাঘ্রসম বলিষ্ঠ প্রজাও অবনত-মস্তকে বিঘা প্রতি দুই টাকার স্থলে সাত টাকা খাজনা দিতেছে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, সে ভ্যাকা, অর্থাৎ তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে—যাহাকে ফাঁকি দিয়া গোটা কতক নির্জীব লোকও গোপৃষ্ঠস্থ মশকের ন্যায় তাহার রক্ত শুষিয়া খাইতেছে। ইহার মূলেই ধর্ম্ম ও আত্মত্যাগ।

যখন বুদ্ধি বাড়িতে থাকে, সেই বুদ্ধির বিরুদ্ধে আবার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর হয়। মশা এড়াইলে মাছি, মাছি এড়াইলে কীটাণু, এবং কীটাণু এড়াইলেও মারা যায় কোথা? একটা মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, অমনই তাহার বুদ্ধিশোণিতটুকু পান করিয়া লেখক মশকগণ অন্য একটি নবীন সম্পাদকের নির্জীব প্রাণে সেচন করেন। অমনি একখানা নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব! এইরূপ, পালাজ্বরেরও নূতন সংস্করণ হইতেছে, এবং অবশেষে পরিপক্কতা লাভ করিয়া প্লেগ-রূপে দাঁড়াইয়াছে।

ইহা হইতে, কর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধির নির্দ্দিষ্ট কোন পথ নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। কৌশলে বাধা এড়াইয়া যাওয়াই বুদ্ধির লক্ষণ। কি করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে ও অধর্ম্মক্ষেত্রে, এই বাধা উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে, বুদ্ধিমানেরা তাহা জানেন। তাহার নাম রাজযোগ। বারান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীসু——

ওয়ালটেয়ার।

মন্দ্রদেশের বনরাজিনীলা নীলাম্বুবেলায় ওয়ালটেয়ার সহর প্রথমদর্শনে চিত্রলিখিতবৎ প্রতীয়মান হয়। সমুদ্র ইহার তিন দিক্ বেষ্টিত করিয়া গিয়াছে। প্রান্তরে কোথাও বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড, কোথাও বা শিলাস্তূপ; মধ্যে মধ্যে

প্রান্তরদৃশ্যে সজীবতার সঞ্চার করিয়া গৃহ; পথের পার্শ্বে ও গৃহপ্রাঙ্গনসীমায় কেতকীর বৃতি ও পবনসঞ্চালন-মুখর আনতপত্রমুকুট নারিকেল তরু—সরল, সুন্দর, শোভাময়। অদূরে কর্ম্মকেন্দ্র বিশাখাপত্তন (ভিজিগাপটম—সংক্ষেপে ভাইজাগ) হইতে বাণিজ্যের স্রোতে দৈনিক অভাব নিবারিত হয়; ক্ষুদ্র বাজারে একান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যও সব মেলে না।

বাষ্পযানের কল্যাণে এখন "ছ' মাসের পথ" ছয় দিনে অতিক্রান্ত হয়। কলিকাতা হইতে ওয়ালটেয়ারও এখন অধিক সময়ের পথ নহে। অল্প সময়ের মধ্যেই বাষ্পযান বঙ্গ ও উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া মদ্রদেশের সমুদ্রতটে উপনীত হয়। পথও রমণীয়; পথে প্রধান দ্রষ্টব্য নদীবাহুল্য। বোধ হয়, আর কোন পথে এত অল্প ব্যবধানে এত অধিক নদী নাই। দ্বাদশ ঘণ্টা কালের মধ্যে বহুনদী অতিক্রম করিতে হয়।—দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, ব্রাহ্মণী, বিরূপা, বৈতরণী, মহানদী;—নদীর প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর। দামোদরের ধ্বংসসহচর প্লাবনের কথা "বঙ্গে যথা তথা"; রূপানারায়ণ বিস্তীর্ণা—জলবেণী-রম্যা; সুবর্ণরেখা বিস্তৃত বালুকাশয়নমধ্যে রেখাসম প্রবহমানা; মহানদী সুদূর প্রসারিত। মহানদীর জলধারা বর্ষায় উভয়কূলপ্লাবিনী মূর্ত্তি ধারণ করে; অন্য সময় বিস্তৃত বালুরাশির মধ্যে দুই চারিটি স্রোতঃ—মধ্যে মধ্যে ঝাটি জন্মিয়াছে। উড়িষ্যার নদী অলসগতি; সমুদ্রসান্নিধ্যে নদীর বেগ প্রশমিত, সেই জন্য জলবাহিত মৃত্তিকাদি নদীগর্ভে স্থির হইয়া চড়া ও নদীমুখে বদ্বীপ গঠিত করে।

নবনির্ম্মিত রেলপথের উভয়পার্শ্বে বাবলাবৃক্ষের সারি। বাবলা অযত্নে বর্দ্ধিত হয়; ইহার মূলের বাঁধনে নবগঠিত পথের মৃত্তিকারাশি স্থানচ্যুত হইতে পায় না; পথ কঠিন হইতে হইতে বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে—বিক্রয় করিয়া লাভ হয়। বাবলার ত্বক্ চর্ম্মসংস্কারে ব্যবহৃত হয়; ইহার কাষ্ঠে গোযানের চক্র ও লাঙ্গলদণ্ড প্রস্তুত হয়।

কলিকাতা হইতে অদূরে সহসা প্রান্তরদৃশ্য পরিবর্ত্তিত হয়—ভূমি বন্ধুর, বৃক্ষলতা অপর্য্যাপ্ত-রসপুষ্ট সুচিক্কণ নহে। খড়্গাপুরে প্রান্তরমধ্যে একটি পর্ব্বতবাহু লক্ষিত হয়। প্রান্তরমধ্যে ইহার প্রবাস একান্ত নিঃসঙ্গ। এই পর্ব্বতবাহু অতিক্রম করিলেই আবার তালীবনশ্যাম প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র।

বঙ্গপ্রদেশ অতিক্রম করিলেই উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র; কেতকীর বৃতি বঙ্গ হইতে ইহার প্রভেদ প্রকাশ করিয়া দেয়। শ্রীক্ষেত্রের পথ পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে হয়। এই পথ একদিন কতই দুরতিক্রম্য ও সঙ্কটসঙ্কুল ছিল! পুণ্য-

লাভপ্রয়াসের অসামান্য উত্তেজনা ব্যতীত বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী বঙ্গদেশের দূরপ্রান্ত হইতে এই পথ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে দেবদর্শন করিতে আসিতে পারিত না। মোক্ষলাভাশার অসাধারণ উত্তেজনা দুর্ব্বলকে বলবান্ ও শঙ্কাসন্দিগ্ধ চঞ্চলকে স্থির দৃঢ়সঙ্কল্প করিত। কত কষ্ট, কত দুর্দ্দশা ও কত শ্রমস্বীকার করিয়াও বহু যাত্রী এই পথ অতিক্রম করিতে পারিত না। যাত্রিদলের তীর্থযাত্রাকালে ও তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনে পর্ণকুটীর হইতে উচ্চ প্রাসাদ পর্য্যন্ত কত গৃহে আত্মীয়বিয়োগবিধুর হৃদয় হইতে গভীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইত! কত অপূর্ণপুণ্যকাম যাত্রী এই দুরতিক্রম্য পথে স্বজনবিরহিত অবস্থায় অযত্নে জীবনত্যাগ করিত। গৃহে যাহাদের জন্য উৎসুকহৃদয় স্বজনবর্গ অপেক্ষা করিয়া থাকিত, তাহারা অপরিচিত স্থানে জীবনের শেষ শ্বাস ত্যাগ করিত; স্বজনগণের স্নেহ-শুশ্রূষা-লাভ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিত না। আজ এ পথ একান্ত সুগম। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের সীমায় চিল্কা হ্রদ।

চিল্কার অগভীর জলবিস্তার বর্ষায় ৪৫০ বর্গমাইল স্থান অধিকার করে। উড়িষ্যার পুরী জেলা হইতে মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলা পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার। বঙ্গোপসাগর ও এই জলবিস্তারের মধ্যে ব্যবধান স্থানে স্থানে অতি সামান্য—এক স্থানে এই জলরাশি সাগরের সহিত মিশিয়াছে। পশ্চিমে ও দক্ষিণে পর্ব্বতপ্রাচীর। হ্রদবক্ষে নদীবাহিত মৃত্তিকাদিতে গঠিত বহু দ্বীপ। হ্রদের দৈর্ঘ্য ৪৪ মাইল; উত্তরার্দ্ধের বিস্তার ২০ মাইল, দক্ষিণার্দ্ধের বিস্তার ৫ মাইলের অধিক নহে।

চিল্কা অতিক্রম করিলেই মদ্রদেশ। ভাষা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ অপরিচিত; অধিবাসিগণের গঠনও বাঙ্গালীর গঠন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বিজয়নগর অতিক্রম করিয়া অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণ ওয়ালটেয়ারে উপনীত হয়।

প্রথম দর্শনে হতাশ হইতে হয়। সমুদ্র দৃষ্টির বাহিরে; প্রাকৃতিক দৃশ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। ওয়ালটেয়ারে সর্ব্বঋতু শীতাতপের আতিশয্যবর্জ্জিত, শীত বা গ্রীষ্ম কেহই প্রবল হইতে পারে না; আবার সমুদ্রসান্নিধ্যে দিবারাত্রিতে তাপবৈষম্য ২ ডিগ্রীর অধিক হয় না। প্রথমে য়ুরোপীয়, য়ূরেশীয় ও মাদ্রাজীর ভিড়ে তাহা উপলব্ধ হয় না। ষ্টেশনে নামিয়াই প্রথমে যানের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। দুইখানি চক্রের উপর একটি অনতিদীর্ঘ বাক্স; দ্বার পশ্চাতে, মধ্যে লম্বে দুইখানি বা প্রস্থে দুই বা তিনখানি বেঞ্চ-আসন।

বাহন,—একটি গো বা অশ্ব; গোবাহিত যানের নাম ব্যাণ্ডি, অশ্ববাহিত যানের নাম পোনিব্যাণ্ডি বা ঝট্‌কা। ষ্টেশনে বাষ্পযানের ধূম, কর্ম্মকোলাহল ও রেলের গৃহ দেখিয়া মনে হয়, পথের সৌন্দর্য্য অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। সত্যই পথ মনোরম। কোথাও পর্ব্বতমূলে, কোথাও হ্রদকূলে; কোথাও বনপথে, কোথাও পর্ব্বতমধ্যে ট্রেণ চলিতে থাকে; কোথাও শিলা কাটিয়া পথ প্রস্তুত; কোথাও সেতুর পর সেতু। এই রম্যপথ অতিক্রম করিয়া ওয়ালটেয়ার। প্রথম দৃশ্যে হতাশ হইতে হয়।

ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে বিশাখাপত্তন—ওয়ালটেয়ার-নগরোপকণ্ঠে অবস্থিত। সহর ভারতবর্ষের অন্যান্য ক্ষুদ্র সহরেরই মত। পথ অপ্রশস্ত, গলির অভাব নাই; আবর্জ্জনা ও অপরিচ্ছন্নতা যেখানে সেখানে, পথের জনতার কিছু নূতনত্বও আছে। পুরুষের মস্তকের অর্দ্ধভাগ মুণ্ডিত, পরিধেয় বস্ত্রে বর্ণের অভাব নাই; বসন ও উত্তরীয় প্রশস্ত পাড়ওয়ালা, ভৃত্যাদির পৃষ্ঠে তোয়ালে। রমণীদিগের বসন লোহিত, পীতাভনীল প্রভৃতি বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত; শাড়ী ঘুরিয়া নানা ভাঁজে আসিয়া পড়িয়াছে; অনেকের অঞ্চল এমন ভাবে ঘুরিয়া আসিয়াছে যে, পৃষ্ঠ ও বাহু অনাবৃত, কিন্তু সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ আবৃত। পথে উলঙ্গ বালক-বালিকাগণ ক্রীড়া করিতেছে, কেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কাহারও কটিদেশে রৌপ্য বা পিত্তলের অলঙ্কার, প্রকোষ্ঠে বলয়, কর্ণে কর্ণাভরণ। কাহারও বা কটিসূত্র হইতে একখানি চক্রাকার রৌপ্যপত্র বিলম্বিত। পথের পার্শ্বে দোকানে বা তালপত্রনির্ম্মিত বৃহৎ ছত্রচ্ছায়ায় পসারিণীরা কেহ বা পণ্য বিক্রয় করিতেছে; কেহ বা ক্রেতার সহিত দর-কসাকসি করিতেছে; কেহ বা কোন আগন্তুকের সহিত হাস্যপরিহাসবহুল আলাপে রত; কেহ বা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আলস্য-সঙ্কুচিত-নয়নে চুরুট টানিতেছে। শ্রমজীবীদিগের পরিধান কৌপীনমাত্র; সুগঠিত দেহ প্রায় নগ্ন।

সহর অতিক্রম করিলেই নিত্যশতমূর্ত্তিধর সমুদ্র! প্রথম দর্শনে বেলাভূমিতে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দীর্ঘপথযাপনের শ্রম সকল বলিয়া বোধ হয়; অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়। সম্মুখে অনন্ত জলবিস্তার! যত দূর চাহ, কেবল ঊর্ম্মিলীলা! ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি—চক্রবাল পর্য্যন্ত জলরাশি প্রসারিত। ঊর্ম্মিমালা যেন আবর্ত্তিত হইয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, আবর্ত্তনে নিম্নে পতনে ও প্রত্যাবর্ত্তনশীল জলরাশির প্রতিঘাতে ফেনময় হইয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে; শেষে তীরে আসিয়া শুভ্র ফেনহাস্যে বেলাভূমিতে ছড়া-

ইয়া পড়িতেছে ; তাহার পর তীরে শুক্তি, প্রস্তরখণ্ডাদি রাখিয়া আবার সাগর-গর্ভে ফিরিয়া যাইতেছে। যেখানে সাগরসলিলে সলিলসঞ্জাত শৈবাল-সমাচ্ছন্ন শিলারাশি জলের উপর মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে শিলার অঙ্গে প্রতিহত উর্ম্মিমালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া উর্দ্ধে ফেনময় জলকণা উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। মধ্যভাগে সাগরের উদারবক্ষে উর্ম্মির শ্বেত ফেনচূড়া জলবক্ষে ভাসমান কুসুমদামের মত প্রতীয়মান হইতেছে।

বিশাখাপত্তন হইতে ভূমি ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ওয়ালটেয়ারে গিয়াছে। ওয়াল-টেয়ার অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। সম্মুখে সমুদ্র—বীচিবিক্ষোভ-চঞ্চল কামরূপী ; পশ্চাতে পর্ব্বত—হরিত বৃক্ষলতায় সজ্জিত। মধ্যে মধ্যে শিলাস্তূপ। পথে ও গৃহে পিপীলিকার আতিশয্য। পথের পার্শ্বে অযত্নবর্দ্ধিত লতাগুল্মের মধ্যে কোথাও বা নীল অপরাজিতা, কোথাও বা লোহিতাভ হরিদ্রাবর্ণের এক প্রকার কুসুম গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া আছে। প্রান্তরে হরিত তৃণে লোহিতাভ, হরিদ্রা ও নীলবর্ণের কুসুম। সমুদ্রতীরে স্থানে স্থানে বালুকাস্তূপ,—তাহার উপর কণ্টকতৃণ সেই বালুকারাশির রসলেশহীন হৃদয় হইতে রসশোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। কিন্তু অসীম সুখ লাভ করিয়া যেমন কেহ সীমাবদ্ধ সুখের প্রতি ফিরিয়াও চাহে না ; তেমনই সম্মুখে সৌন্দর্য্যের অক্ষয়ভাণ্ডার আছে বলিয়া কেহ এ সব সৌন্দর্য্য বড় লক্ষ্য করে না। শত কবি সমুদ্রের সৌন্দর্য্যবর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। কি বিচিত্র রূপ ! ক্ষণে ক্ষণে নূতন ! পবনের চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে সে রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। মেঘালোকের ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। কখনও অম্লানোজ্জ্বল নীলাম্বরতলে সমুদ্রের নীলিমা—নীলজল রবিকরে জ্বলিতেছে। শেষে চক্রবালরেখায় নীল জল আর নীল আকাশে মিশিয়াছে। কখনও অর্দ্ধ নীল, অর্দ্ধহরিৎ। কখনও বৃষ্টির পর কূল হইতে বহু দূর গৈরিক—তৎপরে নীলহরিৎ। কি বিচিত্র সৌন্দর্য্য! গৃহে বসিয়া সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে সে শোভা দেখ ; পদে পদে পলায়নপরকুলীরশাবকসমাকুল—কেতকীবৃতিশোভিত—নারিকেলবীথিমধ্যবর্ত্তী বেলাপথে গমন করিতে করিতে সে শোভা দর্শন কর ; বিশাখাপত্তন ও ওয়ালটেয়ারের মধ্যপথে অবস্থিত বিশ্রামস্থানে বসিয়া সে শোভা দর্শন কর—দেখিয়া আশা মিটিবে না। চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশায় আবার অন্য রূপ। অন্ধকারে তরঙ্গচূড়ায় আলোকদীপ্তি প্রকাশিত হয়। আবার বাত্যাবৃষ্টিসহচর অন্ধকার নিশায় কি ভীষণ রূপ—কি প্রবল গর্জ্জন ! তখন

তরঙ্গমালা যেন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ঘাতপ্রতিঘাতে ফেনময় হইয়া তীরভূমিকে আক্রমণ করে, সিন্ধুবক্ষ ক্রোধবিধৃত; বিদ্যুদালোকে সে ভীষণ সৌন্দর্য্যময় রূপ দেখিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। সিন্ধুবক্ষে বৃহৎ জাহাজ কত ক্ষুদ্র বোধ হয়।

বিশাখাপত্তনের উত্তরে ওয়ালটেয়ার, দক্ষিণে সমুদ্রশাখা (Back water) অতিক্রম করিলে একটি অনুচ্চ পাহাড়। গঠনানুসারে ইহার নাম Dolphin's nose। উপরে উঠিবার সুগঠিত পথ বর্ত্তমান, এক দিকে আলিসা। পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে উপবনের অবশেষ ফুলগাছ বর্ত্তমান, একটি ত্যক্ত গৃহও বিদ্যমান। এই পথ অপর দিকে আরাদা গ্রামে গিয়াছে। বাজারে বার্ত্তাকুর অপরিপুষ্টতা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকে বলে, আরাদার সুপুষ্ট বার্ত্তাকু শ্লীপদাদি রোগের কারণ বলিয়া অপরিপক্ব অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এই পাহাড়ের উপর হইতে সমুদ্রের দৃশ্য অতি নয়নারাম। নিকটস্থ পাহাড়ে ধর্ম্ম-মহামেলা—একটি হিন্দুর মন্দির, একটি মুসলমানের মস্‌জিদ ও একটি খৃষ্টানের গীর্জ্জা বিদ্যমান!

এই পাহাড়ে গমনপথে সহরের এক প্রান্তে দুর্গ; এখন নামমাত্র অবশিষ্ট এই অংশে ফিরিঙ্গীদিগের বাস। সহর পূর্ব্বে ডচদিগের উপনিবেশ ছিল; পরে করমণ্ডল-উপকূলে ইংরাজদিগের বাণিজ্যস্থান হয়।

প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া দেখিলে সহজেই মনে হইবে, মদ্রজ-মদ্রজা-গণ সাধারণতঃ বাঙ্গালী ও বাঙ্গালিনীর অপেক্ষা অধিক কুৎসিত নহে। এখানে কৃষ্ণবর্ণই সাধারণ—শ্যাম ব্যতিক্রম। রমণীরা শ্রমসহিষ্ণু। তাহাদের বেশ বর্ণ-বৈচিত্র্যে রমণীয়—দেহ শিথিল নহে, পরন্তু দৃঢ়। দেখিবে, তালপত্রে গঠিত অর্দ্ধচক্রাকার পাত্রে তাহারা কূপ হইতে জল তুলিয়া পাত্র পূর্ণ করিতেছে; পাত্র পূর্ণ হইলে তাহা মস্তকে বা স্কন্ধে লইয়া গৃহে যাইতেছে। এখানে কলস নাই; মৃত্তিকার, কচিৎ বা পিত্তলের 'ডেক'ই ব্যবহৃত। উচ্চ বর্ণের মহিলারা স্কন্ধে ও নিম্নবর্ণের মহিলারা মস্তকে এই পাত্র বহন করেন। নিম্নবর্ণের মহিলারা চুরুট-ধূমাসক্ত। এ দেশের লোকে আমদানী তামাক যথেষ্ট উগ্র নহে বলিয়া আপনারা তামাক করিয়া চুরুট প্রস্তুত করে। পথে দেখিবে, জননী শিশুর মুখে চুরুট দিতেছে। নিম্নজাতীয়া মহিলারা Dolphin's Nose হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বহন করিয়া বাজারে আনে। তাহাদের মুখে চুরুট; নাসাগ্রে অর্দ্ধচক্রাকার একপ্রকার অলঙ্কার, তাহাতে সমস্ত মুখ শ্রীহীন করে। কিন্তু কাহারও মুখে প্রফুল্লতার অভাব নাই। বাঙ্গালার এই পরিবর্ত্তন-যুগে এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সন্ধিস্থলে সমাজে যে বিষম অশান্তি,

অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা ও অসংযম আসিয়াছে; পুরুষদিগের নিত্যবর্দ্ধনশীল উচ্ছৃঙ্খলতায় ও রমণীদের কারণে অকারণে আত্মহত্যায় তাহা সংবাদপত্রে আত্মঘোষণা করে। বাঙ্গালায় আমরা পুরাতন ছাড়িয়াছি বা ছাড়িতেছি, কিন্তু নূতন লইতে পারি নাই—আমাদের চিরপরিচিত বহুশতাব্দী ধরিয়া ছায়া ও আশ্রয়প্রদ বটবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার প্রান্তরে য়ুরোপের ওক বৃক্ষের সন্ধান করিয়া হতাশ হইতেছি, নিত্যবর্দ্ধনশীল কর্ম্মের মধ্যে কেবল অশান্তি লাভ করিতেছি;—কিছুতেই নূতনে ও পুরাতনে সামঞ্জস্য করিয়া আমাদের অবস্থার উপযোগী স্থান-কাল-পাত্র-সঙ্গত পথ আবিষ্কৃত করিতে না পারিয়া পদে পদে লাঞ্ছিত হইতেছি। মাদ্রাজীরা আজও পাশ্চাত্য সভ্যতায় একেবারে গা ঢালে নাই। আজও বিদ্যালয়ে মুণ্ডিতমুণ্ড, পরিধেয়-উত্তরীয়-মাত্রধারী শিক্ষক ও ছাত্রকে সেক্সপীয়র, বেকন, কাণ্ট, বার্ক, হেগেল, আর্ণল্ড প্রভৃতির আলোচনা করিতে দেখিবে; দেখিবে, পথে নগ্নপদ পথিক থিয়সফির পুস্তক পাঠ করিতে করিতে আফিসে যাইতেছেন; নগ্নপদ মাদ্রাজীকে সমুদ্রসৈকতে বসিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজীতে রাজনীতির অলোচনা করিতে শুনিয়া বিস্মিত হইবে। এখানেও পুরুষের প্রকোষ্ঠে বলয় ও কর্ণে কর্ণাভরণ দৃষ্ট হইবে। আরও দেখিবে, মাদ্রাজে সত্য সত্যই ইংরাজী পুস্তকে বর্ণিত "পারিয়া" বাস করে। ইহারা কোন বর্ণেরই অন্তর্গত নহে; মাদ্রাজীদের কথায় No caste people; সভ্যতার স্পর্শে ইহাদিগের 'বর্ব্বরতা'র চিহ্ন অপসৃত হয় নাই। এখনও ইহারা কৌপীনমাত্র পরিধান করে; স্বাস্থ্যনীতির বিরোধী তালপত্রে ছাওয়া একদ্বারবিশিষ্ট নিতান্ত নিম্ন গৃহে বাস করে। গৃহের মেজে মৃত্তিকা হইতে এক হস্তও উচ্চ নহে। গৃহের প্রাচীর মৃত্তিকার; তালপত্রের চাল মৃত্তিকার উপর হইতে দুই হস্তের অধিক উচ্চ নহে। প্রাচীরে আলিপনা চিত্রিত—রেখা বা বিন্দুরচিত। সঙ্কীর্ণ দ্বারপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। অথচ স্বাস্থ্যনীতির সকল অনুশাসন অতিক্রম করিয়াও ইহারা ভীমকায়।

নিম্নশ্রেণীর ধীবর ব্যবসায়ীরা বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমশীল। ইহাদের নৌকা কয় খণ্ড কাষ্ঠ একত্র বদ্ধ করিয়া গঠিত। তাহাতে আরোহণ করিয়া তরঙ্গভঙ্গভীষণ সমুদ্রে মৎস্য ধরে। তীর হইতে প্রতিমুহূর্ত্তে বোধ হয়—এইবার তরঙ্গে তরী ও আরোহী অদৃশ্য হইয়া যাইবে; কিন্তু তরঙ্গ সরিয়া গেলেই আবার দৃষ্ট হয়,—সেই একান্ত ক্ষীণপ্রাণ তরীতে সেই ভীমকায় আরোহী তেমনই মৎস্য ধরিতেছে। আলোক পাইলে ইহারা সমস্ত রাত্রি মৎস্য ধরিয়া

প্রভাতে তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাদিগের সমুদ্রতীরবর্ত্তী কুগঠন কুটীরে সমুদ্র হইতে সহর অতি দীন দেখায় বলিয়া একবার ইহাদিগকে সহরের পশ্চাতে Backwater কূলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেখানে অস্বাস্থ্যকর স্থানে ইহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার এত অধিক হয় যে, পুনরায় ইহাদিগকে সাগরতটে আসিবার আদেশ দেওয়া হয়। ইহারা নহিলে এখানে কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

এ প্রদেশে রন্ধনে সর্ষপতৈলের ব্যবহার নাই। তবে ওয়ালটেয়ারে ইষ্ট-কোষ্ট রেলপথের কর্ম্মকেন্দ্র ছিল—সেই সময়ে বাঙ্গালী কেরাণী এখানে থাকিতেন। তাঁহাদের অভাবনিবারণের উদ্দেশে বাঙ্গালীর দোকানও হইয়াছিল। সেই সকল দোকানীরা কলিকাতা হইতে সর্ষপতৈল আনাইয়া রাখেন। গুড়ুকসেবী বাঙ্গালীকেও গুড়ুক তামাকের (এ দেশের কথায় গুড়াকুল) সন্ধানে এই সকল দোকানে আসিতে হইবে। এই উগ্রচুরুটভক্তের দেশে বঙ্গের গুড়ুকের চলন নাই।

এ প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ মৎস্য মাংস ভোজন করেন না; বৈশ্যগণও সেই নিয়ম পালন গৌরবজনক মনে করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আমিষ আহার নিষিদ্ধ নহে। বিধবারা একাদশীতে উপবাস করিতে বাধ্য নহেন।

বিশাখাপত্তনের গজদন্তের দ্রব্য অতি প্রসিদ্ধ ও অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। মহিষের শৃঙ্গের ও চন্দন কাষ্ঠের কারুকার্য্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একান্ত সুখের বিষয়, শিল্পীরা শিল্পজাত সময়োপযোগী করিয়াছে—রুচির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তপর হইয়াছে। কাগজকাটা ছুরী, ফটোফ্রেম, কলমদানী, যষ্টি, মহিলাদের work-basket, ঘড়ী ও অঙ্গুরীর বাক্স প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়, মূল্যও খুব অধিক নহে। গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গজদন্ত-কারুকার্য্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বঙ্গের শিল্পের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মাদ্রাজের শিল্পবিবরণীতে বিশাখাপত্তনের শিল্পের বিবরণ ও চিত্র আছে। বাজারে যে বস্ত্র পাওয়া যায়, তাহাও উল্লেখযোগ্য—পাড়ে জরীর কাজ। অবশ্য মাদ্রাজের বস্ত্র—বিশেষতঃ শাড়ী আরও উৎকৃষ্ট; তবে এ প্রদেশের বস্ত্র যদিও দেশে সাধারণতঃ ব্যবহৃত বস্ত্র অপেক্ষা দীর্ঘ—পাড়ের কাজও নব্য রুচির আদর্শে বিচার করিলে কিছু উদ্ভট, কিন্তু ফরমাইস দিয়া প্রস্তুত করাইলে উপযুক্ত মাপের ও সুন্দর পাড়ের বস্ত্র পাওয়া যায়—তাহা বঙ্গললনাদিগের নিকট আদৃতও বটে। বাজারে প্রাপ্তব্য ত্রিচীনাপলীর চটিজুতা ও চুরুটও উল্লেখযোগ্য।

বিশাখাপত্তন মন্দিরবহুল স্থান; সহরে অনেকগুলি মন্দির আছে। সন্ধ্যায় আরতিকালে সানাইয়ের স্নিগ্ধ মধুর স্বর শান্ত সন্ধ্যার করুণ মাধুরী সজীব করিয়া তুলে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির ওয়ালটেয়ার হইতে পাঁচ মাইল দূরে পর্ব্বতশিরে অবস্থিত। পর্ব্বতাঙ্গ শ্যামতরুলতায় স্নিগ্ধদর্শন, নির্ঝর ও প্রপাতে খচিত। শৈলের অঙ্গে আনারস, পেঁপে প্রভৃতি ফল ও গোলাপও আছে। মন্দির এই গিরি-শিরে অবস্থিত; প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। পর্ব্বতমূলে ক্ষুদ্র গ্রাম; দেবদর্শনপ্রয়াসী যাত্রীদিগের অভাবমোচনের উপদান এখানে প্রাপ্তব্য। পর্ব্ব-তাঙ্গে সুগঠিত, প্রস্তরনির্ম্মিত, বিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণী; মধ্যে মধ্যে সোপান সমধিক বিস্তৃত—যে স্থানে খাড়াই যত অধিক, সে স্থানে বিস্তৃততর সোপানের সংখ্যাও তত অধিক। ইহাতে যাত্রীদিগের সুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ও পর্ব্বত-পথে সোপাননির্ম্মাণে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। প্রায় এক সহস্র (সম্ভবতঃ ৯৭৩) সোপান অতিক্রম করিয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হওয়া যায়; গ্রামখানি ক্ষুদ্র—এখানে বিততসহস্রশাখ বৃহৎ বটবৃক্ষ ও উচ্চ বল্মীকস্তূপ যথেষ্ট। ইহার পর প্রায় অর্দ্ধ শত (বোধ হয় ৫২) সোপান অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতসানুতে উপনীত হইতে হয়। এখানে যাত্রীদিগের রন্ধনগৃহ ও স্নানের স্থান। উচ্চতর স্থানের নির্ঝর হইতে নিম্নগামিনী জলধারার পতনপথে একটি প্রস্তরগঠিত জলা-ধার—এখানে স্নান করিতে হয়; তাহার পর সেই জল নালা বহিয়া নিম্নে যাইয়া পড়ে। এই জলাধারেও দেবমূর্ত্তি রাখিয়া পাণ্ডারা অর্থলাভের উপায় করিয়া রাখি-য়াছে। ইহার পর আর একশ্রেণী সোপান অতিক্রম করিয়া লোকবিশ্রুত সিন্ধাচলম্ মন্দিরদ্বারে উপনীত হইতে হয়। মন্দির সুন্দর—প্রথমেই একটি অনতিবৃহৎ চত্বর। প্রস্তরস্তম্ভের উপর প্রস্তরের ছাত; স্তম্ভগাত্রে ও ছাতের ভিতর পৃষ্ঠে (Ceiling) অতি সুন্দর কারুকার্য্য। বহু লতাপত্র, নানা জন্তুর মূর্ত্তি ও নানা অবস্থায় অবস্থিত নরনারীমূর্ত্তি শিলায় খোদিত। কোথাও খোলবাদনপর মনুষ্য-মূর্ত্তি, কোথাও একশ্রেণী মরাল, কোথাও করিদল, কোথাও কয়টি সিংহ—ইত্যাদি—বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই সকল কারুকার্য্য বিশেষ ধৈর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।—

"Strange works of a longdead people loom,

*   *   *   *   *

An elephant hunt, a musician's Feast—

And curious matings of man and beast ;

What did they mean to the men who are long since dust ?

Whose fingers traced

*

These rioting, twisted, figures of love and lust." *

মন্দিরের শিলাগাত্রে যে অশ্লীলতাব্যঞ্জক চিত্র নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। প্রথম কক্ষ অতিক্রম করিয়া প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে বুদ্ধমূর্ত্তি - পদ্মাসনে উপবিষ্ট, নয়নে ও অধরে স্নিগ্ধ প্রশান্তিভাব। কিন্তু বাহু বিভগ্ন—কে কোন্ উদ্দেশ্যে এ কুকার্য্য করিয়াছে—কে বলিবে ?

মন্দিরগর্ভ অন্ধকার—উচ্চ পিত্তলের পিলসুজে বৃহৎ পিত্তলদীপে ঘৃতপুষ্ট দীপ-শিখা আলোকবিস্তার করিতেছে। প্রথমদর্শনে মূর্ত্তি শিবলিঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। প্রকৃত দেবমূর্ত্তি—নৃসিংহ ; তাহা শিবলিঙ্গের অভ্যন্তরে সংস্থাপিত। চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী ও বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় সমারোহে পূজা হয় ; চৈত্র মাসে উৎসব পঞ্চদিবসব্যাপী, বৈশাখের উৎসব দিনমাত্রস্থায়ী। সেই সময় শিবলিঙ্গরূপী আবরণ অপসারিত হয় ও প্রকৃত দেবমূর্ত্তির দর্শনলাভ ঘটে। দুই উৎসবেই নানা স্থান হইতে বহু যাত্রী সমাগত হয়। এই নৃসিংহ-মূর্ত্তি হইতে পর্ব্বতের ও মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে—সিংহ+অচলম্=সিংহা-চলম্, ক্রমে সিহ্মাচলম্, শেষে সিমাচলম্।

মন্দিরের সোপানশ্রেণীই বিস্ময়কর—অসাধারণ ব্যয়সাধ্য ও অসীম ভক্তির ফল। এই সকল বৃহৎ প্রস্তর আনিয়া কাটিয়া এই সোপানের গঠন ও ৮০০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতশিখরে প্রস্তরে গঠিত এই মন্দিরনির্ম্মাণ, অসীম ধৈর্য্য ও ব্যয়-সহকারে প্রস্তরে বিচিত্র শিল্পকার্য্যের সমাবেশ যে অতি অসাধারণ ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ভক্তের হৃদয় ব্যতীত এই গঠনের কার্য্য অন্যের কল্পনায় উদিত হইতে পারে না ; ভক্তির উত্তেজনা ব্যতীত কেহ শিলায় শিলায় এত অর্থ ছড়াইতে পারে না। ভক্তির উত্তেজনায় দুর্ব্বল কিরূপে সবল হয়—মানুষ কিরূপে ক্ষমতার অতীত কার্য্য করিতে পারে, সিহ্মাচলম্ মন্দিরে আসিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। পর্ব্বতের সোপানারোহণে অনভ্যস্ত সবলকেও পথে তিন চারি বার বিশ্রাম করিতে হয় ; যাঁহাদিগের দেহ দৃঢ়গঠিত নহে, তাঁহাদিগকে আরোহণ ও অবতরণের ফলে পদে মালিস্‌ও করিতে হয়। এই

* The Garden of Kama.

সোপানশ্রেণী দুর্ব্বলের পক্ষে একান্ত দুরারোহ। দেখিলাম,—একটি রোগজীর্ণা শীর্ণা মন্দ্রবালিকা সঙ্গীদিগের অঙ্গে ভর দিয়া সোপান অবতরণ করিতেছে। প্রত্যেক অষ্টম বা নবম সোপানে সে বিশ্রামলাভের জন্য উপবেশন করিতেছে। কিন্তু রোগযন্ত্রণা ও শ্রান্তিসত্ত্বেও তাহার আননে প্রফুল্ল ভাব; সে মন্দিরে পূজা-সমাপন করিয়া আসিয়াছে,—সে সার্থকসাধন। কেমন করিয়া সে এই দুরারোহ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিল? ভক্তির উচ্ছ্বাস সেই রোগজীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বলদেহে কি বলের সঞ্চার করিয়াছিল যে, সে এই দুরারোহ সোপানমালা অতিক্রম করিয়া মন্দিরে দেবপূজা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে? শিথিলবিশ্বাসদিগের পক্ষে ইহা বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য মানুষ কি না করিয়াছে! যে বিশ্বাসকে মানুষ প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহার জন্য সে কঠোর কশাঘাত, লেলিহান অগ্নিশিখা, তীক্ষ্ণধার তরবারি, সকলই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে; হাসিতে হাসিতে প্রাণপাত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই,—পর-লোকের আশায় ইহলোককে একান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ওয়ালটেয়ারে প্রায় এক মাস যাপন করিয়া আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই রম্য স্থানে অতিবাহিত কাল জীবনের একান্ত অল্প সুখস্মৃতিতে পরিণত হইয়া স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

সহযোগী সাহিত্য।

শিখজাতি।

অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ এম্. মেকলিফ মহোদয় সিমলার 'ইউনাইটেড্ সার্ভিস ইনষ্টিটি-উশনে" শিখজাতি সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ও বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিলাম। প্রবন্ধলেখক বলেন, ইংরাজরাজের প্রতি শিখদিগের সুগভীর ভক্তির কথা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু শিখধর্ম্মতত্ত্ব অল্প-শিক্ষিতগণের কথা দূরে থাকুক, প্রাচ্যতত্ত্বদর্শী সুধীগণেরও অনধিগত রহিয়াছে। শিখ-ধর্ম্মের উপযোগিতা ও সৌন্দর্য্যের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে একাধিক প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা তাদৃশ অধ্যবসায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সংক্ষেপে আমাদিগের বক্তব্য বিষয় বিবৃত করিতেছি।

শিখধর্ম্মের মূলসূত্রনিচয় পৃথিবী-প্রচলিত কতিপয় প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন নহে। ভূমণ্ডলে এ পর্য্যন্ত যে সকল লোকশিক্ষক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বরচিত কোন গ্রন্থাদি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। জনপ্রবাদ বা ব্যক্তি-বিশেষবর্ণিত তথ্যসমূহের অনুশীলন ব্যতীত তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মতত্ব অবগত হইবার উপায়ান্তর নাই।

ঐতিহাসিক তামসযুগে ইউরোপের ন্যায় এসিয়াখণ্ডেও ধর্ম্মের তাদৃশ অভ্যুদয় পরি-লক্ষিত হয় নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অবসান ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে পঞ্জাবে গুরুদাস নামক জনৈক শিখ লেখক আবির্ভূত হন। ভাগৎ ও গুরুদিগের আবির্ভাব-কালের পূর্ব্বে শিখজাতির নৈতিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থমধ্যে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। ইউরোপে যে সময়ে উইক্লিফ, লুথার ও কলভিন প্রমুখ মহাত্মারা খৃষ্টধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট ভ্রমসমূহের সংস্কারকল্পে জন-সাধারণকে উদ্বোধিত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষে কবীর ও গুরু নানক পৌরোহিত্য, কপটতা ও প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এই সংস্কারপ্রয়াস বহুপরিমাণে সফল হইয়াছিল। ভার-তীয় মধ্যযুগে যে ধর্ম্মবীরগণ কুসংস্কারের অপনোদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ধর্ম্মসম্প্রদায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে বাবা নানকের প্রতিষ্ঠিত শিখসম্প্রদায় সংখ্যা ও শক্তিতে সকলের অগ্রগণ্য।

একেশ্বরবাদ গুরু ও ভাগৎগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূলসূত্র। বেদের "এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাই,"—এই মহাবাক্য হইতেই গুরুগণের একেশ্বরবাদ সংকলিত হইয়াছে। শিখধর্ম্মগ্রন্থনিচয়ে এই তত্বের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। যে প্রকার মূর্খতা ও কুসং-স্কারসমাচ্ছন্ন যুগে শিখধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ পুনরুক্তির বাহুল্য অনাবশ্যক ও অকারণ বলা যায় না। একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়া গুরু নানক ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলী হিন্দুদিগের প্রতিমাপূজা ও কুসংস্কার পরিহার করিলেন। তাঁহারা প্রচার করিলেন যে, যে কেহ প্রতিমা বা ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীকে ঈশ্বর-জ্ঞানে অর্চ্চনা করিবে, সে ঈশ্বরের কোপে পতিত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

শিখেরা হিন্দুদর্শনোক্ত আত্মার অনশ্বরত্ব ও জন্মান্তরবাদ আপনাদিগের ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন, কর্ম্মবন্ধনমুক্তি ও মোক্ষ-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারিত সাম্যবাদের প্রভাবে শিখদিগের মধ্য হইতে জাতিভেদপ্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে পঞ্জাবে সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল। সকল বিধবাই যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পতির চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিত না, এ কথা বহুকালাবধি জন-সাধারণের অবিদিত ছিল না। সে যাহা হউক, উক্ত প্রথা যে দারুণ নৃশংসতা ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শিখধর্ম্মপুস্তক গ্রন্থসাহেবে এই প্রথার অনুসরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উত্তরকালে হিন্দুভাবাপন্ন শিখেরা সতীদাহপ্রথার অনুষ্ঠানে নিরস্ত হন নাই। যখন লর্ড বেণ্টিক মহোদয় এই প্রথার উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তখন যদি তিনি জানিতে পারিতেন যে,

সহমরণ প্রথা শিখ গ্রন্থসাহেবে নিষিদ্ধ, তাহা হইলে, গ্রন্থসাহেবের এই বিধান তদীয় অভিপ্রায়সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইত। গ্রন্থসাহেবে লিখিত আছে,—

'কলিযুগে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে সম্মিলিত হয়। ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত তাহারা পরস্পরের সংসর্গসুখে কালযাপন করে। পতিহীনা রমণী স্বামীর সহিত মিলিত হইবার অভিলাষে 'সতী' হইয়া অনলে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেও পরলোকে পতির সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয় না।'

প্রাচ্যদেশের অবরোধপ্রথার উল্লেখ করিয়া অনেক পাশ্চাত্য লেখক পরিতাপ করিয়াছেন। পুরাকালে এ দেশে স্বয়ংবরসভা ও অন্যত্র রমণীরা প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হইতেন বটে, কিন্তু প্রাচ্যমহাদেশের বহু রাজ্যেই মহিলাগণের অন্তঃপুরবাস প্রচলিত ছিল। কবীর এই প্রথার প্রতিকূলে আত্মমত প্রচারিত করিয়াছিলেন। নিজপুত্র কমলের পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কবীর বলিয়াছেন,—

অয়ি বধূ! কোথা যাও চঞ্চলচরণে
আবরি' আনন তব নীলাবগুণ্ঠনে?
তিষ্ঠ ক্ষণকাল সতী, ও অবগুণ্ঠন
চরমে কি ফল বল করিবে অর্পণ?

একদা মণ্ডীরাজ মহিষীগণের সমভিব্যাহারে গুরু অমরদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। গুরু-সমীপে উপনীত হইয়া রাজার নবপরিণীতা পত্নী কিছুতেই মুখমণ্ডল হইতে অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিলেন না। গুরু তখন ধীরভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—'উন্মাদিনি গুরুর মুখদর্শনে তোমার হৃদয়ে যদি আনন্দের সঞ্চার না হয়, তবে কি জন্য এখানে আসিয়াছ?' এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র নূতন রাণী উন্মাদগ্রস্ত হইলেন, এবং পরিধেয় বসন উন্মোচনপূর্ব্বক বিবসনা হইয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহু অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

অনেকের ধারণা, মদ্য ও অন্যবিধ উত্তেজক মাদকদ্রব্যের সেবন শিখধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু এ সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্তি-মূলক। কবীর লিখিয়াছেন,—'যে সকল লোক ভাঙ্গ ও সুরাপান করে, তাহারা নিরয়গামী হইবে। তীর্থদর্শন, ব্রতোপবাস, প্রাত্যহিক আরাধনা, কিছুতেই এ পাপের খণ্ডন হইবে না।'

এই প্রসঙ্গে আর একটি সাধারণ ভ্রমের উল্লেখ করিতেছি। অনেকের বিশ্বাস, শিখদিগের পক্ষে গোমাংস-ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কিন্তু দুইখানি শিখধর্ম্মগ্রন্থ ও অন্যান্য বিবিধ সমাজবিধানসংক্রান্ত পুস্তকে কুত্রাপি ঐরূপ উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। শিখেরা যে সকল হিন্দুপ্রথার অবলম্বন করিয়াছেন, এইটিও তাহাদিগের অন্যতম। কুকা নামক ভক্ত শিখসম্প্রদায়ের নিকট গোমাংসভক্ষণ ঘোর অধর্ম্মজনক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। মনুষ্যখাদ্যের অনুপযোগী মাংস ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার মাংসই শিখদিগের অগ্রাহ্য নহে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই মাংসভোজন করেন না। একদা ব্রাহ্মণেরা গুরু নানককে ভক্তজনপ্রদত্ত মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়া চকিত ও আতঙ্কিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে শিখদিগের মধ্যে কন্যাবধপ্রথা প্রচলিত ছিল। শিখ-গুরুগণ অতি তীব্রভাষায় শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি এই কুপ্রথার নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। আদিগ্রন্থে উক্ত প্রথা সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে কন্যাহন্তারা ঘোর দুষ্কৃতকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দীক্ষাগ্রহণকালে শিখদিগকে 'কন্যাবধপাপে লিপ্ত হইব না, এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হয়। কন্যাহন্তাদিগের সংসর্গও তাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। রহিত-নামা বা শিখসমাজপদ্ধতি গ্রন্থে কন্যাবধ পাপাবহ কার্য্য বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। জন্ লরেন্স ও তদীয় সহযোগিগণ ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত (on moral grounds) হইয়াই এই কুপ্রথার উৎসাদনকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রথা যে শিখদিগের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ইউরোপীয়েরা অবগত ছিলেন না। শিখ-ধর্ম্মানুসারে ধূমপান নিষিদ্ধ, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে সময়ে ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম জেমস্ তাম্রকূটসেবনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রচার করিতেছিলেন, ঐ সময় প্রাচ্যদেশেও সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ধূমপানের প্রতিকূলে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি স্বীয় রূপলাবণ্য-বতী মহিষী নুরজাহানের অভিলাষানুসারে কিয়ৎপরিমাণে উক্ত আদেশের কঠোরতার হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নবম গুরু তেগ বাহাদুরও ধূমপানের প্রতিকূলবাদী ছিলেন। গুরু গোবিন্দসিংহ এ বিষয়ে তাঁহার পিতার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। তিনিও ধূমপানের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। একদা মৃগয়াকালে তিনি এক তাম্রকূটক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ঐ সময়ে তিনি বলেন, 'তাম্রকূট অশেষ রোগের আকর।' শিষ্যবর্গকে ধূমপান বিষয়ে উপদেশপ্রদানকালে বলিয়াছিলেন,—'সুরা অপকারী,—ভাঙ্গ্ সেবনে এক পুরুষের অনিষ্ট হয়, কিন্তু তাম্রকূট সেবন করিলে পুরুষানুক্রমে ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হয়।' দশম গুরুও ধূমপানকারীদিগকে কন্যাহন্তাদিগের ন্যায় দুষ্কৃত-কারী বলিয়াছেন। তিনি ধূমপানবিষয়ে নিম্নলিখিত শাসনবাণীর প্রচার করিয়াছিলেন,—'যে কেহ ধূমপান করিবে, তাহাকে খাল্‌সা-সমাজচ্যুত হইতে হইবে। দ্বিতীয়বার দীক্ষা-গ্রহণ ব্যতীত তাহাকে আর সমাজে গ্রহণ করা হইবে না। দীক্ষান্তে পুনর্গৃহীত হইলেও ঐ ব্যক্তি সংস্কৃত ভগ্নপাত্রের ন্যায় হইয়া থাকিবে। এবং সে কোনও শিখকে ধর্ম্মদীক্ষা-দানযোগ্য পবিত্রতাশালী বলিয়া বিবেচিত হইবে না।' শিখগুরুর এই নিষেধবাণী যে কিরূপ ফলোপধায়িনী হইয়াছে, তাহা শিখদিগের বলিষ্ঠ ও উন্নত মূর্ত্তি এবং অন্যান্য জাতি-সমূহের দেহের বংশানুক্রমিক উত্তরোত্তর খর্ব্বতা অবোলোকন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাম্রকূটসেবনে পৃথিবীর সমৃদ্ধিশালী ও সভ্য জাতিসমূহের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে কিরূপ অবনতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিরন্তর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উপকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ বা (নিমকহালালী) সম্বন্ধে শিখধর্ম্মের সেণ্টপল-স্বরূপ গুরুদাস লিখিয়াছেন,—'অভ্রভেদী পর্ব্বত, লক্ষ লক্ষ দুর্গ ও গৃহ, সমুদ্র, নদী, ফল-সমাকীর্ণ বৃক্ষ, সংখ্যাতীত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গাদি জীবের ভার পৃথিবী অনায়াসে বহন করেন। কিন্তু নরাধম কৃতঘ্ন ব্যক্তির ভারই পৃথিবীর পক্ষে একান্ত দুর্ব্বহ। গুরুদাস এ সম্বন্ধে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটি

কাহিনী বর্ণিত হইল। কোন রাজগৃহে জনৈক তস্কর প্রবেশ করে; সে নিম্নতলের গৃহসমূহে অপহরণযোগ্য দ্রব্যাদির অনুসন্ধানের পর উপরিতলের গৃহে উপনীত হয়। কতিপয় স্বর্ণ ও রৌপ্যময় দ্রব্যাদি সংগ্রহের পর অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যাদির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। লোভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সে সাগ্রহে একটি লবণপাত্র গ্রহণ করিল। কিন্তু যখন সে পাত্রস্থিত দ্রব্য আস্বাদনপূর্ব্বক লবণ বলিয়া বুঝিতে পারিল, তখন সহসা তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। অতঃপর সে সংগৃহীত দ্রব্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেল। তস্করের এইরূপ পরদ্রব্য-অপহরণে বিতৃষ্ণার কারণ এই, সে মনে করিয়াছিল,—লবণ গ্রহণ করিয়া 'নিমকহারামী' করার অপেক্ষা পাপ আর কিছুই নাই। জনহিতৈষণা (philonthrophy) সম্বন্ধে দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ বলিয়াছেন, "সত্যনাম-স্মরণই শ্রেষ্ঠ তপস্যা; লোকহিতৈষণাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। যে ব্যক্তি এই উভয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহার জীবন অভিশাপস্বরূপ। সে কেবল উদ্ভিদের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতেই থাকে, এবং তাহার পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলকর বিষয় অবগত হইতে পারে না। সে শৃঙ্গ ও পুচ্ছবিহীন পশুমাত্র, এবং পৃথিবীতে তাহার জন্ম নিতান্ত নিস্ফল। জীবনের চরমক্ষণে মৃত্যুদূতেরা তাহাকে দৃঢ়রূপে পাশবদ্ধ করিবে, এবং সে রিক্তহস্তে বিষাদখিন্নহৃদয়ে ইহলোক হইতে অপসৃত হইবে। মুষ্টিভিক্ষাপ্রদান, উপবাস, যজ্ঞ, কিছুই জনহিতৈষণার সমতুল্য নহে। মনুষ্যেরা যে সমুদয় পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তন্মধ্যে কোন পাপই স্বার্থপরতার সমকক্ষ নহে। ভারতীয় বিদ্যার্থী যুবকেরা জাতিনির্ব্বিশেষে অধ্যয়ন করিতে পারে, এরূপ নীতিপুস্তক নির্ব্বাচন-ব্যাপারে ভারতগবর্মেণ্টকে প্রায়ই বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। শিখগ্রন্থনিচয় বিবিধ নীতিকথায় পরিপূর্ণ। গুরু নানক বলিয়াছেন, "হিন্দুদিগের পক্ষে গো ও মুসলমানের পক্ষে শূকর যেরূপ, পরদ্রব্যও তোমার নিকট সেইরূপ হউক।" বৃক্ষস্থিত অথবা বৃক্ষচ্যুত ফলও তাঁহার মতে গ্রহণযোগ্য নহে। বৃক্ষস্থিত ফল যে ব্যক্তি স্পর্শ না করে, এবং বৃক্ষচ্যুত ফল যে ব্যক্তি ভোজন না করে, সে স্বর্গে গমন করিবে। গুরু অর্জ্জুন লিখিয়াছেন,—"পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা পরিত্যাগ কর, কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ কর, লোভ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ কর।" গুরুদাস বলিয়াছেন,— "ঘটনার পূর্ব্বলক্ষণ, নবগৃহ জুড়িয়ার (?) দ্বাদশ নিদর্শন, মন্ত্র, তন্ত্র, মায়াবিদ্যা, মুদ্রা প্রভৃতির সাধন বিফল প্রয়াসমাত্র। গর্দ্দভ, কুক্কুর, মার্জ্জার, শ্যেন, মলালী ও শৃগাল প্রভৃতির শব্দ হইতে ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করাও পণ্ডশ্রম। বিধবা ও উষ্ণীষশূন্য লোকের দর্শন, অগ্নি, জল, হাঁচি, কাসি, বার, তিথি, অশুভ মুহূর্ত্ত গ্রহসংযোগ প্রভৃতি হইতে ভাবী ঘটনার নির্দ্দেশও কুসংস্কারমূলক। যে সমুদয় সাধু ব্যক্তি ঈদৃশ কুসংস্কার পরিবর্জ্জন করেন, তাঁহারা সুখ ও মোক্ষের অধিকারী হন। লোকে লোকান্তরিত বীর, পূর্ব্বপুরুষ, সতী, সপত্নী, পুষ্করিণী, কূপ, প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে কোনই ফললাভ হয় না। তপস্যা, ব্রতনিয়ম, পর্ব্বোৎসব, উপবাস, শুদ্ধাচার, তীর্থদর্শন, ভিক্ষাদান, দান, দেবদেবীর অর্চ্চনা প্রভৃতি সত্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সত্যের অনুষ্ঠান এই সমুদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। মিথ্যা অতিতীব্র বিষময় ইক্ষু (akk) তুল্য। সত্য সুমিষ্ট আম্র সদৃশ। সত্য সুখসুপ্ত ভূপতির ন্যায়। মিথ্যা গৃহ-হীন তস্কর। ভূপতি

সুপ্তোত্থিত হইয়া তস্করকে ধৃত করিয়া রাজদরবারে তাহাকে দণ্ডিত করেন। মস্তকস্থিত উষ্ণীষের ন্যায় সত্য পরম সুন্দর। মিথ্যা অপবিত্র বস্ত্রখণ্ড। সত্য পরাক্রমশালী সিংহ। মিথ্যা দুর্ব্বল মেষ। সত্যাচরণে তৎপর হও, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। অনিষ্টাবহ মিথ্যার শরণ লইতেছ কেন? সত্য প্রচলিত মুদ্রাস্বরূপ। মিথ্যা অপ্রচলিত কৃত্রিম মুদ্রা। তমস্বিনী রজনীতে লক্ষ লক্ষ তারকা অল্পমাত্র আলোক বিকীর্ণ করে, কিন্তু একমাত্র সূর্য্যের উদয়ে তাহারা সকলেই অন্তর্হিত হয়; সেইরূপ সত্যের সমক্ষে মিথ্যা তিষ্ঠিতে পারে না। সত্য ও মিথ্যা পরস্পর পাষাণপাত্র ও মৃৎপাত্রের সম্বন্ধবিশিষ্ট। মৃৎপাত্রে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইলে উহা ভগ্ন হয়। পাষাণোপরি মৃৎপাত্র নিক্ষেপ করিলে মৃৎপাত্রই ভগ্ন হয়। উভয় স্থলেই মৃৎপাত্রই ভগ্ন হইয়া থাকে। মিথ্যা সংহার-অস্ত্র, সত্য রক্ষাকবচ (armour); মিথ্যা ছিদ্রান্বেষী আক্রমণোদ্যত শত্রু, সত্য প্রকৃত বন্ধু ও বিপদের সহায়। সত্য বীরপুরুষ, মিথ্যা মিথ্যাই সঞ্চয় করে। সত্য নিরাপদ্ ভূমির উপর অটল হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, মিথ্যা ভঙ্গুর-ভিত্তির উপর কম্পিত হইতেছে। সত্য মিথ্যাকে ধারণপূর্ব্বক তাহাকে ভূতলশায়ী করে—সমস্ত পৃথিবী ইহা অবলোকন করিতেছে। প্রবঞ্চনাপরায়ণ মিথ্যা চিরদিনই যন্ত্রণা ভোগ করে; সত্য চিরকাল অনাহত ও নির্ব্বিঘ্ন থাকে। সত্য চিরদিন সত্য, এবং মিথ্যা চিরদিনই অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।"

শিখধর্ম্মগ্রন্থে শিখজাতির ব্যক্তিগত জীবনযাপনের নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভাতকালে ঈশ্বরধ্যানে চিত্তনিবেশপূর্ব্বক আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার উপদেশ শিখধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গুরুদাস বলেন, "পুষ্পগন্ধামোদমধুর প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শিখেরা নদীজলে অবগাহন করিবে। তাহার পর একাগ্রচিত্তে প্রশান্তহৃদয়ে অনন্তের ধ্যানে সমাহিত হইয়া গুরুর জপজীর আবৃত্তি করিবেন। তদনন্তর সাধু মহাত্মাদিগের অনুসরণপূর্ব্বক তৎসমীপে উপবেশন করিবেন, এবং তদ্গতচিত্তে মহাবাক্য (গুরুর) স্মরণ এবং গুরুর স্তোত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবেন। তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, ভীতি ও আত্মনিবেদনশীল হইয়া আরাধনা শেষ করিবেন। তাঁহারা গুরুর আজ্ঞাকারী হইয়া তৎসম্পর্কিত উৎসবসমূহ সম্পন্ন করিবেন। রজনীযোগে কীর্ত্তনসহিলা পাঠ এবং ভগবদ্‌বন্দনাপূর্ব্বক পবিত্র ভোজ্য বিতরণ করিবেন। এই প্রকারে পবিত্র শিখসম্প্রদায় আনন্দসহকারে সুখরূপ সুমধুর ফলের রসাস্বাদ করিবেন। স্বল্প খাদ্য, স্বল্প পানীয় দ্বারা শিখেরা ক্ষুৎপিপাসার নিবারণ করিবেন—তাঁহারা অল্পভাষী ও আত্মপ্রশংসাকীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হইবেন। তাঁহারা কেবল রাত্রিকালে অল্পমাত্র নিদ্রাসুখ ভোগ করিবেন। এবং বিষয়বাসনাসম্পন্ন হইবেন না। কোন সুরম্য গৃহে প্রবেশ করিলে তাহা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিবেন না।"

পরনিন্দাপ্রসঙ্গে গুরুদাস লিখিতেছেন,—"পরনিন্দা কর্ণগোচর হইবামাত্র শিখেরা বলিবেন,—'আমাদিগের অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই।' অন্যের কুৎসা শ্রবণ করিলে শিখমাত্রই লজ্জিত হইবেন।"

শিখদিগের অপক্ষপাতিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইল:—

"একদা গুরু গোবিন্দসিংহ শুনিলেন—কানাইয়া নামক এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ পক্ষপাতপরিশূন্য হইয়া তাঁহার ভক্ত শিখবৃন্দ ও শত্রুদিগের জন্য জল আহরণ করিতেছে। গুরু তাহাকে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কথা কি সত্য?' সে বলিল, 'হাঁ।' তাহার পর নিজবাক্যের সমর্থনার্থ গুরুর উপদেশবাক্যের আবৃত্তি করিল,—'সকল লোককে সমদৃষ্টিতে দর্শন করিও।' গুরু তাহার বাক্যশ্রবণে কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। তাহার পর 'তুমি ধর্ম্মাত্মা' এই সাধুবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।"

শিখগুরুদিগের লিখিত গ্রন্থসমূহে তীর্থযাত্রার প্রতিকূল মত দৃষ্টিগোচর হয়। কুম্ভমেলা প্রভৃতির অধিবেশনকালে তীর্থক্ষেত্রে বিপুল জনসমারোহ হেতু বিসূচিকা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ঐরূপ সংক্রামক রোগ সুদূরব্যাপী হয়। আর্য্যসমাজের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার শিষ্যবর্গ এই জন্য তীর্থযাত্রার সম্পূর্ণ প্রতিকূলবাদী হইয়াছিলেন। আকবরী-আম নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য কতিপয় সংবাদপত্রের সম্পাদক তীর্থযাত্রার বিরুদ্ধে লেখনীধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যদি হিন্দুসমাজের নেতারা এই লোকক্ষয়কর তীর্থযাত্রার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, এবং শিখদিগকে তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে গুরুদিগের অভিমত সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কলুষিত জলপান, বিসূচিকা ও মহামারীর কীটাণুদুষ্ট জলে স্নানজনিত পুণ্যলাভের হস্ত হইতে এই সকল পুণ্যপ্রয়াসীরা অব্যাহতি-লাভ করিতে পারে।

বিশাল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে নানা জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বাস। এই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃতিবর্গের প্রতি একবিধ শাসনপ্রণালীর প্রয়োগ বিষম ভ্রমমূলক। ইহাদিগের কোন শ্রেণীর লোক রাজভক্তিপ্রকাশে উৎসুক, আবার কোন শ্রেণীর লোক স্বাতন্ত্র্য-লাভের জন্য যত্নশীল। কোন কোন ধর্ম্মের পক্ষে রাজকীয় সাহায্য আবশ্যক, আবার কোন কোন ধর্ম্ম এরূপ প্রাণশক্তিসম্পন্ন যে, তাহাদিগের পক্ষে ঐরূপ সাহায্যলাভের প্রয়োজনমাত্র নাই। অশেষবিধ নির্য্যাতনের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও ইহুদীদিগের ধর্ম্ম কোন-প্রকার রাজকীয় সাহায্য ব্যতিরেকে বহু শতাব্দী সঞ্জীবিত রহিয়াছে। ইস্‌লাম ধর্ম্ম বহুদেশে বিস্তৃত হইয়াছে, এবং উহার উন্নতি বা রক্ষাকল্পে কোনপ্রকার পার্থিব শক্তির সহায়তার আবশ্যক নাই। মুসলমানেরা অবাধে ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রার্থনা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং এ দেশে তাহাদিগকে উক্ত অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য কতিপয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বিশ্বাস,—তাহাদিগের ধর্ম্ম স্বর্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং তাহারা তাহাদিগের ধর্ম্মের রক্ষা বা উন্নতিকল্পে রাজকীয় সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক বলিয়া মনে করে না। কিন্তু বিবিধ ধর্ম্মের রহস্যবিৎ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিভিন্ন মতের পোষণ করিয়া থাকেন।

এক সময়ে এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথিতনামা অশোকের পরবর্ত্তী বৌদ্ধরাজগণ তাঁহার ন্যায় মনস্বী ও ধর্ম্মতত্ত্বদর্শী ছিলেন না, কাজেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত হইয়া ভিন্নদেশীয়ের নিকট সমাদর ও

আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ আকবর নির্ব্বাচনপ্রণালীর সাহায্যে মুসলমান হিন্দু ও জোরেষ্টরিয় ধর্ম্ম হইতে এক অভিনব যুক্তিমূলক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তদীয় পুত্র সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীর উহার প্রতিকূলাচরণ করায় ঐ ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐতিহাসিক আবুল ফজল ধর্ম্মের উন্নতিসাধনপক্ষে রাজকীয় সাহায্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"মনস্বিমণ্ডলীর এইরূপ অভিমত যে, কোন জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিও রাজকীয় সাহায্যসাপেক্ষ। কারণ, রাজশক্তিতে ভগবজ্জ্যোতি বিদ্যমান।"

মহারাজ রণজিৎসিংহের শাসনকালে শিখধর্ম্ম যে বিশুদ্ধ ছিল, এ কথা কোনক্রমে বলা যাইতে পারে না। কিন্তু শতদ্রুতীরে পরবর্ত্তিকালে যে সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার পরিণাম যদি অন্যরূপ হইত, তাহা হইলে রণজিতের কোন সুশিক্ষিত উত্তরপুরুষ খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারক কনষ্টান্টেনাইনের ন্যায় শিখধর্ম্মের সংস্কারসাধন করিতে পারিতেন।

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ সময়ে সময়ে স্ব স্ব ধর্ম্মের রক্ষা বা উন্নতিকল্পে রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমাদিগের বিশ্বাস, এই সকল আবেদনের প্রত্যাখ্যান—প্রজাগণের রাজভক্তি-পরিবর্দ্ধনের অনুকূল নহে। ভারতবাসীর সম্বন্ধে আমরা যে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়াছি, উহা সকল ক্ষেত্রে সমীচীন নহে। জন-সাধারণও আমাদিগের এই নিরপেক্ষতার মর্ম্মাবধারণে অসমর্থ। আমি বিদেশী ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; তথাপি শিখসমাজের নেতৃগণ আমাকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের ইংরাজীভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু কোন মুসলমানই এক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে তাঁহাদিগের কোরাণের অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিবেন না। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদিগের বেদ ও শাস্ত্রগ্রন্থনিচয়ের অনুবাদ করিবার জন্য এক জন ইউরোপীয়কে আমন্ত্রণ করিবেন না।

খৃষ্টধর্ম্ম ও শিখধর্ম্মে পার্থক্য এই যে, শিখধর্ম্মে জন্মান্তরবাদ ও অদৃষ্টবাদ প্রচারিত হইয়াছে। নিয়তির নিগ্রহ হইতে পরিত্রাণলাভের উপায়ও শিখধর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ধর্ম্মে ললাটলিপি মুদ্রার উপরিস্থিত বিপরীত অক্ষরনিচয়ের সদৃশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। লোক যখন গুরুর নিদেশ-অনুসারে কাজ করে, তখন এই ললাটলিপি প্রকৃত আকৃতি পরিগ্রহ করে। তখন সে পুনর্জীবন লাভ করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হয়। এই অদৃষ্টবাদপ্রভাবে শিখেরা প্রাচ্যদেশের নিতান্ত অকুতোভয় উচ্চশ্রেণীর সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখিলাম,—প্রতিমাপূজা, কপটতা, জাতিভেদ, সহমরণ, অবরোধপ্রথা, মাদকসেবন, ধূমপান, শিশুহত্যা ও তীর্থযাত্রা শিখধর্ম্মে নিষিদ্ধ; এই ধর্ম্মে রাজভক্তি, কৃতজ্ঞতা, লোকহিতৈষণা, ন্যায়নিষ্ঠা, অপক্ষপাতিতা, সত্য, সাধুতা, সর্ব্ববিধ নৈতিক ও গার্হস্থ্য সদ্‌গুণসমূহের মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা গুরুদিগের প্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্মের বর্ণনা করিলাম। কিন্তু এক্ষণে ইহার বিপরীত চিত্র উপস্থিত করিতেছি। দুঃখের বিষয়, অধুনা অধিকাংশ শিখ-ধর্ম্মাবলম্বীই গুরুদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত। যে ভাবায়

শিখধর্ম্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে ভাষা পৃথিবীর মধ্যে পঁচিশ জনেরও অধিগম্য নহে। কোনও ভারতীয় ভাষায় এই গ্রন্থসমূহের প্রামাণিক ভাষ্য বা অনুবাদ নাই। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থসাহেব অনূদিত হইলে উদীয়মান শিখবংশধরগণ যুগপৎ স্বধর্ম্মতত্ত্বে ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে পারিবে।

অধ্যাপক ওয়েবর "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে" লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসন জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুরধিগম্য ছিল, এই জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।" ঠিক এই কারণেই শিখধর্ম্মেরও বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে। গুরুদাস বলিয়াছেন, "শিখধর্ম্মের পথ অতিসঙ্কীর্ণ; তরবারির ধার অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর ও কেশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর।" এক্ষণে যদি এই ধর্ম্ম আত্মরক্ষাকল্পে কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ইহার ভবিষ্যৎ নিতান্ত আশঙ্কাজনক বলিতে হইবে। যে সকল শিখ এক্ষণে সৈন্যদলভুক্ত হইবার জন্য উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে প্রায়ই মুণ্ডিতমস্তক দেখা যায়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা বিষয়ে তাহাদিগের ধর্ম্মবিষয়িণী অজ্ঞতা ও উদাসীনতা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গান্তরে আমি বলিয়াছি, খালসা দেওয়ান শিখদিগের সংখ্যা-হ্রাস দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। ধর্ম্মের সংস্কার ব্যতীত এই অমঙ্গলের অন্য প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই।

শিখেরা যে ক্রমশঃ হিন্দুভাবাপন্ন হইতেছে, এবং তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, তাহা বিগত লোকগণনাকালে স্পষ্টই লক্ষিত হইয়াছে।

শিখধর্ম্মের আলোচনা করিবার জন্য অদ্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি বটে; কিন্তু আমাদিগের আন্তরিক কামনা এই যে, মহানুভব শিখগুরুদিগের দৈবপ্রেরণাপ্রসূত উন্নত ধর্ম্মের শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত সাহিত্য যেন বিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্ন না হয়। যে শিক্ষা শিখদিগের বাহুতে বলের সঞ্চার করিয়াছিল, যে শিক্ষাপ্রভাবে তাহারা ষষ্ঠ ও দশম গুরু ও বৃটিশ সেনানায়কদিগের নেতৃত্বে সমরক্ষেত্রে অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কালেও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তির অন্যতম আশ্রয়স্তম্ভস্বরূপ বিদ্যমান থাকিবে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কবিচন্দ্র-রচিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" নামক একখানি প্রাচীন কাব্যের নামমাত্র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের "সেকেন্দ্রা" একটি বিশেষত্বহীন কবিতা। পদ্যে ইতিহাস। কবিত্বের সৌরভ বোধ করি চুন-সুরকীতে চাপা পড়িয়াছে। "কবিরঞ্জন" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য সাধক-কবি রামপ্রসাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোনও নূতন প্রসঙ্গ

নাই। কবিরঞ্জনের কাহিনী অনেকবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং পুরাতনের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পৃথিবীর ইতিহাস" একটি চলনসই বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ, এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের "সে আমার —আমি তার" একটি মামুলি পদ্য। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, তাহার উপর অক্ষম অনুকরণের এক পোঁচ পাতলা 'পালিস'। কিন্তু সে 'পালিসে' কবির দারিদ্র্য ঢাকা যায় না। এমন করিয়া কবিতাকে ভেংচাইবার দরকার কি? আগে কাজ না থাকিলে লোকে 'জ্যেঠার গঙ্গাযাত্রা' করিত। এখন তাহার বদলে কবিতা লিখিবার রেওয়াজ হইয়াছে। কোনটা ভাল? শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষের "লুসাই জাতি" সুপাঠ্য। লেখক বোধ করি নূতন ব্রতী, এখনও ভাষার 'আড় ভাঙ্গে' নাই। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়" প্রবন্ধে বস্তু নাই। আমরা কিন্তু তাঁহার নিকট অনেক আশা করিয়াছিলাম। যোগেন্দ্র বাবুর রচনাটি ফাঁপা গোলার ন্যায় শূন্যগর্ভ। আশা করি, লেখক ভবিষ্যতে রাজকৃষ্ণ বাবুর বিস্তৃত জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের আশা সফল করিবেন। "সপত্নী" শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়ের রচিত একখানি উপন্যাস, ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। "কবিতা-গুচ্ছে" আদ্যোপান্ত 'সে আমার—আমি তার'। তদ্ভিন্ন আর কিছু খুঁজিয়া পাইবার যো নাই। কবিতার নামে অরুচি হইয়া গেল। বাল্যকালে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম,

> "নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্ল্লভা।
> কবিত্বং দুর্ল্লভং তত্র কীর্ত্তিস্তত্র সুদুর্ল্লভা॥"

এ দেশে তাহা খাটে না। এখানে 'নরত্ব' নিতান্ত দুর্ল্লভ বটে, কিন্তু কবিত্ব অত্যন্ত সুলভ। আর কীর্ত্তি,—'পরস্পর-কণ্ডূতি-নিবারিণী' সভার কল্যাণ হউক,—তাহারই বা অভাব কি? সুতরাং আশা করা যায়,—ভারত-উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই।

প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর "অহমদনগর" নামক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। বসু মহাশয় প্রবন্ধের 'কাঠামো' করিয়াই নিরস্ত হন, কখনও তাঁহাকে রঙ্গ ফলাইতে দেখি না। রচনাও প্রতিমার ন্যায়; অন্ততঃ 'একমেটে' না হইলে কেবল কাঠে খড়ে একটা 'আদল'ও পাওয়া যায় না। বিষয়গৌরবে ও তথ্যসম্পদে বসুজার প্রবন্ধগুলি প্রশংসনীয়। রচনার প্রসাধনের দিকে তাঁহার একটু দৃষ্টি থাকিলে "সোনায় সোহাগা" হইত। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্তের "জোহান কেপ্‌লার" একটি চলনসই জীবনচরিত। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "প্রহেলিকা" একটি ডিটেক্‌টিভের গল্প। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার "আদিকাব্য" প্রবন্ধে রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে সাতটি মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখকের নিজের সিদ্ধান্ত এ প্রবন্ধে নাই। পাঠক পরে তাহার পরিচয় পাইবেন। "পুস্তকরামের আড্ডা" কি বস্তু, বুঝিতেই পারিলাম না, রসগ্রহ ত দূরের কথা। "স্তম্ভিত" একটি কবিতা, কেন না, ছন্দে গ্রথিত। এ ক্ষেত্রে ছন্দ দেখিয়াই 'জন্তু' নির্ণয় করিতে হয়। আজকাল কবিতার অন্য লক্ষণ বা চিনিবার আর কোনও উপায় নাই। মারাঠা চিত্রকর ধুরন্ধরের অঙ্কিত "রাজা দুষ্মন্তের সভায় শকুন্তলা" চিত্রের কল্পনা ও চিত্রবস্তুর 'সংস্থান' প্রশংসনীয়; কিন্তু বেশবিন্যাসে মারাঠী পরিচ্ছদের প্রাধান্য অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এরূপ চিত্রে প্রাদেশিকতার আরোপ সমীচীন নহে। 'প্রবাসী'র চিত্র-ভাগ্য যেমন সুপ্রসন্ন, প্রবন্ধের ভাণ্ডার সেরূপ সমৃদ্ধ নহে। আশা করা যায়, চিত্রের ন্যায় রচনাও ক্রমে উৎকর্ষলাভ করিবে।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়;—হেমচন্দ্র-সংখ্যা। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্রের "অন্তর্দ্ধান" নামক অমিত্রাক্ষর কবিতাটি কবিবর হেমচন্দ্রের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত। 'অন্তর্দ্ধান' শোকের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাই বোধ হয় অর্থগ্রহ করিতে পারিলাম না। ছন্দের মন্ত্রই কবিতার প্রাণ নয়, প্রতিষ্ঠাপন্ন কবিরাও তাহা বিস্মৃত হন কেন, বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত "কাপুরুষতা"র প্রথমেই লিখিয়াছেন,—"ভারতবাসীর জন্য তিনি

(গ্লাড্‌ষ্টোন) কিছুই করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন, ভারতবাসী কাপুরুষ।" মহাজনের মুখে উচ্ছ্বাসের আবেগেও এমন কথার আরোপ করিতে নাই। সাধারণ পাঠক এই উক্তি সহসা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। গ্লাডষ্টোন ভারতবাসীকে কাপুরুষ ভাবিতেন, তাহার প্রমাণ কি? লেখক হয় ত অনুমানবলে এই অমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন। বীকন্‌সফীল্ড ও গ্লাডষ্টোন্‌,—কন্‌সার্ভেটিব্‌ ও লিবারেল্‌, ভারতবর্ষের পক্ষে উভয়ই সমান। তাহার কারণ, ইংরেজ জাতির চরিত্রগত স্বার্থপরতা। লিবারেল কন্‌সার্ভে-টিব দুই দল 'মহিষের শিঙ্গের মত বাঁকা' বটে, কিন্তু ভারতের সঙ্গে 'যুঝিবার বেলা একা', তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে শত শতবার প্রতিপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতবাসীর কাপুরুষ-তার নিন্দা করুন, সত্যের অপলাপ করিবেন না। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর "উত্তরাখণ্ড" সুখপাঠ্য। মহাভারতী বলেন,—"হরিদ্বারের পর্ব্বতমালা হইতে আরম্ভ করিয়া তিব্বতের মানসসরোবরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ উত্তরাখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।" এ প্রবন্ধে ভ্রমণকারী জলধরের ইন্দ্রজাল নাই। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "আশিষ" নামক কবিতাটি মন্দ নহে। এখনও 'প্রেম ও ফুলে'র সৌরভ আছে, একবারে 'উবিয়া' যায় নাই। "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা"র কণ্টকবনে এ যাত্রাও অনেকে বিচরণ করিতেছেন। দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। "প্রয়োজন-মনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে,"—ইহাঁদের উদ্দেশ্য কি? "মৌর্য্যবংশের উৎপত্তি" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর "পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ" উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা করিতে ভালবাসেন, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তীর "মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ" তাঁহাদের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "হেমচন্দ্র" সুলিখিত সন্দর্ভ। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে লেখক অসঙ্কোচে লিখিয়াছেন,—"কেবল সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাঁহারা কাব্য রচনা করেন, তাঁহারা বারবনিতাজাতীয় অধম শ্রেণীর কবি। যাঁহাদের কাব্যপাঠে হৃদয় সন্তোষের সহিত পবিত্রতা ও উন্নতি লাভ করে, দেবত্ব অনুভব করে, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহারাই কবি, দেবজাতীয়। কবি সরস্বতীর পুরোহিত, দেহ মনে শিব, সত্য, সুন্দর। কলুষ-কালিমার লেশমাত্র নাই, ব্রহ্মচারী, তপস্বী, যোগী। অনুভূতিতে গৃহী, ব্রতে সন্ন্যাসী। লোকরঞ্জন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্যকে দেবতা করা তাঁহার ব্রত। তিনি বৌদ্ধ নহেন, হৃদয় তাঁহার বিশ্বের অনুভূতিতে উচ্ছ্বসিত, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য লালায়িত। তিনি ব্রাহ্মণ—নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য তাঁহার জন্ম। শিক্ষায় দীক্ষায় বহুদিন ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিলে তাঁহার ব্রতসাধনের সক্ষমতা জন্মে। মিল্‌টনের এই আদর্শ ছিল।" ক্ষীরোদ বাবুর মতে, হেমচন্দ্র "নিজের অজ্ঞাতসারে চিরদিন মানবীয় উচ্চভাবের উদ্দীপনা ও উৎকর্ষে মনুষ্যকে দেবত্ব দিতে দেবদূতের ন্যায় চেষ্টা করিয়াছেন।" তাঁহার ন্যায় আমরাও স্বীকার করি,—"কামিনীর অঞ্চলপরায়ণ, চরণের অলক্তকলেহী রুগ্ন বঙ্গ কবিকুলে রৌদ্ররসে উদ্দীপিত হেমচন্দ্র একমাত্র বীর কবি।"

বান্ধব। জ্যৈষ্ঠ। যাঁহারা "আগুন ও আকাঙ্ক্ষা"র ভক্ত, শ্রীমদ্‌জ্ঞানানন্দ শর্ম্মার "অগ্নি আর অঙ্গার" তাঁহাদের ভাল লাগিবে। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাসের কৃত রঘুবংশের অনুবাদে যে প্রাঞ্জলতার প্রশংসা করিয়াছি, তাঁহার অনূদিত "শিশুপালবধে" তাহার অভাব দেখিতেছি। মাঘ কবির কাব্যের কাঠিন্যই কি ইহার কারণ? শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ "ব্রাহ্মণ সমস্যার" মীমাংসায় বলিয়াছেন,—"(১) বিনা আহ্বানে কাহারও দানপরিগ্রহ করিব না। (২) পরিবারপ্রতিপালনের ক্ষমতা না থাকিলে দারপরিগ্রহ করিব না। (৩) তপঃসাধনে যত্নশীল হইব। ব্রাহ্মণসন্তানগণ এই তিনটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তাহা পালন করিতে যত্নশীল হইলে, আবার এ দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আবার ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট আদর্শে সমগ্র হিন্দুজাতি গৌরবান্বিত হইবে।" শুধু ব্রাহ্মণ কেন, প্রতিজ্ঞা তিনটি সমভাবে সাধারণ মনুষ্যমাত্রেরই প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 'বাসু-দেব দত্ত' প্রবন্ধে, "কিরূপ ছুটাছুটি করিয়া, কিরূপ আকুপাঁকুর সহিত, কিরূপ প্রবলবেগে,

সহস্র সহস্র নদী নালা এই (গৌর-প্রেমের) স্রোতের সঙ্গে মিলিত হইয়া আপনাদিগকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া মিশাইয়া দিয়াছিল", তাহা বিবৃত করিয়াছেন। 'আকুপাকু' কি 'হোদল-কুঁতকুঁতে'র কনিষ্ঠ? শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সেন "ভারতে কিসের অভাব" প্রবন্ধে 'আর্য্যামি'র মামুলি প্রমাণগুলি সযত্নে উপস্থাপিত করিয়াছেন। "ক্রমশঃ" ভয়ের বিষয় বটে। "ছায়া-দর্শন" পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ। "সন্ধ্যা" কবিতাটি মন্দ নহে। বক্তব্য বিষয়ের অনুপাতে রচনাটি বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। আর একটু সংহত হইলে আরও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারিত। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার "বিষ্ণুমাহাত্ম্যে" বিষ্ণু দেবতার বিবর্ত্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের "দুয়ো-রাণী" পড়িয়া জানিলাম, প্রচলিত 'আটপৌরে' ভাষাই তাঁহার 'সুয়ো-রাণী'। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গদর্শনে" প্রবন্ধ লিখিয়া বলিতেছেন,—বাঙ্গালী! বাজে খরচ করিও না। নিজে এত কালী কলম কাগজ বাজে খরচ করিলেন কেন? উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত যে বেশী উপকারী, প্রবন্ধরচনার ঝোঁকে তাহা বিস্মৃত হইলেন।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। "কবি কালিদাস ও রঘুবংশে" শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রঘুবংশের অনুবাদ করিতেছেন। শিরোনামার সার্থকতা কি, বুঝিতে পারিলাম না।

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ। "পণ্ডিতে শুনিবে কথা সদসদ্বিচারে নিপুণ
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥ আগুনে পরীক্ষা হয় সোনার যে আছে গুণাগুণ।"

'বিশুদ্ধি' ও 'শ্যামিকার' অনুবাদ কি গুণাগুণ? এ অনুবাদ আমাদের মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস পদ্যে সমগ্র রঘুবংশের অনুবাদ করিয়াছেন। যদি কেহ আবার রঘুবংশের অনুবাদ করেন, তাঁহার নিকট অধিকতর উৎকর্ষের আশা করি। সত্যেন্দ্র বাবুর এই অনুবাদে সে আশা সফল হয় নাই। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাম-অনুগ্রহ নারায়ণের বিদ্যারম্ভ" বিহারের একটি সুচিত্রিত সমাজচিত্র। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রসুন্দর সান্যালের "ভারতীয় শিল্প" সময়োপযোগী সুপ্রবন্ধ—আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভাদুড়ী "শক্তি-তত্ত্বে" চণ্ডীর ব্যাখ্যা করিতেছেন। লেখকের লিপি-কৌশল ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে তাহাদের সাফল্য দেখিলাম না। শক্তি-তত্ত্বের এই ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক না রাজনৈতিক, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। সম্পাদিকার রচিত ও "বিগত বৈশাখী পূর্ণিমায় ভবানীপুর, কালীঘাট, বালিগঞ্জ ও বাগবাজারের বালক-সমাজ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত 'প্রতাপাদিত্য-উৎসবে' পঠিত "বাঙ্গালীর পিতৃধনে"র প্রারম্ভ এই,—"বঙ্গ-ভূমির বন, উপবন, নদী, প্রান্তর, সৈকত ও চত্বর, এমন তিন শত বৈশাখী পূর্ণচন্দ্রের সম্পূর্ণ আলোকে নীরবে প্লাবিত হইয়াছে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এমনই তিথিতে এক . যে মঙ্গলশঙ্খ যে তোপধ্বনি যে অভিষেকমন্ত্রের গম্ভীর রব বঙ্গাকাশকে পরিকম্পিত করিয়াছিল, বঙ্গমাতা তাহারই অনুকরণ, তাহারই প্রতিধ্বনির শ্রবণলালসায় আজ তিন শত বৎসর ধরিয়া নিদ্রায় প্রতীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কে জাগাইবে প্রতিধ্বনি? সে প্রথমাধ্বনির বার্ত্তা তাঁর কোন্ সন্তানের কর্ণকুহরে পৌঁছিয়াছে? কেহ ত শোনে নাই! কেহ ত জানে না।" এতকাল পরে 'ভারতী'র কুঞ্জে সেই তোপধ্বনি শুনিয়া পুলকিত হইয়াছি।

ধ্বজপূজা।

ধর্ম্মবৃত্তির বিকাশের সহিত উপাসনা প্রণালীর নিত্য সম্বন্ধ। বিকাশ যত পরিস্ফুট হইবে, উপাসনার প্রণালীও তত উন্নত হইবে। প্রাকৃত লোকে যাহা বুঝে না, তাহাকেই দৈব বলিয়া বিবেচনা করে। এ জন্য তাহার কাছে পদার্থমাত্রই দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষতঃ যে যত ভয়ানক, সে তত বন্দনীয়। প্রথম সমাজ ভয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক যে কিছু ব্যাবৃতি হইয়াছিল, সে ব্যাবৃত্তির একটি প্রধান কারণ ভয়। মানসিক বিকাশের সহিত ক্রমে উপাস্যের ভাবান্তর ঘটে। জড়ে তদধিষ্ঠাতা চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। পদার্থ চিন্ময়ের স্মারক হইয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্মবিকাশের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিচিত্র নহে।

প্রাচীন ভারতের পূজা ও উৎসবাদির কতকগুলি লুপ্ত ও কতকগুলি ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। শেষোক্তের অনেকগুলিকে উপাদান দ্বারা কখন কখন চিনিয়া লইতে পারা যায়। কখনও বা ভাবান্তরের আতিশয্য হেতু সম্পূর্ণ পৃথক জ্ঞান হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ধ্বজপূজা ও দেবোদ্দেশে ধ্বজদানপ্রথা চলিয়া আসিয়াছে। দেবপ্রাসাদের উপর ধ্বজদান, দেববিশেষের গৃহের ঈশান অথবা বায়ু কোণে সেই দেবের বাহনচিহ্নিত (১) ধ্বজ প্রোথিত না করিলে তথাকার পূজা হোমাদি সকলই বৃথা হইত। ঈদৃশ ধ্বজদান মহাদান

(১) দেবেভ্যশ্চ গৃহং দদ্যাৎ বাহনৈরুপশোভিতম্।
ভুরঙ্গমেন সূর্য্যস্য হরস্য বৃষচিহ্নিতম্॥
বিষ্ণবে গরুড়াঙ্কস্তু দুর্গায়ৈ সিংহচিহ্নিতম্।
কার্য্যং ধ্বজপতাকাঢ্যং অন্যথা ন কথঞ্চন॥

বলিয়া কীর্ত্তিত। ইহাতে মহাপাতক সকল আশু দগ্ধ হয়, এবং ইহা সর্ব্বকামফলপ্রদ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র ইত্যাদি সকল দেবের উদ্দেশেই কিঙ্কিণী-চামর-দর্পণোপশোভিত ধ্বজদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও যে কোনটির একেবারে অভাব হইয়াছে, বলিতে পারি না।

এগুলি প্রকৃতপক্ষে ধ্বজপূজা নহে। দেববিশেষের প্রীতির জন্য ধ্বজদান। যথার্থ ধ্বজপূজা আমরা শক্রধ্বজপূজায় দেখিতে পাই। অতি প্রাচীন গ্রন্থে এই পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌরাণিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে শক্রধ্বজ পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। "দেবরাজ ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ অসুর-রণে পরাজিত হইয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মাদেশ-ক্রমে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া নানা স্তবে তাঁহাকে প্রসন্ন করেন। বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রকে মাল্যছত্রঘণ্টাদিযুক্ত, শরৎসূর্য্যপ্রতিম, ভাবিজয়শংসী, দেদীপ্যমান এক দিব্য ধ্বজ প্রদান করেন। শচীনাথ সেই ধ্বজ লইয়া সমরে জয়লাভ করেন। অনন্তর ইন্দ্র সেই বেণুময় ধ্বজ চেদী-পতিকে প্রদান করেন। চেদীপতি যথাবিধানে ঐ ধ্বজের পূজা করায় দেবরাজ প্রীত হইয়া এইরূপ আদেশ করিলেন,—'যে নৃপ এইরূপ ধ্বজ পূজা করিবে, তাঁহার ধন বল শস্য বৃদ্ধি হইবে, এবং সে সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিবে। তাঁহার প্রজাগণ সর্ব্বদা আনন্দে থাকিবে। ভাদ্রমাসের সিতপক্ষের একাদশীতে ধ্বজযষ্টির অধিবাস করিবে, পরে দ্বাদশীতে মণ্ডল করিয়া ধ্বজরূপ বাসবের পূজা করিবে। প্রথমে যথাবিধি অচ্যুতের পূজা করিয়া পরে শক্রের বিশেষ পূজা করিবে।' দেবরাজের কনকময়ী, অন্যধাতুময়ী, অথবা দারুময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। অভাবে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি করিবার ব্যবস্থাও আছে।" শক্রধ্বজ-পূজায় হোতা, যজ্ঞ, দান ইত্যাদির উল্লেখ আছে। ছাগাদি পশু বলিদানের নিয়ম নাই। ক্রিয়ার সমস্ত অঙ্গই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন। পূজাটি সম্পূর্ণ বৈদিকী ক্রিয়া। সুতরাং শক্রধ্বজ পূজা যে অতি প্রাচীন, এবং বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এরূপ অনুমান অযুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণু ও ইন্দ্র বেদেরই দেবতা। এখানে দেখা যাউক, অধুনা ধ্বজপূজা কিরূপ ভাবে প্রচলিত।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা সাধারণতঃ তিন প্রকার ধ্বজপূজার কথা শুনিতে পাই ;—ইন্দ্রধ্বজ-পূজা, কপিধ্বজ-পূজা, এবং ধ্বজ-পূজা, বা বিষ্ণুধ্বজ-পূজা।

কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে তৃতীয় শ্লোকে শক্রধ্বজের উপমা

দিয়াছেন। (১) সূরি মল্লিনাথ ঐ শ্লোকের টীকায় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

চতুরস্রং ধ্বজাকারং রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠিতম্।
আহুঃ শক্রধ্বজং নাম পৌরলোকে শুভাবহম্॥
তথা, এবং যঃ কুরুতে যাত্রাং ইন্দ্রকেতোর্যুধিষ্ঠির :
পর্জ্জন্যঃ কামবর্ষী স্যাৎ তস্য রাজ্যে ন সংশয়ঃ॥

এই ইন্দ্রধ্বজ-পূজা রাজা ব্যতীত অপর কেহ করিতেন না। চতুষ্কোণ ধ্বজা রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃতিবর্গের হিতের জন্য পূজা করা হইত। ইন্দ্রধ্বজ-পূজায় দেবরাজ ইন্দ্রের তৃপ্তি, কালে সুবৃষ্টি, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা, সুতরাং প্রজাবর্গের সুখ।

বর্ত্তমান সময়ে মানভূম অঞ্চলে পঞ্চকোটে রাজা প্রতিবৎসর ইন্দ্রধ্বজ পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রচলিত রীত্যনুসারে কাশীপুর গ্রামে শরৎকালে শুক্লপক্ষে ইন্দ্রধ্বজের পূজা হয়। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে মাঠে একটি শ্বেতধ্বজা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর এই ধ্বজা পরিবর্ত্তিত হয় না। রাজা হস্তিপৃষ্ঠে অমাত্যগণ সহ তথায় গমন করেন। মহারাজের সাঁওতাল প্রজাগণ মাদল বাজাইয়া নৃত্য করে। সেই দিনের জন্যই তথায় মেলা হয়, এবং নানাপ্রকার আমোদ কৌতুক হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, কপিধ্বজ-পূজা, বা মহাবীর-পূজা। ইহা রামসেবক হনুমানের পূজা। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দুস্থানীরা এই পূজা করিয়া থাকেন। চট্টগ্রামে বালকদাস মোহান্তের বাড়ীতে প্রতি বৎসর কপিধ্বজ-পূজা হয়। ২০।২১ হাত উচ্চ একটি বাঁশে শ্বেত পতাকা সংলগ্ন। পতাকায় হনুমানের মূর্ত্তি অঙ্কিত। বাঁশ মন্দিরের দ্বারের বাম পার্শ্বে বা ঈশান কোণে প্রোথিত। প্রতিবৎসর পতাকা পরিবর্ত্তিত হয়। সাধারণতঃ, ভাদ্রের শেষে শুক্লপক্ষে কপিধ্বজ-পূজা হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষের কোনও তিথি বা অমাবস্যা পাইলে ভাদ্রের সংক্রান্তি হইতে আশ্বিনের ৪ঠার মধ্যে যে কোন দিনও পূজা হইতে পারে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিকামনাতেই রামভক্ত হনুমানের পূজা হয়। কপিধ্বজ-পূজায় সীতারামেরও অর্চ্চনা হইয়া থাকে। পূজা বিশেষ কোন আয়োজনসাপেক্ষ নহে। কদলী ও ঘৃতপক্ক সুজীর লাড্ডু হনুমানের

(১) পুরুহূতধ্বজস্যেব তস্যোন্নয়নপংক্তয়ঃ।
নবাভ্যুত্থানদর্শিন্যঃ ননন্দুঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ॥

বড় প্রিয় বস্তু। তাহাই পূজোপহারের প্রধান সামগ্রী। হিন্দুস্থানীদিগের কপিধ্বজ-পূজা একটি বিশেষ আমোদের ক্রিয়া।

তৃতীয়, ধ্বজ পূজা। চট্টগ্রামে ধ্বজপূজা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা বিষ্ণুর বা গদাধরের পূজা। ইহাকে বিষ্ণুধ্বজ-পূজা বলা যাইতে পারে। কার্ত্তিক মাস শুক্লপক্ষ পূজার সময়। রাসপূর্ণিমার পূর্ব্বের দ্বাদশী তিথিতে পূজা হয়। কেহ কেহ ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশীতেও পূজার ব্যবস্থা দেন। চট্টগ্রামের অনেক স্থানে ধ্বজপূজা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীতেই ইহা প্রচলিত। ইতর শ্রেণীর মধ্যে এই পূজা দৃষ্ট হয় না। এক অথবা চারি বৎসরের সংকল্প করিয়া ধ্বজ-পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এক বৎসরের সংকল্পে সেই বারে সেই বৎসরেই ব্রতপ্রতিষ্ঠা হয়। যাঁহারা চারি বৎসরের সংকল্প করেন, তাঁহারা প্রায়শঃ চতুর্থ বর্ষেই প্রতিষ্ঠা করেন। বৎসর বৎসরও প্রতিষ্ঠা করিতে কোন কোন স্থলে দেখা যায়। প্রতিষ্ঠার সময় বিশেষ আয়োজন ও দানাদি আবশ্যক। ধ্বজ-পূজা ব্যয়সাধ্য। উচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বসাধারণে ইহা করিয়া উঠিতে পারে না।

দক্ষিণদ্বারী বিষ্ণুমণ্ডপের বাম পার্শ্বে, সুতরাং ঈশাণ কোণে তুলসী-বাটিকার সমীপে দুইটি সুপারি গাছ প্রোথিত করা হয়। গাছ দুইটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে পাশাপাশি ভাবে অবস্থান করে। মধ্যে ব্যবধান ১॥০ হাত ১॥০ হাত হইবে। প্রোথিত সুপারি গাছের উচ্চতানুসারে ধ্বজ উত্তম, মধ্যম ও অধম, তিন প্রকার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় (১)। সাধারণতঃ অধম ধ্বজই দৃষ্ট হয়। গাছ দুইটি ১৮ হাত লম্বা রাখা হয়। দুই হাত মৃত্তিকায় প্রোথিত, উপরে ১৬ হাত লম্বভাবে অবস্থিত। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে ইহা অধম ধ্বজ অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ হ্রস্ব। ইহাকে অধম ধ্বজ ব্যতীত আর কোনও সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। গাছের শিরোভাগে একটিতে ত্রিশূল ও অপরটিতে বিষ্ণুচক্র বসান। শাস্ত্রে তাম্রজ চক্র দিবার ব্যবস্থা; বর্ত্তমানে লৌহচক্রই প্রদত্ত হয়। শিরোভাগের ১ হাত ১॥০ হাত নীচে একটি খিল গাছ দুইটিকে সংযুক্ত করে। ঐ খিলের ১ হাত ১॥০ হাত নীচে ঐরূপ আর একটি খিল। ১ম খিলে একটি ঘণ্টা ও শ্বেত চামর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় খিলের সহিত একখণ্ড শুভ্র নূতন বস্ত্র সংলগ্ন। ইহা দুই গাছের মধ্যে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত লম্বমান। এই দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ডই ধ্বজা। যাঁহাদের জন্য ধ্বজ-পূজা করা হয়, তাঁহাদের বিশ্বাস,

(১) উত্তম কেতু ৪২ হাত, মধ্যম ৩২ ও অধম ২২ হাত উচ্চ হইবে।

ধ্বজা বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া যতগুলি ধূলিকণা বিকীর্ণ করিবে, তত যুগ বা তত বৎসর স্বর্গবাস হইবে। ধ্বজা যত দিন পর্য্যন্ত আপনা-আপনি পচিয়া নষ্ট না হয়, ঐ ভাবেই থাকে। যাঁহারা চার বৎসরের সংকল্প করেন, তাঁহারা প্রতি বৎসর নূতন নূতন ধ্বজা প্রস্তুত করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ধ্বজা ঐ ভাবেই রাখিয়া দেওয়া হয়। গাছ দুইটির গোড়ায় দুইটি আম্রপল্লবাচ্ছাদিত সিন্দূর-পুত্তলি-যুক্ত মঙ্গলঘট দিতে হয়। ঘটদ্বয়ের মধ্যদেশ হইতে ১ হাত ১৷৷০ হাত দক্ষিণে কুসুমস্তবকে বিল্বপত্রাসনে শালগ্রাম শিলা স্থাপন করা হয়। কোন কোন স্থানে রজতপাতে শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি আঁকিয়া স্থাপন ও পূজা করিতে দেখা যায়। পুরোহিত উত্তরমুখ হইয়া পূজায় বসেন। ধ্বজ-পূজায় অন্যান্য দেবতারও অর্চ্চনা হয় বটে, কিন্তু বিষ্ণুই ইহার মূলদেবতা। বিষ্ণু ও বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী সরস্বতীরই বিশেষ পূজা হয়।

ধ্বজ-পূজায় চারি জন ব্রাহ্মণের আবশ্যক; গুরু, তন্ত্রধার, ব্রহ্মা ও পুরোহিত। গুরু—দীক্ষাগুরু, বা আচার্য্যগুরু। কেহ কেহ পুরোহিতকেই পূজা কার্য্যের হোতা জানিয়া গুরুর স্থানে বরণ করেন। তন্ত্রধার এক জন সংস্কারাপন্ন ক্রিয়াকুশল ব্রাহ্মণ, পূজার পুঁথি হস্তে রাখিয়া পুরোহিতকে মন্ত্র বলিয়া দেন। ব্রহ্মা এক জন ব্রহ্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ইনি সাক্ষিস্বরূপ যজ্ঞাগ্নির পর্য্যবেক্ষণ করেন। পুরোহিতেরা কেহ কেহ বলেন, ইনি পিতামহ ব্রহ্মার প্রতিনিধি। যজ্ঞপরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ইঁহাকে ক্রিয়াস্থলে অপেক্ষা করিতে হয়। পুরোহিত তন্ত্রধারের সাহায্যে পূজার সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহিত করেন।

ধ্বজপূজা সাধারণতঃ দিবাভাগে সম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠা-বর্ষে পূর্ব্ব রাত্রিতে অধিবাস, অষ্ট দিক্‌পালের অর্চ্চনা, বিষ্ণুর মহাস্নান ও একটি যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাত্রির যজ্ঞাগ্নি পরদিবস পূজাসমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত রাখিতে হয়। পরদিন ঐ অগ্নিতে যজ্ঞ ও দানাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া পূজাশেষে দক্ষিণান্ত করা হয়। ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বৈদিকী। ধ্বজপূজায় ছাগাদি বলিদানের কথা কোথাও শুনা যায় না। সাত্ত্বিক ভাবেই সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

ধ্বজপূজার প্রথমে যথাক্রমে গুরু, ব্রহ্মা, তন্ত্রধার ও পুরোহিতকে বরণ করিতে হয়। গুরু অর্চ্চিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা যজ্ঞাগ্নির রক্ষাকর্ত্তা, সুতরাং যজ্ঞশেষ পর্য্যন্ত তাঁহার উপস্থিতি আবশ্যক। যজ্ঞের জন্য বিশেষ কোন বেদীর আবশ্যক করে না। পূজাস্থানের সন্নিকটে শুদ্ধ ভূমিতে পঞ্চ বর্ণের চূর্ণ দ্বারা ঘর করিয়া শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার যজ্ঞের ন্যায় যজ্ঞ

করা হয়। তন্ত্রধার পূজা-পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত পুরোহিতকে সাহায্য করেন। তৎপরে ক্রমে ধ্বজবৃক্ষের অর্চ্চনা, অষ্টকলা মন্ত্রে দর্পণাদি দ্বারা শালগ্রাম শিলা অথবা গদাধর মূর্ত্তির স্নান, মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, গণেশ ও অষ্ট দিক্‌পালাদির অর্ঘ্যদান, অর্চ্চনা; পরে মূল পূজার আরম্ভ। পূজা প্রায় এক প্রহর কাল-ব্যাপী। পরে যজ্ঞ। যজ্ঞান্তে আন্তকুত্তোর ন্যায় শয্যা, পালঙ্ক, তৈজসাদি দান করিতে হয়। যাঁহারা চারি বৎসরের সংকল্প করেন, ৪র্থ বর্ষে তাঁহাদের যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।

ব্রাহ্মণ চারি জনকে দিবসে সংযম করিতে হয়। যাঁহার পূজা, তাঁহাকে দিবসে উপবাসী থাকিতে হয়। ধ্বজপূজা সাধারণতঃ পাপক্ষয় ও স্বর্গকাম-নায়ই করা হয়। অনেক স্থলে বিধবা স্ত্রীলোককে করিতে দেখা যায়। পরজন্মে এয়োত্বই ইঁহাদের প্রধান কামনা।

চট্টগ্রামের প্রায় সর্ব্বত্রই এই ধ্বজপূজা প্রচলিত। সাতকানিয়া (সহর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ), শিকারপুর (৬ মাইল উত্তর), চক্রশালা (১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম), নোয়াপাড়া (১০ মাইল দক্ষিণ) প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে ধ্বজপূজার কথা বিশেষ শুনা যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই তিন প্রকার ধ্বজপূজার পরস্পর সম্বন্ধ কি, এবং ইহারা সকলেই এক প্রাচীন শক্রধ্বজ-পূজার রূপান্তর কি না।

প্রথমতঃ, পূজার সময়। সময়ের অসামঞ্জস্যটুকু বাদ দিলে, তিন প্রকারের ধ্বজপূজাই ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। চট্টগ্রামের ধ্বজপূজা অধিকাংশ স্থলেই কার্ত্তিক মাসে রাসপূর্ণিমার পূর্ব্বের শুক্লা দ্বাদশীতে হইলেও, সময়ের পরিবর্ত্তন যে বিশেষ বিস্ময়কর ব্যাপার নহে, পূজার মূল দেবতার অনুসন্ধানে তাহার উপলব্ধি হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, মূল দেবতা। আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন শক্রধ্বজ-পূজায় বিষ্ণু ও ইন্দ্র, উভয় দেবতারই রীতিমত পূজা হইত; তবে ইন্দ্রের পূজা কিছু প্রকৃষ্ট রকমে হইত। আবার অচ্যুতের পূজা বাসবের পূজার পূর্ব্বে হওয়া চাই। শক্রধ্বজ-পূজার ইতিবৃত্তানুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, চেদীপতি যে ধ্বজপূজা করেন, তাহা ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন, এবং ইন্দ্র বিষ্ণুর নিকট প্রাপ্ত হন। সুতরাং, প্রাচীন শক্রধ্বজ-পূজার পূর্ব্বে বিষ্ণুর পূজা, পরে ইন্দ্রের পূজার ব্যবস্থা। সাক্ষাৎসম্বন্ধে চেদীপতি ইন্দ্রের নিকট হইতে ধ্বজ প্রাপ্ত হন, তাই ইন্দ্রের পূজা কিছু প্রকৃষ্ট রকমের। অতএব, বিষ্ণু ও ইন্দ্র, উভয়কেই

প্রাচীন শক্রধ্বজ-পূজার মূল দেবতা বলা যাইতে পারে। অবশ্য, অন্যান্য দেব ও দিক্‌পালগণও অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতেন। অধুনা এই মূল দেবতা দুইটি পৃথক হইয়া বর্ত্তমান ইন্দ্রধ্বজ-পূজায় ইন্দ্র মূল দেবতা ও বিষ্ণুধ্বজ-পূজায় বিষ্ণু মূল দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বর্ত্তমানে চট্টগ্রামে যে ধ্বজপূজা প্রচলিত, তাহাতে বিষ্ণু বা গদাধরই মূল দেবতা। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দিক্‌পালদিগের অর্ঘ্যদান ও সাধারণ প্রকার অর্চনা করা হইয়া থাকে। যখন বিষ্ণু ধ্বজপূজার মূল দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন বিষ্ণুপ্রেমবিকাশের আদর্শস্থলরূপা ষোলকলারসপূর্ণা রাস-পূর্ণিমার সহিত বিষ্ণুধ্বজোৎসবের সময়ের সম্বন্ধ রাখা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ইন্দ্রধ্বজ-পূজায় ইন্দ্রকেই মূল দেবতা করা হইয়াছে। এবং এরূপ প্রথা মহাভারতের পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা মল্লিনাথের উদ্ধৃত বচনে বুঝা যায়। অবশ্য, বর্ত্তমান ইন্দ্রধ্বজ-পূজায় গণেশ, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেব ও দিক্‌পালগণকে অর্ঘ্যদান করা হইয়া থাকে।

পরে, কপিধ্বজ-পূজা। ইহা বিষ্ণুধ্বজ পূজার রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপ্রীতি-কামনাই বিষ্ণুধ্বজ-পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহার ফল পাপক্ষয় ও স্বর্গলাভ। (বিধবাগণ যে পরজন্মের এয়োত্বের কামনায় করেন, সে কথা পরে বলিব)। কপিধ্বজ-পূজাতেও তাহারই কামনা। রামভক্তের প্রীতিতে রামের প্রীতি। একে, বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় বিষ্ণুরই পূজা; অন্যে, ভক্তের প্রীতি জন্মাইয়া ভক্তির পাত্রের, ভগবানের প্রীতিলাভের জন্য, ভক্তের পূজা। শাস্ত্রে ভক্ত ও ভক্তির, উপাসক ও উপাস্যের একত্ব প্রতিপাদনে অনেক যুক্তি আছে। সুতরাং, ভক্তির উপাসনা হইতে ভক্তের উপাসনায় নামিয়া আসা অযৌক্তিক বা অসম্ভব ব্যাপার কিছুই নহে। ভগবানের প্রীতিকামনায় তদ্‌ভক্তের পূজা বর্ত্তমানে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

অপর কথা, বিষ্ণুধ্বজ-পূজায় বিধবাগণ পরজন্মে এয়োত্বের কামনা করেন। পুরাণ-অনুসন্ধানে আমরা দেখিতে পাই, পুরাকালে কুমারী কন্যা-গণ উপবাসিনী থাকিয়া সুগন্ধ পুষ্প নৈবেদ্যাদির দ্বারা সিংহবাহনচিহ্নিত ধ্বজ প্রোথিত করিয়া, শুক্লা নবমী তিথিতে কন্যারূপা সিংহবাহিনী শূলিনীর পূজা করিতেন। এই ধ্বজপূজার প্রধান কামনা বিদ্যাধরতুল্য সুপতিলাভ। কুমারীর সুখের ছবি অদূরেও কথঞ্চিৎ প্রকাশমানা, তাই তাহার বর্ত্তমানে সুপতির

কামনা। বিধবার সুখচ্ছবি বিধাতা এ জন্মের মতন মুছিয়া ফেলিয়াছেন; তাহাকে শারীরিক মানসিক সকল প্রকার যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত করিয়াছেন। তাই সে ভবিষ্যের গাঢ় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া, পরজন্মে যেন ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, তাহাই প্রার্থনা করে; ঐশ্বর্য্য বিলাসের কথা তখন তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না।

অতএব, প্রাচীন শক্রধ্বজ-পূজা রূপান্তরিত রূপে বর্ত্তমান ইন্দ্রধ্বজ-পূজা, ধ্বজপূজা, (বিষ্ণুধ্বজ-পূজা) ও কপিধ্বজ-পূজায় বিরাজ করিতেছে, এরূপ অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগেরা ধ্বজপূজা করিয়া থাকেন। বৈশাখ, আষাঢ়, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের পৌর্ণমাসীতে, ১৭।১৮ হাত উচ্চ একটি বাঁশে শ্বেত পতাকা সংলগ্ন করিয়া প্রোথিত করা হয়। ঐ ধ্বজ-যষ্টির পাদদেশে পূর্ণ কুম্ভ রাখিয়া ও মোমের বাতি জ্বালাইয়া বুদ্ধদেবের উদ্দেশে ধ্বজের অর্চ্চনা করা হয়। রাউলীরা পূজা করে। পূজার সময় ধ্বজের মূলদেশে জলসেক করা হয়। যাঁহারা বিষ্ণুধ্বজের পূজা করেন, তাঁহাদের যেমন বিশ্বাস, ধ্বজ যত ধূলিকণা বিকীর্ণ করিবে, তত যুগ বা বর্ষ স্বর্গবাস হইবে, বৌদ্ধদিগেরও তেমনই বিশ্বাস, ধ্বজ যত বায়ুবেগে অন্দোলিত হইবে, তত পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে থাকিবে। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, ধ্বজপূজা বৈদিকী ক্রিয়া, এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। সুতরাং, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক পূর্ব্বের। অতএব, বৌদ্ধগণ ইহা হিন্দুদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, বলিতে অপেক্ষা কি?

হিন্দুদিগের বর্ত্তমান অনেক পূজা, পর্ব্ব ও উৎসবের জনয়িত্রী বৌদ্ধধর্ম্ম। এ বিষয়ে বহুল প্রমাণ আছে। কিন্তু বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের প্রাচীন কোন পূজা উৎসবাদি গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায় দেখা যায় না। ধ্বজ-পূজা যে এ বিষয়ের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, তাহা অস্বীকার করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। নূতন ধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় পূর্ব্ব ধর্ম্মের সহিত বিবাদ, মধ্য অবস্থায় সামঞ্জস্য, শেষাবস্থায় একীকরণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা দেখিতেছি। খৃষ্টধর্ম্মে ইহা দেখিয়াছি। প্রাচীন পৌষপার্ব্বণ খৃষ্টমাসে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে ইহা না হইবে কেন?

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত।

নিমাইর সন্ন্যাস-পটি

দ্বাদশ খণ্ডের ৬ষ্ঠ সংখ্যক "সাহিত্যে" শীর্ষোক্ত নামধেয় একখানি প্রাচীন ক্ষুদ্র পুঁথির বিবরণ পাঠকগণের গোচরীভূত করিয়াছি। সেই পুঁথিখানি সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষের রচিত, এবং তাহার অপর নাম "গৌরাঙ্গচরিত।" ইতিমধ্যে "নিমাইর সন্ন্যাস-পটি" নামক আর একখানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই পুঁথিখানি আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র; কেবল তিনটি পত্রে সমাপ্ত। সমগ্র পদের সংখ্যা ৯৫ মাত্র। "সন ১২৪৮, বাঙ্গলা তারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ, শ্রীরামহরি দে" কর্ত্তৃক এই প্রতিলিপিটি লিখিত হইয়াছে। এই লেখকের নিবাস অজ্ঞাত হইলেও, তিনি যে চট্টগ্রাম-বাসী, তাহাতে আমাদের সংশয় নাই।

পুঁথিখানি কাহার লেখনীপ্রসূত, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই।

চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত হইলেও, এই গ্রন্থখানি যে চট্টগ্রামী সম্পত্তি নহে, তাহার প্রমাণ পুঁথিতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সন্ন্যাস-পটিতে যে প্রকারের ক্রিয়া, বিভক্তি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা কখনও চট্টগ্রামে প্রযুক্ত হইত, এরূপ বোধ হয় না। তদ্ভিন্ন চট্টগ্রামে চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তারিত করিতে পারে নাই বলিয়া, এখানে বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রসার নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। যে কয়েক জন হিন্দু ও মুসলমান বৈষ্ণব কবি আমাদের গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের উৎপত্তিস্থল আজও নির্ণীত হয় নাই, এবং তাঁহাদের সংখ্যাও অন্যান্য দেশের কবি-সংখ্যার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এরূপ অবস্থায় এই পুঁথিখানিকে চট্টগ্রামী সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা যায় না। যাহা হউক, মালী যিনিই হউন না কেন, আমরা যে এই বনফুলের সুগন্ধি মালা হইতে বঞ্চিত হই নাই, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

"গৌরাঙ্গচরিতে" যাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই পুস্তিকায় তাহাই অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে; অর্থাৎ, গৌরাঙ্গ-দেবের সন্ন্যাস-

যাত্রাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। সন্ন্যাসে সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, সুতরাং সে দৃশ্য যে অতিশয় করুণরসাত্মক, তাহা আর বলিতে হইবে কেন ? যে সঙ্কীর্ত্তনছন্দের মধুর ঝঙ্কারে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেইরূপ পীযূষ-বর্ষী ছন্দেই বিরচিত। শচীদেবীর করুণ ক্রন্দনে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় শোকের উদ্রেক হয়। জীবনের ধ্রুবতারা-সদৃশ পুত্ররত্নে বঞ্চিত ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। বৈষ্ণব-সাহিত্যের মত মর্ম্মস্পর্শী জিনিস বঙ্গ-সাহিত্যে আর নাই। ইহার রচনা প্রাচীন ধরণের হইলেও কোমল ও মধুর। এত ক্ষুদ্র গ্রন্থ লইয়া আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া নিম্নে আমরা পাঠকগণকে কতকটা নমুনা প্রদর্শন করিতেছি :—

"একদিন ভারতী গোঁসাই শচীমাতার মন্দিরে আসিল।
ভারতীরে দেখি রাণী ডণ্ডবত (দণ্ডবৎ) কৈল॥
সেই দিন ভারতী শচীর মন্দিরে রহিল।
কিনা মন্ত্র কর্ণে দিআ নিমাই সন্ন্যাসী করিল॥ ধু।

কিনা মন্ত্র কর্ণে দিল।
নিমাই চান সন্ন্যাসী হৈল॥

প্রভাতে ভারতী গোঁসাই গমন করিল।
তান পাছে নিমাই চান্দ হাটিতে লাগিল।
ধাইয়া জাইআ শচীমাতা নিমাইকে ধরিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে কহিতে লাগিল॥
সন্ন্যাসী না হৈঅ বাছা বৈরাগী না হৈঅ।
অভাগিনী মাএর প্রাণ বধিআ না যাইঅ॥ ধু।

যদি নিমাই ছাড়িয়া জাবে।
ছেল হৈআ বুকে রবে॥

বৈশাখ মাসে তুলসীরে দিয়াছিলাম ঝাড়া।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীপূজা কর‍্যাছিলাম সারা॥
আর জথ ব্রাহ্মণেরে দিয়াছিলাম আম।
সেই পুণ্যে পাইয়াছিলাম দূর্ব্বাদলশ্যাম॥

*　　*　　*

ব্রাহ্মণকে দিআছি সোণা।
সেই পুণ্যে পাইয়াছি তোমা।

সন্ন্যাসী হইবেক বাপু তার অধিক নাই।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপাই (উপায়)॥ ইত্যাদি।

নিমাইচাঁদ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ডোরকৌপীন গ্রহণ করিবার জন্য গুরুর আদেশে মস্তকমুণ্ডন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে—

যখনে মস্তকে মধু ক্ষুর উঠাই দিল।
প্রভু প্রভু করি নিমাই কান্দিতে লাগিল॥
আর না যাইব আমি গয়া বারাণসী।
আর পিণ্ড নাহি দিব পুরুষ প্রকাশি॥ ধু।
আমি কুলেতে জন্মিলাম ছার।
না শুধিলাম মায়ের ধার॥

নিমাইর সংসারাসক্তির শেষ চিহ্নটুকু দেখিয়া মনে যে কিরূপ ভাবোদয় হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। জগতের সকল মায়াপাশ ছিন্ন করিতে যাঁহার হৃদয়ে তিলমাত্র বেদনা জন্মে নাই, আজ মাতৃদেবীর কথা মনে উদিত হইবামাত্র তাঁহার কি দারুণ কষ্ট!

পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে, গৌরাঙ্গ-চরিত ও রাধিকার মান-ভঙ্গেও এইরূপ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন সুন্দর ছন্দের ব্যবহার অধুনা অপ্রচলিত হইল কেন?

গীতের সুরে এই গ্রন্থ পঠিত হইত বলিয়া বোধ হয় পয়ারের চরণে অক্ষর-সংখ্যা কেবল চতুর্দ্দশে পরিমিত নহে। তাহা অনেক স্থলে বিংশতি সংখ্যা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অসমাপিকা 'য়'-যুক্ত ক্রিয়াগুলি সর্ব্বত্রই 'য'-ফলা দিয়া লিখিত দেখা যায়। অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়াগুলিতে কোথাও 'অ,' কোথাও বা 'য়' ব্যবহৃত হইয়াছে। আর আর বিষয়েও প্রাচীন সাহিত্যের নিয়মাদি অক্ষুণ্ণ আছে।

শ্রীআবদুল করিম।

শেষ কয়টা দিন।

ফটিক চক্রবর্ত্তীর জীবন-ইতিহাসের শেষ কয়টা দিন স্বাভাবিক সরল রেখা ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাব অবলম্বন করিয়াছিল। প্রাণিজগতে ইহা নূতন নহে। দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে চঞ্চল হয়, নদ-নদী জলধির সহিত মিশিবার পূর্ব্বে একটা বেতর আকার ধারণ করে। একটা অস্তিত্ব অন্য অস্তিত্বে বিলীন

হওয়া কখনই সহজ ব্যাপার নহে। সেই মিলনের আলিঙ্গন, হৃদয়ের আবাহন, চিরজীবনবাহী শোকদুঃখ ও মায়ার উচ্ছ্বাস, সকলই অপূর্ব্ব! এত কেন?

অবশ্য, এটা কাহাকেও অধিক বুঝাইতে হয় না। ক্ষুদ্র মহানের সহিত মিলিত হয়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র থাকিয়া যায়। ক্ষুদ্র চলিয়া যায়। এরূপ যাওয়া আসা মায়াক্ষেত্রের প্রথা। এ বিধান কঠিন। হৃদয় উৎপাটিত হইলেও ইহা অচল, এবং অবশ্যম্ভাবী।

তাই, যখন ফটিক চক্রবর্ত্তী প্রায় বৃদ্ধাবস্থায় শ্রাবণের বারিধারার মধ্য দিয়া গৃহের দিকে চাহিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল যে, কালের পরীক্ষা সম্মুখে।

রোহিত মৎস্যের মুড়া খাইয়া ফটিকচন্দ্রের কেশগুলি বেশী পাকিতে পায় নাই। সেকালের লোকের শত বর্ষ পরমায়ু ছিল, সে হিসাবে ফটিকচন্দ্রের জীবনসূর্য্য মধ্যাহ্ন পার হইতেছিল মাত্র। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ক্ষুদ্র ফটিকচন্দ্রকে একটা মহান্ কিছু বারংবার আকর্ষণ করিতেছিল। সে আকর্ষণের আভাষ প্রায় দুই বৎসর অবধি ফটিক পাইতেছিলেন। আজি যেন বোধ হইল, আবার সেই আকর্ষণকারী ধীরে ধীরে খিড়কীদ্বার দিয়া ফটিকের দেহমন্দিরে আসিয়া উঁকি মারিতেছে। ফটিকচন্দ্র ভাবিলেন, "কি জঞ্জাল!" কিন্তু মন্দির আমূল কম্পিত হইতেছিল।

ফটিক চটিয়া বলিলেন, "আপনার কি সময় অসময় নাই?"

আগন্তুক ধীরে ধীরে বলিলেন "তোমার সময় হইয়া আসিয়াছে। যিনি জগতের স্বামী, করুণাময় বিশ্বপালক, তিনি তোমাকে ডাকিয়াছেন। তোমার আনন্দের দিন সন্নিকট।"

"পরম সৌভাগ্য! পরম সৌভাগ্য!" বলিয়া ফটিকচন্দ্র আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিলেন। সুশীতল জল আনিয়া আগন্তুকের চরণযুগল ধৌত করিতে নিযুক্ত হইলেন। ফটিকচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে-ছিল।

আগন্তুক। তুমি এত কাঁপিতেছ কেন? ফটিকচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, লোকটা সোজা নয়। এ মহানের দূত। ইহার সহিত চালাকী খাটিবে না।

ফটিক। আপনার পদপ্রান্ত দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, তাহাতে আমার মুখ দেখিতে পাইতেছি। এটা যেন কেমন কেমন, তাই আমার ভয় হইতেছে।

আগন্তুক। তোমার দেহ বন বাদাড় আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। আমাকে

এইরূপ আবর্জ্জনার মধ্য দিয়া আসিতে হয়। তোমরা যদি শরীরটা পরিষ্কার রাখিতে, তবে আমাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। দেখ ত!

আগন্তুক চরণ তুলিয়া দেখাইলেন। ফটিকচন্দ্র দেখিলেন, আগন্তুকের পদপ্রান্তে লক্ষ লক্ষ কীট ও কৃমি জোঁকের মত বসিয়া গিয়াছে।

আগন্তুক। এ সব তোমার দেহের। আমার সহিত স্বর্গে পঁহুছিবার পূর্ব্বে তোমাকে এইগুলি যত্নপূর্ব্বক ছাড়াইতে হইবে।

ফটিকচন্দ্র। এ পরিশ্রম ত সোজা নয়।

আগন্তুক। মোটেই না। ওটা ডিক্রীজারির খরচা।

ফটিকচন্দ্রের ত্রাস ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ফটিক। হঠাৎ ভগবান্ আমাকে দয়া করিয়া এ সময় ডাকিলেন কেন? এই ভরা শ্রাবণ মাস, আর পথটাও বোধ হয় জলাকীর্ণ—অন্ততঃ মেঘে পরিপূর্ণ, ইহার মধ্যে—

আগন্তুক। তোমার সে বিষয় ভাবিতে হইবে না। আমার সঙ্গে ওয়াটার-প্রুফ আছে।

ফটিকচন্দ্রের শরীর ক্রমশঃই হিম হইতে লাগিল, হস্ত পদ অবশ হইয়া আসিল। অতি কষ্টে বলিলেন—"মহাশয় যদি দয়া করিয়া কিছু দিন সময় দেন, তবে একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলি। উৎখাতের পূর্ব্বে যে কি কষ্ট হয়, তাহা জানেন ত? একটু দয়া করুন। এই পউন আপনার প্রাপ্য।"

আগন্তুক দশটা টাকা লইয়া বলিলেন, "তথাস্তু।"

মহানের দূত সেই উৎকোচের দশ টাকা গ্রামের কোন দরিদ্র পরিবারকে দান করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ফটিকচন্দ্র আপাততঃ কয়টা দিনের জন্য প্রাণ পাইয়া প্রথমতঃ গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

গৃহিণী দেখিলেন, ফটিকের মুখ বিবর্ণ! ফটিক চারি দিকে চাহিয়া ব্যঞ্জনবর্ণে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার সময় উপস্থিত! "এবার নিশ্চয়!"

গৃহিণী ভাবিল, কি জঞ্জাল! (বাস্তবিক ফটিকচন্দ্রের সময় অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; এখন "একসটেন্সন" ভোগ করিতেছিলেন মাত্র)। ইহার জন্য এত ব্যাকুলতা কেন?

"রেখে দাও তোমার চালাকী!" বলিয়া গৃহিণী ফটিকের জন্য রোহিত মৎস্যের মুড়া রাঁধিতে গেল।

ফটিকচন্দ্র স্নান করিয়া লেপ মুড়ি দিলেন। আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু ফটিকচন্দ্রের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। ফটিক ভাবিতেছিলেন, মৃত্যুটাকে ফাঁকি দেওয়া যায় কিরূপে।

এরূপ স্থলে স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে হিতে বিপরীত হয়। অতএব গৃহিণীর পরামর্শ গ্রহণ করা বিধেয় নহে, তাহা ফটিক ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু স্ত্রী ও পুত্র ছাড়া ফটিকচন্দ্রের কেহই ছিল না। ফটিকচন্দ্র হতাশ হইতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, খাওয়া দাওয়ার পর পুত্রের সহিত পরামর্শ করিবেন।

ফটিক-তনয় হেমাংশু শিক্ষিত যুবক। এণ্ট্রেন্স পাস্ করিয়া কলেজে পড়িত। ফটিকের সংস্থানের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি, হেমাংশু তাহার উত্তরাধিকারী। হেমাংশু মাতার আদরের সন্তান। উভয়েই কর্ত্তব্যজ্ঞান-চালিত হইয়া কর্ত্তা ফটিকচন্দ্রকে জীবনপথে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। অহিফেন, দুগ্ধ ও রোহিত মৎস্যের প্রভাবে ফটিক দেহ বজায় রাখিয়া মনটাকে ঈশ্বরের চরণে সঁপিবেন,এমন সময় পূর্ব্বোক্ত বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়া পড়িয়াছিল।

হায়! হায়! কিছু অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে ফটিকচন্দ্র অনায়াসে ঈশ্বরপরায়ণ হইতে পারিতেন। কিন্তু এ কয়টা দিনে কি হইবে? গুছাইয়া লইতে লইতেই সপ্তাহ কাল কাটিয়া যাইবে, ঈশ্বরপরায়ণ হইবার সময় কই? ফলে হয় ত নরক। "কে জানে মা তারা! তুমিই জান।" ইহাই ভাবিয়া ফটিকচন্দ্র রন্ধনশালানিঃসৃত মৎস্য ভাজার শব্দ শুনিলেন।

একটা মুলতবির দরখাস্ত দিলে হয় না কি?

না, চালাকী খাটিবে না। ডাক্তারের "হেল্‌থ সার্টিফিকেট্" দিলেও উপায় নাই। কালের টান বিষম টান্।

গৃহিণী ভাত বাড়িয়া আনিলে পিতা পুত্রে খাইতে বসিলেন। ফটিকচন্দ্র মুড়া খাইলেন না।

গৃহিণী। ও কি! আমার মাথা খাও—

ফটিকের মরণচিন্তায় ঘোর অগ্নিমান্দ্য হইয়া আসিয়াছিল।

ফটিক। আমার হজম হইবে না।

গৃহিণী। তবে আমার মাথাটা খাইবে?

ফটিক। মরিলে কি কেহ সঙ্গে যায়? যখন তাহাই জান, তখন মাথার দিব্য দিয়া ফল কি?

হেমাংশু। মরিলে কেহ সঙ্গে যায় না সত্য, কিন্তু মরাটা কিছুই না

ওটা একটা ভ্রমমাত্র। বিজ্ঞান বলেন, আপনার দৈহিকস্ফুরণ যত দূর সম্ভব হইয়া গিয়াছে ; এখন আপনার দ্বারা সৃষ্টির কোন কার্য্য হইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে পরমাণুসমষ্টি শিথিল হইয়া মূল উপাদানে মিশিয়া যাইবে।

ফটিক। তবে আমি কি অপদার্থ ?

গৃহিণী ফটিকের মুখে ক্রোধের আভাস পাইয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা! তুই থাম্, লেখাপড়ার কথা কি সকলে বুঝে ?"

ইহাতে ফটিকচন্দ্রের ক্রোধ প্রশমিত না হইয়া বরং বাড়িয়া গেল।

হেমাংশু গম্ভীরভাবে বলিল, "বিজ্ঞান না পড়িলে এ সব বুঝা শক্ত।"

ফটিকের মস্তকে একটা কুরুক্ষেত্রের মত আন্দোলন হইয়া গেল। নিমিষের মধ্যে ফটিকচন্দ্র বলিয়া ফেলিলেন, "হারামজাদা ব্যাটা! তুই দূর হ।"

তাহার পর উভয় পক্ষ হইতেই তুমুল শব্দ, এক পক্ষ হইতে পটাপট চটির ধ্বনি ও ক্ষুদ্র পক্ষ হইতে ঘোর আস্ফালন।

গৃহিণী রমণীস্বভাবসুলভ কোমলতায় আচ্ছন্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

মার খাইয়া হেমাংশু ভাবিল যে, পিতার মস্তিষ্কের অবস্থা খারাপ। অতএব তাঁহার মরণের আশঙ্কা অমূলক না হইতে পারে।

গৃহিণী স্বামীর শারীরিক ও মানসিক বলবীর্য্যের আভাষ পাইয়া বেশ বুঝিল যে, কর্ত্তার আপাততঃ বিলীন হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প।

স্বয়ং কর্ত্তা ফটিকচন্দ্রের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতেছিল।

সন্ধ্যাকালে অতুল ডাক্তার ফটিকচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলেন। ডাক্তার ফটিকচন্দ্রকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুভয় মানসিক বিকারমাত্র।

কিন্তু ফটিকচন্দ্রের পক্ষে ও জগতের পক্ষে আপাততঃ বিকার হইলেও, মৃত্যু নামক ঘটনা যে মিথ্যা হইবার নহে, তাহা নিশ্চয় ; এবং মৃত্যুভয় কিছু নিন্দনীয় ব্যাধি নহে ; অতএব সে ব্যাধির প্রতিকার করা ডাক্তারের নিতান্ত কর্ত্তব্য। সত্য ব্যাধিও রোগ, মিথ্যা ব্যাধিও রোগ।

অতএব অতুল ডাক্তার প্রথমতঃ আশ্বাসরূপ ঔষধে রোগের গোড়া মারিতে চেষ্টা করিলেন, এবং এ বিষয়ে গৃহিণী ও ফটিকতনয় সম্পূর্ণ যোগ দিলেন।

ডাক্তার। ফটিক বাবু! আপনি মান্য গণ্য একটা লোক। অবশ্য জানেন, সকলকেই মরিতে হইবে। আপনারও সময় আসিবে, তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য।

ফটিক। তাহা ত আছি।

ডাক্তার। দ্বিতীয়তঃ, আপনি জগতে চিহ্নস্বরূপ সুশিক্ষিত একটি পুত্র-সন্তান রাখিয়া যাইতেছেন। আপনার স্নেহ, উদার চরিত্র, দানশীলতা প্রভৃতিও সর্ব্বসাধারণের মনে অঙ্কিত থাকিবে। জগতে জীব স্মৃতি রাখিয়া যায় মাত্র। যাহাতে সেটা ভালরূপে থাকিয়া যায়, তাহাই আপনার ন্যায় বুদ্ধিমানের আপাততঃ ভাবনার বিষয়।

ফটিক। তার পর?

ডাক্তার। অতঃপর মৃত্যুভয় স্বাভাবিক, কিন্তু তজ্জন্য অধীর হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। আপনার বিশেষ কোনও ব্যাধি দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু মৃত্যুর আশঙ্কা সমধিকভাবে প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে, হৃদ্‌যন্ত্রের কোন অংশে দোষ ঘটিয়াছে।

ফটিক। যদি তাহাই হইয়া থাকে, আমাকে এমন একটা ঔষধ প্রদান করুন, যাহাতে আপাততঃ মৃত্যুটা স্থগিত থাকিতে পারে।

অতুল ডাক্তার যথাবিহিতরূপে একটা ঔষধের বিধান করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রাবণের বারিধারা আবার ধরণী ভাসাইতে লাগিল। ফটিকচন্দ্রের হৃদ্‌যন্ত্র ও স্নায়ুর ক্রিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চক্ষু ক্রমশঃ রক্তবর্ণ হইয়া কোটরে ঘুরিতে লাগিল। গৃহিণী যথাসাধ্য একবার সম্মুখীন ও একবার অন্তর্হিত হইতে লাগিল। পুত্র হেমাংশুশেখর কোনও বন্ধুর বাটীতে আশ্রয় লইল।

গভীর নিশীথে ফটিকচন্দ্রের দুর্ভাবনা বাড়িল। কথাটা এই, "যদি মরিতে এত ভয়, তবে সাহস করিয়া জন্মিয়াছিলাম কেন?" কিংবা, "যদি জন্মিতে ভয় হইয়াছিল, তবে মৃত্যুকে সানন্দে আলিঙ্গন করি না কেন?" কোনও সমস্যার সমাধান হইল না।

কথাটা এই দেহ লইয়া। এই দেহটা অল্পে অল্পে যদি খসিয়া পড়িত, তবে বোধ হয়, মৃত্যুটা সহিয়া যাইত। অন্য কথা সংসার লইয়া। যদি সংসারটার মায়া অল্পে অল্পে জীবদ্দশায় চলিয়া যাইত, তবে মৃত্যুযন্ত্রণা বোধ হয় অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত।

হায়! হায়! কতকগুলা বস্তু জড়ীভূত হইয়া এই জীবনটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে! ইহার উপায় কি?

ঔষধ আসিলে ফটিকচন্দ্র পান করিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। গৃহিণী সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেও ফটিকের ভাল লাগিল না। দেহটাই যদি ছাড়িতে হয়, তবে হাত বুলাইয়া সেটার গৌরব বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে ফটিক হাত পা ছুড়িতে লাগিলেন।

কোনও রকম সুবিধা না পাইয়া গৃহিণী নিদ্রিতা হইল। ফটিকচন্দ্র বাহিরে গেলেন, এবং চাহিয়া দেখিলেন :—

তখন আকাশ পরিষ্কার। লক্ষ লক্ষ তারকা আকাশে জ্বলিতেছে, এবং সন্ সন্ শব্দে বাতাস বহিতেছে।

৪

ফটিকচন্দ্রের পিতা ৺গোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাণপুরে গোমস্তাগিরি করিতেন। বিদ্রোহের সময় শেঠীগণ কাণপুর হইতে চম্পট দিলে গোকুলচন্দ্র যত্নপূর্ব্বক গোটাকতক বহুমূল্য রত্ন-আভরণের বস্তা সংগ্রহ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

সেই বস্তাগুলি কলিকাতায় বিক্রয় করিয়া গোকুলচন্দ্র দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুই লক্ষ টাকায় একটা সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বক্রী দশ লক্ষ টাকা সুবর্ণমুদ্রায় পরিণত করিয়া বাস্তুভিটার কোন গুপ্ত স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

গোকুলচন্দ্র মহা কৃপণ ছিলেন। প্রাণান্তেও কাহাকেও একটি পয়সা দেন নাই। মৃত্যুকালে গুপ্তধনের কথা পুত্র ফটিকচন্দ্রকে বলিয়া যাইবেন কি না, ইহাই মনে করিতেছিলেন। এমন সময় একটা বিকটাকার দীর্ঘকায় পুরুষ লগুড়হস্তে স্বপ্নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেখ ব্যাটা! যদি এ ধনের কথা কাহাকেও বলিস্ তবে তোর মাথা ফাটাইয়া দিব।"

মৃত্যুভয় গোকুলচন্দ্রের বংশগত রোগ। লগুড়াঘাতের আশঙ্কায় গোকুল-চন্দ্র ধনের কথা কাহাকেও বলেন নাই।

দীর্ঘকায় পুরুষ আরও বলিয়াছিল, "তোর বংশে যাহার সমস্ত দেহ খসিয়া কেবল মুণ্ড থাকিবে, সেই এ ধনের অধিকারী হইবে, কোন ভাবনা নাই।"

এইরূপ শাসিত এবং পুনরায় আশ্বাসিত হইয়া গোকুলচন্দ্র মরিয়া যক্ষরূপে সেই গুপ্তধনের রক্ষক হইয়া থাকিয়া গেলেন।

গভীর নিশীথে যখন ফটিকচন্দ্র আকাশের তারা দেখিতেছিলেন, তখন অতুল ডাক্তারের ঔষধ তাঁহার হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল। ফটিকচন্দ্র

ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে পুরাতন বকুল বৃক্ষের তলে আসিয়া মনে করিলেন, এটা বড় রমণীয় স্থান।

সেই বৃক্ষতলে বকুল-পুষ্প-সুবাসিত বাতাসে ফটিকচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। ফটিক স্বপ্ন দেখিলেন। প্রথমে বোধ হইল, তাঁহার পদযুগল খসিয়া পড়িয়াছে। সেই শোকে ফটিকচন্দ্রের স্বপ্ন-জগতের দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তৎপরে হস্তদ্বয়ও গেল, এবং পুনরায় দারুণ শোকগ্রস্ত হইয়া আরও দুই বৎসর কাটিল। হস্তপদবিহীন খর্ব্বাকৃতি ফটিকচন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই উভয় অঙ্গের মায়া এড়াইতে পারিতেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, সকলের আছে, তাঁহার নাই, তখন ক্ষোভে ও ঈর্ষ্যায় মায়াটা থাকিয়া গেল।

ক্রমে ধড়টা মুণ্ডের নিম্নভাগ হইতে খসিয়া গেল। আর ক্ষুধা লাগিল না। প্রথমে ফটিকের বড় ভয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন যে, ইহাতেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, তখন ফটিকচন্দ্রের মনে অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইল—"বোধ হয় আমি অমর!"

অতুল ডাক্তারের ঔষধ যথাবিহিতরূপে কার্য্য করিতেছিল।

ফটিকচন্দ্র ভাবিলেন, আর সংসারের সহিত শরীরের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু মুণ্ডটা সযত্নে রক্ষা করা নিতান্ত দরকার; এই মুণ্ড লইয়া যথাবিহিত আলোচনা করিলে হয় ত মৃত্যুযন্ত্রণা একেবারে এড়াইতে পারা যাইবে।

এই মুণ্ডের মধ্যেই ভালবাসা, স্নেহ, বৈরাগ্য, ভয়, ভরসা।

কিন্তু যদি এই মুণ্ড শৃগালে লইয়া যায়, তবে রক্ষা করে কে? আবার দুর্ভাবনা! ফটিকচন্দ্র ত্রাসিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়!—

ঘটনাক্রমে ফটিকচন্দ্রের মুণ্ডের তলায় প্রোথিত ধনের রক্ষক ৺ গোকুলচন্দ্র বাস করিতেছিলেন। রাত্রিকালে একটা মুণ্ডের সঞ্চার দেখিয়া যক্ষরাজ বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই দীর্ঘকায়-পুরুষ-কথিত বংশধর।

সময় বুঝিয়া ৺ গোকুলচন্দ্র ধীরে ধীরে ফটিকচন্দ্রের মুণ্ডস্থিত টীকি ধরিয়া টানিয়া গাছের গোড়ায় লইয়া গেলেন।

ফটিকচন্দ্র আঁউ মাঁউ করিয়া জড়িত-জিহ্বায় বলিলেন, "তুমি কে?"

৺ গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "আমি তোর বাপ্ গোকুল বাঁড়ুয্যে!"

ফটিকচন্দ্র অবসন্নপ্রাণে বলিলেন, "বাবা! তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?"

গোকুল। এই দেখ্ না।

তৎপরে একটা গর্ত্তের মধ্য দিয়া গোকুলচন্দ্র মুণ্ডাবশিষ্ট ফটিকচন্দ্রকে দশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার ঘড়া দেখাইয়া বলিলেন, "বাবা! আমার সময় হইয়া আসিয়াছে, আমি এত দিন এই ধনের প্রহরী ছিলাম। তুমি ইহার যথাবিহিত সদ্ব্যয় করিও।"

ইহা বলিয়া যক্ষরাজ চলিয়া গেলেন। তখন ভোর হইয়া আসিতেছিল। মুণ্ডবর বুঝিতে পারিলেন যে, কথাটা সত্য। বাস্তবিক, ধন সেইখানে পড়িয়া আছে।

ফটিক আরও বুঝিলেন যে, মুণ্ড খসিয়া গেলেও একটা কিছু থাকিয়া যায়। সেটাকে কেহ মারিতে পারে না। এই তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া স্বর্গীয় পিতা যদি ধনের রক্ষক হইয়া থাকিতে পারিয়াছেন, তখন আমাকে মারে কাহার সাধ্য?

ফটিকচন্দ্র মুণ্ড ঘুরাইতে লাগিলেন। অন্ধকারে স্বপ্নের উপর স্বপ্ন আসিতে যাইতে লাগিল। পুত্র হেমাংশু এবং দারা ক্ষেমঙ্করী মুণ্ড লইয়া গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি লেপন করিল। শ্রাবণের বারিধারার সহিত তাহাদিগের চক্ষের জল মিশিল। তৎপরে শ্রাদ্ধের ব্যয় প্রভৃতির তালিকা হইল। মুণ্ড তাহাই দেখিতে লাগিল। অতি সাবধানে দেখিল। জ্যোতিঃশূন্য চক্ষু আর তখন কোটরে ঘুরিল না।

প্রভাতবায়ুর সহিত ঘর্ম্ম দিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইলে ফটিকচন্দ্র দেখিলেন যে, তিনি বকুলতলায় পড়িয়া আছেন। গাছের গোড়ায় একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত দেখিলেন।

ফটিকচন্দ্র বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, ডাক্তারী ঔষধের বলে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে গুপ্তধনের আবিষ্কার মিথ্যা নহে। বাস্তবিক, জাজ্বল্যমান দশ লক্ষ টাকার স্বর্ণমুদ্রা সেই গর্ত্তের মধ্যে বর্ত্তমান।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া ফটিক সেই স্বর্ণমুদ্রার ঘড়া বাহির করিলেন, এবং সেই দিন সন্ধ্যার সময় বড় বড় সিন্ধুকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে মোহর দিলেন।

তৎপরদিন লুক্কায়িতভাবে ফটিকচন্দ্র জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যাইলেন, এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার পিতৃসঞ্চিত দশ লক্ষ টাকা তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত দুঃখীদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেই গুপ্তধন সরকারী ধনাগারে রক্ষিত হইল। ফটিকচন্দ্র পরিত্রাণের নিশ্বাস ছাড়িলেন।

ফটিকচন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। গৃহিণী তখন রোহিত মৎস্যের মুড়া রাঁধিতেছেন।

ফটিকচন্দ্র বলিলেন, "ডাক্তার ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া আন; আজ আমার শেষ দিন।"

বাস্তবিকই ফটিকের আজ শেষ দিন। কালপুরুষ-দত্ত সপ্ত দিন কাটিয়া গিয়াছিল। শ্রাবণের অমাবস্যায় ফটিকচন্দ্র মরিতে প্রস্তুত হইলেন।

ফটিকের পূর্ব্বাবধিই দারাসুত প্রভৃতির উপর বড় মমতা ছিল না। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মায়া চলিয়া গিয়াছে। জগৎ প্রবঞ্চনাময়, ঘোর নিষ্ঠুর!

শরীরের মায়া পূর্ব্ববর্ণিত নিশীথে লোপ পাইয়াছে। মুণ্ডের মায়াটা মায়াই নহে। এ মুণ্ড থাকিলেই বা কি? এবং গেলেই বা কি? একটা নেশার ওয়াস্তা।

ডাক্তার ডাকিবার পূর্ব্বেই ফটিকচন্দ্র কসিয়া এক ছিলিম গঞ্জিকা টানিলেন; ক্রমে দুই ছিলিম, এবং তিন ছিলিম।

স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ব্যস্ত হইয়া পলায়নতৎপর হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "বেগতিক!"

তৎপরে ক্রন্দনের রোল। ক্রন্দন ও আশ্বাসবাণীতে মৃত্যুগৃহ ভরিয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন, "ফটিক বাবু! একটু ঔষধ খান!"

ফটিক চক্ষু উল্টাইয়া দেখাইলেন, "বৃথা।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বাবা! বল গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, হরে রাম হরে হরে।" ফটিকচন্দ্র ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আর বকামিতে কাজ নাই।"

সকলেই একমত হইয়া বলিল, "কাণে হরিনাম কর।" কিন্তু মধ্যে মধ্যে ফটিকচন্দ্রের নির্জীব প্রাণের বিকট পুনরুদ্যম দেখিয়া কেহ সাহস পাইল না। প্রতিবাসিগণ বলিল, "লোকটাকে দানায় পাইয়াছে।"

ফটিক বলিলেন, "তোর বাবার কি?"

ইহাতে সকলের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গেল। গৃহিণী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ফটিকচন্দ্র এই অবসরে একবার অন্তর্দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, কালপুরুষ আসিয়া বসিয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রস্তুত ত?"

ফটিক। কিসের প্রস্তুত?

আগন্তুক। ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ।

ফটিক। মহাশয়! আমার কোনও পুরুষ মরণের পর ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ব্রাহ্মণ এই দেহেই ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। তাঁহাকে ডাকিয়া আমুন; আমি প্রস্তুত আছি।

আগন্তুক। তোমার স্পর্দ্ধা ত বড় কম নয়। এই কলুষিত শরীরে ভগবান আসিবেন ?

ফটিক। মুণ্ড পর্য্যন্ত ছাড়িয়াছি। শরীরে ত কিছুই দেখিতে পাই-তেছি না।

আগন্তুক. তুমি এখনও অহঙ্কারের আসনে বসিয়া আছ।

ফটিক দেখিলেন, ঠিক। মায়া, মমতা, স্বার্থপরতা, সকলই গিয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গিয়াছে। আশা, নিরাশা, জন্ম মৃত্যুর ভয় গিয়াছে। কিন্তু তথাপি তিনি যেন একাকী—সেই ঘোর তমসাবৃত শব্দ-রূপ-হীন জগতে একাকী। ফটিকচন্দ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া ডাকিলেন, "দয়াময়! আমি একাকী কেন ? আমার কি কেহ নাই ?"

অলক্ষ্যে শব্দ আসিল, "আমারও কেহ নাই।" বাস্তবিক, তাঁহারও কেহ নাই। জটাজূটধারী শ্মশানবাসী, শূন্যে বায়ুমধ্যে বিস্তৃত থাকিয়াও একাকী; বারিমধ্যে থাকিয়াও একাকী; অনলমধ্যে থাকিয়াও একাকী।

ঐ যে জগতের প্রাণ! তোমাদিগের জন্য সকলই উৎসর্গ করিয়াছেন, তথাপি একাকী। কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে না। কেহ তাঁহার সাথী হয় না। তাঁহার স্নেহের প্রতিদান নাই, তাঁহার করুণার কৃতজ্ঞতা নাই।

ফটিক ডাকিলেন, "নাথ! এস, আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; আমি তোমার চরণসেবা করিব।"

সেই অন্ধকার দীপ্তিমান হইল; স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল; পারিজাতের সুবাস বহিল। ধীরে ধীরে কালপুরুষ ফটিকের পদতলে পড়িয়া বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি এখন ঈশ্বরে মিলিত—মুক্ত, ভক্ত ও অমর।"

তখন ফটিকচন্দ্র বলিলেন,"কৈ, নাথ, তোমার স্নেহ,দয়া, ভালবাসা কৈ ?"

ফটিকচন্দ্রের তখন নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। পুত্র হেমাংশু পিতার পদতলে বসিয়া কাঁদিতেছে। "বাবা! পাপ করিয়াছি, আপনিই গুরু, আপনিই ঈশ্বর, না বুঝিয়া অজ্ঞানে অহঙ্কারে কটু কথা বলিয়াছি, মার্জ্জনা করুন।"

সতী ফটিক-জায়া স্থিরনেত্রে স্বামীর জীবনসঞ্চার দেখিতেছিল। ফটিক-

চন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার জীবন-তমালের উপর মাধবীলতার ন্যায় সে জীবনটি জড়িত রহিয়াছে।

এমন সময় স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিস দারোগা ফটিকচন্দ্রের উৎকট পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে পুনর্জীবিত দেখিয়া আনন্দে ফিরিয়া গেলেন।

অতুলচন্দ্র ডাক্তার আগা গোড়া বাহাদুরী লইলেন।

ফটিকচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, এবং হস্ত নাড়িয়া সকলকে বলিলেন,—

"আমার এখন মরিবার ইচ্ছা নাই। অনিচ্ছাও নাই। তবে শেষ কয়টা দিন দেখিয়া একটা কথা বুঝিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম—মনে রাখিও—বয়সে কিছু আসে যায় না, এবং মুণ্ড পর্য্যন্ত না খসিয়া গেলে জীব জগতের কোন উপকারে আসে না।—হেমাংশু! এ কথা তোমার ম্যাষ্টরকে বলিও।"

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি।

৩রা ফাল্গুন। রাধানগর হইতে পিতাঠাকুর মহাশয়ের একখানি পত্র পাইলাম। তাঁহার মানসিক কোনও ক্রিয়া করিবার জন্য আবার টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি এ মাসে পুনর্ব্বার টাকা দিতে পারিব না; আগামী মাসে দিব; এই মর্ম্মে তাঁহাকে একখানা কার্ড লিখিয়া দিলাম। ভগবান এক রকমে চালাইয়া দিতেছেন বটে; কিন্তু সকল অভাব সময়মত মিটিতেছে না। দেখিতেছি, অর্থভাগ্যটা আমার নিতান্তই মন্দ। শুধু ভাগ্যেরই বা দোষ দি কেন? এ বিষয়ে পুরুষকারেরও সম্পূর্ণ অভাব।

"হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল
সেই সে দরিদ্র হ'বে?"

কবিবরের এই যুক্তির বলে আপনাকে মস্ত একটা কবি মনে করিয়া মাঝে মাঝে হৃদয়টা আনন্দে নাচিয়া উঠে, স্বীকার করি! কিন্তু ও দিকে

গৃহে পরিজন সবাই যে হাহাকার করিতেছে! শ্রীমতী কবি কামিনী সেন লিখিয়াছেন,—

"যৌবনের লাগি আমি তপস্যা করিব ঘোর।"

আমার যৌবনের ততটা প্রয়োজন নাই। একবার সাধ যায়, কেউ যদি বলিয়া দিতে পারে, তাহার কাছে অর্থের তপস্যাটা শিখিয়া লই। আর নিশিদিন কেবল গাহিতে থাকি,—

টাকার লাগিয়া আমি তপস্যা করিব ঘোর;
এষ্টেশনে কাটি গাঁট, হই বা সিঁদেল চোর।

গানের allusionটাও লিখিয়া রাখি;—হাবড়ার ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিবার সময়, অতি অল্প দিন হইল, আমার টাকাভরা থলিটির উপর কে অনুগ্রহ করিয়াছে!

৪ঠা ফাল্গুন। Boswellএর লিখিত Samuel Johnson এর জীবনীর ভূমিকা-ভাগটুকু পাঠ করিলাম। বস্‌ওয়েল যাহা বলিয়াছেন, চরিতাখ্যায়কদিগের তাহাই আদর্শ হওয়া উচিত। কোনও ব্যক্তির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একখানি সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবি নয়নের সম্মুখে ধরিতে পারিলেই জীবনী লেখা সার্থক হয়। জীবন-গত ঘটনার সামান্য অংশগুলি বাদ দিয়া, কেবল বৃহৎ ও উচ্চতর অংশগুলির আলোচনা করিলে প্রকৃত চরিতাখ্যানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যাঁহার জীবনী লিখিত হইতেছে, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক দিবসের, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। নহিলে, কেবল প্রশংসা ও অনুকরণের উপযোগী দুই চারিটি বিষয় বাছিয়া লইয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিলে, উপকারের সম্ভাবনা যে থাকিবে না, এমন নহে; কিন্তু লোকটাকে চিনিবার সুবিধা হয় না। জীবিতাবস্থায় তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা তাঁহাকে যেরূপ দেখিতেন, এবং বুঝিতেন, আমরাও যেন সেইরূপ করিতে পাই। তা'র পর, স্থিরভাবে, অবিচলিতচিত্তে, পক্ষপাতশূন্য সমালোচনার যে সুবিধা, তাহা ত আমাদের হাতেই রহিয়াছে। তাঁহার সমসাময়িক লোক-দিগের এ সুবিধা কখনই থাকিতে পারে না। তবে একটা কথা আছে। মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনী এইরূপে লিখিবার উপযোগী কি না, তাহাও বিবেচ্য। আমার বিশ্বাস, যদি জীবনচরিত লিখিতেই হয়, তবে উহাকে সর্ব্বাঙ্গীন করাই বাঞ্ছনীয়। আর, যাঁহার জীবন সেরূপে বর্ণিত হইবার

যোগ্য নহে, তিনি যে কয়টি ভাল কাজ করিয়াছেন, তাহাদের কথাই কেবল বলা উচিত। (১)

৭ই ফাল্গুন। সকালবেলা খানিকটা পঙ্কুকে কোলে লইয়া, খানিকটা সাহিত্যের আসরে তাস খেলিয়া, কাটিয়া গেল। ১ টার সময় সু—, সোমরাজ ও আমি ছবি তুলাইবার মানসে রাধাবাজারে বেঙ্গল ফটোগ্রাফার-দিগের দোকানে গিয়া উপস্থিত। তাহাদের লোক জন তখন হাজির ছিল না। কতককটা সময় গল্প করিয়া, সুন্দর, অসুন্দর, সুন্দরী, অসুন্দরী প্রভৃতির বিবিধ প্রকার ফটো দেখিয়া, কাটিয়া গেল। * * * ছবি তোলা আজ আর হইয়া উঠিল না। আগামী রবিবার আবার আসা যাইবে, স্থির করিয়া, প— বাবুর নিকট তিন জনে গমন করিলাম। প—র এবার এটর্ণীর শেষ পরীক্ষা। তাঁহার বেশী সময় নষ্ট করা অবিধেয় জানিয়া সত্বরই গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলাম। আমি এক জোড়া কাপড় কিনিবার জন্য সোমরাজের সহিত কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে নামিলাম; সু—চন্দ্র রজনী বাবুর (রজনীকান্ত গুপ্ত, ঐতিহাসিক) সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ও পরে কয়েক ঘণ্টা আবার সাহিত্যের আসরে কাটিল। সু—র ১৫ই ফাল্গুন বিবাহ হইবে। এতদুপলক্ষে এক একটা কবিতা বা গদ্য উপহার দিবার কথা বড়াল কবির সহিত স্থির করিলাম। মু—কেও অনুরোধ করা গেল। বন্ধুরা সকলে লিখিলে একখানা বহি হইয়া যাইতে পারে।

৮ই ফাল্গুন। বাবুজীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে কবিতা উপহারের প্রতিজ্ঞা ত করিয়াছি। কিন্তু আমার মনের বর্ত্তমান যে অবস্থা, তাহাতে এ সময়ের উপযোগী কবিতা বাহির হইবে কি না, তাহাই ভাবিতেছি। আনন্দের উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিতে গিয়া হয় ত নিতান্ত বিষাদময় করিয়া ফেলিব। ইহার উপায় কি? জোর করিয়া ফরমায়েসী ভাবে ত কবিতা হইবে না। যাহাই হউক, যে বিবাহের জন্য ২।৩ বৎসর ধরিয়া সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিতেছি, তাহা যখন সম্পন্ন হইতে চলিল, তখন চুপ করিয়াই বা থাকি কিরূপে? যাহা মনে আসে, একটা কিছু লিখিয়া সু—র পরিণয় ব্যাপার-টাকে জীবনের সহিত গাঁথিয়া রাখিতে হইবে। আমার নিজেরও দ্বিতীয় দারের কথা লইয়া একটা বড় গোলমাল উপস্থিত হইতেছে, দেখিতেছি। ভাগিনের চারুচন্দ্রকে ত একরকম ভাগাইয়া দিলাম। তিনি যে কনে দেখিয়া

(১) ৫ই ও ৬ই ফাল্গুনের ডায়েরি পাওয়া যায় নাই। —সাহিত্য-সম্পাদক।

আসিয়াছেন, তাহার রূপের বর্ণনাটা পাড়িয়া আমাকে পাড়িবার যোগাড় করিতেছিলেন। আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। * * * *

৯ই ফাল্গুন। পঙ্কুর সংবাদ জানিবার জন্য অখিলকে একখানি পত্র দিলাম। দেশে পিতৃদেবকেও একখানি লিখিলাম। কয়েক দিবস তাঁহাদের কোনও খবর না পাইয়া চিন্তিত রহিয়াছি।

কোনও কোনও কবি তাঁহাদের কবিতার মূল উদ্দেশ্য কি হইবে, তাহা স্থির না করিয়াই লিখিতে বসিয়া যান। প্রাণে কোনও উচ্ছ্বাস উপস্থিত হইলেই একেবারে কালি কলমের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে প্রায়ই ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হয়। সুতরাং যে বিষয় লইয়া কবিতাটি আরম্ভ করিলেন, পরিশেষে তাহা হইতে হয় ত একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। কবিতার প্রারম্ভ এবং উপসংহারের মধ্যে কোনও সাদৃশ্যই রহিল না। এই পদ্ধতি নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া মনে করি। প্রাণে যে উচ্ছ্বাসটুকু অনুভব করিতেছি, যথাসাধ্য পাঠকের হৃদয়ে তাহাকে প্রবাহিত করিয়া দেওয়াই কবিতার উদ্দেশ্য। যিনি এই উদ্দেশ্য সম্যক্ প্রকারে সুসিদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহার রচনাই শ্রেষ্ঠপদবাচ্য। তবে উচ্ছ্বাসেরও আবার তারতম্য আছে। আমার ন্যায় সামান্য জনের হৃদয়োচ্ছ্বাস কখনও সেক্ষপীয়রের সমকক্ষ হইতে পারে না। ফল কথা, যিনি যে দরের কবিই হউন না কেন, তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বোত্তম রত্নগুলিই সাধারণকে উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য; কেবল "চ, বৈ, তু, হি" দিয়া বিরক্ত করা উচিত নহে।

১০ই ফাল্গুন। সু—চন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে নব দম্পতীকে উপহার দিবার নিমিত্ত একটি সনেট আজ সকালে রচনা করিয়াছি। গতকল্য সন্ধ্যার সময় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারি নাই। আজ যাহা লিখিয়াছি, তাহাও তেমন মনের মতন হয় নাই। কে জানে, ভাব-প্রকাশের ভাষা কেন খুঁজিয়া পাইলাম না। যাহা লিখিয়াছি, তাহা এইঃ—

থাক্ দূরে শঙ্খরব, কর্ণ বধিরিয়া
পুরাঙ্গনা হুলুধ্বনি, আনন্দ-আধার।
পবিত্র বাসরে আজি দোঁহে একবার
শুভক্ষণে, হে দম্পতী, দাঁড়াও আসিয়া
মুক্ত এ আকাশতলে; বারেক চাহিয়া—
দেখ নব উষামুখে মেঘের মাঝার

আরাধ্য মূরতি সেই,—প্রেম-অশ্রু যাঁর
ঝরিত নয়ন বহি কারুণ্যে গলিয়া।
হের, কি আগ্রহ-ভরে দেব হস্ত তুলি
অভীপ্সিত পথ নিজ দি'ছেন দেখায়ে,—
দয়ার সাগরে আজি উঠিছে আকুলি'
আকাঙ্ক্ষা, কামনা কত তরঙ্গে দুলায়ে।
লহ ওই আশীর্ব্বাদ; পূত-তনুমন,
বল,—"পুণ্যব্রত, দেব, করিনু গ্রহণ।"

১১ই ফাল্গুন। নিকোলাস রো (Nicholas Rowe) প্রণীত Fair Penitent নামক নাটকখানি পাঠ করিলাম। পিতার অনুরোধে Calista নাম্নী এক জন নায়িকা Altamont নামক নায়কের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু নায়িকা ইতিপূর্ব্বে Lothario নামক এক জন আমোদ-প্রিয়, অসচ্চরিত্র যুবকের প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাকে হৃদয়ের ভালবাসা, এমন কি, দেহ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর নায়িকা স্বীয় প্রণয়পাত্রের সহিত গৃহত্যাগপূর্ব্বক পলায়নের সংকল্প করিয়া এক পত্র লেখেন। সেই পত্র Lotharioর হস্তচ্যুত হইয়া Altamontএর বন্ধু ও ভগিনীপতি Horatioর হস্তগত হয়। বন্ধুর মুখে শুনিয়া Altamont প্রথমে এই গুপ্ত-পাপে বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই। পরে স্বচক্ষে দুই জনের মিলন দেখিয়া Lotharioর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে নিহত করেন। Lotharioর অনুচরবর্গ ইহার প্রতিফল দিতে গিয়া নায়িকার পিতাকে নিহত করিল। তার পর নায়িকা নিজেও কতকটা অনুতাপ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। Dr. Johnson বলেন, Lotharioর প্রতি পাঠকের কতকটা করুণার সঞ্চার হয়। কিন্তু আমার ত সেরূপ কিছুই হইল না। তাহার সাহস বা বীরত্ব প্রশংসনীয় হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সে বীরত্ব পাপের সমর্থনেই নিয়োজিত। সে যে এক অসহায়া যুবতীর কৌমার্য্য হরণ করিয়াও তাহার সহিত পরিণয়-রূপ পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ হইতে চাহে নাই, অথচ নিজের কলুষিত প্রেমের বড়াই করিয়া হতভাগিনীকে কেবল ইন্দ্রিয়সুখের উপায়মাত্র করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া বেড়াইয়াছে, ইহা আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি না। তাহার মৃত্যুতে আমাদের হৃদয় ধর্ম্মের জয় দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছে। নাটকের একটা চরিত্রও আমার চক্ষে তেমন উচ্চ দরের বোধ

হইল না। মাঝে মাঝে দু' একটা দৃশ্য কেবল বস্তুহীন অস্বাভাবিক বক্তৃতার ন্যায় ঠেকিল। জনসন্ ভাষার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। আমি ততটা করি না। সমস্ত পুস্তকের মধ্যে কোথাও একটা মনোহর নূতন ভাবের সমাবেশ দেখিলাম না।

১২ই ফাল্গুন। Jonathan Swift প্রণীত On the death of Dr. Swift নামধেয় শ্লেষ-কবিতাটি পাঠ করিলাম। কবির মৃত্যুতে তাঁহার শত্রু মিত্র উভয় দল তাঁহার চরিত্র ও গ্রন্থাবলীর উপর কিরূপ মত প্রকাশ করিবেন, এই কবিতায় প্রকৃত ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় তিনি নিজেই তাহা লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন।

"In the adversity of our best friends, we always find something that doth not displease us"—Rochefoucaultএর এই উক্তিকে তিনি তাঁহার কবিতায় শীর্ষোক্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সুইফ্‌টকে মানবদ্বেষী (misanthrope) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ হৃদয়ের ভিতর চাহিয়া দেখিলে, তাঁহার এই সকল বাক্য অপ্রীতিকর হইলেও কঠোর সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

> "What poet would not grieve to see
> His brother write as well as he?
> But, rather than they should excel,
> Would wish his rivals all in hell?"

এই উক্তির প্রমাণ আমরা কি প্রত্যহই পাইতেছি না? আর Swift যে প্রার্থনা করিয়াছেন,——

> "To all my foes, dear Fortune, send
> Thy gifts; but never to my friend:
> I tamely can endure the first;
> But this with envy makes me burst."

ইহাতেও কি সাধারণ: মানুষের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক একটা বাস্তবিক সত্য কথা নিহিত নাই? যাহা সত্য, তাহার স্পষ্ট আলোচনায় সুফলেরই আশা করা যায়। সুতরাং এই সকল অপ্রিয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া, কবি কখনই আমাদের নিন্দাভাগী হইতে পারেন না। তবে আমার

মত এই, নিশিদিন মানুষের পশুভাবের উপর শ্লেষের সায়কবর্ষণাপেক্ষা দেবভাবের উপাসনা করা অধিকতর শুভপ্রদ।

১৩ই ফাল্গুন। সকাল বেলা বিছানায় পাতিবার লেপখানা সারিলাম। উহার কয়েক স্থলে ইঁদুরে কাটিয়া দিয়াছিল। শেলাইএর কাজ করিয়া Popeএর Essay on Criticism আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম।

২½ টার গাড়ীতে কলিকাতায় আসিলাম। সু—র বিবাহ উপলক্ষে উপহার-কবিতাগুলি ছাপাইবার জন্য হেয়ার প্রেসে কা—বাবুর সহিত গমন করিলাম। তাঁহাদের হাতে কাজ অনেক। আর আমাদেরও বিলম্ব করিলে চলিবে না। সুতরাং সেখানে ছাপাইবার সুবিধা হইয়া উঠিল না। পরে, নবকৃষ্ণ বাবুর দ্বারায় সখা প্রেস হইতে কাজটি সারিয়া লইবার মানসে তাঁহারই সন্ধানে চলিলাম। তিনি বাটীতে উপস্থিত নাই। কাজেই আর কোনও বন্দোবস্ত হইল না। বড় বাবুর আসরে আসিয়া সভা জমাইয়া দিলাম। বিবাহের ধুম এখনও তত পড়ে নাই। তবুও, দুই একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস আগ্রহে অধীর হইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই ছুটিয়া আসিয়া যে না পড়িতেছে, এমন নহে। সোনার অক্ষরে নিমন্ত্রণের পত্র ছাপা হইয়াছে, দেখিলাম। পত্রগুলি অতি সুদৃশ্য রঙ্গীণ কভারে রঙ্গীণ ফিতার দ্বারা বাঁধা হইতেছে। অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে, এমন কথা বলি না। তবে কোনও বিষয়ে একটা মারাত্মক ত্রুটীর বোধ হয় সম্ভাবনা নাই। ছাপান পত্রে দুই চারিটা বর্ণাশুদ্ধি, পান তামাকের অনুৎকৃষ্টতা, ইত্যাদি; ত্রুটী প্রায়শঃই এই ধরণের।

১৪ই ফাল্গুন। সকালবেলা পঞ্চুরামের সহিত আমোদে খানিকটা সময় কাটাইয়া দিলাম, তার পর সু—র বাড়ীতে গমন। আজ বাবুর গায়ে হলুদ পড়িবে। আহারের নিমন্ত্রণটা গতকল্যই পাইয়াছিলাম। বেলা প্রায় ১টার সময় সে কাজটা বেশ এক রকম চলিল। তবে আমি সেই সব বিবিধ আয়োজনের বড় সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না। কারণ, অত বেলা পর্য্যন্ত উদর-দেবতাকে একবারে অন্নশূন্য করিয়া রাখিতে পারি নাই। উপহারের অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ হইয়াছে। সেইগুলি "সাহিত্য-যন্ত্রে" ছাপা হইতেছে। কারণ, নবকৃষ্ণ সাহস করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বড় বাবু, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাণে" ইত্যাকার বচন ছাড়িয়া, অথচ আনন্দের সহিত, প্রুফগুলি দেখিতেছেন।—সভাটা মাঝে একবার কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হওয়াতে আমি ঘরে আসিয়া খানিকটা সময় শয়ন করিয়া

কতকটা আলস্য বা তন্দ্রায় কাটাইয়া দিলাম। সন্ধ্যাবেলা আবার আসরে আসিয়া উপস্থিত। এবার আসর লোকে পরিপূর্ণ। এক জন চক্ষুহীন গায়ক গান ধরিলেন। বী—ভাদুড়ী মহাশয় হার্ম্মোনিয়মে শব্দ করিতে লাগিলেন। বাদক মহাশয় তবলার উপর আপনার বিবিধ কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে মস্তক-সঞ্চালনেরও বিবিধ বাহাদুরী দেখাইতে লাগিলেন। আমি বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত গল্প করি, আর কেবল সোমের ঘরে আসিয়া বাহবা দিয়া উঠি। দু' একটা গান নিতান্ত মন্দ লাগে নাই।

১৫ই ফাল্গুন। আজ বিবাহ। সকাল বেলার আহারটা বিবাহ-বাড়ীতেই সম্পন্ন হইল। সারাদিন কেবল খেলিয়া, গল্প করিয়া, হাসিয়া, বসিয়া, শুইয়া কাটিতে লাগিল। এমন আনন্দ ও উল্লাস অনেক দিন উপভোগ করি নাই। এই অসীম হর্ষের যিনি মূল-কারণ, তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ। আনন্দের আলোকে দুগ্ধপোষ্য বালকগুলির প্রাণেও কবিতার কলি ফুটিয়া উঠিল। কবিবর নবীনচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির বড় বড় স্থলপদ্মের তোড়ার সহিত তাহারাও আপনাদের হৃদয়ারণ্যের দু' একটা ঘেঁটুফুল গুঁজিয়া দিতে লাগিল। বর মহাশয়ের বড়ই আক্ষেপ,—তিনি নিজে একটা কিছু লিখিতে পারিলেন না। ভায়া রাত্রিদিন অনুরুদ্ধ হইয়াও নিজে কিছুই করেন নাই—বা করিবার সময় পান নাই। দাদার আক্ষেপ শুনিয়া তাঁহার জবানীতে একটা লিখিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু দাদা মহাশয়ের বোধ হয় কিছু ভয় হইল। তাই পিছাইয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর যেখানে যুগলের মিলন হইবে, সেই অমরাবতী বীডন্ ষ্ট্রীটের বাটীতে সকলে মিলিয়া গমন করিলাম। মিলনটা কি মন্ত্রে, কি প্রথায় হইল, দেখি নাই। উদরের সহিত সন্দেশ লুচীর মিলন করিতে কিছু বেশী ব্যস্ত হইয়াছিলাম। আমার ত ঐ পর্য্যন্ত। শুনিলাম, শেষ মুহূর্ত্তে অক্ষয় বাবু আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে চুণী ভায়া তাঁহাকে বরের কাকা শ্যামবাবু সাজাইয়া বাসরঘর পর্য্যন্ত রাস্তা করিয়াছিলেন। আক্ষেপ রহিল, সেই সুমার্জ্জিত কণ্ঠকণ্ডূতিপরিপূরিত সুন্দরীসভা একবার দেখিতে পাইলাম না।

১৬ই ফাল্গুন। কাল স্কুলে আসি নাই। রোজ রোজ ত আর কামাই করিলে চলে না। সকালে আটটার গাড়ীতে কোন্নগরে আসিলাম। তিন ঘণ্টা কর্ত্তব্য কর্ম্ম চালাইয়া ২।৩০ মিনিটের ট্রেণে নববধূ দেখিবার নিমিত্ত আবার কলিকাতায় ছুটিলাম। কিন্তু আজ আর দেখা হইল না। চুণী

ভায়ার পরামর্শে আগামী রবিবার বৌ-ভাতের দিবস দর্শন করাই সাব্যস্ত হইল। দেখার ত দাম আছে। দুই দিন মূল্য দিবার সামর্থ্য কই? নূতন প্রেমিক বাসরের বিবিধ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিলেন। বাবুজী যে নিতান্ত চোর বনিয়া যান নাই, ইহা প্রশংসার বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা বিষয়ে একটু আপসোস্ রহিল। * * * *

১৭ই ফাল্গুন। "পরিণয়োপহারে" সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ সতেরটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে। সময়াভাবে আরও কত কবির কত উচ্ছ্বাস হৃদয়েই মিলাইয়া রাখিতে হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা এইখানে লিখিয়া রাখিব মনে করিতেছি। সাহিত্যের প্রিয় কবি প্রফুল্লমনা দেবেন্দ্র বাবু এ সময়ে নীরব হইয়া রহিলেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তাঁহার কবিতা পাইলে পুস্তিকার সৌন্দর্য্য বাড়িত, সন্দেহ নাই। নবীন বাবু ন—কে চন্দ্রলোক হইতে কি প্রকারে আনিলেন, আমি বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার "নর-নারায়ণ" যদি এই মর্ত্ত্যলোক খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে বধূকে তাঁহার আদর্শের অনুরূপ বলিয়া বাহির করিতেন, তাহা হইলে উহা বেশ সঙ্গত ও সুন্দর হইত। বড়াল-কবির সখা-সখীর গান বেশ মিষ্ট হইয়াছে। তাহার একটি লাইন বড় সুন্দর,—

"এস প্রতিপলে, এস প্রতিকাজে,
এস মনে, এস প্রাণে।"

নবীন বাবু এবং অক্ষয় বাবুর রচনা ছাড়া অপরগুলিতে উল্লেখযোগ্য কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। ঠাকুরদাস বাবু চুণী বাবুর কবিতাকে সর্ব্বাপেক্ষা দেশীয় জিনিস বলিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহার দেশী বিদেশীর অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

"মেঘমালার" শেষ গল্প গতমাসে শেষ করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান মাসে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। জীবনটা এমন নিয়মবিহীন, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে যে, কোনও বিষয়েই স্থির, নিশ্চিত একটা সঙ্কল্প করিয়া কাজ করিতে পারি না। সকলই যেন অনিয়ম ও সাময়িক আবেগের অধীন। কে জানে, কবে এই জীবনকে আদর্শের পথে সম্পূর্ণ ইচ্ছার বশীভূত করিয়া চালাইতে সমর্থ হইব। গত মাসের দুই চারিটা দিবস সু—চন্দ্রের বিবাহের উল্লাসে এক রকম বেশ চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মাসটা কিরূপে চলিবে,

ভগবানই জানেন। চারি দিকে কেবল বিপদ্ এবং মৃত্যুর কথাই শুনিতে পাইতেছি। দেশের সংসারে নিতান্ত লোকাভাব। পঞ্চুরামকে লইয়া দুইটি স্ত্রীলোক কলিকাতায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। যেরূপ সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে এক জনকে সেখানে না পাঠাইলে চলিবে না। পঞ্চুকে রাখিবার কি নূতন বন্দোবস্ত করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। অর্থেরও অনাটন অনুভব করিতেছি। যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহার উপর খরচ বাড়াইলে যোগান দায় হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বের সঞ্চিত কয়েকটা টাকা আছে বলিয়াই, যা কিছু ভরসা। কিন্তু তাহাও ত বেশী দিন চলিবে না। বেশী উপার্জ্জনের পথ একটা না দেখিলে ত আর চলে না। ক্রমশঃ।

রাজযোগ।

২। যোগভ্রষ্ট।

রাজযোগিগণ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদের উত্তর সীমায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎকালে মানস-সরোবরের উভয় তটেই জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর ছিল। সেখানে খাদ্য দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগের শিষ্যগণ হংসপুচ্ছ দগ্ধ করিয়া ধূম দ্বারা গুরুমণ্ডলীর ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেন। এ স্থলে বুঝা উচিত যে, রাজ-যোগিগণ কারণদেহেই অবস্থিতি করেন, এবং অম্লযান যবক্ষারযান প্রভৃতি সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থ সেবা করিয়া থাকেন।

পুনর্জ্জন্মতত্ত্বের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সচরাচর জীবগণের (মানবাখ্যাত জীব) প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পরে পুনরাবর্ত্তন হয়। Precession of Equinoxes আলোচনা করিয়া দেখিলে আরও বুঝা যায় যে, পুরাণে উক্ত রাসলীলা প্রভৃতি সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। পাঠকগণকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কঠিনাংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া কষ্ট দিবার ইচ্ছা নাই, নতুবা সম্পূর্ণ বচনগুলি দেখাইয়া এবং রাশিচক্র প্রভৃতি টানিয়া ইহা সপ্রমাণ করিতাম। আর একটা বিশেষ কথা এই যে, যাহারা ভুক্তভোগী, তাহারাই বুঝিয়া থাকে। যদি এই সময়ে কেহ অষ্টবসু, নবগ্রহ, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতির

লীলা এবং আধ্যাত্মিক অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝাইতে পারেন, তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, তিনি তৎসাময়িক জীব, কেবল পুনর্জন্মের বিধানানুসারে বিংশশতাব্দীর রাশিচক্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেইরূপ, বিংশ শতাব্দীর ঘটনাগুলির আধ্যাত্মিক অর্থ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরে তৎকালীন মানবগণ বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। মধ্যবর্ত্তী কোনও বংশ পারিবে না।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, যাঁহারা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানস-সরোবরতটে হংসপুচ্ছের ধূম আহার করিয়াছিলেন, সেই রাজযোগিগণই আবার তাহা হইতেও দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে সশরীরে ধরাধামে বিচরণ করিতেন, এবং তাঁহারাই আবার বিংশ শতাব্দীর সময় বঙ্গের ধর্ম্মবিপ্লবকালে দেখা দিয়াছেন।

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আলোচনা উদ্দেশ্য নহে, তবে পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, মতভেদই জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের প্রধান প্রমাণ। কেহই বলিতে চাহে না যে, "আমার পিতা এবং আমি একই দেহ, একই মন, একই আমি।" ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব পাঠ করিলেও দেখিতে পাইবেন যে, বঙ্গের আধুনিক রাজ-যোগিগণের মতামত প্রাচ্য কিংবা প্রতীচ্য কোন বংশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। অতএব আধুনিক অঙ্গসৌষ্ঠব, কর্ম্মপ্রণালী এবং মতামত যে চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই, তাহা নিশ্চিত।

এই রাজযোগিগণ পুরাণবর্ণিত যোগভ্রষ্ট পুরুষ। যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই যোগভ্রষ্ট। যোগভ্রষ্ট রাজযোগিগণ দেখিতে সুশ্রী, পুরুষের মত, শরীরে বলবীর্য্য অল্প থাকিলেও সতত প্রকাশমান, মিষ্টভাষী, শান্ত, অথচ সুচতুর। তাঁহারা প্রায়ই কন্যাসন্তানের জন্মদাতা, অসাধারণ রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিকী প্রজ্ঞা-সম্পন্ন। ইঁহারা রাজর্ষি জনকের ন্যায় শ্মশ্রুবিশিষ্ট, এবং সংসারবৈরাগ্যে, তপে, ধ্যানে জনক রাজারই অনুরূপ।

রাজযোগিগণ রাজার আচার ও ব্যবহারেরই স্বভাবতঃ অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের বর্ণভেদ নাই। যোগবাশিষ্ঠ, উপনিষদ ও গীতা প্রভৃতি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পুরাকালে রাজবিদ্যা ক্ষত্রিয়বংশেই প্রচলিত ও রক্ষিত ছিল। ক্রমে তাহা লোপ পাইয়াছিল। ক্ষত্রিয়বংশ লোপ পাইয়া প্রায় দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে বৈদ্যবংশ, কায়স্থবংশ প্রভৃতি নানাবিধ বংশের

অভ্যুত্থান হইয়াছে। আধুনিক ব্রাহ্মবংশও যে একটা কোন অভিনব বংশ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাভারত-বর্ণিত যদুবংশ কিংবা বৃষ্ণিবংশ যে কোন্ বংশভুক্ত, তাহা শাস্ত্রে লেখে নাই; কিন্তু তাহাদিগের ধ্বংসবৃত্তান্ত অতি শোচনীয়। বারুণীঘূর্ণিতলোচন ও মুষ্ট্যাঘাতক্লিষ্ট যদুবংশের শেষ বংশধরগণ যে এই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাহার অনেক আভাষ পাওয়া যায়। জাতিস্মর না হইলেও বুদ্ধিমানের এ সম্বন্ধে ভ্রম হওয়া সম্ভব নহে। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া বেশ দেখিতে পাইবেন যে, বর্ণশঙ্করের প্রভাব ক্রমে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। প্রায় সকলেই কৃষ্ণভক্ত। শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ের আকার আর বড় দৃষ্ট হয় না। রুদ্রতেজ মধুর হইয়া প্রেমের ধ্বজা বঙ্গে খাড়া হইয়াছে। যদুবংশ ছাড়া অন্যে কেহ বড় প্রেমের ধার ধারিত না। যদুবংশ ছাড়া অন্য কেহ বংশী হাতে করে নাই, এবং ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতি ধারণ করে নাই। যদুবংশ ছাড়া অন্য কেহ প্ল্যাটফর্ম্মে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ায় নাই,এবং যদুবংশ ছাড়া অন্য কেহ গীতা রচনা করিয়া ষড়্দর্শনের সম্মিলন করেন নাই। অন্ততঃ আমাদিগের স্বতঃই সন্দেহ হইতে পারে যে, বিংশশতাব্দীর ব্রাহ্মণাখ্যাত, বৈদ্যাখ্যাত, কায়স্থাখ্যাত বর্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক সময়ে বৃষ্ণিবংশভুক্ত ছিল কি না।

যাহাই হউক, ইহারা যোগভ্রষ্ট ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী। কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করেন, অথচ মন দিয়া করেন না; মন ঈশ্বরে রাখিয়া দেন। "মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন" সত্য বটে, কিন্তু কর্ম্মযোগীর পক্ষে ইহা খাটে না; অথচ তাঁহারা রাজার অনুকরণ, রাজার আসনে উপবেশন, রাজ-কর্ম্মচারীর পদগ্রহণ প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ইহাই রাজযোগীর লক্ষণ। যেমন ভগবান ভক্তের পদাঘাত গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ লক্ষণ দ্বারা রাজযোগিগণও আক্রান্ত হন। রাজযোগিগণ ম্লেচ্ছ প্রভৃতির বিচার করেন না, এবং বর্ণভেদ যে মনস্তত্ত্বের অঙ্গ, সমাজতত্ত্বের নহে, তাহাও প্রতিপন্ন করেন।

মনে করুন, যদি একটা উষ্ট্র ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া প্রতিনিয়ত তালবৃক্ষের পত্র গণনা করে, তবে তাহার লাঙ্গূলে কাক ঠোক্‌রাইয়া গেলেও সে বুঝিতে পারিবে না। বর্ণাশ্রম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি ধর্ম্ম স্বভাবজ। সে দিকে মন না রাখিলে একীকরণ ও সমীকরণ আপনা হইতে আপনিই হইয়া পড়ে। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, যাঁহারা রাজযোগিগণের আচার

ব্যবহার প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করেন, তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত। আচার ব্যবহার প্রভৃতি অজ্ঞানমূলক। মনে পড়ে, সে দিন গড়ের মাঠে এক-দল মুসলমান বৃক্ষতলে ছাতু খাইতে বসিয়াছিল, এবং কিয়দ্দূরেই এক দল হিন্দু কলা খাইতেছিল। এমন সময় এক দল গোরা আসিয়া হিন্দুগণের গলা টিপিয়া কলাগুলি কাড়িয়া খাইল। মুসলমানের দল তাহা দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক উঠিয়া পড়াতে, প্রবল দক্ষিণ বাতাসে তাহাদিগের মুখনিঃসৃত ছাতু হিন্দুগাত্র স্পর্শ করিল। গোরাগণ চলিয়া গেলে হিন্দুগণ একস্বরে বলিল,—

"তোদের ছাতু উড়িয়া আমাদিগের গায়ে পড়িয়াছে—এখন জাতি যে যায়?"

মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে বলিল, "তোর গলা টেপাতে জাতি যায় নাই?"

ইহা লইয়া তুমুল সংগ্রাম ও আন্দোলন চলিল। কিন্তু রাজযোগিগণ এরূপ অবস্থায় পড়িলে মুসলমানের অবশিষ্ট ছাতু খাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

"প্রেমে নাচে ময়ুর ময়ুরী, প্রেমের বাঁশরী বাজে।" প্রেমই রাজযোগি-গণের মহামন্ত্র।

অতি সুন্দর শ্যামল বনরাজিমধ্যে মলয়পবনবিতাড়িত স্বচ্ছ-সরসীতটে বসন্তের প্রথম অঙ্কুরোদ্গত কচি দূর্ব্বাদলের উপর ত্রিভঙ্গবেশে রাজযোগিগণ বংশী বাজাইতে থাকেন, এবং কঙ্কালদেহ শীর্ণ মলিন মুমূর্ষু দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জীবগণ আসিয়া তালে তালে নাচে।

"নাচ রে শ্যামা হৃদ্‌কমলে"

ইহা রাগিণী খাম্বাজ তাল ফেরতাতে গীত হয়, এবং ইহার সারেগম প্রভৃতি "নোটেশন" হইয়া মাসিকপত্রিকায় বাহির হয়। বিক্রী বহুৎ।

আধ্যাত্মিকভাবে ব্যাখ্যা করিলে ইহা এই রকম হয়। যথাঃ—মানবের সপ্তদেহের মধ্যে চারিটি দেহ, অর্থাৎ ভাণ্ড, পিণ্ড (কিংবা লিঙ্গদেহ), কাম ও কামমনস দেহগুলি ফাজিল (Extra)। যেমন আপিসের বাবুদিগের "উপরি" রোজগার। এ চারিটি বাদ দিলে বক্রী তিন ত্রিভঙ্গ কিংবা ত্রিভুজ। এই ত্রিভুজের মধ্য দিয়া প্রাক্তন যুগে ভগবান চতুর্ভুজ-রূপে অবতীর্ণ হইতেন। অবতারের নিয়ম এই যে, ভগবান্ চতুর্দ্দেহরূপী চতুর্ভুজ গ্রহণ না করিলে সম্পূর্ণ অবতার হয় না। কিন্তু প্রেমের বৈষম্যবশতঃ দ্বাপরে দুইটি ভুজ লোপ পাইয়াছিল, এবং সেই প্রথা কলিকালে রহিয়া গিয়াছে। যাঁহারা জীবতত্ত্বে "Fission প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার গূঢ় কারণ বুঝিতে পারিবেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছিলেন,—

"দান পুণ্য করিনু দক্ষিণ হস্তখানে
শূকরের মলমূত্র মুছিব কেমনে ?"

উহাই দুঃখ। যে হস্ত পূর্ব্বে সপ্তদ্বীপে বিস্তৃত হইয়া ঈশ্বরের বেদবাণী প্রচার করিয়াছিল, সেই হস্তে ক্রমাগতঃ কাঁটা, চামচ প্রভৃতির ব্যবহার আর কত সয় ? অতএব লাগাও কলম। পরহিতার্থ লেখ, পরহিতার্থ বংশী বাজাও, পরহিতার্থ ত্রিভঙ্গভাবে দাঁড়াও, এবং সারেগমের "নোটেশন" প্রচার কর।

পাঠকগণ ইহা কোন শ্লেষোক্তি মনে করিবেন না। রাজযোগিগণকে বুঝিতে হইলে, তাঁহাদিগের অসাধারণ আধ্যাত্মিকী বুদ্ধি ও রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, মনোজগতে বিচরণ করিতে হইবে ; মানসিক দেহের লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মানুষটা কেমন, কি খায়, কত দান পুণ্য করে, কোথায় যায় আসে, এ সব বাহ্য কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাতে কেবল ভ্রমসঞ্চারের সম্ভাবনা। মিষ্ট হাসি, নম্র মস্তক, মিতাহার, স্থির জ্ঞানবিস্ফারিত দৃষ্টি, করুণা জ্যোতিমিশ্রিত গোধূলি লগ্নের ভাব, এ লক্ষণগুলি অনেকটা পরিচয়-দায়ক বটে, কিন্তু ইহাতেও অনেক সময় ভুল হইতে পারে।

প্রায়ই দেখা যায় যে, ধর্ম্মপথে বিড়ম্বনা আছে, বাধা আছে, পীড়ন আছে। রাজযোগিগণ প্রায়ই পীড়িত হন। রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত, আকাশ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত, অনল হইতে ব্যাধি পর্য্যন্ত,—দেবতা, দৈত্য, মানব, স্থাবর, জঙ্গম, সকলেই ইঁহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। কিন্তু ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা নিহিত জ্যোতি দ্বারা কীট পতঙ্গের ন্যায় আকৃষ্ট হয় মাত্র। যদি কোন পাখী রঙ্গীন কাঁচের উপর ঠোকরায়, তবে তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বর্ণের বাহার দ্বারা সে আকৃষ্ট হইয়াছে, বর্ণকে পীড়ন করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। জীবগণ স্বভাবতঃই ইহা বুঝিয়া লয়, এবং প্রেমের জগতে ইহার বহুল দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। অতএব, যে কোন পীড়া হউক না কেন, রাজযোগী তাহাকে প্রেমের বিকাশস্বরূপ মনে করিয়া থাকেন।

রাজযোগীদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে। এক দল প্রাণায়াম প্রভৃতির বিরোধী ; অন্য দল প্রাণায়াম ও মুদ্রা প্রভৃতির পক্ষসমর্থন করিয়া থাকেন। ইহা কেবল দৃষ্টির বৈলক্ষণ্যমাত্র। মনে করুন, যদি দুইটি রেলের গাড়ী ক ও খ দুই দিকে চলিতে থাকে, এবং দুইটিই যদি এক ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল

ধাবমান হয়, তবে "ক"র আরোহী মনে করে যে, "খ" ঘণ্টায় ১২০ মাইল চলিতেছে। যদি উভয়ে এক দিকে চলে, তবে উভয়ে মনে করে, উভয়ই দাঁড়াইয়া আছে। সেইরূপ, যদি "ক" ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল চলে, এবং "খ" ত্রিশ মাইল চলে, এবং "খ" বিশ মাইল চলে, তবে "খ" মনে করে যে, "ক" ঘণ্টায় ১০ মাইল দৌড়িতেছে। গণিত অনুসারে—

৩০ ৩০
১। ক + খ = ৬০
৩০ ৩০
২। ক − খ = ০
৩০ ২০
৩। ক − খ = ১০

এই তৃতীয় দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত রাজযোগিগণ বৃথা প্রাণায়াম প্রভৃতি করিয়া ঘণ্টায় দশ মাইলের একটা আকার খাড়া করিতেছেন। যখন উদ্দেশ্য মনঃসংযম, তখন সকলে এক চালে চলিলেই ধরা শান্ত ও স্থির বলিয়া বোধ হইবে। ইহার উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন যে, উভয়ে ত্রিশ মাইল দৌড়ায় না কেন, কিংবা একেবারে স্থির হইয়া থাকে না কেন? তাহার উত্তরে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—"হে পার্থ! কর্ম্ম কর, কর্ম্ম না করিলে তোমার একদিনও চলিবে না।" (মূল বচন মনে নাই, দরকারও নাই।)

কথাটা এই যে, কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলে পরস্পরের গতির তারতম্যও লক্ষিত হয়। কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিলে কাহারও সহিত অন্য কাহারও গোলযোগ বাধে না। সহৃদয় রাজযোগী তাহা বুঝিয়া লন।

রাজযোগাবলম্বিগণের নিম্নদেহ (Lower bodies of Man) শুষ্ক হইয়া যায়। যেমন পোড়া তামাকু টানিলে দুর্গন্ধ ছাড়ে মাত্র, সেইরূপ রাজযোগিগণকে লইয়া বৃথা টানাটানি কর্ম্মভোগ। জ্ঞানের চক্ষুতে প্রেম, সখ্যতা, আত্মত্যাগ, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি মনের বৃত্তিমাত্র; ইহাদিগের নিরোধ করিতে হইবে;—নষ্ট করিতে নাই। এক জনের প্রতি ধাবিত হইলে প্রেম প্রেমই নহে, স্নেহ স্নেহই নহে। ভ্রাতৃভাব, সখ্যভাব, সহৃদয়তা, প্রত্যেক নরনারীর উপর বর্ষিত না হইলে যোগের সার্থকতা হইল না। কোন একটা বৃত্তি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হইলে তাহার নাম রস। প্রেম-নামক ভাব পুষ্পে কেন্দ্রীভূত

হইলে গোলাপের গন্ধ ছাড়ে ও দেখিতে রক্তবর্ণ হয়,—হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে ব্যক্তিবিশেষে তাহা কামরূপে প্রতিভাসিত হয়, এবং অন্য ব্যক্তিতে তাহা প্রণয়-রূপে দাঁড়ায়। ইহারও বর্ণ লাল। এই বৃত্তি মনসক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইলে প্রথমে তাহা জ্ঞানরূপে হরিদ্রাবর্ণ হয়, এবং অসীম ভক্তিরূপে অবশেষে নীলবর্ণ ধারণ করে। উদাহরণ,—যেমন শ্যামলবর্ণ দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, শস্যতৃণ প্রভৃতি ধরার সহিত কামদেহে প্রেম করিতেছে; হরিদ্রাবর্ণ হইলে বুঝিতে হইবে,—তাহারা পাকিয়াছে, কিংবা শুকাইয়া যাইতেছে। এইরূপ স্তরে স্তরে একই বৃত্তির নানা বর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, সকলের প্রেম প্রভৃতি এখন Plane of orbit পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

প্রেমিক নিধিরাম খুড়া প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে ধনসঞ্চয় করিতে মধ্য-প্রদেশে গিয়াছিলেন। সেখানে খাটিয়া খাটিয়া পোড়া কাকের মত চেহারা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে অনেক টাকা। কিন্তু টাকা লইয়া নিধি-রাম খুড়ার জীবনে তৃপ্তি হইল না। নিধিরামের জীবনের তিনটি সাধ ছিল। প্রথমতঃ, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সাধের ইন্দুমতীকে বিবাহ করিবেন; দ্বিতীয়তঃ, পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত গোটা গল্‌দা চিংড়ীর চাট্‌ করিয়া বেচারাম শাহার এক টাকা বোতলের মদ্য পুনরায় পরীক্ষা করিবেন; এবং তৃতীয়তঃ, এইরূপে সুখের চরম সীমায় পঁহুছিয়া একবার দক্ষিণ বাতাসে তেতালার ছাতে চন্দ্রকিরণে নাসিকাধ্বনিসহকারে নিদ্রা যাইবেন। মনে করুন, এ সাধে কাহারও কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ইন্দুমতী আর সে ইন্দুমতী নাই! প্রেমের নামে ইন্দু চটিয়া যায়। ইন্দু আর নিধিরামকে দেখিতে পারে না। সেই দশ বৎসরের বালিকা ইন্দু যুবক নিধিরামের বীর হৃদয়ের উপর কোমল করপল্লব রাখিয়া দিব্য করিয়াছিল যে, নিধিরামই তাহার মনোমত বর। সে ইন্দু এখন যুবতী! ইন্দুর সে প্রতিজ্ঞা কই, ভালবাসা কই? এখন ইন্দু নিধিরামকে দেখিলে হাসে?

নিধিরাম খুড়া বুঝিতে পারিলেন যে, ধরা শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। ভালবাসা জগৎ হইতে অপসৃত হইতেছে। জ্ঞানানল প্রজ্বলিত হইয়া কোমল হৃদয়গুলিকে আলুপোড়ার মত দগ্ধ করিতেছে। নিধিরাম কাঁদিয়া বলিলেন, "ইন্দু, তুমি ত আর সে ইন্দু নও, তুমি এত ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরিয়াছ কেন?" হতাশহৃদয় নিধিরাম খুড়া বন্ধুবর্গের মধ্যেও ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিলেন। "ভাই রাম; এখন গল্‌দা চিংড়ী কেমন লাগে?" রাম কোটরে চক্ষু ঘুরাইয়া

বলিল, "আমি এখন স্বামীজীর শিষ্য ; মহামুদ্রা কসিতেছি ; আমার নিকট চিংড়ী টিংড়ির কথা কহিও না।" রাম চিংড়ী খায় না, শ্যাম আর মদ খায় না, সে রাজযোগী।

নিধিরাম ভাবিলেন, "তবে ইহারা কি ভালবাসে ? আগে যে রাম আমাকে দেখিলে আনন্দে আটখানা হইত, সে রাম এখন চিংড়ী মাছ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে।" হায় ! হায় ! নিধিরাম চক্ষের জলে ভাসিয়া একাকী ভাজা চিংড়ী চাটু করিয়া খাইলেন ; কিন্তু মদের নেশাটা প্রেমের নেশা, একলা কখনই ভাল লাগে না ; সুতরাং নিধিরামের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। জগতে একাকী— নিধিরাম খুড়া আর কিছুতে রস পাইলেন না ; অবশেষে চটিয়া বলিলেন, "এ শালারা সব জুয়াচোর।"

কিন্তু নিধিরাম খুড়ার এরূপ ভাবা দোষ। প্রথমেই বলা গিয়াছে, স্নেহ যত প্রসারিত হয়, নিম্নক্ষেত্রগুলি তত শুষ্ক হইয়া পড়ে। ভালবাসিও, কিন্তু কাঁদিও না। কাঁদিও, কিন্তু চক্ষে অশ্রু আনিও না। কাজেই যত স্নেহমধুর প্রবৃত্তিগুলি সূক্ষ্মভাবে উর্দ্ধজগতে বিচরণ করে, ততই ইহাদিগের আকার নিরাকারের দিকে যায়। যখন করুণা কোনও ব্যক্তিবিশেষে আরোপিত হয়, তখন করুণা মূর্ত্তিমতী হয় বটে, কিন্তু সে করুণার মূল্য নাই। যখন করুণা সর্ব্বজীবে বিস্তৃত হয়, তখন করুণার আকার সূক্ষ্ম দাঁড়ায়, এবং সে করুণার আগাগোড়া বুঝা যায় না।

রাজযোগিগণের তাহাই। তাঁহাদিগের করুণা অতিবিস্তৃত, অতএব অদৃশ্য। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, একটি ক্ষুদ্র জীবের স্নেহ, করুণা, প্রভৃতি এত বড় ক্ষেত্র ব্যাপিয়া থাকে কিরূপে ? যেমন এক ভরি সোনা পিটিয়া দশ যোজন বিস্তৃত $\frac{1}{1000}$ ইঞ্চির পাত প্রস্তুত করা যায়, সেইরূপ একটা জীবাত্মাকে পিটিয়া লম্বা করিলে হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার নাম "আমিত্বের প্রসার"। যখন দেখিবেন, আত্মা আর কিছুই অবলম্বন করিতেছে না, যখন হৃদয়-প্রবৃত্তিগুলি বাষ্পের ন্যায় উড়িয়া মেঘরূপে জগতে ক্ষরণোন্মুখ, তখন জানিবেন যে, রাজযোগীর আত্মা আকাশে বিচরণ করিতেছে। তখন আত্মা আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। স্বল্পদর্শী পুরুষের ইহা স্বার্থপরতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বহুদর্শীর নিকট ইহাই সত্যযুগের পুনরাবির্ভাব।

রাজযোগিগণ ইচ্ছা করিলে নেশা করিতে পারেন, কিন্তু করেন না।

নেশা প্রভৃতি নিম্ন প্রকৃতির গুণ। মাদক দ্রব্যের সম্বন্ধে রাজযোগিগণের মত এই :—

বায়ুপ্রধান	জ্ঞানমার্গ [রাজযোগ] শৈব	গঞ্জিকা চরস সিদ্ধি, মাজুন প্রভৃতি
পিত্তপ্রধান	ঐ জ্ঞানমার্গ প্রেমমিশ্রিত— [শাক্ত ও তন্ত্র প্রভৃতির মত] হঠযোগ	মদ্য
কফপ্রধান	ভক্তিমার্গ [ছোটলোকের]	তাড়ি হেঁড়ে কোকেন তামাক
	ঐ (যদুবংশ) কালাচাঁদ	অহিফেন

সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, তিন গুণ হইতে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর মাদক দ্রব্য উদ্ভূত হইয়াছে। যাঁহারা যোগারূঢ়, তাঁহাদিগের পক্ষে কোন মাদক দ্রব্যই প্রয়োজনীয় নহে। যাঁহারা নিম্ন দেহের প্রক্রিয়া বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা কফপ্রধান নেশা হইতে বায়ুপ্রধান নেশা পর্য্যন্ত সকলই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যাঁহারা অনেক কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, তাঁহারা জানেন যে, মাদকদ্রব্যাদিসেবনে কোনও ফলই নাই। রাজযোগি-গণও তাহাই বলেন।

বঙ্গে যোগবিদ্যার প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া গিয়াছে। বোধ হয়, কতিপয় বৎসরের মধ্যেই অনেক যোগীর আবির্ভাব হইবে। হিন্দুস্থান (আর্য্যাবর্ত্ত) গুরুর জন্মভূমি। পুরাকালে মহর্ষিগণের প্রত্যেকের সহস্রাধিক শিষ্য ছিল। এক জন ছোট খাট মুনিরও পঞ্চসহস্র শিষ্য ছিল। মহাভারতে ইহাদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর বালার্ককিরণে কীট পতঙ্গের ন্যায় লক্ষ লক্ষ শিষ্য বঙ্গে আসিয়া উদীয়মান হইবে, তাহার আভাষ এখনই পাওয়া যাইতেছে। যে দেশ এত শিষ্যপ্রসবিনী, যে দেশে যোগভ্রষ্ট মহাত্মগণ এইরূপে উদিত হন, যে দেশে অনাহারে, পেটে ও পৃষ্ঠে এত

সহিয়াও, কারুণিক রাজযোগিগণ জীবের হিতার্থ জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য, "শস্যশ্যামলাং মাতরং" ও "বন্দে"।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব।

ইংলণ্ডের নিকট আমরা নানা কারণে কৃতজ্ঞ। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে নবশক্তিসঞ্চারের জন্য আমরা যত কৃতজ্ঞ, তত বোধ হয় আর কোন কারণে নহে। কারণ, যে কোনও য়ুরোপীয় জাতির সংস্রবে ও প্রভাবে আমরা প্রতীচ্য সভ্যতার সিংহদ্বারে উপনীত হইতে পারিতাম; সহস্র উন্নতির সন্ধান পাইতাম। কিন্তু যে কোনও প্রতীচ্য জাতি আমাদিগকে অতি বিপুল সাহিত্যের সহিত পরিচিত করিয়া দিতে পারিত না। ইংলণ্ডের বিপুল সাহিত্যের সহিত এই পরিচয়ের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল বিভাগে যে অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা বিস্ময়কর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজের শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে রাজসভায় অনাদৃত ও সংস্কৃতসেবী পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত বঙ্গভাষা সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে কেবল কবিকুলের নিকট কিছু সেবা পাইত। সত্য বটে, সাধারণ লোকের সাধারণ কথোপকথন মাতৃভাষাতেই নিষ্পন্ন হইত, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী সাহিত্য সংগঠিত হইবার সম্ভাবনা প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। তখন পথ ঘাট ভাল ছিল না; পথিপার্শ্বে শ্বাপদসঙ্কুল কানন; পথে দস্যু তস্করের উপদ্রব। যাহাদের হস্তে দেশের শান্তিরক্ষার ভার ছিল, তাহারা রক্ষক না হইয়া প্রায়ই ভক্ষক হইয়া উঠিত। শৃঙ্খলার অভাবে দিল্লীর শাসনদণ্ড বাঙ্গলায় ও মুর্শিদাবাদের শাসন-প্রতাপ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রসারিত হইত না। সে দুর্দ্দিনে লোকের পক্ষে স্বগ্রাম ত্যাগ করাই প্রায় অসম্ভব ছিল। জনগণের পক্ষে বহির্জগতের প্রভাবে চিন্তা বা জ্ঞান প্রসারিত করা অসম্ভব হইত না। বাঙ্গালা তখন তাহাদেরই কথোপকথনের ভাষা। কেবল কোন কোন ভক্ত-কবির ভক্তিপুষ্পদাম মাতৃভাষার ক্ষীণপ্রবাহে ভাসিয়া যাইত। কেবল সঙ্গীত ভিন্ন ভাষায় রচিত হইলে প্রাণস্পর্শী হয় না, ব্যর্থ হয় বলিয়াই সাধন-সঙ্গীত

ও প্রেমগীত বাঙ্গালাতেই রচিত হইয়া গীত হইত। দেশীয় ধনীরাও ক্বচিৎ মাতৃভাষা-সেবীদিগকে সাহায্যদানে উৎসাহিত করিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমে বাঙ্গালা কবিতাতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

ইহার পর মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তিম দশা। তখন বিলাসব্যসনবিপন্ন মুসলমানের রাজপ্রাসাদে বিলাসবাসনাও ক্রমাগত চরিতার্থতাহেতু নূতনত্বের চাকচিক্যহীন হইয়া আসিয়াছে। তখন জাতির মানসিক শক্তিকে সচেতন ও সচেষ্ট করিবার উপযোগী ঘটনার ও কর্ম্মশীলতার একান্ত অভাব। জীবন দৈনন্দিন কার্য্যের ভারে কাতর; হৃদয় আশা, আগ্রহ, আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষাশূন্য। এই সময়ের কবিতাতেও কালের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের কবিতা এই সময় রচিত। কবিতার কোমল প্রবাহে, ভাষাসম্পদে, নিপুণ বাক্যবিন্যাসে ও প্রবাদ-বাক্যসৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র অদ্বিতীয়। তাঁহার গীতে যেমন বৈচিত্র্য, তেমনই মাধুরী। তাঁহার ভাষার ঝঙ্কারে ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, বর্ণিত বিষয় চিত্রের মত ফুটিয়া উঠে। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে করিতে পুনঃপুনঃ মনে হয়,—এ বাক্যবিন্যাস অনিন্দ্যসুন্দর। তিনি তাঁহার পূর্ণ ভাণ্ডার হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নরাজি লইয়া মাল্যরচনা করিয়াছেন; কুসুমকাননের শ্রেষ্ঠতম কুসুম চয়ন করিয়া উপহারের ডালা সাজাইয়াছেন। যেখানে তিনি পূর্ব্ব সূরিদিগের রত্ন গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানেও সিদ্ধহস্ত মণিকারের মত তাহাকে সংস্কৃত করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন,—তাহার শতচক্ষে দীপ্তি ঠিকরিয়া পড়িয়াছে। বাক্যবিন্যাসে তেমন ক্ষমতা কয়জন কবি দেখাইতে পারিয়াছেন? কিন্তু সে কবিতার ভাষার নিকট ভাব ম্লান; ভাষাই সমুজ্জ্বল, ভাব মলিন; ভাষা প্রচুর, ভাব স্বল্প; কবি ভাষাসম্পদে ধনী, কিন্তু ভাবে দীন।

ইহার পর পলাশীক্ষেত্রে বাঙ্গালার ভাগ্য পরীক্ষিত হইল। মুসলমানের দুর্ব্বল-হস্তচ্যুত শাসনদণ্ড ইংরাজের করায়ত্ত হইল। তখন এক রাজ্যের ধ্বংস, অন্যের অভ্যুদয়;—চারি দিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, অশান্তি, সংগ্রাম,—

> লোহিত শোণিতস্রোতে সিক্ত ধরাতল;
> বেদীচ্যুত দেবমূর্ত্তি; মন্দির সকল
> ভগ্নচূড়; অগ্নিশিখা নিশীথ অম্বরে;
> গৃহ-সহকার হ'তে ছিন্ন পাপকরে

ললিতা মাধবী, চাহে নিবাতে জীবন,
লাঞ্ছিত জীবন হ'তে বাঞ্ছিত মরণ।

এ সময় কবিতা স্ফূর্ত্তির পক্ষে উপযোগী নহে; রক্তসিক্ত ভূমিতে কবিতা-কুসুম ফুটে নাই। প্রাচীন পুঁথি-পরীক্ষায় জানা যায় যে, ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভকালে বাঙ্গালা-সাহিত্যস্রোত রুদ্ধগতি হইয়াছিল।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্য আমাদের অনেকের অনধিগম্য; যে ভাষায় প্রাচীন ভারতের ভাব ও চিন্তারাশি ব্যক্ত, সে ভাষা কেবল এক সম্প্রদায়ের একাংশের নিকট পরিচিত—সে ভাষা ইতিহাসের সহায় হইতে পারে, কিন্তু নিত্য মনোভাবপ্রকাশের ভাষা নহে; তাহা প্রমোদভবন-প্রহ্লাদী ক্ষুদ্র সরোবর হইতে পারে, তাহাতে বর্ণবৈচিত্র্যবহুল মৎস্যরাজি ক্রীড়া করে, প্রমোদভবনের প্রতিবিম্ব কম্পিত হয়, বসন্ত-পবনস্পর্শলোলুপা শুদ্ধান্ত-শোভিনীদিগকে লইয়া প্রমোদতরণী মরালীর মত ভাসিয়া যায়; কিন্তু জীবনধারণের জন্য, ভূমির উর্ব্বরতা-সাধনের জন্য প্রবাহিণীর প্রয়োজন। আমাদের যখন এই অবস্থা, তখন ভারতবর্ষ ইংরাজের শাসনাধীন হইল। ইংরাজ-শাসনের স্থায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ্ হইল; দেশে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল; পথ সুগম হওয়ায় লোকের পক্ষে গমনাগমনের সুবিধা হইল; লোকের পক্ষে অভিজ্ঞতালাভ সহজসাধ্য হইয়া আসিল; দেশের লোক সাহিত্যচর্চ্চায় মন দিবার অবকাশ পাইল। দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে ইংলণ্ডের সাহিত্যের প্রভাব বাঙ্গালীর বিরোধ হেতু সঞ্চিত মানসিক শক্তিকে মুক্ত করিয়া দিল।

নবশিক্ষাদৃপ্ত বাঙ্গালীর নিকট মাতৃভাষার দৈন্যবিমোচন প্রথমে অসাধ্য-সাধন বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। তাই তাঁহারা ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষায় পরিণত করিবার দুরাশাচালিত হইলেন। তাঁহারা ইংরাজী বলিতে ও ইংরাজী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, ইংরাজীতে ভাবিবার ও নিমচাঁদের মত ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিবার কল্পনাও করিলেন। নব্যবঙ্গের সাহিত্যরথীদিগের অনেকের ইংরাজীতে হাতে খড়ি। মধুসূদন পরিণত বয়সে বাঙ্গালারচনায় হস্তক্ষেপ করেন; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ইংরাজীতে রচিত!

বাঙ্গালীর ইংরাজী রচনার চেষ্টা যে নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। রামমোহন রায় যখন সংস্কার-সংগ্রামে রত, তখন বাঙ্গালী

কেবল ইংরাজী শিখিতেছে। তথাপি জেরিমি বেন্থাম বলিয়াছেন, তাঁহার রচনা ঐতিহাসিক মিলের রচনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তরু দত্তের ইংরাজী কবিতা ইংলণ্ডে অনাদৃত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক এড্‌মণ্ড গস্‌ তাঁহার "Critical Kitkats" গ্রন্থে তরু দত্তের কবিতার সহিত প্রথম পরিচয়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে একদিন তিনি "Examiner" পত্রের আফিসে উপস্থিত হইয়া সমালোচনাযোগ্য নূতন পুস্তকের অভাবের কথা বলিতেছিলেন। সেই সময় পোষ্টম্যান একখানি পুস্তক দিয়া গেল। সেখানি ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত; ভবানীপুর সাপ্তাহিক-সংবাদ যন্ত্রে মুদ্রিত; নাম, "A sheaf gleaned in French Fields" তরু দত্তের রচনা। দেখিয়া বোধ হইল, সেখানি অবিলম্বে বাতিল কাগজের গাদায় নিক্ষেপের উপযুক্ত। সম্পাদক জিদ করিয়া তাঁহাকে সেখানি দিলেন,—যদি সমালোচনার যোগ্য হয়। তিনি কিন্তু সে পুস্তক লইতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন পুস্তকখানি খুলিয়া কবিতা পাঠ করিলেন, তখন যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন,—

এখনো তোমার রুদ্ধ দুয়ার?
পূরবে শোণিমা অরুণরাগে;
প্রভাত-সমীর জাগায় অধীর
গোলাপে; ও আঁখি কেন না জাগে?

প্রেম, আলো, গান করে তোমা ধ্যান,
রক্ত আকাশ আলোকে ভাসি';
বিহগের স্বরে সুধাধারা ঝরে;
আমার হৃদয়ে প্রণয়রাশি।

দূরে দূরে, হায়, জীবন বৃথায়!
নিয়তি প্রতারি' কি ফল লভি?
এ প্রেম আমার নহে কি তোমার?
ও রূপ তোমার আমারি সবি।

তুমি তবে ঘুমাও না আর;
শুন তবে শুন মোর বাণী।
মোর শুধু ঝরে আঁখিধার;—
কোথা তুমি কোথায় না জানি।

মূলের সৌন্দর্য্য অনুবাদে রক্ষিত হয় না; কাজেই এই অনুবাদে তরু দত্তের রচনার শব্দচাতুর্য্য বা মাধুর্য্য বুঝাইতে পারিলাম না। এই কবিতার কথায় গস্ বলেন, কবিতায় যদি এরূপ উৎকর্ষ থাকে, তবে তাহার ছাপা বা কাগজে কি আসে যায়? তিনি বলেন, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই বিদেশজাত কোমল কবিতা-কুসুমের উল্লেখ থাকিবেই। এই রচনার সময় তরু দত্তের বয়স সপ্তদশ অতিক্রম করে নাই। তাঁহার ফরাসী রচনা আরও মধুর। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত গদ্যে ও পদ্যে বহু ইংরাজী পুস্তকের রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রসিদ্ধ। তাঁহার রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদপাঠে বহু বিদেশী পাঠক প্রাচীন ভারতের সভ্যতার পরিচয় পাইয়াছেন। সুকবি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের নাম ইংলণ্ডে একান্ত অপরিজ্ঞাত নহে। আমাদের মত বিজিত, বিলুপ্তবীর্য্য জাতি একটা বিজয়ী, জীবন্ত জাতির সংস্রবে আসিলে তাহাদের ভাবের ও চিন্তার অনুকরণ না করিয়া পারে না। কাজেই আমাদের সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই প্রথমে বঙ্গদেশে বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষার উচ্ছেদসাধনই সম্ভব বিবেচনা করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী-চর্চ্চায় মন দিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরে সে ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদিত হয়—স্রোত ফিরে।

নব্যবঙ্গের অলৌকিকী কীর্ত্তি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আদর্শ ইংরাজী; "দুর্গেশনন্দিনীতে" স্কটের ছায়া সুস্পষ্ট। মধুসূদনের মহাকাব্যেরও আদর্শ য়ুরোপীয়—তাঁহার প্রতিভা-মধুকর নানা দেশের কাব্যোদ্যানের কুসুম হইতে মকরন্দ সংগ্রহ করিয়াছে। নব্যবঙ্গের সাহিত্যে কাব্যের ত্রিধারা মধুসূদনের, হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কবিতা ইংরাজী প্রভাববিশিষ্ট। "বৃত্রসংহার" কাব্যের বিজ্ঞাপনে হেমচন্দ্র বলিয়াছেন, "বাল্যাবধি আমি ইংরেজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি * * সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরেজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন * * লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।" "ইন্দ্রের সুধাপান" একটি উৎকৃষ্ট কবিতা; কিন্তু ড্রাইডেনের কবিতা তাহার আদর্শ। নবীনচন্দ্রের—

"চলুক্ চলুক্ নাচ, টলুক চরণ,
উড়ুক্ কামের ধ্বজা,—কালি হবে রণ।
* * * *

ধ্রুম্ করে' দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি,
এ কি গো? কিছু না, সুধু মেঘের গর্জ্জন;
নাচ, গাও, পান কর, প্রফুল্লিতমন।"

পাঠ করিতে করিতে বায়রণের কবিতা মনে পড়ে,—

"But hush ! hark ! a deep sound strikes like a rising knell.
Did ye not hear it ?—No ; 't was but the wind,
Or the car rattling o'er the stoney street ;
On with the dance ; let joy be unconfined ·
No sleep till morn, when Youth and Pleasure meat
To chase the glowing Hours with flying feet"

নব্যবঙ্গের গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় 'কালো আঁখির' উল্লেখ কয় বৎসর মাত্র পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে; তাঁহার প্রতিভাও ইংরাজী-প্রভাবপুষ্ট। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, ইঁহাদের মৌলিকতা নাই। ইঁহাদিগের নিজস্ব সম্বল প্রচুর; ইঁহাদিগের রচনা আমাদের গর্ব্বের বিষয়। ইঁহাদিগের প্রতিভা "কবির চিত্তফুলবনমধু" লইয়া যে মধুচক্র রচনা করিয়াছে, তাহা হইতে গৌড়জন "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

ইংরাজ-রাজত্বের সূচনাকালে দুই বিপরীত-মুখগামী সভ্যতার সংঘর্ষে সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসভ্যতাদৃপ্ত জাতির নূতন আবশ্যক পূর্ণ করিবার জন্য গঠিত ভাষা অসাধারণ ও ক্রমবর্দ্ধনশীল বেগে পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা প্রকাশ-চেষ্টায় লক্ষিত হইল, বঙ্গভাষার আপাত-গতিহীন দেহে অসাধারণ শক্তি সুপ্ত ছিল। এখন তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। প্রতীচ্য-শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যবঙ্গের চালকগণ এই নিহিত শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই বঙ্গভাষার জননী সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা আবশ্যক কালে সংস্কৃতের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হইতে সম্পদ্গ্রহণে সক্ষম হইলেন। বঙ্গভাষা লাবণ্যশ্রীভূষিতা হইয়া উঠিল। রামমোহন রায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাচীন, কিন্তু ভাবপ্রকাশ-ক্ষম গদ্যের পর বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে! বিদ্যাসাগরের আতিশয্যবর্জ্জিত গদ্যরচনা, অক্ষয়কুমারের গম্ভীর ও অলঙ্কারশোভিত গদ্যরচনা, মধুসূদনের অমর অমিত্রাক্ষর পদ্যরচনা,

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রীসম্পন্ন গদ্যরচনা, হেমচন্দ্রের উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা, নবীনচন্দ্রের অলঙ্কাররমণীয় কবিতা, রমেশচন্দ্রের সরল গদ্যরচনা ও রবীন্দ্রনাথের মধুর গীতিকবিতা কখন বা অল্প দিনের ব্যবধানে, কখন বা একই সময়ের ভিন্ন ভিন্ন উৎসমুখে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে।

রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকের পক্ষে জ্ঞানসঞ্চয়ের অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনের যে সুবিধা ছিল, বাঙ্গালার লোকের পক্ষে পূর্ব্বে সে সকল সুবিধা ছিল না। বাণিজ্যের সম্প্রসারণ বা অভিজ্ঞতার অর্জ্জন সহজসাধ্য ছিল না। বাধা দূর হইতে না হইতে বাণিজ্যের স্রোতঃ শতমুখে প্রবাহিত হইল; নূতন ভাব ও নূতন চিন্তার প্রবল স্রোতে সমাজের অনেক প্রাচীন প্রথা ভাসিয়া গেল। অন্য জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ জাতির পক্ষে জাতীয় ভাষার পবিত্রতা-রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ না হইয়া যায় না। জগতে কোন্ ভাষায় বিদেশীয় শব্দ নাই? বাণিজ্য বিজয়াদি নানা কারণে বিজাতীয় শব্দ জাতীয় ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। অনেক ভাষায় বিজাতীয় শব্দের সংখ্যা জাতীয় শব্দকে সংখ্যায় পরাজিত করে। কিন্তু জীবন্ত ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অটুট থাকে। বর্ত্তমান সময়ের পারস্যের ভাষায় আরব্য শব্দের প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর; কিন্তু ব্যাকরণ ইণ্ডোয়ুরোপীয়ান, সেমিটিক নহে। কনস্তান্তিনোপলে তুর্ক ভাষায় আরব্য ও পারসীয় শব্দের সংখ্যা তুর্ক শব্দের সংখ্যার অনেক অধিক; কিন্তু তাহাতে ইহার ব্যাকরণ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ইংরাজী ভাষা বহু ফরাসী শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে; কিন্তু ফরাসী ব্যাকরণের নিয়মের অনুসরণ করে নাই। ইহাই ভাষার শক্তির প্রমাণ। বঙ্গভাষায় এ শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। বহু বিদেশীয় শব্দ বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে; কিন্তু বঙ্গভাষায় সে সকল শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। য়ুরোপীয় ভাষায় ল্যাটিনের প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট, আজ বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজীর প্রভাব তেমনই সুস্পষ্ট। কিন্তু বাঙ্গালায় সংস্কৃতই প্রধান উপকরণ। এখনও লেখকদিগের পক্ষে সংস্কৃতশব্দবর্জ্জিত ভাষায় এক পৃষ্ঠা লেখা অসম্ভব। বাঙ্গালার ভিত্তি সংস্কৃত। কাজেই বাঙ্গালার ব্যাকরণও সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবমুক্ত হইতে পারে না।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালার পুষ্টিসাধন স্বাভাবিক উপায়ে হয় নাই, তাহা স্থায়ী হইবে না। পুষ্টির উপকরণ আত্মসাৎ করিয়া—অঙ্গীভূত করিয়া যে উন্নতি, তাহাই

স্বাভাবিক। বঙ্গভাষায় তাহা হয় নাই; পরন্তু কতকগুলি বিজাতীয় উপকরণ তাহার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া আছে মাত্র। বাঙ্গালার অঙ্গাবরণ বৈরাগীর আল-খেল্লার মত জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের সমষ্টিমাত্র। এ কথা সত্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাদিগের কথায় বলিয়াছেন, "যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল; যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাকুক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না," তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগকে এখন অনেক কথা শুনিতে হয়। কিন্তু সুবুদ্ধির মত তাহা হাসিয়া উড়ানই কর্ত্তব্য। তাঁহারা বাঙ্গালীর বুদ্ধি, বাঙ্গালীর ভাষা কিছুতেই মৌলিকতার আভিজাত্যচিহ্ন দেখিতে পারেন না। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস কেবল তাঁহাদের মধ্যেই আবদ্ধ নহে; সুতরাং বিচারযোগ্য। এই মতাবলম্বীরা ভাবিয়া দেখেন না যে, আমরা মাতৃভাষার সঙ্গে প্রায় একই সময়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করি। রাজদ্বারে, বাণিজ্যে আমাদের ইংরাজী ব্যবহার করিতে হয়। ইংরাজী নহিলে পেটের জ্বালা জুড়ায় না। ফরাসী সমালোচক টেন বলিয়াছেন, যাহারা সাহিত্যের আদর করিতে জানে ও সাহিত্যের জন্য অর্থব্যয় করিতে পারে, সাহিত্য তাহাদিগেরই রুচি অনু-সারে গঠিত হয়। বাঙ্গালার নদী যেমন এক কূল হইতে মৃত্তিকা আনিয়া অন্য কূলে সঞ্চিত করে, বাঙ্গালা ভাষাও তেমনই এক কূলের জ্ঞানসম্পদ্ আনিয়া অন্য কূলে সঞ্চিত করিতেছে। মুসলমান রাজত্বকালে রাজদ্বারে পারসীই প্রচলিত ছিল, ক্রমে সমাজেও পারসীতে দক্ষতা আদৃত হইত। তাই পারসী-শব্দ অবাধে বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্রের রচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসুন্দর অনেক কবি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইতেন; তাঁহার উদ্যান সযত্নরক্ষিত —মালঞ্চের ফুলের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল, ফুল তেমনই বড় ও সরস। তাই তাহা আজও আদৃত। কিন্তু তাহাতে বহু বিদেশী ফুল অনায়াসে দেশী ফুলের সঙ্গে গ্রথিত। "অন্নদামঙ্গলে"র "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ" হইতে ছয়টি চরণ উদ্ধৃত করিতেছি—

"ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥
কোটায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।
পাতশাহী শিরোপা সুলতানী সুলতানৎ॥

ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল ॥"

এই ছয় চরণে কত পারসী শব্দ! ভারতচন্দ্রের রচনার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পারসী শব্দ বর্ত্তমান। মুসলমান-রাজত্বের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে পারসী ভাষা অনাদৃত ও ক্রমে তাহার আলোচনা ত্যক্ত হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বহু পারসী শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছিল; সে সকল বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হইয়াই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের অনেক রচনাতেও সে সকল শব্দ সংস্কৃতের পার্শ্বেই আসন প্রাপ্ত হয়। অনেক আচার যেমন বিধানের বক্র কটাক্ষ সত্ত্বেও সিংহদ্বারপথে না হউক, পশ্চাতের দ্বারপথে সমাজে প্রবেশ করে, এবং একবার প্রবেশ করিতে পাইলে সিংহদ্বারপথেও তাহাদের গতায়াত আর গোপনে নিষ্পন্ন হয় না; তেমনই সকল বিধান সত্ত্বেও অনেক বিজাতীয় শব্দ ভাষায় প্রবেশ করে, এবং একবার প্রবেশ করিতে পারিলে রহিয়াই যায়।

ইংরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীই রাজভাষা হইয়া দাঁড়াইল; সমাজেও ইংরাজীতে অভিজ্ঞতা সভ্যতার চিহ্ন হইয়া উঠিল। আজ বাঙ্গালীর হৃদয় ইংরাজী-প্রভাবে প্রভাবিত। ইংরাজের প্রভাবে দেশে বেশভূষায়, আহার্য্যপানীয়ে, ব্যায়ামবিরামে, এমন কি, আশা ও আকাঙ্ক্ষাতেও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। নূতন বিষয় ও নূতনপ্রবর্ত্তিত দ্রব্যাদির নির্দ্দেশ জন্য বিদেশীয় শব্দের ব্যবহার বিস্ময়কর নহে। এক্ষণে বিদেশ হইতে বহু নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সে সকলের নির্দ্দেশ জন্য কোন শব্দ গঠিত হইলে তাহা যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবেই, এমন নিশ্চয় জানা যায় না। বহু দিনের ব্যবহার ব্যতীত শব্দের অর্থ স্থির হইয়া দাঁড়ায় না। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে thermometre নির্দ্দেশক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আবশ্যক স্থলে এরূপে ভাষার পুষ্টিসাধন অনাবশ্যক বা নিন্দনীয় নহে। ভাষার উন্নতির পথে বিঘ্নসংস্থাপন করিলে ভাষা সহজে সর্ব্ববিধ ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইবে না; বঙ্গভাষাকে জগতের বহুজন-সেবিত ভাষা সকলের সহিত সমান আসনে সমাসীনা দেখিবার আশা সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়াইবে।

যেখানেই কোন নবসভ্যতাদৃপ্ত জাতি মাতৃভাষাকে সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশের অনুপযোগী দেখিয়াছে, সেখানেই তাহারা ভাষার পুষ্টি ও উন্নতিসাধনে

তৎপর হইয়াছে। ভাষা অলঙ্কারভারক্লিষ্টা বোধ করিলে তাহারা তাহাকে ভারমুক্ত, লঘুগতি করিয়া লইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নব্য গ্রীসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কনস্তান্তিনোপল গ্রহণকালেও প্রাচীন গ্রীক ভাষা প্রচলিত ছিল। তখন ধর্ম্মমন্দিরে প্রাচীন গ্রীকভাষাই ব্যবহৃত; ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা গ্রন্থে সেই ভাষাই চলিত। ধর্ম্মযাজকগণ প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ভাষার পরিহার করিতে সঙ্কুচিত। তখনও সর্ব্বত্র সুশিক্ষিত গ্রীকগণ প্রাচীন ভাষায় কবিতা-রচনা করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রীসের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। তখন মনীষী লেখকগণ বুঝিলেন, প্রাচীন ভাষা নবযুগের ভাবপ্রকাশের উপযোগী নহে। তাঁহারা ভাষার ভিত্তি অবিচলিত রাখিয়া, পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধনে মনোযোগী হইলেন। ফলে যে ভাষা প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা মূলে প্রাচীন ভাষা হইলেও, বর্ত্তমান সময়ের ভাবপ্রকাশোপযোগী হইয়া দাঁড়াইল।

গুজরাটী ভাষা দুই ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত। দুই জাতি ভাষাকে নবযুগের ভাবপ্রকাশোপযোগী করিবার জন্য দুই পথ অবলম্বন করিয়াছে; পার্শীরা পশ্চিমভারতে স্থায়ী হইয়া গুজরাটীকেই মাতৃভাষা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভাষার যেরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের ভাষা "পার্শী-গুজরাটী" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। হিন্দুরা বলেন, পার্শীরা তাঁহাদের মাতৃভাষাকে বিকৃত করিতেছেন। উভয় জাতির মধ্যে একই ভাষা ক্রমে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। মূলভাষা এক; হিন্দু ও পার্শী উভয়েই বিলক্ষণ বুঝেন যে, গুজরাটী ভাষা এখনও বর্ত্তমান কালের সর্ব্ববিধ ভাবপ্রকাশে সক্ষম নহে। কিন্তু ভাষার উন্নতিকল্পে দুই দল দুই ভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন। পার্শীরা পারসী শব্দ ও আবশ্যক হইলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেছেন; হিন্দুরা সংস্কৃত হইতে শব্দগঠন করিয়া লইতেছেন। ইংরাজী এঞ্জিন বুঝাইতে পার্শীরা গুজরাটীতে "ইঞ্জিন" লিখিতেছেন; কিন্তু হিন্দুরা সংস্কৃত ধাতু ধরিয়া শব্দগঠন করিতেছেন। যখন আমাদের সাহিত্যে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসাদির অপেক্ষা সেক্সপীয়ার, টেনিসন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতির প্রভাব অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তখন আমাদের ভাষায় ইংরাজীর প্রভাব অনিবার্য্য। ইংরাজী 'এঞ্জিন" অর্থে বাঙ্গালা বাষ্পীয়যান ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সে কেবল

Locomotive engine অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। বিশেষতঃ, বহু-দিন ব্যবহার ভিন্ন নব-গঠিত শব্দের অর্থ স্থির হইয়া দাঁড়ায় না। যে স্থলে বিদেশী দ্রব্য ও তাহার বিদেশী নাম বিশেষ পরিচিত—সকলেরই নাম বলিলে দ্রব্যটি বুঝিতে পারে, সে স্থলে অনিশ্চিত অর্থের নূতন শব্দ গঠিত না করিয়া পরিচিত বিদেশী শব্দের ব্যবহারে দোষ কি ?

বাঙ্গালায় এইরূপে বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। আমরা মূলের উচ্চারণ অবিকৃত রাখি। তাহাতে ভাষার ভবিষ্য ইতিহাসলেখকের, অভি-ধানকারের অনেক শ্রমলাঘব হইবে। আমরা "ইঞ্জিন" না লিখিয়া "এঞ্জিন" লিখি।

আমি যে নিতান্তই দুরাশাচালিত হইয়া বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও অভিধান-কারের কথা বলিয়াছি, এমন বোধ হয় না। পরিষদ আমাকে শব্দ-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। সেই সুযোগে আমি লক্ষ্য করিয়াছি,বাঙ্গালার নানা স্থানে সাহিত্য-সেবিগণ ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতিমাত্র আকাঙ্ক্ষা করিয়া প্রচলিত বিজাতীয় শব্দের তালিকা সংগ্রহ করিতেছেন ; প্রচলিত শব্দের মূলনির্ণয়ে সচেষ্ট হইতেছেন। তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ, অক্লান্ত সাধনায় সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী হইয়া আসি-তেছে। বঙ্গভাষার বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ অভিধানলাভের আশাও সুদূরপরাহত নহে। পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী সভ্য, শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যসুহৃদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বহুজনসাধ্য বৃহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়া অদম্য উৎ-সাহে কার্য্য করিতেছেন। এই সকল আন্তরিক চেষ্টা নিষ্ফল হইবার নহে।

সাহিত্যে জাতির চিত্র ও চরিত্র প্রতিফলিত হয়। জাতির ভাব ও অভাব, ঐশ্বর্য্য ও দীনতা, উন্নতি ও অবনতি, রাজনীতি ও সমাজচিত্র, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সবই প্রতিফলিত না হইয়া যায় না। জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ। একের উন্নতি অপরের উন্নতির, একের অবনতি অপরের অবনতির নির্দ্দেশক।

আমরা মাতৃভাষার সহিত প্রায় এক সময়েই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করি ; আমরা শৈশব হইতেই ইংরাজী ভাবে অভ্যস্ত হই ; আমাদের রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের অনুকরণ, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ইংরাজী প্রভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। আমাদের জাতীয় জীবনে যখন ইংরাজীর প্রভাব পদে পদে

পরিস্ফুট, তখন আমাদের জাতীয় ভাষায় ও সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব অনিবার্য্য।

জটিল ভাষা ও কুটিল প্রণালী ভাবপ্রকাশের সহায় না হইয়া অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কৃত নাটকে পাত্র ও ভাবপ্রকাশের প্রণালী যখন একান্তই স্থির নিয়মে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও আখ্যায়িকার ঘটনাবলী সম্পূর্ণ করিবার জন্য, এক জনের ব্যবহারে বা বাক্যে অপরের হৃদয়ভাব স্বরিত প্রকাশের জন্য প্রাকৃত ব্যবহৃত হইত। ইংরাজীর প্রভাবে বাঙ্গালার জীবনে ও ভাষায় প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এমন কি, বাঙ্গালা সাহিত্যে ফরাসী লেখক রোপাঁসা ও জর্ম্মান কবি হায়েনের প্রভাব বিস্ময়কর। বাঙ্গালায় সংবাদপত্র-প্রচার, মাসিকপত্র-প্রকাশ, রাজনৈতিক ও সমাজিক মত-প্রকাশের জন্য পুস্তিকা-রচনা—এ সকলই নূতন। বাঙ্গালার উপন্যাস ও গীতিকবিতা ইংরাজী প্রভাবের পরিচায়ক। বাঙ্গালা নাটক ইংরাজী নাটকের আদর্শে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তনের জন্য ভাষাকেও পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে ও হইবে। এক্ষণে আমাদের পক্ষে ভাষার আবশ্যক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ভাষাকে নবযুগের সর্ব্ববিধ ভাবপ্রকাশের উপযোগিনী করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, ভাষার ভিত্তি সংস্কৃত;—ভিত্তি শিথিল করিলে তদুপরি গঠিত রম্য হর্ম্ম্য স্থায়ী হইবে না।

ভাষাকে অনাবশ্যকভারমুক্ত করিয়া, তাহাকে সর্ব্ববিধ ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত করিলে, তাহার কঠোর চরণশৃঙ্খল মুক্ত করিয়া তাহার গতি সহজ করিয়া দিলে, তাহার ভাণ্ডার সর্ব্ববিধ আবশ্যক শব্দে পূর্ণ করিলে, ভাষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে,—নতুবা নহে। সময় সময় কোন ভ্রান্ত ব্যক্তি ভ্রান্ত বিশ্বাসবশে ভাষার স্বাভাবিক গতিকে প্রতিহত করিয়া জীবনদায়ী প্রবাহ রুদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, তাঁহাদিগের ভ্রান্ত চেষ্টায় কোনও স্থায়ী ফল ফলে নাই। কোনও প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক বলিয়াছেন, যুগে যুগে অনেক লেখক ফরাসী ভাষার নির্ম্মল সলিলে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টায় ভাষার প্রবাহ আবিল হয় নাই। আজ বঙ্গভাষার পরিপুষ্ট প্রবাহ বাধামুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। আশা করি, কাহারও ভ্রান্ত চেষ্টায় সে প্রবাহের গতিরোধ হইবে না, সে প্রবাহ আবিলতা প্রাপ্ত হইবে না; পরন্তু গঙ্গার পূত

প্রবাহ যেমন যুগে যুগে ভারতবর্ষে উর্ব্বরতা, সৌন্দর্য্য ও জীবন সঞ্চারিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তেমনই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে সৌন্দর্য্য ও শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রবাহিত হইবে; বাঙ্গালীকে ধন্য করিবে।*

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নবকৃষ্ণের জীবনচরিত ও নন্দকুমার।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে বিরাট্ রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, তাহার সহিত মহারাজ নন্দকুমারের পূর্ব্বাপর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রই অবগত আছেন। সেই সম্বন্ধের ফলে তাঁহাকে যে জীবনবিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল, ইহাও কাহারও অবিদিত নাই। মহারাজ নন্দকুমারের বিষয় লইয়া তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষায় অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি তাঁহার অনুকূলে এবং কতকগুলি বা প্রতিকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সম্প্রতি বঙ্গভাষায়ও মহারাজ নন্দকুমারের সম্বন্ধে আলোচনা আরব্ধ হইয়াছে। এই আলোচনার প্রথম প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন। তিনি স্বীয় নন্দকুমার নামক উপন্যাসে প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনা করেন, কিন্তু তাঁহার ঔপন্যাসিক গ্রন্থে কোন্ বিষয় সত্য ও কোন্ বিষয় মিথ্যা, তাহা সহসা হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। সেই জন্য অনেকে সে বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। তাহার পর "ভারতী", "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী", "বিশ্বকোষ"প্রভৃতিতে মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনীসমালোচনা প্রকাশিত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ শাস্ত্রী স্বপ্রণীত "নন্দকুমারচরিত" নামক গ্রন্থে মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করায়, অনেকের সে বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইহারই ফলে দেখিতেছি যে, শ্রদ্ধাস্পদ ইণ্ডিয়ান নেশন সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন্. এন্. ঘোষ সাহেব মহোদয় স্বরচিত "নবকৃষ্ণের জীবনচরিত" নামক ইংরাজী গ্রন্থে এ বিষয়ের গুরুতর আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন। নবকৃষ্ণের জীবনচরিতে নন্দকুমার সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থাপিত করিবার কারণ এই যে, নবকৃষ্ণ ও নন্দকুমার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, এবং কোন কোন বিষয়ে পরস্পরের সম্বন্ধও ছিল। কিন্তু নন্দকুমারের সহিত নব-

---

* সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

কৃষ্ণের যে যে বিষয়ে সম্বন্ধ ছিল, সেই সেই বিষয়ের তীব্র সমালোচনা করিলেই ঘোষ সাহেবের গ্রন্থের উপযোগী হইত বলিয়াই আমাদের ধারণা। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি নবকৃষ্ণের জীবনীতে নন্দকুমার সম্বন্ধে যে দুই অধ্যায় লিখিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য, নবকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী নন্দকুমারকে সাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। ঘোষ সাহেব উক্ত দুই অধ্যায়ে যে কেবল নন্দকুমারের প্রতি গালি বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। যে সমস্ত আধুনিক বঙ্গীয় লেখক নন্দকুমারের জীবনী সমালোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও তিনি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঘোষ সাহেবের সেই সমালোচনার আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই প্রবন্ধে আমরা নবকৃষ্ণের জীবনীর সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। কারণ, আমরা জানি, তাহাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন ও বহুতর অপ্রীতিকর বিষয়ের উত্থাপন করিতে হয়। সেই জন্য আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল ঘোষসাহেবলিখিত নন্দকুমারের চরিত্র-সমালোচনা সম্বন্ধেই মন্তব্যপ্রকাশ করিতেছি।

এই মন্তব্যপ্রকাশের পূর্ব্বে, আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণ নন্দকুমারকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাদের মতে, নন্দকুমার স্বীয় প্রভু ও স্বদেশের কল্যাণের চেষ্টা করিয়া ইংরাজ কোম্পানীর বিষদৃষ্টিতে পতিত হন, এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ঘোরতর বিদ্বেষের ফলে অবশেষে তাঁহাকে জীবনবিসর্জ্জন দিতে হয়। তাঁহার চরিত্র যে একেবারে নির্ম্মল ছিল, এরূপ নহে; তাহাতে স্বার্থ ও কূটনীতি মিশ্রিত ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি কেবল স্বীয় প্রভু ও স্বদেশের কল্যাণের চেষ্টায় অবশেষে আপনার জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য, তিনি যে সামান্য ব্যক্তি নহেন, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। উল্লিখিত মন্তব্যের সমর্থনের জন্য আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণের কোন গ্রন্থ হইতে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে।—"মহারাজ নন্দকুমারের জীবনীসমালোচনা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাঁহার জীবিতকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রের উপর এক দিকে অসংখ্য কশাঘাত পড়িয়াছে, আবার অন্য দিকে সুস্নিগ্ধ প্রলেপে সে আঘাত দূর করিবার চেষ্টা করাও হইয়াছে। তাঁহার সময়ের যত ইতিহাস বা বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রায়

সমস্তই তাঁহার শত্রুপক্ষের কল্পিত। কি মুসলমান লেখক, কি ইংরাজ ঐতিহাসিক, সকলেই একবাক্যে তাঁহার দোষকীর্ত্তন করিয়া জগতের সমক্ষে বাঙ্গালী জাতিকে অত্যন্ত হেয় করিয়া তুলিয়াছেন। কোন কোন ইংরাজ-লেখক নন্দকুমারের সহিত সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপর এরূপ গালি বর্ষণ করিয়াছেন যে, তাহা শ্রবণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যক হইয়া উঠে। আবার কেহ কেহ সেই নন্দকুমারকে 'Great Rajah Nundcomar বলিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রভুভক্তি ও স্বদেশের স্বত্বাধিকারের প্রতি অনুরাগই সমগ্র ব্রিটিশ জাতির গালিবর্ষণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহারাজ নন্দকুমারের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য সমালোচনা করিয়া প্রকৃতসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে অনেক স্থান ও;সময়ের আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব। তবে আমরা এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বাস্তবিক মহারাজ নন্দকুমার তৎকালীন প্রবঞ্চক ইংরাজ কোম্পানীর হস্ত হইতে তাঁহার প্রভুর ও স্বদেশের স্বত্বরক্ষার জন্য আপনার জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল, সে বিষয়ের বিরুদ্ধ কোন তর্ক আমাদের মনে স্থান পায় না। তবে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য যে একেবারে স্বার্থশূন্য ছিল, সে কথাও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। শিবাজী বা রাজসিংহের ন্যায় তাঁহার উদ্দেশ্য মহত্তর বা নির্ম্মলতর না হইতে পারে, তথাপি সেরূপ উদ্দেশ্যেরও যে যথেষ্ট মূল্য আছে, ইহাও অনায়াসে স্বীকার করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ,অষ্টাদশশতাব্দীর বঙ্গদেশে অন্যান্য বাঙ্গালীর ন্যায় বৈদেশিকের পদলেহন না করিয়া তিনি যে স্বদেশের স্বত্বসংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। জগতে নিঃস্বার্থ হিতৈষিতা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। শিবাজী প্রভৃতি দেবচরিত্রেও তাহার কিছু কিছু অভাব লক্ষিত হয়। ফলতঃ, সাংসারিক চরিত্র একেবারে স্ফটিকনির্ম্মল হওয়া কঠিন। উচ্চ আশা না থাকিলে জগতে কেহ কখনও কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় নাই। মহারাজ নন্দকুমার যদি সেই উচ্চ আশা থাকার জন্য চরিত্রহীন হইয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি জগতের চক্ষে একেবারে হেয় হইবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি যে সমস্ত দোষে তাঁহার চরিত্রকে কালিমামণ্ডিত করা হইয়াছে, আমরা তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি না। তবে সুচতুর ইংরাজ জাতির কূটনীতির সহিত তাঁহার প্রতিভা ও বুদ্ধির সংঘর্ষণ ঘটায় কখন কখন তাঁহাকে যে কূটবুদ্ধির পরিচয় দিতে

হইয়াছে, ইহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই নীতিবলে তাঁহার যত দূর কৌশল ও চতুরতা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, সময়ে সময়ে তিনি তত দূর প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তৎকালিক বাঙ্গালীগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের ভক্ত লোক আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাঁহার সহস্র দোষ থাকিলেও উপরোক্ত গুণের জন্য তিনি যে বাঙ্গালীর চিরপূজ্য থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে বঙ্গীয় লেখকগণ ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার জীবনীতে আপনাদিগের প্রতিপাদ্য বিষয় সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে নন্দকুমারের বিরুদ্ধ মন্তব্যগুলির খণ্ডন করিয়া তাঁহার চরিত্রের সমর্থনও করিয়াছেন, এবং যে যে বিষয়ে তাঁহার দোষ সুস্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে তাঁহার কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে ঘোষ সাহেব নন্দকুমারের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই প্রসঙ্গে আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণের প্রতি কিরূপ তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন, আমরা আপাততঃ তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি; পরে সে বিষয়ে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। ঘোষ সাহেব বলিতেছেন :—

"History as written by eminent Englishmen in recent times after elaborate research, as written, for instance, by Sir James Stephen, Colonel Malleson, and Mr. Forrest has in the eyes of impartial readers at any rate delivered its final verdict on Nuncomar and his trial for forgery. The impression left on the mind of the last generation by the flowing periods of Burke, the ponderous pages of Mill and the brilliant protraits of Macaulay cannot but suffer to-day a large degree of effacement. But there are those who will not see, who love to hug an illusion that is beautiful, and who with little ceremony or scarcely an apology dismiss facts that are repellent to the taste. Some recent Bengalee writers have made a hero of Nuncomar. They have represented him as the victim of a conspiracy led by Warren Hastings, who employed Impey as his instrument for a judicial murder. Nuncomar was, in their judgment, a martyr to his patriotism. He was not only a social leader of the Brahmins, but the political leader of the entire Hindu Community in Bengal, if not of native population generally. Round him Hindu interests and forces were to rally, or at any rate the decaying strength of Mahomedan rulers was to revive; and he was to stand forth as the deliverer of his native land from a foreign yoke, and the founder of a united nation and state. Nubkissen on the other hand

was in the light vouchsafed to these writers a sneak and a coward, a trimmer and traitor who betrayed native interest, and delivered his country, so far as it lay in his little power into the hands of the English. He abetted Hastings in his attempt to remove his chief accuser and witness of guilt, Nuncomar. By giving false evidence he abetted Impey in his judicial murder.

"All this view of Nuncomar is excllent romance ; it is not history. The writers have very largely drawn on their imagination. They at once ignored and created history. Nuncomar at his best was a shrewd, worldly man of business, the mediocre character of whose abilities, and the modesty of whose social position are proved by the fact that he did not make a prominent appearance or occupy a distinguished position in public life before he was past fifty. Taken all round he was an ambitious, scheming villain, absolutely selfish, thoroughly unprincipled, dead to a sense of gratitude, prone to abuse of power, faithless as a friend, implacable as an enemy. Almost the whole of his public life is a tissue of crimes—extortion, conspiracy, giving bribes, taking bribes, making false complaints, getting up false cases, perjury, subornation of perjury, the uttering of forged documents, and the like. His public life had nothing of public spirit in it. His ambition was wholly personal. The solitary instance of faithfulness in his whole life was his attachment to Mir Jaffir but even in the service of that potentate he seems to have had no thought except that of self-aggrandisement. He never appears to have excelled in diplomacy, or administration, and if he had any influence over Mir Jaffir, if he shaped his policy, and guided his counsels, the best index to his honesty, wisdom, and foresight would be the act of Mir Jaffir himself, to which a brief reference will presently be made, and which it may be observed in the meanwhile, exhibit little of either firmness or fairness. In character and aspirations Nubkissen was the very antithesis of Nuncomar.

"The testimony of the best writers in regard to the character of Nuncomar is unanimous."

তাহার পর তিনি মেকলে ও ম্যালেসন হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং পরে বলিতেছেন,—

"In face of such a consensus of opinion, do Bengalees advance their reputation, do they serve the interest of truth, when they put forward this infamous person, this genuine 'Captian-General of iniquity' as one of the noblest specimens of their race, as their champion, leader and representative, their ideal of a hero ? No, such a view is essentially unfair to Bengalees, but not even a typical or average Bengalee. Macaulay suggests that he was one of the worst specimens of

a Bengalee and indeed as much inferior to the avarage Bengalee as the Italian is to the Englishman: and in that view he is absolutely right. No Bengalee has equalled him in villainy."

ইহার পর তিনি ষ্টিফেন সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত বারওয়েলের ভগিনীকে লিখিত তাঁহার পত্রে নন্দকুমারের বিবরণ স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া, নন্দকুমারের জীবন, বিচার ও ফাঁসি সম্বন্ধে বিদ্বেষমূলক মত প্রকাশ করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি নন্দকুমার সম্বন্ধে এইরূপ শেষ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"If Nuncomar is an object of sympathy to any class of men, it is because he was hanged. And scarcely has a criminal been more fortunate."

"Nuncomar with indiscriminate spite threw mud at many, and something of it has stuck to each. For himself he posed as an injured innocent, and the more emphasis and persistency of his protestations have in the eyes of a good many invested his stories with an air of truthfullness. When, however, he is judged as he was, and not as he or his sentimental champions have made him out to be, he cannot but come to be recognised as a monumental villain, compared to whom Cethegus was a simple citizen and Titus Oates, a man of honour." *Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur.—pp. 103-136.*

ঘোষসাহেবের উল্লিখিত বর্ণনা হইতে সাধারণে বুঝিতে পারিবেন যে, মহারাজ নন্দকুমার ও আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণের প্রতি তিনি কিরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা যে ঘোরতর বিদ্বেষমূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অদ্যাবধি কোন ইংরাজ বা বাঙ্গালী নন্দকুমারকে এরূপ সুমধুর বিশেষণে বিভূষিত করেন নাই। দুই এক জন ইংরাজ নন্দকুমারের প্রতি ঘোষসাহেবের ন্যায় মন্তব্যপ্রকাশ করিলেও, তাঁহারাও নন্দকুমারের প্রতি এরূপ কটূক্তি করেন নাই। ইংরাজেরা যাহা পারেন নাই, ঘোষসাহেব অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। ইংরাজ লেখকগণের উক্তি এতদিন ঘোষ সাহেব কর্ত্তৃক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। সুতরাং বলিতে হইবে যে, সেই শতাধিকবর্ষমৃত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি কটূক্তি আজ তাঁহার স্বজাতীয় কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কি না, তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইংরাজেরা যাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, আমরা তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিলাম। যদি ঘোষসাহেব নবকৃষ্ণের জীবনী লিখিতে না বসিয়া নন্দকুমারের প্রতি ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে আমরা

তাঁহার মন্তব্যের অনুরূপ সমালোচনা করিতাম। কিন্তু নবকৃষ্ণের জীবনীলেখক হইয়া যখন তিনি নন্দকুমারের প্রতি অযথা কটূক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সেই বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের সমালোচনা যদি কিছু তীব্র হয়, তজ্জন্য ভরসা করি, পাঠকবর্গ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এবং তজ্জন্য ঘোষ সাহেবের নিকটও আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আগামী বার হইতে আমরা ঘোষসাহেবের মন্তব্যের যথাসাধ্য সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

সহযোগী সাহিত্য।

লুপ্তনগরীর কাহিনী।

"Lady's Pictorial" নামক পত্রিকায় একটি রমণীয় সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিপুণ লেখিকার নাম Charlotte Smith Rossie, এবং সুন্দর ছবিখানি "বিধ্বস্ত পম্পেআইর একটি দৃশ্য" নামে অভিহিত। সাহিত্যের পাঠকগণের জন্য প্রবন্ধটির অনেক কথা সঙ্কলিত হইল।

সাগরোপান্তের যে সমৃদ্ধ প্রাচীন পুরী ৭৯খৃষ্টাব্দের ২৪এ অগষ্ট আগ্নেয় পর্ব্বতের উদ্‌গিরিত ধাতুস্তূপে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, সেই বিনষ্ট নগরীতে পদার্পণ করিয়া, লেখিকা বলিতেছেন:—

নগরীর বর্ণনা।

এ নগরী স্বপ্নে রচিত—এ শুধু-জটিল চতুর্দ্দিগ্‌বিসর্পী অপ্রশস্ত রাজপথ, আর বাতায়নহীন অদ্ভুত অট্টালিকায় সমাকীর্ণ গোলকধাঁধাঁ। এই ভীষণ বিরাট নির্জ্জনতায় আমরা আত্মহারা হইয়া যাই; ভয় হয়, কখন বা অকস্মাৎ এই সব সরু ফুটপাথ হইতে পিছলাইয়া পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়! সত্যই কি এই সব প্রাচীরে গবাক্ষ নাই? সত্যই নাই; কিন্তু তাই বলিয়া উহারা কি ভাষাহীন, নির্ব্বাক্? না, তা' নয়; আমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপে উহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত না কাহিনী শুনাইতেছে! প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল নরনারী অতি ভয়ানক মৃত্যুকে আলিঙ্গন

প্রাচীর-লিপি।

করিয়াছিল, তাহাদেরই হাতে লেখা কত না কাহিনী আজও সেই সব জড় প্রাচীরকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। আজিকার মত "কালি কলমের" চলন তখন ছিল না; সেই পুরাতন যুগের মানবেরা তখন প্রাচীর-গাত্রে সকল রকম কথা, বিজ্ঞাপন, প্রেমলিপি ও সংবাদ "কয়লার আঁচড়ে" লিখিয়া রাখিত। আজও তুমি পম্পেআইর প্রাচীরে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন বিল হইতে রজকের হিসাব, অথবা থিয়েটার ও গ্লাডিয়েটরদিগের লড়াই প্রভৃতির বিজ্ঞাপনমালা দেখিতে পাইবে। কিন্তু

সাধারণ বালক, বালিকা, যোদ্ধা ও প্রেমার্ত্ত গ্রাম্য যুবকগণের লিখিত "ঘরের কথাই" সেই মৃতনগরীকে আমাদের নয়নসম্মুখে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলে। বৃহস্পতির মন্দির-ভাস্কর্য্যে নয়, অথবা পৌরাণিক দেবতাগণের কারুকার্য্যে বা বর্ণচিত্রেও নয়—পরন্তু আমাদেরই মত সেই সব ধরিত্রীর মানবের শিরার শোণিত আর তাহাদের নয়নের জীবন্ত দৃষ্টিই আমাদিগকে বিহ্বল করে। সে যুগের Edwin সে যুগেরই Angelinaকে

প্রেমের চিরন্তন ধর্ম্ম।

প্রেমপীড়িত কণ্ঠে বলিতেছে, "হায়, তোমাহীন দেবত্বেরও কামনা মনে উদিত হইবার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু হয়!" আমাদের যুগের Burns কবিও কি এই কথাই (শুধু "দেবত্বে"র পরিবর্ত্তে "রাজত্বে"র উল্লেখ করিয়া) গাহেন নাই? এবং সৃষ্টির আদিম মুহূর্ত্ত হইতে আজ অবধি এই একই কথাই কি প্রত্যেক Edwin প্রত্যেক Angelinaকে বলে নাই?

'Metheaর প্রেমলিপি' আজ চারি দিকে প্রসিদ্ধ। যীশুভক্তগণ ইহা লইয়া কত কত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রেমলিপিপাঠে জানা যায় যে, তখনও সেই পুরীতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল। তবু এ প্রেমপত্র অতি সামান্য জনের রচনা—একটি সামান্যা

'মিথিয়ার প্রেমলিপি'।

অভিনেত্রীর লিখিত। লেখাটি এই:—'Atellanaর অভিনেত্রী Methea সমস্ত হৃদয় দিয়া Chrestusকে ভালবাসে; রতিদেবী তাহাদের অনুকূল হউন্; তাহারা যেন চিরদিন প্রীতিমিলনে আবদ্ধ রহে।' Chrestus নামটিতেই সকলে মনোযোগ দিয়া থাকেন—ইহা কি নবধর্ম্মে দীক্ষিত সম্প্রদায়ের এক জনের নাম? হায়, আমি কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারদৃষ্টান্ত অপেক্ষা অন্য একটি গুরুতর কারণে বিচলিত হইতেছি! মিলনের স্থায়িত্বের জন্য নায়িকার আকুল প্রার্থনাটি পড়িয়া বুঝিতেছি, সে দিনেও প্রণয়ের পথ কণ্টকসঙ্কুল ছিল! না জানি, Chrestusএই সরলা প্রণয়িনীর কি পরিবর্ত্তন দেখিয়া, তাহার চরিত্রে কি দোষ দেখিয়া রুষ্ট হইতেছিল। সে কি নবীন ধর্ম্মের অনুরাগে উন্মত্ত হইয়া, সনাতন প্রেমকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল? হায় হতভাগিনী Methea! নারীকে যখন হৃদয়ের ভালবাসা বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিতে হয়, তখন তার সৌভাগ্য আর কোথায়! তবে, সুখের কথা, মর্ম্মের এই দারুণ কাতরতা,—এই ব্যথিত প্রেমের জ্বালা Vesuviusএর দ্বাদশ হস্ত গভীর ভয়ঙ্কর ভস্মস্তূপে চিরনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে!

গিরি নিঃস্রবে যে সকল মনুষ্যদেহ প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, খনকগণ (excavators)

মূর্ত্তিগঠনপ্রণালী।

সেগুলিকে সুকৌশলে বাহির করিয়া লইয়াছেন; এবং সেই ঘনীভূত নিঃস্রবের ছাঁচে plaster ঢালিয়া দিয়া, মৃতদের অবিকল প্রতিকৃতি গঠিত করিয়া লইয়াছেন। মৃত্যুযন্ত্রণায় বিকৃত মুখভাব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির তাৎকালিক অবস্থান এই সকল ধাতব মূর্ত্তিতে এমন অসামান্য সাফল্যের সহিত প্রতিফলিত হইয়াছে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এমন নিখুঁত ভাবব্যঞ্জক মূর্ত্তি অঙ্কিত বা নির্ম্মাণ করিবার শক্তি কোন চিত্রকর বা ভাস্করের নাই।

আমরা নানাবিধ মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। কত না রমণীর অবিকল প্রতিমূর্ত্তি! কেহ

ললিতবপু তরুণী;—কেহ বা কুণ্ঠিতদেহা; কাহারও উত্তোলিত হস্ত ঈশ্বরোদ্দেশে অঞ্জলিবদ্ধ;—কেহ বা মজ্জমান ব্যক্তির তৃণধারণের ন্যায়, দারুণ তপ্ত নিঃস্রবের সমাধি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রাণান্তপণে অন্তিম চেষ্টা করিতেছে। একটি কুকুর দেখিলাম,—মৃত্যুর নিদারুণ যাতনায় তাহার কি ভীষণ মুখভাব! এই কি পরিণাম? সকলেরই কি একই অবসান? প্রাচীরে যাহারা প্রেমলিপি লিখিয়াছিল; যাহারা কন্দর্পের হাস্যফুল্ল বিমোহন মুখ অঙ্কিত করিয়াছিল—তাহারাও কি পশুর মত কেবলমাত্র আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইয়া, আতঙ্কে কষ্টে বিকৃতবদনে এই ভাবে মরিল? কর্ত্তব্য ভাবিয়া সেই পুরাণপ্রসিদ্ধ বীর দেশের জন্য যেমন স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তেমনই অপরের জন্য কেহ কি এখানে প্রাণ দেয় নাই? আত্মপ্রীতি মনুষ্যহৃদয়ে এতই কি বলবতী যে, মৃত্যুপথে সে জীবনের পরম প্রিয়জনের কথাও আর ভাবে না? প্রাণাধিক প্রিয়তমের জন্য নিজ প্রাণ উৎসৃষ্ট করিয়া, কাহারও নাম কি অমৃতোজ্জ্বল চিরস্মরণীয় হয় নাই?—পম্পেআইতে এমন কোন স্থান নাই কি, যাহা সেই মহাত্মার মহিমায় তীর্থস্বরূপ হইয়া আছে?

এক জন বলিল, 'ঐ দ্বারের নিকট একটি বিকলাঙ্গ শিশু পাওয়া গিয়াছিল। তাহার দেহ অগ্নি বা উষ্ণ ভস্মে কিছুই দগ্ধ হয় নাই; কারণ, এক জন রমণী তাহাকে সেই বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন। রমণী নিজ বক্ষপুটে শিশুটিকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখিয়া, স্বয়ং পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন! তাঁহার মাংস পুড়িয়া অস্থি পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সেই করুণাময়ী দেবী শিশুকে ত্যাগ করেন নাই! খনকগণ যখন শিশুর দেহটি দেখিতে পায়, তখন সেই মহিমাময়ী নারীর সমস্ত শরীর ভস্মাবশেষমাত্র; কেবল সেই শিশুর পশ্চাদ্ভাগে একখানি সুকোমল সুন্দর বলয়-ভূষিত হস্ত। কল্যাণী সেই কোমল বাহু দিয়া শিশুটিকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাই নিজ শরীরেরই অন্তরালে পড়িয়া উহা অক্ষত রহিয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, তিনি শিশুটিকে লইয়া পলাইতেছিলেন; কিন্তু খঞ্জত্বহেতু, সে দ্রুত দৌড়িতে না পারায়, রমণী তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে স্বেচ্ছায় ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে অকালে আলিঙ্গন করেন।'

বলয়শোভিত হস্ত।

'মৃত্যু—আপনি বলিলেন, মৃত্যু?'

'কেন, আর্য্যে, নিশ্চয় মৃত্যু! আমি ত আপনাকে বলিয়াছি যে, ছেলেটিকে রক্ষা করিতে গিয়া সেই মহিলার সমস্ত শরীর পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল!'

'না না, মৃত্যু তাঁহাকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে নাই; তাঁহার সেই অগাধ স্নেহ মৃত্যু-জয়ী। এমন নারী অনন্ত কাল জীবিত আছেন। মানবীর এমন প্রেম নিশ্চয়ই মৃত্যুঞ্জয়!'

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রদীপ। আষাঢ়। উপকথার 'সুয়োরাণী'র মত এবারকার "প্রদীপে"রও 'হেঁটের কাঁটা, উপরে কাঁটা'। অর্থাৎ, প্রথমে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কবিগুরু হেমচন্দ্র" নামক একটি কবিতা, শেষে রাও সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিতের "হেমচন্দ্র" নামক একটি 'শোণিতা'। রাও সাহেবের রচনাটির প্রথম বারো চরণ অমিত্রাক্ষর, কিন্তু শেষ দুই চরণে মিল আছে। ছন্দটি নূতন, এবং রচনায় রক্তারক্তির চিহ্ন বিদ্যমান। তাই 'অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির',—এই নূতন 'সনেটে'র নাম হউক 'শোণিতা'। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষের "কণারক মন্দির" সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। বিষয়গুণে রচনাটি চিত্তাকর্ষক বটে, কিন্তু তাহার প্রাণ নাই। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র পাহাড়ী "শিশু" নামক কবিতায় বলিতেছেন,—"তাই বলি শিশু এবে হাস প্রাণ ভরে।" কবিবর আশ্বস্ত হউন, তাঁহার অনুরোধ বিফল হইবার সম্ভাবনা নাই। শিশুর বাপেরাও তাঁহার কবিতা পড়িয়া হাসিয়া ফেলিবে, তা শিশু কোন্ ছার? "প্রতিজ্ঞাপালন" গল্পটি রাবিশ। না আছে ভাব, না আছে ভাষা, আখ্যানবস্তুর ত কথাই নাই। গল্পটিতে "যুবতীগণ 'ত্রস্ত'গমনে চলেন", হরিশবাবু বজ্রাহতবৎ দণ্ডায়মান থাকেন।" তথাপি গল্পটি জমে নাই। দুঃখের বিষয়, সন্দেহ কি? 'যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?' "বৈদিক যুগে আর্য্যভূমি" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী গুপ্ত কোনও নূতন কথা বলিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তের "ঐতিহাসিক পাঠে"র পুনরাবৃত্তি করিয়া ফল কি? তবে "আর্য্যগণ বড় অদ্ভুত ও সুন্দর মত পোষণ করিতেন" প্রভৃতি নূতন বটে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর "দিন-গণনা" শীর্ষক কবিতায় 'পীরিতি'র ছোট বোন 'মিরিতি'র সাক্ষাৎ পাইলাম। 'পীরিতি'র বাপ মা নাই, নতুবা হারানিধি খুঁজিয়া দিয়া যদুবাবুর মত কবিকে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইত না। "সৌন্দর্য্যের হাট" মন্দ নয়। কিন্তু ছবিতে তাহার যে নমুনা দেখিতেছি, সে সৌন্দর্য্য বড় লোভনীয় নয়। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের "কোথা হতে আসি—কোথা ভেসে যাই?" একটি আশ্চর্য্য হেঁয়ালি। আমরা ত জানিই না; লেখকও যে উক্ত দুই মোকামের ঠিকানা জানেন, প্রবন্ধ পড়িয়া তাহাও ত মনে হইতেছে না। প্রশ্নটি অবিকল মজুত রহিল, অথচ একটা প্রবন্ধ হইয়া গেল; মন্দ কি?

ভারতী। আষাঢ়। প্রথমেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর "ধরণীর প্রেম" নামক একটি কবিতা। সমগ্র কবিতাটির উদ্দিষ্ট কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মত 'ও রসে বঞ্চিতে'র দল বুঝিতে পারিলে বুঝি কবিতাই হইত না। কবিতাটি তিলোত্তমা। অর্থাৎ, পুরাকালে বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য্যের তিল তিল চয়ন করিয়া যেমন তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, যতীন্দ্রবাবুও তেমনই "ধরণীর প্রেমে" বাঙ্গলা গীতিকবিতার ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবু পরে "আষাঢ় এলায়ে দিল কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ" লিখিবেন জানিলে রবীন্দ্রনাথ কখনই

"মানসী"তে "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী" আগে লিখিয়া ফেলিতেন না, ইহা আমরা 'হলপ্‌' করিয়া বলিতে পারি। শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর "গঙ্গাস্নানযাত্রা" একটি নক্‌সা। আমাদের সামাজিক জীবনে লেখিকার দৃষ্টি আছে; গুছাইয়া বলিতে পারিলে রচনাটি আরও রমণীয় হইত। "বিলাতী ঘুসী বনাম দেশী কিল" প্রবন্ধটি পরম রমণীয়। কিল খাইয়া কিল চুরী করাই যে জাতির স্বভাব, তাহাদের বংশধরগণ যে কিল দিয়া ঘুসীর ঋণ শুধিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা সুসংবাদ। ধার ফেলিয়া রাখিতে নাই, ভারতবাসী যেন এই অমূল্য সত্য বিস্মৃত না হন। দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ছিল, এখন অনাহূত শ্বেতঋণ স্বয়ং উপস্থিত। ঘরের মামুলি ঋণ তামাদি হয়, ক্ষতি নাই; পরের ঋণ ফেলিয়া রাখিলে চক্রবৃদ্ধির হিসাবে সুদ বাড়িতে থাকিবে; অতএব এ ধার কখনও গায়ে রাখিবেন না। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মানুষের জড়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা" একটি সুলিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির নাম সঙ্গত হয় নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারতে নাট্যের উৎপত্তি" সুলিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু এই প্রবন্ধে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ইম্‌দাদ হকের "ঐস্‌লামিক যৎকিঞ্চিৎ" পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। লেখকের সকল মতের সহিত আমাদের ঐক্য নাই। শিক্ষিত মুসলমানগণ আত্মরক্ষার্থ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় বটে। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের বিরোধের ন্যায় শোচনীয় ব্যাপার আর আছে কি না, বলিতে পারি না। হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ সেই বিরোধবহ্নিতে ইন্ধনসংযোগ না করিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। মাতৃভূমির কল্যাণের আশায় উভয় সম্প্রদায়কেই আমরা উদার ও সহিষ্ণু হইতে বলি। হিন্দু মুসলমানের মিলনভিত্তির উপরেই জাতীয় মঙ্গলমন্দির নির্ম্মিত হইতে পারে। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, আমাদের মাতৃভাষাই এই মিলনের তীর্থ হউক।

বঙ্গদর্শন। আষাঢ়। "গ্রাম" শীর্ষক কবিতাটি চিরপরিচিত ও চিরপ্রিয় বীণার ঝঙ্কার, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর অনেকগুলি কবিতা ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইয়াছে; এখনও হইতেছে। কবিতাগুলির সুর ক্রমেই 'একঘেয়ে' হইয়া পড়িতেছে। "ভরত" শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্কলিত সুপাঠ্য সন্দর্ভ। লেখক রামায়ণ অবলম্বন করিয়া যে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, "ভরত" তাহাদের শীর্ষস্থানীয়। লেখক বলিয়াছেন,—"ভরতের ভাগ্যে যে কি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে আমরা দুঃখিত হই। পিতা তাঁহাকে অন্যায়ভাবে ত্যাগ করিলেন, এমন কি তাঁহাকে আনিবার জন্য যে সকল দূত কেকয় রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারাও অযোধ্যার কুশলসম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর যেন ঈষৎ ক্রূর ব্যঙ্গসহকারে বলিয়াছিল—'কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি'—আপনি যাহাদের কুশল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কুশলে আছেন। অর্থাৎ ভরত যেন দশরথ-রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান না—তিনি কৈকয়ী ও মন্থরার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন।" এই 'অর্থাৎ'টুকুর মূল্য বড় অল্প নহে। দূতগণের "কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি"—এই সহজ সরল উত্তরে দীনেশবাবু "যেন ঈষৎ ক্রূর ব্যঙ্গ" কোথায় পাইলেন, তাহা বলা দুষ্কর। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

মহাশয়ের সম্পাদিত মূল রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্ততিতম সর্গে দেখিতে পাই, ভরত দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কচ্চিৎ স কুশলী রাজা পিতা দশরথো মম।
কচ্চিদারোগ্যতা রামে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি॥ ৭॥
আর্য্যা চ ধর্ম্মনিরতা ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মবাদিনী।
অরোগা চাপি কৌসল্যা মাতা রামস্য ধীমতঃ॥ ৮॥
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্ম্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা।
শত্রুঘ্নস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মধ্যমা॥ ৯॥
আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ॥ ১০॥
এবমুক্তাস্তু তে দূতা ভরতেন মহাত্মনা।
ঊচুঃ সংপ্রশ্রিতং বাক্যমিদং তং ভরতং তদা॥ ১১॥
কুশলাস্তে নরব্যাঘ্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি।
শ্রীশ্চত্বাং বৃণুতে পদ্মা যুজ্যতাঞ্চাপি তে রথঃ॥ ১২॥"

মূলে দূতগণের বাক্যের বিশেষণ দেখিতেছি,—"সংপ্রশিত"। রামানুজ টীকায় লিখিয়াছেন,—"সংপ্রশিতং সবিনয়ং সঙ্ক্ষিপ্তঞ্চ।" ইহার অর্থ "ঈষৎ ক্রূর ব্যঙ্গ" নহে। মূলের সহজ উত্তরেও "ঈষৎ ক্রূর ব্যঙ্গ" নাই। দীনেশবাবুর মস্তিষ্ক রত্নাকর ব্যতীত অন্য কুত্রাপি তাহার অস্তিত্ব নাই। দূতগণের প্রতি ভরতের প্রশ্ন ও দূতগণের প্রদত্ত 'সংপ্রশিত' অর্থাৎ 'সবিনয় সঙ্ক্ষিপ্ত' উত্তর আমরা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতেও সহজ চক্ষে "ঈষৎ ক্রূর ব্যঙ্গে"র বিন্দুমাত্র আভাস নাই। যাহাকে ইংরাজীতে বলে Between the lines, সে ভাবে দেখিলেও দীনেশ বাবুর এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের তিলমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না। দীনেশবাবু কল্পনায় যেন ঈষৎ ক্রূর ব্যঙ্গের গন্ধ পাইয়া নাচিয়া উঠিয়াছেন, এবং টীকা করিয়াছেন, "অর্থাৎ ভরত যেন দশরথ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির কুশল চান না, তিনি কৈকয়ী ও মন্থরার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন।" 'অর্থাৎ'টুকু সম্পূর্ণ মৌলিক, এবং দীনেশ বাবুর 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' প্রতিভার জয়ডঙ্কা, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। রামায়ণ পবিত্র কাব্য, এমন করিয়া কলুষিত করিতে নাই। সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রশংসনীয়, কিন্তু অতিবুদ্ধির খ্যাতি অন্যরূপ। আজকাল মূল রামায়ণ বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা হইয়াছে, এবং অনুবাদেরও অভাব নাই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অসংখ্য "মহানাটক" অনায়াসে রচিত হইতে পারে। তথাপি মনে হয়, দীনেশ বাবুর মত সংস্কৃত সাহিত্যে সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রয়োগকালে আমরা যদি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের শরণাপন্ন হই, তাহা হইলে এরূপ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। 'হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া' দেখিলাম, সব দেখিবার অবকাশ নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার "মৃচ্ছকটিক" প্রবন্ধে নাটকখানির আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র লেখকের তৃতীয় প্রমাণের আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা সাহিত্যের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়ের "স্বপ্নতত্ত্ব" নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। "মেঘোদয়ে" নামক কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দের "প্রাচীন জব্বলপুরের প্রসঙ্গ" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "প্যারীচরণ সরকার" প্যারীবাবুর নবপ্রকাশিত জীবনচরিতের সজ্জিপ্ত সমালোচনা। আশা মিটিল না।

নবপ্রভা। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "দেশভেদে আচারভেদ" উৎকলের চুটকী নক্সা। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস "আমি কে" প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"আমি চতুর্বিংশতিতত্ত্বসংবলিত জীব।" শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্রের "প্রভাবতীর ছানাবড়া" একটি কবিতা। ব্রাহ্মণ হইয়া কোন প্রাণে বলিব, ছানাবড়ায় 'রস' নাই? 'পীরিতি' 'মিরিতি' 'চাঁদিমা' প্রভৃতি ছাড়িয়া কবিতা যদি ময়রার দোকানের দিকে ধাবিত হন, তাহা হইতে সুখের সীমা থাকে না। কেবল 'জোছনা' পান করিয়া ও 'সারা নিশি জাগিয়া' আমাদের কবিতা ক্রমেই 'কাহিল' হইয়া পড়িতেছেন, সে বিষয়ে বোধ করি দ্বিমত নাই। খাজা গজা সন্দেশ রসগোল্লার কল্যাণে তাঁহার যদি একটু স্ফূর্ত্তি হয়, পুষ্টি হয়, তাহা মন্দ কি? রুগ্ন কবিতার 'নাকী সুর' আর সহ্য হয় না। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি "সম্বন্ধ-নির্ণয়ে"শ্রান্ত হইয়া অবশেষে "বদন পঞ্চানন" ধরিলেন? একে পুরাতন, তাতে পচা রসিকতা, প্রবৃত্তি হইবে কেন? শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "মেঘদূত" নামক কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি। যখন বক্তব্য কিছু নাই, তখন অনর্থক কলম ভোঁতা করিয়া লাভ কি? শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর "থাই থাই" শ্যামদেশের ভ্রমণকাহিনী। সুখপাঠ্য ও বিবিধ কৌতুকাবহ তথ্যে পূর্ণ। লেখক বলেন, শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককের নাম 'বঙ্গকক'। অপিচ,—"সাম দেশ এক সময়ে হিন্দুরাজ্যভুক্ত ছিল, কেবল হিন্দু রাজ্য নহে, এই সুদূরবর্ত্তী সাম দেশ বাঙ্গালী জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালী জাতি কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল।" লেখক তৃতীয় প্রস্তাবে ইহা সপ্রমাণ করিবার আশা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উত্তমানন্দ স্বামীর "ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র" প্রবন্ধে বিশেষত্ব আছে। স্বামীজী বলিতেছেন,—"হেমচন্দ্রের কবিতাতে আমি চারিটি স্তর দেখিতে পাই। ১—ব্যক্তিগত। যথা, 'হতাশের আক্ষেপ' ও 'উন্মাদিনী'। ২—স্বদেশগত। যথা, 'ভারতসঙ্গীত' ও ভারতবিলাপ'। ৩—সমগ্র মানব—(দেব-দৈত্য)—জাতিগত। যথা, 'বৃত্রসংহার'। ৪—অখিল ব্রহ্মাণ্ডগত। যথা, 'দশমহাবিদ্যা। হেমচন্দ্রের কবিতাতে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রতিহত প্রণয় হইতে, বিশাল অপ্রতিহত প্রীতি, অবিরাম আনন্দ প্রবাহ—যাহা চরাচর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে,—তাহা ক্রমবিকাশে বিকশিত হইয়াছে।" প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সহৃদয়তায় অনুপ্রাণিত।

গতবর্ষের বাঙ্গলা সাহিত্য।

পরিষদের সপ্তমবার্ষিক অধিবেশনে সম্মানভাজন সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তদীয় "অভিভাষণে" পরিষৎকে অনুরোধ করেন,—

"প্রতিবৎসর পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে, প্রতিবৎসরে নূতন প্রকাশিত বাঙ্গলা-গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে ভাল হয়। তাহা হইলে, প্রতিবৎসরে সাহিত্যের গতির একটা আলোচনা হয় ও পাঠকগণেরও ভাল গ্রন্থের সংবাদ জানিবার কতকটা উপায় হয়। পরিষৎ যে সকল গ্রন্থ প্রশংসার যোগ্য মনে করেন, যদি তাহাদের ও তাহাদের গ্রন্থকারগণের নাম উল্লেখ করেন, তবে তাঁহাদেরও উৎসাহবর্দ্ধন করা হয়।"

এইরূপ প্রস্তাবনা করিয়া সুযোগ্য সভাপতি মহাশয় সেই বৎসরের কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের উল্লিখিত প্রস্তাব পাইওনীয়রে অনুকূলভাবে আলোচিত হইয়াছিল। গত অষ্টমবার্ষিক অধিবেশনেও সত্যেন্দ্র বাবুই সভাপতি ছিলেন, কিন্তু সেবারকার অভিভাষণে এরূপ কোনও বিবরণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই. মহোদয় এক জন প্রবীণ সাহিত্য-সেবী। তিনি আমাদের অদৃষ্টবৈগুণ্যে এখন প্রবাসী। আজ তিনি উপস্থিত থাকিলে এ প্রসঙ্গে কোন কথার অবতারণা করিতেন কি না, বলিতে পারি না।

দুঃখের বিষয়, কোন যোগ্যতম সাহিত্যসেবী বা আমাদের বর্ত্তমান সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের মধ্যে কেহ এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা ও উন্নতি-বিধানের জন্যই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি। সে জন্য সাহিত্যের প্রাচীন ও নবীন উভয় প্রকার গ্রন্থাদির আলোচনাই কর্ত্তব্য। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা ও উদ্ধারকল্পে ব্রতী হইয়া পরিষৎ দেশের ধন্যবাদ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কোন জীবিত গ্রন্থকারের রচনার সমালোচনা এখন পরিষদের নিয়মের বহির্ভূত। পরিষদ্ যে আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তাহা যদিও স্পষ্ট বুঝা যায়, তথাপি বর্ষে বর্ষে বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতি-অবনতির আলোচনা যে পরিষদের ন্যায় সভারই কর্ত্তব্য, এবং পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এতদিন পরিষদ্ যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাতে তত ক্ষতি হয় নাই। বেঙ্গল গবর্মেণ্ট হইতে বেঙ্গল লাইব্রেরীর বর্ত্তমান সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত লাইব্রেরীয়ান মহাশয় এতদিন বাঙ্গলাদেশের যে কোন ভাষায় মুদ্রিত সমস্ত গ্রন্থের প্রতিবৎসর একটি বিবরণ প্রকাশ করিতেন। সেই তালিকায় উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মতামতও লিপিবদ্ধ থাকিত। এই বিবরণ "কলিকাতা গেজেটে" মুদ্রিতও হইত। এখন এ নিয়ম রহিত হইয়াছে। আজ তিন বৎসর হইল, মতামতসংবলিত বার্ষিক-বিবরণটি গবর্মেণ্ট গোপনীয় কাগজ-পত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আজ তিন বৎসর বাঙ্গলা-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইতেছে, সাহিত্যের কোন্ বিভাগে কিরূপ উন্নতি বা অবনতি ঘটিতেছে, কোন্ শ্রেণীর পুস্তকের পাঠক ও কাট্তি বাড়িতেছে, এখন আর তাহা জানিবার উপায় নাই।

এরূপ বার্ষিক বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে, দেশের সকল প্রদেশ হইতে মুদ্রিত বাঙ্গলা সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হয়। গবর্মেণ্ট এ জন্য আইন করিয়া সমস্ত ছাপাখানাকে বহি দিবার জন্য বাধ্য করিয়াছেন। পরিষদের বা অপর পুস্তকালয়ের পক্ষে সেরূপ সংগ্রহ অতি দুঃসাধ্য,—একরূপ অসম্ভব। * * *

গতবর্ষের বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ-সঙ্কলনে আমার প্রথম বাধা হইল পুস্তক-সংগ্রহ। গতবর্ষে দেশের সর্ব্বত্র যত বাঙ্গলা বহি ছাপা হইয়াছে, তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। কাহারও দেখিবার সম্ভাবনাও নাই। গবর্মেণ্ট হইতে সমালোচনা-সংবলিত বার্ষিক বিবরণ এখন আর প্রকাশিত হয় না বটে, কিন্তু তিন মাস অন্তর মুদ্রিত যাবতীয় বাঙ্গলা পুস্তকের একটি তালিকা এখনও কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই তালিকাই এখন এই কার্য্যের প্রধান অবলম্বন। বর্ত্তমান বিবরণ-সংগ্রহের জন্য আমি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের চারিখানি ত্রৈমাসিক তালিকারই সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা হইতেও ১৩০৯ সালে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের সংবাদ পাইবার উপায় নাই। কারণ, ইহার প্রথমাংশে ১৩০৮ সালের মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্রের সংবাদ আছে, এবং ১৩০৯ সালের মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্রের বিবরণ ১৯০৩ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক বিবরণরূপে পরে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষ তিনখানি তালিকা ও ১৩০৯ সালের বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী ও বসুমতী প্রভৃতি সংবাদপত্রের সমালোচনা-স্তম্ভ ও বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে অনুসন্ধান করিয়া আমাকে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। পুস্তকাদির যে সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা গবর্মেণ্টের তালিকা

হইতে সঙ্কলিত। সংবাদপত্র হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহা সংখ্যাগণনায় ধরি নাই, সুতরাং সংখ্যাগুলি সম্পূর্ণ নহে। আমি এই সংগ্রহে কোনও পুস্তক-বিশেষের দোষগুণের প্রসঙ্গ করি নাই। কেবল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামোল্লেখ করিয়াছি। * * *

গতবর্ষে বৈশাখ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ৬২৫খানি বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ সময়ের মধ্যে মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তকের সংখ্যা অনেক অধিক। সে সকল পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইয়াছে, বা যে সকল পুস্তক আলোচ্য-বর্ষের পূর্ব্ব হইতে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে; সেগুলির সংখ্যা ইহাতে ধরা হয় নাই। উল্লিখিত ৬২৫খানির মধ্যে—

বিশুদ্ধ বিমিশ্র বাঙ্গলায়	৪৭৩
মুসলমানী বাঙ্গলায়	৩০
বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে	৬৩
বাঙ্গলা, হিন্দী ও সংস্কৃতে	১
বাঙ্গলা, ইংরাজী ও সংস্কৃতে	১৮
বাঙ্গলা, ইংরাজী ও পারসীতে	১
বাঙ্গলা ও পালিতে	১
বাঙ্গালা ও সাঁওতালিতে	১
মুসলমানী বাঙ্গলা ও আরবীতে	৭
বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে	২০
মোট—	৬১৫

প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিমিশ্র বাঙ্গলা, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজী, এবং বাঙ্গলা, ইংরাজা ও সংস্কৃতে প্রকাশিত ৫৭৪খানি পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যায়,—আলোচ্য বর্ষে ;—

কলাবিদ্যায়	৩	চিকিৎসায়	৩২
জীবনীতে	৭	দর্শনে	৯
নাটকাদিতে	৪১	কাব্য ও কবিতায়	৭৭
উপন্যাসে	৬৩	ধর্ম্মবিষয়ে	৮৪
ইতিহাস ভূগোলে	১৮	বিজ্ঞানবিষয়ে	১৮
সাহিত্যে	১০৪	বিবিধ বিষয়ে	১০৮
আইনে	৭		
			৫৭৪

প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের উপদেশমূলক পথে বিতরণীয় চটি পুস্তিকাগুলি ধরি নাই। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মধ্যে—

ইতিহাস ও ভূগোলের ১৮ খানির মধ্যে	...	...	১১
সাহিত্যের ১০৪ খানির মধ্যে	...	...	১০৩
কাব্য ও কবিতার ৭৭ খানির মধ্যে	...	...	৯
বিজ্ঞানবিষয়ক ১৮খানির মধ্যে	..	...	১৭
বিবিধবিষয়ক ১০৮ খানির মধ্যে	...	...	২৮
			১৬৮

মোট ১৬৮খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য।

ক। কলাবিদ্যা—এই বিভাগের তিন খানি পুস্তকই উল্লেখযোগ্য।

১। সহজ বেহালা ও এস্‌রার শিক্ষা— শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

২। হরিগুণানুকীর্ত্তন ও খোলের বাজনা—„ ভুবনচন্দ্র দাস।

৩। সহজ তবলা ও মৃদঙ্গশিক্ষা— „ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

তৌর্য্যত্রিক-শিক্ষার উপদেশক এই কয়খানি পুস্তক ব্যতীত বাঙ্গলা সাহিত্যে কলা-বিদ্যাবিষয়ক অন্য কোন পুস্তক প্রকাশিত নাই। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের "পাকপ্রণালী" গতবর্ষ হইতে আবার খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সংস্কৃতশাস্ত্রানুসারে পাকপ্রণালীও চতুঃষষ্টি কলার অন্তর্গত। সুতরাং উহাকেও কলাবিদ্যার অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তক আছে বটে, কিন্তু এই শ্রেণীতে আরও নানারূপ গ্রন্থরচনার আবশ্যক হইয়াছে। বাঙ্গালী শিল্পজীবীদিগের ও শিল্পপ্রিয় সাহিত্যসেবীদিগের এ বিষয়ে অবধান আবশ্যক।

খ। জীবনী—এই শ্রেণীর ৮ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ৪ খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

১। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জীবনবৃত্তান্তের স্বল্প পরিচয় ... ... শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

২। বাজীরাও ... ... „ সখারাম গণেশ দেউস্কর।

৩। পিয়ারীচরণ সরকার ... „ নবকৃষ্ণ ঘোষ।

৪। শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী „ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

এই ৪খানি পুস্তক হইতে বুঝা যাইতেছে,—সকল শ্রেণীর মহানুভব ব্যক্তিগণের

জীবনবৃত্তই যে আলোচ্য, পরিশ্রম করিয়া লিখিবার উপযুক্ত, এবং প্রকাশযোগ্য, তাহা বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণ বুঝিয়াছেন। আলোচ্যবর্ষে এক জন দেশবিখ্যাত, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির, এক জন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজার, এক জন দেশের ও সমাজের প্রকৃত হিতৈষী কর্ম্মবীরের ও এক জন বিখ্যাত সম্পাদকের জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনচরিত-পর্য্যায়েও পুস্তকের সংখ্যা অধিক নহে। যাহা আছে, তাহার মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এখনও অধিকাংশ স্বদেশী ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরের জীবনচরিত লিখিত হয় নাই।

গ। নাটকাদি—এই শ্রেণীর ৪৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত সাতখানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

১। প্রায়শ্চিত্ত ... ... শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
২। ভ্রান্তি ... ... „ গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
৩। বেদোরা ... ... „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
৪। প্রবোধচন্দ্রোদয় ...
৫। নাগানন্দ ... } „ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬। দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ...
৭। কালপরিণয় ... ... „ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত বর্ষে দৃশ্যকাব্য-বিভাগে তেমন উৎকৃষ্ট নাটক বা প্রহসন প্রকাশিত হয় নাই। জাতীয় নাট্যশালায় জাতীয় নাট্যসাহিত্যের পুষ্টি ও সংস্কারের আশা করা যায়। কিন্তু যে কারণেই হউক, বাঙ্গালীর নাট্যশালায় বাঙ্গলানাটকের পুষ্টির কোন উপায় হইতেছে না। প্রথম শ্রেণীর নাটক ও গীতিনাট্যেও আজকাল নানাকারণে অনেক অপ্রাসঙ্গিক চিত্র, অসঙ্গত প্রসঙ্গ ও বিরুদ্ধ রসের সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধুনাতন কতকগুলি নাটকে অনর্থক সঙ্গীতবাহুল্যও দৃষ্ট হইতেছে। ব্যর্থ অনুকরণ-চেষ্টায় এই সকল দোষ বড় সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সংস্কৃতনাটকগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। বাঙ্গলার নাট্য-সাহিত্যরচনার প্রথম যুগে সংস্কৃত-নাটকের আদর্শে বাঙ্গলা নাটক রচিত হইয়াছিল। পরে ইংরাজী আদর্শই অনুসৃত হইতেছে, এবং তাহার ফলে বাঙ্গলা-নাটকের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর কৃত অনুবাদে নাটকলেখকগণ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ পাইবেন। বর্ত্তমান বর্ষে "কিং লীয়ারের" একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিদেশী সাহিত্যের রত্নগুলি অনুবাদসূত্রে স্বদেশী সাহিত্যে গ্রহণ করিতে পারিলে

মাতৃভাষার পুষ্টি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু গতবর্ষে একখানি ফরাসী-প্রহসনের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত আর একখানি অনুবাদ বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। শুনা যায়, ইটালীয় ভাষার অপেরাগুলি অতি রমণীয়। আমাদের কোনও নাট্যকবি যদি তাহার দুই একখানি অনুবাদ করিয়া এ দেশে গীতিনাট্যের আদর্শ আনিয়া দেন, তাহা হইলে সুফলের আশা করা যায়। গতবর্ষে কয়েকখানি যাত্রার পালা প্রকাশিত হইয়াছে। আজকাল শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর যশ, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য যাত্রার পালার রচনায় প্রবৃত্ত। যাত্রার পালার আদর্শও আজকাল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী আদর্শে গঠিত গীতবহুল নাটকের ছাঁচে আজকাল যাত্রার পালা বাঁধা হইতেছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পৌরাণিক আখ্যায়িকা লইয়া একবারে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে নাটক লিখিতেছেন। পৌরাণিক চিত্রগুলির পুরাণবর্ণিত আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন আদর্শের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় কি না, তাহা বিচার্য্য হইলেও, বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। গতবর্ষে একখানি নূতন নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; উহার নাম "সর্ব্বজ্বর-গজ-সিংহ-বিজয়-কাহিনী নাটক"! নাটকখানির জন্মভূমি ঢাকা। ঔষধ-বিশেষের বিজ্ঞাপন-প্রচারই এই অপূর্ব্ব নাটকের উদ্দেশ্য। সাহিত্যের ও লেখকের দুর্দ্দশা এই উদ্ভট নাটকের আবির্ভাব হইতে কতকটা অনুমিত হইতে পারে।

ঘ। উপন্যাস—এই শ্রেণীর ৬৩ খানি গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত ৯ খানির নাম উল্লেখযোগ্য—

১।	অমৃতে গরল	...	...	শ্রীবিধুভূষণ বসু।
২।	নির্ম্মলকুমার	...	...	,, কে. এম্. সেন।
৩।	বঙ্গের শেষ নবাব	...	...	,, সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।
৪।	অন্নপূর্ণা	...	...	,, দামোদর মুখোপাধ্যায়।
৫।	প্রেমের জয়	...	...	,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৬।	জঙ্গলী মেয়ে	...	...	,, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৭।	নরবলি	...	...	,, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
৮।	যুগান্তর	...	...	,, শিবনাথ শাস্ত্রী।
৯।	চোখের বালি	...	...	,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংবাদপত্রে কয়েকখানি উপন্যাসের কয়টি দোষবিশেষ লইয়া গতবর্ষে বড়ই আন্দোলন হইয়াছিল। বাস্তবিক, আজকাল অধিকাংশ উপন্যাসে ভ্রাতৃবিরোধ,

জাতি-বিবাদ ও ব্যভিচারই বর্ণনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য অনেক গুলি উপন্যাস একই রকম হইয়া গিয়াছে। * * * ঐতিহাসিক নাটক উপন্যাসের কথা ছাড়িয়া নাটক-উপন্যাসে কেবল যে মানব-চরিত্রের কুপ্রবৃত্তির ছবিই আঁকিতে হইবে, এমন নহে। অনেক লেখক পূর্ব্বকবির রচিত কথাবস্তুর নকল করিয়াই আপনাদের অধ্যবসায় নষ্ট করেন। অনেক দিন হইতে এই দোষের সূত্রপাত হইয়াছে। পূর্ব্বে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী বা কপালকুণ্ডলার আদর্শ অক্ষম লেখকের একমাত্র সম্বল ছিল। তাহার পর "স্বর্ণলতা"র আদর্শেও বহুতর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আজকাল সেরূপ কোন আদর্শ স্থির নাই, কিন্তু অনুকরণ-প্রবৃত্তির আতিশয্যে মৌলিক ভাবের, মৌলিক আদর্শের গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল। বটতলার সুলভ উপন্যাস-প্রচারের ব্যবসায় হইতে এই অনুকরণস্রোত দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। বটতলার উপন্যাসরাশির মধ্যে লালসাময় প্রেমমূলক গল্পই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আজকাল "ডিটেক্‌টিভ্‌" গল্প পড়িবার জন্য পাঠকসমাজে আগ্রহ জন্মিয়াছে। খুন, জাল, চুরি, ডাকাতী প্রভৃতি নিকৃষ্ট ব্যাপার ইহাদের বর্ণনীয়। বিদেশী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উপন্যাসের অনুবাদ সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। "লেডীজ্‌ অফ্‌ দি ক্যামেলিয়সের" নকলে এ বৎসর এক জন নূতন উপন্যাস-লেখক কয়েকটি ভ্রষ্টার সতীত্বহানির বিবরণমাত্রের বর্ণন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন। বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত "নটনন্দিনী"ও এই ধরণের উপন্যাস—তাহার আর সংস্করণ হয় নাই। পাপের পরিণাম দুঃখকর দেখাইবার জন্য পাপের ছবিগুলিকে মনোরম করিয়া আঁকিতে গেলে যে আর একটা নূতন আশঙ্কার উৎপত্তি হয়, এই শ্রেণীর উপন্যাসলেখকেরা তাহা অনুধাবন করিতে পারেন না।

(৬) ইতিহাস-ভূগোল—এই শ্রেণীর ১৮ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৫ পাঁচখানি উল্লেখযোগ্য।

১। তমোলুকের ইতিহাস ... ... শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত।
২। কুচবিহার-বিবরণ ... ... „ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। নূরজাঁহা ... ... „ মতিলাল ঘোষ।
৪। মুরশিদাবাদের ইতিহাস ... ... „ নিখিলনাথ রায়।
৫। কুশদহকাহিনী বা খাঁটুরার ইতিহাস ... „ বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

আলোচ্যবর্ষে বাঙ্গলা-সাহিত্যের এই শ্রেণী বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহা অল্প আশাপ্রদ নহে। "বুয়র-যুদ্ধ" নামে আর একখানি পুস্তক আলোচ্যবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, সাময়িক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার দিকে বাঙ্গালী

অবহিত হইয়াছেন। গতবর্ষে স্বর্গীয় ঐতিহাসিক ৺রজনী বাবুর সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের শেষভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। গতপূর্ব্ববৎসরে প্রকাশিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস ব্যতীত এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা বা ভারতবর্ষের অপর কোন দেশের অথবা সমগ্র ভারতবর্ষের রীতিমত ইতিহাস প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ক্রমশঃ তমোলুকের ইতিহাস, খাঁটুরার ইতিহাস, মুরশিদাবাদের ইতিহাস এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে প্রকাশিত রাজসাহীর ইতিহাস, ত্রিপুরার রাজমালা প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া বোধ হয়, লেখকগণ দেশের ইতিহাসের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

(চ) চিকিৎসা—এই শ্রেণীর ৩২ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৬ ছয়খানির নাম উল্লেখযোগ্য।

১।	স্ত্রীচিকিৎসা	... ...	শ্রীবিপিনবিহারী মৈত্র।
২।	ঐ ঐ	... ...	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
৩।	সূতিকাচিকিৎসা	... ...	শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী কুলভী।
৪।	বাইওকেমিক চিকিৎসাবিধান	...	শ্রীউমামহেশ্বর সামন্ত।
৫।	সমন্বয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	... ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।
৬।	কর-সংহিতা	... ...	শ্রীরাধাগোবিন্দ কর।

চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে বহুবিধ সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপ্যাথী মতে রোগচিকিৎসার ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ সংগ্রহ বা অনুবাদপুস্তকের সংখ্যা অল্প। গতবর্ষে শুশ্রূষা, শিশুপালন ও শিশুচিকিৎসা সম্বন্ধেও দুই একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে কবিরাজী মতে নাড়ীবিজ্ঞান ব্যতীত কোন ভাল পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। গতবর্ষে "সটীক সানুবাদ সযন্ত্র তান্ত্রিক চিকিৎসা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুসন্ধানের ফলে তান্ত্রিক সাহিত্য হইতে রসায়ন শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(ছ) দর্শন—এই শ্রেণীর চারিখানি গ্রন্থের মধ্যে দুইখানি উল্লেখযোগ্য।

১।	বেদান্তদর্শন—বসু মল্লিক ফেলোশিপের লেক্‌চার	মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
২।	সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব	শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার।

দর্শনশাস্ত্রের পুস্তক বাঙ্গলায় অত্যন্ত অল্প। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতির ন্যায় পাশ্চাত্য-দর্শনজ্ঞ ও ন্যায়ালঙ্কার, শিরোমণি, বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি সংস্কৃত-দর্শনজ্ঞ বিদ্যমান থাকিতেও আমাদের দার্শনিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইল না, ইহা অল্প দুঃখের কথা নহে।

(জ) কাব্য ও কবিতা—এই শ্রেণীর গ্রন্থরাশির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য।

১।	অমিয়গাথা	...	...	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।
২।	কোকিলদূত	..	..	শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।
৩।	আরতি			
৪।	গীতিকা	..	...	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।
৫।	গৌরাঙ্গ			
৬।	অশোকা	...	..	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।
৭।	মন্ত্র ...	...	...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্. এ।
৮।	ফুলের মালা	..	...	শ্রীশেখ সাবজাদ করিম।
৯।	কাঁটার মালা	...	...	„ অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী।
১০।	অর্ঘ্য ...	...	...	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।
১১।	মুঞ্জরী	...	...	„ বসন্তকুমারী দাসী।
১২।	রঙ্গিনী	...	...	„ সুরমাসুন্দরী ঘোষ।

কবিতা ও কাব্যের গতি সমান।—সকলই খণ্ডকবিতা। কাব্য ও মহাকাব্য লিখিবার প্রথা দেশ হইতে যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গতবর্ষে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী "গৌরাঙ্গ" নামক একখানি কাব্য ও শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভারত-বংশ কাব্য নামক একখানি গ্রন্থের প্রথমাংশমাত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রায় সমস্ত খণ্ডকবিতা অজ্ঞাত প্রেমিক-প্রেমিকার "অজানা" বিরহব্যথার ও আসঙ্গলিপ্সার গান, এবং কি-জানি-কি ভাবের অজস্র বর্ণনাই তাহাদের প্রাণ। সুতরাং অধিকাংশ কবিতা এক ছাঁচে ঢালা। দ্বিজেন্দ্র বাবু, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী প্রভৃতি কবির কবিতায় বিষয়ান্তরের সমাবেশ থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বড় অল্প। গত বর্ষে আনন্দলহরী, যোগীর পুঁথি, সিগারেট, পেচকিনী প্রভৃতির কবিতাও প্রকাশিত হইয়াছে! নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী "গৌরাঙ্গমঙ্গলসঙ্গীত" নামে একখানি মহাকাব্যের প্রথমাংশ প্রকাশিত করিয়াছেন।

(ঝ) ধর্ম্ম—এই শ্রেণীর ৮৪খানি গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত ১৪ খানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

১।	চন্দ্রনাথপ্রসঙ্গ	শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
২।	দর্ব্বেশী	রেভঃ শ্রীগিরীশচন্দ্র সোম।
৩।	রোজা	মৌলভী মকবুল আলী।
৪।	আধ্যাত্মিক কিরণপ্রকাশ ...	শ্রীমতী কিরণবালা গঙ্গোপাধ্যায়।
৫।	উদয়দীপিকা	শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৬।	প্রকৃতি ও পুরুষ বা রাধাকৃষ্ণ ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৭।	গুরুতত্ত্ব	শ্রীসরস্বতীকণ্ঠ অধিকারী।
৮।	আমি কে, বা মানবজীবনের কর্ম্ম, উদ্দেশ্য ও পরিণাম	শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত।
৯।	কর্ম্মযোগ	শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।
১০।	ব্রহ্মোপাসনা	শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।
১১।	ব্রহ্মজিজ্ঞাসা	শ্রীসীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ।
১২।	পরলোক	শ্রীরামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।
১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৪।	ঐ	শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মগ্রন্থের যে মোট সংখ্যা ধরা হইয়াছে, তাহার মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পুস্তিকাগুলি ধরি নাই। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান ধর্ম্মের পুস্তকই ৮৪ খানি। মুসলমান-ধর্ম্মের "হদিস" প্রভৃতি দুই একখানি গ্রন্থের অনুবাদ গতবর্ষে বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ বা তাহার আলোচনা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইতেছে, ইহা সুলক্ষণ বটে। গতবর্ষে স্বর্গীয় কালীসিংহের মহাভারতের তিনটি সংস্করণ, (শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহরিদাস মান্না ও শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ) শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশের সম্পাদিত বাশিষ্ঠ মহারামায়ণ, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের সম্পাদিত জৈমিনিভারত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সম্পাদিত পদ্মপুরাণ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর বেদান্তসূত্র—খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে, এবং শ্রীচন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদিত অদ্ভুত রামায়ণ, শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কল্কিপুরাণ অনুবাদ সহ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(ঞ) সাহিত্য—এই শ্রেণীর ১০৪ খানি গ্রন্থের মধ্যে স্কুলপাঠ্য ১০৩ খানি গ্রন্থ বাদ দিলে এক খানি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেখানি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত "মেঘদূত"। সাহিত্য সম্বন্ধে গতবর্ষের ন্যায় গ্রন্থাভাব বোধ হয় কোন বর্ষে ঘটে নাই। প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যের

পর্য্যায়ে পরিষদের গ্রন্থাবলী ব্যতীত গতবর্ষে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত "নিত্যানন্দলীলামৃত," "রসকণা," কবিকঙ্কণের "চণ্ডী," দাশরথি রায়ের "পাঁচালী," রঘুনন্দন গোস্বামীর "রামরসায়ন," লোচন দাসের "চৈতন্যমঙ্গল" প্রকাশিত হইয়াছে। শেষ চারিখানি গ্রন্থ বঙ্গবাসি-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কণ ও সম্পাদন উৎকৃষ্ট।

(ট) বিজ্ঞান—এই শ্রেণীর ১৮ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১৭ খানি বিদ্যালয়পাঠ্য। অপরখানি শ্রীযুক্ত রামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রণীত "ভূত ও শক্তি"। কি গণিত, কি প্রাকৃতবিজ্ঞান, কোন বিষয়েই বাঙ্গলায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। গতবর্ষে শ্রীযুক্ত বি. এন্. রায় হিন্দুবিজ্ঞানসূত্র নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন।

(ঠ) বিবিধ—এই শ্রেণীর গ্রন্থের ১০৮ খানির মধ্যে ২৮ খানি স্কুলপাঠ্য। অবশিষ্ট ৮০ খানির মধ্যে—

১।	সমাজতত্ত্ব	শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।
২।	বঙ্গদেশস্থ হিন্দুসমাজ ও প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার ...	শ্রীব্রজলাল চক্রবর্ত্তী।
৩।	দয়ানন্দ—হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক ...	" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৪।	নবযুগের নবসন্ন্যাস	" গৌরগোবিন্দ রায়।
৫।	ভবানীপুরকাহিনী	" তারিণীচরণ ঠাকুর।
৬।	কুন্তলতার মনের কথা	" চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
৭।	চিত্র বিচিত্র	" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
৮।	কুণ্ডলীকল্পতরু (জ্যোতিষ) ...	" যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিত।
৯।	কবির ঝঙ্কার	" কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।
১০।	কালিদাস (সমালোচনা)	" চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১১।	বঙ্গীয় কিণ্ডারগার্টেন	" কালীপদ বসু।
১২।	চরিত্রগঠন	" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

সেন্সস্ উপলক্ষে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে এ দেশে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহার ফলে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে

১। মাহিষ্য-মীমাংসা—২। মুরশিদাবাদ-কায়স্থসমিতি, ৩। বৈশ্যবিকাশ, ৪। বৈশ্যসংহিতা পরিশিষ্ট, ৫। কায়স্থতত্ত্ববিচারের প্রতিবাদ, ৬। স্বর্ণবণিক, ৭। মাহিষ্যসিদ্ধান্ত, ৮। জঙ্গীপুর কায়স্থসমিতি, ৯। বঙ্গীয় বৈশ্য-

জাতিতত্ব, ১০। বঙ্গীয় বৈশ্যবারুজীবি-সভার কার্য্যবিবরণ ও ১১। কুলপ্রতিভা নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

গতবর্ষে স্কুলপাঠ্য সাহিত্যের মধ্যে আনি বেসাণ্টের হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর উল্লেখযোগ্য। ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী নব নিয়মে যে সকল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, পরিষৎ হইতে সে সম্বন্ধে যখন স্বতন্ত্র আলোচনা হইবে, তখন আমি এখানে আর কিছু বলিতেছি না।

আলোচ্যবর্ষে মুসলমানী বাঙ্গলার অনেক উন্নতি হইয়াছে। উহার মধ্যে পূর্ব্বে কেবল সে কালের মুসলমান কবির রচিত প্রাচীন সাহিত্যই মুদ্রিত হইত। আজকাল এই ভাষায় ক্রমে ক্রমে দুই এক জন নব্য-লেখকও নবীন বিষয় লইয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন। গতবর্ষে এই ভাষায় ১২ খানি নূতন উপন্যাস, ধর্ম্মবিষয়ে ১০ খানি ও বিবিধ বিষয়ে ১৫ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২।৪ খানি মাত্র প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার মধ্যে ফুল-ভ্রমরা, বসন্ত-ভ্রমরা, সুরাটেশ্বর, যামিনী-উজ্জ্বল বিবি ও ঢোলের পণ্ডিতি অর্থাৎ ঢোলবাদ্যশিক্ষা, ইত্যাদি গ্রন্থও আছে। এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, কালে এই মুসলমানী সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষার একটি স্বাধীন শাখা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এখন আসামী ভাষাকে বাঙ্গলা ভাষার একটি স্বতন্ত্র শাখা বলিলে যেমন অসঙ্গত হয় না, কালে মুসলমানী বাঙ্গলা বিবিধ গ্রন্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলে, ইহাও আসামীর ন্যায় স্বতন্ত্র অথচ উহা অপেক্ষা বাঙ্গলার সহিত নৈকট্যবিশিষ্ট স্বাধীন ভাষা হইয়া পড়িবে। মুসলমানী বাঙ্গলায় বেশী পরিমাণে আরবী ও পারসী শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার ও ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষার শব্দ ও রীতি লইয়া ভাষা গঠিত হইয়া থাকে, এইমাত্র প্রভেদ। প্রাচীন মুসলমানী সাহিত্যে অনেকগুলি সৎকাব্য, অনেক সুকবির গ্রন্থ ও অনেকগুলি পারসী কাব্যের ও আরবী ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ আছে। আবার খৃষ্টান মিশনরীদিগের হিন্দু পৌরাণিক ঘটনার ব্যাখ্যা যেমন বিকৃত হয়, সেইরূপ এই ভাষায় অনেক অজ্ঞ কবির রচিত হনুমানের সহিত হজরতের যুদ্ধ, ভীমের সহিত আলীর যুদ্ধ, রামচন্দ্রের মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণ ইত্যাদি বিকট ব্যাপারও বিদ্যমান। নিম্নশ্রেণীস্থ বাঙ্গালী মুসলমানসমাজে সেইগুলি বেশী সমাদৃত।

গতবর্ষে আরও এক কারণে মুসলমানী বাঙ্গলা ভাষার প্রসারবৃদ্ধি হইয়াছে। কয়েক জন মুসলমান পণ্ডিত, যাঁহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা বোধ হয় লিখিতে পারেন না, তাঁহারা মূল আরবী ভাষার কয়েকখানি পুস্তক আরবী মূল গ্রন্থের সহিত এই মুস-

মানী বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। গতবর্ষে এরূপ পুস্তক ৭ খানি প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা ও ইংরাজী, এবং বাঙ্গালা ইংরাজী ও সংস্কৃতমিশ্রিত যে সকল পুস্তক গতবৎসর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকের অর্থ ও ব্যাখ্যাপুস্তক।

গতবর্ষে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় "ভবসিন্ধুতরণী" নামক একখানি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। হিন্দীভাষায় অনেক সদ্‌-গ্রন্থ ও উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। হিন্দী লেখকের চেষ্টায় হউক, আর বাঙ্গালী লেখকের যত্নেই হউক, সেগুলি বাঙ্গালা ভাষায় আনিতে পারিলে বাঙ্গলার পরিপুষ্টি হয়। প্রসঙ্গতঃ এখানে একটা কথা বলিতেছি। আজকাল বিহারকেন্দ্রের স্কুলপাঠ্য সাহিত্যের জন্য অনেক বাঙ্গলা গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা বড়বাজার লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি, বঙ্কিম বাবু, তারক বাবু প্রভৃতির অনেক উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ হইয়াছে। কোন কোন উপন্যাসের দুই তিনটি অনুবাদ আছে। ইহা বাঙ্গলার পক্ষে গৌরবের কথা। যেমন হিন্দী সাহিত্যের পুষ্টির জন্য এই ঋণ প্রদত্ত হইতেছে, তেমনই হিন্দী সাহিত্যের সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া সে ঋণের ওয়াসিল লইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে মন্দ হয় কি ?

গতবর্ষে মোট ৭৪ খানি বাঙ্গলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গতবর্ষে অতিথি, আশা, কায়স্থপত্রিকা, সদানন্দ, শিবপুর-কলেজপত্রিকা, যুবক, আর্য্য-গৌরব, জ্ঞানদায়িনী, সুপ্রভাত ও প্রীতি, এই দশখানি মাসিকপত্র নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিকপত্রের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ১৭৬৫ শকাব্দে তত্ত্ববোধিনী প্রথম প্রচারিত হয়। সুতরাং আলোচ্য-বর্ষে তত্ত্ববোধিনীর ৬০ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহা এক্ষণে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্বকৌমুদী ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাধারণ মাসিক সাহিত্যের মধ্যে বামাবোধিনী-পত্রিকা দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১২৭০ সালে ইহার প্রথম প্রচার হয়। আলোচ্যবর্ষে ইহার ৪০ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাহার পরে ভারতী উল্লেখযোগ্য। ভারতী ১২৮৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্যবর্ষে ভারতীর ২৭ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। নব্যভারতের আরম্ভ ১২৯০ সালে। ইহারও বিশ বৎসর কাটিয়া গেল। ১২৯৮

সালে সাহিত্য প্রথম প্রচারিত হয়। সাহিত্যও ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম করিল। ইহার পর পূর্ণিমা, হিন্দুপত্রিকা, পন্থা, প্রদীপ, প্রবাসী, প্রচারক, প্রভৃতি পত্রিকাগুলির নাম করিতে হয়। গতবর্ষে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র বর্ত্তমান ছিল। গতবর্ষের অধিকাংশ সাময়িক পত্রই সাধারণ সাহিত্য-বিষয়ক। কতকগুলি কেবল ধর্ম্মবিষয়ক, এবং কতকগুলিতে চিকিৎসাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে স্বতন্ত্র পত্রিকার বিশেষ প্রচার এখনও হয় নাই। আলোচ্যবর্ষে সঙ্গীত সম্বন্ধে "আলাপিনী" ও "সঙ্গীতপ্রকাশিকা", আইন সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্ট" (বাঙ্গলা), জীবনচরিত সম্বন্ধে "বিশ্বজীবন", জোতিষ সম্বন্ধে "জোতির্ব্বিদ", রন্ধন সম্বন্ধে "পাকপ্রণালী", ব্যবসায় সম্বন্ধে "মহাজনবন্ধু", এই কয়েকখানি বিশেষ বিষয়ের স্বতন্ত্র পত্রিকা ছিল। "শিবপুরকলেজপত্রিকা" ও "শিল্প ও সাহিত্য" শিল্প ও সাহিত্য উভয়বিধ প্রবন্ধের আধার। কৃষিসম্বন্ধে "কৃষক" পত্রখানি ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। গতবর্ষে নবপর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বৎসর ও নবপর্য্যায়ের বান্ধবের প্রথম বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনযুগের দুইখানি শ্রেষ্ঠ পত্রিকার নবপর্য্যায় আরব্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র নাই। বান্ধব কালীপ্রসন্ন বাবুর হস্তেই পুনরায় গজাইয়াছে। ৭৪ খানি সাময়িকপত্রের মধ্যে অতিথি (ঢাকা), আর্য্যগৌরব (ঢাকা), বান্ধব (ঢাকা), সদানন্দ (ঢাকা), রামধনু (ঢাকা), আরতি (ময়মনসিংহ), পূর্ণিমা (বাঁশবেড়িয়া, হুগলী), শিবপুরকলেজপত্রিকা (শিবপুর, হাবড়া), আলোচনা (ব্যাটরা, হাবড়া), সুধা (মুরশিদাবাদ), শ্রীশ্রীগৌড়ভূমি (মুরশিদাবাদ), উৎসাহ (রাজসাহী), যুবক (শান্তিপুর), কল্যাণী (খুলনা), এবং সাবিত্রী (গয়া) হইতে ও অবশিষ্টগুলি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বাঙ্গলা দেশে কতগুলি সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তাহা ঠিক জানা যায় না। এখন অনেক জেলা হইতে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান ও বিদ্যার প্রাচীন স্থান নদীয়া জেলা হইতে কোনও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্রগুলি আমাদের দেশে নামে সংবাদপত্র হইলেও সর্ব্ব বিষয়ের আধার। * * * বলিতে দুঃখ হয়,—অনেক সংবাদপত্র ব্যক্তিগত গ্লানি ও কুৎসার প্রচারে যেন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

গতবর্ষের বাঙ্গলা-সাহিত্য সম্বন্ধে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করিলাম। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা আমার নিজের ব্যক্তিগত মত, পরিষদের অভিমত নহে।

* * * আমি এই প্রবন্ধে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি, হয় ত তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমার দৃষ্টিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; হয় ত আমার তালিকায় অযোগ্য গ্রন্থও স্থানলাভ করিয়াছে। এই সকল ত্রুটির জন্য আমিই দায়ী, এবং আশা করি, বিষয়ের গুরুত্ব ও উপাদানের অসদ্ভাবের বিষম বিচার করিয়া পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন। *

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তোফী।

মুক্তার মালা।

১

কলিকাতার একটি অনতিপ্রশস্ত রাজপথে একখানি মধ্যায়তন গৃহ। গৃহের সম্মুখে একখানি অশ্বযান অপেক্ষা করিতেছিল। এক জন প্রৌঢ় পুরুষ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল। হেমন্তের প্রভাত; আটটার সময় বেলা তত অধিক বলিয়া মনে হয় না।

গৃহখানি পুরাতন নহে; সুগঠিত, সুন্দর। কিন্তু বহুদিন অসংস্কৃত। গৃহে অনেক লোক আছে বলিয়া বোধ হয় না, বরং জনাভাবই অনুভূত হয়। নিম্নে—প্রাঙ্গনে এক জন বৃদ্ধা দাসী কল-তলায় কয়খানি বাসন মাজিতেছে। দ্বিতলে একটি কক্ষে—হর্ম্ম্যতলে একখানি মাদুরের উপর এক জন যুবতী শিশু-পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। পার্শ্বে তাঁহার জননী—প্রৌঢ়া, আননে চিন্তার অতিনিবিড় ছায়া, নয়নে বিষাদ। যুবতীর বয়স অষ্টাদশ হইবে। দেহে রূপ যেন ধরে না; যেন ভাদ্রের নদী—জল কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিতেছে। যুবতীর মুখে দৃঢ়তার ভাব—ওষ্ঠাধরে সে ভাব সুস্পষ্ট; নয়নের দীপ্তি প্রখর বলিলে বলা যায়, কিন্তু কোমল বলা যায় না।

যুবতীর জননী একছড়া মুক্তার মালা লইয়া দেখিতেছিলেন। মুক্তাগুলি স্থূল, সুগোল, মূল্যবান্। তিনি বলিলেন, "বীণা, তোর কাকার এ উপহার অপ্রত্যাশিত, আশার অতিরিক্ত।"

---

* সাহিত্য-পরিষদে পঠিত প্রবন্ধের সারসংগ্রহ।

যুবতী পুত্রের দিকে চাহিয়া ছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "এত অপ্রত্যাশিত যে, আমার দুই তিনবার ইচ্ছা হইয়াছিল, ফিরাইয়া দি। এখনও মনে হইতেছে, ফিরাইয়া দেওয়াই ভাল। আমার ছেলেকে আমি এ অলঙ্কার পরাইতে পারিব না।"

জননী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

"এ উপহার আমার পুত্রকে নহে। আমার শ্বশুরের নিকট কাকা সহস্র প্রকারে বাধ্য। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিলে কাকার অনেক লাভ, রুষ্ট করিলে সহস্র ক্ষতি। তাই কাকার এ আত্মীয়তা—এত স্নেহ। এ স্নেহ আমার পুত্রের প্রতি নহে। আমার শ্বশুরের পৌত্রের প্রতি।"

"তোর সব তাতেই কেমন।"

যুবতী মা'র দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "মা, তুমি যত সহজে সব ভুলিতে পার, আমি তত সহজে পারি না; ভুলিতে চাহিও না।" বলিতে বলিতে যুবতীর চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল।

মা অধোবদন হইয়া রহিলেন। হায়, তিনিই কি কিছু ভুলিতে পারিয়াছেন ? কিছু ভুলিতে পারেন কি ?

যুবতী বলিতে লাগিলেন, "বাবা যখন পিতৃমাতৃহীন পিতৃব্যপুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা খুব স্বচ্ছল নহে—অন্ততঃ আর এক জনকে প্রতিপালন করিবার মত নহে। তিনি আপনি কষ্টস্বীকার করিয়াও কাকাকে মানুষ করিয়াছিলেন। তিনি সাহায্য না করিলে, কাকা আজ পথের ভিখারীরও অধম হইতেন। বাবা হইতে তাঁহার সব। বাবা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, কাকাও ততদিন আপনার ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সে আত্মীয়তা কোথায় ছিল ? যখন পাঁচ শত টাকা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইত না, তুমি কাঁদিয়া কাকাকে সে কথা বলিয়াছিলে, তখন তিনি কি করিয়াছিলেন ? তখন তাঁহার পক্ষে পাঁচ শত টাকা প্রদান করা কষ্টকর হইত না। তাই আজ তাঁহার এ স্নেহ আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়াছে।"

দুহিতার কথায় নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে স্মরণ করিয়া জননীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি রন্ধন করিতে যাইবার ছল করিয়া উঠিয়া অন্য কক্ষে গমন করিলেন। মুক্তার মালা পড়িয়া রহিল।

২

বীণার পিতা নরেশচন্দ্র অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়েন। সংসারে তাঁহার জননী

ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। জননীর হস্তে সামান্য কিছু টাকা ছিল। তিনি তাহা হইতে পুত্রের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াই নরেশচন্দ্র মাতায় সেই সামান্য সঞ্চয় লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময় দারুণ বিসূচিকা এক রাত্রিতে পিতৃব্য-পুত্র মাধব-চন্দ্রকে পিতৃমাতৃহীন--জগতে সম্বলশূন্য করিয়া যায়। নরেশচন্দ্র আপনার অবস্থার কথা বিবেচনা না করিয়া তাহার ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভ্রাতার মত স্নেহে তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন।

তাসের পড়্তা পড়িলে এক হাতেই ছক্কা হয়। ব্যবসায়ে যখন লাভ হইতে আরম্ভ হয়, তখন উন্নতির গতিরোধ করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নরেশচন্দ্রের তাহাই হইল। ক্রমে ব্যবসায়ও বাড়িতে লাগিল, লাভও খুব হইতে লাগিল। নরেশচন্দ্র একখানি বাড়ী প্রস্তুত করাইলেন।

এই সময় নরেশচন্দ্রের জননীর মৃত্যু হইল। নরেশচন্দ্র সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। পূর্ব্বেই তিনি ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছিলেন; তাঁহাকে ব্যবসায় শিখাইয়া মূলধন দিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন।

কয় বৎসর নরেশচন্দ্রের ব্যবসায় খুব ভাল চলিল, তাহার পর মন্দা পড়িল। শেষে দুই বৎসর বড় লোকসান হইল। পরবৎসর তিনি লোকসান পুষাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বড় ও অনিশ্চিত ব্যবসায়ে টাকা ঢালিলেন। অত্যন্ত লোকসান হইয়া গেল। নরেশচন্দ্র নিঃসম্বল হইয়া দেনা মিটাইলেন। পুনরায় ব্যবসায় করিবার উপযুক্ত মূলধন রহিল না; সঞ্চয় যাহা কিছু ছিল, সবই শেষ হইয়া গেল। নরেশচন্দ্র সে ধাক্কা সামলাইতে পারিলেন না—পীড়িত হইলেন। পত্নী আপনার স্ত্রীধন দিয়া চিকিৎসা চালাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কয় মাসেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

নরেশচন্দ্রের পত্নী ষোড়শবর্ষবয়স্ক পুত্র কুমুদবিহারীকে ও দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা বীণাকে লইয়া বিধবা হইলেন। তখন স্বামীর গৃহ ও জীবনবিমার কিছু টাকা ব্যতীত তাঁহার আর বড় কিছু নাই।

বীণার বিবাহের কথা হইতেছিল; এখন সে কথা চাপা পড়িল। এ অসময়ে নরেশচন্দ্রের বিধবা, দেবর মাধবচন্দ্রকেই অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা স্বাভাবিক বিবেচনা করিলেন। কিন্তু মাধবচন্দ্রের ব্যবহারে আত্মীয়তার শেষ চিহ্নও ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল। বিধবা আপনার অদৃষ্টের দোষ ভাবিয়া সবই নীরবে সহ্য করিলেন। না করিয়া উপায় কি?

এ দিকে বীণা ত্রয়োদশ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশে পড়িল। তাহার বিবাহের চিন্তায় জননী বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন; কি করিতে পারেন? এই সময়ে একান্ত অপ্রত্যাশিত বিবাহের প্রস্তাব আসিল। অক্ষয়কুমার নরেশচন্দ্রের সমব্যবসায়ী ছিলেন। সেই সূত্রে উভয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। যে বার ব্যবসায়ে নরেশচন্দ্রের সর্ব্বনাশ হয়, সেই বারই ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর লাভ হয়। এখন তিনি কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ ধনী। তিনি আপনার একমাত্র সন্তান যুবক পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন। নরেশচন্দ্রের কন্যার কথা শুনিয়া তিনি স্বয়ং তাহাকে দেখিয়া যাইলেন। অনেক ধনী তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্থের প্রলোভন দেখাইলেন; তাঁহার অনেক সুহৃদ্ দরিদ্রের ঘরে কাজ করা অসম্মানকর বলিয়া উপদেশ দিলেন; কিন্তু অক্ষয়কুমার কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি কপর্দ্দকমাত্র না লইয়া নরেশচন্দ্রের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে বিধবা জননীর আনন্দের সীমা রহিল না। যে কন্যাকে কত দিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিছু না দিয়া তাহার বিবাহ দিতে পারিলেন না। আপনার অলঙ্কারের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাকে যৌতুক দিলেন।

৩

শ্বশুরবাড়ী কন্যার আদর যত্ন—জননীর অজস্র দুঃখেও সুখের কারণ হইল। পুত্র ব্যতীত অক্ষয়কুমারের অন্য সন্তান ছিল না; কাজেই বীণার আদরের সীমা রহিল না। তাহাতে জননী বিশেষ সুখী হইলেন। বীণা প্রায়ই জননীকে দেখিতে আসিত। কিন্তু একবারে দীর্ঘ কাল পিতৃগৃহে বাস ঘটিয়া উঠিত না।

পিত্রালয়ে যে দাসী কুমুদবিহারীকে মানুষ করিয়াছিল, সেই—টাকার জন্য নহে, স্নেহের টানে—ছিল। শ্বশুরালয়ে বীণার একার তিন চারি জন দাসী ছিল। কিন্তু সে যখন পিত্রালয়ে আসিত, শাশুড়ী সঙ্গে দাসী দিতেন না; প্রথম কারণ, যদি সে মনে করে, তাহার পিত্রালয়ে দাসীর অভাবে তাহার কষ্ট হইবে বলিয়া শাশুড়ী দাসী দিলেন—সে মনে কষ্ট পায়; দ্বিতীয় কারণ, কতকগুলি দাসী দিয়া তাহার জননীকে বিব্রত করা অকর্ত্তব্য। কিছু অধিক বয়সে—অষ্টাদশ বর্ষে—দুই মাস হইল বীণার প্রথম সন্তান—পুত্র হইয়াছে। তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর আনন্দ আর ধরে না। পুত্রকে লইয়া সে এই প্রথম

পিত্রালয়ে আসিয়াছে। শাশুড়ী অনেক বিবেচনা করিয়া এবার সঙ্গে কেবল ছেলের দাসীকে পাঠাইয়াছেন।

কন্যাকে লইয়া মাতার যেমন সুখ ছিল, পুত্রকে লইয়া তেমনই দুঃখের অন্ত ছিল না। উপযুক্ত অভিভাবকহীন পুত্র কুসঙ্গে মিশিতে লাগিল; ক্রমে পাঠে অমনোযোগী হইয়া পড়িল। মার আশঙ্কার অবধি রহিল না। তিনি কেবল কাঁদিতেন। তিনি অনাথা বিধবা কি করিবেন? কেমন করিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে রক্ষা করিবেন?

অক্ষয়কুমার প্রায়ই কুমুদবিহারীর সংবাদ লইতেন। তখন যদি মা সেই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন কুটুম্বকে সব কথা বলিতেন, তবে ভাল হইত। কিন্তু লজ্জায় মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কা ব্যক্ত হইল না। তিনি কেমন করিয়া কুটুম্বের নিকট আপনার পুত্রের দোষের কথা বলিবেন? তিনি তাহা পারিলেন না। হায়, স্নেহের আতিশয্যেও কত সময় কুফল ফলে! বল্গাহীন অশ্ব যেমন প্রবল বেগে যে দিকে ইচ্ছা ছুটিয়া যায়—যুবক কুমুদবিহারীও তেমনই অসংযত ভাবে অবনতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কুমুদবিহারীর তখনও যে ভয়, যে লোকলজ্জা, উদারতা, যে ন্যায়-নিষ্ঠা ছিল, তাহার কুকর্ম্মে অভ্যস্ত সঙ্গীদিগের কাহারও তাহা ছিল না। তাহারা অনেক সময় কুমুদবিহারীর স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিত। কিন্তু কিছুতেই কুমুদবিহারীর চক্ষু ফুটিল না। মা যতদিন পারিলেন, পুত্রকে রক্ষা করিলেন। শেষে আর রক্ষা করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। তিনি কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

বীণার বিবাহের দুই বৎসর পরে কয় জন সঙ্গী আপনাদের দেনা কুমুদবিহারীর স্কন্ধে চাপাইয়া দিল। সহস্র মুদ্রা ব্যতীত তাহার উদ্ধার সাধিত হয় না। হাজার টাকা! মার হস্তে শেষ পাঁচ শত টাকা ছিল। তিনি সেই শেষ সম্বলও দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু আর পাঁচ শত? কোন উপায় না দেখিয়া তিনি স্বয়ং যাইয়া দেবর মাধবচন্দ্রকে ধরিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ—ক্রন্দন কিছুতেই কিছু হইল না। মাধবচন্দ্র বলিলেন,—এরূপে টাকা দেওয়া অর্থের অপব্যয়। কতবার এরূপ করা যাইবে? আবার যখন কল্যই টাকা চাহিবে?—ইত্যাদি। কিন্তু মা যখন কিছুতেই শুনিলেন না, তখন তিনি বলিলেন, তাঁহার ব্যবসায় মন্দা পড়িয়াছে। তিনি কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবেন না।

মা অক্ষয়কুমারকে এ কথা বলিতে পারিলেন না। অক্ষয়কুমার অন্যসূত্রে অবগত হইয়া যখন সহস্র মুদ্রা লইয়া দিতে আসিলেন, তখন আর সময় নাই। তখন ঘৃণায়, লজ্জায়, ভয়ে, কুমুদবিহারী নিরুদ্দেশ হইয়াছে। সেই অবধি তাহার আর সংবাদ নাই। মার শরীর পূর্ব্বেও ভাল ছিল না। এখন স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল—হৃদ্‌রোগ প্রকাশ পাইল।

এ দিকে মাধবচন্দ্র প্রতিপালক ভ্রাতার বিধবার নিকট যে মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল। সেবার ব্যবসায়ে মাধবচন্দ্রের সর্ব্বনাশ হইল। এখন তিনি 'নরেশচন্দ্রের ভ্রাতা' এই সম্পর্কে অক্ষয়কুমারকে অবলম্বন করিয়া আবার দাঁড়াইয়াছেন। তিনি অক্ষয়কুমারের টাকা লইয়া তাঁহারই অধীনে কার্য্য করিতেছেন।

বীণার অনেকবার ইচ্ছা হইয়াছে, শ্বশুরকে কাকার সব কথা ভাঙ্গিয়া বলে, কিন্তু সে তাহা করে নাই। কাকার উপর তাহার বিরক্ত হইবার যথেষ্ট কারণ নাই কি?

৪

মা উঠিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই বীণা পুত্রকে দাসীর নিকট দিয়া স্বয়ং পাকশালায় যাইয়া উপস্থিত হইল। মা তখন দুগ্ধের কটাহ নামাইয়া রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন। তিনি কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, "দুধ জ্বাল হইয়াছে; খোকার দুধ লইয়া যা।"

কন্যা বলিল, "তুমি খোকাকে দুধ খাওয়াও মা! আজ আমি রন্ধন করিব।" মা কিছুতেই কন্যাকে অগ্নিতাপে আসিতে দিবেন না; কন্যাও কিছুতে সে কথা শুনিবে না। শেষে সকল সময় যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল,—কন্যার কণ্ঠস্বরে অভিমানের আভাস ফুটিতে না ফুটিতে মা পরাজয় মানিলেন। কন্যা সোৎসাহে রন্ধন করিতে উদ্যতা হইল। মা বাটিতে দুধ লইয়া দৌহিত্রকে পান করাইতে চলিলেন।

মা আসিয়া দেখিলেন, দাসী খোকাকে লইয়া বসিয়া আছে; ঘরের মেজেয় মাদুরের উপর মুক্তার মালা পড়িয়া আছে। দাসী মাকে তাহা দেখাইয়া বলিল, "দেখ, মা, বৌদিদি ফেলিয়া গিয়াছেন। টাকার জিনিস, যদি কিছু হয়, আমরা গরীব মনুষ, আমরাই বিপদে পড়িব।"

মা বলিলেন, "ওর সব তা'তেই অমনই।"

"মা, বৌদিদির ভাল মন; উনি কিছু মনে করেন না। কিন্তু এমন অসাবধান হইতে নাই।"

বাল্যকাল হইতে অতিরিক্ত আদরে বীণার গোছাল হইবার সুবিধা হয় নাই। তাহার পর—শ্বশুরগৃহেও দ্রব্যের ও আদরের প্রাচুর্য্য। যিনি বাল্যকালে তাহাকে গোছাল হইতে দেন নাই, তিনি আজ কোথায়?

দাসী খোকাকে দুগ্ধ পান করাইতে উদ্যতা হইল। মা দাসদাসীর হস্তে শিশুর দুগ্ধপান ভালবাসিতেন না। তাহারা কি যত্ন করিয়া বুঝিয়া দুগ্ধ পান করায়? তিনি স্বয়ং তাহাকে অঙ্কে লইয়া দুগ্ধ পান করাইতে প্রবৃত্তা হইলেন। অনেক আপত্তির পর শিশু দুগ্ধ উদরস্থ করিল। তাহার মুখ মুছাইয়া, মেজেয় যে কয় ফোঁটা দুগ্ধ পড়িয়াছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়া, মা খোকাকে দাসীর নিকট দিলেন। তাহার পর মুক্তার মালা তুলিলেন।

৫

শিশুকে দাসীর নিকট দিয়া মা পুনরায় পাকশালায় গমন করিলেন। তিনি দুহিতাকে বলিলেন, "বীণা, তুই ওঠ। আর অগ্নিতাপে থাকিস্ না। অসুখ করিবে।"

কন্যা হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"মা, তোমার অবশ্য অসুখ করিতে জানে না? যত অসুখ বুঝি আমারই হইবে?"

মা বলিলেন, "তোর সঙ্গে কে তর্ক করিবে? এখন যা; খোকাকে ঘুম পাড়াইতে হইবে।"

"ঝি ঘুম পাড়াইবে।"—বলিয়া বীণা রন্ধনে প্রবৃত্তা হইল। মা অনেক আপত্তি করিলেন; কিছুতেই কাণ দিল না।

তখন মা সেই পাকশালাতেই বসিলেন। মাতা-পুত্রীতে নানা বিষয়ে নানারূপ কথা হইতে লাগিল।

কথায় কথায় মুক্তার মালার কথা মার মনে পড়িল। তিনি বলিলেন, "বীণা, তুই কি কোনও কালেই গোছাল হইবি না?"

কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"মুক্তার মালা ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলি। যদি কোনরূপে হারাইত?"

বীণার ইচ্ছা হইল, বলে,—"তাহা হইলে খুব আনন্দিত হইতাম।" কিন্তু সে কিছু না বলিয়া তরকারীর আলু তুলিয়া কত দূর সিদ্ধ হইয়াছে, টিপিয়া তাহার পরীক্ষায় বিশেষ মনোযোগ দিল।

মা বলিলেন, "তোর শাশুড়ী কিছু বলেন না?"

বীণা হাসিয়া বলিল, "মা কি শাশুড়ী কেহ গোছাল হইতে শিখাইলে

হয় ত আমিও শিখিতে পারিতাম। কিন্তু শিখাইতে হইলে তাঁহাদিগকে আগে শিখিতে হইবে।”

৬

সেদিন রাত্রিকালে বীণা পিত্রালয়ে রহিল; পর দিন ফিরিয়া যাইবে। রাত্রিকালে শয়ন করিয়া মাতা-পুত্রীতে নানা কথা হইতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে মা উঠিলেন, উঠিয়া বাক্স খুলিলেন। বীণা জিজ্ঞসা করিল, “মা! এত রাত্রিতে বাক্স খুলিতেছ কেন?”

মা বলিলেন, “মুক্তার মালা আমার বাক্সে রহিয়াছে। লোহার সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়া আসি।”

“বাক্সেই থাকুক।”

“না। একবার আলোটা ধরিবি চল।”

বীণা আলো ধরিল। উভয়ে পার্শ্বের কক্ষে আসিলেন, মা লোহার আলমারী খুলিলেন। তাহাতে বিশেষ কিছু ছিল না। তাহতে মুক্তার মালা তুলিয়া রাখিয়া উভয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, “আলমারীর চাবি হারাইয়া গিয়াছিল না?”

আলমারীর একটা চাবি মার কাছে থাকিত; আর একটা মার একটা হাতবাক্সে থাকিত। কুমুদবিহারীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সে বাক্সের কয়টা জিনিস ও সে চাবিটি পাওয়া যায় নাই। বীণা তখন তাহা শুনিয়াছিল; কিন্তু সব কথা তাহার মনে ছিল না।

মাতা-পুত্রীতে আবার কথা হইতে লাগিল। কুমুদবিহারীর জন্য উভয়েই একান্ত কাতর। সে কথা উঠিতে বীণার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; মা কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বীণা আবার জননীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, “তুমি অত ভাবিও না। দাদা নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে।” মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেই রাত্রিতে মা ঘুমাইলেন; বীণা জাগিয়া রহিল। সে নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার কথা, সংসারের কথা ভাবিতে লাগিল।

৭

অদূরে একটা বড় ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। বীণা তখনও জাগিয়া। সে যেন সোপানে পদশব্দ শুনিতে পাইল। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল; পদধ্বনি অতি মৃদুপদসঞ্চারে উপরে উঠিল।

কিছুক্ষণ কোন শব্দ নাই। তাহার পর গৃহের সে দিকের শেষ কক্ষটির দ্বার যেন অতি সাবধানে মুক্ত করা হইল। তাহার পরই পার্শ্বের ঘরে কাহার সতর্ক পদধ্বনি ধ্বনিত হইল। স্তব্ধ রাত্রি—সুপ্ত গৃহ। নহিলে সে শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত না।

বীণা দেখিল, মা ঘুমাইতেছেন। সে তাঁহাকে তুলিল না। আপনি অতি সাবধানে দ্বার মুক্ত করিয়া বারান্দায় বাহির হইল। পার্শ্বের কক্ষের দ্বার মুক্ত! দ্বারের সম্মুখে এক জন কে দাঁড়াইয়াছিল। সে বীণাকে দেখিতে পাইল, অতি সাবধানে, কিন্তু দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। যাহারা অন্যায় কার্য্য করিতে আইসে, তাহাদের বড় অধিক সাহস থাকে না।

বীণা সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইল, পার্শ্বের কক্ষের দ্বার-প্রান্তে উপনীতা হইল। কক্ষে একটিমাত্র আলোক—অন্ধকার লণ্ঠন। কিন্তু দিগব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে যে স্থানে আলোক পড়িয়াছে, সে স্থানে বীণা যাহা দেখিল, তাহাতে ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

লোহার আলমারীর দ্বার মুক্ত। আর তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া লাবণ্য-শ্রীহীন কুমুদবিহারী! সে বীণার পুত্রের উপহার সেই মুক্তার মালা লইয়া দেখিতেছে; আর তদ্গতচিত্তে কি ভাবিতেছে।

বীণা কক্ষে প্রবেশ করিল। পদশব্দ শুনিয়া কুমুদবিহারী চাহিয়া দেখিল, —সম্মুখে ভগিনী। তাহার মুখ রক্তশূন্য হইয়া গেল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন সব অন্ধকার।

বীণা ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে—তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "তুমি তোমার মাতার ও ভগিনীর অলঙ্কার চুরি করিতে আসিয়াছ?"

কুমুদবিহারী নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

বীণা বলিল, "আজও আমরা তোমার কথা বলিতেছিলাম! তোমার মত কুপুত্রের জন্য কাঁদিয়া মা মরিতে বসিয়াছেন? তোমার এমন অধঃপতন হইবার পূর্ব্বে—পিতার নামে কলঙ্ক না দিয়া তুমি মরিলে না কেন? তাহা হইলে আমাদের লজ্জার কারণ হইত না।"

বীণার প্রত্যেক কথা সত্য; প্রত্যেক কথা তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত কুমুদবিহারীর হৃদয় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল।

৮

বীণার কণ্ঠস্বরে পার্শ্বের কক্ষে মার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া

কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নয়নে ভীতিভাব। মাকে দেখিয়া বীণার মনে পড়িল, ডাক্তার বলিয়াছেন, সহসা কোনরূপ উত্তেজনার কারণ ঘটিলে হৃদ্‌রোগগ্রস্ত রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। বীণা মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া লইল।

সে মার দিকে ফিরিল। যেন সহসা সলিলসেচনে অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বীণা বলিল, মা, "দাদা ফিরিয়া আসিয়াছে। কাকা আমার ছেলেকে যে মুক্তার মালা উপহার দিয়াছেন, তাহাই দাদাকে দেখাইতেছি। তুমি কেবল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, তাই তোমাকে জাগাই নাই।"

দীর্ঘকাল পরে অপ্রত্যাশিতরূপে পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনে মার দুর্ব্বল-হৃদয়ে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহা সহজে নিবৃত্ত হইবার নহে। হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল। পুত্রের দিকে চাহিয়া মা বসিয়া পড়িলেন।

বীণা ব্যস্ত হইয়া জল আনিল। সে মাতাকে শায়িতা করিয়া তাঁহার মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইল। তাঁহার মুখে চক্ষুতে জল দিল। পুত্রকন্যার শুশ্রূষায় মা কিছুক্ষণ পরেই সুস্থ হইলেন। আনন্দের আতিশয্য দুঃখের আতিশয্যের মত অপকারী নহে, বরং অনেক সময় তাহার মত উত্তেজক ঔষধ আর নাই।

* * * * *

সেই দিন হইতে কুমুদবিহারীর স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল। সে সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে রাত্রিতে সে যে কেন বাড়ী আসিয়াছিল, মা তাহা জানিতে পারিলেন না।

সে বীণাকে বলিল, "বীণা, তোমার মুক্তার মালাই আমার উদ্ধারের কারণ।"

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আমার কাছে লোহার আলমারীর একটা চাবি ছিল। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া, আমি ঘৃণা লজ্জা সব ভুলিয়া, আলমারী হইতে চুরি করিতে আসিয়াছিলাম। আলমারী হইতে মালা বাহির করিয়াই বুঝিলাম, এ মালা মার নহে; নিশ্চয়ই তোমার হইবে। ভাবিলাম, এ মালা আমি কেমন করিয়া লইব? মালা বহুমূল্য। দেখিয়া এক দিকে যেমন লোভ হইতে লাগিল, অপর দিকে তেমনই আপনার অবস্থা মনে করিয়া আপনার প্রতি ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। এমন সময় তুমি কক্ষে-প্রবেশ করিলে।"

"নহিলে তুমি কি করিতে?"

"নহিলে তুমি আসিবার পূর্ব্বেই সামান্য যাহা কিছু পাইতাম, লইয়া পলাইয়া যাইতাম।"

শুনিয়া বীণা ভাবিতে লাগিল। তাহার পর যখন সে মুক্তার মালা দেখিল, তখন ভ্রাতার উদ্ধারের কারণ বলিয়া তাহার নয়নে সে মালার সকল দোষ দূর হইয়া গেল। বীণা অকৃতজ্ঞ মাধবচন্দ্রকে তাঁহার উপহার ফিরাইয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শূদ্র-জাতি।

ইংরাজেরা আমাদের গুরু। আমাদের সমগ্র হৃদয় ও শরীর, এবং শরীরের মধ্যে বিশেষভাবে কর্ণ ও পৃষ্ঠদেশ, বিনা ওজরে গুরুর সকল প্রকার শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। প্লীহাগুলি নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া কখনও কখনও ফাটিয়া যায় বটে, কিন্তু গুরুর আশীর্ব্বাদে নির্ব্বাণমুক্তিলাভে ব্যাঘাত ঘটে না। আমাদের গুরুকুলের গুরু পাদ্রী সাহেবেরা বলেন যে, স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা চিরদিন শূদ্রদিগকে পদদলিত করিয়া আসিতেছে। আমরা প্রতিধ্বনি তুলিয়া ওই কথাটা অধিকতর গম্ভীরস্বরে সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি।

মুখ্যতঃ, আর্য্যসমাজের বহির্ভাগ হইতে যে সকল বিজিতারা আর্য্যসমাজের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহারাই প্রথমতঃ শূদ্রপদবাচ্য হইয়াছিল। যাহারা বিজিত, অশিক্ষিত ও বর্ব্বর, তাহারা যে আর্য্যের সহিত এক পদবী লাভ করিতে পারে নাই, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আর্য্যেরা তাহাদের প্রতি সদয় কিংবা নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন, তাহাই বিবেচ্য। কবি রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন-নাটকে, এক জন রাজকর্ম্মচারীর একটি পরিহাস-উক্তি আছে যে, এই সংসারের পথ দীর্ঘে বড় এবং প্রস্থে ছোট ; সেই জন্য আগু-পিছু হইয়া চলিতে হয ; নচেৎ হাস্যবিকশিত দন্তপাটির মত সকলেই এক সঙ্গে প্রশস্ত পথে অগ্রসর হইতে পারিত। উচ্চ-নীচ-বিচার ছিল বলিয়াই যে দ্বিজকুলের ব্যবহারে নির্ম্মমতা বা কঠোরতা ছিল, তাহা বলা যায় না।

ব্রাহ্মণের আসুরিকতার প্রমাণের জন্য যে মনুসংহিতাকে উপস্থিত করা হয়, আমি তাহার কুত্রাপি এমন কথা দেখি নাই, যদ্দ্বারা শূদ্রজাতির নিষ্পেষণ ও ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা প্রমাণিত হয়। ধর্ম্মলাভের জন্য, ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য ও নিস্পৃহতাশিক্ষার জন্য, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে সুকঠোর ব্যবস্থা বিহিত আছে, তাহা দেখিয়া কে বলিবে যে, মনুসংহিতা ব্রাহ্মণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রচিত? যে ব্রাহ্মণ বিধানানুযায়ী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পরাঙ্মুখ, তাহাকে জাতি-ব্রাহ্মণমাত্র বলা হইয়াছে, তাহাকে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব দান করা হয় নাই। গুরু অপরাধে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলের প্রতিই কঠোর দণ্ড বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের প্রতি কোন কোন স্থলে একটু যাহা পার্থক্য আছে, তাহা দ্বারা শূদ্রনিপীড়ন বুঝায় না। এ বিষয়ে আরও পুরাকালের কথা আলোচনা করিতেছি।

মহর্ষি পতঞ্জলির মহাভাষ্য, প্রায় খ্রীঃ পূঃ ১৫০ বৎসরের গ্রন্থ। যে পাণিনি লইয়া এই মহাভাষ্য রচিত, তাহার অভ্যুদয় প্রায় খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে। এই মহাভাষ্যে শূদ্রের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহাতে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব সময় হইতে পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্ত শূদ্রজাতির অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। মহাভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রথম আহ্নিকে লিখিত হইয়াছে, "শূদ্রাণাং=অনিরবসিতানাম্।" সূত্রটি পাণিনির, কিন্তু ভাষ্যটি মহর্ষি পতঞ্জলির। শূদ্র কাহারা? না, যাহারা অনিরবসিত। নিরবসিত অর্থ বহিষ্কৃত, এবং অনিরবসিত অর্থ অবহিষ্কৃত বা অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থটুকু দিয়া আবার লিখিত হইয়াছে, "অনিরবসিতানাং=আর্য্যাবর্ত্তাদনিরবসিতানাং"। অর্থাৎ যাহারা আর্য্যাবর্ত্তভুক্ত, অথচ দ্বিজজাতীয় নহে, তাহারাই শূদ্র। অনার্য্যদেশ হইতে আসিয়া যাহারা আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছিল, তাহারাই যে শূদ্র-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝা গেল। আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভাগের শত্রুজাতীয়েরা অনার্য্য বা অন্য সংজ্ঞায় উক্ত হইতেন। পতঞ্জলির শূদ্র-কথার ভাষ্য শেষ হয় নাই। বিস্তৃতব্যাখ্যার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ আর্য্যাবর্ত্তের প্রসার বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, "প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্কালকবনাৎ দক্ষিণেন হিমবন্তমুত্তরেণ পারিযাত্রং"। সম্ভবতঃ পাণিনির সময়ে অনার্য্যেরা সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত ভূভাগের বাহিরে বাস করিত। সেই জন্য, ১৫০ খৃঃ পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত বলিলে আর শূদ্রের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয় না বলিয়া, পতঞ্জলি একটি তর্ক তুলিয়া, কথাটার সমাধান করিয়াছেন। তর্কটি এই:—"যদ্যেবং (আর্য্যাবর্ত্তবাসী হইলেই যদি দ্বিজেতর বর্ণ শূদ্র হয়) তদা কিষ্কিন্ধগন্ধিক-

শকযবনং শৌর্য্যক্রৌঞ্চমিতি ন সিধ্যতি।" কিষ্কিন্ধ্যাবাসীদিগের আর্য্যসমাজভুক্ত হওয়া উচিত ছিল কি না, বলিতে পারি না ; কিন্তু তখন যে তাহাদের আর্য্যদংশন-বৃত্তি যথেষ্ট ছিল, তাহাতে ভুল নাই। যাহা হউক, আর্য্যাবর্ত্তের সীমা দ্বারা মীমাংসা হইল না বলিয়া মহর্ষি এই সমাধান করিলেন যে, "শূদ্রাণাং=আর্য্যনিবাসাৎ অনিরবসিতানাং"। তাহার পর আবার আর্য্যনিবাস অর্থে "গ্রামঃ, ঘোষঃ, নগরং, সংবাহঃ ইতি" ব্যাখ্যা করিলেন। এই ব্যাখ্যার পর আবার যখন দেখিলেন যে, আর্য্যগ্রাম প্রভৃতিতে মৃতপাঃ (ডোম) প্রভৃতি নীচ অনার্য্যেরা বাস করে, তখন আবার বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "শূদ্রাণাং যাজ্ঞাৎ কর্ম্মণঃ অনিরবসিতানাং"। বুঝিতে পারা গেল যে, সৎশূদ্রেরা যজ্ঞকর্ম্মে অধিকারী ছিল। উহার প্রাচীন টীকাতেও উল্লিখিত আছে যে, "যতঃ শূদ্রাণাং পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারঃ অস্তি।"

ইহার পর আবার যখন দেখিলেন যে, এমন অনেক শূদ্র আছে, যে যাহারা পঞ্চযজ্ঞের অধিকারী নহে, তখন পূর্ণ অধিকারী শূদ্রের ব্যাখ্যায় লিখিত হইল ;— "তর্হি (উল্লিখিত কারণ অনুসারে) শূদ্রাণাং=পাত্রাৎ অনিরবসিতানাং"। বুঝিতে পারা গেল যে, দ্বিজ জাতির খাদ্যপদার্থের পাত্র হইতে যাহারা বহিষ্কৃত নহে, তাহারাই শূদ্র। শূদ্রের সহিত দ্বিজজাতির হাঁড়ী চলিত, এ কথাটা শুনিয়া কেহ কেহ চমকিয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু মহামান্য মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ২২৩ শ্লোকে আছে যে, শ্রাদ্ধাদি পঞ্চ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে না, এরূপ শূদ্রের পক্ক অন্ন বিদ্বান্ দ্বিজেরা আহার করিবেন না। ঐ অধ্যায়ের ২৫৩ শ্লোকে আছে যে; কর্ষক (চাষাজাতি), দ্বিজগৃহের মিত্র, গোপাল (গোয়ালা), দাস (কৈবর্ত্ত), নাপিত জাতীয়েরা যদি সদনুষ্ঠানশীল হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের অন্ন দ্বিজজাতীয়েরা গ্রহণ করিতে পারেন। মনুর এই শ্লোকগুলি মুম্বই * দেশের সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত। গৌতমের ধর্ম্মসূত্রে (১৭—১) উল্লিখিত আছে যে, সকল দ্বিজজাতীয়েরাই শুদ্ধাচারী শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন। অনেক পরবর্ত্তি-সময়ের আপস্তম্ব স্মৃতিতে শূদ্রান্ন নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিকারগণ যে উহার অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা আপস্তম্বে স্বীকৃত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সময়ে যখন শূদ্র ও দ্বিজজাতির মধ্যে কিছু বেশী বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছিল, তখনও শূদ্রকে কেহ পদদলিত করে নাই। আহারাদি না

* Bombayর দেশী নাম মুম্বই।

চলিলেও যে সৌহার্দ্দ্য মিলন প্রভৃতি নষ্ট হয় নাই, একাল পর্য্যন্তও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

মহাভারতে দেখিতে পাই যে, শূদ্রেরা রাজমন্ত্রী হইতেন; সকল পুরাণাদিতে দেখিতে পাই যে, জ্ঞানবৃদ্ধ শূদ্রেরা সমাজে মান্য হইতেন; এবং শূদ্রদিগের শিক্ষার জন্য মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি যে উন্মুক্ত ছিল, তাহা সকলেই জানেন। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতা ও শূদ্রের প্রতি কঠোরতার কথা উল্লেখ করা নিতান্ত অন্যায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অব্যক্তানুকরণ।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের যে সকল গ্রন্থ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, মৃচ্ছকটিক তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া পরিচিত। ঠিক্ কোন্ সময়ে মৃচ্ছকটিক রচিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা অসম্ভব হইলেও, ইহা যে প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, সে কথা অনেকে বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় অধ্যাপকমণ্ডলী মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীও ইহাকে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব-প্রতিপাদক কি কি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, "প্রবাসী" পত্রে তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় মৃচ্ছকটিকের আধুনিকত্ব-প্রতিপাদনের জন্য প্রবন্ধ প্রকটিত করিতেছেন। মজুমদার মহাশয় এ পর্য্যন্ত যে সকল তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান তর্ক এই যে,—মৃচ্ছকটিকে "খটখটায়েতে" "ফুরফুরায়তে" প্রভৃতি যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত গ্রন্থের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মজুমদার মহাশয় এই মত প্রচারিত করিবার সময়ে পাণিনির ব্যাকরণের আলোচনা আবশ্যক মনে করেন নাই; বরং লিখিয়াছেন,—এক আধটি শব্দ থাকিলেও ব্যাকরণ সূত্র রচিত হয়। সুতরাং পাণিনির ব্যাকরণে এইরূপ শব্দশাসনের জন্য এক আধটি সূত্র থাকিলেও,

তাহাতে মৃচ্ছকটিকের আধুনিকত্ব খণ্ডিত হইবে না। মজুমদার মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত কত দূর সত্য, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

খট্‌খটায়তে, ফুরফুরায়তে প্রভৃতি যে শ্রেণীর শব্দ, সকল ভাষায় ঐ শ্রেণীর শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা সকল দেশেই ভাষার শৈশব অবস্থা হইতে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, বা ব্যতিক্রম ঘটিবার কোন বিশিষ্ট কারণ ছিল, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সংস্কৃত ভাষায় এই শ্রেণীর শব্দ "অব্যক্তানুকরণজাত" শব্দ বলিয়া সুপরিচিত। সংস্কৃত-সাহিত্যের কোন্ যুগে তাহাদের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে এই শ্রেণীর শব্দের ব্যবহার দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ ইহার সমধিক প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। পাণিনির পূর্ব্বে যে সকল ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, তাহাতে এই শ্রেণীর শব্দ-শাসনের সূত্র ছিল কি না, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণে এই শ্রেণীর শব্দশাসনের জন্য অনেকগুলি সূত্র বর্ত্তমান আছে। ভাষায় অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ প্রচলিত না থাকিলে, ব্যাকরণে তাহার এতগুলি সূত্র থাকিত না। পাণিনির ব্যাকরণ যে বহুপুরাতন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণপ্রয়োগ অনাবশ্যক। পাণিনির ব্যাকরণে অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ শাসনের জন্য সূত্র বর্ত্তমান থাকাই এই শ্রেণীর শব্দের সমধিক প্রাচীনত্বসূচক। পাণিনির ব্যাকরণে কত সূত্রে কি ভাবে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

অপরিস্ফুট বর্ণের নাম অব্যক্ত। তাহাকে যে কোন সাদৃশ্যমাত্র অবলম্বন করিয়া যথাকথঞ্চিৎ পরিস্ফুটবর্ণরূপে অনুকরণ করিবার চেষ্টার নাম অব্যক্তানু-করণ। * ভেক যে শব্দ করে, তাহা অব্যক্ত—অপরিস্ফুট। যে ভাবে ভেক শব্দ করে, ঠিক সেই ভাবে তাহার অনুকরণ করা যায় না। মক মক শব্দে তাহার যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যরক্ষা করিয়া আমরা তাহার অনুকরণ করিয়া থাকি। এইরূপে অনুকরণজাত যে সকল শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহা কোন ধাতু-মূলক নহে, অব্যক্তানুকরণমূলক। এই শ্রেণীর শব্দ পাণিনির ব্যাকরণে বহুবিভাগে বিভক্ত হইয়া নানা সূত্রে নানাবিধ নিয়মের অধীন হইয়াছে।

---

* অব্যক্তং অপরিস্ফুটবর্ণং। তদনুকরণং পরিস্ফুটবর্ণমেব কেনচিৎ সাদৃশ্যেন তদব্যক্তং অনুকরোতি।—কাশিকাবৃত্তিঃ॥

"জগৎ" শব্দের উত্তর "ইতি" শব্দ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া সন্ধির সাধারণ নিয়মানুসারে "জগদিতি" হয়। অব্যক্তানুকরণজাত অৎ-ভাগান্ত সমস্ত শব্দ এই নিয়মের অধীন হয় না। যে সকল অৎভাগান্ত অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ একাধিকস্বরবিশিষ্ট, সেই সকল শব্দের উত্তর "ইতি" থাকিলে, সন্ধির সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। "পটৎ" শব্দের উত্তর "ইতি" শব্দ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া "পটদিতি" না হইয়া, "পটিতি" হয়। ইহার সূত্র:—

অব্যক্তানুকরণস্যাত ইতৌ॥" ৬। ১। ৯৮॥

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, পাণিনির ব্যাকরণ রচিত হইবার পূর্ব্বে, সাহিত্যে "অব্যক্তানুকরণজাত" নানা শ্রেণীর শব্দ, এবং এক এক শ্রেণীর বহুসংখ্যক শব্দ বর্ত্তমান ছিল, অন্যথা এরূপ সূত্র ব্যাকরণে স্থান প্রাপ্ত হইত না। অৎ-ভাগান্ত বহু শব্দ ছিল; তন্মধ্যে কতকগুলি একস্বরবিশিষ্ট, যথা—"প্রৎ।" সে সকল স্থলে ইতি শব্দ পরে থাকিলে "প্রদিতি" হইত। যেগুলি একাধিকস্বরবিশিষ্ট, তাহার উত্তর ইতি থাকিলেই, সাধারণ নিয়ম অনুসারে সন্ধি হইত না।

অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ অনেক সময়ে আম্রেড়িত হইয়া থাকে, যেমন—পটৎ পটৎ। এইরূপে আম্রেড়িত হইলে, ইতিশব্দ যোগে (১) পটৎপটদিতি হয়, (২) বিকল্পে শেষস্থ তকারের ও পরবর্ত্তী ইকারের পররূপ একাদেশ হইয়া ইকার হইয়া যায়, তাহাতে পটৎপটৎ+ইতি=পটৎপটেতি রূপও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (অসম্পূর্ণ অনুকরণস্থলে "পটৎপটদিতি", এবং পূর্ব্বসূত্রানুসারে সমুদায়ানুকরণে "পটৎপটিতি" হয়। ইহার সূত্র যথা:—

নাম্রেড়িতস্যান্তস্য তু বা॥ ৬। ১। ৯৯॥

এই সূত্রেও আম্রেড়িত অব্যক্তানুকরণজাত শব্দের ইতি-শব্দযোগে সন্ধির বিশেষ নিয়ম লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারা যায়, ভাষায় বহুসংখ্যক অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ প্রচলিত না থাকিলে, ব্যাকরণে তাহার এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধি নিষেধের পরিচয় থাকিত না।

"ইতি" শব্দ পরে না থাকিলে, দুই বা ততোধিকস্বরবিশিষ্ট অব্যক্তানুকরণজাত শব্দের উত্তর "ডাচ" প্রত্যয় হইয়া দ্বিরুক্ত হইয়া থাকে; তাহার পর প্রত্যয়সংযুক্ত হইয়া দমদমা, পটপটা ইত্যাদি শব্দ গঠিত হয়। এই সকল শব্দ কৃ, ভূ ও অস্‌ধাতুর যোগে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—পটপটাকরোতি, পটপটাভবতি, পটপটাস্যাৎ। ইহার সূত্র যথা:—

অব্যক্তানুকরণাদ্ব্যজবরার্দ্ধাদনিতৌ ডাচ্ ॥ ৫। ৪। ৫৭ ॥

"ডাচ্"প্রত্যয়ান্ত শব্দ ঊর্য্যাদি ও চ্ব্যন্ত শব্দের ন্যায় "গতিসংজ্ঞা" প্রাপ্ত হইবার কথা আর একটি সূত্রে লিখিত আছে ; তদনুসারে পটপটাকৃত্য, পটপটাকৃতং ইত্যাদি রূপ হইয়া থাকে। তাহার সূত্র যথাঃ—

ঊর্য্যাদিচ্চিডাচশ্চ ॥ ১। ৪। ৬১ ॥

অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ হইতে ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করিয়া, ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা যে অতি পুরাকালেই আরব্ধ হইয়াছিল, পাণিনির ব্যাকরণে তাহার এই সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষ্যকে ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করিবার প্রথম কৌশল কৃ, ভূ ও অস্‌ধাতুর যোগ, দ্বিতীয় কৌশল "নামধাতু"র সৃষ্টি। অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ কৃ, ভূ ও অস্‌ধাতু যোগে ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় পূর্ব্বোক্ত সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা যে নামধাতুরূপেও পাণিনির ব্যাকরণ রচিত হইবার পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইত, আর একটি সূত্রে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—

লোহিতাদিডাজ্‌ভ্যঃ ক্যষ্ ॥ ৩। ১। ১৩ ॥

এই সূত্রানুসারে লোহিত, নীল, হরিত, পীত, ভদ্র, ফেন, মন্দ প্রভৃতি লোহিত্যাদি শব্দের ও ডাচ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর "ক্যষ্" প্রত্যয় হইয়া নামধাতু হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—পটপটায়তি, পটপটায়তে ইত্যাদি। নামধাতুর এইরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া, খটখটায়তে, ফুরফুরায়তে প্রভৃতি প্রয়োগ যে সমধিক পুরাতন, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ মজুমদার মহাশয় এই সকল শব্দ অবলম্বন করিয়াই মৃচ্ছকটিকের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মজুমদার মহাশয়ের আর একটি প্রধান তর্ক এই যে, কালিদাসাদির গ্রন্থে এই শ্রেণীর অব্যক্তানুকরণজাত নামধাতুর প্রয়োগ না থাকায়, উহা যে কালিদাসাদির পরে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। এই সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ভাষার পূর্ণাবস্থায় কবি কালিদাসাদির কিছুমাত্র শব্দদারিদ্র্য ছিল না ; ভাষার শৈশবে ও বার্দ্ধক্যেই সাহিত্যে এই শ্রেণীর বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। শৈশবের গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া, এই শ্রেণীর শব্দ আধুনিক কালে প্রচলিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যায় না। প্রাচীন সময়ে এই শ্রেণীর শব্দ প্রচলিত না থাকিলে, তাহার এত সূত্র ব্যাকরণে স্থান লাভ করিত না।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। সে সাহিত্যের সমগ্র গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিলে ব্যাপার এত কঠিন হইত না। কিন্তু গ্রন্থলোপে নানা ঐতিহাসিক সূত্র বহুধা ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ব্যাকরণেই একমাত্র অবিচ্ছিন্ন সূত্রের সন্ধান প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিরতিশয় শ্রমসাধ্য ব্যাপার; তাহাতে লেখকগণ হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত। অথচ সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস চাই ;—তজ্জন্য তর্কবিতর্কে বঙ্গসাহিত্য অল্প দিনের মধ্যেই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাণিনির পূর্ব্বে এ দেশে যে সকল ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল পাণিনির সূত্রে তাহার মধ্যে কোন কোন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণিনির কোন্ সূত্রে কোন্ পুরাতন বৈয়াকরণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি তালিকা থাকিলে তথ্যসঙ্কলনের সুবিধা হইতে পারে। এই তালিকার সংগ্রহ আবশ্যক বলিয়া, যত দূর জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। অন্যান্য লেখকগণ ইহার সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিলে ভাল হয়।

নাম	পাণিনির সূত্রসংখ্যা।
গার্গ্য—	৭। ৩ ৯৯ ॥
গালব—	৬। ৩। ৬১ ॥ ৭। ১ ৭২ ॥
সেনক—	৫। ৪। ১১২ ॥
আপিশলি—	৬। ১। ৯২ ॥
কাশ্যপ—	৮। ৪। ৬৭ ॥
চক্রবর্ম্মা—	৬। ১। ১৩০ ॥
ভরদ্বাজ—	৭। ২। ৬৩ ॥
কাত্যায়ন—	৩। ৪। ১১১ ॥
সাকল্য—	১। ১। ১৬ ॥
স্ফোটায়ন—	৬। ১। ১২৭ ॥
যাস্ক—	২। ৪। ৬৩ ॥

ইহা ছাড়া বার্ত্তিকসূত্রে ব্যাড়ি, পৌষ্করসাদি ও ভাগুরি নামক বৈয়াকরণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল পুরাতন বৈয়াকরণগণের মধ্যে যাস্ক সুপরিচিত। তিনি বৈদিক শব্দের যে "নিরুক্ত" রচনা করেন, তাহাতেও অব্যক্তানুকরণজাত

শব্দ বেদে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। * . সুতরাং অন্যান্য ভাষার ন্যায় সংস্কৃত ভাষাতেও অতি পুরাকাল হইতেই যে অব্যক্তানুকরণজাত শব্দের ব্যবহার ছিল, তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণে এই সকল শব্দ শাসনের জন্য যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, পরবর্ত্তিযুগের সংস্কৃত-ব্যাকরণে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন হয় ত বহুকালের ব্যবহারে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অর্থপার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যের পরিণতাবস্থায় অব্যক্তা-নুকরণজাত শব্দ প্রচলিত হইয়া থাকিলে, উত্তরকালের ব্যাকরণেই তাহার সূত্রাদির বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যাইত। এই সকল কারণে মৃচ্ছকটিকের "খটখটায়তে" "ফুরফুরায়তে" প্রভৃতি শব্দ ঐ গ্রন্থের আধুনিকত্বের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মজুমদার মহাশয় এই প্রমাণ ব্যতীত আরও অনেকগুলি তর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। তাহার সহিত সংস্কৃত-ব্যাকরণের সম্বন্ধ নাই। তজ্জন্য এই প্রবন্ধে তাহার কথা আলোচিত হইল না। সংস্কৃত সাহিত্যের রচনাকালনির্ণয় করিতে হইলে, পাণিনির ব্যাকরণ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এক্ষণে উহার অধ্যাপনা করিতে পারেন, এরূপ সুপণ্ডিত অধ্যাপকের সংখ্যা অল্প হইয়াছে বলিয়া, মূল গ্রন্থপাঠের অসুবিধা ঘটিলেও, এলাহাবাদ হইতে অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের বৃত্তি ও ব্যাখ্যার এক উৎকৃষ্ট ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা মূল গ্রন্থপাঠে সময় ক্ষয় করিতে অসম্মত, তাঁহারা উক্ত অনুবাদ অবলম্বন করিয়াও নানা ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করিতে পারেন। মজুমদার মহাশয়ের যেরূপ অধ্যবসায়, তাহাতে তিনি অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া, প্রমাণসংগ্রহার্থ পাণিনির আলোচনা করিলে, আমরা তাঁহার কৃপায় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিতে পারিতাম।

মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিতেছি, তিনি পাণিনির আলো-চনায় কালক্ষয় করা অনাবশ্যক মনে করিয়া, অন্যান্য অনুমানের বলে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছেন। † ইহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পুনরায় বিচার করিয়া পরিশ্রান্ত হইতে হয়;—তজ্জন্য তাঁহার

---

* অব্যক্তানুকরণজাত কত শব্দ বেদে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অধ্যাপক হুইট্নী বিরচিত সংস্কৃত ব্যাকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে।

† মৃচ্ছকটিকের শকারের উক্তিতে এক স্থলে 'সুবন্ধু' শব্দ প্রাপ্ত হইয়া মজুমদার মহাশয় তর্ক করিয়াছেন, ঐ সুবন্ধু বাসবদত্তা-রচয়িতা। বাসবদত্তার কবি বিক্রমাদিত্যের পরবর্ত্তী। সুতরাং মৃচ্ছকটিকে তাঁহার নাম উল্লিখিত থাকায় মৃচ্ছকটিকও বিক্রমাদিত্যের পরবর্ত্তী। ইহাই মজুমদার মহাশয়ের তর্কের সারাংশ। কিন্তু সুবন্ধু নাম সংস্কৃতসাহিত্যে বৈদিক

অধ্যয়নের ফল অন্য লেখক প্রাপ্ত হইতে পারেন না। মৃচ্ছকটিককে পুরাতন নাট্যগ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিবার যে সকল কারণ "প্রবাসীতে" লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মজুমদার মহাশয় পরিতৃপ্ত না হইয়া, প্রাকৃত ভাষার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, কতকগুলি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া, মৃচ্ছকটিককে আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সকল প্রাকৃত শব্দ যে কত পুরাতন, তাহার বিচার করিবার চেষ্টা না করিয়াই, তাহাদিগকে আধুনিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। উহার প্রত্যেক শব্দ ধরিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা যে নিতান্ত আধুনিক সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। অন্যথা সাধারণভাবে ঐ সকল শব্দ আধুনিক বাঙ্গলা বা উড়িয়া শব্দের অনুরূপ বলিয়া সমালোচনা শেষ করিলেই চলিতেছে না। কে বলিল,—ঐ সকল "ঘিয়ং," "দহীং", "গুড়ং" প্রভৃতি শব্দ আধুনিক? কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত ঐ সকল শব্দবিচারের সম্বন্ধ না থাকায়, এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন, ভাষায় এক আধটি শব্দ থাকিলে, তাহার জন্যও ব্যাকরণে সূত্র সন্নিবিষ্ট হইত। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের রচনাকৌশল কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহ আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, "এক আধটি" শব্দের জন্য নিপাতনের ব্যবস্থা ছিল, এবং অল্পসংখ্যক শব্দ হইলে, তাহাদিগকে গণভুক্ত করিয়া সেই "গণের" শব্দশাসনার্থ সূত্র সন্নিবিষ্ট হইত। অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ যে এই শ্রেণীর এক আধটি শব্দ নহে, তাহা নানা সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

অব্যক্তানুকরণাদ্ব্যজবরার্দ্ধাদনিতৌ ডাচ্॥ ৫। ৪। ৫৭॥

এই সূত্রে "দ্ব্যজবরার্দ্ধাৎ" বাক্যের মধ্যেই একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ সংখ্যায় এত অধিক ছিল যে, স্বরের সংখ্যা অনুসারে তাহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত

কাল হইতেই সুপরিচিত। মৃচ্ছকটিকের শকারোক্তিতে যে 'সুবন্ধু' নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বাসবদত্তার কবিকেই বুঝাইবে কেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা, যায় না।

Subandhu, as an appellation, is of great antiquity. Professor Wilson says, of the sacred character so called, who is mentioned in the Eighth act of the *Mrichcha Katika* drama, that *he has not* been identified. According to the *Sarvanukrama* of the *Rig Veda*, Bandhu, Subandhu, Srutabandhu, and Viprabandhu, sons of Gopayana or Lopayana, were joint authors of a hymn, the thirtyfourth of the fifth Mandala."—*Hall's Vasavadatta*, Editor's Preface.

হইয়াছিল। কতক একস্বরবিশিষ্ট, কতক অনেকস্বর-বিশিষ্ট, এবং অনেকস্বর-বিশিষ্টের মধ্যেও নানা শ্রেণী কল্পিত হইয়াছিল। বার্ত্তিককার বলিয়া গিয়াছেন,

ডাচি বহুলং। ৮। ১। ১২ ॥

ইহাতে বুঝা যায়, 'ডাচ্' প্রত্যয়ের পরে অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ বহুপ্রকারে দ্বিরুক্ত হইত। বহুপ্রকার দ্বিরুক্তিশ্রমে বহুসংখ্যক শব্দের উৎপত্তি সুপরিচিত না থাকিলে, "বহুলং" শব্দ প্রযুক্ত হইত না।

এই সকল অব্যক্তানুকরণজাত শব্দ প্রথমে অবশ্যই অপভাষা বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে ব্যাকরণসম্মত সাধুভাষায় পরিণত হইয়া বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ সাহিত্যেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। কোন্ পুরাকালে ফট্-ফটায়তে, কুরকুরায়তে প্রভৃতি শব্দ অপশব্দ-সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, সাধুশব্দ-রূপে সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল যাস্কের ও পাণিনির গ্রন্থে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। এই শ্রেণীর শব্দ পাণিনির বহু পূর্ব্বে সাধুশব্দরূপে ভাষায় গৃহীত ও বৈদিক সাহিত্যে স্থান প্রাপ্ত না হইলে, পাণিনি তাহার জন্য এতগুলি সূত্রের রচনা করিতেন না। কারণ, পাণিনির সময়ে তৎপরবর্ত্তী ও ভাষ্যকারের সময়েও অপশব্দ নিতান্ত হেয় ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানসময়ে অব্যবহার্য্য বলিয়া নিন্দিত হইত। ভগবান পতঞ্জলি মহাভাষ্যের সূচনাতেই তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা একালের লোক, সেকালের সাহিত্যসমালোচনার সময়ে যদি সেকালের ব্যাকরণের সমালোচনা করিতে অসম্মত হই, তাহা হইলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য মজুমদার মহাশয়ের মতের আভাস পাইয়া, তাঁহাকে পত্র দ্বারা সংক্ষেপে পাণিনির ব্যাকরণের এই সকল প্রমাণের কথা বিদিত করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, মজুমদার মহাশয় ইঙ্গিতমাত্রে তাহার উল্লেখ করিয়া, পাণিনির ব্যাকরণে সূত্র থাকিলেও তাহার সমালোচনা করা অনাবশ্যক বলিয়া মন্তব্যপ্রকাশে প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। যাঁহারা সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত, তাঁহাদের মতামত অনেকের নিকট বিনা বিচারে গৃহীত হইয়া থাকে। তজ্জন্য কোন কথা প্রচার করিবার পূর্ব্বে অবহিতভাবে সকল কথারই আলোচনা করা আবশ্যক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নবকৃষ্ণের জীবনচরিত ও নন্দকুমার।

২

আমরা এক্ষণে ঘোষ সাহেবের মন্তব্যের মর্ম্ম প্রদান করিয়া, তৎসম্বন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিতেছি। ঘোষ সাহেবের প্রথম কথা এই যে, জেম্‌স ষ্টীফেন, ম্যালেসন ও ফরেষ্ট প্রভৃতি আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বহুতর অনুসন্ধানের পর নন্দকুমার ও তাঁহার বিচার সম্বন্ধে যেরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া নিরপেক্ষ পাঠকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছে। বার্ক, মিল বা মেকলের বর্ণনা-পাঠে পূর্ব্বকালীন লোকের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইত, এক্ষণে তাহা অনেক পরিমাণে মুছিয়া যাইতেছে। কিন্তু এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা এই সমস্ত দেখিবে না ও শুনিবে না, এবং কেবল কল্পনা আশ্রয় করিয়া আপনাদিগের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলিকে কৈফিয়ৎ দিয়া এড়াইতে চেষ্টা করিবে। ঘোষ সাহেবের প্রথম কথা কত দূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। ষ্টীফেন প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিয়া বার্ক মিলের বর্ণনা যে আধুনিক নিরপেক্ষ পাঠকগণের মনে স্থান পায় না, ইহা আমরা স্বীকার করি না। তিনি নিরপেক্ষ পাঠক কাহাকে বলেন? যাঁহারা নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করেন, তাঁহারাই কি নিরপেক্ষ পাঠক? পাঠকগণের মধ্যে নন্দকুমারের সহিত সকলের বিশেষরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাঁহাদের মধ্যে জনকতক যদি নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতি দেখান, তাহা হইলে তাঁহারা নিরপেক্ষ পাঠক-শ্রেণীর বহির্ভূত হইবেন, আর যাঁহারা নন্দকুমারকে অন্যরূপ দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা নিরপেক্ষ পাঠকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, ইহা কিরূপ সিদ্ধান্ত, তাহা ঘোষ সাহেবই বলিতে পারেন। ঘোষ সাহেব নিজের দৃষ্টিতেই নিরপেক্ষ-পাঠকের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে পক্ষ-পাতী বিচারক, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না? জীবনীলেখকদিগকে যে অনেকপরিমাণে পক্ষপাতিত্ব আশ্রয় করিতে হয়, তাহা কি ঘোষ সাহেব অস্বীকার করেন? যাঁহারা নন্দকুমারের জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ঘোষ সাহেব যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নন্দকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী নবকৃষ্ণের জীবনীলেখক ঘোষ সাহেব কি তৎসমুদায় হইতে আপনাকে মুক্ত বিবেচনা করেন? যাহা হউক, আমরা নিরপেক্ষ পাঠক কাহাকে বলে, বুঝি না।

এইমাত্র বুঝি যে, পাঠকগণের মধ্যে কত জনই বা নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং কত জনই বা তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সুখের বিষয়, ঘোষ সাহেবের মতপোষক পাঠকের সংখ্যা অধিক বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। ইউরোপের কথা ঠিক জানি না, তবে আমাদের এ দেশে যে নাই, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

তাহার পর, ঘোষ সাহেবের ষ্টীফেন প্রভৃতির বর্ণনায় বার্ক, মিল প্রভৃতির বর্ণনা যে আদৌ নির্ব্বাসিত হয় নাই, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ষ্টীফেনের বর্ণনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব যে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সে পুস্তকখানির প্রতি কি ঘোষ সাহেবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই? কৈ, তাঁহার গ্রন্থের কোন স্থানে ত বেভারিজ সাহেবের পুস্তকের উল্লেখ দেখিলাম না। আধুনিক বাঙ্গলা-লেখকগণের বর্ণনায় ঘোষ সাহেব যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, বেভারিজের গ্রন্থের কথা স্মরণ হইলে বোধ হয় তিনি সেরূপ করিতে সাহসী হইতেন না। ঐ সমস্ত বাঙ্গালী লেখক আপনাদিগের প্রবন্ধ সম্বন্ধে বেভারিজের গ্রন্থ হইতে অনেকপরিমাণে সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা তাঁহারা স্থানে স্থানে স্বীকারও করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার ষ্টীফেনের মত সম্বন্ধে বেভারিজ যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—বেভারিজ ষ্টীফেনের গ্রন্থের উত্তরপ্রদানের জন্য স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের নাম দিয়াছেন, The Trial of Maharaja Nandkumar, a Narrative of a Judicial murder। এক্ষণে আমরা বেভারিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া ঘোষ সাহেবকে ও পাঠকগণকে দেখাইতেছি যে, ষ্টীফেনের মন্তব্য চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয় নাই,এবং বার্ক মিলের বর্ণনা আজিও অনেকের মনে জাগরূক আছে। ষ্টীফেন সম্বন্ধে বেভারিজ বলিতেছেন:—

"My discouragement, however, was renewed when I found that Sir J. Stephen had evidently taken up the subject hastily, and had written his book in hurry. I think the first ray of hope came from the discovery that he was wrong about the date of the capture of Rhotas, and then I found that he did not quote the provision of Bolaqui's will about Padma Mohan

corectly, or notice the expression on the jewels-bond that the jewels were deposited to be *sold*.

Further researches in the Calcutta Public Library, and in the Foreign Office, convinced me that Sir J. Stephen's work was thoroughly unreliable, and that we might adopt to himself what he has wrongly and flippantly said about James Mill (II, 149) and say that his trenchant style and *excathedra* air *produce an impression of accuracy and labour which a study of original authorities does not by any means confirm.*"

নিজের স্বাধীন অনুসন্ধান সম্বন্ধে তিনি আরও বলিতেছেন,—

"I have also made much use of the invaluable documents recently discovered in the High Court Record-room." (Preface)

উল্লিখিত উক্তিগুলি তাঁহার গ্রন্থের Preface বা ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত হইল। কিন্তু তিনি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে নবম বিষয়ে লিখিয়াছেন :—

" That Sir J. Stephen has, in his recent book 'The story of Nuncomar and impeachment of Sir Elijah' Impey partly from the zeal of advocacy and partly from his having approached his subject without adequate preparation, without knowledge of Indian History or of the peculiarities of an Indian record, made grave mistakes in his account of the trial and in his observations thereon."

ইহা তাঁহার একটি প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং তিনি তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্নও করিয়াছেন। ঐ সমস্ত স্বাধীন অনুসন্ধান ব্যতীত তিনি আরও অনেক স্থান হইতে কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন ; তন্মধ্যে ঘোষ সাহেব যাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, সেই নবকৃষ্ণের বংশধরের নিকট হইতেও কাগজপত্র সংগ্রহ করিবার কথা বেভারিজ সাহেব ভূমিকায় সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বেভারিজ সাহেব যে স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা ঐরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিতেছেন। ষ্টীফেনের পর যখন মিল বার্ককে সমর্থন করিবার জন্য কোন কোন সহৃদয় ইংরাজ লেখককে অগ্রসর হইতে দেখিতেছি, তখন ঘোষ সাহেবের কথা কেমন করিয়া

বিশ্বাস করিতে পারি। এবং বেভারিজ সাহেবের গ্রন্থ মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে যে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, তাহা ইংরাজ ও বাঙ্গালী লেখকগণের কোন কোন গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়। আমরা দুই এক জনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি :—

" A very inadeqûate idea would be formed of the scope of 'The Trial of Nanda Kumar' from its title, for its author has enriched its elaborate detail with an amount of historical information (some bearing on, some collateral to the main subject), which shows surprising research, and a successful diligence in tracing out the antecedents and surroundings of many of the actors in the drama, quite extraordinary. In addition to the qualification of a mind trained to habits of patient investigation, Mr. Beveridge has also brought to bear on a labour, which he has thrown himself into with great earnestness, an acquaintance with Bengal, its languages and its people, derived from many years' residence amongst them, and a long experience of practical judicial work." (Busteeds' Echoes from Old Calcutta, second edition, p. 981)

আর একজন বলিয়াছেন :—

" He (Nanda Kumar) was in his seventieth year when he entered into a struggle with Warren Hastings, the result of which is wellknown. In the year 1775, after trial in the Calcutta High Court, Nanda Kumar was convicted of forgery, and sentenced to be hanged. This case has given rise to endless discussion, and to the production of a work by Sir James Fitz James Stephen, in proof of the Maharaja's guilt.

In reply to this Mr. Beveridge, formerly of the Indian Civil Service, has published a volume which upholds the innocence of Nanda Kumar. I do not propose to enter into any controversy. Let those who wish to form an opinion read

the available literature on the subject. *Personally I think with Mr. Beveridge, that the execution of Nanda Kumar was a grave miscarriage of justice.*" (Walsh's History of Murshidabad district, 1902, p. 223.)

আর আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের মত ঘোষ সাহেব নিজেই সমালোচনা করিয়াছেন। সুতরাং জেম্‌স ষ্টীফেন প্রভৃতির গ্রন্থপাঠের পর ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে যে মিল বার্কের বর্ণনাকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করেন না, ইহা সত্য। তবে ঘোষ সাহেবের মতাবলম্বিগণের কথা স্বতন্ত্র।

আমরা এতক্ষণ জেম্‌স ষ্টীফেনেরই বিষয় বলিলাম। ঘোষ সাহেব অন্য যে দুই জন ঐতিহাসিকের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা যে এ বিষয়ে স্বাধীন অনুসন্ধান করেন নাই, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায়। ম্যালেসন বহুস্থানে সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। যথা :—

"In his admirable work, already quoted, Sir James Stephen has commented on the manner in which after Hastings had quitted the Council-chamber, the majority had conducted their buseness." Malleson's Life of Warren Hastings, p. 212.)

আর এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"From the above facts, which are incontestable, Sir James Stephen to whose summary I have been so much indebted, draws the following conclusions."

"It is, I think, impossible to dispute the logical accuracy of the conclusion arrived at by Sir James Stephen." (p. 227)

আবার বলিতেছেন :—

"The curious reader will find these recorded and commented upon in the valuable work from which I have so often quoted." (p. 235)

এইরূপ অনেক স্থলে আছে। সুতরাং ম্যালেসন যে এই বিষয়ে কোনরূপ স্বাধীন অনুসন্ধান না করিয়া ষ্টীফেনের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া আপনার মতামত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ম্যালেসন

এক জন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, এবং অনেক স্থলে তিনি নিরপেক্ষ সত্যও প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি ষ্টীফেনের চর্ব্বিতচর্ব্বণ ব্যতীত আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ফরেষ্টও যে ষ্টীফেনের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার গ্রন্থ হইতে সুচারুরূপে বুঝিতে পারা যায়। তবে তিনি অনেক দিন সরকারী কাগজপত্র দেখাশুনা করিয়া Selections from State Papers নামে যে গ্রন্থপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপক্রমণিকাতেও ওয়ারেণ হেষ্টিংস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই পরিশেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার Selections from State Papers নামক গ্রন্থে পূর্ব্বপ্রকাশিত কাউন্সিলের মন্তব্য ব্যতীত নন্দকুমার সম্বন্ধে নূতন কোন বিষয় নাই। হেষ্টিংসের বিচারকালে ঐ সমস্ত মন্তব্য জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং বার্ক, মিল সে সকলের আলোচনা করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ফরেষ্টের অনুসন্ধানে নূতন কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। আবার ম্যালেসন ও ফরেষ্ট জীবনীলেখক ; সুতরাং ঐতিহাসিক মেকলের উক্তি অনুসারে জীবনীলেখকের সকল কথা যে বিশ্বাস্য নহে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। অতএব নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা যে কেবল কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, ইহা এক্ষণে আমরা অনায়াসে বলিতে পারি কি না? ঐ সকল লেখক কিছু দেখাশুনাও করিযাছেন, এবং কেবল কল্পনা আশ্রয় করিয়া কৈফিয়ৎ দিয়া ঘটনা এড়াইতে চেষ্টা করেন নাই। বিচক্ষণ লেখকদিগের মতের অনুসরণ করিয়া আপনারাও কিছু কিছু স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা নন্দকুমার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঘোষ সাহেব নন্দকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী নবকৃষ্ণের জীবনীলেখক হইয়া কিয়ৎ-পরিমাণে যে পক্ষপাতিত্বদোষে অন্ধ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার নবকৃষ্ণ-চরিত্রে যত দূর কল্পনার খেলা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং তিনি নব-কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় অনেক ঘটনা কৈফিয়ৎ দ্বারা যেরূপ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নন্দকুমারের জীবনীলেখক তত দূর পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার লিখিত নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি তাঁহারই প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। নবকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে নন্দকুমারের সহিত যে যে স্থানে নবকৃষ্ণের সম্বন্ধ আছে, সেই সেই স্থানে ঘোষ সাহেব কিরূপে নবকৃষ্ণের সমর্থন করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া আমরা

দেখাইব যে, তাঁহার প্রতি তাঁহারই উক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে কি না। আমরা ক্রমে ক্রমে ঘোষ সাহেবের মন্তব্যের সকল কথাগুলির সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি।

১৮ই ফাল্গুন। এবারকার "সখায়" ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি ইংরাজী-ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। "রইস এণ্ড রায়ত" পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া তিনি যে দেশের অনেকটা উপকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমার বোধ হয়, মৃত মহাত্মার প্রতিভা সংবাদপত্র-পরিচালনের ততটা উপযোগী ছিল না। রাজনীতির ঘোরেই মজিয়া থাকুন, অথবা সমাজনীতি লইয়া ব্যস্ত হইয়া বেড়ান, শম্ভুচন্দ্রের দৃষ্টি সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিকে নিবদ্ধ হইয়া থাকিত। সেই জন্য তিনি তাঁহার রচনায় ভাষার পারিপাট্য এবং অলঙ্কার-সমাবেশের জন্য যতটা যত্ন করিতেন, বিষয়গত উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতি ততটা লক্ষ্য রাখিতেন না। তাঁহার যেরূপ অধ্যয়নের আসক্তি, সাহিত্যচর্চ্চাকল্পে যে অসীম সাধনা, তাহাতে বোধ হয়, তিনি আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালার সেবা করিলে বিশেষ উন্নতি করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার প্রতিভা প্রধানতঃ সাহিত্য-বিষয়ক ছিল বলিয়াই এরূপ আক্ষেপ করিতেছি। এইরূপে অনেকানেক প্রতিভাশালি-জনের জীবন হইতে আমরা যতটা সুফলের প্রত্যাশা করিয়া থাকি, তাহা ফলিতে পায় নাই। ইংরাজী-ভাষারূপ সমুদ্রে দুই চারি বিন্দু বারি নিক্ষেপ করিলে, কি দেশী কি বিদেশী, কাহারও তাদৃশ উপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সেই দুই চারি বিন্দু, পাইলে হয় ত আমাদের দীনা মাতৃভাষার জীবনীসঞ্চার হইতে পারিত।

১৯শে ফাল্গুন। "সখাকে" উদ্দেশ্য করিয়া "কল্পিত কথা" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিলাম। কেহ কেহ বালকদিগকে পশু-পক্ষীর গল্প পড়াইতে নিষেধ করেন। তাহারই বিরুদ্ধে দুই একটা যুক্তি এই প্রস্তাবে

লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের মনোনীত হইবে কি না; বলিতে পারি না। আমার বোধ হয়, সকল বিষয়েরই দুই দিক্ এখন হইতে বালকদিগকে কিছু কিছু বলিয়া রাখা ভাল। যাহা উত্তম, কেবল তাহারই আলোচনা করিয়া, যাহা মন্দ, তাহার প্রসঙ্গমাত্র না করিলে, শিক্ষার একটা অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভাল মন্দ, এই উভয় লইয়াই জগৎ। অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ এখানে দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং বালককালে ভাল এবং মন্দ এতদুভয়ের সমালোচনা করিয়া, উত্তমের অনুগামী হইতে শিক্ষা না দিলে, পরিণামে সংসারের কঠোর ঘটনাচক্রে পড়িয়া এই শিক্ষা আবার নূতন করিয়া উপার্জ্জন করিতে হয়। ইহাতে বৃথা সময়ক্ষেপ ত আছেই; তাহার উপর বিষম মনস্তাপ। জগতের বাস্তবিক যে পদ্ধতি, বাল্যে কেবল তাহাই শিখি নাই বলিয়া আমরা নিজে কত কষ্ট পাইতেছি।

২০শে ফাল্গুন। ফাল্গুন মাসের "সাধনায়" রবীন্দ্রবাবুর "প্রেমের অভিষেক" ইতিশীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার আজ-কালকার প্রিয় সেই মিশ্রিত পদ্ধতিতে লিখিত। কবিতাটিতে কঠোর কার্য্যময় জীবনের সহিত কাব্যের কল্পনাপূর্ণ আলস্যময় রাজ্যের একটুকু বেশ মধুর বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিরোধটা দুই এক স্থলে একটু হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। কবি বলিতেছেন, বাহিরে (অর্থাৎ কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্রে, ইংরাজের আফিসে) তিনি শত তাচ্ছীল্য বা অপমান সহ্য করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই;—মৃত্তিকার উপর আধিপত্য তিনি অকাতরে ইংরাজের করে ছাড়িয়া দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে, তাঁহার উদার, প্রশান্ত প্রেমের প্রস্ফুটিত কুঞ্জে,—সেখানে তিনিই একমাত্র রাজা, তাঁহার প্রেমময়ী প্রণয়িনীর অসীম সোহাগ ও সৌন্দর্য্য-গর্ব্বে গৌরবান্বিত। সেখানে ইংরাজের আফিস, আদালত, চাকুরী, লাঞ্ছনা—কিছুই নাই। তথায় কেবল মহাশ্বেতা, শকুন্তলা, দময়ন্তী প্রভৃতি হৃদয়ের গৃহ প্রেমের সৌরভে পূর্ণ করিয়া, বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন; আর কবি আপনাকে তাহাদেরই এক জন নিতান্ত আত্মীয় ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছেন।—বর্ত্তমান কবিতায় ঠাকুর-কবি ভাষা ও ছন্দের উপর তেমন আধিপত্য দেখাইতে পারেন নাই। তা' না পারুন, কবিতাটি মন্দ নহে।—

His execution does not do justice to the boldness of his conception.—N. Bose.

২১শে ফাল্গুন। তিনটার পর চুণীবাবুকে সঙ্গে লইয়া ফটো

তুলাইবার মানসে ধর্ম্মতলায় Himaloyan Art Studio বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমার ছবিটা জগতের লোক কিছুতেই বজায় রাখিতে পারিল না, দেখিতেছি! ইঁহাদের শিল্পী মহাশয় বর্দ্ধমানে চলিয়া গিয়াছেন। অপর লোক নাই। আর যেরূপ রৌদ্রের তেজ, অন্য কোনও স্থলেও যাইতে ইচ্ছা করিল না। অবশেষে "কবরের মাটিতে" এই মুখের ছাপ থাকিবে, বঙ্কিমবাবুর মেহেরুন্নিসার মত মনকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার পর সু—চন্দ্রের বাটীতে বউ-ভাত খাইলাম। আগাগোড়া কেবল মাংসের ব্যাপার। আমি সে উপাদেয় পদার্থের ভক্ত নহি; সুতরাং আহারটা তেমন সুবিধাজনক হইল না। যাহা হউক, আনন্দের কোন ত্রুটি হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কেহই ত বউ দেখাইতে চাহিলেন না; অবশেষে, কৌশলক্রমে অমলার অনুগ্রহে শ্রীমুখখানি একবার দেখিয়া, যথাসাধ্য প্রণামী দিয়া, বিবাহের উৎসবটা শেষ করিলাম। এখন প্রার্থনা এই, সুর-ন—র সম্মুখে যে আদর্শ ধরিয়া দিয়াছি, তাঁহারা তাহারই অনুকরণে চিরদিন সুখ স্বচ্ছন্দে পরস্পরকে ভোগ দখল করিতে থাকুন।

২২শে ফাল্গুন। আজ সকাল হইতে কু—র জন্য মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা হইতে কোন্নগরে সমস্ত রাস্তা কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি। দিন কতক—এক রকম সুখে না হউক, তবু বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। আজ সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়াই জীবনের শূন্যতার পানে অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়িয়া গেল,—অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। অতিযত্নেও রোদন সংবরণ করিতে পারি নাই। কেবল মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। দেখিতেছি, এইরূপ মাঝে মাঝে দুই এক সপ্তাহ যেন স্বপ্নের ঘোরে কাটিয়া যায়; তার পর এক দিন কখন কেমন করিয়া অতীতের সেই জীবন্ত স্মৃতিগুলি প্রাণের ভিতর একেবারে জাগিয়া উঠে, দরবিগলিত অশ্রুর স্রোতে হৃদয়টাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়; কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারি না। মনে হয়, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রাম দুঃখ ক্লেশকে তুচ্ছ করিয়া এই সংসার-সংগ্রামে যুঝিতাম, সে ত আমাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছে, তবে আর কেন বৃথা ঘুরিয়া মরি? এই কঠোর কর্ম্মযুদ্ধের আর প্রয়োজন কি? জগতের দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া নিভৃত নির্জ্জনে এক অতি শূন্যময় প্রান্তে বসিয়া, নিশিদিন কেবল তাহারই কথার আলোচনা করি না কেন? তাহাকে ভাবিয়া ভাবিয়া, তাহার প্রতি আমার সহস্র অপরাধের নিমিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরণের দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিব না

কি? হায়! কেন সে আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল? আমি সুখেই থাকি, আর দুঃখেই থাকি, তবু ত তাহাকে লইয়া ছিলাম। এ শূন্যতা যে সহ্য হয় না।

২৩শে ফাল্গুন। ফাল্গুন মাসের "সাহিত্যে" হীরেন্দ্রনাথ বাবুর "কুরুক্ষেত্র ও নব্যভারত" নামধেয় প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। "কুরুক্ষেত্র" কাব্যের সমালোচনায় "নব্যভারত" উহার মৌলিক কল্পনাকে বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণ-চরিত্র" হইতে গৃহীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবু তাহারই প্রতিবাদ করিতেছেন। তাঁহার প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া, "নব্যভারত" যে এ বিষয়ে ভ্রান্ত, তাহা আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধের ভূমিকা সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাই। হীরেন্দ্র বাবু কবি-কলহের উল্লেখ করিয়া ভাল করেন নাই। কারণ, এ বিষয় লইয়া বঙ্কিম বাবুর সহিত নবীন বাবুর কোনও কলহের কথা আমরা আজিও শুনি নাই। হীরেন্দ্র-বাবুর নিজের কথা সত্ত্বেও আমরা বলি যে, তিনিই এই কলহের সূত্রপাত করিয়া দিতেছেন। এখন উল্লিখিত মনীষিদ্বয় এই কলহে যোগ দিবেন কি না, বলিতে পারি না। বঙ্কিম বাবু "কুরুক্ষেত্রে"র খস্‌ড়ামাত্র দেখিয়া উহার যে সমালোচনা করিয়াছেন, আমার মতে তাহা ঠিক হইয়াছে। "কুরুক্ষেত্রে"র প্রতিপাদ্য অভিমন্যুবধের সহিত নবীন বাবুর মূল উদ্দেশ্যের এত দূর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই যে, উহার জন্য একখানা সম্পূর্ণ গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে। নবীন বাবু তিনখানা বহি লিখিবেন; কিন্তু তিনে মিলিয়া কাব্য হইবে একখানা। আমার বিশ্বাস,—এই অতিবিস্তৃতিদোষে তাঁহার মহাকাব্য লোকের আদরণীয় হইবে না। তিনখানা ভাঙ্গিয়া সম্ভবমত একখানা কাব্য রচনা করাই তাঁহার উচিত ছিল।

২৪শে ফাল্গুন। পঞ্চুরামকে দেখিবার জন্য ২-৩০ মিনিটের গাড়ীতে কলিকাতায় আসিলাম। তাহার দুই দিবস হইল, বড় অসুখ হইয়াছে। গতকল্য বড়ই খারাপ গিয়াছিল শুনিলাম। আজ একটু ভাল আছে। কাল তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা এবং ক্রীড়াশীলতা একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। আজ তবু অনেকটা হাসিয়া খেলিয়া সুস্থভাব দেখাইতেছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এবং প্রাচীনা গৃহিণীগণ বলিলেন, ছেলেদের প্রথম দাঁত উঠিবার সময় ওরূপ হইয়া থাকে; সে জন্য চিন্তার কোনও কারণ নাই। আজ হোমিও ঔষধই খাইতেছে। দুগ্ধের পরিমাণ কমাইয়া আরারুটের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। আগামী রবিবারে একবার বিজয়রত্ন কবিরাজ মহাশয়কে আনিয়া দেখাইব, এই কথা

বলিয়া আসিলাম। সু— খবর লইবেন, বলিলেন। যদি ইতোমধ্যে কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয়, তাহাও করিবেন। আমার ভাগিনেয় চারুচন্দ্রকে কিছু দিনের নিমিত্ত নূতন বাসাতে আসিয়া থাকিতে বলিলাম। তাঁহার Surjeryর পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে, তিনি তাই করিবেন। এক জন পুরুষ অভিভাবক কাছে না থাকিলে, স্ত্রীলোকেরা সামান্য কারণে ভয়ে অস্থির হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকদের বড় দোষ নাই। এ বিষয়ে আমিও তাহাদের অপেক্ষা যে বেশী সাহসী, তাহা নহে।

২৫শে ফাল্গুন। "পুরোহিত" নামক মাসিকপত্রের তৃতীয় সংখ্যা দেখিলাম। শুনিয়াছিলাম, বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার সম্পাদনভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু "পুরোহিতে"র কভারে তাঁহার নামটা বড় বড় অক্ষরে এখনও কেন ছাপা হইতেছে, সে রহস্য বুঝিতে পারিলাম না। "পুরোহিতে"র প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়ের যেরূপ পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত তাঁহার বেশী দিন বনিবে কি না, সে বিষয়ে প্রথমেই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। এক্ষণে সে সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল দেখিতেছি।—বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় "বসন্তে" এই নাম দিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা পূর্ণচন্দ্র বাবুর একটা দোষ। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের ভাষাটা খুব আড়ম্বরপূর্ণ বটে, কিন্তু ইহার ভিতর এমন বিশেষ কি সার কথা আছে, তাহা ত আমি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অনেক লেখক কেবল কথায় কথা জোড়া দিয়া বেশ শ্রুতিমধুর একখানা "শব্দসার" অভিধান রচনা করিয়া যান, ইহাতেও বাহাদুরী আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বাহাদুরীর পরিচয় লইতে গিয়া পাঠকের যে প্রাণান্ত হইয়া যায়। সারকথা সংক্ষেপে অথচ সুমিষ্ট করিয়া ও যথাযোগ্য অলঙ্কারের সহিত বলিতে আমাদের বঙ্কিম বাবুর ন্যায় আর কাহাকেও বড় দেখিতে পাই না।

সন্ধ্যাবেলা সাতটার সময় আজকার ডায়ারী লিখিতেছি, এমন সময় হঠাৎ একটা ভূমিকম্পের বেগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। কতকটা ভয়ও হইয়াছিল। কিন্তু কম্পের বেগ কেবল মুহূর্ত্তব্যাপী।

২৬শে ফাল্গুন। ফাল্গুন মাসের "সাহিত্যে" "সহযোগী সাহিত্য" প্রবন্ধে লেখক * * *. এক জন ইংরাজ-সমালোচকের কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন,—সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভাবের অপেক্ষা ভাষারই প্রাধান্য। এ স্থলে ভাব Matter, এবং ভাষা Form। * * বাবু বর্ত্তমান

বাঙ্গালায় নবীন কবিদিগকে মূল প্রবন্ধলেখকের একটা কথায় বিশেষ মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন। তাহা এই,—নবীন কবিগণ ভাষার উপর অতিরিক্ত লক্ষ্য রাখিতে গিয়া ভাব সম্বন্ধে একবারেই উদাসীন। এমন কি, তাঁহাদের কবিতার ভিতর অনেক সময়ে বাস্তবিক কোনও একটা পদার্থের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত সাহিত্যে ভাষা ও ভাব, Form and Matter, উভয়েরই সমান প্রয়োজন। ইহাদের কোনওটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিতে পারি না। যদি নিতান্তই ইহাদের তারতম্য করিতে হয়, বরং ভাবের উপর একটু বেশী নির্ভর করিতে প্রস্তুত আছি। কারণ, ভাষার সম্বন্ধ কেবল পাঠক বা শ্রোতার কাণের সহিত। যাহা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে, তাহা কবিতার ভাব, অথবা ভাবে ও ভাষায় বিজড়িত একটা মধুর অনুভূতি। তাহা সহজে ধরা যায় না। আর * * * মহাশয়ের উপদেশ সম্বন্ধে আমার কথা এই যে, তাঁহার উক্তি বর্ত্তমান বাঙ্গালা-কবিদিগের উপর ততটা খাটে না। কবিতার ভাষা বাস্তবিক যেরূপ হওয়া উচিত, সে দিকে ত কাহারও লক্ষ্য দেখিতে পাই না। তবে তিনি যদি "কমলবিলাসী" দলের আত্যন্তিক কোমলতা-প্রিয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহার কথা আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছি।

২৭শে ফাল্গুন। "মেঘমালার" শেষ গল্প ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

কলিকাতায় গিয়া দেখিলাম, বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সন্ধ্যায় আমোদ আহ্লাদ করিবার নিমিত্ত একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের সম্পাদক-প্রমুখ কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া তাঁহার আশ্রয়ে Hindu Patriot আফিসে উপস্থিত হইলাম। তাস নহিলে সু—র চলে না। সুতরাং তাহাই আরম্ভ হইল। কিয়ৎকাল পরে "সাহিত্য"-আসরের সেই অন্ধ গায়ক মহাশয় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের যন্ত্র-সমূহের সুরসম্মিলনরূপ সুদীর্ঘ ব্যাপারটা শেষ হইলে, গায়ক মহাশয়, গানের মতন হউক বা না হউক, কতকগুলা হিন্দুস্থানী শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আমাদের প্রিয় বড়াল-কবি মহাশয় আর থাকিতে পারিলেন না। আশায় ও সাহসে বুক বাঁধিয়া একটা বাঙ্গালা গানের প্রস্তাব করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটা বড়ই অসাময়িক হইয়া পড়িয়াছিল। শব্দ-স্রোতের বিরাম দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, বুঝি একটা তরঙ্গ শেষ হইয়া গেল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তখনই

প্রবলতর চীৎকারের বন্যা পুনর্ব্বার আসিয়া তাঁহার নিরীহ প্রস্তাবটিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। আমরা উদরের কাজটা সারিয়া ঘরে ফিরিলাম।

২৮শে ফাল্গুন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আজ রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের জন্মোৎসব। কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া আহীরীটোলার ঘাটে ষ্টীমার-উদ্দেশে উপস্থিত হইলাম। সু— সকলকে একখানি করিয়া টিকিট উপহার দিলেন। আমার পকেট শূন্য। কারণ মনি-ব্যাগটি পকেট হইতে কোন বন্ধু সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। টিকিটের ভাবনা ঘুচিল। ষ্টীমারে উঠিলাম। পথিমধ্যে বাতাস ও বৃষ্টির অত্যাচারে খানিকটা সময় বড় গোলমালে কাটিয়া গেল। দুর্য্যোগ দেখিয়া সু— উৎসব-তীরে নামিলেন না। তাঁহার এই সে দিন বিবাহ হইয়াছে। এখনও প্রিয়সখীর সহিত একমাসও আলাপ করিতে পান নাই। ভয়ের কারণ যথেষ্ট! তিনি ফিরিয়া আসিলেন। বাকী কয় জনে নামিলাম। স্থানটি বেশ রমণীয়। সেই তরঙ্গতাড়িত তীরের উপর বসিয়া, উদার আকাশতলে গঙ্গার তরঙ্গলীলা দেখিতে দেখিতে, বাস্তবিকই মনে একটা কেমন মধুর ঔদাস্যের আবির্ভাব হয়। কিছুকাল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া, দেব-প্রতিমা-গুলি সমুদয় দর্শন করিয়া, আমরা উদ্যানস্থিত পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাটে আসিয়া বসিলাম। চুণীভায়া দুই মালসা খিচুড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিলেন; সকলে মিলিয়া সেইগুলির সদ্ব্যবহার করিলাম। শুনিলাম, এ বৎসরের লোক-সমাগম কিছু বেশী। পরমহংসের ভক্তগণ তাঁহাকে কতকটা দেবতার ন্যায় করিয়া তুলিতেছেন, দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তাঁহার বাসগৃহে দুইখানি ফটো শুভ্র শয্যার উপর শ্বেত চন্দ্রাতপতলে ফুলভারে প্রপীড়িত হইতেছে। সেখানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শিষ্য-সমাবৃত হইয়া একধারে বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

২৯শে ফাল্গুন। দুই এক দিনের পীড়াতেই শিশুটি শীর্ণ হইয়া পড়ি-য়াছে। অন্যান্য বালকের সুস্থ সরল দেহ, সুমনোহর কান্তি দেখিয়া আমি ভাবি, আমার শিশুটিও সেরূপ হয় না কেন? সুপুষ্ট শরীর নহিলে শিশুদিগকে ভাল মানায় না। স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা শৈশবজীবনের একটা অঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু এই অধম মানব-জন্মের উপর নিষ্ঠুর দেবতার কেমন যে একটা বিষম অভিশাপ, ইহার কোনও অবস্থাতেই সম্পূর্ণ সুখ দেখিতে পাই না। আমরা বয়ঃস্থ; সংসারের মৃত্তিকার কলঙ্ক না হয় আমাদেরই শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা যদি সব সময়ে সুখের সন্ধান না পাই,

তাহাতে তত দোষ দি না। কিন্তু শিশুরা ত পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ; তাহারা কেন শৈশবের সঙ্কীর্ণ কালটাও আনন্দে কাটাইতে পায় না? তাহাদের কোন কষ্ট পাইতে দেখিলে, আমি দেবতার শুভ-উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারি না। হায়! কবে আমাদের এই কঠোর অজ্ঞানের অবস্থা কাটিয়া যাইবে? আমরা পূর্ণতার সাক্ষাৎ পাইব?

৩০শে ফাল্গুন। রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য বিবেকানন্দস্বামী মহাশয় আমেরিকায় সিকাগো মেলায় নিমন্ত্রিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হইয়া সেদিন পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিতরিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটিতে বিবেকানন্দের অপূর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এক জন আমেরিকাবাসী লিখিয়াছেন, যে দেশের লোক ধর্ম্ম সম্বন্ধে এতাধিক উন্নত, সেখানে খৃষ্টীয় প্রচারক পাঠাইবার কোনও প্রয়োজন নাই ; উহা নিতান্ত মূর্খতার পরিচায়ক। স্বামী মহাশয় বলেন, হিন্দুধর্ম্মের সহিত অপর সকলের পার্থক্য এই যে, অপরাপর ধর্ম্মে কেবল ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং পরলোকগত বিষয়ে কয়েকটি মত অবলম্বন করিলেই হইল। কিন্তু হিন্দুর আদর্শ অতি উচ্চ। হিন্দু সাধক, কেবল ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার নহে, যত দিন না সেই পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইয়া যান, অর্থাৎ "মুক্তি" লাভ না করেন, তত দিন তাঁহার সাধনা অসমাপ্ত। বাস্তবিক, হিন্দুধর্ম্মের যে বিশ্বজনীন উদারতা, তাহা অপর কোন ধর্ম্মেই লক্ষিত হয় না। হিন্দুর আদর্শ যেমন উচ্চ, তাঁহার সার্ব্বভৌমিকত্বও তেমনি মহৎ। আমেরিকার ধর্ম্মমহাসভা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। যুরোপ-বাসী এ কথা কত দিনে বুঝিবেন, ভগবান্ই জানেন।

১লা চৈত্র। দেশ হইতে পিতৃদেব মহাশয়ের একখানি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার ৮। ১০ দিবস ধরিয়া জ্বর হইতেছে। এখন তাঁহার জ্বরের—পীড়ার কথা শুনিলে বড়ই ভাবনা হয়। সংসারে আমার সমস্ত বন্ধনই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্নেহ করিবার আর ত কাহাকেও দেখিতে পাই না। এ সময়ে যদি তিনি আবার এই হতভাগ্যকে ছাড়িয়া যান, তখন কি লইয়া জগতে দিনযাপন করিব, তাহাই ভাবিতেছি। আমাদের বিস্তৃত পরিবার যেরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, এরূপ সংসারে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিধাতার কি উদ্দেশ্য, তিনিই বলিতে পারেন। কত রত্নই যে অতীতের সাগরগর্ভে

বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, তাহা মনে করিলে জীবন বিড়ম্বনা হইয়া উঠে। আমারও হৃদয়টা যেন ঘটনাচক্রে পড়িয়া কতকাংশে কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। বিয়োগ-বিরহে এখন আর ততটা মুহ্যমান হইয়া পড়ি না। কে জানে, হয় ত ভগবান্ এইরূপ সহ্য করিবার জন্যই আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন। জগতের সম্মুখে বাইবেল-বর্ণিত জোবের ন্যায় একটা সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলেও লাভ আছে।

২রা চৈত্র। "মেঘমালার" উষা নামক গল্পটি শেষ করিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রতিদিন ২০। ২৫ লাইন করিয়া লেখাও হইতেছে। কিন্তু যাহা বাহির হইতেছে, তাহাতে সন্তোষলাভ করিতে পারিতেছি না। মনে হয়, ইহার অপেক্ষা ভাল হওয়া উচিত ছিল। যোগ্যতর কোন কবির হাতে পড়িলে, হয় ত বিষয়টি সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া পাঠকদিগকে বিমুগ্ধ করিতে পারিত। মাঝে মাঝে আমার নিজের ক্ষমতার উপর বড়ই বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়। মনে হয়, বুঝি আমার ভিতর বাস্তবিক কোনও কবিত্ব নাই; কেবল জোর করিয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেছি, কিন্তু না লিখিয়াও ত থাকিতে পারি না।

প্রাণের ভিতর যখন ভাবরাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠে, উহাদিগকে ভাষায় একটা যেমনই হউক গঠন না দিলে, হৃদয় ত শান্তিলাভ করে না। লোকে পড়ুক না পড়ুক, কাহারও উপকার হউক বা না হউক, যখন লেখকের প্রাণে শান্তিপ্রদান করে, তখন কোনও রচনাই নিতান্ত নিষ্ফল নহে। তাহাতে অন্ততঃ একটি মানবাত্মাও ত পরিতৃপ্ত হইল। তবে, কবিতা লিখিয়া পুস্তকাকারে সাধারণের সমক্ষে প্রচার করা এক স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাহাতেও লেখকের উচ্চ আশা কতকটা পরিপূর্ণ হয়। আর সকল মানবাত্মা একই ছাঁচে গঠিত, সুতরাং যাহা এক জনের প্রীতিপ্রদ, তাহা যে কোনও কালে অপর কাহারও সন্তোষের কারণ হইবে না, এ কথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমি না হয় সেই ভবিষ্যৎ কোনও এক ব্যক্তির নিমিত্তই গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম।

৩রা চৈত্র। পঞ্চুরাম কেমন আছে, কয়েক দিবস তাহার কোন সংবাদই পাইলাম না। কাল শনিবার। কলিকাতায় গিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছি। এবারে যাইয়া তাহার সংবাদ পাইবার জন্য একটা নিয়মমত বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে হইবে। এখানে আসিয়া নিতান্ত কষ্টে পড়িয়া থাকি। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কাহারও মুখ দেখিতে পাই না। সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত বড়ই ক্লেশে অতিবাহিত করিতে হয়।

কতদিন এইরূপে কাটিবে, তাহা ভগবানই জানেন। পঞ্চুরামকে এখানে আনিয়া নিজের কাছে রাখিতেও সাহস হয় না। এখানকার জলবায়ু ভাল নহে। কিন্তু তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে না পাইলে যে প্রাণের তৃপ্তি হয় না। কে জানে, হয় ত সেও আমাকে দেখিবার জন্য এইরূপ চাঞ্চল্য অনুভব করে।

৪ঠা চৈত্র। কলিকাতায় আসিয়া চুণীবাবুর মুখে শুনিলাম, বিদ্যানিধি মহাশয় সম্প্রতিপরলোকগত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতার স্থান Keshub Academyতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিদ্যানিধির কথা তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল। আরও দুই এক জন বক্তা কেহ ইংরাজীতে, কেহ বাঙ্গালায় দুই চারিটি কথা বলিলেন। শোক-প্রকাশার্থ সভায় যেরূপ হইয়া থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন স্তুতিবাদ শুনিয়া আসিলাম। কেহ কেহ বা রাজকৃষ্ণবাবুকে এক জন প্রথম শ্রেণীর অতি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বর্ণনা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যেন জগৎ একেবারে প্রকৃত কবিশূন্য হইয়া পড়িল! যাঁহারা হৃদয়ের আত্যন্তিক ভক্তিবশতঃ ভক্তির পাত্রকে শত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াও সন্তুষ্ট হন না, তাঁহাদের উপর কোনও কথা নাই। কিন্তু পরলোক-গত কবি রাজকৃষ্ণ রায় সম্বন্ধে আমাদের একটা পক্ষপাতবিহীন মতামত স্থির করিয়া রাখা আবশ্যক। রাজকৃষ্ণ বাবু উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত না হইলেও এক জন কবি ছিলেন। তাঁহার অনুবাদিত "রামায়ণ" ও "মহাভারত" কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থদ্বয়কে পরাস্ত করিয়া, লোকের হৃদয়ে আধিপত্যলাভ করিবে কি না, নিতান্তই সন্দেহের বিষয়। কিন্তু তাঁহার দু একটি গীতিকবিতা এবং খোসগল্প বোধ হয় তাঁহার নামটা সাহিত্যের ইতিহাসে বজায় করিয়া রাখিতে পারিবে। তাঁহার প্রণীত 'পৌরাণিক কয়েকখানি নাটক আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির হিসাবে ততটা নহে, যতটা ভক্তির স্রোতবশতঃ। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে শান্তিপ্রদান করুন।

৫ই চৈত্র। সমস্ত দিবস সু—র বাটীতে গোলমাল করিয়া, আর তাস খেলিয়া কাটিয়া গেল। বৈকালে সাবিত্রী লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বক্তৃতা শুনিতে যাইবার বাসনা ছিল। কিন্তু বন্ধুগণ জবরদস্তি করিয়া যাইতে দিলেন না। অবকাশের সময়গুলা নিতান্ত বিফলে কাটিয়া যাইতেছে। আমার ইচ্ছা, সময়ের এইরূপ অপব্যয় না করিয়া, দুই চারি জন বন্ধু মিলিয়া, কোনও একটা সদ্বিষয়ের আলোচনা হয়। বড়বাবুর তাসের উপর ঝোঁকটা কিছু বেশী। তাঁহার নিকট কোন গম্ভীর বিষয়ের প্রস্তাব

করা অনেক সময়েই 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' বর্ণনার ন্যায় নিষ্ফল। সুতরাং আমাকে একটু ভিন্ন পথ দেখিতে হইতেছে। দুই এক জনকে দলে টানিয়া লইয়া যদি কতকটা সময়ও সদালাপে যাপন করিতে পারি, তাহাও সুখের কথা। অক্ষয় বাবু কিয়দংশে আমার মতাবলম্বী। তবে সু—বাবু সম্পাদক। তাঁহার সম্মান ও খাতির যে আমা অপেক্ষা বেশী হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। বড়বাবুর উপর আমার ভালবাসা কাহারও অপেক্ষা কম বলিয়া মনে করি না। কিন্তু সম্পাদক বড়বাবুর উপর আমার ততটা আস্থা নাই। আর, তাঁহার সামাজিক সকল ব্যবহারও আমি অনুমোদন করি না। ইহাতে বাবুজী যদি রুষ্ট হন, আমি নাচার। তাঁহাকে যেমনটি চাই, তেমনটি পাইলে কত আনন্দ হয়।

৬ই চৈত্র। স্বর্গগত কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধ সাহিত্যব্যবসায়ী বাঙ্গালা-দেশে বড়ই বিরল। অনেক সময়ে দারিদ্র্যের কঠোর দুঃখ ভোগ করিয়াও তিনি যে এক প্রকার সম্মানের সহিত জীবনযাপন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে বাঙ্গলা সাহিত্য-সেবীদিগের অনেকটা আশার অবসর আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যকে জীবিকার একটা উপায়স্বরূপ করিতে আমি বড়ই নারাজ। যথার্থ নিষ্কাম-ভাবে লোকহিতসাধন করাই লেখকদের ব্রত হওয়া উচিত। যাঁহাদের গৃহে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় সঞ্চিত নাই, তাঁহারা অপর কোন প্রকারে তাহার চেষ্টা দেখুন। তবুও সাহিত্যকে যেন অর্থোপার্জ্জনের একটা যন্ত্রস্বরূপ করিয়া না তুলেন। লেখক তাঁহার কর্ত্তব্য পরিপালন করুন। কিন্তু লোকেরাও যেন তাহাদের কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ না হয়। সাহিত্যসেবিগণ যাহাতে তাহাদের পরিশ্রমের উপযোগী পুরস্কার লাভ করেন, সে বিষয়ে লোকের লক্ষ্য রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে প্রবীণ লেখক * * * বাবু বর্ত্তমান সংখ্যার "সাহিত্যে" সহযোগী সাহিত্য প্রবন্ধে বেশ কয়েকটি কথা বলিয়াছেন! সাহিত্যসেবায় যদি পয়সা উপার্জ্জন হয়, সে ত সুখের বিষয়। কিন্তু লেখক যেন উহার উপর একান্ত নির্ভর না করেন। তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চা সৌন্দর্য্যের উপাসনা না হইয়া কেবল টাকা আনা পয়সার ব্যাপার হইয়া উঠিবে।

৭ই চৈত্র। দোলযাত্রা এবং গুড্‌ফ্রাইডে উপলক্ষে স্কুল বুধবার হইতে রবিবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। ২—৩০ মিনিটের গাড়ীতে (কিন্তু আজ

গাড়ীখানা কোন্নগরে পঁহুছিতে প্রায় তিনটা হইয়াছিল) কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পঞ্চুরামকে দেখিলাম। পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাকে ভাল বোধ হইল।

Bengal Academy of Literature এই মাসে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে ইংরাজী নামের উপর "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" এই বাঙ্গালা নাম ধারণ করিয়া বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার সাজে বাহির হইয়াছেন। অঙ্গ-সৌষ্ঠবের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের বৈচিত্র্য বাড়িতেছে বটে; কিন্তু গুণগৌরবের কোনও উন্নতি দেখিতে পাইলাম না। সমালোচনার ব্যাপারটা কিছু বেশী রকম দেখিলাম। কেহ ইংরাজীতে, কেহ বা বাঙ্গালা দেশের এই দরিদ্র ভাষাতেই আপনার অপূর্ব্ব সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সমালোচক মহাশয়গণ যেন হাতে মাথা কাটিয়াছেন। কাহাকেও আকাশে তুলিতেছেন, আর কাহাকেও বা একেবারে সহস্র হস্ত গভীরে ফেলিয়া দিতেছেন। সংক্ষিপ্ত উক্তির ভিতরেও যুক্তির সহিত যে কোনও রচনার দোষ গুণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এ ক্ষমতা বর্ত্তমান সমালোচক মহাশয়ের মূলেই নাই। P. S. চন্দ্রগ্রহণ প্রায় ১—৩০ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

৮ই চৈত্র। আজ সমস্ত দিবস বাদুড়বাগানের গৃহে বসিয়া রহিয়াছি। দোলযাত্রার ভয়ে ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই। মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঢোল পিটিয়া লোকগুলাকে জরিমানার কথা জানাইয়া দিয়াছেন বটে; কিন্তু অত্যাচারের অভাব ত দেখিতে পাইতেছি না। খানিকটা সময় নিদ্রায় কাটাইলাম; খানিকটা Shelleyর Revolt of Islamএর কিয়দংশ পাঠে অতিবাহিত হইল। শেলীর এই কাব্যের উপহারটি বেশ সুন্দর। তিনি যে অতি মহদ্ভাবে অনুপ্রাণিত কবি-হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই উপহারে স্পষ্ট প্রতীয়মান। চারি দিকে অত্যাচার ও স্বার্থপরতার প্রভুত্ব দেখিয়া তিনি তাঁহার কবি-জীবনের প্রারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

"—I will be wise,
And just and free, and mild, if in me lies such power."

আর তাঁহার সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ও অতি উচ্চ-অঙ্গের। তিনি বলিতেছেন,—

"Thou and I,
Sweet friend, can look from our tranquility

Like Lamps in to the world's tempestuous night,—
Two tranquil stars, while clouds are passing by
Which wrap them from foundering season's night.

৯ই চৈত্র। আহারের পর নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে কিয়ৎকাল গল্প করিয়া, তাঁহারই সহিত সাহিত্যের সভায় উপস্থিত হইলাম। সম্পাদক বাবুজী নিদ্রিত। তাঁহার সম্পাদকীয় ঘুমের ব্যাঘাত না করিয়া, আমরা একটু পড়া-শুনায় মন দিলাম। তার পর তাস চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সু—র সহিত ভ্রমণে বাহির হইলাম। নিমতলা ষ্ট্রীট হইতে মণিবাবুকে সঙ্গে লইয়া ট্রামে উঠিলাম। উদ্দেশ্য, India Club পর্য্যন্ত গতি। কিন্তু সু—বাবু মহাশয়ের চিত্ত এত চঞ্চল, যাওয়া আর হইল না। একটি বাবু একটা শিশি ভরিয়া লাল রঙ্গ লইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে একপ্রকার কাড়িয়া লইয়া তিনি সেই জলীয় পদার্থটা বাসী-দোলের প্রবাহস্বরূপ পরস্পরের গায়ে মাখামাখি করিলেন। এ বেশে আর ত India Clubএ যাওয়া যায় না। সুতরাং সকলেই নামিয়া পড়িলাম। বাবুজী Conductorকে একটা টাকা টিকিটের জন্য দিয়াছিলেন। বাকী পয়সা আর লওয়া হইল না। তাঁহার আমোদের মূল্যস্বরূপ Conductor সাহেব টাকাটি লইয়া চলিয়া গেলেন। আমরা পিছু পিছু ছুটিলাম বটে, কিন্তু ধরিতে পারিলাম না।—তবু বাবুজীর বড়াই দেখে কে ?

ক্রমশঃ।

৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

সমুদ্র-দর্শনে

আজি সুবিমল পুণ্য প্রভাতে
হেরিনু তোমারে দিগন্তসীমাতে
রাঙ্গা-রবি টিপ পরিয়া ভালেতে
গোলাপী বসনে সাজি' !
কণ্ঠে দল-মল শুভ্র মালিকা,
আবদ্ধ কুন্তলে তরঙ্গ-জালিকা,
নৃত্য-চপলা মুখরা বালিকা
চলিয়াছ গৃহ ত্যজি' ;
চঞ্চলা কিশোরী আজি।

মধ্যাহ্নে হেরিনু যুবতী সুন্দরী,
পরিধান ঘোর স্নিগ্ধ নীলাম্বরী,
ছড়ায়ে দিগন্তে সুনীল মাধুরী,
নীরদ-কুন্তল মাজি' ;
স্ফীত-হৃদয়া, পুলকবিবশা,
গুরু-গম্ভীর-নিনাদ-সরসা,
সিক্ত-সৈকত-লিপ্ত-রভসা
উদ্বেল তরঙ্গরাজি ;
প্রমত্তা তরুণী আজি।

সুখ-চঞ্চল উর্ম্মি অধীরে
স্ফীত অঞ্চল লুণ্ঠিত তীরে,
কনক-মুকুট শোভিতেছে শিরে,
চলিয়াছ ডাকি' ডাকি',
ফিরি ফিরি থাকি' থাকি'।

হেরিনু নিশীথে মোহিনী অমরী,
তারকা-কুসুমে খচিত কবরী,

মিলিত চন্দ্রমা পূর্ণিমা শর্ব্বরী,
নেহারি হরষে ঢুলি',
কনকাম্বর ঝলমল অঙ্গে,
কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী সঙ্গে,
ভূষিত সু-অঙ্গ হীরকতরঙ্গে
চলেছ গরবে ফুলি'
বাসর জাগিতে সাজি';
প্রৌঢ়া গৃহিণী আজি।

দেখিনু বালিকা, দেখিনু তরুণী,
দেখিলাম তোমা প্রৌঢ়া গৃহিণী,
চির-চঞ্চলতা মুহূর্ত্ত ছাড়নি—
গ্রথিত সে যেন অঙ্গে,
অব্যক্ত ভাষায় ব্যক্ত কোন বাণী
চাহিছ করিতে অয়ি সুভাষিণি!
কি বলিছ নরে হে নীল-অঙ্গিনি!
ডাকিয়া তরঙ্গভঙ্গে,
নিনাদি' শত মৃদঙ্গে।

এমনি চঞ্চল জীবন-বারিধি,
নাহিক এমনি আশার অবধি
হেন ভীম স্রোত বহে নিরবধি
সতত দুরাশা-কূলে,
এমনি সফেন, এমনি তরল,
এমনি উদ্দাম, এমনি প্রবল,
এমনি ছুটিয়া করি' কল-কল,
লুটিয়া বেলার কোলে,
ঘুমায়ে পড়িবে ঢলে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সহযোগী সাহিত্য।

লাসার নব রহস্য।

"নিষিদ্ধ নগরী" আর অজ্ঞাত নগরী নহে। প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীবীর বাবু শরৎচন্দ্র দাস একপক্ষকাল লাসায় বাস করিয়াছিলেন। গতবৎসর তাহার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। গত অগষ্ট মাসের সেঞ্চুরী ম্যাগাজিনে উষে নার্জুনফ্ (Ushe Narzunofs) নামীয় এক জন কালমুক মোঙ্গোলীয়ানের তিব্বতভ্রমণ প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে ফটোগ্রাফ ও লিপির সাহায্যে লাসার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে দালাই লামার পারিষদ এক জন লামার বিবরণী দ্বারা গল্প বর্ণিত হইয়াছে। এই লামা এক জন বরিয়াট্ মোঙ্গোলীয়ান। তাঁহার বাসস্থান ট্রান্সবাই—কালিয়া, কিন্তু তিনি লাসাতে প্রায় ত্রিশ বৎসর বাস করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইনি তিনবার ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন, এবং পারিস রোম লণ্ডন প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন।

এই লামার পরামর্শে উৎসাহিত হইয়াই উষে নার্জনফ ১৮৯৮ সালে প্রথমে লাসাতীর্থে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে ককেসসের উত্তরে ষ্টাভ্রপুল প্রদেশে উষে নার্জনফ বাস করিতেন। তিনি মেষপালন করিতেন, এবং তাহার আয় হইতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রুষীয়স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিলেও তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। একদিন আগাজ্ঞ জরজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিয়া উষে নার্জনফ বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি সন্দর্শন করিয়া এবং বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপুত্র অবলোকিতেশ্বরের জীবন্ত অবতার দালাই লামার স্বর্গীয়জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন।

স্বদেশ ছাড়িয়া তিনি সাইবীরিয়ার পথে উত্তর মোঙ্গোলিয়ার উর্গা সহরে পঁহুছিলেন। ঐ স্থানে তিনি নয়টি উষ্ট্র লইয়া যাত্রিদল গঠন করিলেন, এবং গোবি মরুভূমি অতিক্রমার্থ যাত্রা করিলেন। ৩৮ দিবস অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া তিনি চীন নগরী আনসীতে পঁহুছিলেন। ঐ স্থানে তিনি কোনলুক বেইসার রাজার প্রজা মোঙ্গলদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের যাত্রিদলে প্রবেশলাভ করিলেন। এই মোঙ্গোলেরা তাঁহাকে তিব্বত অধিত্যকার মূলদেশস্থিত সেইদাম প্রদেশের রাজার শিবিরে লইয়া যাইতে সম্মত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত পথপ্রদর্শক দেখিতে পাইল যে, তিনি অনেক বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়া লইতেছেন, এবং অক্ষরগুলি চীন বা মোঙ্গোলীয়ন অক্ষর হইতে বিভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে নার্জনফ রুষীয় অক্ষরে লিখিতেছিলেন। তাহারা সন্দিহান হইয়া পড়িল; কারণ নার্জনফ আপনাকে চীনের প্রজা ও মোঙ্গোলীয়ান-জাতীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। যখন তাহারা দেখিতে পাইল, নার্জনফের চীন পরিচ্ছদের নিম্নে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিনিহিত রহিয়াছে, তখন তাহাদের সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল।

তাহারা অতঃপর নার্জনফকে লইয়া অগ্রসর হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। এমন কি, তাহাদের রাজার নিকট তাহাকে ধরাইয়া দিবার ভয়প্রদর্শন করিল। দশটি ল্যান্সের

(সাত ডলার) কি মোহিনী শক্তি! উক্ত ভয়ঙ্কর পথপ্রদর্শকগণ একেবারে শান্ত হইয়া গেল! ইহা ব্যতীত নার্জনফ সকল সন্দেহের মূল তাঁহার ইউরোপীয় কোটটি সর্ব্বসমক্ষে পুড়াইয়া ফেলিলেন, এবং অতঃপর কালমুক অক্ষরে (ইহা মোঙ্গোলীয় অক্ষরের ন্যায় দেখিতে) বিবরণী লিখিতে লাগিলেন।

তৈজী নরের শিবির হইতে তিনি অশ্বারোহণে তিব্বত অধিত্যকা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নর্জনফ কোলাম পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে প্রথমে লাসার স্বর্ণমণ্ডিতচূড় মন্দির দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি স্বচক্ষে বৌদ্ধদিগের "পবিত্র নগরীর" শোভা দেখিতে পাইলেন!

লাসা ও নিউ অর্লিয়ঁা সমনিরক্ষবৃত্ত, উচ্চতানিবন্ধন লাসার হাওয়া অধিকতর শীতল। তিব্বতীয়দিগের আবাসভবনগুলি ক্ষুদ্র এবং প্রস্তর বা ইষ্টকে নির্ম্মিত। তাহারা চুল্লী ব্যবহার করে না। লাসার প্রথম রজনীতে নার্জনফের অতিশয় শীত বোধ হইয়াছিল। ক্রমশঃ শীত ও ঘরগুলির অন্ধকার তাঁহার সহিয়া গেল। কেবল প্রধান পুরোহিতগণের বাটীর সার্সিতে কাচ দেওয়া ছিল। সাধারণতঃ লোকের বাটীর সার্সিগুলিতে তৈলাক্ত বা শুষ্ক কাগজ লাগান ছিল। রাত্রে বাটীগুলি মশালের আলোকে বা পুরাতন কালের প্রদীপের শিখায় আলোকিত হইত।

নগরী অনেকটা পরিচ্ছন্ন। কেবল যে পল্লীতে বৃষ বা ছাগলের শৃঙ্গে নির্ম্মিত কুটীরে ভিক্ষুকগণ বাস করিত, সেই পল্লীগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। বৌদ্ধপ্রথামতে মৃতের গোর দেওয়া হয় না। ভিক্ষুকগণ শবদেহ সহরের বাহিরে বহিয়া লইয়া যায়। কেবল প্রধান পুরোহিতগণের মৃত্যুর পর তাহাদের শবদেহ অগ্নি দ্বারা সৎকৃত করা হয়, কিংবা সমাহিত করা হয়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর পুরোহিতগণের এবং সাধারণ লোকের মৃতদেহ মৃত্যুর পর পশু পক্ষীর আহারের নিমিত্ত একখানি প্রস্তরের উপর খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রস্তরখানি লাসা এবং সেরার মঠের মধ্যপথে পাবান্‌কা মন্দিরের নিকট আছে।

লাসা নগরীর সংলগ্ন উদ্যানবেষ্টিত কতকগুলি মন্দির ও মঠ আছে। পথিপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণী ও সাধারণ লোকের বাটী। নগর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুই মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে ১ মাইল বিস্তৃত। আগাক্ষ দরজের মতানুসারে লাসার জনসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫০।৬০ সহস্র। উহার মধ্যে তিন সহস্র সন্ন্যাসী।

সহরের মধ্যস্থলে প্রধান মন্দির অবস্থিত। মন্দির উচ্চে তিন তালা, এবং ইহাতে স্বর্ণমণ্ডিত চারিটি ছাদ আছে। বৌদ্ধ দেবতাদিগের অনেক প্রতিমূর্ত্তি তথায় রক্ষিত আছে। এবং উক্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিতা বা সংস্থাপক বুদ্ধদেবের একটি মূর্ত্তি আছে। ঈরন পর্ব্বত বা চাগ্‌পোরি পাহাড়ের ঈষৎ বাম দিকে মন্দিরের সুবর্ণমণ্ডিত ছাদগুলি অবস্থিত। উক্ত পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে লাসার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মঠের বাটীগুলি অবস্থিত। এই মঠের নাম মানবোদাৎসাং। সন্ন্যাসিগণ ঐ স্থানে চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকে। ইহার দক্ষিণ

দিকে তিন শত ফিট উচ্চ একটি পর্ব্বতের উপর আর কতকগুলি বাটী আছে। ইহাই দালাই লামার আবাসস্থান। ইহা প্রাচীরবেষ্টিত, এবং মঠ, রাজবাটী ও সেনানিবাসের সমষ্টিমাত্র। বিভিন্ন বাটীগুলির গমনাগমনের পথগুলি বক্র, এবং প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত।

এই মঠ-দুর্গের মধ্যস্থলে পোত্রাংমার্পো নামে একটি মন্দির আছে। ইহার রক্তবর্ণ প্রাচীরগুলি ধবলকান্তি অন্যান্য সৌধগুলির সহিত পার্থক্য সাধন করিতেছে। দক্ষিণ দিকে ইহা নয় তালা, অপর দিকে ছয় বা সাত তালা। এই স্থানে চীন রীতি অনুসারে নির্ম্মিত সুবর্ণমণ্ডিত চারিটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। পোত্রাংমার্পোর দক্ষিণে দালাই লামার আবাসভবন অবস্থিত। বাম দিকে প্রধান লামাগণের বাসস্থান অবস্থিত। আরও বাম দিকে কর্ম্মচারী ও সভাসদগণের বাসস্থানগুলি অবস্থিত। কিছু নিম্নে একটি প্রকাণ্ড বাটী আছে। সেখানে বহু শত সন্ন্যাসীর বাসপ্রকোষ্ঠ আছে। পোত্রাংমারপোর নিম্নে অবস্থিত আর একটি মঠ আছে; সেখানে ছয় তালা একটি মন্দির আছে। ঐ স্থানে প্রত্যহ ধর্ম্মক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের পাদদেশে অন্যান্য কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণের আবাসবাটী আছে।

সমস্ত বাটীগুলিতে তিন সহস্রের অপেক্ষা অধিক প্রকোষ্ঠ আছে। আগান্ দরজে গতবারে ভ্যাটীকান দেখিবার পর বলিয়াছেন যে, উক্ত বাটীগুলি একত্র ভ্যাটীকান অপেক্ষাও বৃহত্তর।

লামার সহিত সাক্ষাৎ।

নর্জ্জনফ দালাইলামার দর্শনলাভ করেন। আগান্ দরজের নিকট হইতে পত্র ও উপঢৌকন লইয়া দালাইলামার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি লামার আশীর্ব্বাদ ও প্রায় ২০০ লান (১৬০ ডলার) প্রাপ্ত হয়েন।

দালাইলামার বয়স উনত্রিশের অধিক হইবে না। তাঁহার নাম তুবদান-গ্যামসো। দেখিতে অনেকটা ইউরোপীয় ধরণের। তাঁহার পরিহিত পরিচ্ছদ বৌদ্ধদের ন্যায় কেবল তাহা হরিদ্রাবর্ণের।

নর্জ্জনফ দেড় মাস লাসায় বাস করেন। তৎপরে তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সিকিম দেশ হইয়া দারজিলিঙ্গে পঁহুছেন। সঙ্গে এক জন মঙ্গোলীয় ভৃত্য ছিল। সে দোভাষীর কার্য্য করিত, এবং চীন ও হিন্দীভাষায় কথা কহিতে পারিত। ভৃত্যটি নর্জ্জনফের সঙ্গে অনেক অর্থ দেখিয়া তাঁহাকে একদিন বলিল,

"ভাগ্যক্রমে আপনি আমার ন্যায় বিশ্বাসী ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন; অপর কেহ হইলে আপনার অর্থ অপহরণ করিত।"

নর্জ্জনফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে?"

ভৃত্য বলিল, "বা ইহা ত খুব সহজ। কেবল আপনার খাদ্যে সামান্য বিষ মিশ্রিত করিয়া অর্থ লইয়া পলায়ন করিলেই হইত।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর হইতে নর্জ্জনফ সাবধান হইলেন। তিনি ভোজন ও চা-পানকালে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতে চা প্রস্তুত হইলে তিনি তাহা ভদ্রতাসহকারে তাঁহার ভৃত্যকে প্রদান করিয়া নিজে আর এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইতেন। নর্জ্জনফ চীনভাষা জানিতেন না। হংকংয়ে পঁহুছিলে ভৃত্যটি সুবিধা পাইয়া নানা ব্যপদেশে অনেক অর্থ

হস্তগত করিল। টিনসীনে নর্জনফ ভৃত্যটিকে বিদায় দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। তিনি রুষীয় ও মোঙ্গলীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। পিকিনে কিছুদিন থাকিয়া তিনি কালর্কা ও উর্গার মধ্য দিয়া ইরকাটস্ক পঁহুছিলেন। তথা হইতে সাইবীরীয়ার রেলপথে তিনি ১৮৯৯ খৃঃ অঃ অগষ্ট মাসে স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন।

স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিশ্রামলাভ না করিয়াই তিনি পুনরায় লাসা যাইবার সংকল্প করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ দিয়া তিনি তিব্বতে যাইবার অভিলাষ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সফলকাম হইতে পারেন নাই।

নর্জনফের সঙ্গে ফটোগ্রাফের যন্ত্র, বন্দুক ও টোটা প্রভৃতি থাকায়, এবং তাঁহার রুষীয় ছাড়-পত্র ও ফরাসী ভাষায় পরিচয়পত্র থাকায়, এবং চীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মোঙ্গোলীয় ভাষায় কথা কহিতেন বলিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের তাঁহার উপর সন্দেহ জন্মে। তিনি দারজিলিংয়ে সাড়ে পাঁচ মাস আবদ্ধ থাকেন, পরে কলিকাতার কয়েক দিবসের জন্য জেলে আবদ্ধ থাকেন। পরে ভারতগভর্মেণ্টের খরচে ও তত্ত্বাবধানে ১৯০০ ৩রা অক্টোবর তাঁহাকে ওডেসা বন্দরে নামাইয়া দেওয়া হয়।

তৃতীয় অভিযান।

বিফলমনোরথ হইয়া ভগ্নোদ্যম হওয়া দূরে থাকুক, নর্জনফ পুনরায় লাসায় যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাগ্যক্রমে আলঙ্গ দরজে ঐ সময়ে রুষীয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি রুষীয় জারের সাক্ষাৎলাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অনেক চেষ্টার পর ১লা ডিসেম্বর (১৯০০ খৃষ্টাব্দে) উর্গা সহরে গুরুশিষ্যে মিলন হইল। ঐখান হইতে ছয়টি উষ্ট্র লইয়া মোঙ্গোলিয়া ও তিব্বতের ভিতর দিয়া তাঁহারা লাসায় পঁহুছিলেন। এই অভিযান অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। যাত্রিদ্বয় ৮৪ দিনে ২৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করেন। সাধারণতঃ ৫।৬ মাস লাগে। ১৯০০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তাঁহারা উর্গা হইতে বহির্গত হয়েন, এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তাঁহারা লাসায় পঁহুছেন। এইবারে নর্জনফ লাসায় এক মাস বাস করেন। উক্ত অবস্থানকালে তিনি তিনবার দালাই লামার দর্শনলাভ করেন। এবং আশীর্ব্বাদ ও অতি উচ্চ-সম্মান লাভ করেন। একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন প্রাপ্ত হন; দালাই লামার সম্মুখে উহাতে উপবেশন করিতে পাইয়াছিলেন।

তিনি এবার যন্ত্রসাহায্যে নগরীর ফটো সংগ্রহে যত্নবান হইলেন। কিন্তু চিত্রগ্রহণ অতি গোপনে করিতে হইত। কারণ, বৌদ্ধমতে "ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের বাক্সে" মানব ও বস্তু সকলের ছবি প্রতীচ্য প্রদেশে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ। পূর্ব্ববৎসর আগাঙ্গ দরজেকে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা সত্ত্বেও দালাই লামার মন্ত্রীদের আদেশে তাঁহার পারিস হইতে আনীত ফটো উঠাইবার যন্ত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছিল।

নর্জনফ তিব্বতের অপরাপর বাটীগুলির ও তিব্বতের পূর্ব্বতন রাজাদের পুরাতন প্রাসাদটির ফটো আনিয়াছিলেন। ক্রমশঃ ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে এখনও লোকে বাস করিতেছে। তিব্বতের অতীত স্থাপত্য শিল্পের ইহা অতি সুন্দর নিদর্শন।

লাসার মধ্যে কেবল এই প্রাসাদটি চুণকাম করা নহে। তিব্বতের ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান ঘটনার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রাসাদই তিব্বতের শেষ রাজার বাসভবন ছিল। তিনি দালাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। দালাইলামা ঐ সময়ে কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে প্রধান ছিলেন, কিন্তু রাজ্য সম্বন্ধে ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য তিনি ঐ সময়ে বিশেষ প্রয়াসী হইয়া পড়েন। চীনরাজ উক্ত বিপ্লবে মধ্যস্থ হয়েন, এবং তিব্বতরাজ ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। তাহার পর চীন সম্রাট সপ্তম দালাই লামাকে (১৭০৮—৫৮) বৌদ্ধধর্ম্মের নেতা ও তিব্বতের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই ঘটনার স্মারক চিহ্নস্বরূপ চীনসম্রাট কাংসী প্রজাগণকে আদেশ করেন যে, কেবল তিব্বতের রাজার প্রাসাদ ব্যতীত অন্যান্য বাটীগুলি চুণকাম করা হয়। নগরপ্রান্তস্থিত অনেক স্থানের চিত্রও নর্জনফ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চীন কর্ম্মচারী আম্‌বানের আবাসভবনই উল্লেখযোগ্য। ইনি দালাই লামার কার্য্য ও গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য নিযুক্ত। এই প্রাসাদটি প্রাচীরবেষ্টিত সাধারণ বাটী। ইহার দ্বারটি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবেশ-দ্বারে চীন কর্ম্মচারীর আবাসস্থানের চিহ্নস্বরূপ পতাকাসংশোভিত দুইটি দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

নর্জনফ লাসায় অবস্থানকালে লাসার নিকটস্থিত মঠগুলি দেখিতে গিয়াছিলেন। লাসা হইতে উত্তর-পশ্চিমে চারি মাইল দূরে অবস্থিত দেপঙ্গ নামীয় মঠ তিব্বতের মঠগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রায় দশ সহস্র সন্ন্যাসী বাস করেন।

দ্যাৎসাঙ্গ নামক সুবর্ণমণ্ডিত মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে চারিটি চকমিলান মঠ আছে। ঐ মন্দিরটি এত বৃহৎ যে, দশ সহস্র লোকের উহার মধ্যে সংকুলান হয়। তিনটিতে মন্দির আছে। চতুর্থ মঠের মন্দিরটিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মঠের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রাযন্ত্র আছে।

লাসা ত্যাগ করিয়া নর্জনফ তাচি-লম্পো দর্শন করিতে গমন করেন। ঐ স্থানে প্রায় দালাই লামার ন্যায় ক্ষমতাশালী পাঞ্চেন সেম্বেন নামে এক জন বুদ্ধের অবতার বাস করেন। তাঁহার ফটো যন্ত্র গোপনে লইয়া নর্জনফ তৎপরে নেপালে গমন করেন। তথা হইতে ভারত-বর্ষে আগমন করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী তিনি দালাই লামার নিকট হইতে রুষজারের নিকট প্রেরিত দূত রূপে) ভারতবর্ষ হইতে ওডেসা পঁহুছেন। এই দূতাভি-যানের নেতা পূর্ব্বোক্ত আজাঙ্গ দরজে। ইউরোপীয় রাজার সহিত দালাই লামার ইহাই প্রথম রাজনৈতিক সম্বন্ধ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। শ্রাবণ। "সরমের কথা" একটি সুবিস্তৃত গল্প। ঘটে ও পটে মহামায়ার পূজা হয়, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। দেখিতেছি, গত শ্রাবণমাসে পবিত্র প্রয়াগতীর্থে 'প্রবাসী' চাটুর্য্যে মহাশয়ের 'চণ্ডীমণ্ডপে' পুরোহিত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'গল্পে'ই দুর্গোৎসব সারিয়া রাখিয়াছেন! গল্পটীতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, বিসর্জ্জন,—সব আছে। 'বোধনে'র বদলেই বোধ করি পুরুতঠাকুর 'আবাহন' করিয়াছেন। প্রতিমা নাই, কিন্তু গল্পের চারি দিকে চটকদার 'চালচিত্তির' আছে। নায়ক গ্রিয়ারসন 'চোরা' হইতে পারেন, কিন্তু ভগবতী কে, ঠিক করিতে পারিলাম না। গ্রিয়ারসন ইংরেজ সেনানী। সীমান্তপ্রদেশে চাকরী করেন। কর্ম্মস্থলের আশে পাশে ওয়াজিরি ও আফরিদীদের বাস। এক দল ওয়াজিরী নূতন বাসস্থানের সন্ধানে যাইতেছিল। চারুবাবুর 'চোরা' তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফিরিবার সময় দেখিতে পাইল, একটি "যুবতী উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।" গ্রিয়ারসন যুবতীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া "দেখিল, যুবতী সুন্দরী।" সুতরাং যুবতীহরণ। তাহার পর উভয়ের প্রেমসঞ্চার। এক মাস প্রেমিক প্রেমিকার একাদশীব্রতের পর মোল্লারূপী সহিসের সাহায্যে উভয়ের পরিণয়। দুই বৎসর পরে সস্ত্রীক সেনানীর পঞ্জাবে পদার্পণ। সেখানে স্বজাতি ও সমাজ কর্ত্তৃক তাঁহার নির্য্যাতন। ক্রমে পাদরীকন্যা মিলির সহিত গ্রিয়ারসনের সাক্ষাৎ;—ফলে ওয়াজিরী-কন্যা করিমার উপর অরুচি। তাহার পর মিলির মিলনাশায় গ্রিয়ারসনের ছলনা। করিমা সহ গ্রিয়ারসনের আবার সীমান্তপ্রদেশে যাত্রা। তথায় পূর্ব্ব মিলনতীর্থে করিমার বিসর্জ্জন। ওয়াজিরী সর্দ্দারের সহিত করিমার স্বদেশযাত্রা। তথায় তাহার বহুবিধ লাঞ্ছনা। অবশেষে ইংরেজের গোয়েন্দা-সন্দেহে স্বজাতি কর্ত্তৃক করিমার হত্যা। শেষ চিত্রে প্রতিহিংসাপরায়ণ ওয়াজিরী-দ্বয়ের গুপ্ত ছুরিকায় করিমার মৃত্যু ও সতীত্বহানির প্রতিফলস্বরূপ গ্রিয়ারসনের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি। গ্রিয়ারসনের রক্তপানের পর ওয়াজিরী জাতি করিমা-হরণ-রূপ "সরমের কথা" ভুলিতে পারিল। বর্ণনায় ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু লেখক সর্ব্বত্র তাহার যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। ভাষাও সকল স্থলে গল্পের উপযোগিনী নহে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক, গল্পটি প্রীতিপ্রদ। চর্চ্চা করিলে লেখক ভবিষ্যতে গল্প-রচনায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন, আলোচ্য গল্পে তাহার আভাস পাওয়া যায়। 'একঘেয়ে' গল্পের লীলাভূমি বাঙ্গলা মাসিকে আজ কাল যেরূপ গল্পের গড্ডলিকাপ্রবাহ সচরাচর দেখা যায়, "সরমের কথা" সে দলের নহে। প্রতিষ্ঠাপন্ন সুলেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় "হামিদা"র কল্পনায় যে পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, চারুবাবুও সেই পথের পথিক। আমরা গল্পে এইরূপ বৈচিত্র্যবিধানচেষ্টার পক্ষপাতী। "সরমের কথা"য় কাঁচা হাতের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান। সংশোধনে গল্পটি উন্নতিলাভ করিত। হীরাকেও কাটিয়া ঘষিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল সুন্দর করিতে হয়। রচনাও ঘষিলে মাজিলে

লাবণ্যলাভ করে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু "মনোমোহন ঘোষ" প্রবন্ধে স্বনামধন্য মনোমোহনের রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর "অশ্বা" নামক কবিতাটি সুপাঠ্য। কবি প্রতিধ্বনির মোহ অতিক্রম করিয়া নিজের পথ বাছিয়া লইয়াছেন, এবং নূতন পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। "অশ্বা" তাহার প্রমাণ। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যালের "মালাবারের চেরুমা" মন্দ নহে।

বঙ্গদর্শন। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "সীতা" প্রবন্ধটি মন্দ নহে, কিন্তু আশানুরূপ হয় নাই। সীতা রামায়ণ-নন্দনের পারিজাত। দীনেশ বাবু স্বর্গের ফুলটি ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই। তাড়াতাড়ি যে সব তালি দিয়াছেন, তাহা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই ধরা পড়ে। সীতা করুণরসের প্রতিমা,—অশ্রুর নির্ঝরিণী। বাল্মীকির অপূর্ব্ব বর্ণনার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া দীনেশ বাবু নিজের প্রবন্ধে কেবল তাহাই স্তূপীকৃত করিয়াছেন; সেই পৃথিবীপ্রথিত পুণ্যময় অশ্রুতীর্থের সন্নিহিত হইবারও অবকাশ পান নাই। সুতরাং প্রবন্ধটি বাক্যচিত্রে যতই সমৃদ্ধ হউক, অনুষ্টুপ-কণ্টকখচিত শুষ্ক মরুতে পরিণত হইয়াছে। "সাগর-মন্থন" কবিতাটি কষ্টকল্পিত, ভাব কৃত্রিমতাদুষ্ট। মন্থনের ফলে জনসমুদ্রের

> "অন্তরলক্ষ্মী যে শুভ প্রভাতে
> উঠিবেন অমৃতের পাত্র বহি' হাতে
> বিস্মিত ভুবন মাঝে,"

সে শুভ প্রভাত বহুদূরবর্ত্তী, সুতরাং এখন সে জন্য বিস্মিত না হইলেও চলে। কিন্তু এই অদ্ভুত শব্দসমুদ্রমন্থন দেখিয়া যে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "শ্মশানতলা" একটি নক্সা। রসহীন রচনাটি সম্পূর্ণ নিষ্ফল। সম্প্রতি ফরাসী অধ্যাপক অ্যাল্‌বের মের্তোঁ ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষীয় সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে "আজিকার ভারতবর্ষ" নামে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "বঙ্গদর্শনে" তাহার সারসঙ্কলন করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। অধ্যাপক মের্তোঁর পর্য্যবেক্ষণের ফল অনুশীলনের যোগ্য। "হিমালয়" হইতে "সঞ্চিত বাণী" পর্য্যন্ত ছয়টি কবিতা মহাদেবের জটার মত জটিল। কবিতার কি প্রসাদগুণ অনাবশ্যক? শব্দসম্ভার কাদম্বরীর ন্যায়, তাহা অস্বীকার করিব না। গভীর গম্ভীর শব্দারণ্যে বিবিধ ভাবের কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হয়, অথচ একটা ভাবকেও সহজে আয়ত্ত করা যায় না। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু অতি সংক্ষেপে "প্রাচীন আর্ম্মেনীয়ায় হিন্দু উপনিবেশে"র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সংক্ষেপে "হেমচন্দ্র" প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের সারভাগ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

"হেমবাবু যে বঙ্গভাষাকে অমূল্য সম্পদ্ দান করিয়াছেন, ইহা বুদ্ধিমান মাত্রেই স্বীকার করেন। তাঁহার 'বৃত্রসংহার' ও 'দশমহাবিদ্যা'র ন্যায় কাব্য বঙ্গভাষায় পূর্ব্বে আর লিখিত হয় নাই। * * *

"হেমবাবুর কবিতায় আমরা তাঁহার মানসিক বিকাশের যে একটি পদ্ধতি দেখিতে পাই, আজ শুধু আমরা তাহারই আলোচনা করিব। প্রথমেই ধর, তাঁহার 'কবিতাবলী'।

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার দৃষ্টি নিজের ভিতরেই নিবদ্ধ—কোথায় প্রতিভার পরিচয়, কোথাও বিদ্যার পরিচয়। তাঁহার 'মদনপারিজাত' য়্যালেক্জাণ্ডার পোপের Eloisa to Abelardএর নকল; তাঁহার 'কমলবিলাসী' টেনিসনের Lotos-Eatersএর নকল; তাঁহার 'ইন্দ্রের সুধাপান' ড্রাইডেনের Alexander's Feastএর অনুকরণ; তাঁহার 'হতাশের আক্ষেপ' এবং 'কোন একটি পাখীর প্রতি' কেবল ব্যক্তিবিশেষের অন্তরের হাহাকার। ইহাতে এই বুঝিলাম যে, যে সময়ে তিনি 'কবিতাবলী' প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার প্রতিভা আপনাতেই সবদ্ধ।

"তাহার পর দেখিতে পাইবে, তাঁহার প্রতিভা ইহসংসারের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত। জগতে যে, শক্তিরই জয়, তাহা ত আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। 'বৃত্রসংহারে' সেই চিত্রই চিত্রিত হইয়াছে।

'শক্তির জয়ের, ঐতিহাসিক কালেও পরিচয় পাইয়াছি নেপোলিয়নের জীবনে, কিন্তু শক্তি কি সর্ব্বজয়ী? বৃত্রাসুরে এবং নেপোলিয়নে কোথাও ত সেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধর্ম্ম আসিয়া জুটিলেই শক্তির ধ্বংস হয়। বৃত্রাসুর এবং নেপোলিয়ন, উভয়েই জগতে শক্তিতে অজেয়। অধর্ম্মাচরণে উভয়েরই ধ্বংস হইল। শেষে উভয়কেই কাঁদিতে হইয়াছে। এক জনকে কাঁদিয়া বলিতে হইল—'হা শম্ভু, তুমিও বাম!' আর জনকেও কাঁদিয়া বলিতে হইয়াছিল—'St. Helena was written in destiny.'

'চিরদিনই অধর্ম্মে এইরূপ বিলাপ করিতে হয়। সংসারে শক্তির জয় হইবে, ইহা যেমন সত্য; অধার্ম্মিক শক্তির ক্ষয়ও তেমনি সত্য। হেমবাবু তাঁহার 'বৃত্রসংহারে' এই প্রগাঢ় নীতির অবতারণা করিয়াছেন।

"তাহার পর দেখিতে পাই যে, হেমবাবুর প্রতিভা সংসারকেও ছাড়াইয়া বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়াছে—তাহার পরিচয় 'দশমহা বিদ্যায়"। প্রতিভার এইরূপ পরিণতি সচরাচর দেখা যায় না।" "নবপ্রভায়" শ্রীযুক্ত উত্তমানন্দ স্বামীও হেমবাবুর কবিতার কতকটা এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

উদ্বোধন। শ্রাবণ। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। "উদ্বোধনে" "ভূতের গল্পে"র উপযোগিতা কি? শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের "পূর্ব্বমীমাংসা" উল্লেখযোগ্য দার্শনিক সন্দর্ভ।

নবপ্রভা। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধির "শ্রাদ্ধমাহাত্ম্য" প্রবন্ধটি সুলিখিত। "নবপ্রভা"র "সাহিত্যের দরবার" বসিতেছে। সুসংবাদ।

মাতৃস্নেহ

১

দীর্ঘ দুই বর্ষ ব্যাপি' রুষ্ট দেবতার
অনাবৃষ্টি অভিশাপ—তীব্র হাহাকার
তুলিয়াছে রাজ্য মাঝে। প্রান্তরে যেথায়
পুষ্ট-স্বর্ণ-শীর্ষভারে অবনতপ্রায়
বিরাজিত শস্যক্ষেত্র, সেথায় বাতাস
তুলিতেছে ধূলিময় অনলের শ্বাস।
সরসীর অতিশীর্ণ অবশেষ তরে
বন্ধুত্ব-বন্ধন টুটি' যায় ঘরে ঘরে।
জননীর অঙ্কোপরি দারুণ ক্ষুধায়
শিশুর জীবনস্রোতঃ প্রবাহিয়া যায়।
রাজপথে শবস্তুপ। কে করে সৎকার ?—
মাংসাহারী প্রাণীদের অবাধ আহার।
রাজ্যের সীমান্তে যেথা পর্ব্বত-উপরি—
রাজদণ্ডে অবহেলে অবহেলা করি,—
নিবসে বিদ্রোহিদল, যুদ্ধের অনল
আসিতেছে সেথা হ'তে দুর্ভিক্ষ-দুর্ব্বল
রাজ্যের হৃদয় পানে। সেই পথময়
নরকের রঙ্গমঞ্চে পাপ-অভিনয়,—
লোহিত শোণিত-স্রোতে সিক্ত ধরাতল ;
বেদীচ্যুত দেবমূর্ত্তি ; মন্দির সকল
ভগ্নচূড়, অগ্নিশিখা নিশীথ-অম্বরে ;
গৃহ-সহকার হ'তে ছিন্ন পাপ করে
ললিতা মাধবী চাহে নিবাতে জীবন—
লাঞ্ছিত জীবন হ'তে বাঞ্ছিত মরণ।
অর্থশূন্য রাজকোষ—সহস্র প্রজার
নিরন্ন ক্ষুধিত মুখে যোগায়ে আহার।

দুর্ভেদ্য জনতা সদা ক্ষুধিত—মন্দিরে
নগরে প্রসাদ মাগি' দিবানিশি ফিরে।
বৃষ্টির সময় যায়, তবু নাহি আসে
মেঘমালা দগ্ধ তাম্র বিশুষ্ক আকাশে।
নিবদ্ধ গগন পানে সহস্র নয়ন—
মেঘলেশ নাহি সেথা। কোথায় বর্ষণ?

নিশীথে স্বপন দেখি' জাগিলা মন্দিরে
বৃদ্ধ পুরোহিত; উঠি' ডাকিলা গম্ভীরে
অন্য পুরোহিতগণে, কহিলা, "স্বপনে
হেরিনু, প্রজার দুঃখ দেবতার মনে
জাগিতেছে অনুক্ষণ। শাস্ত্রের নিদান—
নৃপতির পাপে ঘটে রাজ্যে অকল্যাণ।
নৃপতির প্রিয়তম যে জন;—তাহায়
আনি যদি বলি দাও তুষিতে পূজায়
দেবতারে, ঘুচি' যা'বে রোষ দেবতার;
রাজ্য মাঝে সুখশান্তি ফিরিবে আবার।
পারিবে কি?"

শ্রোতৃগণ রহে নিরুত্তর।
আরম্ভিলা বৃদ্ধ পুনঃ, দৃঢ় কণ্ঠস্বর
রোষে পূর্ণ—"মূঢ়গণ, দেবতাসেবায়
বৃথা কাটাইছ কাল। কম্পিত দ্বিধায়
পালিতে দেবতা-আজ্ঞা? শুধু তোমা সবে
কলুষিছ এ মন্দির। যত দিন র'বে
এ শীর্ণ শিরায় রক্ত, শেষ বিন্দু তা'র
দিবে দাস, পালিবারে আজ্ঞা দেবতার।
দূর হও, স্বার্থঅন্ধ, সারমেয়দল—
করিও না কলুষিত পুণ্য পীঠতল।"

আসিলা বাহিরে বৃদ্ধ। মন্দির-প্রাঙ্গণে
তখনো জনতা;—নিদ্রা জড়িত নয়নে।
গম্ভীরে ডাকিলা বৃদ্ধ। বজ্র-কণ্ঠস্বরে
জনতা উঠিল জাগি'। উঠিল অম্বরে
উদাত্তে গম্ভীরস্বর,—"শুন, বৎসগণ,
গভীর নিশায় আজি দেখিনু স্বপন,
তোমাদের বেদনায় দেবতা চঞ্চল।
পারিবে কি দেবরোষ করিতে নিষ্ফল
পূজায় করিয়া তুষ্ট?" শত কণ্ঠধ্বনি—
"অবশ্য পারিব," বলি' ধ্বনিল অমনি।
উঠিল বৃদ্ধের কণ্ঠ,—"স্থির হও তবে;
কল্য প্রাতে দেবাদেশ জানাইব সবে।
বল, দেবতার জয়!" "জয়! জয়!" স্বর
বিদীর্ণ করিল যেন নিশীথ-অম্বর।

৩

প্রভাতে চলিলা বৃদ্ধ জনতা-সহায়;
আসিলা প্রাসাদদ্বারে। বিগত নিশায়
দরিদ্রের ছদ্মবেশে দরিদ্রের ঘরে
সাহায্য, করুণা—দুই বিতরণ তরে
গত রাজা। নাথহীন-প্রাসাদরক্ষণে
সশস্ত্র প্রহরী ফিরে। হেরিয়া ব্রাহ্মণে
ছাড়ি' দিল সিংহদ্বার।

রাজার কুমার
ভ্রমিতেছে বিকশিত উদ্যান মাঝার।
তামরসগর্ভ আভা ললাটে উজ্জ্বল
পবনে পড়িছে আসি কুঞ্চিত কুন্তল;
ইন্দ্রধনু-বর্ণে আঁকা পক্ষ মনোহর
ফুলে ফুলে প্রজাপতি ভ্রমে নিরন্তর,

তাহারে ধরিতে ব্যগ্র। হেরিলা ব্রাহ্মণ;
উপযুক্ত বলি বলি' করিলা গ্রহণ।
হাসিয়া চলিল শিশু, মনে নাহি ভয়।
জনতা পিশাচ সম চীৎকারিল, "জয়!"
ভীমনাদে।

দ্বাররক্ষী ছাড়ি' দিল দ্বার
নিশ্চল রহিল কোষে অসি তীক্ষ্ণধার
কর্ত্তব্যবিমুখ; দ্বিধাবিভক্ত হৃদয়—
কর্ত্তব্য নিষ্প্রভ, দীপ্ত দেবরোষভয়।
উৎফুল্ল জনতা গেল মন্দিরের মুখে।

বাজিল বিষম শেল জননীর বুকে
রাজ-অন্তঃপুরে। ললাটে কঙ্কণ হানি'
বিমূর্চ্ছিতা হর্ম্ম্যতলে নিপতিতা রাণী।

৪

অন্ধকার অমানিশা। মত্ত জনগণ
নরবলি-আয়োজনে—করেনি দর্শন,
গগন নক্ষত্রহীন, চৌদিক্ গম্ভীর—
ঘুমায়ে পড়েছে যেন অধীর সমীর।

আজ পূজা অতি দীর্ঘ। নিশীথ আগত;
পট্টবস্ত্রে পুরোহিত দেবার্চ্চনারত।
শ্রেণীবদ্ধ ঘৃতপুষ্ট দীপশিখা ভায়
আঁধার মন্দিরগর্ভে, বিকট দেখায়
প্রাচীরে ক্ষোদিতমূর্ত্তি—বিচিত্র আকার,
বিস্মৃত শিল্পীর কীর্ত্তি, ভক্তি-উপহার
নৃপতির। দ্বারপ্রান্তে মন্দিরপ্রাঙ্গণে
ক্ষুধিত জনতা চাহি' ক্ষুধিত-নয়নে।

প্রতিমার পদমূলে রাজার কুমার
ঘুমায় ক্রন্দন-শ্রান্ত; দেহ সুকুমার
এলায়ে পড়েছে, যেন ম্লান হয়ে আসে
বৃন্তচ্যুত ফুল্ল ফুল দীপশিখা পাশে।

পূজা শেষ। পুরোহিত ত্যজিলা আসন,
প্রফুল্ল কুসুমভার করিলা গ্রহণ
নিদ্রিত শিশুর দেহ; আসিলা—যেথায়
শতবার রক্তসিক্ত কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ভায়
যূপকাষ্ঠ। তা'র পার্শ্বে তীক্ষ্ণ-খড়্গ-ধর
ঘাতক দাঁড়ায়ে আছে নিষ্কম্প-অন্তর।
গম্ভীরে কহিলা বৃদ্ধ,—নিশীথগগন
কাঁপিয়া উঠিল, "কর বলি-আয়োজন।"

জ্বলিল মশাল শত জনতার করে—
নির্ব্বাপিত চন্দ্রতারা আঁধার অম্বরে
শ্মশান-আলোক সম। আলোঅন্ধকার
ছায়ালোকে দেখাইল ঘিরি' চারিধার
ভীষণ-বীভৎস চিত্র,—ক্ষিপ্ত জনগণ
শিশুর প্রাণের তরে,—বিকটদর্শন।
জাগিয়া কাঁদিল শিশু; তার আর্ত্তস্বর
কাঁপিয়া উঠিল ঊর্দ্ধে—প্লাবিল অম্বর।
ঘাতক তুলিল খড়্গ। "জয়! জয়!" স্বরে
জনতা উঠিল গর্জ্জি' উৎফুল্ল-অন্তরে।

বিপুল জনতা যেন কোন মন্ত্রবলে
দ্বিখণ্ডিল আপনারে। হেরিল সকলে,
আসিছে উন্মাদমূর্ত্তি—জ্বলিছে নয়ন
আকুল-রোদন-স্ফীত; কোমল চরণ

রক্তসিক্ত ক্ষতপূর্ণ রাজপথ বাহি';
স্নেহ-ক্ষুধা-দীপ্ত আঁখি বলি পানে চাহি;
তরঙ্গিত দীর্ঘ কেশ উড়ে বিশৃঙ্খল;
যূপকাষ্ঠ পানে ছুটি' আসিছে বিহ্বল।
সহসা সে মূর্ত্তি হেরি' ঘাতকের করে
খসিয়া পড়িল খড়্গ।

আঁধার অম্বরে
ঝকিল বিদ্যুৎ; ঘন বারিধারা ঝরে—
দেবতার আশীর্ব্বাদ মাতৃস্নেহ' পরে।
নিবিল আলোকরাশি, চৌদিকে আঁধার—
জননী সন্তানে চাপে বক্ষে বারেবার।

পূজার মিলন।

১

শ্যামনগরের চৌধুরীরা সে জেলার প্রসিদ্ধ বুনিয়াদী ঘর। নবাব-সরকারে দেওয়ানী করিয়া বংশপতি যে বহু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা রাজৈশ্বর্য্য না হউক, লোভনীয় বটে। সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহার একাধিক পুত্র ছিল না; পৌত্রও একাধিক হয় নাই। কাযেই সম্পত্তি বিভক্ত হয় নাই। পৌত্র হরিহর চৌধুরী, শ্যামকমল ও নীলকমল—পুত্রদ্বয়কে রাখিয়া সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। তখনও সম্পত্তির আয় প্রচুর। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ শ্যামকমল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অসাধারণ বিষয়-বুদ্ধির ফলে বিষয় বাড়িয়াছিল। দুই ভ্রাতায় অসাধারণ সদ্ভাব দেখিয়া লোকে বলিত, "যেন রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই।" জ্যেষ্ঠ শ্যামকমল বিষয়ের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; সংসারের সব তিনিই দেখিতেন। কনিষ্ঠ কিছুদিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন। কায কিছু ছিল না, ইহাও যেমন সত্য, কাযের

অন্ত ছিল না, ইহাও তেমনই সত্য। লোকের উপকার করিতে, আপদে বিপদে সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই তৎপর।

ক্রমে যখন শ্যামকমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহন গ্রামের বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন শ্যামকমল কনিষ্ঠকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, এখন অধিক লেখাপড়ার রেওয়াজ হইয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়া বড়ঘরের ছেলেরাও কায করিতেছে। দেখিতেছ, সংসারের ব্যয়ও ক্রমেই বাড়িতেছে। তাই ইচ্ছা করিয়াছি, মোহিনীকে বিদ্যাভ্যাসের জন্য কলিকাতায় পাঠাইব। কিন্তু ছোট ছেলে; বিদেশে একা রাখিতে ভয় হয়।" নীলকমল ভ্রাতার কথা বুঝিলেন, তিনিও একটা কায পাইলেন; বলিলেন, "তা'র জন্য চিন্তা কি? আমি যাইব।" ইহার পর শিক্ষার্থী ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবক হইয়া নীলকমল কলিকাতায় গমন করেন। সেখানে তাঁহার মধুর স্নেহে সদ্যোগৃহচ্যুত বালক একদিনের জন্যও জননীর অভাব বুঝিতে পারে নাই। শেষে 'কাকাবাবু'র সঙ্গে মোহিনীমোহনের এমনই সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল যে, একের পক্ষে অপরকে ছাড়িয়া থাকা কষ্টকর হইত।

চার বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া—মোহিনীমোহন যে বার বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেইবার আশ্বিন মাসে তিন চারি দিনের জ্বরে শ্যামকমল দেহত্যাগ করেন। কাযেই কলিকাতার বাসার ও শিক্ষার্থী মধ্যম ভ্রাতা রজনীমোহনের ভার মোহিনীমোহনকে দিয়া নীলকমল দেশে ফিরিয়া আসেন। শ্যামকমলের কনিষ্ঠপুত্র যামিনীমোহনের বয়স তখন সাত বৎসর মাত্র। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে নীলকমলের পত্নী পরলোকগতা হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান—তিন বৎসরের শিশুপুত্র কামিনীমোহন পিসীমার ও জ্যেঠাইমার আদরে পালিত হইতেছিল।

অন্তঃপুরে এই বিধবা পিসীমারই কর্তৃত্ব। বড়বধূ ঠাকুরাণীর (শ্যামকমলের পত্নীর) বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র মোহিনীমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র সজনীমোহন এখন পঞ্চদশ বৎসরের। তবুও তিনি বধূ। অষ্টম বর্ষের বালিকা যখন শ্বশুরের কুললক্ষ্মী হইয়া প্রথম আসিয়াছিলেন, তখন শাশুড়ী ঠাকুরাণী জীবিতা। ননন্দার বয়স তখন পঞ্চদশ। তিনি বিবাহের অল্পকাল পরেই বিধবা;—পিতার সংসারেই থাকেন। মাতার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ভার ক্রমে কন্যার হস্তে আসিতে লাগিল।

বুদ্ধিমতী বড়বধূ ঠাকুরাণীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ননন্দা যে সামান্য

ভ্রমে ও সামান্য ত্রুটিতেও তাঁহাকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে তিরস্কার করেন, সে কেবল অপরের নিকট তাঁহাকে প্রশংসিত করিবার জন্য। অপরের নিকট ভ্রাতৃজায়ার ত্রুটিকেও গুণ প্রতিপন্ন করিতে, তাঁহার সকল অপরাধ বালিকার চাপল্য-প্রণোদিত প্রতিপন্ন করিতে ননন্দার চেষ্টার অন্ত ছিল না। লোকের নিকট ভ্রাতৃজায়ার প্রশংসা শুনিলে সেই অকাল-সুখ-স্বাদ-বিরহিতার হৃদয় যে আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত, সে আনন্দ আর কে ভোগ করিত? অল্পদিনেই তিনি বালিকাকে আপন করিয়া তাহার আপন হইলেন। বড়বধূ ননন্দাকে জ্যেষ্ঠার মত ভাবিতেন।

শ্যামকমলের ও নীলকমলের পুত্র-কন্যারা মার অপেক্ষা পিসীমার অধিক অনুরক্ত ছিল। তাহাদের পায়ে কাঁটা ফুটিলে পিসীমার বুকে ব্যথা বাজিত। তাহাদিগকে লইয়া পিসীমার কিছুতেই শান্তি ছিল না। এক একটি বালিকা বিবাহের পর স্বামীর ঘর করিতে যাইবার সময় যেন পিসীমার বক্ষের এক একখানি অস্থি লইয়া গিয়াছে। শ্যামকমল এক একদিন হাসিয়া বলিতেন,—"দিদি, ওদের জ্বালায় যে ধর্ম্ম কর্ম্মও ভুলিলে! ওরা কি তোমার স্বর্গের সিঁড়ি করিয়া দিবে?" তাহাদের জননীরাও যে তাহাদিগকে তাঁহার অপেক্ষা অধিক স্নেহ দিতে পারে, এ চিন্তা পিসীমার সহিত না। ডেপুটীর পদ পাইয়া মোহিনীমোহন যেবার প্রথম কর্ম্মস্থানে যায়, সেবার পুরোহিতঠাকুর, নীলকমল ও বড়বধূ ঠাকুরাণী তাহার গমনের দিনস্থির করিবার সময় পিসীমা জানিতে পারেন নাই। পুত্রাধিক পুত্রের গৃহত্যাগের কথা চিন্তা করিয়াও তিনি যে সে কথা জানিতে পারেন নাই, তাহাতে তিন দিন পিসীমার চক্ষুর অশ্রু শুকায় নাই। বড়বধূ ঠাকুরাণী সেইবার বিশেষ বুঝিয়াছেন যে, জননীর অপেক্ষাও অধিক ভালবাসা অপরে দিতে পারে।

নীলকমল দাদার আওতায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সংসারের অনেক কাযে তাঁহার বাধ-বাধ ঠেকিত। তখন দিদির পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকিত না। বাস্তবিক সে সংসার নহিলে যেমন পিসীমার চলিত না, তেমনই পিসীমা নহিলে চৌধুরীদের সেই বৃহৎ পরিবার চলিত না।

২

আমি চৌধুরী-পরিবারকে বৃহৎ বলিয়াছি। শ্যামকমল ও নীলকমল দুই ভ্রাতার পুত্র-কন্যা সবগুলিরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দুই ভ্রাতার কেহই অধিক বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা বলিতেন (অর্থাৎ দাদা বলিতেন, সুতরাং

ভ্রাতারও সেই মত ছিল), বয়স হইলে ছেলেরা একটা আদর্শ গড়িয়া ভাবে, সেইরূপ স্ত্রী নহিলে বিবাহ কেবল কষ্ট। মেয়েরা একটা আদর্শ গড়িয়া ভাবে, সেইরূপ স্বামী হইলে ভাল হইত। যাহারা সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞ, তাহাদের কল্পিত আদর্শ বাঞ্ছনীয় নহে, বিশেষতঃ যখন সব ছেলের জন্য "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী" পাত্রী এবং সব মেয়ের জন্য রূপে কার্ত্তিক ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাত্র পাওয়া অসম্ভব, তখন তাহাদিগকে সে আদর্শ গড়িবার অবকাশ না দেওয়াই ভাল। কারণ, তাহার ফলে অসুখের সম্ভাবনা।

শ্যামকমলের দুই কন্যা এখন স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছে। ছেলেদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ডেপুটী, মধ্যম উকীল। কেহই কর্ম্মস্থানে স্ত্রী লইয়া যায় নাই। নীলকমল বুঝাইযাছিলেন যে, এখন উহা প্রচলিত হইয়াছে ; কিন্তু এই এক বিষয়ে তাহারা কাকার কথা শুনে নাই। তাহাদের ছেলেমেয়েরাও বাড়ীতে।

* * * *

পূজার আর চার দিন মাত্র বিলম্ব আছে। চৌধুরী পরিবারের বৃহৎ অট্টালিকা আজ মক্ষিকাপূর্ণ মধুচক্রের মত পূর্ণ। বাজে লোকের কথা বলিতেছি না ; সে সমুদ্রে যোগবিয়োগ সহসা বুঝাই যায় না। দরিদ্র আত্মীয় স্বজন যে যেখানে থাকেন, পূজার সময় সকলকেই আনিবার চেষ্টা করা হয়। তাঁহারা আপন আপন ছোটখাট সংসার লইয়া পূজার কয় দিন পূর্ব্বেই আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপিত করেন, এবং পূজার পরে দশ দিন হইতে এক মাস পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সকলকে পাথেয়, কিছু অর্থ ও বস্ত্র দিবার ব্যবস্থা আছে। বৎসরে এ সাহায্য দরিদ্রের পক্ষে সামান্য নহে।

বাড়ীর মেয়েরাও শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে। চৌধুরী-পরিবারে পূজার সময় সকলেরই গৃহে আসা প্রথা। শ্যামকমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহন রায় কয় মাস পরে আজ নৌকাযোগে কর্ম্মস্থান হইতে আসিয়াছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বঙ্গদেশ সর্ব্বত্র রেলপথের জটিল-জালে জড়িত ও জল-নিকাশ-পথের রোধবশতঃ ম্যালেরিয়াগ্রস্থ হইয়া দাঁড়ায় নাই। গ্রাম রেল-পথ হইতে যতই দূরে হউক,তখনও লোকের গ্রামের উপর টান ছিল। তখন অনেকে পল্লীগ্রামের প্রাসাদ ছাড়িয়া কলিকাতায় কুটীরে বাসের জন্য লালায়িত হয় নাই। স্নানের ঘাটের পার্শ্বেই মোহিনীমোহনের নৌকা লাগিয়াছে। নৌকা হইতে মাল নামিতেছে ; তীরে এক দল ছেলে তাহাই দেখিতেছে। মধ্যম রজনীমোহন ঘর-জেলায় ওকালতী করে। কাকার আদেশে তাহাকে পূর্ব্বেই আসিতে হই-

য়াছে। কেবল তৃতীয় যামিনীমোহন এখনও আসে নাই। সে কলিকাতায়। এবার আইনের পরীক্ষা। সে পরে আসিবে বলিয়া ভ্রাতা কামিনীমোহনকে ও ভ্রাতুষ্পুত্র সজনীমোহনকে পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহারা তাহাকে রাখিয়া আসিতে চাহে নাই; কিন্তু কলিকাতার বাসায় সে-ই কর্ত্তা, কাযেই সে জিদ করিয়া তাহাদিগকে পাঠাইয়াছে। গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে আজ কয় দিন হইতে তাহার জন্য নৌকা অপেক্ষা করিতেছে।

আজ সকালে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে দাঁড়াইয়া নীলকমল প্রতিমার সজ্জা কত দূর অগ্রসর হইল, তাহার সন্ধান লইতেছেন, এমন সময় গ্রামের ডাকপিয়ন প্রণাম করিয়া একখানা পত্র দিল। পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় নীলকমলের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া নীলকমল বলিলেন, "যামিনী লিখিতেছে, তাহার অসুখ করিয়াছে। বাড়ী আসিবে না। পূজায় বাড়ী আসিবে না; সে কি!" পত্রখানা কামিনীমোহনের হস্তে দিয়া তিনি বলিলেন, "যা, তোর পিসীমাকে জ্যেঠাইমাকে শুনিয়ে আয়।" কামিনীমোহন অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিল, আপনাকে ডাকিতেছেন।

নীলকমল অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

৩

অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বারেই পিসীমা ও বড়বধূ ঠাকুরাণী তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন। নীলকমল উপস্থিত হইলেই বড়বধূ ঠাকুরাণী বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমাকে কলিকাতায় লইয়া চল। ঠাকুরঝি থাকিবেন; পূজার কোন ত্রুটি হইবে না। আশ্বিন মাসে--পূজার সময় অসুখ—"

কথাটা আর সম্পূর্ণ হইল না। শুনিয়া নীলকমলের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; পিসীমার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে আজ প্রায় পনের বৎসরের কথা। কিন্তু, হায়!—কালে কি শোকের পরিমাণ হয়? শোকের রাবণের চিতা কালজয়ী—চিরস্থায়ী। পূজার উৎসবানন্দের মধ্যে চৌধুরীগৃহে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছিল; সহসা উৎসব-দীপ নিবাইয়া সামান্য জ্বরে শ্যামকমল দেহত্যাগ করেন।

আত্মসংবরণ করিয়া নীলকমল বুঝাইলেন, নিশ্চয়ই সামান্য অসুখ করিয়াছে; ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। তিনি মুখে ব্যস্ত হইবার কারণ নাই বলিতেছিলেন বটে, কিন্তু বুঝি শঙ্কিতা জননীও তাঁহার অপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হয়েন নাই। শ্যামকমলের পুত্রকন্যাদিগকে অসহায় শৈশব হইতে কে কোলে পিঠে করিয়া

মানুষ করিয়াছে? কে শিশুর সঙ্গে শিশু সাজিয়া খেলা করিয়াছে? বালক-বালিকারা রোগে কাহার কাছে তিক্ত ঔষধ খাইতেও আপত্তি করে নাই? কে তাহাদের শত আবদার ও অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে? কাকার ক্রোড় তাহাদেরই অধিকারে ছিল। কাকার হৃদয়ে তাহাদের ছাড়া আর কাহারও স্থান ছিল কি?

তখন কি করা কর্ত্তব্য, স্থির করিবার জন্য ছেলেদের ডাক পড়িল। নীলকমল স্বয়ং কলিকাতায় যাইতে চাহিলেন; শুনিয়া মোহিনীমোহন বলিল, "তা হইবে না। বাড়ীতে পূজা; আপনি গেলে সব গোল হইবে। আমি যাইব।" শেষে তাহাই স্থির হইল।

নৌকার বন্দোবস্ত করিতে নীলকমল বহির্বাটীতে আসিলেন।

৪

এক ঘণ্টার মধ্যেই মোহিনীমোহন আহার করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কয় মাস পরে ছেলে বাড়ী আসিয়াছে, এ দুশ্চিন্তার মধ্যেও তাহাকে কাছে বসাইয়া যত্ন করিয়া না খাওয়াইয়া পিসীমার ও মার তৃপ্তি হইল না। সে স্নেহ—সে যত্ন আহার্য্যে যে সুমিষ্ট স্বাদ সঞ্চার করে, তাহার তুলনা কোথায়?

আহারের পর পিসীমাকে ও মাকে প্রণাম করিয়া মোহিনীমোহন যখন বাহিরে আসিতেছে, তখন দালানে—তাহার শয়নকক্ষের দ্বারে পত্নীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

বড়বৌমার পিতা ভ্রাতাদিগের সহিত পৃথক্ হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃগৃহে বৃহৎ পরিবারে বাস করেন নাই। সেই কারণে এবং তদুপযোগী শিক্ষার অভাবে তিনি বৃহৎ সংসারে, দশের মধ্যে, দশকে আপনার করিতে ভালবাসিতেন না। সে তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি 'আপনার' গণ্ডিটি বিস্তৃত না করিয়া সঙ্কীর্ণ করিতেন। আপনার বেশ-ভূষা, আপনার ছেলেমেয়ে,—ইহাতেই তাঁহার আনন্দ ছিল। সময় সময় তাঁহার ব্যবহারে মা ও পিসীমা ব্যথিতা হইতেন; ভাবিতেন,—তিনি গৃহের কর্ত্রী হইলেই সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে—ভাই ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হইবে। তাঁহারা কোন কারণে দুঃখিতা জানিতে পারিলে মোহিনীমোহন তাঁহাদিগকে বলিত, "দোষ ত তোমাদেরই। আমাদের সব মানুষ করিতে পারিলে, আর একটা বোকা মেয়েকে মনের মত করিয়া গড়িতে পার না?" ছেলের কথায় তাঁহাদের সব দুঃখ দূর হইত, সব ব্যথা বিধৌত হইয়া যাইত।

পত্নীকে দেখিয়া মোহিনীমোহনের মুখে হর্ষদীপ্তি দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

সে কথার উত্তর না দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজই কলিকাতায় যাইবে?"

মোহিনীমোহন বলিল, "হাঁ। এখনই।"

"পথকষ্ট পাইয়া এই ত আসিলে! আর কেহ গেলে হইত না?"

মুহূর্ত্তে মোহিনীমোহন ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "কথাটা বলিলে কেমন করিয়া? আমার একটু কষ্ট বড়, না আমার ভাই বড়?"

বৌমা বুঝিলেন, আর কিছু বলিলে বারুদের স্তূপে অগ্নিকণা পড়িবে।

মোহিনীমোহন বাহিরে যাইয়া দেখিল,—নীলকমল তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি এক শত টাকা করিয়া পাঁচখানি নোট মোহিনীমোহনের হস্তে দিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দেখিস্, বাবা, চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়।" "এত টাকা কি হইবে?"—বলিয়া পিতৃব্যের মুখে চাহিয়া মোহিনীমোহন দেখিল, কাকার স্নেহসিক্ত নয়ন জলে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। মোহিনীমোহন আর কোন কথা কহিল না; মনে মনে ভাবিল, জন্মান্তরের কোন্ সুকৃতির ফলে তোমার স্নেহ পাইয়াছি! সে পিতৃব্যের পদে প্রণত হইল। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই সেই শরতের আলোকোজ্জ্বল অম্বরতলে—গ্রামের ঘাট হইতে মোহিনীমোহনের ছয় দাঁড়ের পান্সী বীচিবিক্ষোভবিহ্বলা নদীর জল কাটিয়া ভাসিয়া চলিল।

৫

সহসা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বাসায় উপস্থিত দেখিয়া যামিনীমোহন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

সস্নেহে কনিষ্ঠের পৃষ্ঠে করতল সংস্থাপিত করিয়া মোহিনীমোহন বলিল, "তোর পাগলামীর জন্যই ছুটিয়া আসিতে হইল। কত দিন পরে বাড়ী আসিলাম; তবু তোর দেখা নাই! কি অসুখ করিয়াছে? কেমন আছিস্?"

প্রথম শিশিরের সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া যামিনীমোহনের সর্দ্দি ও সামান্য জ্বর হইয়াছিল। পরীক্ষার অধিক বিলম্ব নাই, আবার পথে ঠাণ্ডা লাগিবে, এই আশঙ্কায় সে বাড়ী যাইতে চাহে নাই। শুনিয়া মোহিনীমোহন বলিল, "তাহাও কি হয়? তোর অসুখের সংবাদ পাইয়া কাকাবাবু, পিসীমা, মা—সব বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। তুই না যাইলে তাঁহারা বড় দুঃখিত হইবেন। তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছিস্। পরীক্ষা আমরাও দিয়াছি, তুইও ত জ্ঞানের জলাই দিয়াছিস্।

পরীক্ষার জন্য কি বাড়ী যাওয়া আটকায়? এ সময় বাড়ী না গেলে চলিবে না।"

যামিনীমোহন একটু ইতস্ততঃ করিল। মোহিনীমোহন কোন আপত্তি শুনিল না। বলিল, "তাহা হইবে না। সব গুছাইয়া ফেল্। আজই বাড়ী রওনা হইতে হইবে।"

শেষে স্থির হইল, দুই ভ্রাতায় পরদিন রওনা হইবে।

৬

পূজার ষষ্ঠী কাটিয়া গেল। গৃহে উৎসব; কিন্তু যাঁহাদের গৃহে আনন্দোৎসব, তাঁহাদের হৃদয়ে উৎসবের স্পর্শমাত্র নাই। প্রবাসী যামিনীমোহনের জন্য তাঁহাদের হৃদয় চিন্তাকুল। জলের মধ্যে বাস করে বলিয়াই বুঝি মীন জলের স্নিগ্ধকারিতা অসাধারণ বলিয়া অনুভব করে না। নহিলে এই স্নেহ ছাড়িয়া কি কেহ প্রবাসে থাকিতে পারে?

ষষ্ঠীর নিশি ত পোহাইল। পিসীমার ও মার মনে সুখ নাই, কিন্তু কাযেরও অন্ত নাই। আজ উভয়ে রাত্রি থাকিতে উঠিয়া স্নান শেষ করিয়াছেন। বাড়ীতে লোকের অভাব নাই; কিন্তু পূজার আয়োজন স্বহস্তে না করিলে তৃপ্তি হয় না। বধূরা ও মেয়েরা পূজার জিনিস স্পর্শও করিতে পায় না। উভয়ে পূজার দ্রব্যাদি গুছাইতে বসিয়াছেন।

তখন পূর্ব্বদিক্‌চক্রবালে অরুণরাগবিকাশে কেবল বাল-ভানুর আগমন সূচিত হইতেছে; শরতের নাতিশীতোষ্ণ প্রভাত-সমীরে তরুলতা মর্ম্মরিত হইতেছে; সুপ্তপল্লী কেবল জাগিয়া উঠিতেছে; চৌধুরীগৃহের সমুচ্চ নহবৎখানায় সানাই কেবল আগমনী ধরিয়াছে :—

"গা তোল, গা তোল; বাঁধ, মা, কুন্তল;
ঐ এল পাষাণী—তোর ঈশানী।"

সহসা অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বারে যামিনীমোহনের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ ধ্বনিত হইল,—"পিসীমা!"

মা ও পিসীমা ব্যস্ত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। যামিনীমোহন তাঁহাদের চরণে প্রণত হইল। তখন সেই স্নেহময়ী বিধবাযুগলের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু পুণ্য আশীর্ব্বাদের মত গৃহাগত পুত্রের শিরে বর্ষিত হইয়া তাহাকে পবিত্র করিয়া দিল।

চৌধুরীপরিবারে সেই দিন হইতে প্রকৃত উৎসবের আরম্ভ হইল।

অদৃষ্ট।

১

বসন্তে যখন ফুল ফুটে, তখন ভ্রমর ছুটিয়া বেড়ায়। বর্ষায় যখন তড়াগ জলপূর্ণ হয়, তখন সোনা ব্যাং আসিয়া জুটে। শীতকালে যখন লেপ মুড়ি দিয়া আরাম করিবার ইচ্ছা হয়, তখন প্লেগের আবির্ভাব হয়। অবশ্য কোন প্রাকৃতিক নিয়মে এই সকল ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কথা এই যে, ইহারা থাকে কোথায়?

ভ্রমর গলিতপত্রের মধ্যে থাকে। ব্যাং গর্ত্তে বাস করে। প্লেগ-কীটাণু অবশ্য কোন স্থানে লুক্কায়িত থাকে। যত দিন কাননে ফুল না ফুটিবে, যত দিন বর্ষার জলে তড়াগ সরসী প্রভৃতি পরিপ্লাবিত না হইবে, যত দিন সকলে শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়া না শুইবে, তত দিন ভ্রমর, ভেক ও প্লেগ কি করিয়া থাকে?

তাহারা চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অন্তরে তাহারা জানে যে, অমুক সময় আমাদিগের আবির্ভাব প্রয়োজনীয়; কিন্তু জানিলেও তাহাদিগের বিচারের শক্তি নাই।

তাহারা চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকে কেন? তাহার উত্তর এই যে, বসন্ত-কাল ভিন্ন ভ্রমরের গুঞ্জন করিবার ইচ্ছা হয় না। যদি তুমি ভ্রমরকে দারুণ শীতে বল,—"বাবা ভ্রমর! একবার গুন গুন কর ত!" তবে ভ্রমর বিরক্তি-সহকারে চলিয়া যাইবে।

মানবেরও সেইরূপ সময় আছে। শৈশবকালে স্নেহ-মমতায় জড়িত হইয়া থাকে। যৌবনে উড়িতে ইচ্ছা হয়। বার্দ্ধক্যে গোঁফে তা দিয়া থাকে।

কিন্তু মানবের আরও একটু আছে। দেখা যায় যে, যৌবনকালেও কেহ কেহ বার্দ্ধক্যের ভান করে, এবং বার্দ্ধক্যেও কেহ কেহ গোঁফে তা ছাড়িয়া উড়িতে চাহে।

কোন্‌টা অদৃষ্ট? যৌবন ভ্রমরের গুঞ্জন, না বার্দ্ধক্যের উড্ডীয়ন?

অনেকে বলিবেন, ওটা স্বভাবের দোষ। তবে ভ্রমরের স্বভাবের দোষ হয় না কেন? আবার বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভ্রমরের উড়িবার শক্তি থাকিলেও সময় না হইলে গুঞ্জন কর্ম্মটাকে বৃথা মনে করে। কিন্তু মানব, শক্তি না থাকিলেও, একবার উড়িতে চাহে।

এত বড় গৌরচন্দ্রিকার উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনকালের সহধর্ম্মিণী জীবিতা

থাকিতেও, অনুকূল মুখোপাধ্যায় বৃদ্ধ বয়সে একটা বিয়া করিয়া ফেলিলেন। একটা বিবাহের দোষ এই যে, তাহাতে "ব্যালেন্স" থাকে না। বংশদণ্ডের উপর কেবল একটিমাত্র ঝোলা স্কন্ধে স্থাপন-পূর্ব্বক ভবনদী পার হওয়া বড়ই কষ্টকর; সুতরাং সম্মুখে আর একটি ভার ঝুলাইয়া দিলে স্থিরভাবে সমতল ও বন্ধুর ভূমিতে বিচরণ করা যায়।

মানবের যে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা এই সারসত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা একটা কোন অন্য ধরণের প্রকৃতির। বসন্তকালের গুঞ্জনস্বভাবের বিরুদ্ধে বৃদ্ধকালের উড্ডীয়নলিপ্সা ধীরভাবে খাড়া করিয়া দিলে অবশ্যই একটা প্রত্যক্ষ ফলের সৃষ্টি হয়।

দার্শনিকগণ তাহাকে কর্ম্মফল বলেন। সেই ফল পাকিলে আমরাই যে খাইয়া থাকি, এমন নহে। ফলটা যদি ভাল হয়, তবে ইতর ব্যক্তি পাড়িয়া খায়। ফল যদি মন্দ, কটু, কিংবা বিষাক্ত হয়, তবে বৃক্ষেই ঝুলিতে থাকে। অর্থাৎ, বৃক্ষরূপী জীব নিজের কর্ম্মফল নিজেই ভোগ করে।

চক্রবর্ত্তী বলেন, "যাহা করেন ঈশ্বর।" গীতা বলেন, "ঈশ্বর কোন কর্ম্মই করেন না।" বেদান্তবাগীশ বলেন, "তিনিই আমি।" টীকাকার বলেন, "দুই-প্রকার প্রকৃতিই,—(নষ্ট ও উৎকৃষ্ট) মায়া। উভয়ের সংঘর্ষণে সুখ দুঃখ প্রভৃতি।" কেহ কেহ চটিয়া বলেন, "ঈশ্বর টীশ্বর নাই, সকলই অদৃষ্ট রে বাবা, সকলই অদৃষ্ট!"

অথচ অদৃষ্ট একটা ফাঁকা কথা। অদৃষ্টটাকে এড়াইবার জন্য আবার চেষ্টা, আবার কর্ম্ম, আবার ফল, আবার নং ২ বোঝা। হায়! হায়!

২

মুখুয্যের পূর্ব্বপক্ষের একটি শ্যালক ছিল। তাহার নাম শ্যামচাঁদ। শ্যামচাঁদ শ্যাম হইলেও চাঁদ। ইহাই প্রাকৃতিক অর্থ। অর্থাৎ, সুশ্রী সুপুরুষ, অথচ ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ। অনেক কৃষ্ণবর্ণের বিড়াল দেখিতে মন্দ হয় না। বিরল হইলেও শ্যামচাঁদ তাহাদিগের মধ্যে একটি।

সরমাসুন্দরী গৃহে অধিষ্ঠিতা হইতেই শ্যামচাঁদ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিল। শ্যামচাঁদ বলিল, "মণি বাঁচিয়া থাকিতে এ কাজটা কি ভাল হইল?"

রামমণি শ্যামচাঁদের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, এবং মুখুয্যের প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

রামমণি শান্তপ্রকৃতির স্ত্রীলোক, এবং বুদ্ধিমতী। রামমণি বলিল, "নাথ, তোমার সুখে কণ্টক দিব কেন? অনুমতি হয় ত বাপের বাড়ী চলিয়া যাই;

নচেৎ যদি এখানে থাকিতে দাও, তাহাতেও দাসী কুণ্ঠিতা নয়। চারিটি খাইয়া দাসীর মত তোমাদের পরিচর্য্যা করিব।"

উপযুক্তা স্ত্রী থাকিতেও বিবাহ করা কৌলীন্য-প্রথার বাহাদুরী। বল্লাল সেনের মত এই ছিল যে, বহুগুণান্বিতা সহধর্ম্মিণী সত্বেও আবার বিবাহ করা উচিত। গুণ অসীম। একটা স্ত্রীতে সর্ব্বগুণের লক্ষণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ দিবসেই কলহ করে, অতএব রাত্রিকালেও যাহারা কলহ করিতে পারে, এমন আর একটি চাই। কেহ সর্ব্বদাই প্রফুল্লা, অতএব একটি মানময়ী গম্ভীর-প্রকৃতি 'ধনী' সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। কেবল ইহাই নহে, বিপরীত গুণের একই স্কন্ধে সমাবেশ না হইলে, বিশ্বসৌন্দর্য্যের গরিমা বুঝা যায় না। যেমন সুন্দর চিত্রে বহু বর্ণের আবশ্যকতা, সেইরূপ আলোক ও অন্ধকারেরও আবশ্যকতা আছে।

সরমা ষোড়শী। মুখুয্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে, রামমণি তবে বনে যাউক। এবং শ্যামও তাহার সঙ্গে যাউক। সে অনর্থক ঘরে বসিয়া খাইতেছে।"

এখন, বল্লালসেন পুরুষপক্ষে বহুগুণভোগের যে প্রথার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, স্ত্রী-পক্ষে তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে কোন গুণধর কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কৃত না হইলেও, অন্তরীক্ষের অন্যতম সেনজা মহাশয় তাহার অবশ্য কোনও বিধান করিয়াছেন।

সেই বিধানানুসারে সরমাসুন্দরীরও মোটে ইচ্ছা হইল না যে, শ্যামচাঁদ যায়; অথচ শ্যাম থাকিলে রামমণি যাইবে না।

অতএব, রামমণি ও শ্যামচাঁদ উভয়েই থাকিয়া গেল। অনর্থক দুইটি অসহায় প্রাণীকে পুরাতন বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করা কাহারও ন্যায়সঙ্গত বোধ হইল না। কর্ম্ম হইতে যে ফল বাহির হইবে, তাহার মূলে জল সেচন করা হইল। বল্লাল সেনের প্রথাও বজায় রহিল।

ইহাও অদৃষ্ট। যাহা দৃষ্ট হয় নাই, তাহাই অদৃষ্ট। যাহাদিগের অগ্রপশ্চাৎ দুই দিকে চক্ষু আছে, তাহাদিগের নিকট অদৃষ্ট বোধ হয় একটা বিন্দুর মত। যাহাদিগের কেবল এক দিকে চক্ষু, তাহাদিগের নিকট অদৃষ্ট—সীমাবিহীন গোলক। তাহার বার আনাই দেখা যায় না।

কাজেই বৃদ্ধ মুখুয্যে (এমনই বা বৃদ্ধ কি? মোটে পঞ্চাশ বৎসর বয়স) যখন পূর্ণ পেন্সন-লাভের লালসায় সারাদিন কর্ম্মস্থলে থাকিতেন, তখন রামমণি, শ্যাম ও সরমা ডাক্‌তুরূপ খেলিত। তাস্‌খেলা ভিন্ন অকর্ম্মা কয়টা লোকের সময়

কাটিবার আর কি উপায় আছে? একান্নবর্ত্তী গৃহের ভার কর্ত্তার উপর। কর্ত্তা কর্ম্ম করিলেও সে কর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যেই নয়। সেটা ব্যাগার। সুতরাং কর্ত্তা (দার্শনিকগণের মতে) ঈশ্বরস্থানীয়। তবে এ কর্ত্তা কর্ম্ম না করিয়াও মনে করে, "আমি করিতেছি," এবং এই সামান্য দোষের নিমিত্ত কর্ম্মফল ভোগ করে। কেবল মনের ভ্রম! কেবল মনের ভ্রম!

৩

অনুকূল মুখুয্যে গীতা পড়েন নাই। গীতার টীকাও পড়েন নাই। পড়িলে, কর্ম্মফল ঈশ্বরকে দিয়া বসিয়া থাকিতেন। ফলের অধিকারী যে তিনি নহেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। যাহারা জানে, তাহারা মনে করে, "তবে কর্ম্মের দরকার কি?" কিন্তু তাহা নয়। কর্ম্ম করিতেই হইবে, নিস্তার নাই। তুমি জন্মিতে না চাহিলেও জন্মিতে হইবে। বিবাহ করিতে না চাহিলেও করিতে হইবে। তা' ইচ্ছা করিয়াই কর, আর অনিচ্ছা করিয়াই কর, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তুমি বলদ। বোঝা বহিতে হইবে। তুমি একটা বোঝা যদি শান্তভাবে চক্ষু বুজিয়া বহিয়া থাক, ভাল। তাহার ফল ঈশ্বরকে দিয়াছ। যদি অন্য বোঝা সাধ করিয়া ঘাড়ে লইযা থাক, তবে হয় তাহার ফল ঈশ্বরকে দাও, নচেৎ স্কন্ধে ঝুলাইয়া রাখ। অন্য বোঝা স্কন্ধে আসিয়া পড়িলেও তাই। কিন্তু একটা বোঝা টান্ দিয়া ফেলিতে না চেষ্টা করিলে অন্য বোঝা আসে না।

ভজহরির স্কন্ধে পশুশালা-রক্ষণাবেক্ষণের বোঝা ছিল। সে বোঝাটা টানিবার চেষ্টা করাতে ভজহরির প্রভু তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিল। ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি অবিচার প্রভু?"

প্রভু। তোমার বুঝিবার ভুল। নিশ্চয়ই পূর্ব্বের বোঝা তোমার পক্ষে লঘু হইয়াছে, নচেৎ তোমার ফেলিবার চেষ্টার শক্তি কোথা হইতে আসিল? অবশ্য তোমার এখনও শক্তি আছে; হয় ত কোন সময় বোঝাটা ফেলিয়া দিতে পার। অতএব আমি চাপিলাম।

ভজহরি ক্রমে বুঝিতে পারিয়া নীরবে চক্ষু মুদিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখে, স্কন্ধ পরিষ্কার। আর কোন ভার নাই। তবে ভজহরি বড় সাবধান। পাছে ভারশূন্যতার উৎসাহ কেহ দেখিয়া ফেলে, তাই ক্রমাগত ডাকিতে লাগিল, "প্রভু! তোমার মহিমা অপার! ওঃ! সংসারের ভার কি গুরুতর!"

কিন্তু অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের সে জ্ঞান তখনও জন্মে নাই। ভ্রমরের মত হইলে তিনি শীতকালে আর গুঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু মানুষের "মন" বলিয়া একটা পদার্থ আছে। গুঞ্জনের মধ্যে সুখ আছে, সেটা তিনি মনে বুঝিয়াছিলেন ; অতএব অসময়ে গুঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মন বিচার করিয়া দেখে, গুঞ্জনে সুখ আছে, এবং বাধা পাইলে পুনর্ব্বার বিচার করে যে, অমুক রকমে অমুক পথে গেলে সুখ হইত। যখন সব পথ ঘুরিয়া আসে, তখন সে মনে করে যে, অসময়ে গুঞ্জন বৃথা। ক্রমে মনে করে যে, এটা আগা গোড়াই কর্ম্মভোগ। কিন্তু বোঝা নামাইতে গেলে ভজহরির দশা হয়। অবশেষে চক্ষু মুদিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বিগুণ গুঞ্জন করে।

এই অনিচ্ছা ক্রমে শ্রমলব্ধ ভ্রমজ্ঞানের প্রাথর্য্যে মরিয়া যায়। তখন মন বলে, "বাঃ! এ ত বেশ! বে মন-ভ্রমরা! বসন্তকালে গুঞ্জন করিতে থাক, আমি একটু বিশ্রাম করি।"

উল্লিখিত নিয়মানুসারে মুখুয্যের একদিন মনে হইল, "যদি ব্যাগার খাটিয়াই মরিতেছি, তখন বিবাহ করিলাম কেন? সমস্ত দিন খাটিয়া রাত্রিকালে ঘুমাইয়া পড়ি। ইহাতে সরমাসুন্দরীরও কষ্ট, এবং আমারও বিবাহের উদ্দেশ্য বিফল হইতেছে।"

কিন্তু পাছে কেহ সন্দেহ করে, সেই ভয়ে মুখুয্যে লুক্কায়িতভাবে পেন্সন লইয়া ও কর্ম্মস্থান হইতে অবসরগ্রহণ করিয়া প্রথম দিনকতক গুলির আড্ডায় বসিয়া থাকিতেন। সকলে মনে করিত, মুখুয্যে আপিসে যায় এবং আসে। কিন্তু মুখুয্যে নবীন জীবনের পত্তন কি করিয়া করিতে হয়, তাহা না জানিয়া হঠাৎ যদি একটা কাণ্ড করিয়া বসেন, এই ভয়ে গুলির আড্ডায় চক্ষু বুজিয়া ভবিষ্যতের পথ স্থির করিতেন।

ইতিমধ্যে শ্যামচাঁদ ও সরমাসুন্দরীর মধ্যে একটা নূতন রকমের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল। সেটা ঠিক প্রণয় নহে, এবং নিন্দনীয়ও কিছু নহে। অথচ সেটা কি, তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিল না।

স্বয়ং মুখুয্যে তাহা জানিতে পারেন নাই। জানিবার কোনও কারণই ছিল না। সংসারের কিছুই ঠিক জানা যায় না ; কারণ, কিছুই কিছুর মত নহে। মুখুয্যে যখন কাঁচা আফিং সেবন করিতেন, তখন সেটা কাঁচার মতই লাগিত। আপাততঃ দগ্ধ আফিং কিংবা গুলি গুলিরই মত লাগিতেছিল।

একটা নূতন কিছু সকলেই চাহে, অথচ সেটা কি, তাহা কেহই ভাল করিয়া

দেখে না। দেখিলে আর নূতনের তৃষা থাকে না; হয় ত নূতনের পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে পুরাতনের শ্রেষ্ঠতা অনুভূত হয়।

নূতন বধূ ঘরে আনিয়া মুখোপাধ্যায় তাহার নূতনত্ব সম্বন্ধে কোনও বিশেষ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। কিন্তু শ্যামচাঁদের পক্ষে অন্য রকম দাঁড়াইল। শ্যামচাঁদ কলেজে পড়িত। প্রকাণ্ড গ্রীষ্মাবকাশ সরমার সহিত তাস্ খেলিয়া কাটাইয়া দিয়া যখন শ্যামচাঁদ পুনর্ব্বার কলেজে যাইতে লাগিল, তখন শ্যামের বোধ হইল যে, জীবনের প্রসারতার নিমিত্ত তাস্ খেলা দরকার। শুধু তাহাই নহে, সে খেলার সাথী সরমা হওয়া চাই। ক্রমে এই মত তাহার এত স্থির ও দৃঢ় হইয়া পড়িল যে, সে কলেজ হইতে পলাইয়া মধ্যে মধ্যে তাস্ খেলিয়া যাইত।

এরূপ বাড়াবাড়িতে রামমণি সর্ব্বদা যোগ দিতে পারিত না। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে সে প্রায় গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত। অতএব একটি সঙ্গীর হ্রাস হওয়াতে শ্যাম সরমার সহিত বিন্‌তি খেলিতে লাগিল।

মুখুয্যে গুলি খাইয়া স্থিরবুদ্ধি হইতে লাগিলেন। ক্রমে একদিন আড্ডা হইতে কিছু প্রাক্কালে আগমনপূর্ব্বক বিন্‌তি খেলার ধুম দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

মুখুয্যে কহিলেন, "শ্যাম! লোকটার (সরমাকে লক্ষ্য করিয়া) বুদ্ধি শুদ্ধি আছে?"

শ্যাম। (সলজ্জে) আমি সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিবার অধিকারী নহি।

মুখুয্যে। প্রকাশ করই না ছাই! আমরাও সেকালে অনেক খেলিয়াছি। একালের খেলার সঙ্গে সেকালের খেলার কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা জানিয়া রাখা উচিত। তুমি সম্পর্কে শ্যালক হইলেও লেখা পড়া অনেক শিখিয়াছ। সেকালে আমরা গল্‌দাচিংড়ী তেলে ভাজিয়া খাইতাম, একালে তাহাই অন্যরূপে ভাজিয়া তোমরা বল "কট্‌লেট্"। সেকালের ঈশ্বরকে তোমরা এখন কি বল?

শ্যাম। Logos.

মুখুয্যে। দেখ ত কেমন সুন্দর নাম! আচ্ছা, বল ত—সেকালের প্রেমে ও একালের প্রেমে তফাৎ আছে কি?

শ্যাম। আমি ও সব কিছু জানি না।

মুখুয্যে। আমার বোধ হয়, আছে। সেকালের প্রেমে হৃৎকম্প হইত,

একালের প্রেমে মাথার গোলযোগ হয়। সেকালের দেশ-হিতৈষিতায় লোকে কাঁদিয়া ফেলিত, একালে নানারূপ কথা কহিয়া চীৎকার করে। যাহা হউক, বিন্‌তি খেলায় আজ জিতিলে কে ?

সরমা। আমি জিতিয়াছি।

মুখুয্যে। দেখ শ্যাম! সেকালে আমিই জিতিতাম। পুরুষেরাই সেকালে রণজয় করিত; একালে স্ত্রীলোকেরা করে। এটা সভ্যতার লক্ষণ। যখন রামমণি ছোট ছিল, তখন সে আমার নিকট সর্ব্বদাই বিন্‌তি খেলিয়া হারিত। এখনও হারিবে। স্বর্গে গিয়াও হারিবে।

সরমা। একবার খেলিয়া দেখ না।

মুখুয্যে। এখন সময় নাই। দুইটা গোরু মরিয়া গিয়াছে। দুগ্ধের অনাটন বড়ই কষ্টকর। চাউলের দর বাড়িয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ সম্মুখে। তাহার উপর মহামারী। শ্যাম! তোমরা খেল; আমি একবার রামমণির সঙ্গে গৃহস্থালীর পরামর্শ করিয়া আসি।

মুখুয্যে মহাশয় চলিয়া গেলেন। তখন রামমণি মরা গোরুর নিকটে বসিয়া কাঁদিতেছিল। সেকালের কত সাধের শ্যামলী ধবলী! কতবার স্বহস্তে তাহাদিগের সেবা করিতে করিতে রামমণির জীবনের প্রথম সুখের প্রভাত কাটিয়া গিয়াছে! তাহার সাক্ষী চলিয়া গেল, আর আসিবে না! তাই রামমণি কাঁদিতেছিল।

৫

মুখুয্যে বলিলেন, "রামমণি! কাঁদিও না; তোমাকে নূতন গোরু কিনিয়া দিব।"

রামমণি বলিল, "আমি মরিতে চলিলাম, আর নূতন গোরু লইয়া কি হইবে?"

মুখুয্যে। রামমণি! তুমি গুলি খাও নাই, তাই তোমার বুদ্ধি পাকে নাই। কর্ণরন্ধ্রে জল প্রবেশ করিলে জল দিয়া বাহির করিতে হয়। সংসারে একটা কষ্ট হইলে, আর একটা কষ্ট আনিয়া প্রথমটাকে ভুলিয়া যাইতে হয়।

রামমণি। তবে লাভ?

মুখুয্যে। জ্ঞান! অর্থাৎ শেষে বুঝিতে পারা যায় যে, গোড়ার কষ্টটা লইয়া মরিলে পুনঃপুনঃ কষ্ট সহিতে হইত না। ইহাকে অদৃষ্ট কহে।

রামমণি অত বুঝিতে পারিল না। রামমণি দেখিল, তাহার স্বামীর

চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, এবং শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামমণি মনে ব্যথা পাইল।

মুখুয্যে তাহা বুঝিতে পারিলেন।

মুখুয্যে। রামমণি! তোমারও শেষদশা, আমারও তাহাই। আমি মাহিনা পাইতাম কুড়ি, এখন পেন্সন পাই দশ। সেই দশের মধ্যে পাঁচে গুলি খাই, এবং বক্রী টাকায় ও তোমার গহনা বেচিয়া এই তিন মাস সংসার চলিতেছিল। এখন চাউলের দর বাড়িয়াছে, এবং দুগ্ধেরও সংস্থান গেল। দুধ না পাইলে আমি মরিয়া যাইব।

রামমণি অতি কাতরভাবে কাঁদিল। "এখন উপায়?"

মুখুয্যে। শ্যামকে একটা চাকুরী করিতে বল। সে বি. এ পাশ করিয়াছে। ইচ্ছা করিলে আমার চাকুরীটা করিতে পারে। সে কর্ম্মের মাহিয়ানা এখন পঞ্চাশ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্বেকার লোকগুলা গাধা ছিল, কুড়ি টাকায় চলিয়া যাইত। এখনকার অভাব পঞ্চাশ নহিলে মিটে না। অতএব কর্ত্তৃপক্ষগণ পদের মূল্য ক্রমশঃই বাড়াইতেছেন। ইহাতে ঘুস বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং অসৎ উপায়ও কেহ অবলম্বন করিবে না।

মুখোপাধ্যায়ের আয়ব্যয়ের হিসাব শ্যামচাঁদের নিকট যথাসময়ে রামমণি প্রকাশ করিয়া ফেলিল, এবং শ্যামচাঁদও যথাসময়ে সরমাসুন্দরীর নিকট প্রকাশ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আয়ব্যয়ের উপর অন্নসংস্থান নির্ভর করে, অন্নের উপর মন, এবং মনের উপর কল্পনা নির্ভর করে। বোধ হয়, শ্যামচাঁদ ও সরমা জীবনটা সোজা মনে করিয়া যে কল্পনা করিতেছিল, তাহার মধ্যে মসীবর্ণ একটা কিছুর সঞ্চার হইল।

সরমা বলিল, "এখন উপায়?"

শ্যামচাঁদ। আমাকে চাকুরী করিতে হইবে।

সরমা। তাহাই কর।

সরমা বুঝিল দুই কথা। সতীনের ভ্রাতার উপর ভরণপোষণের নিমিত্ত অবলম্বন বড় সুখের নহে, এবং তাসখেলার মাত্রা কমাইয়া অন্য কোন দিকে জীবনের কলটা ঘুরাইয়া দেওয়াও কি সহজ?

সন্ধ্যার পর মুখুয্যে জীবনের ভার দেহে ন্যস্ত করিয়া এবং দেহের ভার শয্যায় ন্যস্ত করিয়া যখন একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন প্রসিদ্ধ কালপুরুষ তাঁহার জীবন ও দেহের গ্রন্থিগুলি লইয়া ধীরে ধীরে একবার নাড়া

চাড়া করিয়া দেখিলেন। নাড়া চাড়া পাইয়া মুখুয্যে একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন, "আর দুগ্ধ আছে?"

দুগ্ধ গাভীর সহিত চলিয়া গিয়াছিল, এবং গাভীদ্বয় কালপুরুষ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। তাহা মনে পড়িতেই মুখুয্যের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মুখুয্যে ডাকিল, "রামমণি! এস ত।" রামমণি আসিল। সেই শীর্ণা বিগত-যৌবনা সাধ্বী ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল; স্বামীর অবস্থা বড় ভাল নহে।

রামমণি আবার কাঁদিল। মুখুয্যে বলিলেন "কেঁদ না, নূতন গোরু কিনিয়া দিব।" রামমণি আরও কাঁদিতে লাগিল।

৬

পূর্ব্বে আভাষ দেওয়া হইয়াছে যে, শ্যামচাঁদ ও সরমার মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, সেটা আকর্ষণও নয়, বিপ্রকর্ষণও নয়।

আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু জীবের আত্মজ্ঞান-লাভের একটা মহাবাধা "লজ্জা"। যখন রামমণির বাষ্পভারাক্রান্ত সেকালের চক্ষু দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়ের অজ্ঞাতপ্রদেশে একটা আলোক সঞ্চারিত হইয়াছিল, তখন সরমাসুন্দরী একালের কপোলে মৃণালনিন্দিত বাহুসংযোগ করিয়া লজ্জাবনত-বদনে অন্ধকার গৃহে শ্যামচাঁদের প্রবেশপ্রতীক্ষা করিতেছিল।

যথাসময়ে শ্যামচাঁদ গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া দাঁড়াইল। সরমার অঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, নাসিকায় দীর্ঘনিশ্বাস, মুখে উদাসীনতা। শ্যামচাঁদের অঙ্গে ঈষৎ শীত-লতাজড়িত কম্প, নাসিকায় ঘন ঘন নিশ্বাস, মুখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার ভাব।

কোন ভিষক্ এইরূপ অবস্থা দেখিলে মনে করিতেন, শ্যামচাঁদের জ্বর আসিতেছে, এবং সরমার জ্বর ছাড়িতেছে।

শ্যামচাঁদ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থায় বিচরণ করিয়া অবশেষে অতিকষ্টে ডাকিল, "সরমা!"

প্রথম ডাকে প্রায়ই এরূপ অবস্থায় কেহ উত্তর দেয় না। কাজেই শ্যামচাঁদ আবার বলিল, "সরমা! আমি চাকুরী লইয়াছি। আমার জীবন তোমার সেবায় উৎসর্গীকৃত করিয়াছি। আমি আর কিছু চাহি না। তুমি একবার আমাকে তোমার বলিয়া ভাব।"

বোধ হয়, কথার বাড়াবাড়ি হইল মনে করিয়া শ্যামচাঁদ একটা "ওঃ!" শব্দ করিলেন।

প্রেমিক প্রায়ই নানাবিধ ভঙ্গী করিয়া থাকে। বানর যেমন স্বীয় অস্তিত্ব-প্রচারার্থ বহুবিধ অঙ্গভঙ্গী করে, তেমনই প্রেমিকও মানসিক অঙ্গের নানারূপ বিকাশ করিয়া প্রেমের অবস্থা দেখায়। প্রেমিকাগণ নিজগুণে ইহা মার্জ্জনা করিয়া থাকেন।

কিন্তু কি জানি কেন, সরমার তাহা ভাল লাগিল না। জগতে স্ত্রীচরিত্র অতি বিচিত্র। সরমা বলিয়া বসিল, "আমার দুঃখের সময় তুমি এখানে কেন?"

শ্যামচাঁদ ভয় পাইল। ভাবে ভঙ্গীতে সে মনে করিয়াছিল যে, সরমাও তাহাকে ভালবাসে। শ্যামের প্রেমস্পন্দন আকুঞ্চিত হইয়া মস্তিষ্কে গিয়া বিচারের আশ্রয় লইল। দেওয়ানী ফৌজদারী প্রভৃতি বাধিলে বিষয়ী পুরুষ বিচারাসনের আশ্রয় লইয়া থাকে।

কিন্তু এখানে বিচারকর্ত্তা আবার শ্যাম নিজেই। শ্যাম সরমাকেই ডিক্রী দিল।

শ্যাম পুনর্ব্বার বলিল, "সরমা! লজ্জা রাখিয়া দাও; আমার মনের কথা তুমি জানিয়াছ। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি। পরস্ত্রীকে ভালবাসা দোষ, কিন্তু আমার ভালবাসা দোষের নহে। আমি তোমার নিকট কিছুই চাহি না। আমাকে যদি দূর করিয়াও দাও, তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি দুঃখ করিও না। আমাকে ভাই বলিয়া মনে করিও।"

প্রেমিকের অবস্থা ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথমে শ্যাম সরমার স্কন্ধে চাপিতে বসিয়াছিল, এখন তাড়া খাইয়া ধীরে ধীরে ভ্রাতৃস্থানীয় হইয়া পড়িল।

কিন্তু সরমা দেখিতেছিল, এক দিকে স্বামীর অন্তিমদশা, সেই অন্তিম সময়ে সাধ্বী সরলা রামমণির সহমরণের প্রজ্বলিত চিতাগ্নি, এবং অন্য দিকে তাহার ছার জীবনের বালির বাঁধ।

সুতরাং এমন সময় লজ্জা অপসৃত হইবারই কথা। প্রাণ-শক্তি উলঙ্গ-বেশে পার্থিব বসন ভূষণ দূরে ফেলিয়া সরমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সরমা স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিল।

শ্যামচাঁদ তাহাতেই ভয় পাইয়াছিল।

সরমা বলিল, "তুমি যাও। আমি অনর্থক এতদিন নরকের অগ্নিমধ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। আমি স্বামী কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছি। এবং তোমার দ্বারা দগ্ধ হইতেছি। আমার আর কোনও পদার্থ নাই। বিধাতা আমার

কপালে ইহলোকে সুখ লেখেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতের সুখ তুমি আর নষ্ট করিও না।

শ্যামচাঁদ বেগতিক দেখিয়া চলিয়া গেল। শ্যামচাঁদের এখনও বিশ্বের অনেক জানিতে বাকী ছিল। মনে করিল, "এ আবার কি?"

সরমা তখন রামমণিকে ডাকিল।

"দিদি, আমারা একই পথের পথিক। তুমি কষ্ট পাইয়া অনেক পথ হাঁটিয়াছ। আমি তোমার কষ্টনিবারণ করিতে পারিব না, কিন্তু অশ্রুজল মুছাইতে পারিব।"

তখন রামমণি সরমাকে কোলে লইয়া বলিল, "ভগবান, এ রত্নকে কেন অকূল পাথারে ভাসাইলে?"

৭

সরমার উল্লিখিত আকস্মিক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সহিত শ্যামচাঁদেরও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল।

শ্যামচাঁদ দেখিল, জগতে প্রেমের কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ নাই; সুতরাং অন্য কোনও উপায় অবলম্বন না করিয়া সে পরোপকারব্রতে ব্রতী হইল।

যাঁহারা সাহিত্যজগতে যশঃপ্রার্থী, অথচ নূতন ধরণের কবিতা কিংবা উপন্যাস লিখিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতে পারেন না, তাঁহারা সমালোচনা-ব্রত গ্রহণ করিয়া জন-সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া পড়েন। শ্যামচাঁদ সেই পথ ধরিয়া হঠাৎ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তিম সময়ে দুইটা গাভী খরিদ করিয়া দিল।

গাভী দুইটিই দুগ্ধবতী। অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ পান করিয়া মুখুযোর কান্তি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার আসন্ন অবস্থা অনেকটা ভবিষ্যতের দিকে হটিয়া গেল।

জন্ম-মৃত্যুর কোন বাঁধা নিয়ম নাই। যেখানে হওয়া উচিত নয়, সেখানে হঠাৎ পুত্রকন্যা প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, এবং যে সময় ঠিক মরা উচিত, সেই সময়ে লোকটা বাঁচিয়া উঠে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ জীবনের আশা তৃষ্ণা প্রভৃতি না মিটিলে প্রাণ বাহির হইতে চাহে। মুখুয্যের দুগ্ধের অভাবই সম্ভাবিত পতনের মুখ্য কারণ হইয়াছিল। জীবন-বৃক্ষের শুষ্কমূলে আবার খাঁটি গোদুগ্ধ সিঞ্চিত হইল। বৃক্ষশাখা হইতে আবার নবপল্লব মুকুলিত হইল। আবার আশা-ভ্রমরা উড়িয়া আসিল। অদৃষ্ট কি না করে?

সকলেই ভাবিল, অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। অর্থাৎ, অদৃষ্ট যে গতি লইয়াছিল,

তাহার বিপরীত গতি দাঁড়াইয়াছে। সকলেই ভাবিয়াছিল, মুখুয্যে মরিলে শ্যামচাঁদ যুবতী বিধবাকে বিবাহ করিয়া পতিত সংসার প্রতিপালন করিবে। রামমণি হয় ত সহমরণে যাইবে, কিংবা শুক্লবসন পরিধান করিয়া সেকালের সতীন ও একালের নবীন ভ্রাতৃবধূর সেবা করিবে ; কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। মুখুয্যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া তিন মাসের বাকী পেন্সনের জন্য দরখাস্ত করিতে গেল। এই ত্রিশ টাকায় সংসারে দীনদুঃখীর কত উপকার হয়—কত ইতিহাসের নূতন গতি দাঁড়ায়, কত ভালবাসার পুরাতন বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়।

মুখুয্যে ত্রিশ টাকা লইয়া আসিয়া গোঁফে তা দিলেন, এবং রামমণিকে নূতন কাপড় কিনিয়া দিলেন, নূতন শাঁখা গড়াইয়া দিলেন।

এই অভাবনীয় পুনর্জীবনলাভে শ্যামের অধিক কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

কিন্তু—সরমা ?

সরমার জীবনটা যেন আবার নূতন আবর্ত্তে পড়িয়া গেল। পূর্ব্বে যে দৃশ্যে সরমার মনে একটা তুমুল আন্দোলন ঘটিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইতেই সরমার দীর্ঘনিশ্বাস ঘন হইয়া আসিল, বৈরাগ্য নূতন তিলকের মনোমোহন টিপ পরিয়া প্রেমের মন্দিরে ভিক্ষা করিতে গেল ;—সরমা আকুল হইয়া পড়িল।

মুখুয্যে জ্ঞান-চক্ষে দেখিলেন যে, সরমার ভবিষ্যৎ একটা ঝটিকার দিকে হেলিয়া আছে। কিন্তু উপায় নাই। রামমণি হেন স্নেহময়ী সাধ্বীকে পায়ে ঠেলিয়া সরমার বোঝা স্কন্ধে করা শারীরিক ও মানসিক উভয় তত্ত্বেরই বিপরীত।

অপিচ মুখোপাধ্যায় দেখিলেন, দুইটা বোঝা স্কন্ধে লইয়া ভবনদী পার হওয়া সুকঠিন। কেন না, বোঝা দুইটা জড় নহে। ক্রমাগত নড়িয়া চড়িয়া হেলিয়া দুলিয়া বাহককে ত্রস্ত করিয়া তুলে। তন্মধ্যে আবার একটা গুরু ও অন্যটা লঘু।

তাই মুখোপাধ্যায় বৃহস্পতিবারের শেষে অতি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভগবানকে ডাকিলেন, "হে ভগবান ! এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর।"

সরমা তাহা শুনিল, এবং ধীরে ধীরে শ্যামচাঁদের নিকট গেল। সরমা বলিল, শ্যাম ! চল, এক দিকে যাই। যদি তুমি সঙ্গে না যাও, আমি একাকীই মরিব।"

শ্যাম যাইত না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পরোপকার-ব্রতের বোঝা ঘাড়ে করিয়া শ্যাম দেখিয়াছিল যে, জীবনে ইহা অপেক্ষা সুখ নাই। অতএব দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ ধারার একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিল।

যখন শুক্রবার প্রত্যুষে রামমণি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল, "ওগো ! সর্ব্বনাশ

হইয়াছে!" তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাণ্ড লগুড়হস্তে রামমণিকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "রামমণি! কাঁদিও না;—এটা অদৃষ্ট—কিন্তু সুখের বিষয় যে, গোরু দুইটা লইয়া যায় নাই।"

অবশিষ্ট দশ টাকা পেন্সনে রামমণিকে লইয়া মুখোপাধ্যায় নিশ্চিন্তভাবে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

দেবী।

১

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "পীড়া গুরুতর, কিন্তু চিকিৎসার অতীত নহে। তবে কিছু সময় লাগিবে। সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত সুশ্রূষাও আবশ্যক।"

কম্পিতকণ্ঠে হরিমোহন বাবু বলিলেন, "সমস্ত ভার আপনার উপর। আমার একটিমাত্র কন্যা। যাহাতে সে শীঘ্র সারিয়া উঠে, সে জন্য আপনি যেমন আদেশ করিবেন, সেবা শুশ্রূষা সেই ভাবেই চলিবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "এ সব রোগের শুশ্রূষার জন্য এক জন ভাল ধাত্রী আবশ্যক। আমি মিস্ বসুকে বলিয়া যাইতেছি। সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রসূতির কাছে থাকিতে হইবে। এ সকল কার্য্যে তাঁহার বেশ দক্ষতা আছে। সম্ভবতঃ তিনি কোন আপত্তিও করিবেন না। পীড়িতের সেবা অনেক সময় তিনি অযাচিতভাবে করিয়া থাকেন।"

রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। উষার তরুণ আলোকচ্ছটা বাতায়নপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। মুঙ্গেরের রাজপথে দুই একটি লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হরিমোহনবাবু বলিলেন, "আমার জামাই রেঙ্গুনে চাকরী করেন। তাঁহাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা আবশ্যক বিবেচনা করেন কি?"

"এখনই তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবার আবশ্যক নাই। ভগবান্ না করুন, তাঁহাকে সংবাদ দিবার প্রয়োজন হইলে আমি পূর্ব্বেই আপনাদের বলিব।"

ডাক্তার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

২

দীর্ঘ দিনগুলি কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এবং কখন রাত্রির পর প্রভাত ও প্রভাতের পর আবার রাত্রি আসিতেছিল, মৃণালিনীর তাহা জানিবার শক্তি ছিল না।

কোনও কোনও রোগে অবস্থাবিশেষে সমস্ত ইন্দ্রিয় একটা স্বপ্নে, একটা তন্দ্রাজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানের উপর এমন একটা যবনিকা পড়িয়া যায় যে, রোগীর দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি কিছুতেই সেই স্বপ্নজাল হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না।

মৃণালিনী কেবল স্বপ্ন দেখিত। স্বপ্নের পর স্বপ্ন—বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন, অর্থহীন স্বপ্ন! সেই স্বপ্নে সে দেখিতে পাইত, যেন এক স্নেহময়ী দেবীমূর্ত্তি নিরন্তর তাহার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেছেন। তাঁহার সুন্দর মুখে সেবাপরায়ণা মাতৃ-মূর্ত্তির অপূর্ব্বশ্রী; সুধাস্নিগ্ধ স্বরে করুণা উছলিয়া উঠিতেছে।

স্বপ্নের পর গাঢ় নিদ্রা, তার পর কি শান্তিপূর্ণ জাগরণ! মৃণালিনী চাহিয়া দেখিল, সে তাহারই পরিচিত শয়নকক্ষে শয়ানা।

গৃহমধ্যে টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে। সেই প্রজ্বলিত দীপাধারের সম্মুখে আনতমুখে তাহারই স্বপ্নদৃষ্ট রমণীমূর্ত্তি উপবিষ্ট। মৃণালিনী তাহার দুর্ব্বল শীর্ণ হাত দুইখানি তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিল। এখনও কি তাহার দৃষ্টির উপর স্বপ্নের ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?

অলঙ্কারনিক্কণ শুনিয়া অধ্যয়নরতা রমণী রুগ্নার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ধাত্রী মিস্ বসু বলিলেন, "এখন কি একটু সুস্থ বোধ হইতেছে?"

মৃণালিনী তাহার শীর্ণ হস্তের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমার কি ভারি অসুখ করেছিল? কতক্ষণ আমি অজ্ঞান ছিলাম?"

ধাত্রী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আজ পনের দিনের পর আপনার চৈতন্য হইয়াছে। একবার হাতটা দিন ত দেখি।"

মিস্ বসু নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পনের দিন! এত দিন তার জ্ঞান ছিল না! ঘুরিয়া ফিরিয়া মৃণালিনীর দৃষ্টি তাহার বিস্তৃত শয্যাপার্শ্বে এক রাশি মল্লিকা ফুলের মত একটি ক্ষুদ্র ঘুমন্ত শিশুর উপর স্থাপিত হইল। অমনই একটা বিচিত্র বেদনা, অপূর্ব্ব রাগিণী তাহার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অনিমেষ নয়নের স্নিগ্ধ উৎফুল্ল দৃষ্টি

খোকার প্রত্যেক অঙ্গ যেন আলিঙ্গন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার সকল কথা স্মরণ হইল। এক দিন গভীর রাত্রে একটা তীব্র বেদনায় তাহার সমুদয় ইন্দ্রিয় অভিভূত হইয়াছিল; প্রদীপের আলো চক্ষের উপর হইতে নিভিয়া গিয়াছিল; সে কথা এখন তাহার বেশ মনে পড়িল।

মৃণালিনী সবিস্ময়ে বলিল, "এই পনের দিন তবে আপনি দিনরাত আমার পাশে বসিয়া ছিলেন! আমি স্বপ্নে কেবল একটি দেবীমূর্ত্তি দেখিয়াছি। সে সব তা হ'লে মিথ্যা নয়?"

একটা পাত্রে ঔষধ ঢালিয়া মিস্ বসু বলিলেন, "এই ঔষধটা খাইয়া আর একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করুন। আজ আর বেশী কথা কহিবেন না। বোধ হয়, জ্বর আর আসিবে না।"

মৃণালিনী ধীরে ধীরে খোকার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইল।

৩

দিন দিন মৃণালিনী আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। তাহার রক্তহীন পাণ্ডুর কপোলে স্বাস্থ্যের কোমল আভা আবার ফিরিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এখনও সে শয্যা ছাড়িয়া বেশী দূর যাইতে পারে না।

মিস্ বসু প্রত্যহ মধ্যাহ্নে তাহার কাছে আসিতেন। গল্প গুজবে হাস্য গানে তিনি মৃণালিনীর অবসন্ন হৃদয়তন্ত্রীতে একটা আনন্দের সুর বাঁধিয়া দিতেন।

এই নবপরিচিত স্নিগ্ধমূর্ত্তি যুবতীর স্নিগ্ধ হাস্যে, অপরূপ স্নেহে, সুসঙ্গত শ্রুতিমধুর কথোপকথনের বিচিত্র মোহে অল্পদিনের মধ্যেই মৃণালিনী এত আকৃষ্ট আবিষ্ট হইয়া পড়িল যে, কোনদিন তাঁহার আসিতে এতটুকু বিলম্ব হইয়া গেলে সে উন্মনা হইয়া জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার সে সময় আর কোন কাজ, আর কোন কথা ভাল লাগিত না।

তাঁহার হাস্য, তাঁহার গল্প, তাঁহার সঙ্গীত ও পুস্তকপাঠের ভঙ্গি, সবই মৃণালিনীর বিচিত্র বলিয়া বোধ হইত। এমন ভাবে আর কেহ যেন হাসিতে পারে না, এমন মধুর ভাষায় আর কেহ যেন গল্পও করিতে জানে না। আর তাঁহার সঙ্গীত? এমন গান সে পূর্ব্বে আর কখনও শোনে নাই। হারমোনিয়মে সুর দিয়া যখন মিস্ বসু গান গাহিতেন, তখন মৃণালিনীর বোধ হইত, সে যেন আর একটা অভিনব রাজ্যের স্বপ্নলোকে গিয়া পড়িয়াছে। সে সঙ্গীতে প্রেমের মান অভিমান আদানপ্রদানের কোন কথা, নিরাশ প্রণয়ের করুণ ক্রন্দনের বা ব্যর্থ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘশ্বাস নাই। সে সঙ্গীতের সুরে সুরে

কেবল একটা মহাবৈরাগ্যের উদাস ভাব ঝঙ্কার তুলিয়া ফিরিত। একটা আকুল আবেদন—ব্যর্থ জীবন কর্ম্মপ্রবাহে ঢালিয়া দিয়া সেই অনন্ত অপরিজ্ঞেয় চিররহস্যময় মহাদেবের চরণতলে শান্তিলাভের সাগ্রহ প্রার্থনা রাগিণীর ছন্দে ছন্দে নাচিয়া উঠিত। সে সঙ্গীত কি প্রাণস্পর্শী, কি অমৃতময়!

গান গাহিবার সময় গায়িকার নেত্র ঈষৎ নিমীলিত হইয়া আসিত। দীপ্ত মুখমণ্ডল করুণায় মহিমায় সৌন্দর্য্যে প্রেমে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

সঙ্গীতের শেষ তান শেষ ঝঙ্কার লীন হইয়া গেলে, মোহাবিষ্টার মত উভয়ে ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিত। তার পর মৃণালিনী হয় ত জিজ্ঞাসা করিত, "আপনি বিবাহ করেন না কেন? বয়স ত আপনার বেশী হয় নাই। চিরকাল কি এমনই ভাবেই কাটিবে?"

মিস্ বসু হাসিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেন। হয় ত একখানা নবপ্রকাশিত মাসিকপত্রের একটা ছোট গল্প পড়িয়া শুনাইতেন। কখনও বা মৃণালের শিশুটিকে কোলে তুলিয়া নাচাইতেন। বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন, "সংসারবন্ধনে যদি কোন সুখ থাকে, তবে তাহা ইহাতে। বুকের জ্বালা এমন আর কোন জিনিসে জুড়ায় না।"

৪

"ধিন্ ধিন্ ধিন, খোকন্ নাচে ধিন্!"

সঙ্গে সঙ্গে খোকাবাবু বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলিয়া দুলিয়া টলিয়া টলিয়া নাচিতেছিল। নাচিতে নাচিতে কখনও ভূমিতলে পড়িয়া যাইতেছিল, আবার উঠিয়া সেই স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠের মধুর সুরের তালে তালে নৃত্য করিতেছিল।

খোকার মা জানালার ধারে বসিয়া চৈত্রের বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল সান্ধ্য আকাশ পানে চাহিয়াছিল। তাহার শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

দেড়বৎসরের খোকা হাসির লহর তুলিয়া কখনও মিস্ বসুর স্নেহাতুর বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, কখনও বা দূরে সরিয়া বসিয়া, উদার শান্ত চক্ষু দুটি তুলিয়া সকৌতুকে চাহিয়া দেখিতেছিল। মিস্ বসু অতৃপ্তনয়নে তাহার রুচিমুখের সৌন্দর্য্য, নব-নবনীততুল্য তনুর কমনীয়তা ও উচ্ছ্বসিত কলহাস্য পরম আনন্দে উপভোগ করিতেছিলেন।

শিশুর মত মায়াবী সংসারে আর কেহ নাই। বন্ধনহীন বিদ্রোহী হৃদয়কে শিশুর সরল হাস্য অলক্ষ্যে আবার কর্ম্মবন্ধনে সহজে ফিরাইয়া আনিতে পারে; শোকার্ত্তের সন্তপ্ত প্রাণের জ্বালা স্নিগ্ধ মোহস্পর্শে শীতল করিয়া দেয়।

মৃণাল কি বলিতে যাইতেছিল। এমন সময় দ্বাদশবর্ষীয় বালক মোহিতচন্দ্র ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বলিল, "দিদি, মা তোমাকে ডাক্‌ছেন, শীঘ্র যাও। নরেন বাবু এসেছেন।"

মৃণালিনীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধহাস্য অধরপ্রান্তে চাপিয়া সলজ্জকণ্ঠে সে বলিল, "দিদি, আপনি একটু বসুন, আমি শুনে আসি।"

মিস্ বসু বলিলেন, "কে এসেছেন, বল্‌লে, মোহিত বাবু?"

"নরেন বাবু। আপনি তাঁকে চেনেন না বুঝি? তিনি আমাদের জামাই বাবু,—দিদির বর। এই দেখুন তাঁর ছবি।"

মোহিতচন্দ্র সহর্ষে, হাত উঁচু করিয়া ফটোখানা তাঁহার সম্মুখে ধরিল।

"নরেন বাবু রেঙ্গুন থেকে ফটো তুলে এনেছেন। আমি একখানা কেড়ে নিয়েছি।"

কম্পিতহস্তে মিস্ বসু ফটোখানা ফিরাইয়া দিলেন। বালক সোৎসাহে বলিল, "কেমন সুন্দর ফটো, না? যাই, আমি মাকে দেখাইগে।"

বালক দৌড়িয়া চলিয়া গেল।

মিস্ বসু দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া জানালার ধারে সরিয়া গেলেন। জানালার গরাদে ধরিয়া অনিমেষনয়নে শব্দপূর্ণ তিমিরমগ্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

খোকার ক্রন্দন শুনিয়া মৃণালিনী ফিরিয়া আসিল। পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া সে ডাকিল, "দিদি!"

মিস্ বসু ফিরিয়া চাহিলেন। মৃণাল চমকিয়া উঠিল। মিস্ বসুর মুখ এমন বিবর্ণ!

"আপনার অসুখ করেছে নাকি? মাকে ডাকি।"

দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ক্লিষ্টস্বরে মিস্ বসু বলিলেন, "না না, দাঁড়াও। মাঝে মাঝে আমার বুকে একটা বেদনা ধরে; সেই বেদনাটা ধরেছিল। এখন সেরে গেছে।"

মৃণালিনী পাখা হইয়া মিস্ বসুকে বাতাস করিতে লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধাত্রী বলিলেন, "থাক্, এখন সুস্থ হয়েছি। তুমি একখানা গাড়ী আনাইয়া দাও। এখন আবার রমেশবাবুর বাড়ী যেতে হবে।"

মৃণাল বলিল, "কাল আসবেন ত?"

মিস্ বসু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমায় বল্‌তে ভুলে গেছি, কাল আমার গয়ায় যাবার কথা আছে। যদি যাওয়া হয়, তা হ'লে পনের ষোল দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।"

৫

স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। পাখা করিতে করিতে মৃণালিনী বলিল, "তা তুমি যাই বল না কেন, এ কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আমার এত বড় অসুখ শুনেও তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলে। আমার চেয়ে তোমার কাজ বড়। যদি আমি মরে যেতুম ?"

অভিমানে মৃণালের রক্তাভ ওষ্ঠদ্বয় আকুঞ্চিত হইল। প্রায় প্রত্যহই সে এমনই করিয়া স্বামীর কর্ত্তব্যশৈথিল্যের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া একটু তৃপ্তিবোধ করিত।

এ কথার উত্তর ছিল; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ পত্নীর উচ্ছ্বাসে বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেন না। এবং চাকরীর কর্ত্তব্য বজায় রাখিতে গিয়া স্ত্রীর প্রতি খানিকটা যে অবিচার করিতে হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার হৃদয়ে পুনঃপুনঃ আঘাত করিত। নরেন্দ্র অন্য দিনের মত অভিযোগের তীক্ষ্ণ শরাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন।

মৃণালিনী তাহাতেও ছাড়িবার মেয়ে নয়। সে বলিল, "ও চাকরী তোমায় ছেড়ে দিতে হবে। কেন, তোমার কিসের অভাব ? শ্বশুরঠাকুর যে টাকা রেখে গেছেন, তাতে দু তিন শ' টাকা মাইনের অমন দুটো চাকর তুমিই রাখতে পার। ছাই টাকার জন্য তুমি আর চিরকাল বিদেশে থাক্‌তে পাবে না।"

নরেন্দ্র অন্যমনে বলিলেন, "আমিও তাই ভাবছি। একবার সাহেবকে বলে দেখব, যদি আমায় এ দেশে কোথাও বদ্‌লী করেন ভাল, নইলে মিথ্যা আর বিদেশে পড়িয়া থাকিব না।"

মৃণাল বলিল, "এখন ত আর শুধু তুমি আর আমি নই। খোকা ক্রমে বড় হইতে চলিল,—তার কথাও ত ভাবিতে হয়।"

দাঁড়ে বসিয়া কাকাতুয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া মধ্যাহ্নের বিজনতা ভঙ্গ করিতেছিল। নরেন্দ্র নিমীলিতনয়নে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পত্নী স্বামীর চিন্তাগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বাতাস করিতেছিল।

ঝি আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, মা তোমায় ডাক্‌ছেন।"

মৃণাল উঠিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া, স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া মৃণালিনী বলিল, "এখন আর ঘুমুতে হবে না। চল, মিস্ বসুর বাড়ীতে যাই। তুমি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে।"

নরেন্দ্র সকৌতূহলে হাস্যমুখে বলিলেন, "মিস্ বসু আবার কে? তাঁকে আবার কোথা থেকে জোটালে?"

মৃণালিনী বলিল, "তোমায় বলি নাই,—আমার অসুখের সময় এক জন ধাত্রী দিনরাত আমার সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন? তিনি সে রকম যত্ন না করলে ফিরে এসে তুমি আর আমায় দেখতে পেতে না। এমন মেয়ে আমি কোথাও দেখি নাই। তাঁর নাকি বড় অসুখ। তিনি আমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নরেন্দ্র বলিলেন, "এ কথা আগে বলতে হয়। তোমার এখনই যাওয়া উচিত।"

মৃণাল বলিল, "আমি জানতুম, তিনি তিনি গয়ায় গেছেন। কিন্তু তা নয়। এখান থেকে গিয়ে অবধি তাঁর অসুখ। সে আজ ষোল সতের দিনের কথা।"

স্বামী বলিলেন, "তবে আর দেরী করো না। আমি গাড়ী ঠিক করতে বলে' আসি।"

৬

ঝির কোলে খোকাকে দিয়া মৃণালিনী উপরে চলিয়া গেল। ভৃত্য নরেন্দ্রনাথকে মিস্ বসুর ড্রয়িং রুম দেখাইয়া দিল।

তখন কিছু বেলা আছে। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া সন্ধ্যার সুবর্ণসূর্য্যের শেষ রশ্মি গৃহমধ্যস্থ আস্‌বাবে পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। একটি সুদৃশ্য টেবিলের উপর খানকয়েক সযত্নরক্ষিত পুস্তক, একটা দোয়াতদান, কয়েকটা কলম ও ফ্রেমে আঁটা একখানা ফটো।

নরেন্দ্র চেয়ারে বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া মুক্তবাতায়নপথে উদাসদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলেন।—বাহিরে রাজপথ, তাহার পার্শ্বে প্রান্তর, দূরস্থ বৃক্ষশ্রেণী ও ঘননীল আকাশ এক নিমিষে দেখিয়া দৃষ্টি আবার গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিল।

নরেন্দ্র অন্যমনে বাঁধান ফটোখানি তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। সময়ের প্রভাবে চিত্রখানি কিছু ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, বুঝি তেমন স্পষ্ট দেখা যাইতে-ছিল না। রুমালে চশ্‌মা মুছিয়া লইয়া নরেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার স্বভাবগম্ভীর মুখের উপর যেন মেঘ করিয়া আসিল। ধীরে

ধীরে ফটোখানি রাখিয়া তিনি জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরের বাতাস আসিয়া তাঁহার স্বেদাপ্লুত তপ্তললাটে কোমল স্নিগ্ধ স্পর্শ ঢালিয়া দিয়া গেল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যখন শ্রান্তিবোধ হইল, তখন নরেন্দ্র ধীরে ধীরে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। একখানা বহি খুলিয়া বিক্ষিপ্ত মনটাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় একটা নাম লেখা, অক্ষরের কালি বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বহিখানি টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শরবিদ্ধ মৃগের মত তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি কোথায় আসিয়াছেন? দীপালোকে মানুষ কি স্বপ্ন দেখে?

এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। মৃণালিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "ওগো, শীঘ্র উপরে এস, দিদি কেমন করিতেছেন!"

দ্বারবানকে ডাক্তার আনিতে আদেশ দিয়া নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ পত্নীর সহিত উপরে উঠিয়া গেলেন।

ঘরের সকল জানালা দরজা রুদ্ধ। টেবিলের উপর একটা আলোক জ্বলিতেছে।

মৃণালিনী মিস্ বসুর নিকটে গিয়া ভীতকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি! নিশ্বাস পড়ছে না যে? শীঘ্র এ দিকে এস!"

নরেন্দ্র কিছু দিন চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, রোগীর মূর্চ্ছা হইয়াছে। পত্নীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি খানিকটা দুধ গরম ক'রে নিয়ে এস। বড় দুর্ব্বল হযে পড়েছেন দেখছি।"

মৃণালিনী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

রুগ্নাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য নরেন্দ্র আলোকশিখা আরও উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তার পর ধীরে ধীরে তিনি শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

উজ্জ্বল আলোকরশ্মি রোগীর সর্ব্বদেহে পড়িয়াছিল। তাঁহার আলুলায়িত কেশভার অযত্নবিক্ষিপ্ত, শোভন মুখখানি রোগের পাণ্ডুর রাগে মলিন। যৌবনের নিটোল সৌন্দর্য্যের উপর পীড়ার এইরূপ সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণ দেখিয়া নিমেষমধ্যে নরেন্দ্রের চক্ষু পলকহীন হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। একটা প্রবল আঘাতে তাঁহার সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল।

নরেন্দ্র দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিলেন। একটা তীব্র আর্ত্তনাদ তাঁহার বুকের মধ্যে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

রূঢ় আলোকস্পর্শেই হউক, বা স্বভাববশেই হউক, রোগীর চেতনা তখন ফিরিয়া আসিতেছিল। মিস্ বসু চক্ষু উন্মীলিত করিলেন।

এক জন অপরিচিত যুবককে সেই অবস্থায় আপনার শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রথমতঃ তিনি চকিত হইলেন। পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি! তুমি!"

সমুদয় হৃদয় মন্থন করিয়া সেই বেদনারুদ্ধ স্বর যেন কক্ষমধ্যে কাঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দুই জানু নত করিয়া নরেন্দ্র রোগীর শীর্ণ শীতল বামহস্তখানি তাঁহার অগ্নিময় দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া উন্মত্তের মত বলিলেন, "অমিয়া, অমিয়া, আমার অপরাধের মার্জ্জনা নাই। তোমার সহিত যে নৃশংস ব্যবহার করিয়াছি, সংসারের কোন শাস্তিই তাহার উপযুক্ত নহে।" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত আবেগে নরেন্দ্রের বাক্য রুদ্ধ হইল। ক্ষীণকণ্ঠে মিস্ বসু বলিলেন, "তুমি অপরাধী, এ কথা আমি কখনও মনে করি নাই।" ধীরে ধীরে মিস্ বসু নরেন্দ্রের হস্ত হইতে আপনার হস্ত বিমুক্ত করিয়া লইলেন।

এমন সময় মৃণালিনী দুগ্ধপাত্র লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উত্তেজিতস্বরে পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস, আমার জীবনের যে গূঢ় মসীলিপ্ত অংশ তোমার কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লও। শুন মৃণাল, ইনি তোমার সপত্নী। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, পাঠ্যাবস্থায় আমার কিছু ব্রাহ্মধরণ হইয়াছিল। সেই সময় পিতার অজ্ঞাতসারে ইহাঁকে বিবাহ করিয়াছিলাম। অতুল সম্পত্তির লোভে পড়িয়া, বন্ধুদের পরামর্শে আমার দুর্ব্বল মন টলিয়া গেল। সম্পত্তি হারাইবার ভয়ে ও পিতার অভিপ্রায়মত এক ধর্ম্মপত্নীর বিনিময়ে আর এক ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিলাম। কিন্তু মনের শান্তি জন্মের মত ঘুচিয়া গেল। তাই বিদেশে বিদেশে কক্ষচ্যুত উল্কার মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আর আমার ক্ষমা চাহিবার সাহস হইতেছে না। তুমি উহাঁর চরণ ধরিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া লও।"

তীব্র বেদনাভরে মৃণালিনীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু সাধ্বী হৃদয়ের সমস্ত বল একত্র করিয়া সে আঘাত সহ্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অকম্পিতপদে শয্যাপ্রান্তে নতজানু হইয়া রুগ্নার চরণযুগল মাথায় তুলিয়া মৃণালিনী

বলিল, "দিদি, তুমি একবার আমায় মরণের মুখ হইতে কাড়িয়া আনিয়াছ, এখন বাঁচাও, ক্ষমা কর, আশীর্ব্বাদ কর।"

ধাত্রীর স্তিমিত নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু উদ্গত হইল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মিস্ বসু বলিলেন, "তিনি অবশ্য ক্ষমা করিবেন। আমি প্রতিদিন তাঁহার কাছে এই প্রার্থনাই করিয়াছি। তোমরা সুখী হও। দে বোন্, খোকাকে এখন একবার আমার বুকে আনিয়া দে।"

মৃণালিনী কাঁদিয়া উঠিল।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

মুঙ্গেরে গঙ্গাতরঙ্গমুখর শান্ত উপবনপ্রান্তে এক মর্ম্মরময় সমাধিস্তম্ভ। ঘনীভূত জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র ও সুন্দর। তাহার শীর্ষদেশে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল ওঁকার মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সমাধিলিপির শিখরদেশে শরবিদ্ধহৃদয় কপোতের ছবি। তাহার নীচে কমল ও কুমুদমাল্যের বেষ্টনমধ্যে লিখিত,

"টুটিয়া গিয়াছে তব বিষাদ-বন্ধন
সায়াহ্নপদ্মের শীর্ণ দলরাজি সম ;
পবিত্র জীবনসিন্ধু করিয়া মন্থন
পেয়েছ কি প্রেমরত্ন নিত্য নিরুপম !
মৃত্যু-মাঝে লভিয়াছ আনন্দ-অমৃত,—
বিশ্বপ্রাণে শান্তিমগ্ন, আপনাবিস্মৃত।"

বসন্তের পূর্ণিমারজনীতে জ্যোৎস্নালোকে যখন চারি দিক হাসিয়া উঠিত, পুষ্পগন্ধে যখন বাতাস শ্রান্ত হইয়া পড়িত, এবং একটা উদার অনবদ্য মঙ্গল-মধুর মহিমশ্রীতে চরাচর পরিপূর্ণ হইত, সেই সময় প্রতিবৎসর তিন জন তীর্থযাত্রী এই সমাধিস্তম্ভের পাদমূলে ভক্তিভরে অবনত হইত। অশ্রুশিশিরসিক্ত পুষ্পভারে ও পদ্মমুকুটে সজ্জিত মর্ম্মরসমাধি চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইত।

সহযোগী সাহিত্য।

রাজপুতানী।

পঞ্চনদের পুণ্য সলিলে
শোভন শ্যামল দেশ,
কনকশস্যে কুসুম-হাস্যে
খচিত ধরার কেশ।

সে দেশে আছিল রাজপুতবীর,
সর্ব্বজনের পূজ্য,
চিরজয়ী রণে ভীষণকর্ম্মা.
প্রতাপে নিদাঘসূর্য্য।
সমবিক্রম রাজপুত আর
সে দেশে ছিল না কেউ,
বীর-গণনে প্রথমগণ্য
শূরেশ 'সূরয দেউ'।
আছিল তাঁহার অবিচল প্রেম
বন্ধুজনের' পরে;
ভয়বিহ্বল অরাতিবৃন্দ
সতত কাঁপিত ডরে

যবন-সৈন্য-বন্যায় দেশ
সহসা হইল মগ্ন,
ধূলিলুণ্ঠিত মন্দিরচূড়া,
নগরপ্রাচীর ভগ্ন।
উখাড়ি' উজাড়ি' নগর পল্লী
ছুটিল যবনস্রোত,
পুরবাসী সবে বিকল বিভল,
বন্যায় ওতপ্রোত।

স্বরয দেহুর ছিল না কোথাও
তোরণ প্রাচীর পুর,
অম্বরতলে সমরশিবিরে
বিরাম লভিত শূর।
তুরগপৃষ্ঠ রাজাসন তাঁর,
রাজবেশ বীরবর্ম্ম ;
হাজার যোদ্ধা রাজপারিষদ—
অদ্ভুত রাজধর্ম্ম !
উন্নত শিরে ধরিত না বীর
মণিমণ্ডিত তাজ ;
লৌহকিরীটে রাজমহিমায়
শোভিত স্বরযরাজ।
বজ্রকঠিন তলবার তাঁর
অপরূপ রাজদণ্ড ;—
শত্রুনাশন, দুষ্টশাসন,
অতি উজ্জ্বল, চণ্ড !
"স্বরযকি জয়," "আল্লাহো" রব
অসি ঝঙ্কার সহ
কত মেঘময়ী নিশীথিনী গত
নিদারুণ ভয়াবহ !
স্তম্ভিত-মেঘমুক্ত-অশনি-
সদৃশ স্বরয শূর,
বাহুবিক্রমে যবন-দর্প
করিতে লাগিল চূর।
স্বরযের রাণী গুণবতী নীলা
নিজকরতলে তুলি'
অঙ্গে আঁটিল যে বীরবর্ম্ম,
অরাতির তীর, গুলি
পড়ি সে বর্ম্মে বৃষ্টির মত
প্রতিদিন হ'ল ব্যর্থ ;

বীরের বিনাশ সাধনিল শেষে
নারকীর নীচ স্বার্থ!

বহু রণশেষে পাইল যবন
অরাতি-নিপাত-পন্থা ;
সুপ্ত সিংহে বাঁধিল কিরাত ;—
হারে বিশ্বাসহন্তা!
অসহ কঠিন পরাজয়গ্লানি
দর্পে করিতে দূর
দরবারে বসি' খাঁ সুরীফ্ কহে—
কুটিল কঠিন ক্রূর,—
"বাঁচিবার সাধ যদি থাকে মনে
লহ ইসলাম-ধর্ম্ম,
নহিলে মৃত্যু ভীষণ কঠিন
দগ্ধ করিবে মর্ম্ম।"
ঈষৎ হাসিল সাহসী সুরয
সুরীফের পানে চাহি,
"জান নাকি মূঢ়! এ হৃদয়ে মোর
কভু ভয়লেশ নাহি!
"যত পার কর কঠিন পীড়ন,
ক্লেশ দাও যথাসাধ্য,
মুহূর্ত্তের তরে এ হৃদয় মম
হবে না কাহারো বাধ্য।
"লাঞ্ছনা সুখে করিব বহন,
সহিব হৃদয়-তাপ.
দেবতারে তোর, অন্তিমবাণী
বরষিবে অভিশাপ।"
ঘোর লাঞ্ছনা দারুণ পীড়নে
জর্জ্জর বীর দেহ ;

বীরের আননে বেদনার বাণী
কভু না শুনিল কেহ।

বার্ত্তা আসিল ক্ষত্রশিবিরে—
"সূরয যবন-বন্দী;
পূর্ণ করেছে কুকুর সুরীফ্
আপনার অভিসন্ধি
পিঞ্জরে বাঁধি রেখেছে তাঁহারে
হিংস্র পশুর মত,
ঘোর অপমান, হীন উপহাস
চলিয়াছে অবিরত।
মহা উল্লাসে ঘিরি চারিধার
যত কাপুরুষ সৈন্য
অতি কৌতুকে করিতেছে ভোগ
বীরের দারুণ দৈন্য!"
মরণোৎসাহে গর্জ্জি' উঠিল
শত রাজপুত শিপাহী,
"বন্দী সূরয, রাজপুতপতি!"—
বারতা মর্ম্ম-প্রদাহী!
ঝলসিল শত শাণিত কৃপাণ,
ক্রোধে কম্পিত অঙ্গ;
তুরগপৃষ্ঠে বিদ্যুৎবেগে
প্রধাবিত সেনাসঙ্ঘ।

বিষাদিনী নীলা কহিল না কারে
পতির মুক্তি লাগিয়া,
দেবর দোঁহারে দৃপ্ত বচনে
সুধা'ল বিরলে ডাকিয়া।
"শুন মোর বাণী, চল দেখাইয়া
শত্রু-শিবির-পথ

কৌশলে আজি হইবে পূর্ণ
রমণীর মনোরথ।
রমণীর প্রেম, ছলনা, করেছে
সকল বিঘ্ন জয় ;
শত শত যোধ হবে পরাজিত,
প্রেম সে অকুতোভয়।
যদি এ অসীম প্রেমের শকতি
রাখিতে না পারে নাথে,
রাজপুতানীও পতিচিতানলে
মরিবে তাঁহারি সাথে।”
এত বলি' বালা কুন্তল হ'তে
খুলিল মুকুতা-হার,—
কাশ্মীরজাত দ্রাক্ষার মত
বৃহৎ,—সুষমাসার।
কমলমুকুলকোমল বক্ষ
স্বর্ণনিচোলে আবরি,
রঞ্জিত পদে মঞ্জীর বাঁধি'
সাজিলা নবীনা নাগরী !
নটিনীর সাজে তনু আবরিত,
হৃদয়ে রাণীর মহিমা ;
বিমল ললাট কঠিন, রুক্ষ,
নয়নে বিষাদকালিমা।
বেশভূষা সারি' রাজপুতনারী
তুরগ-পৃষ্ঠে উঠিয়া
ধাইল সবেগে শত্রুশিবিরে
উল্কার মত ছুটিয়া।
নটিনী-বসন-ভূষণে নবীনা
নর্ত্তকী, মনোহারিকা,
নটিনী-স্বপ্ন-অতীত ভূষণ—
হৃদয়ে গুপ্ত ছুরিকা।

পিঞ্জর মাঝে বদ্ধ হৃদয়—
নয়ন অনলপূর্ণ,
কঠিন পীড়নে করিছে শক্র
সে বীর-শরীর চূর্ণ।
মহা উল্লাসে ঘিরি' চারিধার
যত কাপুরুষ সৈন্য,
অতি কৌতুকে করিতেছে ভোগ
বীরের দারুণ দৈন্য!
ঘোর লাঞ্ছনা, ভীষণ পীড়নে
জর্জ্জর বর দেহ,
বীরের বদনে বেদনার বাণী
কভু না শুনিল কেহ।
আহত সিংহে রাখিয়া যেমতি
ফিরে কুক্কুরপাল,
ফিরি গেল যত যবন সৈন্য
হেরিয়া 'আজান্' কাল।
অনশনে গেল দগ্ধ দিবস,
ধূম্র গোধূলিকালে
নির্ভীক বীর রহিল পড়িয়া
মণ্ডিত ধূলিজালে।

হর-শির-শোভা চন্দ্র উদিত
উজলি' গগনদেশ;
ভাবে মনে মনে, "মম এ জীবন
অচিরে হইবে শেষ!
অচিরে মরণ মঙ্গল মম,
নীলা যদি শুধু জানিত—
কে নটিনী গায় পরিচিত তানে?
সঙ্গীত সুধা-স্বনিত!

'প্রেমে ভয়ে ওই পিঞ্জরতলে
কাঁপিছে কোমল রাগিণী—
বিদায়ে অমনি গেয়েছিল নীলা—
কি করিছে হোথা নটিনী ?
কোথায় পেয়েছে নীলার কণ্ঠ,
সুধাঝঙ্কৃত তান !
নীলা কি সেজেছে নর্ত্তকীবেশে ?—
নর্ত্তকী ! গাহ গান !"
"হায়, প্রাণনাথ !"—কাঁপিল কণ্ঠ
"দাসী নীলা তব চরণে,
জীবনে তোমার চির-অনুগামী,
সঙ্গিনী তব মরণে !
ধীরে কথা কও, শুনিবে প্রহরী,—
আজি এ নিশির অঙ্কে
ইহলোক হ'তে যাও যদি নাথ !
সুরীফ যাইবে সঙ্গে।"
চুম্বিল চারু করপল্লব,
অধরে ভাসিল হাস্য,
সহসা মরণ-তিমির ঢাকিল
বীরের উজল আস্য।
পতিমুখ পানে চাহিয়া সাধ্বী
কহিলা, "দাসীরে ভুল না,
মহাপথে তব হব সঙ্গিনী"—
কোথা এ প্রেমের তুলনা !

চলে রাজরাণী ; সুধাল প্রহরী,
"কে যাও, কিসের লাগি' ?"
"নর্ত্তকী আমি, যাব দরবারে,
যাঁর দরশন মাগি

সুধাও সাহেবে, যদি কৃপা হয়,
শুনাইয়া যাব গান।”
আমোদমত্ত সেনানী সুরীফ্
করিল আদেশদান।

বহিছে শিবিরে মদিরা-প্রবাহ;
সুরাপ্রমত্ত সেনানী ;
পশিল সভায় মন্থরগতি
সুন্দরী রাজপুতানী
ছলিছে শ্মশ্রু যবন-আননে,
হরষে বিভোর চিত্ত।
গাহিয়া গাহিয়া নাচিছে নটিনী
মধুর ‘মধুপ’ নৃত্য !
ছলিছে অলকে কুসুমকলিকা
কপোল গোলাপগণ্ডী রে !
“রিণিকি ঝিনিকি রুণ্ ঝুণ্ ঝুণ্”
গুঞ্জন ঘন মঞ্জীরে !
“পীরিতি বনের পিয়াসী মধুপ আমার পরাণবঁধু,
চম্পক আমি সোনার বরণ পীরিতি মরম-মধু !”
হেলিছে অঙ্গ রূপতরঙ্গ,
নাচিছে মদনমোহিনী,
কি সুধা-হাস্য বিলাস-লাস্য !
কি দিঠি মরমদাহিনী !
কি সুর-সৃষ্টি ! কি গীত-বৃষ্টি !
সুধা কি পড়িছে গলিয়া ?
সুরাপ্রমত্ত যবন-চিত্তে
অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া !
অঙ্গুলি হ’তে অঙ্গুরী খুলি
সহসা হরষে শিহরি’
কহিল যবন, “খোদার কসম্ !
সুন্দরী তুমি সুন্দরী !

অঙ্গুরী লহ, চল মোর সহ,
দিব আশাতীত অর্থ,
বিরামসময়ে শুনিব গীতিকা,—
মিনতি ক'র না ব্যর্থ।"

পলকে যবন চাহিয়া দেখিল
শিবির সুদূর ক্ষেত্র,
রাণী আঁখি'পরে জ্বলিতে লাগিল
লালসাতৃষিত নেত্র।
আঁখি নিমীলিত রাজপুতানীর
নিরখি' নিলাজ নৃত্য,
আর কি সে আঁখি কভু নিরখিবে
শোভন ভুবন-চিত্র?
চকিতে যুবতী চুমিলা যবনে,
চুম্ব প্রথম শেষ,
তীখন ছুরীর খর-চুম্বনে
ভিন্ন হৃদয়দেশ!
লুণ্ঠিত তনু রাণীর চরণে,
রুধিররুদ্ধ কণ্ঠ।
মরম-লগ্ন ছুরিকা কাঁপিছে,
পাপের কি ঘোর দণ্ড!
কৃপাণমুষ্টি চাহিল ধরিতে
ব্যথা-চঞ্চল হস্তে,
বিফল যত্ন, জীবন-সূর্য্য
চলিয়াছে চির-অস্তে!
মণিমণ্ডিত কোষ হ'তে রাণী
কৃপাণ লইল খুলিয়া,
বিদ্যুৎসম উদ্যত অসি
বারেক উঠিল দুলিয়া,

লোচনে অনল জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্,
হৃদয়ে অনলকুণ্ড,
দ্বিধা-বিভিন্ন যবন-কণ্ঠ,
ধূলিমণ্ডিত মুণ্ড!
ঊর্দ্ধে গগন তারকাদীপ্ত;
চলেছে স্বতন্ত্র-বালিকা;
ভীষণ দৃশ্য! নরশির-করে
যেন ভৈরবী কালিকা!
রাজদেহ লয়ে জাগিছে দু' ভাই;
প্রায় অবসান যামিনী;
উতরিলা ধীরে স্তব্ধ শিবিরে,
মেঘমন্থরগামিনী।
পতিপদতলে ফেলিয়া মুণ্ড
কহিল কমললোচনা,
"মম প্রতিজ্ঞা সফল হে নাথ!—
কর দোঁহে চিতা-রচনা।"

সজ্জিত চিতা, পিঞ্জর হ'তে
বর বীরবপু বহিয়া
আনিল দু' জনে সজললোচনে
মর্ম্ম-অনলে দহিয়া।
আরোপিলা শির নীলার অঙ্কে,
চিতাসনে বসি' যুবতী,
অশ্রুশূন্য প্রেম-প্রসন্ন
মহিমা-মধুর মূরতি।
জ্বলিল বহ্নি, বহে ঘৃতধারা,
লোলুপ অনল-রসনা।
"মধুর মরণে বঁধু হে দোঁহার
মিটিল মরমবাসনা!"

ধূ ধূ ধূ বহ্নি জ্বলিছে, টলিছে
সতীর অঙ্গ বেড়িয়া ;
রাজরাণী নীলা সতীকুল-সতী
মরিলা অনলে পুড়িয়া।

প্রথম প্রভাতে শিবিরে শিবিরে
পড়ে গেল কোলাহল!
দিনশেষে যেন করিছে কাকলি
শ্রান্ত মরালদল।
"সেনানী স্থরীফ্ ছিন্নমুণ্ড,
কোথায় স্থরয দেউ!
হেথা অনাহূতা নর্ত্তকী কোথা!
তোমরা দেখেছ কেউ?"
প্রহরীরা কহে, "তখন প্রভাত
জাগিয়াছে সবে মাত্র,
সোয়ার দু' জন গেছে ওই পথে—
হাতে মৃণ্ময়-পাত্র!
অমনি পাত্রে শ্মশানভস্ম
বহি' বিষণ্ণবদনে
চলে রাজপুত পুণ্যসলিলা
স্মিত জাহ্নবীজীবনে। *

---

* Sir Edwin Arnold রচিত ও "The Indian Ladie's Magazine নামক সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত The Rajput Wife শীর্ষক গাথা হইতে অনূদিত।

শারদীয় দুর্ঘটনা।

অম্বরচুম্বিত কৈলাসশৃঙ্গে শরতের প্রথম চন্দ্রকিরণ শত শত শিলাখণ্ডে কিশোর সুবর্ণতনু বিস্তৃত করিয়া হরপার্ব্বতীর পদসেবা করিতেছিল। হরজটানিঃসৃতা শুভ্রফেনাবগুণ্ঠিতা আকাশবাহিনী গঙ্গা ঈষৎকম্পিত পার্ব্বতীয় বায়ুর স্পর্শে নাচিতে নাচিতে উত্তর দিকে শিখর হইতে শিখর ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে যোগমগ্ন ঋষিগণের আশ্রমে যাইতেছিল। বিমল আকাশ। শিশিরস্নাত শত ফুলের পরিমল বহিয়া প্রকৃতি মহেশ্বরের পূজা করিতেছিল। বিশ্বনাথের অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র। গৌরী অর্দ্ধ অঞ্চল পাতিয়া স্বামিপদতলে সুষুপ্তা।

মহেশ্বরের বসতবাটী কৈলাসের মধ্যভাগে। অত্যুচ্চ শিখরে তিনি কেবল যোগাসনে বসিয়া থাকেন। বাটীর মধ্যে কেবল দুইটি ঘর। একটি ঘরে জয়া বিজয়া শুইয়া থাকে। অন্য ঘরে গৌরীর পুতুলে সজ্জিত প্রকাণ্ড বেদী বা মঞ্চ। গৌরী চিরকালই বালিকা, অতএব তিনি পুতুল খেলিয়া থাকেন। এই খেলার সময় মহাদেব ঘুমাইয়া পড়েন। খেলা সাঙ্গ হইলে গৌরীও ঘুমাইয়া পড়েন। তখন জয়া বিজয়া চলিয়া যায়। বেদীপার্শ্বে সুবর্ণপ্রদীপ সারানিশি জ্বলিয়া থাকে।

বহির্ব্বাটী প্রায় শ্মশানের মত। ভাঙ্গা ঘরের সম্মুখে ষাঁড় শুইয়া থাকে। চতুর্দ্দিক আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর; ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে সর্পের বিবর। তন্মধ্যে গোটাকতক পুরাতন সর্প বাস করে; অবশিষ্টগুলি জটার মধ্যেই থাকে। প্রস্তরের দেয়ালে পেরেক্ ঠুকিয়া শিঙ্গা, ডম্বরু প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত। দক্ষিণ কোণে ত্রিশূলটা হেলিয়া থাকে। বিখ্যাত ত্রিপুরাসুরবধের পর ত্রিশূল আর ব্যবহৃত হয় নাই, সুতরাং তাহার আগাগোড়া মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ। একটা চারি ইঞ্চি পেরেকের উপর সিদ্ধির ঝুলি লম্বমান, এবং গৃহের মধ্যে সুবিস্তৃত ও কুঞ্চিত উভয় প্রকারের বাঘছাল।

গৃহের অনতিদূরে নিম্ববৃক্ষ। বৃক্ষতলে নন্দী শুইয়া থাকে, এবং ভৃঙ্গী বৃক্ষের উপর থাকিতে ভালবাসে। যেখানে মদন ভস্ম হইয়াছিল, সেখানে উমার স্বহস্ত-রোপিত ধুতুরা গাছের ফুল চন্দ্রকিরণে ঝলসিতেছিল। তাহারই কিছু দূরে কার্ত্তিকের 'ব্যারাক'। ময়ূরের দৌরাত্ম্যরোধ করিবার জন্য নন্দী একটা সপ্তহস্তপরিমিত আকন্দের বেড়া দিয়াছিল; তাহা কালক্রমে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ময়ূর এ পারে আসে না। 'ব্যারাকে'র সম্মুখে সুন্দর ফুলের উদ্যান। সেখানে চিরকুমারগণ কার্ত্তিকের সহিত বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করেন। গণেশ উপবনে বেদপাঠ করেন। সেখানে অন্য কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। সরস্বতীর কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; ঘুম পাইলে কখনও কখনও জয়া বিজয়ার ঘরে শুইয়া থাকেন, অবশিষ্ট সময় অলকনন্দার তীরে গিয়া দেবর্ষি নারদের নিকট বীণা-বাদন করেন, এবং নারদ তাহার স্বরলিপি রচনা করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেই থাকেন। কৈলাস হইতে ক্ষীরোদ সমুদ্র অধিক দূর নয়। এমন কি, ক্ষীরোদ সমুদ্রে ডুব দিলে কৈলাসে আসা যায়।

ঘটনার দিনে হরপার্ব্বতী গৃহ ছাড়িয়া সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিশ্রাম করিতে-ছিলেন। আগামী শারদীয় মহোৎসবে দল বল সহিত ভগবতী মর্ত্ত্যে আগমন করিবেন, তাহা হঠাৎ নন্দীর মনে পড়িয়া গেল।

নন্দী ডাকিল, "ভৃঙ্গী!"

ভৃঙ্গী বলিল, "হুঁ!"

নন্দী। দাদা ও দিদিবাবুদের নামে নোটিশ লিখিয়া ফেল।

অতি শীঘ্র ভৃঙ্গী বৃক্ষোপরি বসিয়া ভূর্জ্জপত্রে সনাতন প্রথানুসারে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির নামে নোটিশ লিখিয়া ফেলিল। মর্ম্ম এই যে, "আগামী মহালয়া অতি সন্নিকট; এ পক্ষ হইতে অনুজ্ঞা প্রচার হইতেছে যে, আপনারা স্ব স্ব বাহন সুসজ্জিত করিয়া বেলা তিনটার মধ্যে যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিবেন।"

বাহন সম্বন্ধে প্রায়ই কৈলাসে প্রতি বৎসর গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। মাড়ওয়ারীগণ গণেশ পূজা করে বলিয়া কৈলাসমূষিকগণ কলিকাতার বড়বাজারে যথোচিত সমাদৃত হইয়া বংশবিস্তার করিয়াছিল। তন্মধ্যে যাহারা প্লেগে মরিয়া গিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি সত্ত্বেও যথাসময়ে প্রেতদেহে কৈলাসে পঁহুছিতে পারে নাই। যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদিগের ধরাতলের ফল মূল সুগন্ধ ছাড়িয়া কৈলাসে যাইতে মোটেই ইচ্ছা হইত না।

ময়ূরগণ ক্রমাগত বঙ্গের জলবায়ু ভোগ করিয়া ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং শরতের প্রারম্ভেই তাহারা বর্ষাবিহারজনিত অবসাদে ক্লিষ্ট হইয়া কম্পজ্বরে পড়িত।

লক্ষ্মীপেচকগণ মর্ত্ত্যের কাকপ্যাচার ভয়ে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিতে চাহিত না।

নোটিশ পাইয়া সরস্বতী ছাড়া সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন, এবং যথাসাধ্য বাহনের যোগাড় করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে নন্দী নিম্ববৃক্ষে ষাঁড় বাঁধিয়া দেবীর বাহন আনয়ন করিতে গেল। যেখানে কৈলাস স্বর্গের দিকে হেলিয়াছে, তাহারই সন্নিকটে দুর্গম গিরিগহ্বরে ভগবতীর বাহন সিংহ মহিষাসুরকে কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত।

প্রায় দুই ঘণ্টার পর নন্দী নিম্ববৃক্ষতলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কম্পিতস্বরে ডাকিল, "ভৃঙ্গী!"

ভৃঙ্গী। হুঁ!

নন্দী। সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মহিষাসুর—নিরুদ্দেশ।

ভৃঙ্গী। পাগল না কি? আর সিংহী?

নন্দী। সেটা জিহ্বা বাহির করিয়া পড়িয়া আছে।

এক লাফে ভৃঙ্গী বৃক্ষ হইতে নামিয়া নন্দীর সহিত গহ্বরের দ্বারে গিয়া দেখিল, বাস্তবিকই মহিষাসুর ভাগিয়াছে, এবং দশনবিস্তার পূর্ব্বক পৌরাণিক সিংহ মহাশয় রক্তাক্তকলেবরে পড়িয়া আছেন!

২

এই অভাবনীয় লোমহর্ষণ কাণ্ডে নন্দীর নেশা ছুটিয়া গেল, এবং ভৃঙ্গীর গাত্র দিয়া ঘর্ম্ম বহির্গত হইতে লাগিল। পৌরাণিক সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আবহমান কাল পূর্ব্বপ্রথানুসারে সিংহীরই মহিষাসুরকে কামড়াইয়া থাকিবার কথা। এ প্রথার হঠাৎ কেন পরিবর্ত্তন হইল, তাহা শাস্ত্র দূরে থাকুক, ত্রিলোকে কাহারও বিদিত ছিল কি না সন্দেহ। বহুযুগ ব্যাপিয়া শিবপরিচর্য্যা-রত বৃদ্ধ নন্দী ভৃঙ্গীর বয়স অধিক হইলেও সিদ্ধিসেবনবর্দ্ধিত বুদ্ধি কখনও লোপ পায় নাই। আজ সেই বুদ্ধি লোপ পাইতে বসিল।

নন্দী প্রথম আবেগে ভগবতীর নিকট সংবাদ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা কেবল স্বীয় অমনোযোগিতার স্বপক্ষে প্রমাণ দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে আবার ভৃঙ্গীকে ডাকিল। হতবুদ্ধি ভৃঙ্গী নন্দীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

নন্দী। এ কথা মাকে কখনই বলা হইবে না।

ভৃঙ্গী। না।

নন্দী। তবে উপায়?

ভৃঙ্গী। থানায় খবর দে।

কৈলাস পর্ব্বত গড়ওয়াল থানার এলাকাধীন। গড়ওয়াল কৈলাসশিখর হইতে বত্রিশ যোজনের পথ। রাতারাতি সমস্ত পথ হাঁটিয়া ভৃঙ্গী ও নন্দী প্রত্যূষে থানায় আসিয়া পঁহুছিল।

থানার দারোগা বিরিঞ্চি মিশ্র প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া খট্টাঙ্গে বসিয়া ছিলেন। শয্যার শিয়রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, এবং পার্শ্বে পঞ্চহস্তপ্রমাণ আগ্রার নলবিশিষ্ট আলবোলা। খট্টাঙ্গের নিম্নভাগে কীটদষ্ট হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি ও কার্য্যবিধি আইন একত্র বাঁধা।

দারোগা মহাশয় গত মাসের গোপনীয় প্রাপ্য প্রভৃতির সম্বন্ধে স্বহস্তলিখিত জমাওয়াশীল বাকীর খাতা একটি পুরাতন বাক্সে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পুনরবলোকন কর্ত্তব্য মনে করিয়া যেমন গাত্রোত্থান করিবেন, অমনই একটা বিকট চাপা শব্দ শুনিতে পাইলেন।

দারোগা মহাশয় সেই দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, দুইটা অসভ্য বর্ব্বর মনুষ্য তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গভঙ্গী করিতেছে।

দারোগা মহাশয় পার্ব্বতীয় ভাষা জানিতেন। তাহারই সাহায্যে নন্দীর বক্তব্য শীঘ্র বুঝিয়া ফেলিলেন; সংবাদ অভিনব ও গুরুতর দেখিয়া প্রথমতঃ থানার রোজনামচায় একটা খসড়া লিখিয়া ফেলিলেন, এবং পুনরায় তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "এটা গুমের সংবাদ, না চুরীর?"

নন্দী। সেটা বুঝিয়া দেখুন।

দারোগা। কেবল গুমের সংবাদে পুলিস তদন্ত করিতে বাধ্য নহে; কাহা-কেও সন্দেহ না করিলে কিংবা চুরীর কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলে প্রথম সংবাদ কেবল রোজনামচায় থাকিয়া যাইবে।

ভৃঙ্গী এতক্ষণ পরে আইনের অর্থ চমৎকার বুঝিয়া ফেলিল, এবং বলিল, "তবে চুরীই লিখুন।"

দারোগা। তাহাতে প্রত্যেক নূতন কথায় এক টাকা করিয়া দর্শনী দিতে হইবে

ভৃঙ্গী কোমর হইতে একটা সংস্কৃত মহিষের শিঙ্গ বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে এক ভরি আন্দাজ সুবর্ণখণ্ড দারোগার প্রসারিত হস্তে অবিলম্বে অর্পণ করিল।

দারোগা। কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর সন্দেহ হয়?

নন্দী। কিসের সন্দেহ?

দারোগা। এই মহিষাসুর চুরী সম্বন্ধে?

নন্দী। এটা কি সোজা কথা? কৈলাসপর্ব্বত হইতে অত বড় দুর্দ্দান্ত জানোয়ার চুরী করা কি মানুষের সাধ্য?

দারোগা। 'ন্যাশনাল কংগ্রেসে'র কোনও লোকের উপর সন্দেহ হয় না কি?

ভৃঙ্গী 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামটা শুনিয়া মনে করিল, হয় ত ত্রিপুরাসুরের বংশের কেহ। বিগত পৌরাণিক যুদ্ধে সেই বংশের কেহ ভৃঙ্গীর হাতে কামড়াইয়া দিয়াছিল। সুতরাং ভৃঙ্গী বলিল, "বোধ হয় তাই।"

তখন দারোগা প্রথম এজেহারের বহি বাহির করিলেন, এবং স্বয়ং তিন খণ্ড প্রথম এত্তেলা কাটিয়া ফেলিলেন। এক খণ্ড পুলিস আপিসে গেল, এবং অন্য খণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইল। তৃতীয় খণ্ড বহিতেই সংলগ্ন রহিল।

ভুলক্রমে দারোগা রোজনামচাটার সংশোধন করিলেন না। তাহাতে গুমের সংবাদই রহিয়া গেল।

৩

তৎপরে প্রথম সংবাদ পঠিত হইল। তাহা এই,--"তারিখ ১৬ই অক্টোবর, সন ১৯০৩, বেলা ৭॥০ ঘটিকা, অকুস্থান কৈলাস—গড়ওয়াল থানা হইতে বত্রিশ যোজনের পথ।—বাদীর নাম ভৃঙ্গী, পিতার নাম অজ্ঞাত--আসামীর নাম অজ্ঞাত, কিন্তু 'ন্যাশনাল কংগ্রেসের' কেহ--তদন্তকারী স্বয়ং দারোগা বিরিঞ্চি মিশ্র—ওকুস্থানে রওনা হইলেন—অতঃপর বিবরণ এই যে, ছাএল ভৃঙ্গী ছাএল নন্দী সমভিব্যাহারে আসিয়া উপরোক্ত সময়ে সংবাদ দিতেছে যে—কৈলাস পর্ব্বতের গহ্বরে (সেখানে চৌকিদার নাই) স্বয়ং জগজ্জননী দুর্গাদেবীর বাহন সিংহ মহিষাসুর নামক দুষ্ট জনোয়ার অথবা দৈত্যরাজের বক্ষঃস্থল নখরে ও স্কন্ধদেশ দন্তে বিদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকিত। এই মহিষাসুর বৎসর বৎসর ধরাতলে প্রদর্শিত হয়, এবং তজ্জন্য অনেক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। মহিষের মূল্য অজ্ঞাত, সম্ভবতঃ ১০॥০ টাকা। গত কল্য সন্ধ্যার পর উপরোক্ত মহিষাসুরকে গুম দেখিয়া রক্ষক ছাএলগণের মনে সন্দেহ হয়, কিন্তু মালিকগণ নিদ্রাভিভূত থাকায় কালব্যয় না করিয়া বরাবর থানায় চলিয়া আসে। উক্ত মূল্যবান মহিষ নিশ্চয় কোন চোর লইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ না থাকায় ছাএল ভৃঙ্গী 'ন্যাশনাল কংগ্রেসের' কোন সভ্য দ্বারা এই কার্য্য সমাধা হইয়াছে তাহা নিশ্চিত জানিয়া এত্তেলা দিতেছে।—ছাএলগণের মধ্যে ভৃঙ্গী লেখাপড়া জানে, কিন্তু পার্ব্বতীয় বর্ণমালা অধীন অজ্ঞাত থাকায় উভয়ের টিপ সহি লওয়া হইল, এবং

সংবাদ পাঠ করিয়াও শুনান হইয়াছে।—সহি দারোগা বিরিঞ্চি মিশ্র। নন্দী ও ভৃঙ্গীর টিপ সহি।”

অতিকষ্টে বহু গিরিশিখর পর্ব্বতকন্দর উপত্যকা নদ নদী প্রভৃতি পার হইয়া নন্দী ভৃঙ্গীর সাহায্যে দারোগা বিরিঞ্চি মিশ্র দুই জন কনেষ্টবল লইয়া কৈলাসে পঁহুছিলেন। দৈবসাহায্য ব্যতীত কেহ সশরীরে কৈলাসে পঁহুছিতে পারে না। কৈলাসে ফল মূল ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না, অতএব সে রাত্রি দারোগা মহাশয় কেবলমাত্র মূল খাইয়া বৃক্ষতলে ঘুমাইয়া থাকিলেন। তৎ-পর দিন মাল-তালিকা ও অকুস্থানের চিহ্ন টুকিয়া লওয়া হইল। নূতন মনুষ্যের সমাগম দেখিয়া কার্ত্তিক পূর্ব্বেই বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। মহাদেব ও গৌরী পূর্ব্ববৎ সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গেই বিহার করিতেছিলেন। সে স্থান মনুষ্যের অগম্য। অনেক চেষ্টা করিয়াও দারোগা তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অতঃপর ঘটনাস্থল পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও কেহই সিংহকে দেখিতে পাইল না। বোধ হয়, সিংহ জ্ঞানসঞ্চারের পর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রাতারাতি অন্য কোনও পর্ব্বতে আহারের অনুসন্ধানে গিয়াছিল। সার কথা এই যে, দারোগা মহাশয় ঘটনার কোনও বিশেষ প্রমাণ পাইলেন না। সন্ধ্যাকালে তিনি নন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন, “কেহ সাক্ষী না দিলে মোকদ্দমা টেঁকা অসম্ভব।”

নন্দী। তবে উপায়?

দারোগা। মালিকগণকে এখানে ডাকিয়া আন।

নন্দী বিস্মিতবদনে বলিল, “আপনি কি পাগল? দেবাদিদেব মহাদেব ও শক্তিস্বরূপিণী গৌরীর সমাধিভঙ্গ করিয়া এখন ডাকিয়া আনে, ত্রিলোকে এমন সাধ্য কাহার আছে?”

বিরিঞ্চি মিশ্র অদ্বৈতবাদী। দেবতাগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অনেকটা সন্দেহ ছিল। তিনি জানিতেন, অনেক পাণ্ডা দেবতার নাম করিয়া ঠকাইয়া খায়। হয় ত নন্দী ভৃঙ্গী তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছে।

প্রথমতঃ, তাঁহার পদোচিত সম্মান হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ, তিনি একপ্রকার অনাহারেই ছিলেন; এবং তৃতীয়তঃ, ভৃঙ্গীর নিকট পুনরায় সুবর্ণের কোন আভাষ না পাইয়া দারোগা মহাশয় চটিয়া উঠিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত স্থানে হঠাৎ একটা কাণ্ড করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া দারোগা মহাশয় বলিলেন, “একটা উপায় আছে।”

ভৃঙ্গী। কি?

দারোগা। আমি মহিষাসুরের সন্ধান করিতে যাই; তোমরা আমার সঙ্গে আইস। যেখানে যেখানে খানাতলাসী করিব, তোমরা উপস্থিত থাকিবে, এবং মাল পাওয়া গেলে গৃহস্বামীকে কৈলাসে ওৎ করিতে দেখিয়াছিলে, ইহা বলিয়া সনাক্ত করিবে। আপাততঃ কিছু স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া আন।

নন্দী ভৃঙ্গী স্বীকৃত হইয়া তাহাই করিল। ইতিমধ্যে কনেষ্টবলদ্বয় সিদ্ধির ঝুলি ও বাঘছালের সন্ধান পাইয়া একমনে তাহাই চুরী করিতেছিল। দারোগা তাহাদিগকে কেবলমাত্র সিদ্ধি লইবার অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া অবিলম্বে নন্দী ভৃঙ্গীর সহিত গড়ওয়ালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৪

কথিত খানাতলাসী অনেক সৎ ও অসৎ লোকের ঘরে হইয়া গেল। অনেক পুরুষ ও রমণী তলাসীর চোটে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল। কিন্তু মহিষাসুর পাওয়া গেল না। কার্য্যগতিকে দারোগা "সি" ফারম্ দিলেন। দারোগার মন্তব্য এই, "মোকদ্দমা সত্যও হইলে হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে, তবে যত দূর তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, মোকদ্দমা মিথ্যা, কিন্তু মিথ্যা প্রমাণ করিবার সাক্ষী নাই, সত্য প্রমাণের সাক্ষীও নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এরূপ রিপোর্টে প্রায়ই সন্তুষ্ট হইতেন না। সত্য কিংবা মিথ্যা বিশিষ্টরূপে অবগত না হওয়া পুলিস ও মাজিষ্ট্রেট উভয়ের পক্ষে লজ্জার কথা। অতএব তিনি একটা ছোট-খাট মন্তব্য লিখিয়া হুকুম দিলেন যে, ভৃঙ্গী ও নন্দী উভয়েই কারণ দর্শাইবে যে, কেন তাহাদিগকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারায় চালান দেওয়া হইবে না। পূজার ছুটী সন্নিকট বলিয়া সাহেব মোকদ্দমার নথি শ্রীযুক্ত রামধন বসু ডিপুটীর আদালতে বিচারের জন্য সমর্পণ করিলেন, এবং লিখিয়া দিলেন যে, যে হেতু উভয় ব্যক্তিই অর্থাৎ নন্দী ও ভৃঙ্গী আদালতে হাজির আছে, তাহাদিগকে ডাকিয়া একেবারে কারণ দর্শাইতে বলা হউক।

বসুজা মহাশয়ের নিকট মোকদ্দমার ভার অর্পণ করিবার অন্যতর কারণ এই যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী; শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি উক্ত ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা লইয়া এক সময় অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন, এবং একটা হইতে অন্যটায় লাফ্ দিয়া ও অন্যটা হইতে আর একটায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সকলের গোড়া কি, তাহা বুঝিয়াছিলেন।

মোকদ্দমার নথী লইয়া বসুজা মহাশয়ের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। যদি

বাস্তবিক মহিষাসুর চুরী গিয়া থাকে, তবে এ বৎসর দেবীর মর্ত্তে আগমন অসম্ভব। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, এবার পূজার সময় গৃহিণী ও আত্মীয়-বর্গের নূতন কাপড় প্রভৃতি ক্রয় করিবার কোন আবশ্যক নাই। অতএব তিনি মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন যে, মহিষাসুর যাহাতে না পাওয়া যায়, এবং নন্দী ভৃঙ্গী কৈলাসে শীঘ্র ফিরিতে না পারে, তাহারই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, এবং মোকদ্দমার স্থির বিচারের জন্য স্থানীয় তদন্ত প্রয়োজন, এইরূপ মন্তব্য লিখিয়া, মোকদ্দমা মুলতবী রাখিবেন।

আদালত লোকারণ্য। মোকদ্দমার উপর বৎসরের ফলাফল নির্ভর করি-তেছে। নন্দী ভৃঙ্গী কৈলাসে না ফিরিলে হরপার্ব্বতীর সাজসজ্জার যোগাড় করিবার অন্য লোক নাই ; অপিচ, স্বয়ং মহিষাসুর অন্তর্হিত! ইহার শেষ ফল দেখিবার জন্য বিংশসহস্রাধিক লোক গড়ওয়ালে উপস্থিত।

বসুজা মহাশয় স্বীয় হুকুম প্রচার করিয়া নন্দী ভৃঙ্গীকে জানাইলেন যে, যে হেতু মোকদ্দমার সাক্ষী সবুত কিছুই নাই, সুতরাং স্থানীয় তদারক আবশ্যক। কিন্তু কৈলাস বহুদূরবর্ত্তী, সুতরাং হঠাৎ দুর্গম পথে ভাল দিন না দেখিয়া যাত্রা অসম্ভব ; অতএব তিনি ছুটীর পরে মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন। ততদিন নন্দী ভৃঙ্গী প্রত্যেকে দশ সহস্র টাকার জামিন ও মুচেলকা দিবে। অন্যথা হাজত!

'হাজতের' হুকুম শুনিয়া অনেকের হৃৎকম্প হইল। দুই জন অজানিত লোকের জামিন হইতে কেহই স্বীকৃত হইল না। এক জন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি-য়াছিল, "শিবের অনুচর হাজতে যায়, এমন হিন্দু কেহ কি নাই যে, তাহাদিগকে রক্ষা করে ?" কিন্তু লোকটার প্রস্তাবের অনুমোদন কেহ করিল না, এবং যদিও তাহার নিজের যথেষ্ট সঙ্গতি ছিল, তথাপি সে স্বয়ং নিজে এ বিপদ ঘাড়ে করিতে স্বীকৃত হইল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। সকলেই যেন একটু চিন্তাভারজড়িত। আদালত জনাকীর্ণ, তবু নীরব, নিস্তব্ধ। অসংখ্য তারা আকাশে, অসংখ্য হৃদয় ধরা-তলে,—সকলই যেন ম্লান হইয়া গেল।

সকলেই যেন বুঝিল,এ বৎসর দুর্গোৎসব হইবে না। এ বৎসর দেবী কৈলা-সেই রহিয়া যাইবেন। উপায় নাই।

বসুজা মহাশয় বলিলেন, "ঘটনা অভাবনীয়। ইহাতে হিন্দুমাত্রেরই চিন্তা-ন্বিত হইবার কথা, কিন্তু মাটীর প্রতিমা গড়াইয়া আমরা পূজা করি, তাহাতে

দেবীর যাতায়াতের কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব তোমরা বাৎসরিক আমোদ করিতে কুণ্ঠিত হইও না।”

নন্দী ভৃঙ্গী হাজতে গেল।

৫

দেবী আসিবেন না, এ সংবাদ শীঘ্রই বঙ্গে প্রচারিত হইল। এই নিদারুণ সংবাদে অনেক হিন্দু কাঁদিয়া ফেলিল। অনেক ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের গাঁইট বড় বড় দোকানে খোলা হইল না। জুতার দর কমিয়া গেল। বিপদ দেখিয়া দেশ হিতৈষিগণ “টাউনহলে” একটা বিরাট সভা আহ্বান করিলেন। অনেক বক্তৃতা বাদবিসংবাদের পর নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি সর্ব্বসাধারণের অনুমোদিত হইল।—

১। দেবী না আসিলেও পূজা বন্ধ হইতে পারে না। তবে এই দুর্ঘটনার স্মরণার্থ কেবল প্রতিমার কাঠামোয় মহিষাসুর থাকিবে না, এবং মহিষাসুরের মূর্ত্তি কেন লুপ্ত হইল, তাহার কৈফিয়তে একটা টিকিট মারিয়া তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে “পলাতক” লিখিয়া দিতে হইবে।

২। নন্দী ভৃঙ্গীর মূর্ত্তি চালচিত্রে হাজতে দেখান হইবে।

৩। মহিষাসুরের অভাব সত্ত্বেও সিংহের বীরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত তাহার দন্তপাটিতে ‘ন্যাশনাল কংগ্রেস’ অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে।

কংগ্রেসের অনেক ডেলিগেট তৃতীয় মন্তব্যে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহাদিগের উপর গোড়াতেই মিথ্যা দোষারোপ হইয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইল, তখন তাঁহাদিগের কোন আপত্তি রহিল না।

অতঃপর বঙ্গে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। আবার জুতার দর বাড়িয়া গেল। আবার পার্শীশাড়ী, দেলখোস ও কুন্তলীন শ্রাবণের বারিধারার মত ঘরে ঘরে বর্ষিত হইতে লাগিল।

মিত্র মহাশয়দিগের প্রকাণ্ড ঠাকুরদালানে টিকিট মারা সিংহবাহিনীর প্রতিমা ও নূতন সাজসজ্জার বাহার দেখিবার জন্য অনেক লোক দাঁড়াইয়া গেল।

সপ্তমী পূজার আরম্ভ হইল।

সুন্দর তাড়িতালোকে, সুন্দর পুষ্প পত্রে, সুন্দর মুখের বাহারে মিত্র মহাশয়দিগের বৈঠকখানা স্বর্গের নন্দনকানন নিন্দিতেছিল। রাত্রি দশটা।

সকলেই মধুপানে মত্ত। হৃদয়ে হৃদয়ে, আঁখিতে আঁখিতে, কণ্ঠে কণ্ঠে, আনন্দসুধা বহিতে লাগিল। প্রত্যহ নয়, মাসে মাসে নয়, বৎসরকার দিন! এমন সময় আনন্দসুধা ত বহিবেই।

বীণানিন্দিত কণ্ঠে সারঙ্গরবমিশ্রিত আনন্দগান পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিতেছে। মুখে সুধার হাসি, ফলং ঐশ্বর্য্য ; হৃদয়ে সুবর্ণখচিত সুনীল ওড়না, ফলং ভ্রমণ ; পৃষ্ঠদেশে লম্বমান বেণী, ফলং মৃত্যুবৎ! সৌরজগতের দ্বাদশ রাশি স্তব্ধ! চন্দ্র সূর্য্য মাতোয়ারা।

এমন সময়ে গৈরিকবসনপরিধৃত, মস্তকে জটাভার, হস্তে ভগবদ্গীতা, কৃষ্ণবর্ণ মহিষের মত একটা পদার্থ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সভার লোক সকলেই ত্রস্ত হইল। চিকের আড়াল হইতে রমণীগণ পলায়ন করিলেন। একটা মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল।

মিত্রজা। মহাশয়ের নিবাস ?

মহিষ। পূর্ব্বে 'আটলান্টিস' নামক স্থানে বাস করিতাম ; কিন্তু গত দুই সহস্র বৎসর অবধি কৈলাসের গহ্বরে বাস করিতেছিলাম।

সকলেই বুঝিতে পারিল, স্বয়ং মহিষাসুর উপস্থিত! সকলের গাত্র হইতে ঘর্ম্ম বহিয়া শুভ্র কামিজগুলির 'কলার' ও 'কফ্' তুলার মত নরম হইয়া গেল। জিহ্বা শুকাইয়া আসিল।

মহিষাসুর ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভয় নাই! তোমরা প্রতিমা পূজা কর, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু আমার বক্তব্য ইহাই যে, বিশ্বে একই 'সৎ', এবং অন্য সব মায়া ও মিথ্যা। এই মায়াভ্রমে পতিত হইয়া তোমরা অনর্থক কাল অতিবাহিত করিতেছ। তোমাদিগের ভ্রমদূরীকরণার্থ আমি এত দূর আসিয়াছি। যখন সকলেই 'সোহং, তখন এ আড়ম্বর কেন ?"

সকলেই বুঝিল, মহিষাসুর বেদান্তবাগীশ! তখন বীণা সারঙ্গ প্রভৃতি থামিয়া গেল।

৬

মহিষাসুর সকলকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক হিন্দু ষড়্দর্শনের সামঞ্জস্য করিলেন, এবং তাঁহার প্রণীত গীতার নূতন টীকা মিত্র মহাশয়কে ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত করিবার ভার দিলেন। মূল্য চারি আনা মাত্র।

এ মূল্য লইবার মহিষাসুরের উদ্দেশ্য এই যে, তাহা দ্বারা জাহাজের মাশুল সংগ্রহ পূর্ব্বক আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতে যাইবেন।

সকলে এ সাধু উদ্দেশ্যে বাহাদুরী না দিয়া থাকিতে পারিল না।

মহিষাসুরের বদান্যতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, ও গভীর মিষ্ট ভাবে সকলেই চমৎকৃত

হইল, এবং সকলেই স্বীকার করিল যে, দেবী এহেন ধর্ম্মবীরের উপর অত্যাচার করায় তাঁহার পাষাণী নাম সার্থক হইয়াছে মাত্র।

সেই শারদীয়া সপ্তমীর দ্বিপ্রহর নিশীথে মিত্র মহাশয়ের বাটীতে একটা গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হইল। যাঁহারা 'ক্রিয়াবান', অর্থাৎ হঠযোগ প্রভৃতির ক্রিয়া করেন, তাঁহারাই সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। স্বয়ং মহিষাসুর যোগশিক্ষক।

অষ্টমীর দিন সকলে যোগাসনে বসিলেন। নবমীর মধ্যেই "গীতা" সটীক মুদ্রিত হইল, এবং —কোম্পানী তাহার 'কাপীরাইট' কিনিয়া লইয়া সার্দ্ধ চারি সহস্র টাকা মহিষাসুরকে দিল।

পূজা চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তাদের সমাগম বিরল হইয়া পড়িল। কার্য্যগতিকে গৃহিণীগণ ও রাজবাটীতে অগ্রমহিষীগণ ষোড়শোপচার বজায় রাখিয়া মৃৎপ্রতিমার পূজা করিতে লাগিলেন।

বিজয়াদশমীর সন্ধ্যার সময় প্রাঞ্জল ইংরাজী-ভাষায় বিজ্ঞানসঙ্গত বক্তৃতা দ্বারা মহিষাসুর সিং ও জটা দোদুল্যমান করিয়া বেদান্ত প্রচার করিলেন। প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষিত বৃদ্ধ, যুবা ও অপোগণ্ড বালক নিমেষের মধ্যে জ্ঞানলাভ করিল।

এ দিকে কৈলাসে কার্ত্তিক ও গণেশ বাহন না পাইয়া, এবং নন্দী ভৃঙ্গীর টিকী না দেখিয়া মনে করিলেন যে, এ বৎসর দেবী তাঁহাদিগকে বিশ্রামার্থ অবকাশ দিয়াছেন। সরস্বতীও তাহাই মনে করিয়া অলকনন্দার তীরে বীণা লইয়া চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মী নারায়ণ-বিরহ-বিধুরা হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া ক্ষীরোদসমুদ্রে ডুব দিয়া প্রবাল মাণিক্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

মহাদেব যোগমগ্নই থাকিয়া গেলেন।

দশমীর দিন দেবীর মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হইল। আকাশ পরিচ্ছন্ন। বিহঙ্গগণ পক্ষপুট বিস্তৃত করিয়া নীল আকাশের তলে শুভ্ররেখাশ্রেণীর ন্যায় বিচরণ করিতেছিল। সূর্য্যদেব কৈলাসশিখরে জ্বলন্ত সিন্দুররেখা অঙ্কিত করিয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের বক্ষে ডুব দিতেছিলেন।

দেবী দেখিলেন, ক্ষুধার্ত্ত সিংহ তাঁহার পদতলে। কৈলাস জনশূন্য। রাশিচক্রে চাহিয়া দেখিলেন যে, দশমীর সন্ধ্যা আগত-প্রায়।

ধ্যাননেত্রে দেবী অনেকটা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু নিদ্রাজড়িত তৃতীয় নেত্র তখনও উন্মীলিত হয় নাই। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রজ্বলিত হইল।

ক্রোধটা মহাদেবের দিকেই গেল। কিন্তু মহাযোগীর ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিল না।

তখন দেবী কুন্তল হইতে কেশ উৎপাটিত করিয়া মহামারী সেনার সৃষ্টি করিলেন। তাহারা চতুর্দ্দোল সাজাইয়া দিল। সেই দশমীর সন্ধ্যায় মহাশক্তির সেনা গগন ছাইয়া বঙ্গদেশের দিকে ধাবিত হইল।

তাহার পূর্ব্বেই মহিষাসুর "সটীক গীতা"র টাকা লইয়া পঞ্জাব মেলে রওনা হইয়াছে।

কৈলাসে মহাদেব ধ্যানাবস্থায় হাসিলেন।

৭

দেবীর মর্ত্তে গিয়া মহিষাসুরকে ধরিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ত্রিকালজ্ঞা ভগবতী জানিতেন যে, মহিষাসুরের মুক্তির সময় হইয়াছে। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া মায়ের পদতলে বাস করিয়া সে ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই সঞ্চিত করিয়াছিল। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ দুর্গার মর্ত্তলোকের উপর টান বিংশ শতাব্দীতেও অন্তর্হিত হয় নাই। সেই পূর্ব্বাভাস অকালে, অর্থাৎ দশমীর দিন জাগরিত হওয়াতে, পূর্ব্ববর্ণিত ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল।

যখন দশমীর চন্দ্রমা শারদ গগনে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উদিত হইতেছিল, তখন অলক্ষ্যে মহাশক্তি বঙ্গে আবির্ভূতা হইলেন। সেকালের ভক্তগণ আঁধার গৃহে সিদ্ধি ঘুঁটিয়া চুপ করিয়া বন্ধুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শিক্ষিত যুবারা মহানগরীর পথে রেশমী চাদর উড়াইয়া থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে যাইতেছিল। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি দশমীর আলিঙ্গন ও নমস্কারের প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া একালের নব্য যুবকগণকে মনে মনে ধিক্কার প্রদান-পূর্ব্বক লুচি সন্দেশের যোগাড় করিতে যাইতেছিলেন। সাধ্বী বঙ্গবধূগণ ছাতে বসিয়া দক্ষিণপবনে গত তিন রাত্রির অবসাদ দূর করিতেছিলেন।

দেবীর আগমন কেহ দেখিতে পাইল না! রোগী শয্যায় উঠিয়া বসিল। দস্যু ঘরে ফিরিয়া গেল। কেহ দেখিতে পাইল না। মুমূর্ষু জনকজননীও দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জঠরানল ভুলিয়া কঙ্কালবাহু দ্বারা বুকে করিয়া সন্তানসন্ততির পাণ্ডু মুখচুম্বন করিল। তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

সেই সভ্যতার আবরণের মধ্যে, সেই রাজপথের তাড়িতালোকের মধ্যে, সেই বিশ্ববিজয়িনী বক্তৃতা ও অভিনয়ের মধ্যে, দেবী সন্তানগণের অবস্থা দেখিতে পাইলেন। জননীর হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি সৈন্যগণকে সংবরণ করিতে গেলেন। কিন্তু তাহারা তখন চলিয়া গিয়াছিল।

দেবী সিংহকে মর্ত্তে রাখিয়া একাকিনী একাদশীর আঁধারে অনশনে কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। কেহই দেখিল না।

মহেশ্বর সকলই দেখিতেছিলেন, এবং নন্দী ভৃঙ্গীর অভাবে জয়া বিজয়ার দ্বারা সিদ্ধি ঘুঁটাইয়া খাইতেছিলেন।

দেবী আসিয়া শয়নমন্দিরে গেলেন, এবং অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

রাত্রি পোহাইয়া গেল; তথাপি দেবী নিদ্রার ছলনা করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। বেদীর উপর সুবর্ণপ্রদীপ পূর্ব্ববৎ জ্বলিতে লাগিল।

দেবাদিদেব জয়া বিজয়াকে ইঙ্গিতে বিদায় করিয়া গৌরীর লঘু হেমবর্ণ দেহ দুই হাতে তুলিয়া লইয়া পঞ্চমুখে দেবীর মুদ্রিত ত্রিনয়ন পঞ্চবার চুম্বন করিলেন।

গৌরী মায়াবিস্তার করিয়া হরহৃদয় হইতে অপসৃত হইয়া আবার বেদীর নিম্নে লুকাইলেন।

শঙ্কর মায়া ভাঙ্গিয়া আবার গৌরীকে ধরিলেন। কিন্তু দারুণ অভিমান ভাঙ্গিল না।

মহাদেব ধীরে ধীরে বলিলেন, "পার্ব্বতী! মহিষাসুর তোমারই মায়া-নিঃসৃত, তোমারই সংস্পর্শে সে মুক্ত হইয়াছে, এবং কৈলাস ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহা জানিয়াও তোমার ক্রোধসঞ্চার হইল? কর্ম্মক্ষেত্রে সকলকেই ফলভোগ করিতে হয়। অতএব অভিমান করিও না।"

পার্ব্বতী। তুমি আমার মহিষাসুরকে ধরিয়া দাও।

মহাদেব। আচ্ছা, প্রতিশ্রুত হইলাম। নন্দী ভৃঙ্গীও আসিবে, এবং তোমার সিংহ মহিষাসুরকেও লইয়া আসিবে। নূতন লীলা প্রকটিত হইবে। তুমি এত দিন ঘুমাইয়া ছিলে, একবার সন্তানগণের দিকে চাহিয়া দেখ।

অনেক অনুনয় বিনয়ের পর গৌরী ফলমূল খাইতে গেলেন। মহাদেব সিদ্ধি পান করিয়া কণ্ঠের বিষের জ্বালা নিবারিত করিলেন।

৮

তাহার পরদিন গড়ওয়াল আদালতে বসুজা মহাশয় সাহেবের তাড়া খাইয়া ছুটীর মধ্যেই নন্দী ভৃঙ্গীর মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিয়া গেলেন।

মুলতবীর উপর ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বাবধি চটা। বসুজা মহাশয়ের আলস্য সম্বন্ধে পূর্ব্বাবধিই তাঁহার মন্তব্য নোটবহিতে টোকা ছিল; এবার বাৎসরিক রিপোর্টে বসুজার মস্তকভাগটা উড়াইয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে সাহেব স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

বসুজা মহাশয় বিরিঞ্চি মিশ্র দারোগাকে ডাকাইয়া তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় তদন্ত আবশ্যক বোধ হইল না। এমন সময় এক জন উকীল আসিয়া নন্দী ভৃঙ্গীর তরফে বক্তৃতা জুড়িয়া দিল।

বক্তৃতার আয়োজন দেখিয়া বসুজার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে?"

উকীল। রামানন্দ সিংহ।

বসুজা মহাশয়ের থিয়সফির উপর জাতক্রোধ ছিল। তিনি বলিলেন, "আপনি কাহার হুকুমে বক্তৃতা করিতে আসিয়াছেন?"

উকীল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমে।

বসুজা মহাশয় বক্তৃতা শুনিতে বাধ্য হইলেন। বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে, বাস্তবিক নন্দী ভৃঙ্গী চুরীর কোন সংবাদ দেয় নাই। তাহার প্রমাণে রোজনামচার নকল প্রদর্শিত হইল। কেবল বিরিঞ্চি মিশ্র দারোগার ষড়যন্ত্রে অনর্থক কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করিয়া একটা মিথ্যা প্রথম এত্তেলা লিখিত হইয়াছিল, এবং বর্ব্বর নন্দী ভৃঙ্গীর টিপ্ সহি লওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে কংগ্রেস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বিশেষতঃ সিংহের দন্তে 'কংগ্রেস' অঙ্কিত হওয়াতে দেশের লোকের অসারতা ও অধঃপতনশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মূল কারণ পুলিস। পুলিসের যথোচিত শাস্তি আবশ্যক। অপিচ, রামানন্দ সিংহ আরও বলিলেন যে, বাস্তবিক মহিষাসুর 'গুম' হইতে পারে না। কেন না, সমস্ত ঘটনাই স্বপ্নজগতের। মনুষ্যের দেহের মধ্যে astral body নামক একটা দেহ আছে। তাহাতে মধ্যে মধ্যে স্বপ্ননামক পদার্থ প্রকটিত হয়। স্বয়ং বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মূলপ্রকৃতিই ইহার কারণ, এবং তন্নিবারণার্থে থিয়সফিক্যাল সমিতি অনেক উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন।

বসুজা। অত্র আদালতকে তাহার প্রমাণ দেখাইতে পারেন?

রামানন্দ। অবশ্য।

অনতিবিলম্বেই একটা 'বরিশাল গনের' মত শব্দ হইল, এবং অলক্ষ্যে কতকগুলা ভূতপ্রেত আসিয়া বসুজার স্কন্ধে আরোহণ করিল।

সভয়ে বসুজা ডাকিলেন, "মা জগদম্বা! রক্ষা কর। দোষ আমার নয়, বিরিঞ্চি মিশ্র দারোগার।"

সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা ভূত বলিল, "লেখ, তাহাই রায়ে লেখ!"

কাঁপিতে কাঁপিতে বসুজা রায় লিখিলেন, এবং তাহাতে বিরিঞ্চি মিশ্রকে যথেষ্ট গালাগালি দিলেন।

রায় প্রকাশিত হইল। নন্দী ভৃঙ্গী বেকসুর দায়মুক্ত। সকলে রামানন্দ উকীলের জয়জয়কার করিতে লাগিল। এমন সময়ে একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

সকলে দেখিল, অদূরে সিংহের স্কন্ধে চড়িয়া মহিষাসুর কৃতাঞ্জলিপুটে অধোবদনে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছেন। বলা বাহুল্য, সিংহ মহিষাসুরকে বোম্বাই নগরের ডকে গিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছিল; কিন্তু মহাদেবের কৃপায় অসুর কোনও প্রকারে সিংহের দন্ত এড়াইয়া স্কন্ধে চড়িয়া বসিয়াছিল।

বসুজা এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া রামানন্দ সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কোন Esoteric ব্যাখ্যা আছে?"

রামানন্দ। জ্ঞান যুক্তকরে ভক্তিপথে যাইতেছে।

বসুজা। কেমন করিয়া?

রামানন্দ। শক্তির চোটে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রদীপ। ভাদ্র। "কাল" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের রচিত একটি দার্শনিক 'সমস্যা'। বিশেষজ্ঞের উপভোগ্য হইতে পারে, সাধারণ পাঠকের পরিপাকযোগ্য নহে। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্তের "তন্ময়" ইতিশীর্ষক কবিতাটিতে কিন্তু কালের প্রভাব সুস্পষ্ট। কবি বলিতেছেন,—

"শুধু—তোমারে করেছি হৃদয়ের রাণী
আমি তব দীন শিষ্য!"

কবিবর দেখিতেছি নিপুণ শিকারী,—এক ঢিলে দুই পাখী শিকার করিয়াছেন। প্রথমেই প্রিয়াকে "হৃদয়ের রাণী" করিয়া দিলেন; সুতরাং মনে হইতে পারে, পরের চরণে তিনি "প্রজা" না হইয়া ছাড়িবেন না। কিন্তু তিনি উদ্‌ভ্রান্ত পাঠককে বিস্ময়-রসে মগ্ন করিয়া সহসা "দীন শিষ্য" হইয়া পড়িলেন। যাঁহাকে স্বয়ং রাণী করিয়াছেন, কবি যে তাঁহার প্রজা, তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ। সেই জন্য স্পষ্ট করিয়া তাহার উল্লেখ করিলেন না। বোধ করি, খোস্‌কবলায় কবুলতি না দিয়া রাণীর খাজনা আদায়ের পথটাও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। এ দিকে স্বয়ং শিষ্য হইয়া রাণীকে "গুরু"-পদে বরণ করিলেন! সুতরাং প্রথম চরণে তিনি

হইলেন 'রাণী,' ইনি হইলেন 'প্রজা'; দ্বিতীয় চরণে ইনি হইলেন শিষ্য, সুতরাং তিনি হইলেন 'গুরু'। ইহাকেই বলে কবিকৌশল! এই কৌশলটুকুই কবিতাটির সর্ব্বস্ব, তাই আমরা ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম। শেষ চরণটি এই—

"সদা—তোমারই নয়নে চয়ন করিব,
জগতের যত পুণ্য!"

কবি "নয়ন চয়ন" না করিয়া যে "নয়নে" "পুণ্য চয়ন" করিয়াছেন, ইহা রাণী তথা গুরুর পরম সৌভাগ্য। আর এক জন কবি "তন্ময়ের" শেষ চরণ কয়টি রচিয়া সমস্যাপূরণ করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাহা "প্রদীপে"র" শিখায় সমর্পণ না করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি,—

"আমি—এমনি করিয়া লিখিব কবিতা
জড় করি শুধু শব্দ,
কালী—ও কলম খরচ করিয়া
পাঠক করিব জব্দ!"

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "বাঙ্গলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে গুটিকত কথা" নিরঙ্কুশ নব্য লেখকগণের আলোচ্য। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষের "রোহিল্লার রঙ্গভূমি" বিশেষত্ববর্জ্জিত চলনসই রচনা। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর"ভোজ্য, ভূষা ও ভাষা" একটি অদ্ভুত রচনা। পৃথিবীর সকল বিষয়েই মহাভারতী মহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এমন কি, ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাই। এ ক্ষেত্রে তিনি সাহিত্যসেবীর "ভোজ্য, ভূষা ও ভাষার" ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। একটি ব্যবস্থা এই, "সাহিত্য-সেবীদিগের পক্ষে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তিক্ত দ্রব্য সেবন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।" তাঁহার জন্য এ সপ্তাহের মত তিক্তের ব্যবস্থা করিলে তিনি ভস্ম করিবেন না ত? যদি অভয় দেন, একটি কথা বলি,—"যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠী বাজে" —এই অমূল্য প্রবাদবাক্যটি তিনি বারংবার বিস্মৃত হইতেছেন কেন? মহাবৈদ্য মহাভারতী মহাশয় বলিতেছেন,—"এক বৎসরের অনধিক পুরাতন চাউল ব্যবহার করা একবারে নিষিদ্ধ।" চিররুগ্ন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার খুব পুরাতন চাউল ব্যবহার করিতেন। এখন বোঝা গেল, তাই শেষদশায় তাঁহারা বিশেষ কিছু লিখিয়া যাইতে পারেন নাই! সাহিত্যসেবীদের উপকারার্থ, মহাভারতী মহাশয়ের উপদেশসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ আমরা আজ তাহা প্রকাশ করিলাম। হায়! চিকিৎসকের কুপরামর্শে যদি ইঁহারা "এক বৎসরের অনধিক পুরাতন চাউল" ত্যাগ না করিতেন! স্নানের নিয়মটি জানিয়া রাখুন,—"সাহিত্যজীবীর পক্ষে প্রতিদিন স্নান করা অপেক্ষা প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার স্নান করা ভাল।" ভাষ্য,— নিশ্চয়;—প্রমাণ,—কুয়োর দড়ী শীঘ্র পচিয়া যায়, আল্‌নার দড়ী বহুকাল থাকে। "সব ভালো যার শেষ ভালো", তাহাও মহাভারতী মহাশয় বিস্মৃত হন নাই। উপসংহারে বলিয়াছেন,—"গৈরিক বসন এবং দীর্ঘ কেশ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী।" ছেলেবেলায় কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'দীর্ঘ কেশ' ছিল বটে! তাই তিনি এত বড় কবি হইয়াছেন, অত্র সন্দেহো নাস্তি! কিন্তু 'গৈরিক বসনে'র যে এত গুণ, তাহা জানিতাম না। আমরা মনে-

করিতাম, 'গেরুয়া' বুঝি কেবল হজমীগুলি! শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল পরম পিতার নিকট "প্রার্থনা" করিতেছেন,—

"হয় চির-অগ্নি জ্বালি, সুবিশুদ্ধ কর খালি
চিরদিন তরে
নহিলে চাহি না প্রাণ তব অযাচিত দান
অকর্ম্মার পরে!'

পরম পিতা যদি সন্তানের এই প্রার্থনাটি বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে জানিব, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ বটেন। শাসমল মহাশয়ের একটি কথার প্রতিবাদ আবশ্যক। তিনি "তব অযাচিত দান অকর্ম্মার পরে" কেন লিখিলেন? যদি পিতার নিকট আবদার করিয়া আপনাকে 'অকর্ম্মা' বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিব না। কিন্তু যদি তিনি সত্যই আপনাকে 'অকর্ম্মা' মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিব, তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন! কবিতার চাষও ত একটা কর্ম্ম বটে,—তা সু-ই হউক, আর কু-ই হউক। বিশেষতঃ, পিতা যদি তাঁহাদের অন্য কর্ম্ম দিতেন, তাহা হইলে কবির কর্ম্মটি কে নির্ব্বাহ করিত? ইহার পর আবার "কবিতাগুচ্ছ" দেখিতেছি। কিন্তু আজ আর সাহস হইতেছে না, অতএব লোভসংবরণ করিলাম। ইঁহাদের কেহই কবিত্বে কম নহেন, এই পর্য্যন্ত সঙ্ক্ষেপে বলিতে পারি।

প্রবাসী। ভাদ্র। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "গীতাধর্ম্ম" নামক সুচিন্তিত দার্শনিক প্রবন্ধে গীতোক্ত ধর্ম্মের লক্ষণনির্দ্দেশ ও স্বরূপনিরূপণ করিয়াছেন। বিপিন বাবুর রচনায় "সৃজন" প্রভৃতি অপশব্দের অনাবশ্যক বাহুল্য বিস্ময়াবহ। "জমিদারী বন্দোবস্তবিষয়ক আইন" প্রবন্ধটি সাময়িক। লেখকের অনেক ইঙ্গিত বিচার্য্য ও জমীদারসম্প্রদায়ের প্রণিধানযোগ্য। "বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বক্ষ্যমাণ পাণ্ডুলিপিখানি দ্বারা বঙ্গদেশীয় জমিদারবর্গের মধ্যে কতকটা প্রাইমোজেনিচারের অনুরূপ একটি বিধান প্রবর্ত্তিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।" লেখক এই প্রস্তাবিত বিধানের যে এক গজ বাঙ্গলা নাম দিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। গৌণভাবে তাহা "জমিদারী বন্দোবস্ত" বটে, কিন্তু যে বিশেষ বন্দোবস্ত এই বিধানের উদ্দিষ্ট, উক্ত সংজ্ঞায় তাহা অভিব্যক্ত হয় কি? লেখকের মতে, এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, "যে প্রাইমোজেনিচার-পক্ষপাতী জমিদার এরূপ গুরুতর আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াও বন্দোবস্ত গ্রহণ করিবেন, তিনি চিরকালের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মবিক্রয় করিবেন, তাঁহার মস্তকোপরি সর্ব্বদা ডামক্লিসের খড়্গ ঝুলিতে থাকিবে, তিনি কখনও আর স্বীয় লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবেন না।" লেখকের এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ সত্য, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু "শালগ্রামের শয়ন উপবেশন যে সমান," তাহাও ত বিস্মৃত হইতে পারি না। জমীদারসম্প্রদায় এখনও ত গবর্মেণ্টের—জেলার হাকিমের—পুলিসের দারোগার ক্রীড়াপুত্তলী! শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "পণরক্ষা" নামক চলনসই গল্পটিতে বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "কোলজাতির বৃত্তান্ত" সঙ্ক্ষিপ্ত, কিন্তু উল্লেখযোগ্য। কোলের একমাত্র দেবতা—ঈশ্বর 'বোঙ্গা'। 'বোঙ্গা' সাঁওতাল জাতিরও উপাস্য দেবতা। তবে সাঁওতালদের অন্য দেবতাও আছে। সাঁওতালের হলকের মন্ত্র, "চান্দো বোঙ্গা সামানরে, ধরম কথা রড়া।" সাঁওতালী দেবতার অর্থ সূর্য্য নয়? কোনও আদিম জাতির বিবরণ লিখিবার সময় অন্ততঃ একদেশবাসী বিভিন্ন জাতির আচার বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতির তুলনা করিলে মানববিজ্ঞানের অধিকতর উন্নতি হইতে পারে। একটু শ্রমস্বীকার করিলেই লেখকগণ এ বিষয়ে সফল হইতে পারেন। কিন্তু এ জন্য যে সাধারণ অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা আবশ্যক, বাঙ্গালী লেখক তাহাও অনাবশ্যক বা অসাধ্য মনে করেন। দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর "লুপ্ত হিন্দুরাজ্য" প্রবন্ধটি মনোরম। লেখক কাম্বোডিয়ার ও আনামের প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছেন। কাম্বোডিয়া প্রাচীন

কম্বোজ। লেখকের মতে, প্রাচীন কালে অধুনাতন আনামের নাম ছিল 'অণিমা'। লেখক এইরূপ অনেক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রমাণ দেন নাই,—প্রত্নতত্ত্বের আলোকে সত্য-আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির ন্যায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের পারদর্শী দেশীয় পণ্ডিতগণকে গবর্মেণ্ট যদি প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস-সঙ্কলনের জন্য যাবা, সুমাত্রা, বালি, মালয়, কাম্বোডিয়া, আনাম, শ্যাম প্রভৃতি দেশে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আর্য্যজাতির ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযুক্ত হইতে পারে। এ দেশে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় এরূপ অনুষ্ঠান সফল হইবার নহে। "পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" প্রবন্ধে দেখিলাম, "কপিলবস্তু ও পাটলিপুত্রের আবিষ্কর্ত্তা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৮ই শ্রাবণ রক্তামাশয় রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।" বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। পূর্ণ বাবুর বিয়োগে আমাদের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। পরিব্রাজকের লিখিত "ত্রিগর্ত্তদেশ" উল্লেখযোগ্য ও বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ সুখপাঠ্য রচনা। একটু উদ্ধৃত করিব,—"কাঙ্গড়া প্রদেশে ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা; প্রতি বৎসর দুই প্রকার শস্য অবাধে উৎপন্ন হইয়া থাকে। * * * কৃষকেরা শস্য কাটিয়া জমি কর্ষণ করতঃ বীজ ছড়াইযা চলিয়া যায়, দেবরাজ তাহার পর মুষলধারে বারিবর্ষণ করিয়া যান। তাহার পর বীজ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও শস্যভারে অবনত হইয়া পড়ে; তখন কৃষক আনন্দে কর্ত্তন করিয়া গৃহজাত করে। এইরূপে আবহমানকাল এ প্রদেশে বিনা বহুকষ্টে জীবনোপায় সংগৃহীত হয। পুরাতন সেই হল, সেই বীজ, তাহার উন্নতি কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। কৃতবিদ্যগণ এ দিকে একটু দৃষ্টি করিলে যে দেশের ও সমাজের কত উন্নতি করিতে পারেন, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। এ বিষয়ে আমাদের সমূহ ঔদাসীন্য দেখিয়া ইংরাজেরা ক্রমে সমস্ত ভূমি অধিকার করিয়া লইতেছেন; আর সাহুকারের সন্তানেরা জমীজমা তাহাদের নিকট জমানৎ দিয়া তাহাদের অধীনে চাকুরী করিতেছে!" আর একটি সংবাদ এই,—"গভর্ণমেণ্ট অনাবাদী জমী আবাদ করিবার জন্য যে কয়েকটী স্থান—ক্যাম্বেলপুর, লায়লপুর—আবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, দলে দলে তথায় ইংরাজগণ উপস্থিত হইয়া ইজারা লইতেছেন; দুই তিন বৎসরের মধ্যে গোধূম এবং ধান্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন!" তা হউক, আমরা অনশনে বাস্তুভিটায় মরিয়া থাকিব, তবু চাকরী ভিন্ন অন্য পথের পথিক হইব না। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "মহাভারত" নামক প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এবারকার "প্রবাসী"র "গ্রন্থসমালোচন" দেখিবার জিনিস। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার বাহার দেখিতে চাও, "গ্রন্থসমালোচনে" "প্রবাসী"র ভাদ্র মাসের বিকার দেখ। গোঁড়ামী ও পরধর্ম্মবিদ্বেষের বিষে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের এমন অধঃপাত সম্ভবে, তাহা জানিতাম না। কাব্যের সমালোচনা করিতে বসিয়া গৌরাঙ্গদেবকে,—বৈষ্ণব ধর্ম্মকে—বৈষ্ণবগণকে গালি দিবার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। কালিদাসের সেই কবিতাটি মনে পড়িতেছে,—

> "ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
> শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কোনও গ্রন্থে কি এম্. এ. "অধ্যাপক" সম্পাদক এরূপ কোনও উপদেশ লাভ করেন নাই? "শিশুবোধে" যে শিক্ষার আরম্ভ হয়, তাহাতে কিন্তু অন্ততঃ এতটুকু মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। ছি!

সাহিত্য, ১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

১০ই চৈত্র। সকাল বেলা কিয়ৎকাল পঞ্চবাণকে লইয়া কিয়ৎকাল Mademoiselle de Maupin নামক ফরাসী গল্পকাব্যের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া কাটিয়া গেল। তার পর, চুণীবাবু ও সামন্ত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে "মেঘ-মালা"র শেষ গল্পের কিয়দংশ তাঁহাদিগকে শুনাইলাম। সামন্ত মহাশয় বলিলেন, ইহাতে অধঃপাতের চূড়ান্ত প্রদর্শিত হইল বটে, কিন্তু যে ইন্দ্রিয়-জয় কাব্যের প্রতিপাদ্য, তাহার কোন উচ্চ আদর্শ লোকসমক্ষে উপস্থাপিত হইল না। বলা বাহুল্য, আমি তাঁহার মতে সায় দিতে পারিলাম না।—চারিটার সময় কয়েক জন বন্ধু হরিদাস বাবুর গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলাম। তিনি বাটীতে নাই, শুনিয়া, বাবু উপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে প্রায় সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলাম।

১১ই চৈত্র। সকালে উঠিয়া সু—র নিয়োগানুসারে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বাবুজী স্বয়ং অনুপস্থিত। তাঁহার এরূপ অভ্যাস আছে। সে জন্য বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বসিয়া কাগজ পাঠ আরম্ভ করিলাম। কিয়ৎকাল পরে চুণী ভায়া আসিলেন। দুই জনে যতীশ ভায়ার সহিত কিছুক্ষণ গল্প করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। আহারান্তে অক্ষয় বাবুর গৃহে গমন করিলাম। তিনি আগ্রহের সহিত "মেঘ-মালা"র একটি গল্প শ্রবণ করিলেন। বলিলেন,—"খুব ভাল হইয়াছে। এত দূর আমি আশা করি নাই।" সন্ধ্যার পর সু—বাবুর বাটীতে প্রীতিভোজন। কয়েকটি বন্ধু সমবেত হইয়াছিলেন। সোমরাজ কবিবর নবীনচন্দ্রের নিকট হইতে আজ ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সময় সেখানে কিরূপ কাটিয়াছিল, তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সময়টা কেবল "কুরুক্ষেত্রে"র আলোচনাতেই কাটিয়াছিল। পড়িতে পড়িতে দুই জনে কেবল অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। "নির্গুণ নবীন তৃণ" কিন্তু আমার উপর তেমন অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। আমি—"কে আমি, কি নাম ধরি, কোথায় বসতি করি ?" ইত্যাদি দুই একটা প্রশ্ন অবজ্ঞার সহিত (?) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাও আবার সোমরাজের উত্তেজনায় ; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নহে। হে বসুন্ধরে ! তুমি দ্বিধা হও ; নবীন-বিরাগে জীবনই বৃথা !

১২ই চৈত্র। সকালবেলা নিদ্রা হইতে উঠিয়া, প্রথমে পঞ্চুরাম ও তৎপরে Mademoiselleকে লইয়া সময়টা কাটিয়া গেল। আহারের পর বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে প্রিয়বর নবকৃষ্ণ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২রা মার্চের ডায়েরীতে যে প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনি তাহা দেখিয়া বলিলেন—"এ সব কথা ত ছেলের বাপের জন্য লিখিয়াছ, ইহাতে স্বয়ং ছেলের প্রতি দুই একটা উপদেশ কি নাই?" আমি বলিলাম,—"তাও আছে বই কি? আর বাপের কথা যে ছেলেকে পড়িতে নিবারণ করিয়া কোনও মারাত্মক দিব্যি দেওয়া আছে, এমনটাও ত জানি না।" যাহাই হউক, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর একটা কাজ দিলেন। তাঁহার নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া সন্ধ্যার পর কিয়ৎকাল বসিয়া উহা শেষ করিয়া দিলাম। কোন্নগরে আসিয়া তবে পাঠাইয়া দিব, বলিয়াছিলাম; এত সত্বর পাইয়া তিনি বিশেষ আপ্যায়িত হইবেন, সন্দেহ নাই। বেচারী যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার উপযোগী পুরস্কার ত দেখিতে পাই না। তবে সাহিত্যসেবীরা প্রায়শঃ আত্মতৃপ্তির উদ্দেশেই পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি সেই তৃপ্তি পাইতেছেন কি না, বলিতে পারি না। তাহা না হইলে বাস্তবিকই ক্লেশের কথা। এত দূর নিষ্কাম কর্ম্মী এখনও হই নাই যে, সামান্য আত্মপ্রসাদটুকুরও আকাঙ্ক্ষা করিব না।

১৩ই চৈত্র। অদ্য প্রভাতে ঘাঁটাল ষ্টীমারে দিদিঠাকুরাণী দেশে চলিয়া গেলেন। এখন পিতৃদেব মহাশয়ের কষ্টনিবারণ হইলেই পরম লাভ। পঞ্চু এখন একটু সুস্থ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, সে কাল হইয়া যাইতেছে। তা' হউক, আমি আজকাল আর বাহ্য সৌন্দর্য্যের ততটা ভিখারী নহি। সে যে সব অস্পষ্ট কথা বলে, যেরূপ আনন্দের সহিত হাসে, এবং চাঞ্চল্য ও চাতুর্য্য প্রকাশ করে, আমি তাহাতেই মুগ্ধ। এখন আবার হামা দিয়া কতকটা চলিতে শিখিয়াছে। তাহার কাছে কোন খাবার জিনিস রাখা দায়। দেখিলে আর রক্ষা নাই। বড় হইলে সে হয় ত আমার এই কথাগুলি আদরের সহিত, অশ্রুজলের সহিত পাঠ করিবে, তাই যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখিতেছি।

১৪ই চৈত্র। Mademoiselle de Maupin পুস্তকে আদর্শ শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে আমার হৃদয়ে আবার সেই পুরাতন পিপাসা জাগিয়া উঠিতেছে। ভাবিয়াছিলাম, সে তৃষ্ণা বুঝি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দেহের সম্বন্ধে বিস্মৃত হইয়া এখন বুঝি বাস্তবিক আত্মার স্বযমায়

মনকে অভিভূত করিতে শিক্ষা করিয়াছি। আজ দেখিতেছি, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। মানুষ আপনাকে কখনও সেই উচ্চ অবস্থায় উপনীত করিতে পারে কি না, তাহাতেই আজ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যের পিপাসা আজিও প্রাণে অন্তঃশিলা ফল্গুর ন্যায় নীরবে বহিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইতেছি। তবে কি আবার এই তৃষ্ণাকে উদ্দীপিত করিয়া সংসারের তৃপ্তির আশায় ঘুরিয়া বেড়াইব? মনে হয়, যদি সেই আদর্শ সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাই, তবে বুঝি উহাকে অশরীরী সুষমার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারি। কিন্তু কপালে তাহা জুটিবে কি? না, আর কাজ নাই। যে পথে চলিয়াছি, তাহাই ভাল। পিপাসা যদি চিরদিন জ্বলে, তাহাতেও ক্ষতি নাই। বরং ইহাকে লইয়া গিয়া পরজগতে সেই পরম পুরুষের নিকট উপস্থিত হইব। তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিব,—"পিতা, আমি সংসারে কিছুরই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারি নাই। আজ, তোমার সিংহাসন-তলে সেই সহস্র অতৃপ্তি লইয়া আসিয়াছি। তুমি তাহাদের এক একটি করিয়া সকলগুলিকেই সম্পূর্ণ করিয়া দাও। আমার আজন্মের সাধ সফল কর।"

১৫ই চৈত্র। দিদিঠাকুরাণী দেশে গিয়াছেন; পঙ্কুরামের কোনও কষ্ট হইতেছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত ২-১০ মিনিটের গাড়ীতে কলিকাতায় আসিলাম। চারুচন্দ্র দুই বেলা আসিয়া তদারক করিয়া যাইতেছেন; আগামী রবিবার হইতে তিনি এখানে আসিয়া থাকিবেন। তখন বোধ হয় আর কোনও বিষয়ের জন্য ভাবিতে হইবে না। কিন্তু শিশুটির শরীর তেমন পুষ্ট হইতেছে না, দেখিয়া আমার মনে মধ্যে মধ্যে ভাবনা উপস্থিত হয়। সন্ধ্যার পর হী -বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি মেঘমালার "শোভা" নামক গল্পটি পাঠ করিলেন। বলিলেন,—"বেশ হইয়াছে! গল্পের ধরণটি নূতন। ইহার প্রকাশে লোকের উপকার হইবে।" তিনি দুই তিন জায়গায় বর্ণনা একটু বিস্তৃত করিতে বলিলেন। বাঙ্গালী পাঠকের মতি গতি বুঝিয়া আমি এ বিষয়ে সমূহ অবকাশ থাকিলেও একটু সাবধান হইয়াছিলাম। সাধারণতঃ আধুনিক বাঙ্গলার পাঠক-সম্প্রদায় সৌন্দর্য্য বা কবিত্বের দিক দিয়া যান না; কেবল আজগুবী গল্পের অনুসরণ করেন। ইহা ভাল নহে। দেখি, যদি একটু একটু পাঠক-মণ্ডলীর এই ভাবটা ঘুচাইতে পারি।

১৬ই চৈত্র। ফরাসী কবি ও ঔপন্যাসিক Theophile Gautier প্রণীত পুস্তকখানির পাঠ শেষ হইল। পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু সে উল্লাসের প্রকৃতিটা সব সময়ে তত পবিত্র

নহে। শারীরিক বা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় কবি অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাগুলি চিত্রকরের বিশেষশুভমুহূর্ত্ত-প্রসূত, জীবন্তবৎ প্রতীয়মান আলেখ্য হইতেও অধিকতর সজীব এবং শক্তিশালী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে পাঠকের কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিই জাগিয়া উঠে। বিশ্বের যাবতীয় বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে যে অতি পবিত্র মহামহিমাময়ী এক সুষমা নিহিত রহিয়াছে, বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা তাহার কোন উদ্দেশই পাই না। আমি বাহ্যিক অথবা জড় সৌন্দর্য্যের বিরোধী নহি ; সে সৌন্দর্য্যের প্রভাব ও মহত্ব একবারে উপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ করি না। মানুষ যত দিন বর্ত্তমান বৃত্তিসমুদয় লইয়া বাস করিবে, ততদিন তাহার হৃদয়ে এই সৌন্দর্য্যের পিপাসা চিরপ্রজ্বলিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে পিপাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, সদসৎ, সুনীতি-কুনীতি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া যে কোন প্রকারের পানীয় মুখের গোড়ায় ধরিলে চলিবে না। যে তৃষ্ণার্ত্ত, সে তাহার পিপাসার অনুরূপ যে কোন প্রকার বারিই প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু যিনি কবি,—মানব-হৃদয়ের চিকিৎসক, তিনি ঠিক সেইরূপ না দিয়া, কর্দ্দমাক্তের পরিবর্ত্তে পরিশুদ্ধ পানীয়ের ব্যবস্থা করুন।

১৭ই চৈত্র। Gautierএর গ্রন্থের গল্পাংশ অতি সামান্য ও সরল। উহা ঘটনাপ্রধান না হইয়া ভাব ও বর্ণনা প্রধান হইয়া পড়িয়াছে। ঘটনার বৈচিত্র্য বোধ হয় কবির উদ্দেশ্য নহে। যাহা হউক, গল্পটি এই ;—এক জন নায়ক কল্পনায় আপনার বাঞ্ছিত কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া, তাহারই উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এ দিকে এক অলৌকিকসৌন্দর্য্যসম্পন্না যুবতী "মনের মানুষ" পাইবার আশয়ে, পুরুষপরীক্ষার নিমিত্ত পুরুষের বেশে ঘুরিতেছেন। পুরুষের বেশ গ্রহণ করিয়া ইঁহাকে এক মহা গোলযোগে পড়িতে হইয়াছিল। Rosette নাম্নী এক রূপসী ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। নিতান্ত পীড়াপীড়ি দেখিয়া ইনি নিশীথে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। বিরহিণী Rosette প্রেম-বিস্মৃতির নিমিত্ত উন্মত্তা ভ্রমরীর ন্যায় নানা স্থানে বিচরণ করিয়া অবশেষে সেই আদর্শঅন্বেষী নায়কের প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু নায়ক মহাশয় তাঁহার প্রেমে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ভিতরে প্রকৃত প্রেম নাই, বাহিরে কেবল দৈহিক বৃত্তিগুলা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। Rosette এর অবস্থাও বোধ হয় কতকাংশে সেইরূপ। তার পর গ্রন্থে পুরুষবেশিনী নায়িকা আসিয়া আবার দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নায়ক মহাশয় আপনার আদর্শের জীবন্ত প্রতিকৃতি বলিয়া বুঝিতে

পারিলেন। কিন্তু পুরুষের বেশ দেখিয়া সহসা কিছু বলিতে পারেন না। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া পত্রের আকারে তাঁহাকে সমুদয় অবস্থা জ্ঞাপন করেন। নায়িকারও মন একটু নরম হয়। একরাত্রি মাত্র সহবাস-সুখে নায়ককে তৃপ্ত করিয়া তিনি আবার অন্তর্দ্ধান করিলেন। একখানি পত্রে বিদায় লইয়া লিখিলেন,—তুমি Rosetteকে ভালবাসিও। আমি কেবল তোমাদের দুই জনেরই আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া রহিলাম। এ জন্মে এ দেহ আর কাহারও করে সমর্পণ করিব না।

১৮ই চৈত্র। Gautier আপনার গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি বিস্তৃত ভূমিকায় সমালোচক ও সম্পাদকদিগের উপর মনের আনন্দে কয়েকটি বাণবর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার প্রধান আক্রোশ কাব্য সাহিত্যে utility-বাদীদিগের উপর। তিনি বলেন, কাব্যের উদ্দেশ্য কেবল আনন্দ ;—ইহাতে উপকার অনুপকারের কোন কথাই উত্থাপিত হইতে পারে না। কোন কোন কবি এবং গল্প-লেখক এই মতের দোহাই দিয়া অনেক সময়ে একবারে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। মানুষ স্বভাবতঃ পশুমাত্র। পশুর আনন্দও নানাপ্রকার। কিন্তু সদসৎ-বিবেচনা না করিয়া, আনন্দমাত্রেরই উত্তেজনা কবির কার্য্য নহে। একটা সাধু উদ্দেশ্য না থাকিলে কোনও গ্রন্থই গ্রন্থপদবাচ্য হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত উদ্দেশ্যহীন উচ্ছৃঙ্খল কোনও কাব্যকে জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে দেখি নাই। বর্ত্তমান পুস্তকেরও একটা উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা গ্রন্থকারের মনে বিদ্যমান ছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সমালোচক সহজেই বুঝিতে পারেন। আদর্শ সৌন্দর্য্যকে আমরা চিরদিন বাহুপাশে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। কবে কোন পবিত্র শুভ মুহূর্ত্তে উহা আমাদিগকে স্বপ্নবৎ দর্শন দিয়া, আমরা উহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না করিতেই, অন্তর্হিত হইয়া যায়।

সুতরাং যাহা নিশ্চিত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই অনিশ্চিত অস্থির প্রকৃতির পশ্চাদ্ধাবন নিতান্তই মূর্খতার পরিচায়ক। তাই আদর্শসৌন্দর্য্যরূপিণী Mademoiselle de Maupin তাঁহার প্রণয়ী ও প্রণয়িণী উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া গেলেন, তোমরা আমাকে অর্থাৎ প্রেমের আদর্শকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া পরস্পরকে ভালবাসিতে থাক। এইরূপ করিতে করিতে পরিণামে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—অর্থাৎ প্রেমে আদর্শ উন্নতিলাভ করিবে। "মেঘমালা"র উষা-নামক গল্প গত মাসের প্রারম্ভে শেষ করিতে পারি নাই বলিয়া যে কথা লিখিয়া-ছিলাম, তাহা আবার এখানে লিখিতে হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা কতকটা যে অগ্রসর

না হইয়াছে, এমন নহে। কিন্তু এখনও শেষ করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালা বৎসরে বহিখানি আর প্রচার করা হইয়া উঠিল না। প্রথমকার দুইটি গল্প বহুপূর্ব্বকার রচনা, তাহাদের ভাষার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। সেগুলি সংশোধন করিয়া তবে প্রকাশিত করিতে হইবে। সে কাজটাও নিতান্ত সহজ নহে। কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল না হইয়া গেলে হয়। যাহা হউক, শেষ গল্পটি শেষ করিতে না পারিলে মনটা তৃপ্ত হইতেছে না। হী—বাবু বলেন,—প্রতিদিন সকালে খানিকটা সময় সাহিত্যসেবার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিলে সংকল্পগুলি সহজে সিদ্ধ হইতে পারে। আমি কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারি না। Pegasus এর উপর এখনও ততটা প্রভুত্ব করিতে পারি নাই। এক এক দিন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও এক ছত্রও বাহির করিতে পারি নাই।

১৯শে চৈত্র। "নব্যভারতে" দিবার জন্য "বসন্তের বোধন" নামক একটা পুরাতন কবিতা সংশোধনের চেষ্টা করিতেছিলাম। সংশোধনের কার্য্যটা কি গুরুতর! খানিকটা সময় মাথা ঘামাইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া ফেলিয়া রাখিলাম। সেক্ষপীয়র আপনার সাহিত্য-জীবনের শিক্ষানবিশী পরের রচনা সংশোধন করিয়া সাঙ্গ করিয়াছিলেন। এ বিষয়েও তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ বলিতে হইবে। আমাদের নিজের রচনা সংস্কৃত, মার্জ্জিত করিতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়। তিনি অপরের মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাঁহার প্রাণের ভাবগুলি বুঝিয়া, কিরূপে উহাদিগকে একটা সম্পূর্ণ অবয়ব প্রদান করিতেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময় উপস্থিত হয়। তবে হয় ত ইহাও হইতে পারে যে, নিজের লেখা কাটাকুটি করা অপেক্ষা পরের রচনার উপর হাতটা কিছু খেলে ভাল। যাহাই হউক, এইরূপ সংশোধনের কার্য্যটা নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইলেও ইহার উপকারিতা বড়ই বেশী। শিক্ষানবিশী যখন প্রয়োজনীয়, তখন উহা এইরূপেই করা কর্ত্তব্য, এবং ফলপ্রদ।

২০শে চৈত্র। চৈত্রমাসের "নব্যভারতে" নবীনবাবু বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র-ব্যাখ্যার পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা প্রকাশিত হইয়াছে, দেখিলাম। আমার বিশ্বাস, কৃষ্ণচরিত্রের বর্ত্তমান ব্যাখ্যার মৌলিকতা যে নবীন বাবুরই, তাহা "সাহিত্যে" বন্ধুবর হীরেন্দ্রনাথ সপ্রমাণ করিয়াছেন। "নব্যভারত"-সম্পাদক মহাশয়ের যুক্তি বড় অদ্ভুত। তিনি বলিতেছেন,—"কুরুক্ষেত্র যখন বঙ্কিম বাবুর পুস্তকপ্রকাশের পর বাহির হইয়াছে, তখন ইতিহাস বলিবেই, নবীনবাবু মূলমন্ত্রে বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী।" ইতিহাস কখন এরূপ অদ্ভুত বিচার করিয়াছেন কি না, আমাদের মনে নাই। বর্ত্তমান বিষয়ে যে করিবেন না, তাহা নিশ্চিত।

হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ সম্মুখে রাখিয়া নিতান্ত মূর্খ ও অন্ধ ঐতিহাসিক ভিন্ন এ কথা আর কেহই বলিবেন না যে, "কুরুক্ষেত্র" "কৃষ্ণচরিত্রে"র পরে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উহা পূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকের নিকট ঋণী। সম্পাদক বলিতেছেন, "ইতিহাসের চক্ষে ইহা ভ্রমের ছায়া।" জিজ্ঞাসা করি, সত্যের আলোকে সেই ভ্রমের ছায়া অপনীত না করা কি সুবুদ্ধির কার্য্য?

২১শে চৈত্র। চৈত্রমাসের "নব্যভারতে" প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি পাঠ করিলাম। আজি কালি মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা পাঠ করা কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কেহ মাথার দিব্য দিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করে নাই বটে, কিন্তু কেমন কপালের দোষ, গণা-গাঁথা, ছোট ছোট লাইনগুলি দেখিলেই মধুলোভী ভ্রমরের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে সেই দিকেই ছুটিয়া যাই। বাঙ্গলার বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়েরা যে আজ কাল কেবল শুষ্ক ঘেঁটু ফুলের মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা মনেই থাকে না। এবারকার "নব্যভারতে" বোধ হয় দুই ফর্ম্মারও অধিক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুই চারিটি অনুবাদ এবং প্রিয়বর অক্ষয়বাবুর "বিবাহোৎসব" ব্যতীত আর একটাও ত পড়িবার উপযোগী বলিয়া বোধ হইল না। "ফাল্গুন মাসের বাকী তিন ফর্ম্মা" এরূপে না পুরাইয়া, সম্পাদক মহাশয় যদি তিন ফর্ম্মা সাদা কাগজ গাঁথিয়া দিতেন, তাহা হইলে গ্রাহকেরা তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত; আর আধুনিক বাঙ্গালার বেওয়ারিস বীণাপাণিও এই নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার হইতেন। বাজারের গতিক দেখিয়া বোধ হইতেছে, আমাদের কঠোর সু—চন্দ্র তাঁহার কশাঘাতগুলাকে কঠোরতর করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

২২শে চৈত্র। Dr. Blair প্রণীত "Rhetoric and Belles Letters" নামক গ্রন্থখানি আনন্দের সহিত পাঠ করিতেছি। কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার ঐকমত্য দেখিয়া বড়ই উৎফুল্ল হইয়াছি। "Taste" নামক পরিচ্ছেদে Blair বেশ সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে, সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার কেবল ব্যক্তিগত নহে; উহার একটা উদার প্রাকৃতিক ভিত্তি আছে। "আমার ভাল লাগিল না, সুতরাং জিনিসটা ভাল নহে," যাঁহারা কেবল এই কথা বলিয়াই সকল তত্ত্বের শেষ করিয়া দেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। যথার্থ সৌন্দর্য্যানুভবশক্তির ভিতর দুইটিমাত্র বৃত্তি বিদ্যমান,—Delicacy এবং Correctness। Delicacy অর্থে, সাধারণ লোকে যাহা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারে না,

কাব্যের সেই সকল সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি। আর Correctness অর্থে, ঝুঁটা সৌন্দর্য্যকে প্রকৃত বলিয়া মনে না করা। প্রথমটি প্রধানতঃ স্বভাবজ ; দ্বিতীয়টি অনুশীলন-সাপেক্ষ। কিন্তু সৌন্দর্য্যের আসল নকল কি প্রকারে প্রভেদ করা যাইবে? Blair বলিতেছেন, যুগ-যুগান্তরের বহুদর্শিতায়, অধিকাংশ মানব-হৃদয়ের মতিগতি নিরীক্ষণ করিয়া, সমালোচকগণ যে সকল সার্ব্বভৌমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই আমাদের নিয়ন্তা ;—অর্থাৎ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" জগতের সাহিত্যে এমন কয়েকখানি গ্রন্থ রহিয়াছে, যাহাদের সৌন্দর্য্য এ পর্য্যন্ত সকলেই অতি উচ্চ এবং আদর্শস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। সৌন্দর্য্য-বোধ কেবল ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর নির্ভর করিলে এরূপ কখনই হইত না।

২৩শে চৈত্র। Lectures on Rhetoric and Belles Letters নামক পুস্তকে ডাক্তার ব্লেয়ার সমালোচন-প্রথার উৎপত্তি এবং সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। দোষ-গুণ, সৌন্দর্য্য, অসৌন্দর্য্য নির্ব্বাচনের নামই সমালোচনা। বিশেষ দৃষ্টান্ত হইতে সমালোচক সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হন। সাহিত্যের সৃষ্টিকাল হইতে সমালোচক দেখিয়া আসিতেছেন, কোন্ কোন্ সৌন্দর্য্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে মানুষের মন অধিকতর মুগ্ধ হয় ; তিনি অমনি নিয়ম করিলেন, কোনও গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখিয়া লোকের মনোহরণ করিতে বাসনা করিলে, তাঁহাকে এই এই তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা তাঁহার কাব্য হৃদয়গ্রাহী হইবে না। যদি তিনি মহাকাব্য রচনা করিতে চান, তবে, "সর্গবন্ধং মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ" ইত্যাদি যে নিয়মগুলি বহুকালের বহুদর্শিতায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা পালন করিতে হইবে। নতুবা মহাকাব্য-পাঠের যে আনন্দ, তাহা লোকে পাইবে না। সমালোচন-শাস্ত্রটা আগাগোড়া এইরূপ ভূয়োদর্শনমূলক। কখনও কখনও নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াও কোনও কোনও গ্রন্থকারকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে দেখা যায় বটে ; কিন্তু উহার কারণ লোকের বিচার-শক্তি অথবা রুচির সাময়িক অবনতি, আর কিছুই নহে। কালবশে লোকের সমালোচন-শক্তি আবার প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সেই ক্ষণিক প্রতিষ্ঠাপন্ন কবির নাম কোথায় লুপ্ত হইয়া যায়। সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে ব্লেয়ার বলেন, তিনি নাটক-রচনার নিয়ম অনেক স্থলে রক্ষা করেন নাই ; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থসমূহে সৌন্দর্য্যের এত বহুল সমাবেশ যে, লোকে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া দোষের প্রতি লক্ষ্য করিবার অবসর পায় না। Blairএর কথার উপর আমার একটু বক্তব্য আছে। সেক্ষপীয়রের

দুই একটা দোষ আজকাল গুণ বলিয়া কেহ কেহ বিবেচনা করিতেছেন ; Blair তাহার উল্লেখ করেন নাই। Tragidy ও Comedyর মিশ্রণকে তিনি দোষ বলেন ; কিন্তু Dr. Quincey Macbeth নাটকের দ্বারোদ্ঘাটন দৃশ্যের যেরূপ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, এই মিশ্রিত পদ্ধতির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

২৪শে চৈত্র। কাল সূর্য্যগ্রহণের জন্য স্কুল বন্ধ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। সকালবেলা সু—চন্দ্রের বাটীতে গ্রহণটা বেশ উপভোগ করিয়াছি। উপরে ডায়েরীর প্রকাশক যে সময় গ্রহণ আরম্ভের কথা লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিয়াই বোধ হইল। তবে, দুই চারি মিনিটের প্রভেদ চর্ম্মচক্ষে ধরা পড়ে না। সূর্য্যের প্রায় ১২ আনা রকম দৃষ্টির অগোচর হইয়াছিল। আমাদের প্রিয় বাবুজীর সব বিষয়েই একটা উৎকট বাহাদুরী না দেখাইলে চলে না। তিনি আমার নাসিকা হইতে চশমাখানা খুলিয়া লইয়া, তাহাই বাতীর শিখায় পুড়াইয়া, কালো করিয়া, দেখিতে লাগিলেন। আমি বহুদিনের পরীক্ষিত চশমা জোড়াটির নিমিত্ত আশঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। পরে কিন্তু উহার ভিতর দিয়া গ্রহণ দেখিয়া বেশ একটু আনন্দের উদয় হইল। সুতরাং ভয়ের ক্ষতিটা পোষাইয়া গেল। সুখের বিষয়, চস্‌মা জোড়াটির কোনও ক্ষতি হয় নাই। ইচ্ছা আছে, Lawrence Mayo মহাশয়দিগের বাড়ীর এই দশ টাকা দামের চশমা জোড়াটি লইয়া এ জীবনটা কাটাইয়া দিব। কিন্তু চক্ষু দুইটা দিন দিন বড় বেশী খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অবশেষে, পরিণামটা মিল্‌টনের ন্যায় হইবে কি না, ভগবানই জানেন।

রাজশেখর।

সংস্কৃত সাহিত্যে রাজশেখরের নাম সুপরিচিত। তাঁহার প্রণীত চারিখানি নাটক বিদ্যমান আছে। সেই চারিখানি নাটকের নাম, যথা—(১) কর্পূর-মঞ্জরী, (২) বিদ্ধশালভঞ্জিকা, (৩) বালরামায়ণ ও (৪) বালভারত (বা প্রচণ্ডপাণ্ডব)। বালরামায়ণ নাটকের প্রথম অঙ্কে রাজশেখর লিখিয়াছেন, তিনি ছয়খানি গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, তাঁহার অপর দুই-খানি গ্রন্থ কোথায় গেল ? বোধ হয়, উক্ত দুইখানি গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু উহাদের রচয়িতা অন্য নামে পরিচিত হইয়াছেন।

কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থ আদ্যোপান্ত বিশুদ্ধ প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। কুন্তল-রাজ-কন্যা কর্পূরমঞ্জরীর সহিত রাজা চণ্ডপালের বিবাহ এই গ্রন্থের অভিনেতব্য বিষয়। নায়িকার নাম-অনুসারে এই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। এই গ্রন্থ অদ্ভুত রসে পরিপূর্ণ। ইহাতে চারিটি অঙ্ক আছে। ইহার অঙ্কসমূহ জবনিকা নামে উক্ত হইয়াছে। এই প্রকার গ্রন্থের পারিভাষিক নাম সট্টক। সট্টক এক প্রকার দৃশ্য কাব্য। ইহার সহিত নাটিকার প্রভেদ এই যে, ইহাতে প্রবেশক বা বিষ্কম্ভক থাকে না। রাজশেখরের পত্নী অবন্তীসুন্দরীর অনুরোধে কর্পূরমঞ্জরী প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকা শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে চারিটি অঙ্ক বিদ্যমান আছে। লাট দেশের রাজা চন্দ্রবর্ম্মের কন্যা মৃগাঙ্কাবলীর সহিত রাজা বিদ্যাধর-মল্লের বিবাহ এই নাটিকার বর্ণনীয় বিষয়। যুবরাজদেবের অনুরোধে এই নাটিকা প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল। এই যুবরাজদেব কে? কেহ কেহ অনু-মান করেন, ইনি কান্যকুব্জের যুবরাজ মহীপাল (খৃঃ ৯১৭)। অপর কাহারও মতে যুবরাজ শব্দে চেদির কেয়ূরবর্ষ যুবরাজদেবকে (১) লক্ষ্য করা হইয়াছে। অথবা, চেদির দ্বিতীয় যুবরাজদেবও ঐ শব্দের লক্ষ্য হইতে পারেন। কেয়ূরবর্ষ যুবরাজদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

বালরামায়ণ নাটক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত। এরূপ সুবৃহৎ নাটক সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। রাজা মহেন্দ্রপালের (খৃঃ ৯০৭) অনু-রোধে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। সীতার স্বয়ংবর হইতে রাবণ-বধ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের জীবনের সমস্ত ঘটনা এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে।

বালভারতের অপর নাম প্রচণ্ডপাণ্ডব। ইহা নাটক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে দুইটিমাত্র অঙ্ক বিদ্যমান। কিন্তু নাটকে অন্ততঃ পাঁচটি অঙ্ক বিদ্যমান থাকে। ইহা দেখিয়া বোধ হয়, বালভারত অসমাপ্ত অবস্থাতেই রহিয়াছে। দ্রৌপদীর স্বয়ং-বর, যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও পাণ্ডবগণের বনগমন এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা মহীপালের (খৃঃ ৯১৭) সমক্ষে মহোদয়ে (কান্যকুব্জে) এই নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

স্বপ্রণীত গ্রন্থসমূহে রাজশেখর কিয়ৎপরিমাণে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া-ছেন। তাঁহার নাটকসমূহের প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, তিনি শৈব ছিলেন। কিন্তু যশস্তিলকচম্পূ গ্রন্থে দেখা যায়, জৈন ধর্ম্মেও তাঁহার অনাস্থা ছিল না।

বালরামায়ণের প্রথম অঙ্ক পাঠ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহার পিতার নাম দুর্দ্দুক ও মাতার নাম শীলবতী। তাঁহার পিতা মহামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনেকেই কবি ছিলেন। রাজশেখর যাযাবর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১) যাযাবর এক প্রকার গৃহস্থ। দেবল বলেন, গৃহস্থ দুই প্রকার,—যাযাবর ও শালীন। যাযাবর গৃহস্থ কি প্রকার, তাহার প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ল্যান্‌ম্যান প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও আপ্তে প্রভৃতি প্রাচ্য পণ্ডিতের মতে যাযাবরগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। অকালজলদ, সুরানন্দ, তরল ও কবিরাজ প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিবর্গ এই বংশ (২) অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অকালজলদ রাজশেখরের প্রপিতামহ।

কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থের প্রথম অঙ্কে দৃষ্ট হয়, রাজশেখরের পত্নীর নাম অবন্তী-সুন্দরী। তিনি "চৌহানকুলমৌলিমালা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। চৌহান নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ ছিল। অবন্তীসুন্দরী যে চৌহান-বংশে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারাও কি ক্ষত্রিয় ছিলেন?

রাজশেখর দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশে (মহারাষ্ট্র দেশে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ অকালজলদ বালরামায়ণ নাটকে "মহারাষ্ট্রচূড়ামণি" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু সূক্তিমুক্তাবলী গ্রন্থে সুরানন্দ নামক রাজশেখরের এক জন পূর্ব্বপুরুষ "চেদিমণ্ডলমণ্ডন" এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। বালরামায়ণপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, রাজশেখর মহারাষ্ট্র দেশেই সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি উক্ত দেশের ভাষা বহুলপরিমাণে স্বকীয় গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন। রাজশেখর যে দাক্ষিণাত্যের লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি দক্ষিণ দেশের আচার ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কাবেরী, তাম্রপর্ণী, নর্ম্মদা প্রভৃতি নদীর উল্লেখ তাঁহার গ্রন্থে পুনঃপুনঃ দেখিতে পাওয়া

---

(১) দুর্দ্দো যত্রাসীদ্ গুণগণ ইবাকালজলদঃ
সুরানন্দঃ সোঽপি শ্রবণপুটপেয়েন বচসা।
ন চান্যে গণ্যন্তে তরল-কবিরাজপ্রভৃতয়ো
মহাভাগস্তস্মিন্নয়মজনি যাযাবরকুলে॥—বালরামায়ণ, ১—১৩।

(২) কর্ণাটীদশনাঙ্কিতঃ শিতমহারাষ্ট্রীকটাক্ষাহতঃ
প্রৌঢ়ান্ধ্রীস্তনপীড়িতঃ প্রণয়িনীভ্রূভঙ্গবিত্রাসিতঃ।
লাটীবাহুবিবেষ্টিতশ্চ মলয়স্ত্রীতর্জ্জনীতর্জ্জিতঃ
সোঽয়ং সংপ্রতি রাজশেখরকবির্বারাণসীং বাঞ্ছতি॥—ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, ৫।

যায়। তিনি দ্রবিড়রমণীগণের কৃষ্ণবর্ণ গণ্ডস্থল, কর্ণাটরমণীগণের চূর্ণকুন্তল ও লাটরমণীগণের আমোদপ্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। ঔচিত্য-বিচারচর্চ্চা গ্রন্থ পাঠ করিলেও দৃষ্ট হয়, তিনি দাক্ষিণাত্যের লোক ছিলেন, এবং পরিশেষে বারাণসীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি অর্থোপার্জ্জনের মানসে কান্যকুব্জ রাজধানীতে গমন করিয়া তথায় বহুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহেন্দ্রপাল কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর মহীপাল কান্যকুব্জের রাজা হন। রাজশেখর মহীপালের রাজত্বকালের প্রারম্ভেও কান্যকুব্জে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার বালভারত নাটক মহীপালের অনুরোধেই প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

নানা প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, রাজশেখর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। মাধবাচার্য্যের শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থের মতে, শঙ্করাচার্য্য ও রাজশেখর সমসাময়িক। কিন্তু এই মত অপ্রামাণিক। কেহ কেহ প্রবন্ধকোষ গ্রন্থের প্রণেতা রাজশেখর ও কবি রাজশেখরকে একই ব্যক্তি মনে করিয়া বলিয়াছেন, তিনি খৃষ্টীয় ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধকোষ-কার ও কবি রাজশেখর স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন।

বালরামায়ণ ও বালভারত নাটকে বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি ও ভর্ত্তৃমেণ্ঠের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, রাজশেখর এই তিন কবির (৩) পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ভবভূতি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষ ও ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব রাজশেখর অষ্টম শতাব্দীর পরবর্ত্তী কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত কবিগণ ব্যতীত অনেক গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম রাজশেখরের কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। রাজশেখর যে যে কবির উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এই,—(১) বাল্মীকি, (২) ব্যাস, (৩) ভর্ত্তৃমেণ্ঠ, (৪) ভবভূতি (খৃঃ ৭০০) (৫) হরি উড্‌ঢ, (৬) নন্দি উড্‌ঢ, (৭) পোট্টিস, (৮) হাল, (৯) অপরাজিত, এবং (১০) শঙ্কর বর্ম্মন্।

অনেক গ্রন্থকার রাজশেখরের নাম বা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। বল্লভদেব ও অভিনন্দনের গ্রন্থে রাজশেখরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সোমদেবের

---

(৩) বভূব বল্মীকভবঃ পুরা কবিঃ
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃমেণ্ঠতাম্)।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া
স বর্ত্ততে সংপ্রতি রাজশেখরঃ। —বালরামায়ণ, বালভারত, ১।

যশস্তিলকচম্পূ গ্রন্থেও রাজশেখরের নাম দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় ৯৬১ অব্দে রচিত হইয়াছিল। অতএব, রাজশেখর ৯৬০ অব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

দশরূপক ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ নামক দুইখানি সুবিখ্যাত অলঙ্কার গ্রন্থেও রাজশেখরের শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থ যথাক্রমে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। অতএব, রাজশেখর এই সময়ের পূর্ব্বের লোক। ক্ষেমেন্দ্রের (দ্বাদশ শতাব্দীতে) ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, কবিকণ্ঠাভরণ, সুবৃত্ততিলক ইত্যাদি গ্রন্থেও রাজশেখরের শ্লোক বা নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। কাব্যপ্রকাশ, প্রাকৃতপিঙ্গল, গুণরত্নমহোদধি, হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ, মঙ্খের শ্রীকণ্ঠচরিত, অভিনবগুপ্তের গ্রন্থ, রুয্যক, কুবলয়ানন্দ, সাহিত্যদর্পণ, মার্কণ্ডেয়ের প্রাকৃত ব্যাকরণ, কাল্লের কুতূহল ইত্যাদি বহু গ্রন্থে রাজশেখরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

উল্লিখিত যুক্তিসমূহ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয়, রাজশেখর অষ্টম শতাব্দীর পরে ও দশম শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অস্নি উৎকীর্ণলিপিতে মহীপালের নাম পাওয়া যায়। সিয়দোনি উৎকীর্ণলিপি অনুসারে জানা যায়, ভোজ খৃঃ ৮৬২, মহেন্দ্রপাল খৃঃ ৯০৩, মহীপাল খৃঃ ৯১৭ ও দেবপাল খৃঃ ৯৪৮ অব্দে কান্যকুব্জে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজশেখর মহেন্দ্রপাল মহীপালের সমসাময়িক। সুতরাং তিনি খৃঃ ৯০৩—৯১৭ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

হাসি।

হাসি খুসী বেশ। খুসীর হাসি সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম, অগ্নির উদ্দীপক ও বলবৃদ্ধিকারক। স্বর্ণসিন্দুর মকরধ্বজের ন্যায়।

অনুপানবিশেষে হাসির তারতম্য হয়। হঠাৎ অকারণ হাসা লজ্জাজনক। এরূপ হাসি বিরল। পদ্মযোনি সৃষ্টির পূর্ব্বে এই হাসি হাসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শিবের ভয়ে পারেন নাই।

যখন হাসা একটা স্বভাব, তখন অকারণ হাসা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অনেকে অকারণে গোঁফে তা দেয়। উহা স্বভাব। কোন বিশেষ কারণবশতঃ কেহ কখনও গোঁফে তা দিয়াছিল, তাহা শুনা যায় নাই।

ব্রহ্মার পূর্ব্বকথিত হাসির দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। তারিণীশঙ্কর বেদান্তবাগীশ একটি অতি উৎকৃষ্ট রচনা করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। না হাসিলেও চলিত। কেন না, সে রচনা পাঠ করিয়া অবশেষে সকলেই হাসিয়াছিল। উহা পূর্ব্বে জানিলে তিনি কখনও হাসিতেন না।

হাসির অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত সংগ্রহ না করিলে তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না।

কোনও বুধশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়াছিলেন যে, অহঙ্কার হইতে হাসির উৎপত্তি হয়। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেকে অহঙ্কারশূন্য বিনীত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুগণকে অবিশ্রান্ত হাসিতে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহারা জানেন, এরূপ হাসি অন্তুতর। হাস্যরস বলিয়া যে একটা রস আছে, তাহাও কাব্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ রসের রাসায়নিক পরীক্ষা ভাল করিয়া হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন, হাসি বায়বীয় পদার্থ। একটা গ্যাস আছে, তাহা সেবন করিলে হাস্যের আবির্ভাব হয়।

কেহই সম্পূর্ণ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। হাসির মূলে যে কি আছে, তাহা ভাবিয়া নির্ণয় করা যায় না।

তাহার কারণ এই যে, বেশী ভাবিতে গেলে হাসি পায়। হাসিকে ধরিতে গেলে হাসি স্কন্ধে আরোহণ করে। নীল বানর এইরূপে রাবণের স্কন্ধে চড়িয়াছিল।

আবার এক জঞ্জাল এই যে, দুঃখ হইতে হাসি আসে, এবং সুখের চোটে কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলে। ইহার বৈজ্ঞানিক তথ্য নিরূপণ করা দুষ্কর।

মনে কর, একটা ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য সে স্থলে কাঁদাই উচিত। কাঁদিতে কাঁদিতে যখন শরীর অবসন্ন হইয়া যায়, তখন হয় ত লোকটা মরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক সে মরে না। কিয়ৎক্ষণ বেঅকুফের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। অবশেষে কেহ না থাকিলে আস্তে ব্যস্তে চারি দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলে।

সেইরূপ, হাসিতে হাসিতে মাংসপেশী অবসন্ন হইলে লোকটা ব্যথা পাইয়া কাঁদে। চক্ষু দিয়া জল পড়ে। মস্তকে বেদনা হয়। অবশেষে কাঁদিলে সারিয়া যায়।

এই সব দেখিয়া চলিত বচন বলিতেছে, "যত হাসি, তত কান্না"।

"ঘৃণার হাসি", "অবজ্ঞার হাসি", "প্রাণের হাসি", "সুখের হাসি" প্রভৃতি

হাসির অনেক বিশেষণ আছে। সেইরূপ, "মিলনের হাসি", "বিরহের হাসি" ইত্যাদি। বিদ্রূপের হাসিও এক রকম হাসি।

প্রথমে দেখা যাউক, হাসির আকার কি? মুখব্যাদান ও দন্তবিকাশই যে হাসির লক্ষণ, তাহা নহে। আমরা অনেক সময় ভয়ে হাসি চাপিয়া রাখি। ভয়ে ক্রন্দনও চাপা যায়। হাস্ত ক্রন্দনের ব্যবধান মাংসপেশী ও মুখভঙ্গীতে বড় বেশী নয়। মুখুর্য্যে মহাশয় হাসিতেছেন কি কাঁদিতেছেন, ইহা অনেকে নির্ণয় করিতে পারিত না। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের প্রভেদ বেলা পাঁচটায় সময় দিবানিদ্রা হইতে উঠিলে বড় বুঝা যায় না। অনেক সময় ভ্রম হয়। এইরূপ ভ্রমবশতঃ কেহ কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে মনে করে, আমি হাসিতেছি।

বনলতা। নাথ! এত রাত্রিতে কাঁদছ কেন?

বিপিনচন্দ্র। তুমি কি পাগল? আমি যে হাস্‌ছি, ইহার দ্বারা একটা গুরুতর সত্যের আবিষ্কার হইতেছে। কোনপ্রকার বেগ এক দিক দিয়া বাহির হইলে তাহার নাম হাসি, এবং অন্য পথ দিয়া বাহির হইলে তাহার নাম কান্না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বেগটা একই, কিংবা মূলে ভিন্ন প্রকার? এই সমস্যার মীমাংসা হইলেই তত্ত্বের অনেকটা নিকটে উপনীত হইতে পারা যায়।

শরীরের স্থূল ও সূক্ষ্ম আবর্জ্জনা-বহিষ্করণের একটা বেগ আছে। যোগশাস্ত্রে তাহাকে বায়ু কহে। বিভিন্ন নালী দিয়া বাহির হইলে তাহার বিভিন্ন নাম হয়। সংসারেও দেখা যায় যে, একই কথা রামধনের মুখ দিয়া বাহির হইলে "সত্য" আখ্যাত হয়, এবং শ্যামধনের মুখ দিয়া বাহির হইলে তাহা "মিথ্যা" দাঁড়ায়।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। একই আত্মা কখনও স্ত্রী হয়, কখনও পুরুষ রূপে আবির্ভূত হয়।

ইহার অর্থ কি?

বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, সংস্কারবশতঃ গাধা বানর প্রভৃতি হয়। সংস্কারের প্রভাব গুরুতর হইলে আত্মা বলশালী পুরুষ হইয়া পড়ে, এবং সংস্কার নির্জীব হইলে আত্মা অবলারূপে প্রকাশ পায়।

আত্মা দ্রুতবেগে কম্পিত হইলে অগ্নি হয়, এবং তদপেক্ষা ক্ষীণভাবে স্পন্দিত হইলে জল হয়। শক্তি একই। স্পন্দনের ইতরবিশেষে রূপের তারতম্য।

এতটুকু সকলেই বুঝেন যে, হাসিতে বেশী শক্তি লাগে, এবং স্পন্দনও ঘোরতর বেগে হয়। কাঁদিতে শক্তি কম লাগে। অতএব, স্ত্রীলোকেরাই শীঘ্র কাঁদিয়া ফেলে। পুরুষও কাঁদে, কিন্তু তাহা দুর্ব্বলের চিহ্ন।

অথচ কি করিয়া উভয়ের বিভিন্ন রূপ হয়, তাহা বুঝিতে সময় লাগিবে।

দার্শনিকগণ হাস্যকর্ম্মকে সচরাচর আনন্দ কিংবা সুখের চিহ্ন মনে করেন। সেইরূপ, ক্রন্দনকে দুঃখের চিহ্ন মনে করেন।

সুখ দুঃখ কি?

অভাবে দুঃখ হয়। কিন্তু অনেকে ঘোর অভাব সত্বেও হাসে। সুতরাং সুখ দুঃখের সহিত হাস্যের কোন স্থির নিয়মাবদ্ধ সম্বন্ধ নাই।

তবে কি কোন নিয়ম নাই?

ভাল করিয়া দেখুন।

১। দস্তুরমাফিক হাসি কান্না। অর্থাৎ, দুঃখ হইলে কান্না, এবং সুখ হইলে হাসা। ইহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

২। অকারণ হাসি কান্না। যেমন পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইহা স্বভাবের বেগ। যেমন নিষ্ঠীবন-ত্যাগ প্রভৃতি।

৩। বেদস্তুর হাসি কান্না। যেমন দুঃখে হাসি, সুখে কান্না প্রভৃতি।

ইহার অন্তর্নিহিত তত্বের নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, হাসে কে?

অবশ্য মানুষটা হাসে।

কাহাকে দেখিয়া হাসে?

পাগল আপনার মনে হাসে। যাহারা পাগল নয়, তাহারাও অনেক সময় নির্জ্জনে বসিয়া হাসে। সুতরাং গোড়ায় দেখিতে গেলে বেশ বুঝা যায় যে, মানুষটার মধ্যেই কোনও কারণবশতঃ একটা বেগের উৎপত্তি হয়, তাহাতে সে হাসিয়া ফেলে।

যেমন কোন অখাদ্য দুষ্পাচ্য পদার্থ ভোজন করিলে জীব তাহা উদ্গিরণ করে, সেইরূপ কোন পদার্থবিশেষের সহিত সংঘর্ষণ না হইলে হাসির উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত।

এই পদার্থ অবশ্য মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন উল্লিখিত দৃষ্টান্তে অখাদ্য উদরে উপস্থিত হয়, সেইরূপ। এই পদার্থবিশেষের নাম (দার্শনিক-গণের ভাষায়) "ভাব", কিংবা idea।

অষ্টাবক্র ঋষির চেহারা দেখিয়া কোন মুনিকন্যা হাসিয়াছিল। যখন অষ্টা-বক্র চটিয়া শাপ দিলেন, তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল। এখন উপায়?

অষ্টাবক্র বুঝাইলেন, দেখ মা, ঈশ্বর আমাকে কুৎসিত রূপে প্রকাশ করিয়া-

ছেন। আমার অষ্ট ঠাঁই বাঁকা। আমি চলিতে অক্ষম। আমি বড় অভাগা।"

মুনিকন্যার হৃদয় গলিয়া গেল। অনুতাপ হইল। তখন জীবদুঃখ তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল। অভিশাপের ফলরূপ দারুণ ভয় হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। সুতরাং নূতন ধরণের ক্রন্দন। কাজেই অভিশাপেরও অবসান

বুল সাহেবের ভুঁড়ি দেখিয়া চক্রবর্ত্তী হাসিয়াছিল। সাহেব চক্রবর্ত্তীর টীকি ধরিয়া ক্রমাগত লাথি মারিতে লাগিল। অবশ্য আপনারা মনে করিতে পারেন, চক্রবর্ত্তী এইবার কাঁদিবে। না। ক্রমেই তাহার হাসির বেগ বাড়িয়া চলিল। সাহেব যত মারে, চক্রবর্ত্তীও তত হাসে। সুতরাং সাহেব ক্ষান্ত হইয়া বলিল, "টুমি বহুৎ আচ্ছা লোগ!"

কথিত দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, হাসিবার পূর্ব্বে মানসপটে একটা ছাপ্ পড়ে; সেই ছাপ্‌টার স্পন্দনভাব যদি হজম করিয়া ফেলা যায়, তবে হাস্য হয় না। অনেক কথা, যাহা পূর্ব্বে শুনিয়া হাসিতাম, এখন আর তাহাতে হাসি পায় না। যেমন মদ্যপানে প্রথমাবস্থায় বমনোদ্রেক হইলেও পরে সহিয়া যায়। কিন্তু সেই ভাবটা যদি দুরূহ হয়, কিংবা নূতন হয়, কিংবা আঁকাবাঁকা হয়, কিংবা হজম করা যায় না, তবে তাহার অর্থ এই যে, আমি সেই ভাবের স্পন্দনের মতন একটা স্পন্দনের আপাততঃ উৎপাদন করিতে পারি না, কিন্তু চেষ্টা করিতে পারি। বিজ্ঞানের মতে তাহারই ধ্বনি হাসি।

একটা হার্ম্মোনিয়মের নূতন গৎ শিক্ষা করিবার প্রণালী কিংবা নূতন রাগিণী সাধিবার প্রণালীও যাহা, হাস্যের উৎপত্তিপ্রণালীও তাহাই।

অষ্টাবক্র দিয়াই ধরুন। অষ্টাবক্র ঋষি যদি কোন বালকের সম্মুখীন হইতেন, তবে বালক ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিত। তাহার অর্থ এই, "আমি ঐরূপ স্পন্দনের সৃষ্টি করিতে পারিব না।"

কিন্তু মুনিকন্যা যুবতী। অনেক স্পন্দন দেখিয়াছে। সুতরাং সে হাসিল। অর্থাৎ, "দাঁড়াও, আমি ঐরূপ স্পন্দনের সৃষ্টি করিতেছি।"

যখন অভিশাপের ছবি মানসপটে উদিত হইল, তখন কাঁদিবার অর্থ এই, "আমি উহার স্পন্দন সহিতে পারিব না।"

যখন অষ্টাবক্রের দুঃখ দেখিয়া রমণীর হৃদয় ভরিয়া গেল, তখন সে আবার কাঁদিল। তাহার অর্থ এই, "ভাবটা বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু এই দুঃখমোচনের সাধ্য আমার নাই।"

আমরা এখন শক্তিতত্ত্বে উপনীত হইয়াছি। শক্তি তিন প্রকার। যেমন

হজম করিবার শক্তিও শক্তি। হজম করিতে না পারা শক্তিহীনতা, কিন্তু উদ্গিরণ অর্থাৎ বাহির করিয়া ফেলা প্রকাণ্ড শক্তি। হজম করিবার পূর্ব্বেই ইস্তফা দেওয়া কিংবা সকাতরে ও সবেগে স্বীয় শক্তিহীনতার প্রচার কিংবা প্রকাশ করাও একটা শক্তি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্ত্রী পুরুষ কুকুর বিড়াল সকলেরই শক্তি আছে। সকলেই পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। অবশ্য শুনিতে পাওয়া যায় যে, পশুগণ ভাব লইয়া রোমন্থন করে না, মানবেই করিয়া থাকে। তাহা সত্য। কিন্তু পশুগণ কাঁদে, হাসে না।

অথচ কেহ কেহ বলে যে, এ কান্না শারীরিক ব্যথার কান্না, ভাবের কান্না নহে। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। অতএব, পশুদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া মানবক্ষেত্র পর্য্যালোচনা করিলে বিজ্ঞানের মতে ইহাই দাঁড়ায় যে, কোন idea কিংবা ভাব assimilate অর্থাৎ হজম করিবার চেষ্টার যে লক্ষণ, তাহার নাম হাসি। যতক্ষণ সে চেষ্টা করিতে থাকিবে, ততক্ষণ হাসিতে থাকিবে। যেমন চক্রবর্ত্তীর লাথিভোগ। হজম করিতে পারিলে কিংবা বুঝিতে পারিলে হাসি থামিয়া যায়।

বোধ হয়, পশুগণ ভাবের মূলে যায় না, তাই হাসে না। মানবের মধ্যেও অনেকে পশুবৎ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ভাবগ্রহণ করিবার কৌশল তাহারা এখনও শিখে নাই। উহাদিগের কথা ছাড়িয়া দাও। যাহারা হাসে, তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, "আমি ভাবগ্রহণ করিতেছি—এতদ্দ্বারা (হাস্য দ্বারা) সর্ব্বসাধারণ সতর্ক হও।"

অতএব "ঘৃণার হাসির" অর্থ এই যে, ঘৃণা করিলে আমি কিরূপ হই, তাহা এই হাস্যে দেখ। (অতএব তদনুযায়ী মাংসপেশী ও দন্তের সংকোচন ও বিস্ফারণ।)

"মিলনের হাসি"=আমি প্রেয়সীর সহিত মিলনের ভাব গ্রহণ করিতেছি (তদনুযায়ী মুখভঙ্গী ইত্যাদি)

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, ঘৃণা করা ও ঘৃণার হাসি হাসার মধ্যে অনেক ব্যবধান; যেমন, সর্দ্দি লাগা ও নাসিকায় কাঠি দিয়া হাঁচি।

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর হাস্যকর্ম্মের মূলে অহঙ্কার অবশ্য আছে, তাহা স্বীকার্য্য যাঁহারা গীতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না। প্রকৃতি কিংবা স্বভাব কর্ম্ম করিয়া থাকে। অথচ শক্তিটুকু সকলই আত্মার। এখন ভাবিয়া দেখুন, কি হয়।

অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যখন প্রকৃতি আত্মার শক্তি লইয়া টানাটানি করে, তখন একটা কাণ্ড হয়। অর্থাৎ, প্রকৃতি আত্মার কিংবা পুরুষের শক্তি লইয়া পুরুষকে টানে।

এটা বড় মজার জিনিস। প্রকৃতি কি একটা ভিন্ন ব্যক্তি? হইলেও হইতে পারে। কে জানে, ইহার মধ্যে কি আছে? আমরা কথায় বলি, "অমুক মানুষটা ভাল, কিন্তু স্বভাবের দোষে কখন কখন বেতর কর্ম্ম করিয়া ফেলে; যাহা হউক, লোকটার ভাল হইবার চেষ্টা আছে।"

সুতরাং বুঝা গেল, একটা টানে লোক মন্দ হয়, এবং সেই টান টাকে টানিয়া রাখিতে কিংবা আত্মসংবরণ করিতে পারিলে, লোকটা কৃষ্ণ বিষ্ণুর মতন হয়।

দর্শনশাস্ত্র ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী বলেন না। এখন দেখা যাউক, হাসা স্বভাব কাহার?

সচ্চিদানন্দ আত্মা সর্ব্বদাই হাসেন। অতি খুসী। এটা শব্দবাহী উচ্চ হাসি নয়। ব্রহ্মানন্দের হাসি। এ হাসি কেহ দেখিতে পায় না।

অতএব, প্রকৃতির জেদ্ যে, এ হাসিটা কি রকম, তাহা দেখায়। সেটা কি রকম, যেমন দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

মানবাত্মার নিকট প্রকৃতি নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া থাকে। সেই সময় যদি পুরুষের কিংবা আত্মার আনন্দহাসিটা টানিয়া পাওয়া যায়, তবেই ত হাস্যকর্ম্ম-প্রকাশ? নচেৎ নয়।

এ টানাটানি পাশবিক টানাটানি অপেক্ষা একটু শ্রেষ্ঠ রকমের। হাসিটাকে কিংবা আনন্দাবস্থাকে টানিতে হয়, অর্থাৎ জ্ঞানটাকে উস্‌কাইয়া দিতে হয়।

যাহারা প্রথম স্তরের মানুষ, অর্থাৎ কেবল শরীর লইয়াই ব্যস্ত, তাহাদিগের গাত্রের স্থানবিশেষ কণ্ডুয়ন করিলে, কিংবা কাতুকুতু দিলে হাসিয়া ফেলে।

যাহারা মন লইয়া ব্যস্ত,—তাহারা দ্বিতীয় স্তরের। তাহাদিগকে "কাতুকুতু" দিলে কোন ফল দর্শে না। অতএব একটা ভাব সম্মুখে খাড়া করিতে হয়। যাহারা ভাবের কিছু বুঝে না, তাহারা বেরসিক, এবং পেচকের মত গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকে। ইহাদিগের বিষয় সমালোচনার যোগ্য নহে।

অতঃপর, যাহারা অন্যান্য জীবের অঙ্গভঙ্গী ও নানাবিধ অবস্থা দেখিয়া হাসে, তাহারা সেই ভাব গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। ইহারা সোজা ধরণের মানুষ। ইহারা দুঃখ ও কষ্ট দেখিলে কাঁদিয়া ফেলে, সুখের আধিক্য দেখিলে হাসিয়া ফেলে। ইহা ভাবের প্রতিঘাতমাত্র।

কিন্তু শ্রেণীবিশেষে ইহার ব্যত্যয় ঘটে। "আমি হাসিব, কি হাসিব না," "কাঁদিব, কি কাঁদিব না," এইরূপ স্থির করিয়া যাহারা হাসে কাঁদে, তাহারা সহজ মানুষ নহে। অর্থাৎ, তাহাদিগের ভাবগুলি পরিপাক করিবার কিংবা আত্মসংবরণ করিবার ক্ষমতা আছে, অথচ একটা বিচার করিয়া হাসে কাঁদে।

ইহা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য জীবের উচ্চ হাসি নহে। জ্ঞানসম্পন্ন মানবের হাসি। ইহারই নানারূপ।

অহঙ্কার ও রিপু প্রভৃতির সহিত এই হাসির সঞ্চার হইলে আমরা সে হাসিকে অপকৃষ্ট হাসি বলিয়া বুঝি।

দেশের দুঃখ, সমাজের অধঃপতন, লোকবিশেষের গ্লানি, পরনিন্দা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি যে হাস্য জ্ঞানবিধৌত হইয়া ধাবিত হয়, তাহা বিদ্রূপ ও শ্লেষের আকারে পরিণত হয়। উহা কথায় বলা যায়, এবং রচনায় লেখা যায়।

যখন আত্মানন্দ হাসেন না, (তাঁহার সকল সময়ে হাসা উচিত) তখন জানিতে হইবে যে, তিনি মেঘাবৃত! জ্ঞানসূর্য্য উদ্দীপ্ত হইলে হাসি ফুটিয়া উঠে।

যাহা আলোচনা করা গেল, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ে যত দূর বুঝিয়াছেন, তাহাতে হাস্যকর্ম্মকে নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলিতে বদ্ধ করা যাইতে পারে।

১। শারীরিক হাসি (স্থূল) অন্নময় কোষের।

২। কায়মানসিক হাসি (যেমন অবজ্ঞা, ঘৃণা, স্বার্থলাভ, অহঙ্কার এবং রিপু প্রভৃতি হইতে) প্রাণ ও মনোময় কোষের।

৩। জ্ঞানময় কোষের হাসি।

৪। বিজ্ঞানময় কোষের হাসি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান দ্বারা বিচারপূর্ব্বক হাসির বেগ ছাড়িয়া দেওয়া সম্পূর্ণ মানবত্বের লক্ষণ। বেগ সংবরণ করিলেও করিতে পারি, অথচ করিব না, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মকর্ত্তৃত্বের ভাব আসে।

যাঁহাদিগের ভাবের অর্থগ্রহণ করিবার ক্ষমতা হইয়াছে, তাঁহারা স্বতঃই এরূপ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

জ্ঞানিগণ ব্রহ্মাণ্ডের কোন বিষয়ে হাসিবার কারণ দেখেন না। তাঁহারা হজম করিয়া ফেলেন। কারণ, পূর্ব্বে পূর্ব্বে উদ্গিরণ করিয়া এখন আর তাহা করিতে হয় না।

তবে জ্ঞানময় কোষের হাসি কি? ইহার অর্থ এই যে, আমি মনে করিলে

নাও হাসিতে পারিতাম, অথচ তোমাদিগের খাতিরে একটু হাসিয়া দিতেছি। যেমন খাতিরে মদ্যপান।

এখন দেখা যাউক, ক্রন্দন কি ?

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, ভাব উদ্গিরণ করিবার বেগ ছাড়িয়া দিলে হাস্যকর্ম্মে পরিণত হয়। যাহাদিগের হজম করিবারও ক্ষমতা নাই, এবং উদ্গিরণেরও ক্ষমতা নাই, তাহারা সকাতরে কেবল ডাকিতে থাকে, "গেলাম, গেলাম।" ইহার নাম ক্রন্দন। ইহাতেও শক্তি লাগে, কিন্তু বেগটা বাহির হয় অন্যরূপে। যেমন হাস্য বায়বীয় দেহ ধারণ করে, তেমনই ক্রন্দন জলে পরিণত হয়। শারীরিক ব্যথা পাইলে কিংবা মানসিক অভাবে ক্রন্দনের উৎপত্তি হয়। কিন্তু জ্ঞানময় কোষে ক্রন্দনেরও বৈলক্ষণ্য ঘটে। আমি কাঁদিলেও না কাঁদিতে পারি।

এখন বেশ করিয়া দেখুন যে, জ্ঞানময় কোষে যে কোন ভাব উপস্থিত হউক না কেন, অধিকারী মহাশয় ইচ্ছা করিলে হাসিতেও পারেন, এবং কাঁদিতেও পারেন ; অর্থাৎ, বেগটা যে কোন দিক দিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন। ইহাই স্বাধীন মানবের চিহ্ন।

জ্ঞানময় কোষের কর্ত্তা এই স্বাধীন পুরুষ কোনও নিয়মের বশবর্ত্তী নহেন।

কাজেই আমরা জগতে হাস্যকর্ম্মের কোনও নিয়ম দেখি না। কেহ মরিলে জ্ঞানী পুরুষ স্বচ্ছন্দে হাসিতে পারেন, এবং কেহ জন্মিলে কাঁদিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই কাঁদেন না। কেন না, কাঁদা ও দৌর্ব্বল্যের কবুল-জবাব একই। তবে আমি কাঁদিতে পারি, ইহা দেখাইবার জন্য অনেকে কাঁদিতে ইচ্ছা করেন।

হাস্যক্রন্দনের সম্পূর্ণ ভাব জগতের। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে মানুষটাকে বুঝা চাই। অতএব বলা বাহুল্য যে, হাসি কান্না প্রভৃতি দেখিয়া মানুষের হৃদয়টার বিচার করা অন্যায়।

জ্ঞানময় কোষের উপরে বিজ্ঞানময় কোষের হাসি। জীবের দুঃখ আসিয়া কখন কখন সে হাসি আচ্ছাদিত করে। এ হাসি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়।

দেখা যাইতেছে যে, হাসির গোড়ায় একটা স্থির নিশ্চল আনন্দময়ী শক্তি আছে, সেটা পুরুষের। দোহন করিলে সেটাকে পাওয়া যায়। তবে দুগ্ধ ছাড়িয়া দেওয়া না দেওয়া যেমন গাভীরই ইচ্ছা, সেইরূপ হাসা কিংবা না হাসা অধিকারীর ইচ্ছা।

এ হাসিটুকু দেখিবার জন্য জগৎ ব্যাকুল। শিশুর হাসি ও মাতার হাসি

বারআনা খাঁটি। বৃদ্ধের মরণকালের হাসি ভাল, কিন্তু সে লইয়া যায়। প্রেয়সীর হাসি প্রায়ই সন্দেহজনক, প্রসন্ন গয়লানীর দুগ্ধের মত। জ্ঞানীর হাসি হাসিই নয়।

তবে কথাটা এই যে, হাসা ভাল। হাসিয়া হাসিয়া মানুষ কাঁদে, এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাসে। ইহারই মধ্যে জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে। যাহাই হউক, হাসিটা ঠিক কি রকম, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য—নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

প্রায়শ্চিত্ত।

১

চারুচন্দ্র পীড়িতা পত্নীকে লইয়া ওয়ালটেয়ারে আসিয়াছেন। দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করিবার কিছু দিন পূর্ব্বেই সুষমাময়ীর ম্যালেরিয়া হয়। পুত্রের জন্ম হইতে সে জ্বর লাগিয়া রহিল—কখনও দশ দিন বন্ধ থাকে, আবার প্রকাশ পায়। এক বৎসর গৃহেই আশ্রিত নেটিব ডাক্তার "ফিভার মিক্সচার," শালসা, শেষে নানা পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করাইলেন; কিন্তু পুষ্করিণী-পয়ঃপুষ্ট-মশক-বাহন ম্যালেরিয়া কিছুতেই দূর হইল না। দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে চারুচন্দ্র বৃদ্ধ দেওয়ানকে বলিলেন, তিনি চিকিৎসার জন্য সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। এক বৎসর কিছুতেই জ্বর যায় না দেখিয়া দেওয়ানজী ভীত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সেই ভাল।"

আয়োজন করিতে কয় দিন গেল। তাহার পর দেওয়ানজীর হস্তে কার্য্যভার দিয়া চারুচন্দ্র সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কনিষ্ঠ সুবোধচন্দ্র সঙ্গে। পূর্ব্বেই তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর কাল হইয়াছিল; সংসারে অন্য স্ত্রীলোক নাই। তাই সংবাদ দিয়া বিধবা শাশুড়ীঠাকুরাণীকে আনাইয়া সঙ্গে লওয়া হইল। প্রথমে নৌকা, পরে রেল, তৎপরে অশ্বযানের কষ্ট সহ্য করিয়া একান্তশ্রান্তা পত্নীকে লইয়া চারুচন্দ্র কলিকাতার বাসায় উপনীত হইলেন।

কলিকাতায় চিকিৎসার ত্রুটি ঘটিল না;—ঘটিবার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, চারুচন্দ্র বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি, জমীদারীর মুনাফা প্রচুর, মজুদ তহবিলও উল্লেখের অযোগ্য নহে। বরং বৈদ্যসঙ্কট ঘটিবার উপক্রম ঘটিল। সকল প্রসিদ্ধ অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ ও বৈদ্য ডাকা হইল। কিন্তু জ্বর গেল না। শেষে

ছয় মাস চিকিৎসার পর চিকিৎসকগণ বলিলেন, যথেষ্ট ঔষধ সেবন করান হইয়াছে; তাহাতে যখন কোন ফল ফলিল না, তখন স্থান-পরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

বৈদ্যনাথে চারি মাস, মুঙ্গেরে তিন মাস ও এটাওয়ায় তিন মাস থাকিয়াও কোন উপকার হইল না। রোগিণী পুনঃপুনঃ জিদ করিয়া স্বামীকে বলিতে লাগিলেন, "আমি আর বাঁচিব না। তুমি আর কত দিন এমন করিয়া পথে পথে ফিরিবে? প্রায় দেড় বৎসর দেশছাড়া; কায কর্ম্ম কিছুই দেখ নাই। কর্ম্মচারীরা কি করিতেছে, কে বলিবে? দেশে ফিরিয়া চল। অদৃষ্টে যাহা থাকে, সেইখানেই হইবে। আমার জন্য তুমি কেন এত ব্যস্ত হইয়াছ? আমার জন্য তুমি অর্থ. বিশ্রাম, স্বাস্থ্য, সুখ—সবই হারাইতেছ। আমি তাহা আর সহ্য করিব না।" চারুচন্দ্র বলিলেন, "দেওয়ানজী থাকিতে বিষয়কর্ম্মের কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না। তিনি পিতার সময়ের লোক; আমাদের নাবালক অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত সম্পত্তির বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। আমাদের কাযের জন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন। তুমি সারিয়া উঠিলে স্বাস্থ্য সুখ সবই হইবে। সে জন্য ভাবিও না।"

এত দিনে যখন কোন ফল ফলিল না, তখন আর একবার কলিকাতায় বড় চিকিৎসকগণের পরামর্শ লওয়া আবশ্যক মনে করিয়া চারুচন্দ্র পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এবার চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি রোগজীর্ণা পত্নীকে লইয়া মদ্রদেশের বনরাজিনীলা নীলাম্বুবেলায় ওয়ালটেয়ারে আসিয়াছেন। ভ্রাতা সুবোধচন্দ্র, কন্যা, পুত্র ও শ্বাশুড়ী সঙ্গে আসিয়াছেন।

২

ওয়ালটেয়ারে ইংরাজ ডাক্তার ও ইংরাজ মহিলা-চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার রোগিণীর স্বল্প-রক্ত দেহ হইতে রক্তবিন্দু লইয়া অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, রক্তে ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু বিদ্যমান। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু কোনই ফল হইল না। ক্রমে চারি মাস যায়; রোগের উপশম নাই। এই সময়ের মধ্যে মহিলা-চিকিৎসক ফ্লোরেন্স রসের সহিত চারুচন্দ্রের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। ক্রমে চিকিৎসক ও চিকিৎসিতের সম্বন্ধ ঘুচিয়া ঘনিষ্ঠ পরিচিতের সম্বন্ধ দাঁড়াইল। ফ্লোরেন্স যুবতী। চিকিৎসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া প্রায় এক বৎসর ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। একাকিনী

এক বাঙ্গলোয় বাস করেন। কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া প্রচলিত তেলেগু ভাষা বুঝিতে ও সেই ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন উদ্যানরচনা, ফটোগ্রাফতোলা, চিত্রাঙ্কন, কবিতালিখন, পক্ষিপালন—তাঁহার এ সব সখই আছে। অশ্বত্থ তরু ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যেমন অতি বৃহৎ বনস্পতির জীবনী-শক্তি অবস্থান করে, তেমনই এই তন্বী মহিলার দেহে যে কি পরিমাণ উৎসাহ সঞ্চিত, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ফ্লোরেন্স প্রায়ই সুষমাময়ীর নিকট যাইতেন। তাঁহাকে স্বদেশের গল্প শুনাইতেন; তাঁহার নিকট বঙ্গের আচার ব্যবহারের কথা শুনিতেন। অবশ্য কথা-বার্ত্তায় দ্বিভাষীর প্রয়োজন হইত। হয় চারুচন্দ্র, নয় ত সুবোধচন্দ্র সে কষ্ট স্বীকার করিতেন। বিবাহের পর চারুচন্দ্র দিনকতক স্ত্রীকে ইংরাজীতে পণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পত্নীর সে বিষয়ে আগ্রহ ছিল না। দিন কতক পরে চারুচন্দ্রও বুঝিয়াছিলেন, তাহা এতই আবশ্যক নহে যে, তাহার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া দাম্পত্য-সুখ-সম্বন্ধ ম্লান করা যাইতে পারে। এই রোগজীর্ণা রোগিণীর প্রতি সমবয়সী ফ্লোরেন্সের কেমন একটু ভালবাসা জন্মিল। তিনি তাঁহার প্রতি কেবল চিকিৎসকের কর্ত্তব্য পালন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; সখীজনের মত ব্যবহার করিতেন। স্বদেশ ও স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে,—নূতন দেশে, নূতন অবস্থায়, এই নূতন পরিচিতদিগকে ফ্লোরেন্সের ভাল লাগিত।

ক্রমেই চারুচন্দ্রের সহিত ফ্লোরেন্সের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে লাগিল। ফ্লোরেন্স প্রতিদিন তাঁহার গৃহে আসিতেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ফ্লোরেন্সের গৃহে গমন না করা ইংরাজী সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ। কাযেই চারুচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ফ্লোরেন্সের গৃহে যাইতেন। সে গমন যে কেবল লৌকিক আচাররক্ষার্থ, ক্রমে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহা চারুচন্দ্রের ভাল লাগিত। ফ্লোরেন্সের সুরচিত উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত, সুসজ্জিত, পরিচ্ছন্ন গৃহে—কুসুমিত পরগাছা ও বিহগ-পিঞ্জর-বহুল বারান্দায় বসিয়া সেই নিঃসঙ্কোচ-মত-প্রকাশ-সাহসিকার সহিত উপন্যাসের চরিত্র, কবিতার মাধুরী, বিহগের অভ্যাস প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা চারুচন্দ্রের নিকট যেমন নূতন তেমনই মধুর বোধ হইত। চারুচন্দ্রেরও সখের অন্ত ছিল না। কোন নূতন বৃক্ষের বা লতার রোপণস্থান সম্বন্ধে—কোন নব-লব্ধ বিহগের আহারাদি সম্বন্ধে চারুচন্দ্রের অভি-জ্ঞতায় অনেক সময় ফ্লোরেন্সের অনভিজ্ঞতা দূর হইত। উভয়ের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

প্রায় তিন বৎসর রোগীর সাহচর্য্যে, রোগীর শুশ্রূষায়, রোগের চিন্তায় চারুচন্দ্র শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দিবারাত্রি রোগের আব-হাওয়ায় ও মৃত্যুর ছায়ায় বাস করিয়া চারুচন্দ্র যেন রোগের অবসাদ ভোগ করি-তেছিলেন। এই সময়ে এই আনন্দহাস্যপ্রফুল্লিতা, উৎসাহলাবণ্যসমুজ্জ্বলা, নিঃসঙ্কোচ-স্বাধীনতাশ্রীময়ী মহিলার সঙ্গ চারুচন্দ্রের একান্ত মধুর বোধ হইত। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উদ্যান-রচনায়, বিহগ-পালনে, ফটোগ্রাফ তোলায় চারুচন্দ্র ফ্লোরেন্সের সহচর হইয়া উঠিলেন। এই সকল বিষয়ে চারুচন্দ্রের অসাধারণ উৎসাহ লক্ষিত হইতে লাগিল।

অঙ্গার যেমন অবস্থার পরিবর্ত্তনে হীরকে পরিণত হয়, ফ্লোরেন্সের সহিত চারুচন্দ্রের পরিচয়ও তেমনই ক্রমে একান্ত নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল।

৩

ফ্লোরেন্সের সহিত এই ঘনিষ্ঠতা চারুচন্দ্রের যতই ভাল লাগুক না কেন, সুষমা-ময়ীর ভাল বোধ হইত না। কারণ, লতিকার কুসুমকে বৃন্তচ্যুত করিবার সময় উদ্যানস্বামী যত সতর্কতা যত ধীরতাই অবলম্বন করুন না কেন, লতিকার নিকট সে বিয়োগ-বেদনা অজ্ঞাত থাকে না। স্বামীর সকল খুঁটিনাটি স্ত্রী যেমন করিয়া লক্ষ্য করে, স্ত্রীর খুঁটিনাটি তেমন করিয়া লক্ষ্য করিতে স্বামী স্বভাবতঃই অসমর্থ। বিশেষ রোগশয্যায়,—যখন স্বামীকে আনন্দ, সুখ, শুশ্রূষা দিতে পারা যায় না, পরন্তু তাঁহার নিকট সেই সকল প্রদানের চেষ্টাই গ্রহণ করিতে হয়;—যখন স্বামীকে কিছু দিতে পারা যায় না, পক্ষান্তরে পূর্ব্বদত্তের প্রতিদান অধিক হইতেছে বলিয়াই মনে হয়;—যখন কেবল স্মৃতির বন্ধনেই স্বামীকে আপনার করিয়া রাখিতে হয়,—তখন স্বভাবতঃই হারাইবার আশঙ্কায় হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ব্যবহার, স্বামীর বিশ্রাম, স্বামীর ভাব, এ সকলের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠে। সুষমাময়ীর তাহাই হইয়াছিল। সেই জন্যই ফ্লোরেন্সের সহিত স্বামীর এই ঘনিষ্ঠতা সুষমাময়ীর ভাল বোধ হইত না।

কিন্তু যে স্বামীর বিবাহিত-জীবন কলঙ্কলেশশূন্য; যিনি তাঁহার পীড়ার জন্য অর্থ, অবসর, স্বাস্থ্য সবই অকাতরে ব্যয় করিতেছেন; তিন বৎসর কাল তাঁহাকে লইয়া পথে পথে ফিরিতেছেন; সামান্য সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে দোষী স্থির করা ত সঙ্গত হইবে না। এই ভাবিয়া সুষমাময়ী কিছু দিন মনের ভাব মনেই রাখিলেন; ফুটিলেন না। কিন্তু বক্ষে রক্ষিত বৃশ্চিক অহরহঃ তাঁহা-কেই দংশনবিষে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া

পড়িতে লাগিল। শেষে সুষমাময়ী স্বামীকে বলিলেন, "তুমি আর কত দিন মরা চৌকি দিবে? তিন বৎসর ত পথে পথে ঘুরিলে—সব নষ্ট করিয়া আমার জন্য এত সহিলে! কিন্তু কিছুতেই ত কিছু হইল না। অদৃষ্টে যাহা থাকে, হইবে; চল, দেশে ফিরিয়া যাই। যদি সারিবার হয়, দেশে যাইয়াই সারিবে। আর এ বিদেশে থাকিয়া কায নাই।"

উত্তরে চারুচন্দ্র বলিলেন, "সে কি! ডাক্তার ভিকার্স বলিতেছেন, আরও কিছু দিন থাকিলেই সারিয়া যাইবে। আমার কোন সতীর্থ কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্নী এক বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া এখানে আসিয়া সারিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রক্তেও ডাক্তার ভিকার্স রোগজীবাণু পাইয়াছিলেন।"

বাস্তবিক ডাক্তার ভিকার্স এমন কথা বলেন নাই যে, আরও কিছু দিন থাকিলেই সুষমাময়ী রোগমুক্তা হইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ক্রমে রোগ-জীবাণুর সংখ্যার হ্রাস হইয়া রোগিণীর রোগমুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার জীবনীশক্তি একান্ত ক্ষীণ; দীর্ঘকাল রোগ সহ্য করা সহজ হইবে না। চারুচন্দ্রের কথাটাকে বিকৃত করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য,—হয় আশা দিয়া রোগিণীর নিরাশা দূর করিবার চেষ্টা, নতুবা আরও কিছু দিন ওয়ালটেয়ারে থাকা। তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

সুষমাময়ী আর কিছু বলিলেন না। নিরাশার অন্ধকারে আশার এই ক্ষীণ আলোক দেখিলেন যে, স্বামীর যে ভাব লক্ষ্য করিয়া সন্দেহ-শিখায় দগ্ধ হইতে-ছিলেন, ফ্লোরেন্সের ব্যবহারে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। ফ্লোরেন্সের নীল নয়নে দৃষ্টি তেমনই নিঃসঙ্কোচ, রক্ত ওষ্ঠাধরে হাস্য তেমনই মধুর; তাঁহার ব্যবহার তেমনই সরল। তাঁহার ব্যবহারে অপরাধের লেশমাত্র পরিচয় ছিল না।

৪

ফ্লোরেন্সের সহিত চারুচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সুষমা-ময়ীর আর সন্দেহ রহিল না যে, স্বামীর হৃদয়ে অন্যের ছায়াপাত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার আপনার হৃদয়ে যে নিবিড় ছায়া পড়িল, মুখে তাহার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া দেবর সুবোধচন্দ্র আসন্ন মৃত্যুর ছায়া বলিয়াই অনুমান করিলেন। কিন্তু চারুচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

চারুচন্দ্র ক্রমে ফ্লোরেন্সের গৃহে এত অধিক সময় যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক এক দিন ফ্লোরেন্সই বলিতেন, "আপনি কাছে থাকিলে আপ-

নার পত্নীর মন প্রফুল্ল থাকিবার সম্ভাবনা। এ সময় তাঁহার মন প্রফুল্ল রাখা বিশেষ আবশ্যক। আপনি অধিক সময় বাড়ী ছাড়িয়া থাকিবেন না।" এই মৃদু-তিরস্কারে চারুচন্দ্রের চেতনা হইত ; তিনি গৃহে ফিরিতেন।

ফ্লোরেন্স প্রত্যহ সুষমাময়ীকে দেখিতে আসিতেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গ সুষমা-ময়ীর পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। ইহা সুষমাময়ীর দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের অপকার করিত না, এমন নহে। ক্রমে দুশ্চিন্তায় সুষমাময়ীর ক্ষীণ-দেহ ক্ষীণতর হইয়া আসিল। শয্যাত্যাগ করিতেও তাঁহার কষ্ট হইত। জীবনীশক্তিও অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িল।

৫

বহুদিন অবর্ষণের পর রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইতে না হইতে বাতাস উঠিল। সমুদ্রের তরঙ্গমালা পবন-তাড়নে তীরে বহু দূর পর্য্যন্ত আসিয়া শুভ্র-ফেন-হাস্যে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রৌদ্রতপ্ত তৃষিত বালুকায় জলস্পর্শ-শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। যে স্থানে সাগরগর্ভে সলিলসঙ্গজাত শৈবালে সমাচ্ছন্ন শিলারাশি জলের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে স্থানে শিলার অঙ্গে বেগে প্রতিহত উর্ম্মিমালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ঊর্দ্ধে ফেনময়ী জলকণা উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। গৃহপ্রাঙ্গনে কেতকীর বৃতি কম্পিত হইতে লাগিল ; সৈকতে নারিকেল তরুর আনত-পত্র-মুকুট পবনতাড়নে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার পর দেখিতে দেখিতে খানকতক মেঘ আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বর্ষণ আরব্ধ হইল। সমস্ত প্রকৃতির মুখে স্বচ্ছান্ধকারকাতরতা ; কেবল অবিরাম বর্ষণ। অদূরে সমুদ্রের গর্জ্জন যেন পীড়িতা প্রকৃতির যাতনাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ক্রমে অপরাহ্ন উত্তীর্ণ হইতে চলিল ; বর্ষণ ক্ষান্ত হইল না। তখনও চক্র-বাল পর্য্যন্ত মেঘ—সিন্ধুবক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে। অপরাহ্নেই প্রায় চারুচন্দ্র ফ্লোরেন্সের গৃহে যাইতেন। আজ বৃষ্টির জন্য যাইতে পারিলেন না। কিন্তু অপরাহ্ন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, তাঁহার চাঞ্চল্যও ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি পত্নীর কক্ষে বসিয়া একখানা ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিতে-ছিলেন। তিনি উপন্যাস রাখিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন ; মধ্যে মধ্যে বারান্দায় যাইয়া আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আসিতে লাগিলেন। বারা-ন্দার দিকে বৃষ্টির ছাট, সুতরাং প্রত্যেক বারেই তিনি অল্পবিস্তর সিক্ত হইতে-ছিলেন। কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। বরং বারান্দায় যাইয়া আকাশের

অবস্থাদর্শন ক্রমেই ঘন ঘন হইতে লাগিল। রোগশয্যায় সুষমাময়ী স্বামীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। স্বামীর চাঞ্চল্যের কারণ বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তাঁহার কোটরগত নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সুষমাময়ী স্বামীকে ডাকিলেন। চারুচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। সুষমাময়ী বলিলেন, "ভিজিয়া গিয়াছ। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আইস।" চারুচন্দ্রের সে দিকে খেয়ালই ছিল না। তিনি মস্তকে ও বস্ত্রে করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ও কিছু নয়—সামান্য ছিটা লাগিয়াছে মাত্র।"

সুষমাময়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও যাইবে কি?" সে স্বরে যে কি তীব্র অভিমান ও অরুন্তুদ মর্ম্মব্যথা ধ্বনিত হইতেছিল, কি মৌন তিরস্কার প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা আজ চারুচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কোন উত্তর না দিয়া পত্নীর শয্যায় উপবেশন করিলেন; পত্নীর বহুকাল তৈলসম্পর্কশূন্য রুক্ষ কেশের এক গুচ্ছ লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। সেই আদরে সুষমাময়ীর হৃদয়ে সুখসমুজ্জ্বল অতীতের শত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—কথা কহিতে যাইয়া তিনি যেন অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কণ্ঠরুদ্ধ বোধ করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তে তিনি বুঝিলেন, সে অতীত এখন স্মৃতিমাত্র;—তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "তুমি ঠাকুরপোর বিবাহ দাও।"

চারুচন্দ্র বলিলেন, "আমার কি অসাধ যে, সে বিবাহ করে? তুমি ত জান, আমি সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্তু সে কিছুতেই আর বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। স্ত্রীবিয়োগের পর হইতেই কেমন হইয়া গেল—লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল—কোন কাযে মন দেয় না। কিছুদিন লোকের সঙ্গে মেশাও বন্ধ করিয়াছিল। যদি দেশভ্রমণে তাহার হৃদয়ক্ষত শুষ্ক হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছি।"

"তুমি বিশেষ জিদ করিয়া ধর।"

"তুমি বল।"

"আমি ত বলিবই। আমি মরিতে বসিয়াছি; আমি মরিলে কে ছেলেদের দেখিবে? বাঙ্গালীর মেয়ে নহিলে বাঙ্গালী ছেলেমেয়ের যত্ন বুঝিবে না। ঠাকুরপো বিবাহ করিলে তবুও তাহাদের দেখিবার এক জন হয়; আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি।"

এ কথার গূঢ় অর্থ চারুচন্দ্রের বোধগম্য হইল না, কারণ তখন তাঁহার হৃদয়ের এক প্রবৃত্তিই প্রবল হইয়া হৃদয়ের সমস্ত রস শোষণ করিতেছিল—আর সব হীন-

বল হইয়া পড়িতেছিল। সুষমাময়ী দেখিলেন, স্বামী অন্যমনস্ক,—তাঁহার কথার প্রকৃত অর্থ বুঝেন নাই। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর সুষমাময়ী সুবোধচন্দ্রকে জিদ করিয়া ধরিলেন, "ঠাকুরপো, আমার একটা অনুরোধ—শেষ কথা তোমায় রাখিতেই হইবে। তুমি বিবাহ কর।"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "আপনি আর যে আজ্ঞা হয়, করুন; এ অনুরোধ করিবেন না।"

সুষমাময়ী দেখিলেন, দেবরের কণ্ঠস্বর অশ্রুবাষ্পবিজড়িত। পত্নীপ্রেমের এই দৃষ্টান্ত তাঁহার করুণ হৃদয় স্পর্শ করিল। হায়! জগতে মানুষে মানুষে ভ্রাতায় ভ্রাতায় কি প্রভেদ! সুষমাময়ী বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি ত চলিলাম। কিন্তু ছেলেমেয়ে দু'টা কে দেখিবে? তুমি বিবাহ করিলে তাহাদের দেখিবার লোক হইত।"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "যত দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন উহাদের দেখিবার লোকের অভাব হইবে না। আমার ব্যর্থ জীবন উহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানেই ব্যয়িত হইবে। তাহাতে আপনি সন্দেহ করিবেন না।"

আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় সুষমাময়ীর নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি দেবরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরজীবী হও।"

ইহার পর সুষমাময়ী ঔষধসেবনে অসম্মতা হইলেন। কেবল চারুচন্দ্র স্বহস্তে ঔষধ দিলে সেবন করিতেন। নহিলে কিছুতেই গ্রহণ করিতেন না। তিনি বলিতেন, "আর ঔষধে কায নাই। অনেক ঔষধ খাইয়াছি। আর খাইব না।"

শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিল। ডাক্তার ভিকার্স বলিলেন, "জীবনের আশা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ আর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ফ্লোরেন্স আশা ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "ডাক্তার ভিকার্স যাহাই বলুন, আমার মত অন্যরূপ। উষার অব্যবহিত পূর্ব্বে যেমন অন্ধকার গাঢ়তম হইয়া উঠে, তেমনই সারিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রোগীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ বোধ হয়, এমনও আমি দেখিয়াছি।"

৬

অপরাহ্নে ফ্লোরেন্স ও চারুচন্দ্র ফ্লোরেন্সের গৃহের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। বারান্দায় বিলম্বিত কতকগুলি পরগাছায় ফুল ফুটিয়াছে। পবন কুসুমসৌরভ-ভারকাতর। সহসা বারান্দার পশ্চিম কোণে বিলম্বিত পিঞ্জরে বদ্ধ কেনারা

গাহিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া দক্ষিণ দিকের একটি পিঞ্জর হইতে আর একটি কেনারী সাড়া দিল। সানন্দে ফ্লোরেন্স বলিলেন, "এ কেনারীটা এত দিন গাহে নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, বুঝি ওটা গাহিবে না।" কিন্তু তাঁহার উচ্চ-কণ্ঠস্বরে চমকিয়া কেনারী গান বন্ধ করিয়াছিল, আর গাহিল না।

নানা কথার মধ্যে ফ্লোরেন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিয়াছি, আপনি অনেক দিন দেশছাড়া। কত দিনে ফিরিবেন ?"

চারুচন্দ্র উত্তর করিলেন, "সে আপনার উপর নির্ভর করিতেছে।"

চারুচন্দ্র যে ভাবে কথাটা বলিলেন, ফ্লোরেন্স তাহা বুঝিতে পারিলেন না। না বুঝিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের মিলন সর্ব্বদা সংঘটিত হয়, সে সমাজে পরিচয় প্রণয়ের ও বন্ধুত্ব পদস্খলনের নামান্তরমাত্র নহে। সে সমাজে স্ত্রীপুরুষে কলুষ-লেশ-শূন্য বন্ধুত্বও একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। ফ্লোরেন্স মনে করিলেন, চারুচন্দ্র পত্নীর পীড়ার কথাই বলিতেছেন। তিনি বলিলেন, "আরও এক সপ্তাহকাল না দেখিলে রোগের গতি স্থির করিয়া বলা যাইবে না।"

চারুচন্দ্রের হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "ডাক্তার ভিকার্স বলিয়াছেন, জীবনের আর কোন আশাই নাই। তাহার পর—আপনি অনুমতি করিলে আমি ওয়ালটেয়ারেই বাস করিতে পারি।"

ফ্লোরেন্স এবার চারুচন্দ্রের কথার অর্থ বুঝিলেন। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল,—শান্ত নীল নেত্র যেন জ্বলিতে লাগিল। তিনি ক্রোধবিকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "যে পরিচয় সমাজ—সব বিস্মৃত হইয়া এমন প্রস্তাব করিতে পারে, সে ভদ্রসমাজের ব্যবহারানভিজ্ঞ ; যে মুমূর্ষু পত্নীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া এমন কল্পনা করিতে পারে, সে মনুষ্য-নামের অযোগ্য।" আর কোন কথা না কহিয়া ফ্লোরেন্স উদ্যানের দ্বারের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন।

লাঞ্ছিত চারুচন্দ্র প্রহৃত সারমেয়ের মত সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

৭

চারুচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন না ; সমুদ্রতীরে আসিয়া সৈকতে শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন। সমুদ্রের তরঙ্গচূড়ায় ফেনরাশি তাঁহার চরণ-সন্নিকটে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। হৃদয় একান্ত অবসন্ন—চারুচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুরাশার জলবিম্ব ফুৎকারে ফাটিয়া গিয়াছে। আজ এই কঠোর আঘাতে তাঁহার অপগতমোহাবরণ হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি সমুজ্জল হইয়া উঠিল। তিনি আপনার নিষ্কলঙ্ক বিবাহিত জীবনের কথা স্মরণ করিলেন। বালিকা পত্নীর সহিত প্রথম

পরিচয় -তাঁহার হৃদয়ের যৌবনবিকাশ—উভয়ের সেই সুখের জীবন মনে পড়িল কত দিনের কত তুচ্ছ ঘটনা আজ স্মৃতিপথে উপনীত হইল—কত সুপ্তস্মৃতি আজ জাগিয়া উঠিল! তিনি জীবনের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। হায়! সংসারে যে রমণী তাঁহার গৃহে গৃহিণী, কার্য্যে মন্ত্রী, অবসরে সখী ছিল; যে তাঁহার রোগে শুশ্রূষা, শোকে সান্ত্বনা, বিজনে সুখ ও সজনে গর্ব্বের বিষয় ছিল—তিনি কি ভুলে ভুলিয়া তাহার প্রতি এ দারুণ অত্যাচার করিয়াছেন? তখন মনে পড়িল, তিনি রোগাতুরা পত্নীকে কত অবহেলা করিয়াছেন! তখন তিনি বুঝিলেন, কেন পত্নী বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর মেয়ে নহিলে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ের যত্ন বুঝিবে না। দারুণ সন্দেহ বক্ষে লইয়া পীড়িতা পত্নী কি যাতনাই সহ্য করিয়াছেন!

চারুচন্দ্রের হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে দিবাবসান হইল। সমুদ্রের জলবিস্তারের মধ্য হইতে চন্দ্র-মণ্ডল উদিত হইল। প্রথমে অন্ধকার জলের উপর যেন স্থির বিদ্যুতের রেখা—ক্রমে মণ্ডল পূর্ণতর হইয়া উঠিতে লাগিল; সম্পূর্ণ মণ্ডল মুহূর্ত্তমাত্র জলরাশি স্পর্শ করিয়া রহিল—তাহার পর গগনে চন্দ্রোদয়। চিন্তায় তন্ময় চারুচন্দ্র তাহা দেখিয়াও দেখিতে-ছিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন। পবনতাড়িত একটি তরঙ্গ তাঁহার চরণ-স্পর্শ করিল। চারুচন্দ্র চমকিয়া চাহিলেন—দেখিলেন, রাত্রি হইয়াছে। তিনি উঠিয়া গৃহাভিমুখগামী হইলেন।

পথে ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে আলোক লইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। ভৃত্য ব্যস্তভাবে বলিল, "মাঠাকুরাণী কেমন করিতেছেন, আর আপনাকে খুঁজিতেছেন।"

চারুচন্দ্র দ্রুতবেগে গৃহে চলিলেন। ভৃত্যের পক্ষে তাঁহার অনুসরণ করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া চারুচন্দ্র শুনিলেন, গৃহমধ্যে তাঁহার শ্বশ্রূর ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে। তিনি ঝড়বেগে পত্নীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, ফ্লোরেন্স তাঁহার মৃতা পত্নীর শিয়রে দাঁড়াইয়া টেবিল হইতে অব্যবহৃত উত্তেজক ঔষধের শিশি লইয়া সুবোধচন্দ্রকে বলিলেন, "আমি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম, সহসা কোনরূপ অবস্থাবিকার ঘটিলে এই ঔষধ সেবন করাইয়া আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়। ঔষধ-প্রদানে বিলম্ব না ঘটে। ঔষধ ব্যবহার করা হয় নাই কেন?"

সুবোধচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আজ কয় দিন হইতে তিনি তাঁহার স্বামী

ভিন্ন অন্য কাহারও হস্তে ঔষধ গ্রহণ করিতেছিলেন না।" ফ্লোরেন্স বলিলেন, "আর তাঁহার স্বামী ঔষধ প্রদান করিয়া স্ত্রীর জীবনরক্ষার জন্য গৃহে থাকা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই?"

ফ্লোরেন্স চারুচন্দ্রের দিকে তীব্রতিরস্কারপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন পত্নীর শবদেহ জড়াইয়া বুকভাঙ্গা বেদনায় চারুচন্দ্র অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী জীবন দিয়া স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভা। *

দীনবন্ধু মানুষটা কেমন ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কতকটা পরিচয় স্বলিখিত দীনবন্ধুর জীবন-চরিতে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুরসিক, পরদুঃখ-কাতর, অক্রোধ ও সহৃদয় ব্যক্তি যেরূপ নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানাবিধ লোকের সহিত মিশিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার চরিত্র-পরিচায়ক অনেক বিচিত্র anecdotes থাকা সম্ভব। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা,—আমাদের ভাগ্যক্রমে আজিও যাঁহারা জীবিত আছেন,—তাঁহারা সেগুলির কিছু কিছু জানিতে পারেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে সেগুলি আমরা জানিতে পাইলে দীনবন্ধুর দীনবন্ধুত্ব বোধ হয় আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া কেহ আবশ্যক মনে করেন না, নতুবা আজ এ সভায় দীনবন্ধুর বন্ধুরা মৃত বন্ধুর প্রীতিস্মরণ করিয়া না আসিয়া থাকিতে পারিতেন কি? সুতরাং আমাদের ন্যায় লোকে দীনবন্ধুকে বুঝিতে চাহিলে, তাঁহার গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে হইবে।

দীনবন্ধুবাবুর তিনখানি নাটক ও তিনখানি প্রহসনই তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি কবির কবিত্ব দেখিতে হয়, তবে এই ছয়খানি গ্রন্থ হইতেই তাহার যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও দীনবন্ধুর কবিত্ব-সমালোচনায় যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এই ছয়খানি সম্বন্ধে। তিনি কবির

* দীনবন্ধু বাবুর মৃত্যুর উপলক্ষে সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

কবিত্ব সমালোচনা করিতে গিয়া, কবি মানুষটা কেমন ছিলেন, তাহা বেশ দেখাইয়াছেন। কবির নাটকীয় প্রতিভা সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বলিবার কথা সবই বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি কবির গুণপণা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই। বঙ্কিমবাবু কবির প্রাণের মহত্ত্ব যেমন করিয়া দেখাইয়াছেন, রচনার বাহার তেমন করিয়া দেখান নাই। আমি সেই মহতী প্রতিভার আলোচনা করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহার কোন কোন কথা আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ নীলদর্পণ। ১২৬৭ সালে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। বহু ইউরোপীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রচারিত হওয়াই, ইহার গুণপণার যথেষ্ট পরিচয়। নাটক-সম্বন্ধে, দীনবন্ধু-সম্বন্ধে বাঙ্গালায় এতদিন যিনি দু' কথা বলিয়াছেন, তাঁহাকেই "সধবার-একাদশী" আর "নীলদর্পণের" সুখ্যাতি মুক্তকণ্ঠে করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। নীলদর্পণ কবির প্রথম গ্রন্থ হইলেও ইহাতেই তাঁহার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার, স্বভাব-সঙ্গত-মূর্ত্তি-গঠন-ক্ষমতার, সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণভাবে ঘটনা-সংস্থান করিবার এবং ঈপ্সিত রসের উদ্রেক করিবার শক্তির অপূর্ব্ব ও পূর্ণবিকাশ দেখা যায়। নীলদর্পণের প্রধান প্রধান চিত্র দূরে রাখিয়া তাঁহার দুইটি ক্ষুদ্রতম চিত্র হইতে আমি ইহা সপ্রমাণ করিব। নীলদর্পণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র চিত্র দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কের "রাখাল বালক"। এই ক্ষুদ্র চিত্রটিও এত সুন্দর ও এত ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে যে, বুঝি ঐ অমনটি, যেমনটি দীনবন্ধু বাবু লিখিয়াছেন, তেমনটি নহিলে মানাইত না। রাখালবালকের নিশ্চিন্ত-চিত্তে, বিকারহীন প্রাণে, সুরতাল-হীনস্বরে বিরহের গান "মোর মনে জাগে ও তার নয়ান দুটি" আবৃত্তি করা হইতে, পদী ময়রাণীর সহিত রীতিমত জ্বালা-উদ্রেক-কারিণী রসিকতার অনুষ্ঠান এবং কৃষক-ভীতিস্থান তখনকার নীলকুঠীর লাঠিয়াল-দর্শনে "বাবারে! কুটীর নেটেলা"—বলিয়া সভয়ে পলায়নটুকু পর্য্যন্ত কেবল ৩৪টি পংক্তিতে লিখিত। কবি এইটুকুতেই নাটকের একটি পাত্রের সম্পূর্ণ নিখুঁত-ছবি দেখাইয়া দিয়াছেন, নাটকের মূল উদ্দেশ্যের কোনৈকদেশ পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এখন বোধ হয়, রাখালবালকটিকে বাদ দিলে বুঝি পদী ময়রাণীর ছবির কোন এক স্থানের শেড্‌লাইটের ব্যতিক্রম হইয়া পড়িবে! তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে একটি "খালাসী"র চিত্র আছে। দৃশ্যটি উড্‌সাহেবের কুঠীর দপ্তরখানার সম্মুখ, উড্‌সাহেবের অপেক্ষায় "গুপে গুওটা" এক খালাসীর সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত।

খালাসীকে গোপীনাথ বলিল, "তোদের ভাগে কম না পড়লে তো আমার কাণে কোন কথা তুলিস্‌নে"। তিরস্কারের উত্তরে খালাসী তিন পংক্তি যে জবাবটুকু দিল, সেইটুকুর জন্যই এই খালাসীর প্রয়োজন, আর কেবলমাত্র এই তিন পঙ্‌ক্তি কথার জন্যই কবি খালাসী-চিত্রটি অাঁকিয়াছেন, আরও ঐ কথাটুকুমাত্র বলাইয়াই তাহাকে দর্শকের সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। সমস্ত নাটকে খালাসী আর কোথাও দেখা দেয় নাই; সুতরাং এই একটিমাত্র বাক্যের উপর এই চিত্রটির জীবনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। কবির মহতী প্রতিভার বলে সে সাফল্য ঘটিয়াছে। রাখালবালকের ন্যায় এই ক্ষুদ্রতম চিত্রটিও নিজেকে ফুটাইয়া নাটকের আর একটি প্রধান চিত্রের পরিস্ফুটনে সাহায্য করিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে নাটকের বর্ণনীয় বিষয় নীলকরের কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারের ব্যাপারও বলা হইয়াছে। খালাসী যাহা বলিল, তাহাতে নীলকুঠীর মশাটা মাছিটা পর্য্যন্ত প্রজার রক্তশোষণের কিরূপ অংশভাগী, নীলকুঠীর কর্ম্মচারিগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের জন্য প্রজাদের কিরূপ পীড়ন হয়, আর এই নাটকের প্রধান চিত্র গোপীনাথের স্বভাবের একটা দিক কিরূপ, তাহা সুন্দর ফুটিয়াছে! একটামাত্র কথায় চিত্র ফুটাইতে, চিত্রের আবশ্যকতা উপলব্ধি করাইতে, দীনবন্ধুর ন্যায় সুকৌশলী নাট্যকার অতিমাত্র বিরল। এমন করিয়া সকল চিত্রের সাফল্য রক্ষা করা, এমন করিয়া নাটকীয় প্রত্যেক ক্ষুদ্র চিত্রের বা চিত্রগুলির উপর কোন মূল চিত্রের বিকাশ নির্ভর করা, আর কোন বাঙ্গালী নাট্যকার পারিয়াছেন কি না, জানি না। কবি যে যত্ন করিয়া, এমনই করিতে হইবে বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া, এই সকল ক্ষুদ্র চিত্রগুলিতে রঙ্গ ফলাইয়াছেন, তাহা নহে। তাহা এই চিত্রগুলির সহজ সরল স্বভাবসঙ্গত ভাষা দেখিলেই বুঝা যায়। এই একটা ক্ষুদ্র চিত্র আমি যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই লিখিলাম; এই পরিমাণে তাঁহার নাটকের মূল চিত্রগুলির সমস্ত সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে গেলে, এক একটি স্বতন্ত্র সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। ততটা অবসর আজিকার সভায় হইবে না। অনেকে বলেন, দীনবন্ধু নীলদর্পণে কৃষক, আমীন, লাঠিয়াল, আদুরী, ক্ষেত্রমণি, কবিরাজ প্রভৃতি দ্বিতীয়-তৃতীয়-শ্রেণীর ছবিগুলি যেরূপ সুসঙ্গত স্বাভাবিক রঙ্গে সুচিত্রিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার প্রথম শ্রেণীর চিত্রগুলিকে ততটা পারেন নাই। তাঁহারা কেন এ কথা বলেন, তাহার বিশেষ কারণ দেখাইয়া কেহ যে কোথাও কিছু লিখিয়াছেন, তাহা দেখি নাই। ১২৭৯ সালের ৮ই পৌষ শনিবারে (২১ ডিসেম্বরে) ন্যাশন্যাল থিয়েটারে

নীলদর্পণ দ্বিতীয় দিন অভিনীত হইলে তখনকার "মধ্যস্থ" পত্রে যে সমালোচনা বাহির হয়, তাহাতে কতকটা এইরূপ আভাষ পাওয়া যায়। মধ্যস্থ-সম্পাদক ইহার কতকটা কারণ কবির ভাষাবিন্যাসের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি একটু উদ্ধৃত করিব। মধ্যস্থ লিখিতেছেন,—"নিরপেক্ষ সত্য বলিতে গেলে নীলদর্পণের যে সকল স্থানে সাহেব, চাষা, অন্যান্য ইতর লোক এবং হাস্যরসোদ্দীপক চরিত্রসমূহের কথোপকথনাদি লিখিত হইয়াছে, সে সব স্থান অতি চমৎকার, যেখানে যেখানে নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সরলতা প্রভৃতির মুখে বেশী সাধুভাষা দেওয়া হইয়াছে; সেখানে ভাব উত্তম থাকিলেও শব্দগত 'অতি' দোষটী ঘটিয়া রসের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। ঐ সকল বক্তার মুখে মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক গুরুভাবের গুরুতর শব্দাড়ম্বর কর্ণে যেন অপ্রিয় ধ্বনির কাজ করিয়াছে। * * * সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলার মুখে আর্য্যপুত্র, প্রাণবল্লভ হৃদয়নাথ শোভা পায়। গোলোক বসুর পুত্রবধূর মুখে সেরূপ সম্বোধন দুই এক বিশেষ স্থল ব্যতীত অর্থাৎ সচরাচর ব্যক্ত হওয়া নিতান্তই অস্বাভাবিক।

'বাড়াভাতে ছাই তব বাড়াভাতে ছাই,
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই।'

নীলকুঠীর কঠোর-স্বভাবী, ঘোর-বিষয়ী, অর্থগৃধ্নু, পরপীড়ক, ধূর্ত্ত গোপীনাথের মুখে সাধুর প্রতি ঐরূপ কবিতা ব্যক্ত হওয়া কি সম্ভব হয়? সেরূপ লোক কবিতার কি ধার ধারে? সে কি প্রজার কাছে, কবিতা পড়িয়া আপনার ভারিত্ব নষ্ট করিতে পারে? নাটকের ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে গোলোক বসু নবীন-মাধবকে নীলকুঠীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি বাবা, কি করে এলে?' নবীন উত্তর দিলেন—'আজ্ঞে জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশনে সঙ্কুচিত হয়?' ইত্যাদি।

বাঙ্গালী ছেলে বাঙ্গালী-বাবার কাছে এরূপ উৎকট-রূপক বিশিষ্ট উৎকট সাধুভাষা প্রয়োগ করিলে অভিনয় কি উত্তম হইতে পারে?

৩য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে নবীনমাধব ও সৈরিন্ধ্রী কর্ত্তার কারামুক্তি, অর্থাভাব ও মোকদ্দমা প্রভৃতি দারুণ দুরবস্থার যে সব কথাবার্ত্তা কহিতেছেন তন্মধ্যে 'প্রাণনাথ, অবিরল, হে নাথ, অকিঞ্চিৎকর, আভরণ, হৃদয়বল্লভ, জীবনকান্ত' ইত্যাদি শব্দ কি সৈরিন্ধ্রীর মুখে সাজিতে পারে? আবার—'ও অগ্নিবাণ, তার আর সন্দেহ কি? আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে।' এরূপ কথা কি

স্বাভাবিক? ইহা কি বড় দুঃখপ্রকাশক হইল? কোমল ও লঘুবাক্যবিন্যাস কি ইহার অপেক্ষা করুণাবাচক হয় না? নবীনমাধবের উক্তিতে ঐরূপ অর্থাৎ 'প্রেয়সী, আহা বিধুমুখী, প্রণয়িনী' প্রভৃতি সম্বোধন ও অন্যান্য পদাবলী আমাদের কর্ণে ভাল লাগে নাই।

নবীনমাধবের মৃতবৎ শরীর দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী সৈরিন্ধ্রী রোদন করিয়া বলিতেছেন (এই স্থলেই বড় শোকের আশা)—

'আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন,—প্রাণনাথ! নয়ন মেলে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী বলে ডেকে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর—মধ্যাহ্ন সময়ে আমার সুখসূর্য্য অস্তগত হইল—আমার বিপিনের উপায় কি হইবে।'—এই সংস্কৃত ভাষা স্ত্রীলোকের মুখে পতির মৃত্যুকালে নিনাদিত হইলে রঙ্গভূমিতে শোকোদ্রেকের যত দূর সম্ভাবনা. তাহা সহৃদয় পাঠকমণ্ডলী ধ্যান করিয়া দেখুন। এরূপ ভাষা এক আধ স্থলে হইলে, আমরা উল্লেখমাত্র করিতাম না, বহুস্থলে এই প্রকার গুরুশব্দ অর্থাৎ অবস্থার অনুপযুক্ত সাধুভাষা ব্যবহৃত হইয়া করুণা-রসের প্রতিবন্ধকতা করা হইয়াছে।"

"মধ্যস্থ" এই সকল বলিয়াই আবার এক স্থলে বলিয়াছেন—"অভিনয়ের কোন ক্রটী হয় নাই, প্রায় সমুদায় অংশ মনোমত হইয়া কেবল যে যে স্থলে এইরূপ ভাষা নবীন, বিন্দু, সৈরিন্ধ্রী ও সরলতার মুখে (দুঃখে) নির্গত হইতে লাগিল, সেই সেই স্থলেই শ্রুতিকটু ও রসভঙ্গ হইয়া উঠিল। * * * প্রিয়বন্ধু দীনবন্ধু বাবু আমাদিগের এই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল অভিপ্রায় ভাবিবেন না, আমাদের মতে নীলদর্পণ চমৎকার নাটক। ইহার গুণ অসীম, ইহার বর্ণিত সংযোগস্থল ও চরিত্র, বাঙ্গালা নাটকের মধ্যে অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। * * * ভরসা করি, যে মানসে আমরা ইহা ব্যক্ত করিলাম,—নব-সংস্করণসময়ে সংশোধিত হইবার মানসেই ইহা ব্যক্ত করিলাম,—ভরসা করি, আমাদের সেই মনোরথ সিদ্ধ করিয়া কবি-বর গ্রন্থখানিকে বঙ্গসাহিত্যসংসারের একটি অমূল্যনিধি করিয়া দেন।" * ১২৭৯ সালের ১৫ পৌষের মধ্যস্থ পত্রিকায় এই সকল কথা প্রকাশিত হয়। মধ্যস্থের এই অনুরোধে দীনবন্ধু কি স্থির করিয়াছিলেন জানি না, তবে কোন যে

* পুরোহিত পত্রের ২য় ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় (১৩০১ শ্রাবণের সংখ্যায়) "মধ্যস্থ" হইতে উদ্ধৃতাংশ।

পরিবর্ত্তন করা ঘটে নাই, তাহা নীলদর্পণের বর্ত্তমান সংস্করণ দেখিলেই জানা যায়। পরিবর্ত্তন করিবার অবসরও হয় নাই। যখন উক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তখন কবিবর পীড়িত, ঠিক তাহার এক বৎসর পরে ১২৮০ সালের ১৭ কার্ত্তিক শনিবারে (১৮৭৩। ১লা নভেম্বরে) তাঁহার দেহান্ত হয়।

মধ্যস্থের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচক বলেন,—'দীনবন্ধু বাবুর সময়ে নাটকের উপযুক্ত এখনকার মত এতটা সরল ভাষার ব্যবহার তখনও চলে নাই। তখনও ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় অনুপ্রাসবাহুল্যের প্রভাব এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ ও শব্দালঙ্কারপূর্ণ ঘটটঙ্কারময়ী ভাষার প্রভাব সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। তখনও লোকে বঙ্কিমের ভাষা দেখে নাই, শুনেও নাই, সুতরাং কালের প্রভাব দীনবন্ধু এড়াইতে না পারিয়া যেখানে বাক্যের অর্থগৌরব-বর্দ্ধন করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই তখনকার সাধুভাষা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।' কথাটা কতকাংশে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। নীলদর্পণ বাহির হইবার পূর্ব্বেই নাটকের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় লিখিত নাটক আবির্ভূত হইয়াছিল; এমন কি, তখন কলিকাতার নানাস্থানে সে সকল নাটকের অভিনয় হইতেছিল; * সুতরাং দীনবন্ধু বাবুর যে আদর্শ ছিল না, তাহা নহে; তবে দীনবন্ধু বাবু তখন চাকুরী উপলক্ষে পথে-পথে, দেশে দেশেই ঘুরিতেন, তাঁহার এগুলি দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ নীলদর্পণ পথে-পথে রচিত, ঢাকায় মুদ্রিত, ঢাকায় প্রকাশিত, এবং সর্ব্বপ্রথম (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, ১২৮৮ সালে) ঢাকাতেই প্রথম অভিনীত হয়। যে কারণেই হউক, যে কবি নীলদর্পণের সামান্য চিত্রগুলির ভাষা দেশকালপাত্র বুঝিয়া, প্রাদেশিকতা বজায় রাখিয়া, শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যথাযথ লিখিতে পারিয়াছেন, তিনি যে ইচ্ছা করিলে নবীন, সৈরিন্ধ্রী, সাবিত্রী, বিন্দু, সাধুচরণ প্রভৃতির মুখে তাঁহার জন্মভূমি নদীয়া জেলার বা যশোহরের ভদ্র-পরিবারের কথোপথনের সহজ সরল ভাষা দিতে পারিতেন না, এমন নহে। আমার মনে হয়, কবি ইচ্ছা করিয়াই কাব্যের অর্থ-গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য, রচনায় সংস্কৃত-সাহিত্যসুলভ গাম্ভীর্য্য প্রদানের জন্য, ঐরূপ ভাষা দিয়াছেন। আমার এরূপ অনুমান করিবার আরও একটু হেতু আছে। নীল-

* রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও রত্নাবলী, ও মাইকেলের শর্ম্মিষ্ঠা তখন প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়াছে। এমন কি, বঙ্কিমী ভাষার আদর্শ টেকচাঁদের আলালের ঘরের দুলালও তখন বাহির হইয়াছিল।

দর্পণের ৫ বৎসর পরে প্রকাশিত "বিয়ে পাগলা বুড়োতেও" কবি গৌরমণি-রামমণির কথোপথনের মধ্যে বিধবার আকাঙ্ক্ষা, আক্ষেপ এবং বিধবা-বিবাহের যুক্তিযুক্ততা-বর্ণনস্থলে, ঠিক ঐরূপ ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু সধবার একাদশী নীলদর্পণের ৬ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়, তাহাতে এরূপ ভাষা কোথাও নাই। নবীনমাধব বিন্দুমাধবের ন্যায় পল্লীগ্রামস্থ যুবকের স্বগত-বাক্যাবলী পাঠ কর, আর নিমে দত্তের স্বগত-বাক্য পাঠ কর, সরলতা-সৈরিন্ধ্রীর কথাবার্ত্তা পাঠ কর, আর কুমুদিনী-সৌদামিনীর কথোপকথন পাঠ কর, প্রভেদ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কবির এরূপ ইচ্ছার মূলে, ঈশ্বরগুপ্তের শিক্ষার ফল কতটা কার্য্যকর হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা অনুপ্রাস ও শব্দচ্ছটাময়ী হইলেও, গদ্য যে সাধারণতঃ আড়ম্বরপূর্ণ ছিল, তাহা দেখি নাই। নীলদর্পণের একটি চিত্রের ভাষা সম্বন্ধে আমার একটা সন্দেহ আছে। কবি সাধুচরণের ভাষা রাইচরণের ভ্রাতার মত কোথাও করেন নাই কেন? স্বীকার করি, সাধুচরণ গুরুমহাশয়ের পাঠশালে শিশুবোধকখানা না হয় পড়িয়া শেষ করিয়াছিল, "আজ্ঞাকারী" "সেবকশ্রী" ইত্যাদি লিখিয়াছিল, বিচালীর পোয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া কৃত্তিবাসের, কাশীদাসের পুঁথিও হয় ত পড়িতে পারিত, কিন্তু গোপীনাথ যে বলিয়াছিল, "সাধু তোর সাধুভাষা রাখ্, চাষার মুখে ভাল শুনায় না"—আমিন বলিয়াছিল, "বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন প্রভাপশালী" ইত্যাদি অনুযোগ গুলা কি কবিকেও একটু সন্দেহ-দোলায় দোলায় নাই? চাষাদের মধ্যে সকল গ্রামেই এক জন "দরবেরে ভাই" থাকে, দরবারে অর্থাৎ জমীদারের কাছারীতে, বা আদালতে সেই লোকটা মুখপাত্র হয়, অর্থাৎ দুটা কথা সে গুছাইয়া বলিতে পারে। সাধুচরণ না হয়, তার চেয়েও একটু বেশী,—দ্বিতীয় ভাগের বাক্যাবলীও আওড়াইতে পারিত, সুতরাং সে কর্ত্তামহাশয়ের আটচালায় বসিয়া বা নীলকুঠীতে গিয়া, সাধুভাষা ছড়ায় ছড়াক, কিন্তু সে যে রেবতীর কাছে, ক্ষেত্রমণির মৃত্যু-শয্যায় সাধুভাষায় আক্ষেপ করে, কন্যাকে রোগে সান্ত্বনা দেয়, কবিরাজের সঙ্গে রূপক-ভাষায় বড়বাবুর বিরহের অসহনীয়তা বর্ণন করে, তাহা কি স্বভাবসঙ্গত বলিয়া মনে হয়?

নীলদর্পণ নাটকের নাটকত্বের বিচার করিলে, অনেক গুণপণা লক্ষিত হয়। ঘটনা-বৈচিত্র্যের কথা অনেকেই বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে নূতন কথা বলিবার কিছুই নাই। আমি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার উল্লেখ করিব। নীলদর্পণে ঘটনাস্থলে পাত্রপাত্রীর আসা যাওয়া বড়ই নিপুণতার সহিত সংঘটিত হইয়াছে। কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি,—প্রথম দৃশ্যে নবীনমাধব

যখন পিতার সঙ্গে নিজেদের দাদনের কথা তুলিয়া কুঠীর সংবাদ দিতেছিলেন, সেই সময় গোলোক বসু ভবিষ্যৎচিন্তায় নিজে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং পুত্র-কেও অস্থির করিয়া তুলিতেছিলেন। মানুষ ভবিষ্যৎ-আলোচনায় একটু তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে, সুতরাং সে কথা চলিলে, দুই-দশ ঘণ্টা অবিরত চলিতে পারিত, কিন্তু নাটকের কবি ততটা সময় ব্যয় করিতে পারেন না, দর্শকবৃন্দের প্রতি তাঁহার একটু দৃষ্টি রাখিতে হয়; কাজেই পিতাপুত্রের আলোচনা যখন ক্রমেই ঘোরাল হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণের গম্ভীর তর্কের দিকে ছুটিল, ঠিক সেই সময়ে আদুরী আসিয়া, সহজ স্বাভাবিক ভাবে, বর্ষীয়সী দাসীর মৃদু-প্রভাব জানাইয়া বলিল, "মা ঠাক্‌রণ যে বক্‌তি নেগেচে, কত বেলা হলো, আপনারা নাবাখাবা কর্‌বেন না? ভাত শুকিয়ে যে চাল হয়ে গেল।" আর অমনি কথার স্রোত ফিরিয়া গেল, পিতাপুত্রে স্নানাহারের জন্য উঠিলেন। কবির গুণপণা এইখানে। এ কৌশল বাঙ্গালা নাটকে প্রায় দেখা যায় না। আদুরী আসিয়া স্নানাহারের বেলাধিক্যের সংবাদ দিয়া যেমন গৃহস্থের সংসারচিত্রের একটা বিশেষ সময়ের ফটো দেখাইয়া দিল, বেলাধিক্যজনিত গৃহকর্ত্রীর উৎকণ্ঠা, স্নেহ, প্রীতি ভক্তি ইত্যাদির চিত্র আনিয়া উপস্থিত করিল, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে পিতাপুত্রের দুর্ব্বহ চিন্তার ভার, তখনকার মত অতি কৌশলে সরাইয়া দিল। ঠিক এরূপ একটি ঘটনার সংঘটন ব্যতীত, আর কোন কারণ উপস্থিত করিয়া যদি কবি ঐ তর্কস্রোতে বাধা দিতেন, তাহা হইলে বাধাই দেওয়া হইত, এমন সুসঙ্গত হইত বলিয়া মনে লয় না।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে পদী ময়রাণীকে বালকেরা খেপাইয়া প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে। পদী বালকদলকে সাম্‌লাইতে পারিতেছে না, কাকুতি মিনতিতে বালকদল আরও মজা বোধ করিতেছে। দর্শকেও রসান্তর না পাইলে, পদীর দুর্দ্দশায় আর হাসিয়া কুলাইতে পারিতেছে না, এমন সময় নবীনমাধব উপস্থিত। কৌশলটি সামান্য নহে। পদীর লজ্জা জন্মাইতে, ভয়ের উদ্রেক করিতে, এক নবীনমাধব ভিন্ন গ্রামে আর কেহ নাই। নীল-কুঠীর লোক আসিলে বালকেরা পলাইত বটে, কিন্তু পদী যাইত না; স্বয়ং নীলকর সাহেব আসিলেও না; কাজেই কবি নবীনমাধবকে এখানে আনিয়াছেন। নতুবা দুটা আক্ষেপের কথা আবৃত্তি করা ভিন্ন এ দৃশ্যে নবীনমাধবের অন্য কোন কার্য্যই কবি দেখান নাই। আবার এই দৃশ্যের শেষে নবীনমাধব একাকী যখন খেদোক্তি করিতেছেন, দেশের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া আপনার ক্ষুদ্র-শক্তিতে

কিছু করিতে পারিলেন না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন; আবার, চেষ্টার অসাধ্য কি, বলিয়া সাহসে বুক বাঁধিতেছেন, সেই সময়ে কবি আবার কেমন সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন! নবীনমাধবের এ চিন্তা-স্রোত বাধা না পাইলে, অনিয়মিত কালের জন্য দিবারাত্র ছুটিতে পারে, কিন্তু দর্শক-পাঠকের সে বক্তৃতা শুনিবার তত ধৈর্য্য কোথায়? কাজেই নবীনমাধবকে কিছুক্ষণ পরে গৃহে ফিরাইবার প্রয়োজন হইল। নবীনমাধব মধ্যে বলিয়াছিল, "বাড়ী যাইতে পা ওঠে না," অথচ বাড়ী না গিয়াই বা যান কোথায়? কাজেই বাড়ী যাইবার একটা ইচ্ছা বা প্রয়োজনের সৃষ্টি করা কবির আবশ্যক হইল। তুমি আমি বা তোমার আমার মত কবি হইলে, হয় ত এইখানে নীলকরের একটা অত্যাচারের সংবাদ দিয়া উদ্বিগ্ন নবীনমাধবকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া সরাইয়া লইয়া যাইতেন, নবীনমাধবের করুণা ও মহিমা ফুটাইবার এই একটা অবসর করিয়া লইতেন, কিন্তু কবি তাহা করিলেন না। কবি দুইটি অধ্যাপক আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা নস্য লইয়া, কবিতা আওড়াইয়া, গোলোক বসুর বাটীতে অতিথি হইতে চাহিলেন। নবীনমাধব কাজেই পা না উঠিলেও, বাড়ী যাইতে বাধ্য হইলেন। কবি এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন। নবীনের বাড়ী যাওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অতিথি-সেবায় দ্বিজ-ভক্তিতে অনুরাগ দেখাইলেন, গোলোক বসুর সংক্রিয়ান্বিত নামের যে একটা খ্যাতি বিদেশেও বিশ্রুত ছিল, তাহাও প্রকাশ করিলেন। এমনই সুসঙ্গত কৌশলে বিষয়ান্তরের অবতারণা করিয়া একই ভাবের বর্ণনায় পৌনঃপুনিকতায় হ্রাস করা কি কম গুণপণার কথা? পঞ্চম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে মৃত নবীনের শয্যা-পার্শ্বে পুরোহিতের উপস্থিতি ঠিক এমনই কৌশলময় আর একটি ঘটনা। সাধু আর তোরাপ মৃতদেহ লইয়া আসিল, আদুরী "তানাদের ডাকে আনি" বলিয়া চলিয়া গেল। সাধু আর তোরাপ ঘরে একা, তখন এদের কথা কহিবার কিছু নাই, অথচ 'ডাকে আনি' বলিতেই পারিপার্শ্বিক দৃশ্যপটের (wingsএর) পার্শ্ব হইতে হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরিবারবর্গের প্রবেশসম্পাদন করিলে, সাধু ও তোরাপের পক্ষ হইতে ভক্তি-প্রীতি-বিস্ময়ের সঙ্গে, কৃতজ্ঞতাভরে নিষ্ফল-চেষ্টার আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে, নবীনের বীরত্ব-বর্ণনার অবসর থাকে না; কাজেই সুকৌশলী নাটককার এখানে পুরোহিত ঠাকুরকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ডাক্তার-কবিরাজ আনিলেও চলিত, কিন্তু তাহাতে ঔষধ-পথ্যের বিধান আর আঘাতের অবস্থা বর্ণনা ছাড়া আর কোন কথার অবসর হইত না; কবির উদ্দেশ্য,—নবীনের

চরিত্র-বিকাশ প্রদর্শিত হইত না। হিন্দুর মৃতদেহ-পার্শ্বে প্রায়শ্চিত্তাদির জন্যও পুরোহিতের আবশ্যক হয়, কিন্তু এ স্থলে সে প্রয়োজন থাকিলেও সে উদ্যোগ করিবার কেহ নাই; কবিও তাহা করেন নাই। কবি যাহা করিয়াছেন, সে কৌশল তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কখন আসে না। শোকের উপরে শোকভার চাপাইয়া দৃশ্যটিকে আরও শোকাবহ করিতেই কবি পুরোহিতকে আনিয়াছেন। কৌশলটি এই,— গোলোক বসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যু শ্রবণ করিয়া নবীনের জননী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দশ দিন পাপ পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না। চার দিন অনাহারে কাটিয়াছে, আজ পাঁচ দিন। মাতৃভক্ত পুত্র কাঁদিয়া, মার গলা ধরিয়া, আপনিও উপবাস করিবার কথা বলিয়া মাকে হবিষ্য করিতে সম্মত করিয়াছেন, মা পুরোহিতের প্রসাদান্ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেওয়ায়, নবীনমাধব পুরোহিতকে সংবাদ দিয়াছিলেন। এই সামান্য কৌশলে কবি কেমন অজ্ঞাতসারে মাতৃভক্তি, ব্রাহ্মণভক্তি, পুত্রস্নেহ এবং শোকের উপর শোকের গুরুত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তার পর পুরোহিতের সহিত সাধু ও তোরাপের কথাবার্ত্তায় নাটকীয় ঘটনারও যে অতি সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। নবীনমাধবের মৃতদেহের পার্শ্বে এবং ক্ষেত্রমণির মুমূর্ষু অবস্থার শয্যা-পার্শ্বে কবিরাজের উপস্থিতি যেমন স্বাভাবিক, তেমনই আবার কৌশলময়। শোক তুমুল-ঝটিকার বেশ ধারণ করিয়া, নিরীহ দর্শকদিগকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া যেন কবি দয়া করিয়াই ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, মৃদুভাবে রসান্তর ঘটাইয়া কবিরাজমহাশয়কে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। কবিরাজ না আসিতে আসিতে ক্ষেত্র যদি মরিত, বা নবীনের ক্ষত স্থানে "তার্পিন তৈল ল্যাপনের ব্যবস্থা" যদি নাই হইত, তাহা হইলেও নাটকের কোন ক্ষতি হইত না; কিন্তু দর্শকগণের, পাঠকগণের পক্ষে শোকভার বহন করা অসাধ্য হইত। এরূপ অনেক আছে,—নাটকীয় মূল চিত্রগুলিতেও এরূপ আগম-নিগমের সূক্ষ্ম কৌশল যথেষ্ট আছে, সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান ও সময় নাই। দুইটিমাত্র দেখাইব। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রেবতী কন্যা লইয়া বসুদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। সরলতা ছেলেমানুষ, কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ক্ষেত্র! তুমি ঝাপ্‌টা তুলে ফেলেছ কেন?" ক্ষেত্রমণি বলিল, "মোর ঝাপ্‌টা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাকরুণদিদি বল্লে, ঝাপ্‌টা কাটা কস্‌বিগার আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মরে গ্যালাম। সেইদিন ঝাপ্‌টা তুলে ফেল্ল্যাম।" এই কথা শুনিয়াই বড়বউ সৈরিন্ধ্রী সরলতাকে বলিল,—

"ছোট বউ, যাও দিদি, কাপড়গুণো তুলে আনগে, সন্ধ্যা হলো।" সেখানে আদুরীও বসিয়াছিল, তাহাকে আদেশ না করিয়া বড় বউ ছোট বউকে এ কাজের ভার দিল কেন? বিশেষতঃ ছোট বউ বড়মানুষের মেয়ে, শাশুড়ীর আদরের বউ, বড় বউ নিজেও তাকে কন্যার মত যত্ন করে; তায় যখন সাবিত্রী একটু পরে আসিয়াই বলিল,—"হ্যাগা মা! তুমি বই কি আর আমার কাপড় আন্‌বার মানুষ নেই?"—তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, সৈরিন্ধ্রী যে ছোট বউকে সরাইয়া দিল, তাহার মধ্যে অবশ্যই কোন কৌশল আছে। আমার বোধ হয়, কৌশলটুকু এই,—সরলতা বড়লোকের মেয়ে, এত বড়লোক যে তাহারা "কায়েদ্‌গার পইতি কত্তি চেয়েলো";—সুতরাং বড় মানুষের বড় আদরের মেয়ে,—তার পর তার নিজের যে তখনও ঝাপ্‌টা ছিল, এবং ঝাপ্‌টা কাটায় একটু সখ ছিল, তাহা ক্ষেত্রমণিকে প্রশ্ন করা হইতেই বুঝা যায়। সুতরাং ক্ষেত্রমণি যখন বলিল, ঝাপ্‌টা কাটা কস্‌বিগার আর বড় নোকের মেয়েগারর সাজে", তখন বুদ্ধিমতী বড় বউ বুঝিল, বড়মানুষের ঝাপ্‌টা-কাটা অভিমানিনী কন্যা হয় ত মনে মনে চাষার ঘরের অকপটশূন্যা বাক্য-সংযম-বিহীনা সরলা বালিকার কথায় চটিয়া যাইতে পারে; আর মেয়েটাও হয় ত কথায় কথায় আরও কিছু বলিয়া ফেলিতে পারে; এই আশঙ্কায় বড় বউ আদর করিয়া অতি কৌশলে ছোট বউকে চট করিয়া কাপড় আনিবার আদেশ করিল; নতুবা যে কথোপকথন হইতেছিল, সে স্থল হইতে ছোট বউকে উঠাইয়া দিবার কোন কারণ দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন, সরলতা যখন কাপড়ের রাশি মাথায় লইয়া আসিল, তখন আদুরী ঠাট্টা করিল, "যেন ধোপা বউ আলেন!"—এই সরস রসিকতাটুকু কবির মনে উদিত হওয়াতেই কবি বড় বউকে দিয়া এ কৌশলটুকু খেলিয়াছেন। এ ব্যাখ্যা অতি সামান্য ও বিশেষ উদ্দেশ্যহীন বলিয়া বোধ হয়; অন্ততঃ এ ব্যাখ্যায় আমার তৃপ্তি হয় না। আর একটি চিত্রের প্রবেশের কৌশল দেখাইয়া নীলদর্পণের কথা শেষ করিব। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মৃতা জননীর পদধূলি ভক্ষণ করিয়া বিন্দুমাধব "মানবদেহ পবিত্র" করিয়া নাটক এক প্রকার শেষ করিয়া দিল। এইখানেই যবনিকা ফেলিয়া দিলে দর্শক-পাঠকের আর আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকিত না; কিন্তু সামাজিক-চিত্রনিপুণ কবির এখনও কিছু দেখাইবার আছে। তিনি এইখানে আবার সৈরিন্ধ্রীকে আনিয়াছেন। নীলদর্পণ-প্রকাশের সময়ে সবেমাত্র সহমরণ-নিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু তখনও দেশের অভ্যন্তরভাগ হইতে সহমরণের প্রথা লুপ্ত হয় নাই। হয় ত এমন গ্রামও ছিল, যেখানে তখনও নিষেধ-বিধির

কথা পঁহুছে নাই। এরূপ সময়ে সৈরিন্ধ্রী আসিয়া সহমরণে যাইবার প্রস্তাব করিল; কাজেই ঐতিহাসিক হিসাবে প্রস্তাব অসঙ্গত হয় নাই। সে জানিত না, সরলতা মরিয়াছে; কাজেই সে ব্যবস্থা করিল, "সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাকবে।" তার পর শাশুড়ী বধূর মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। ক্রমে সমস্ত শুনিল। শুনিয়া তাহার গৃহিণীর উপযুক্ত বিবেচনা আসিল,—আপনা-আপনি প্রশ্ন করিল,—"এখন? কেমন করে?" তাহার পর শোকের কান্না—এই অবস্থায় কবির বড় বিপদ। কবি যাহা বলিবার, তাহা বলাইলেন; যাহা দেখাইবার, তাহা দেখাইলেন। এখন সৈরিন্ধ্রীকে আর সহমরণে যাইতে দিলে সংসারটা ভাসিয়া যায়; অনাথ বিপিনের উপায় হয় না, অভাগা বিন্দুমাধবকে কন্থা লইয়া বাহির হইয়া যাইতে হয়; অথচ সৈরিন্ধ্রী যে অবস্থায় উপস্থিত, তাহাতে তাহার পক্ষে সহমরণ-গমন ব্যতীত আর প্রকৃষ্ট পন্থা নাই। তাহার উপর বর্ত্তমান দৃশ্যে দুই দিকে দুইটা মৃতদেহ, মধ্যে মৃতপ্রায় বিন্দুমাধবকে ফেলিয়াও সৈরিন্ধ্রী স্থান ত্যাগ করিতে পারে না; অথচ তাহাকে ঘটনা-স্থলে আর বেশী রাখিলে স্ত্রীসুলভ বিনাইয়া কাঁদিবার ব্যাপারে বাধা দিতে পারা যায় না, যবনিকা পড়ে না। এখন, কি কৌশলে এই সকল দিক রক্ষা করা যায়? দীনবন্ধুর অপূর্ব্ব কৌশল!—আদুরী আসিয়া বলিল,—"বিপিন ডারিয়ে উটেচে, বড় হালদার্ণি শীগ্‌গির এস!"—সৈরিন্ধ্রী চম্‌কাইয়া বলিল,—"তুই সেইখান হতে ডাক্‌তে পারিস্‌নি, একা রেখে এসেচিস্?" এই বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। কি চমৎকার কৌশল! মরণকামা রমণীকে ফিরাইবার কি চমৎকার কৌশল! সন্তানস্নেহ, সন্তানের অমঙ্গল-আশঙ্কা জননী-হৃদয়ে যে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে, তাহার কি সুন্দর নিদর্শন! এই উপায় ভিন্ন নিজের সঙ্কল্প দূরে থাক, মৃতদেহদ্বয়মধ্যবর্ত্তী পুত্রপ্রতিম হতভাগ্য দেবরকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া হিন্দুবধূর পক্ষে আর কিসে সম্ভব হইতে পারে? ধন্য দীনবন্ধু! ধন্য তোমার গভীর দৃষ্টি, এবং ধন্য তোমার উদ্ভাবনী শক্তি! নীল-দর্পণের মত দীনবন্ধুর অন্য নাটকে ও প্রহসনেও এইরূপ পাত্রপাত্রীর আসা-যাওয়ায় এইরূপ কৌশলময় সংঘটন দেখা যায়। তাহাতেই বুঝা যায় যে, এই গুণপণাটুকু দীনবন্ধুর স্বভাবসিদ্ধ গুণ। লীলাবতীতে দ্বিতীয় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে কনে-দেখার দৃশ্যে হেমচাঁদের বক্তৃতার পর রঘুয়ার প্রবেশ এইরূপ একটি কৌশলময় ঘটনা। হেমচাঁদ নদেরচাঁদের বখামির চূড়ান্ত অভিনয় হইয়া গেল। তাহার পরই যদি কর্ত্তা হরবিলাস আসিয়া উপস্থিত হন,

তাহা হইলে, নদেরচাঁদের রূপবর্ণনার অবসর হয় না। রঘুয়া আসিয়া সেটা করিয়া দিল; শ্রীনাথচাঁদসিদ্ধেশ্বরের কৌশলে নদেরচাঁদ যে "ভালুপিলা" সাজিয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যা করিল; আর তাহার সহিত কথোপকথনে নদেরচাঁদের শিষ্টতা—"শালা উড়ে ম্যাড়া"—"জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব" ইত্যাদি প্রদর্শিত হইল। চতুর্থ অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে যেখানে কর্ত্তার সঙ্গে পণ্ডিতমহাশয় বংশজে দুহিতা দান অধর্ম্ম নয় বলিয়া তর্ক করিতেছেন, সেইখানে দাসী আসিয়া লীলার অসুখের সংবাদ না দিলে পণ্ডিতমহাশয়কে কর্ত্তার তর্কস্রোতে ভাসিয়া কোথায় যাইতে হইত, কে জানে। কর্ত্তা ত সংসারত্যাগের কথা তুলিয়া এক প্রকার তাঁহার মুখ বন্ধই করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে শারদা আর লীলা দুটি সইএ বসিয়া আপন আপন মনঃকষ্টের আলোচনা করিতেছে। হাস্য-পরিহাসে কথাবার্ত্তা আরব্ধ হইয়া যেখানে ক্রন্দনের ঢেউ উঠিল, সেইখানে কবি হেমচাঁদকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। হেমচাঁদ আসায় লীলাবতী রক্ষা পাইল, তাহার হাস্য-পরিহাস ফিরিয়া আসিল, দর্শক-পাঠকও বাঁচিল।

এইরূপ সংযোগস্থল নবীন-তপস্বিনীতেও আছে। উদাহরণ উদ্ধারের আর প্রয়োজন নাই।

দীনবন্ধুর নাটক প্রহসনের মধ্যে দৃশ্য-যোজনা ও দৃশ্য-সংস্থানের অতিমাত্র কৌশল দেখা যায়। তাঁহার কোন দৃশ্যে ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য-বর্ণনার কোন গোলমাল দেখি নাই। কোন দুইটি দৃশ্যের যোজনায় একবারে বিরুদ্ধরসের বর্ণনা দেখা যায় না; অর্থাৎ এক দৃশ্যে গভীর শোকের কথা বর্ণনা করিয়া অমনই পরবর্ত্তী দৃশ্যে একবারে হাস্যরসের অবতারণা কোথাও নাই। অনেক আধুনিক নাট্যকারের মুখে বা সমালোচকের মুখে শুনিয়াছি, ঐরূপ দুই নিকট-বর্ত্তী দৃশ্যে বিরুদ্ধরসের বর্ণনাই ভাল নাটকে আবশ্যক। তাহা না হইলে, তাঁহারা বলেন, দর্শকের বা নাটকীয় ঘটনার অবসাদ নষ্ট হয় না। আমাদের অদ্যকার সভাপতি* মহাশয়ের প্রফুল্ল নাটকের দৃশ্য-বিশেষের সমালোচনায় কোন বিজ্ঞ সমালোচক ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের বিধি দূরে থাক, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, নাটকের এক দৃশ্যে বর্ণিত কোন রসের অভিনয়ে দর্শকের মনে যে ভাব জাগিয়া উঠে, পরবর্ত্তী দৃশ্যে ঠিক তাহার বিপরীত রসের অবতারণা করিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবের একবারে নাশ হয়, এবং সে নাটকের অভিনয়দর্শনে দর্শক মুগ্ধ হইবার অবকাশ পায় না; আর অভিনেতৃ-

* প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়।

বৃন্দকেও রসোদ্ভাবন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। দীনবন্ধু বাবুর কোন গ্রন্থে এরূপ রস-বিপর্য্যয়সূচক দৃশ্যযোজনা নাই।

আরও একটি কৌশল দীনবন্ধুর গ্রন্থে দেখা যায়। তাহা আধুনিক অনেক নাটকে দেখিতে পাই না। আদর্শ সত্ত্বেও এখনকার নাট্যকারেরা কেন যে সেটির দিকে লক্ষ্য করেন না, তাহা বলিতে পারি না। দীনবন্ধু বাবুর দৃশ্য সাজাইবার ক্ষমতা অতীব চমৎকার। যে দৃশ্যে যেমনটি দরকার, তাঁহার পাত্র-পাত্রী ঠিক সেই অবস্থায় শুইয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া বা উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত অবস্থায় দর্শকসম্মুখে উপস্থিত হয়, বা প্রকাশিত হয়। নীলদর্পণের ১ম অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে আমরা দেখিতে পাই, সৈরিন্ধ্রী যদি চুলের দড়ী না বিনাইয়া কেবল বসিয়া বসিয়া "ছোট বউ বড় পয়মন্ত" ইত্যাদির পরিচয় দিত, দর্শকের আপত্তির কারণ কিছুই থাকিত না, বা রসবোধেও কোন ব্যাঘাত ঘটিত না; কিন্তু দড়ী বিনাইতে বিনাইতে ঐ কথাগুলি বলায় যে একটু সূক্ষ্ম মধুর রসের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইত না; বা দর্শক যে স্বাভাবিক ছবি দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাও পাইতেন না। এই একটামাত্র উদাহরণই দিলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক দীনবন্ধুবাবুর সকল পুস্তকের সর্ব্বত্র এইরূপ দেখিতে পাইবেন। এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা বলিয়া যাই,—আজকালকার সকল নাটকের অভিনয়েই পাত্রপাত্রীরা প্রায় সমস্ত দৃশ্যেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় করে, দেখিতে পাই। কি ঐতিহাসিক নাটক, কি পৌরাণিক নাটক, কি সামাজিক নাটক, এমন কি, গার্হস্থ্য নাটকের অভিনয়েও কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কোন দৃশ্যে বসিয়া অভিনয় করিবার আবশ্যকতা দেখেন না। নাট্যালয়ের অধ্যক্ষেরাও আজকাল এ বিষয়ে কেন যে দৃষ্টি রাখেন না, তাহা বুঝিতে পারি না। আজকাল অনেক নাটক-কারও রঙ্গমঞ্চের বিধিব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না; অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয়কার্য্যের সুবিধার জন্য নাটকে যে সকল ইঙ্গিত করা আবশ্যক, তাহাও করেন না; অনেকে প্রবেশ প্রস্থানটা পর্য্যন্ত লেখেন না; কাজেই অনেক স্থলে বিশেষতঃ গার্হস্থ্য নাটকে আমরা ঐরূপ বিসদৃশ অভিনয়ের অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। এখনকার দুই একটা উদাহরণ দিব। আজকাল সহরের দুইটি প্রধান থিয়েটারে এক বাঙ্গালী রাজার কীর্ত্তি অভিনীত হইতেছে। এই নাটকে সাম্রাজ্য-স্থাপনচেষ্টাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইলেও, বাঙ্গালীর ঘরের ছবি যে এই দুই নাটকে নাই, এমন নহে। মধ্যবিত্ত সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহিণী স্বামীর অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, এবং স্বামীর বিলম্বের জন্য আক্ষেপ করিতেছে,—তাহাও বসিয়া নহে, প্রত্যুত ছুটা-

ছুটি করিয়া! গৃহকর্ত্তা স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া আদর করিতেছেন, তাহাও বসিয়া নহে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া! রাজাদেশে পুত্রের দণ্ডবিধান হইয়াছে, পিতামাতা ভাবিয়া আকুল, অথচ কেহ বসিয়া পড়িতেছে না, বরং ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ইত্যাদি।

আর একখানি নাটকে দেখিয়াছি, এক জন মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হাঁটিতে হাঁটিতে পাটাওয়ালা খেরো-বাঁধা পুঁথি পড়িতেছেন। না বসিয়া বিষ্ণুস্মরণ না করিয়া যে শাস্ত্রীয় পুঁথির বাঁধন খুলিতে নাই, ইহা তাঁহার ভ্রমেপেও আসিতেছে না। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, সেইরূপ বেড়াইতে বেড়াইতে পুঁথিপাঠে অধ্যাপক এতই বিভোর যে, স্ত্রী আসিয়া কি বলিল, তাহাও কর্ণে প্রবেশ করিল না! অথচ স্ত্রী যে অন্যায় আবদার করিল, তাহাতে অনুমতি দিলেন। বেড়াইয়া বেড়াইয়া পাঠে কি এতটা চিত্ত-সংযম এতটা তন্মনস্কতা হয়?

সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতৃব্যস্থানীয় ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ মহাশয় এবং সভাপতি মহাশয় আজ এখানে উপস্থিত। কাহারও নিকট এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ লওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র; তাঁহারা সকলেই দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীর অভিনয় করিয়াছেন;—অমৃত বাবুর কথাতেই বলি, তাঁহাদের ন্যায় অভিনেতার গুণেই দীনবন্ধুর নাটক উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়াছে; তাঁহারাও আমার সঙ্গে একবাক্যে বোধ হয় বলিবেন যে, দীনবন্ধু বাবুর নাটকগুলিতে এরূপ বিসদৃশ দৃশ্য-সংযোগ কোথাও নাই। দীনবন্ধু বাবুর নাটকে এই সকল গুণ আছে বলিয়াই, আর তাঁহার নাটকগুলিই বাঙ্গালা নাট্যালয়ের আদি সৃষ্টির সময়ে অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়াই, বাঙ্গালা নাট্যালয়ে দৃশ্য সাজাইবার এবং অভিনয়ের ভাবভঙ্গীর এতটা উৎকর্ষ হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

দীনবন্ধু বাবুর প্রহসনগুলি সর্ব্বরসাধার। অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য কথার অছিলায় হাস্য, ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও বিস্ময়ের উৎপাদন করিতে দীনবন্ধু অদ্বিতীয় ছিলেন। ইহার উদাহরণ সধবার একাদশী ও জামাই-বারিকের প্রত্যেক পৃষ্ঠা হইতেই বোধ হয় উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। সধবার একাদশীর নিমচাঁদের সমালোচনা-স্থলে অনেকে বলেন, নিমে দত্ত একটা অতি কুৎসিত প্রকৃতির লোক। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতটুকু আসিয়াছে, তাহাতে আমি নিমে দত্তের মদ্যপ্রিয়তা ভিন্ন অন্য কোন কুৎসিত কার্য্যে তাহাকে লিপ্ত দেখি নাই। তাহার চরিত্র-বল মদের ঘোরে প্রায় ধ্বস্ত হইয়া থাকিলেও, একবারেই লোপ পায় নাই; তাহা তাহার একটি বাক্যে বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—"গৃহস্থের মেয়ে বার করবার

মতলব করা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোক্‌লো ব্যাটাকে ধরে এনে একদিন খুব করে চাবকে দাও। কাঞ্চনকে না রাখ, মেগের কাছে যাও।” তার পর অটল তাহাকেই পাপকর্ম্মের সারথি করিতে চাহিলে, সে বলিল, “একি ভদ্রলোকে পারে?” অটল তাহাতেও টিট্‌কারী করিল। তখন নিমচাঁদ বলিল, “I dare do all that become a man, who dares do more, is none”—ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন নিমচাঁদ যে কি, তাহা তাহার আত্মগ্লানির স্বগত-বাক্যটা পড়িলেই বুঝা যাইবে। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, “সধবার একাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অসাধারণ অনেক দোষও আছে।”—দীনবন্ধুর কবিত্ব-সমালোচনায় কিন্তু তিনি কোথাও এই দোষ-গুণের বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই। আমি ত বলিয়াছি, দীনবন্ধুর মূলচিত্র গুলির সৌন্দর্য্য-সমালোচনা করিবার অবসর এ প্রবন্ধে নাই।

দীনবন্ধুকে বঙ্কিমবাবু হাস্যরসের কবি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমাজের যে সকল জীবন্ত চিত্রের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ঘটিয়াছিল, সেই সকল জীবন্ত-চিত্রের নকলে তিনি যে চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন, সেইগুলিই নিখুঁত হইয়াছে। তখনকার সমাজে যে সকল চিত্রের আদর্শ ছিল না, যেগুলি তিনি কল্পনার সাহায্যে আঁকিতে গিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছেন, সেগুলিতে তিনি তেমন সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। তাঁহার ললিত-লীলাবতী, বিজয়-কামিনী প্রভৃতি সম্বন্ধে এই কথা। বঙ্কিমবাবুর এ কথার মূলে সত্য আছে বটে, কিন্তু আরও একটু ভাবিবার কথা আছে। বঙ্কিম বাবুর ন্যায় সমালোচক ব্রাহ্ম আদর্শে গঠিত নায়ক-নায়িকার আদর্শের হয় ত অনুমোদন না করিতে পারেন, কিন্তু তখনকার উদীয়মান ব্রাহ্মভাবের আদর্শে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সে ভাব যে তখনকার উন্নতি-শীল ব্রাহ্মদলের নিকট আদৃত হয় নাই, তাহা কে বলিল? ললিত-লীলাবতীর কোর্টশিপটুকু, পূর্ব্বরাগটুকু, বিরহটুকু বাদ দিলে, তাহাদের অন্য দিকের ছবিতে বিশেষ দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দীনবন্ধু বাবুর সবই ভাল বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে তাঁহার ন্যায় লোকচরিত্রের বিশেষজ্ঞ-দর্শন-পটু কবির চিত্রগুলির কতকগুলি যে একবারেই কিছু হয় নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না, ইহাই বক্তব্য। লীলাবতী দীনবন্ধুবাবুর বৃহৎগ্রন্থ, কিন্তু নদেরচাঁদ হেমচাঁদের চরিত্র-বৈচিত্র্য ছাড়া মোটের উপর গ্রন্থখানিতে তেমন কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা বা গল্পের মাধুর্য্য নাই বলিয়া বোধ হয়। কমলেকামিনীর গল্পভাগটি বড় মনোরম। মকরকেতনের চরিত্রে যে বিচিত্রতা আছে, তাহা ঠিক

রাজপুত্রের উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, মকরকেতন বাঙ্গালী জমীদারের আদুরে নন্দদুলাল হইতে পারে; কিন্তু শিখণ্ডি-বাহনের প্রতি তাহার যে প্রীতি ও ভক্তিটুকু বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মূল্যই যথেষ্ট।

জামাইবারিকে অভয়-কামিনীর মিলন অংশটুকু বেশ Romantic, কিন্তু জামাইবারিকের গোড়াটায় Realistic ভাব যতটা বেশী আছে, তাহার সহিত যেন শেষাংশ ভাল খাপে না। সধবার একাদশীতে হাস্যরসের সঙ্গে যেমন একটু ঘৃণা, একটু আক্ষেপ, একটু নৈরাশ্যের ভাব সমস্ত পুস্তকটার মধ্যে অনুস্যূত আছে, জামাইবারিকে তেমনই হাস্যরসের সঙ্গে একটু আন্তরিক বেদনার অনুভূতি অনুস্যূত আছে। সধবার একাদশীতে পাত্রপাত্রী-বিশেষের জন্য দর্শক ও পাঠকের মনে ঘৃণা ও তাহার দুর্দ্দশায় আক্ষেপ হয়; কিন্তু জামাই-বারিকের পাত্রপাত্রীকে দেখিয়া সমগ্র সমাজটার জন্য হৃদয়ে একটা বেদনা অনুভব করিতে হয়, সমাজের দুর্দ্দশায় হায় হায় করিতে হয়। এক পদ্মলোচন ব্যতীত আর কোন পাত্রপাত্রীর প্রতি তেমন সহানুভূতি হয় না।

বিয়েপাগ্‌লা বুড়োয় রতা নাপতে আর নসীরামকে বঙ্কিমবাবু উনপাঁজুরে বরাখুরে বলিয়া গাল দিয়াছেন কেন, বুঝিলাম না। রতার গৌরমণি ও রামমণির সহিত সদ্ব্যবহারের যে নিদর্শন আছে, তাহা কুচরিত্র লোকের স্বভাবের একান্ত বিপরীত বলিয়াই বোধ হয়।

দীনবন্ধু বাবুর মৃত্যুর পর সপ্তাহে তখনকার "ভারত-সংস্কারক" পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তখনকার সমাজে তাঁহার বিয়োগে কিরূপ ভাব হইয়াছিল, তাহা জানা যাইবে। *

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তোফী।

অব্যক্ত অনুকরণ।

আমি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহার সুচিন্তিত ঐতিহাসিক সমালোচনা পড়িয়া সর্ব্বদাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি। তিনি যখন "প্রবাসী"তে "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহার মৃচ্ছ-

---

* প্রবন্ধ-পাঠক এই স্থলে সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক সংগৃহীত "ভারত-সংস্কারক" পত্র হইতে দীনবন্ধু বাবুর বিয়োগবার্ত্তার প্রবন্ধটি পড়িয়াছিলেন।

কটিকের কালনির্ণয়টা ঠিক বলিয়া মনে হয় নাই। সুলেখকদিগের মীমাংসা যাহাতে নিখুঁত হয়, তাহাই প্রার্থনীয়; সেই উদ্দেশ্যেই উহার সমালোচনা করিয়াছিলাম, এবং মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ লিখিয়াছিলাম। অক্ষয় বাবু ঐ নিবন্ধটির অংশবিশেষের সমালোচনা করিয়া ভাদ্রমাসের সাহিত্যে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি লিখিয়াছিলাম, সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে 'অব্যক্ত-অনুকরণ-জাত' শব্দের একটি শ্রেণীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না; এই শ্রেণীর শব্দ মৃচ্ছকটিকে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। অক্ষয় বাবু বলেন যে, পাণিনিতে যখন ঐ শ্রেণীর শব্দ সাধিবার সূত্র আছে, তখন উহাকে নূতন বলা যাইতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বেদেও এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা মূলতঃ "অব্যক্ত-অনুকরণ-জাত।"

বেদে পট্ পট্, খট্ খট্ প্রভৃতি শব্দ নাই, তাহা স্বীকৃত হইবে। ভাষার উৎপত্তির মূলে দৃষ্টি করিলে অনেক শব্দ অনুকৃতি-মূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। হয় ত "শব্দ" কথাটাই ঐরূপে উৎপন্ন। সে এক কথা, আর বিশেষ শ্রেণীর কতকগুলি শব্দের ব্যবহার অন্য কথা।

পাণিনির কাশিকা বৃত্তি প্রাচীন জিনিস নহে। পরবর্ত্তী নূতন সূত্রগুলিও যখন পাণিনির সূত্র-অবলম্বনে বিকশিত করা হইয়াছে, তখন ইহার দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষ কিছু মীমাংসা হয় না। যাহা হউক, ঐ শ্রেণীর শব্দের দৃষ্টান্ত যে মহাভাষ্যেও আছে, তাহা আমিও স্বীকার করিতেছি। মহাভাষ্যে কিন্তু এ কথাও আছে যে, ব্যাকরণ-শুদ্ধ হইলেই সকল শব্দ ব্যবহার্য্য নহে; দেশী শব্দ-গুলি প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য মহাভাষ্যে বিশেষ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

এ কথা না হয় নাই তুলিলাম। ব্যাকরণে যাহাই থাকুক, যখন মহাভারত হইতে কাদম্বরী পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে ভাষার পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খট্ খট্ ঝন্ ঝন্ জাতীয় শব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত না, তখন কোনও গ্রন্থে তাহার বিপরীত পদ্ধতি অব-লম্বিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ঘর্ঘর শব্দ না হয় প্রাচীন কাল হইতেই ছিল, কিন্তু যদি সুবন্ধুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল নির্ঘোষ শব্দই ব্যবহৃত দেখি, তাহা হইলে, সাহিত্যে যে ঐ শব্দের ব্যবহার তৎপর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ৯৯টি স্থানে যাহা সত্য, শ-এর স্থলেও তাহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়।

অক্ষয় বাবু "সুবন্ধু" শব্দের যে অন্য অর্থ হইতে পারে, তাহা লিখিয়াছেন। এ দেশের সকল নামই যখন প্রায় অর্থশূন্য নহে, তখন সে কথাটা স্বীকার করিতে কিছু আপত্তি নাই। মূর্খ শকারের উক্তিতে যতগুলি নাম আছে, সকলগুলিই ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাম। এরূপ স্থলে কেবল সুবন্ধু নামটি তাহার মন-গড়া, এ কথা স্থির করা দুঃসাধ্য। শকার অতি মূর্খ, সে যে একটা নূতন নামের সৃষ্টি করিয়া যোজনা করিয়াছিল, তাহা কিন্তু ঐ উক্তি-টির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় না। তাহা হইলে, কবির পরিহাসটিও ঠিক মনের মত হয় না! একালের কবি, সেকালের পৌরাণিক পুরুষ ইত্যাদি এক সঙ্গে সাজানই যে উদ্দিষ্ট, তাহা অতি সুস্পষ্ট। এরূপ স্থলে সুবন্ধুকে একটি সত্য সুবন্ধু বলিয়া অনুমান করাই অধিকতর সঙ্গত।

যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন দেখি না। আমি এখানে যে সকল কথার উল্লেখ করিলাম, মূল প্রবন্ধেও তাহা লিখিয়াছি। দুই পক্ষের কথাই লিখিত হইয়াছে; যাহা সত্য, একদিন তাহা নিশ্চয়ই নির্দ্ধা-রিত হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আকাঙ্ক্ষা।

তোমার অনন্ত বিশ্বে যে আনন্দ-গান
নিশিদিন উঠিছে ধ্বনিয়া, সে আহ্বান
পশিয়াছে কর্ণে যার কভু একবার,—
সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কূপে সে কি পারে আর
তুচ্ছ সুখ দুঃখ লয়ে মগন রহিতে?
সে চাহে আপন প্রাণ ব্যাপ্ত করি' দিতে
সর্ব্বচরাচর মাঝে; যে কল্যাণ ধারা
নিখিল বিশ্বের সর্ব্বশ্রান্তি-ক্লান্তি-হরা,—
তারি স্রোতে আপনারে ভাসাইতে চায়।
যে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে দূর হয়ে যায়
যত তুচ্ছ গর্ব্ব, যত সংশয় আঁধার,—
তারি এক রশ্মি হ'তে বাসনা তাহার;
ক্ষুদ্র হৃদি-মাঝে তার যে প্রেমকাকলি,
বিশ্বের সঙ্গীতে চাহে মিশাতে সকলি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রেম-পিপাসা।

১

নিদাঘে চাঁপার গন্ধে পূর্ণ চারি ধার,
অশোকের রাঙ্গা বাসে মধুর প্রকৃতি হাসে,
কামিনীর সর্ব্ব অঙ্গে কুসুমের ভার;
স্বচ্ছ শীর্ণ কলেবরে বহে নদী বালু'পরে,
লবঙ্গের কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর-ঝঙ্কার,
মধ্যাহ্ণ গগন'পর চাতকের আর্ত্তস্বর
অপ্সরার গীত সম আসে বার বার;
নিশার আঁধার ঘরে নিশি-গন্ধা ফুটি' ঝরে—
মধু গন্ধ স্মৃতি ভাসে বনভূমে তা'র।
তখনো তোমারি কূলে ছিনু আর সব ভুলে,
তবু কি প্রেমের তৃষা মি'টনি তোমার?

২

বরষার মেঘ-জালে আঁধার গগন,
মুহু মুহু মেঘ গায় দামিনী ঝলকি' যায়,
ঘন ঘন মেঘমন্দ্র—গম্ভীর গর্জ্জন,
মেঘ আসে থরে থরে, সারাদিন ধারা ঝরে,
প্রখরকিরণহীন মধ্যাহ্ন-তপন,
আবিল প্রবাহ জলে তটিনী ছুটিয়া চলে,
আবেগে টুটিতে চাহে তটের বন্ধন,
তীব্র আর্দ্র বায়ু ভরে কেতকী কদম্ব ঝরে,
নীরব বিহগ-গীত, জনতা-গুঞ্জন।
তখনো তোমারে বুকে রেখেছি প্রণয়-সুখে,
তবু কেন এ সন্দেহ ঘু'চ না এখন?

৩

শরতে জ্যোছনালোকে প্লাবিত আকাশ,
কাশের চামররাশি মাঠে মাঠে উঠে হাসি',
সান্ধ্য বায়ু বহি' আনে কুমুদের বাস,
স্বচ্ছ-নীর সরোবরে বিহগেরা খেলা করে,
কমল পবনে ঢালে সুরভি-নিশ্বাস;
হরিৎ ধান্যের শিরে পবন মাতিয়া ফিরে;
সুখদ পরশ আনে মধুর বাতাস,
মৃদু-সমীরণ-ঘায় লঘু মেঘ আসে যায়;
সুনীল গগনে ফুটে তারকার হাস।
তখনো দিয়াছি ঢালি' এ হৃদয় করি' খালি
প্রণয় তোমারে, তবু কেন অবিশ্বাস?

৪

শিশিরে তুষারক্ষেত্রে বহে সমীরণ,
স্বচ্ছ অন্ধকার-মাখা রবি যেন পটে আঁকা;
কুহেলি বসনে ঢাকা ধরার আনন,
শীতল-পরশ বায়, তরু-লতা শিহরায়,
বনভূমে ঝরি' পড়ে পত্র-আবরণ,
শুধু নগ্ন বনভূমে কোমল কিরণ চুমে
গরবে গোলাপ ফুটে অরুণ-বরণ,
বিহগের মধুগান হয়ে যায় অবসান,
সুদীর্ঘ শর্ব্বরী ধরা আঁধারে মগন।
তখনো তোমারে চাহি' দীর্ঘ নিশি গেছে বাহি,
তবু কি মিটেনি সাধ—তৃষিত নয়ন?

৫

হেমন্তে শেফালি-গন্ধে বায়ু গন্ধবাহী,
প্রভাতের দূর্ব্বাদলে নিশার শিশির জ্বলে—
ধরায় উরসে যেন মুকুতার রাশি;
শিশিরের সাড়া পেয়ে আঁখি মেলি' দেখে চেয়ে
শুভ্র কুন্দ-মুখে ভাসে শুভ্র মৃদু হাসি,
ত্যজি' নিজ খেলা-ঘর খাল, বিল, সরোবর
মরাল চলিয়া যায় মানস-নিবাসী,
তুষারের পথ খুঁজি' পবন এসেছে বুঝি,—
হিমের আভাষ আসে তা'র সাথে ভাসি'।
তখনো প্রণয়রাশি তোমারে দিয়াছি হাসি',
তবু কি মিটেনি তৃষা, হে চিরপিপাসী?

৬

বসন্তে বকুল-বাসে সমীর চঞ্চল ;
পাদপে লতার কোলে চিক্কণ পল্লব দোলে,
কুসুমে কুসুমময় ধরার অঞ্চল ;
মুঞ্জরিত সহকার বিতরে সৌরভ তা'র,
গুঞ্জরিয়া ফিরে অলি—সৌরভে পাগল ;
ললিত মধুর রবে বিহগ জাগায় সবে,
বনভূমে জাগি উঠে সুপ্ত পিক-কুল ;
আকুল পলাশ রাগে ধরার মাধুরী জাগে ;
অম্লান কিরণে শোভে নীল নভঃস্থল।
তখনো তোমারে লয়ে ছিনু প্রেমে মত্ত হয়ে,
তবু কেন নাহি মুছে নয়নের জল ?

৭

দিয়াছি প্রাণের প্রেম পদে উপহার ;
হৃদয়ের সুখ, আশা, বুক-ভরা ভালবাসা,
অধরে হাসির রেখা, নয়নের ধার।
আজি এ হৃদয় দীন সুখহীন, আশাহীন,
সৌরভ-গৌরব-হীন জীবন আমার।
জীবনে কি মহা ভুলে প্রণয়ে নয়ন তুলে'
চাহনি, মরণ-কূলে চেও একবার ;
যবে দীর্ঘ দিনশেষে শ্রান্তিহর শান্তি বেশে
মরণ মুছা'বে মোর নয়ন-আসার ;
তখন সকল ভুলে' আমারে লইও তুলে'
ক্ষণতরে, মায়াবিনী, ও বুকে তোমার।

সহযোগী সাহিত্য।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

জাপানী পুরোহিতের তিব্বত-ভ্রমণ।

মিঃ কাওয়াগুচি এক জন জাপানী পুরোহিত। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তিব্বত পরিদর্শন করিয়া স্বদেশীয় ভাষায় তাঁহার যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মিঃ মরিসন নামক কোন লেখক তাহা ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিয়াছেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি বিশেষ কৌতূহলজনক ; ইয়ুরোপের নানা ভাষায় তিব্বত-ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থের অভাব নাই বটে, কিন্তু সেই সকল পুস্তকের উপর আমরা—প্রাচ্যদেশের লোক বিশেষ নির্ভর করিতে পারি না। কারণ, একে ত ইংরাজ বিদেশী সম্বন্ধে যাহা লেখেন, তাহাতে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ থাকে না ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা প্রাচ্য ভূখণ্ডের লোককে বুঝিতে পারেন না ; আমাদের সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক সময়েই ভুল ধারণা করিয়া বসেন, এই জন্যই তাঁহাদের বর্ণনা বিকৃত ও বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাচ্যদেশীয় এক জন বৌদ্ধ পুরোহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানে,—কেবল তীর্থস্থানে নহে,— পীঠস্থানে উপস্থিত হইয়া সহানুভূতির আলোকে যাহা দেখিয়াছেন ও সহৃদয়তার সহিত যাহার বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য স্বতন্ত্র ;—বিশেষতঃ বর্ত্তমানের এই গুরুতর তিব্বত-সঙ্কটের সময়।

মিঃ কাওয়াগুচি বলিতেছেন, "সুপ্রসিদ্ধ শাক্যমন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া আমি একটি সুপ্রশস্ত রাজপথ দেখিতে পাইলাম। সেই পথে লাসা হইতে প্রত্যাবৃত্ত বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা সকলেই লামা নামে পরিচিত। এই সকল লামা আমার

পথিপ্রান্তে।

প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা আমার দ্রব্য সামগ্রীর ভার গ্রহণ করিলেন, এবং আমার চলিতে কষ্ট হইতেছে দেখিয়া আমাকে একটি অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিলেন; বলিলেন, 'সকলেই আমরা এক পথের যাত্রী।'—আমরা অগ্রসর হইলাম।

"চলিতে চলিতে দেখিলাম, দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। যবের ক্ষেত্রই অধিক। কোন কোন জমিতে উত্তমরূপে সার দেওয়া হইয়াছে। তিব্বতের এই অংশে কৃষকেরা জমীর পারিপাট্যবিধানে অধিকতর অভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল। ছাঙ্গ নামক স্থানে প্রতিবৎসরই প্রচুরপরিমাণ যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে যথেষ্ট মাখন পাওয়া যায়; তাহা যেমন উৎকৃষ্ট, সেইরূপ সুলভ।

শাক্যমন্দির।

"শাক্যমন্দিরটি দেখিয়া আমার আশা পূর্ণ হইল। এই মন্দির সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমার যেরূপ ধারণা ছিল, দেখিলাম, মন্দিরটি তাহার অনুরূপ। অতি সুন্দর। ইহা ষাট ফিট উচ্চ। মন্দিরের উপর পাঁচটি চূড়া। এই চূড়া পাঁচটি অগ্নি, জল, কাষ্ঠ, ধাতু ও মৃত্তিকা, এই কয়েকটি সামগ্রীর সূচনা করিতেছে। মন্দিরের বনিয়াদ দুই শত চল্লিশ ফিট দীর্ঘ, দুই শত দশ ফিট প্রশস্ত। ইহার চতুর্দ্দিকে দুই শত চল্লিশ বর্গ গজ স্থান ব্যাপিয়া একটি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর আছে। এই সকল প্রস্তর পাহাড় কাটিয়া বাহির করা। প্রাচীরগাত্র শুভ্র সিমেন্টে পরিমার্জ্জিত। প্রচীর ঠিক সোজা হইয়া উঠে নাই, ক্রমে ভিতরের দিকে হেলিয়া কোণ হইয়া উঠিয়াছে;— অনেকটা জাপানী দুর্গের ধরণে নির্ম্মিত। এই প্রাচীর অত্যন্ত সুদৃঢ়। এই মন্দির সাধারণের নিকট 'তুষারস্তম্ভ' নামে পরিচিত। ইহার শিখরদেশে সৌরকরজাল প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু দূর হইতে একটি নয়নবিমোহন দৃশ্যের সৃষ্টি করে। মন্দির-নির্ম্মাণে কোনপ্রকার আড়ম্বরের পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাহার গাম্ভীর্য্য ও গৌরব দর্শনে হৃদয় মুগ্ধ হয়। ইহা তুষারধবলিত গিরিশৃঙ্গ হইতে বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া ইহার গাম্ভীর্য্য ও গৌরব অব্যাহত আছে। আমি এখানে আসিয়া প্রথমেই পান্থনিবাসের অনুসন্ধান করিলাম। তাহার পর প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান ও বিখ্যাত দেবমূর্ত্তিগুলি দেখিবার জন্য একটি পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

প্রধান লামা। তিব্বতের উপর চীনসম্রাটের প্রভাব।

"এখানে আসিয়া প্রধান লামাকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ কামনা করা আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। এই মন্দিরেই প্রধান লামা অবস্থান করেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মন্দিরমধ্যে পাঁচ শত লোক বাস করিতেছে। মন্দিরের দক্ষিণ অংশে কক্ষের পর কক্ষ। একটি সুবৃহৎ কক্ষে কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুন্দর বেদী। এই বেদীতে প্রধান লামা উপবেশন করেন। প্রধান লামার নাম চম্পাপাসান চাড়ে। লামা মহাশয় আমাকে পরমসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুকাল কথাবার্ত্তার পর পরদিন পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিলেন।—সেখান হইতে বাহির হইয়া আমার পথ-প্রদর্শকের সাহায্যে একটি সুন্দর প্রাসাদসন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। এই প্রাসাদটি একটি কুসুমকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত। ইহাতে লামা মহাশয়েরই একমাত্র অধিকার। শাক্যের লামার নামের পূর্ব্বে ইহারা

'মহা পবিত্র' (বোমা রিম্বোসে) শব্দটি ব্যবহার করে। এই 'মহাপবিত্র' শব্দ একমাত্র চীন দেশের সম্রাট ভিন্ন আর কেহ ব্যবহার করিতে পারেন না। তিব্বতীরা বলিয়া থাকে, চীনের সম্রাট ও শাক্যের লামা উভয়ে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়; তাঁহারা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে পাশাপাশি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিব্বতের পূর্ব্ব অংশের লোকেরা 'মহাপবিত্র' বলিতে চীনের অধীশ্বরকেই বুঝিয়া থাকে। তিব্বতের পশ্চিমাংশে এই শব্দ দ্বারা শাক্যের লামাকে লক্ষ্য করা হয়। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস—শাক্যের লামা ও চীনসম্রাট উভয়ে মিলিয়া পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন। এত বড় মহাসম্ভ্রান্ত লামার দর্শন পাইয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম; কিন্তু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমি আশানুরূপ পরিতৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। তাঁহার পাণ্ডিত্যেরও বিশেষ কোন পরিচয় পাই-লাম না। আমি লামা মহাশয়কে দেবতার ন্যায় পূজা করিলাম না দেখিয়া লামারা আমার উপর কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এ জন্য কোন কোন লামা আমার কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত চাহিয়া-ছিল, কিন্তু আমি যুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।—এই প্রাসাদ বা দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত বিশ ত্রিশটি গৃহে পূর্ব্বে সৈন্যগণ বাস করিত, কিন্তু গত দুই বৎসর হইতে সেই সকল গৃহে কোন সৈন্যই বাস করে না। প্রায় দুই তিন শত নিরাশ্রয় ব্যক্তি সেই সকল গৃহে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। এখানে আশ্রয়লাভের পূর্ব্বে কতকগুলি উত্তরদেশ-বাসী দস্যু কর্ত্তৃক তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হয়। এমন কি, বিশ ত্রিশ জন লোককে দস্যুহস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। এখানকার দস্যুদল দমন করিবার জন্য তিব্বত গবর্মেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত ফলবতী হয় নাই। এ দেশে দস্যুভয় এত অধিক যে, কাহারও সম্পত্তি বা জীবন নিরাপদ নহে।

"এই প্রাসাদটি দেখিতে অন্যান্য লামা-মন্দিরেরই মত। তবে ইহাতে এই বিশেষত্ব দেখা যায় যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লামারা শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন। যুদ্ধকালে এখানে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া তাঁহারা একাধিকবার আত্মরক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার প্রমাণও আছে।

দুর্ভেদ্য দুর্গ।

"এই স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, বিশ মাইল কি তাহারও অধিক স্থান ব্যাপিয়া পার্ব্বত্য ভূমিখণ্ড সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় হিল্লোলিতভাবে অবস্থান করিতেছে। বহু দূরে সৌরকরপ্রদীপ্ত চিরতুষারমুকুটিত গিরিশৃঙ্গ। প্রশস্ত চাকুসামু শাম্বু নদী এখান হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এই তিব্বতী নামটির অর্থ 'লৌহ সেতুর নদী'। পূর্ব্বে হয় ত এই নদী পার হইবার জন্য ইহার বক্ষে কোনও স্থানে লৌহ-নির্ম্মিত সেতু ছিল, কিন্তু এখন সে সেতুর চিহ্ন বিদ্যমান নাই, নামটিই কেবল তাহার স্মৃতি বর্ত্তমান রাখিয়াছে। তবে লামার নিকটে দেখিয়াছি, নদীর উভয় পারে শক্ত খুঁটাতে অত্যন্ত স্থূল লৌহ-তার আবদ্ধ আছে। চাকুসামু নদী বৎসরের অধিকাংশ সময়ই হিমশিলায় আচ্ছন্ন থাকে; তাহা এত কঠিন ও স্থূল যে, পথিকগণ অশ্বতর-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনায়াসেই তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। নদী পার হইলে, চারি মাইলের মধ্যে তৃণ-তরু-হীন

প্রাকৃতিক দৃশ্য।

গিরিপৃষ্ঠ ভিন্ন কোন দৃশ্যবৈচিত্র্যই নেত্রগোচর হয় না। এই পথ অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

"শাক্যের লামার নিকট বিদায় লইয়া আমি চোমাংরি নামক স্থানে যাত্রা করিলাম।

ব্রহ্মপুত্রের তুষারস্রোত।

দক্ষিণ পূর্ব্বে আট মাইল দূরে একটি তুষারধবল পর্ব্বত। রাত্রিকালে আমি সেই গিরিপাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরদিন চলিতে চলিতে অবশেষে একটি প্রশস্তকায় নদীর তটদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই নদীটির নাম ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্রসলিলে রাশীকৃত সুবৃহৎ অগণ্য হিমশিলা ভাসিতে দেখিলাম। এই সকল হিমশিলা নদীর ক্রমনিম্নবাহী স্রোতে দ্রুত ভাসিয়া যাইতেছে; পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে সবেগে নামিয়া আসিতে আসিতে পর্ব্বতের বিভিন্ন অংশে আহত ও প্রতিহত হইয়া ক্রমেই তাহাদের গতিবৃদ্ধি হয়। কোথাও বা দুই চারিটি হিমশিলা বাধিয়া গেলে, তাহাদের পশ্চাতে প্রবহমান হিমশিলাগুলি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া তাহাতে আটকাইয়া যায়; ক্রমে সেগুলি স্তূপীকৃত হইতে থাকে। তাহাদের সুবিশাল শুভ্র দেহে উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া যে সৌন্দর্য্য ও মহনীয় দৃশ্যের উদ্ভব হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। তাহার পর যখন কোন সুবৃহৎ তুষারস্তূপ ভাসিয়া আসিয়া সবেগে অন্য তুষারস্তূপের উপর নিপতিত হয়, তখন নয়নসমক্ষে যে দৃশ্য প্রকটিত হয়, যুগপৎ শত কামান-গর্জ্জনের ন্যায় যে সুগম্ভীর শব্দ শ্রবণপথে প্রবেশ করে, তাহা অত্যন্ত ভীতিজনক। সে ভয় কৌতূহলের সহিত সংমিশ্রিত। এ স্থানে ব্রহ্মপুত্র পার হওয়া অসম্ভব। আমি নদী-তীর ধরিয়া উত্তর পূর্ব্ব মুখে কয়েক মাইল অগ্রসর হইলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম, নদীর ধারে একটি ঘোড়া চরিতেছে। সেই ঘোড়াটির পিঠে চড়িলাম, এবং তাহাকে নদীর মধ্যে নামাইয়া দিলাম। অশ্ব আমাকে পিঠে লইয়া নিরাপদে অপর পারে উঠিল! অনন্তর আমি একটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রামটির নাম 'নিউকু তাসামু'। এই এক দিনে আমি তেইশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম। পথের অবস্থা বিবেচনা করিলে আমার এই পর্য্যটন অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

"শিকাচি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই নগরটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহারই সন্নিকটে সুপ্রসিদ্ধ তেশু লম্বো বা তেশু লামার বাসস্থান; তেশু লামা তিব্বত দেশের

পুরোহিত—নরপাল।

পুরোহিত—নরপাল রূপে প্রতিষ্ঠিত। তেশু লামা লাসার 'মহাপবিত্র' লামা অপেক্ষা নিম্নপদস্থ। ইঁহার কোনও রাজনৈতিক অধিকার না থাকিলেও সাধারণ লোকে ইঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও ভয় করিয়া থাকে। চীনসম্রাট ইঁহাকে লামার পদে অভিষিক্ত করিয়া উপাধিদান করেন। দালাই লামার মৃত্যু হইলে, যত দিন পর্য্যন্ত নূতন দালাই লামা নিযুক্ত না হয়, ততদিন তেশু লামাই দালাই লামার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

"শিকাচি নগরটি তেশু লম্বোর ঠিক সম্মুখে অবস্থিত। এখানকার মঠে সাড়ে তিন হাজার

ছদ্মবেশী ছাত্র।

পুরোহিত বাস করেন। শিকাচিতে গৃহের সংখ্যা চৌত্রিশ শত; জনসংখ্যা ত্রিশ হাজার। আমার মনে হইল, গৃহসংখ্যা ও জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। আমি কিছুদিন এখানে বাস করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি

অধ্যয়ন করিব, এইরূপ সংকল্প করিলাম; এবং উত্তর-পশ্চিম-দেশীয় ছাত্র, এই পরিচয় দিয়া মঠে নাম লিখাইলাম। উত্তর-পশ্চিম দেশীয় ছাত্রগণের মঠে বাস করিবার জন্ত স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি এখানে কয়েক মাস বাস করি। এই সময়ে আমি তিব্বতের শাসননীতি সম্বন্ধে অনেক গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। আমি তিব্বতের রাজস্বসচিব মহাশয়ের পরিবারে মিশিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে আমি কোন দেশের লোক, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সর্ব্বদা আমাকে অস্বচ্ছন্দচিত্তে কালযাপন করিতে হইত।

"লাসা নগরের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সেরার সুবিখ্যাত লামা বিশ্ববিদ্যালয় বিরাজিত। এই বিশ্ববিদ্যালয় তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে অষ্টাদশটি বিদ্যামন্দির আছে। এই সকল বিদ্যামন্দিরে তিন হাজার আট শত ছাত্র লামাত্ব বা পৌরোহিত্য শিক্ষা করে।

সেরার লামা বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয় বিভাগেও বিদ্যামন্দিরের সংখ্যা অষ্টাদশ; এখানে আড়াই হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তৃতীয় বিভাগে ছাত্রসংখ্যা পাঁচ শতের অধিক নহে। কোন কোন বিদ্যামন্দিরে সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, এরূপও দেখা যায়। আবার কোন বিদ্যালয়ে পঞ্চাশটির অধিক ছাত্র নাই। এ দেশের কতকগুলি ধর্ম্মযাজকের নাম 'দপ্তবজু' অর্থাৎ পতিত ধর্ম্মযাজক। ইহাদের আচার ব্যবহার বড়ই উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ। সকল কাজেই তাহারা স্বেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়া থাকে। শিক্ষালাভের জন্ত বিদ্যার্থীকে এখানে অধিক টাকা ব্যয় করিতে হয় না। শিক্ষা ও আহারাদির ব্যয়ের জন্ত প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিমাসে বার টাকা হিসাবে মন্দিরাধ্যক্ষকে প্রদান করিতে হয়। কিন্তু কোনও বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া উপাধিগ্রহণের অভিপ্রায় থাকিলে বিদ্যার্থীকে সেরায় বিশ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে হয়।

যৎকালে "লাসার বিদ্যামন্দিরে অবস্থান করিতেছিলাম, সেই সময়ে বিদ্যালয়ের কোন কোন লোক জানিতে পারিল, আমি জাপানী।—কথাটা প্রকাশিত হইয়া পড়ায়, তৎক্ষণাৎ আমার প্রতি রাজধানী পরিত্যাগের আদেশ প্রদত্ত হইল। সেই সময় জালপো নামক

ছদ্মবেশ-প্রকাশ।

এক জন সার্থবাহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সে আমার নিকট প্রকাশ করে যে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার হিন্দুস্থানে গমনের সঙ্কল্প আছে। সুরাটে ও হিন্দুস্থানের অন্যান্য অংশে আমার বন্ধু বান্ধব বাস করেন; আমি জালপোর দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট পত্র পাঠাইবার অভিপ্রায় করিলাম। এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহাদের নিকট পত্রাদি লিখিবার সুবিধা করিতে না পারায় বড় অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিলাম। আমার পত্রাদি না পাইয়া আত্মীয়বন্ধুগণও যে কত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে আমি বড়ই বিচলিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িতাম।

"শাক্য নামক স্থানে বৌদ্ধ যতিগণের যে সম্মিলনী দেখিয়াছি, তেমন বিস্ময়াবহ দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই। সম্মিলনীক্ষেত্রটি তিন শত ষাট বর্গ গজ। সম্মিলনীর জন্য যে হল আছে, তাহার পরিমাণ তিন শত ষাট বর্গ ফিট। এই ক্ষেত্রের ভিতর একটি প্রস্তরবদ্ধ সুবিস্তীর্ণ পথ আছে। এখানে বৌদ্ধ যতিগণ সময়ে সময়ে সম্মিলিত হইয়া থাকেন। এখানে

যতিদিগের জন্য দুই তিন তলা ঘর আছে। উপরে যে ঘর আছে, তাহার অভ্যন্তরস্থ কক্ষে কেবল প্রধান লামাই প্রবেশ করিতে পারেন, আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। তেশুলামা এখানে অবস্থান করিবার সময় প্রায় বিশ হাজার বৌদ্ধ যতির এখানে সমাগম হইয়াছিল। একবার চীনসম্রাটের নিকট একটি বিশেষ আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সে সময়ে এখানে আড়াই হাজার যতি উপস্থিত ছিলেন। প্রতি প্রত্যূষে পাঁচ ঘটিকার সময় বংশীধ্বনি হইবামাত্র লাসা নগরের সমস্ত যতি সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে এখানে আগমন করেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য চা ও মাখনের আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছিল। আধ ঘণ্টা অন্তর তাঁহারা সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। সমাগত বিংশ সহস্র যতিনামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রকৃত বৌদ্ধ যতির সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত। তাহাদের অধিকাংশই মুসাফির লোক, অনেকেই পতিত ধর্ম্মযাজক। তাহারা কেবল আমোদ করিবার জন্যই সেখানে গিয়া জুটিয়াছিল। প্রকৃত ধর্ম্মান্দোলনে যোগদান করা অপেক্ষা পানাহারে সময়-ক্ষেপণ করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার মনে বড়ই অশ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহাদের কথা শুনিয়া বুঝিলাম, তাহারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে, অন্যের সামগ্রী অপহরণ করে; এমন কি, তাহা অপেক্ষাও গুরুতর অপকর্ম্ম করিতে তাহারা কুণ্ঠিত নহে। সন্ধ্যা হইলে, অনেক বেলায়, তাহারা মাংসাশী পক্ষীর ন্যায় চা ও রুটি গিলিতে লাগিল। তাহার পর তাহারা কাঁজিভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের ধর্ম্মহীন ভাব দেখিয়া আমি মনে বড় আঘাত পাইলাম।

বৌদ্ধ-পুরোহিত-সম্মিলনী।

"এ অঞ্চলে দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল। নিরাপদে পদমাত্রও অগ্রসর হওয়া কঠিন, পথ দস্যুদলে পূর্ণ। আমি একবার এক জন গরুওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলাম যে, তাহার গরুর পিঠে আমার লটবহর দিয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিব। লোকটার সঙ্গে বন্দোবস্ত শেষ হইলে সে আমার জিনিসপত্র গরুর পিঠে তুলিয়া দিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই তিন জন ভয়ঙ্করদর্শন লোক আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা অশ্বারোহণে আসিয়াছিল, তাহাদের পিঠে বন্দুক ঝুলান, দক্ষিণ হস্তে লম্বা বল্লম। তাহা-দিগকে দেখিয়া আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। বুঝিলাম, তাহারা আমার যথা-সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবে। খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও ঔষধাদি কিছুই রাখিয়া যাইবে না। আমার সঙ্গে যে গরুওয়ালা ছিল, সে বলিল, 'সাহায্যের জন্য লোক ডাকি' তাহার পর কোথায় যে সে সরিয়া পড়িল, তাহার সন্ধান পাইলাম না। লোক তিনটা আমাকে কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা হইতে আসিতেছ?'—আমি বলিলাম, 'তীর্থস্থান দেখিয়া ফিরিতেছি।' একটা লোক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'এ দিক দিয়া এক দল সদাগরকে যাইতে দেখিয়াছ?'—আমি বলিলাম, 'না, আমি কাহাকেও এ পথে যাইতে দেখি নাই।' তখন সে আমাকে বলিল, 'তোমাকে দেখিয়া এক জন লামা বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি তুমি লামা হও, তাহা হইলে তুমি সৌভাগ্য গণনা করিতে পার। তুমি বলিয়া দাও, কোন পথে যাইলে সদাগরদের দেখিতে

দস্যুভীতি।

পাইব!'—আমি দেখিলাম, ইহারা একটা বড় রকম দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছে, আমার কাছে যে বিশেষ কিছু মিলিবে না, তাহা আমাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল।—আমি বলিলাম, 'যদি ভাগ্য গণাইতে চাও, তাহা হইলে সে জন্য দর্শনী দিতে হইবে।'—দস্যুর কাছে আমি দর্শনী চাহি শুনিয়া লোক তিনটা হাসিয়াই অস্থির হইল; আমাকে বলিল, 'আচ্ছা, তুমি যাইতে পার, তোমার মঙ্গল হউক।'—আমাকে ছাড়িয়া তাহারা অন্য পথে প্রস্থান করিল।

ঘনীভূত বিপদ।

"কিন্তু বিপদের শেষ হইল না। কিছু দূরে গিয়া দেখি, পাহাড়ের আড়াল হইতে আর দুই জন লোক বাহির হইয়া আমাকে ধরিল; ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার সঙ্গে কি কি জিনিস আছে?' আমি বলিলাম, 'বিশেষ কিছু নাই, আমি শাস্ত্র লইয়া যাইতেছি।' আমার আপাদমস্তক দেখিয়া পুনর্ব্বার এই প্রশ্ন করিল, 'তোমার ঘাড়ে ঐ বোচ্‌কাটার মধ্যে কি?' আমি বলিলাম, 'কিছু খাবার জিনিস, আর কেতাব।' তাহারা আমার কথা বিশ্বাস করিল কি না, জানি না, তবে আমার নিকট হইতে বোচকাটা কাড়িয়া লইল, এবং পুঁথিগুলি রাখিয়া আর যাহা কিছু পাইল, সমস্ত লইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'এগুলা রাখিতে পার, উহাতে আমাদের দরকার নাই।'

"সর্ব্বস্বান্ত হইয়া চারি দিন পর্য্যন্ত আমার কিছু খাওয়া হইল না। অবশেষে আমার আর চলিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না; এত দুর্ব্বল হইলাম যে, কথা কহাও অসম্ভব হইল। চারি দিন পরে এক জন সদয়হৃদয় পথিক আমাকে খানিকটা চাঁচি ও চিনি খাইতে দিল, তাহাই আহার করিয়া আমার প্রাণরক্ষা হইল। দেহে একটু শক্তি পাইয়া আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম। দুই ক্রোশ চলিয়া একটা লোকালয় পাইলাম। এই সময় আমি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, এই দুই ক্রোশ পথ চলিতে আমার চারি ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

"লোকালয়ে উপস্থিত হইয়া কয়েক জন লোকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, তাহারা দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আশ্রয়দান করিল; আমাকে খাইতেও দিল। তাহাদের নিকট আমি ভাত, মাখম, চিনি ও শুষ্ক আঙ্গুর খাইতে পাইলাম, পরিতৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিলাম। অনেক দিন এমন তৃপ্তির সহিত আহার হয় নাই। আমি এখানে কয়েক দিন বাস করিলাম। পথশ্রমে ও নানা অনিয়মে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; তুষারপথে আমার চক্ষু দুটি নষ্টপ্রায় হইয়াছিল; দারুণ হিমে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, এবং আমার চক্ষে কয়েক দিন নিদ্রা ছিল না।

অতিসাবধান জাতি।

"বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আনিয়া তিব্বতে কোন প্রকার পরীক্ষা করিবার যো নাই। তিব্বতীয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও সাবধান জাতি। এ দেশে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপযোগী সামগ্রীর অভাব নাই, কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিবার সম্ভাবনা দেখিলাম না। আমার সঙ্গে একটা ছেলে-খেলার চুম্বক ছিল। পাছে ইহারা কোন রকম সন্দেহ করিয়া বসে ভাবিয়া উহাদের সীমায় আসিবার সময় সেটি পর্য্যন্ত ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল। যদি ইহাদের মনে আমার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মিত, তাহা হইলে আমি কখনও এত দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম না।"

বিপদ-মঙ্গল।

১

হে বিপদ, হে আপদ, হে ঘোর লাঞ্ছনা,
নীলাম্বরী শাড়ীটির আঁধার অঞ্চলে
ঝাঁপি' নিজমুখ, ছিলে চিরাবগুণ্ঠনা,
চিরদিন, চিরদিন—ভাসি' নেত্রজলে
তোমার দৌরাত্ম্যে, পেয়ে তোমার তাড়না,
আশৈশব ভাবিয়াছি, তুমি গো কুরূপা,
পিশাচী, ডাইনী, নরশোণিতলোলুপা,
পরমকুৎসিতা কোন অসুর-অঙ্গনা।
ক্ষমা কর দেবকন্যা! বহুদিন পরে
খুলিয়াছে আজি মম জন্মান্ধ নয়ন
এ যুগান্তে! খুলিয়াছে এ অবগুণ্ঠন
তব শুভে,—এত শোভা নয়নে কি ধরে?
এত রূপ! মরি মরি অনিন্দ্য বদনে
ইন্দু-কান্তি! সান্ধ্য তারা ঝলকে লোচনে!

২

আমি ভাবিতাম, তুমি ঘোরা অমানিশা,
কালোর উপর কালো, আলুয়িতচুলা।
একি ভুল! তুমি যে গো অরুণ-দুকূলা;
লাবণ্য-যৌবনময়ী, হাস্যময়ী উষা!
সাজি' বৃদ্ধা ঠান্‌দিদি, কত নাগরালী
করিয়াছ তুমি আলি, ভাঙ্গিয়াছ হাড়,
বুঝি নাই সে ব্যাভার, রঙ্গিণি, তোমার,
ভ্রূ কুঞ্চিয়া আমি রোষে পাড়িয়াছি গালি।
দুর্ব্বোধ (অবোধ আমি!) তব রঙ্গকেলি!
কোথায় সে ঠান্‌দিদি? দন্তের সে নিশি?
আসিয়াছ আলো করি আহা দশ দিশি!

ষোড়শী-রূপসী-বেশে, পরি' রক্তচেলী!
দিগম্বরা ভয়ঙ্করা কোথায় কালিকা?
রাসলীলাময়ী এ যে অপূর্ব্ব রাধিকা!

৩

নবোঢ়া বালিকা যথা পতিরে নেহারি'
বাসরে, আতঙ্কে ঘোর, উঠে গো শিহরি',
আমিও তোমারে হেরি', অয়ি বরনারি,
চিরদিন কাঁপিয়াছি, অঙ্গ থরথরি'!
এবে ঘুচিয়াছে মম লজ্জা, ভয়, ঘৃণা,
হইয়াছে রসবোধ, জেগেছে কামনা,
ললিত বাহুর ডোরে, লোভনা, শোভনা,
বাঁধি' মোরে, ছাঁদি' মোরে, পূরাও বাসনা!
হে সুন্দরী, বাঁধ মোরে কেশনাগপাশে,
কর কর মোর সাথে পরিহাস কেলি!
আমিও গো শিহরিব উচ্ছ্বাসে, উল্লাসে,
কদম্ব ফুটে গো যথা আনন্দে উদ্বেলি'!
দাও দাও শুষ্ক মূলে প্রেমামৃত ঢালি',
ফুটুক্ এ জীর্ণ শাখে শারদী শেফালী!

৪

অপ্সরী শোভার অফুরন্ত ফুলবীথি
হেরিলাম, দেবকন্যা, তোমার প্রসাদে!
আহা কিবা পবিত্রতা, চল-চল প্রীতি,
উজল আননে তব; আনন্দে, আহ্লাদে,
একি হেরি! সৌন্দর্য্যের নব বৃন্দাবন!
তুলসীর গন্ধে আমোদিত, উল্লসিত,
পুষ্পগন্ধে সুরভিত, কোকিল-কূজিত
সারা উপবন! এ যে দেব-নিকেতন!
হে বিপদ! বেষ্টি' তব পদ-কোকনদ
কাঁদিল ভ্রমরী, এই 'বিপদ-মঙ্গল',
গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'!—এরে দেখাও সম্পদ!

খোল, খোল মন্দিরের কনক-অর্গল!
জ্বালি' এবে সান্ধ্যদীপ, করিয়া আরতি,
দেখাও গো, দেখাও গো দেবের মূরতি!

৫

ধর্ম্ম-মন্দিরের তুমি অপূর্ব্ব পূজারি
হে বিপদ! পার হ'য়ে, গিরি, নদী, দরী,
নির্ব্বাসনা-কমণ্ডলু হস্তে করি', ধরি'
জপমালা, ভস্ম মাখি', এ তনু উঘারি',
কৌপীন সর্ব্বস্ব করি', নব বৃন্দাবনে
আসিয়াছি!—খোল দ্বার হে বিপদ-রাধে!
স্নিগ্ধ কর দুটি চক্ষু প্রেমের অঞ্জনে,
আজি গো হরির রূপ হেরিব অবাধে!
প্রীতি-কালিন্দীর নীরে করিয়াছি স্নান,
ভকতি-শিউলি-ফুল দুটি করে ধরি',
ভাসিতেছি নেত্রনীরে!—মুছাও নয়ান,
দেখা দাও, দেখা দাও হে দয়াল হরি!
বিশ্বপতি, কেন আর এ অগ্নি-পরীক্ষা?
দাও দাও ভিখারীরে পরা-ভক্তি-ভিক্ষা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আশ্বিন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পদ্যে অনূদিত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" ভারতীর সর্ব্বপ্রথমে সন্নিবিষ্ট দেখিতেছি। ইহার পূর্ব্বে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বাঙ্গলায় গদ্যে পদ্যে গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহাদের কাহারও প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হয় নাই; গীতার উৎকৃষ্ট যথাযথ অনুবাদের এখনও অভাব আছে। গীতার শ্লোকগুলি সূত্রবৎ—'স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্'। পূর্ব্বতন অনুবাদকগণের কেহই গীতার সে 'রূপ' রাখিতে পারেন নাই। অনেক সময় আমাদের মনে হয়, গীতার ন্যায় বস্তুর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ হয় ত একরূপ অসম্ভব। আলোচ্য অনুবাদ দেখিয়া

আমাদের সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইতেছে। সত্যেন্দ্র বাবুর অনুবাদ চলনসই বটে, কিন্তু ইহাতেও গীতার সে ঐশ্বর্য্য নাই। স্থলবিশেষে

"পুরুষ যে বিচক্ষণ যতই করুক না যতন"

প্রভৃতি দুর্ব্বল চরণগুলি যতিভঙ্গদোষে পীড়িত ও প্রাণহীন। গীতার ধ্বনি অনুবাদে ধরিয়া রাখিবার বোধ করি উপায় নাই। সুনিপুণ লেখক সত্যেন্দ্র বাবুর এই সাধু চেষ্টাও প্রশংসনীয়। তাঁহার সঙ্কল্প সফল হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সত্যেন্দ্র বাবুর যত্নসঙ্কলিত 'টিপ্পনী' পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "ভারতীয় প্রশ্নচিন্তা" সময়োপযোগী প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে আলোচিত হইল না কেন? লেখকের শেষ উক্তি অবধানযোগ্য,—

"কারিগরেরা হাত, শিক্ষিতেরা মাথা। হাত নিজের মনে চলিয়াছে, মাথা উঁচু হইতে দেখিতেছে। মাথা হাতকে নীচু মনে করে; হাত মাথার কথায় ভুলিয়া নিজেকে নীচু মনে করিতে শিখিতেছে। মাথার ধনবল আছে, নিজের কল্যাণের নিমিত্ত স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতেছে। হাতের ধনবল নাই, বুদ্ধি বিবেচনা নাই; নিজের কল্যাণচিন্তা পরের হাতে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে। যে বড়, যে জ্ঞানী, তাহার নামা উচিত নয় কি?

"প্রাচীন সমাজ এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে গ্রাম-সম্পর্ক নাই. কামার দাদা, কুমর জ্যেঠা—শিক্ষিতের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের তারতম্য ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু শিক্ষিত কি নিজের পয়সায় শিক্ষিত হইয়াছেন? * * * যাহারা শিক্ষিতের শিক্ষার নিমিত্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে, তাহারা শিক্ষিতের নিকট হেয় হয়। ইহা অপেক্ষা দুর্গতি হইতে পারে কি?"

স্বর্গীয় মহাপুরুষ বিবেকানন্দ স্বামীও বারংবার ইহাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুমূর্ষু সমাজের বধির কর্ণে তাঁহার 'উদ্বোধন'-বাণী কখনও প্রবেশ করিবে কি" "নন্দোৎসব" ক্ষুদ্র মনোজ্ঞ উৎসব-চিত্র। চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন তুলি ধরিয়াছেন, এই সবে রঙ্গ ফলাইতে শিখিতেছেন; সে হিসাবে পটখানি মন্দ হয় নাই। কিন্তু বর্ণবিন্যাসে আর একটু সাবধান হইলে ক্ষতি কি? ভাবের অভিব্যক্তিই সকল চিত্রের মূল ও একমাত্র লক্ষ্য বটে, কিন্তু শব্দই যে শব্দ-চিত্রের উপাদান,—তাহাও ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লেখক শব্দ-চয়নে আর একটু অবহিত হইলে রচনাটি আরও উৎকর্ষলাভ করিত। "অন্তর্দ্ধান হইলেন" প্রভৃতি অত্যন্ত কর্ণকটু, আশা করি, লেখকও তাহা অস্বীকার করিবেন না। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রাজসেবায় হিন্দু ও মুসলমান" প্রবন্ধে ফিরিঙ্গী বাঙ্গলায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"সহজলভ্য চাকরী মুসলমান সমাজের উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং অনুগ্রহলব্ধ কৃতকার্য্যতা দ্বারা আত্মচেষ্টাজনিত কৃতকার্য্যতার সম্মানও মুসলমানগণ পাইতেছেন না।" এ ক্ষেত্রেও যে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের মূল্য অধিক, বিশেষতঃ ফিরিঙ্গীবংশের কল্যাণে মুসলমান সমাজের উন্নতির এই ক্ষীণতম 'অন্তরায়'টুকুও অচিরে লুপ্ত হইবে, ভবিষ্যদ্বক্তা না হইয়াও তাহা অনায়াসে বলা যায়। সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর "বিহঙ্গ ও

ব্যাধ" শীর্ষক কবিতাটি পুরাতন কল্পনার নূতন ছবি। একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়িতেছে,—

"বাসঃ কাঞ্চনপিঞ্জরে নৃপকরাম্ভোজৈস্তনুমার্জ্জনম্
ভক্ষ্যং স্বাদুরসালদাড়িমফলং পেয়ং সুধাভং পয়ঃ।
পাঠঃ সংসদি রামনাম সততং ধীরস্য কীরস্য মে
হা হা হন্ত তথাপি জন্মবিটপিক্রোড়ে মনো ধাবতি॥"

বাগচী মহাশয়ের ভরত পক্ষীটি এই বিহঙ্গেরই বংশধর। উভয়ের মনে একই ভাবের তরঙ্গ বহিতেছে। সে যাহা হউক, নবীন কবির প্রথম কাকলিটুকু মন্দ নয়,—

"কণ্ঠভরা কাকলি ছিল, কাকলি সুধামাখা,
কনক জিনি চঞ্চু ছিল, রজত জিনি পাখা।"

কিন্তু, তাহার পর

"কিরাত, ওরে কিরাত, তোর করিয়াছিনু কি?
কি লাগি মোরে নিঠুর ডোরে করিলি বন্দী!"

একেবারে অসহ্য! "কি" ও "বন্দী"র মিল দেখিয়া রবি-রাহুর সেই "যা পদ্য! যা মিলে যা!" মনে পড়ে! যতিব প্রতিও কবি নিতান্তই নিদারুণ।

"হায় রে অকৃতজ্ঞ পাখি, ইহারে কহ দুখ?"

এই চরণটিকে "হায় রে অকৃ—তজ্ঞ পাখি" এইরূপ ভাগ করিয়া না পড়িলে চলে না। "অকৃতজ্ঞ" বলিযাই কি শব্দটিকে দ্বিধা বিদীর্ণ করিব? আমরা কিন্তু কবিদের খাতিরেও অতটা নির্ম্মম হইতে প্রস্তুত নহি। ব্যাধ বিহঙ্গকে বলিতেছে,—

"স্বর্ণময় পিঞ্জরেতে আরামে কর বাস।"

সুতরাং আমরা মনে করিয়াছিলাম, ইনি সামান্য ব্যাধ নন; বোধ করি, ময়মনসিংহের মহারাজের মত কোন শিকারী ব্যাধ-রথ্‌শ্চাইল্ড। পরক্ষণেই মনে পড়িল, বাগ্‌চী মহাশয়ের ব্যাধ প্রথমেই কিন্তু বলিয়াছে,—

"ব্যবসা মোর পক্ষিধরা—অর্থলাভ তরে।"

তখন বুঝিলাম, কবি কৌশল করিয়া ব্যাধকে একটু তাড়ি খাইতে দিয়াছেন,—তাই সে স্বর্ণপিঞ্জরের স্বপ্ন দেখিতেছে! এই কয় পংক্তির মধ্যে কি চমৎকার অসামঞ্জস্য! আসল কথা, এমন অসংস্কৃত অবস্থায় কোনও রচনাই, বিশেষতঃ কবিতা, ছাপিতে নাই। একটা চলিত কথা আছে,—'শতং বদ, মা লিখ'। এখন সেটা একটু বদলাইয়া 'শতং লিখ, মা ছাপ' করিলে অন্ততঃ সাহিত্যের অনেক উপকার দর্শে। বঙ্কিম বাবু অধুনালুপ্ত "প্রচারে" নূতন লেখকগণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, নূতনব্রতী লেখকগণকে একবার তাহা পড়িয়া দেখিতে বলি। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বহুদোষাশ্রিত হইলেও কবিতাটির ঝঙ্কার মনোরম, রচনাভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের শিষ্যসুলভ অনুকরণে কলুষিত হইলেও আশাপ্রদ; তাই আমরা লেখককে প্রকৃত পথের নির্দ্দেশ করিলাম। "লঙ্কেশ্বর রাবণ" কৌতুকাবহ প্রবন্ধ বটে! লেখক শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় রাবণ-চরিত্রের সমর্থন ও রাক্ষস-সভ্যতার

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মল্লটভট্ট লিখিয়া গিয়াছিলেন,—"রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং, ন রাবণাদিবৎ।" আমরাও শৈশবে পণ্ডিতমহাশয়ের ভয়ে তাহা মুখস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন চুণকামকরা রাবণকে দেখিয়া পুরাতন শিক্ষাটুকু ভুলিবার ইচ্ছা হইতেছে। Hero-worshipএর স্রোত কত দূর গড়ায়, দেখা যাক। শ্রীযুক্ত হীরালাল সেনের রচিত "গৃহলক্ষ্মী" নামক কবিতাটির আদ্যোপান্তে শব্দবৈভবের তুমুল তরঙ্গ। যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহারই একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"দাঁড়াও প্রদীপ হাতে চুপে চুপে আঁধার গুহায়,
জটিল রহস্য সব লুটে পড়ে চরণছায়ায়
ভক্ত ভৃত্য প্রায়।"

এই 'আঁধার গুহা'টি কি, জটিল রহস্য পদার্থটি কি, বা কিসের, এবং সে কাহার চরণছায়ায় কেন লুটিয়া পড়ে, সে সমস্যার পূরণ কে করিবে? ইহার উপর আবার দার্শনিকতা আছে,—

"চিন্ময়তা বিরাজিত জড়ময় নশ্বর ভুবনে,"

'চিন্ময়তা, 'জড়ময়' প্রভৃতির অর্থও কবি সেই 'আঁধার গুহায়' লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কাব্যকাননের কোনও অপরূপ বৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে হীরালাল বাবু একটি চমৎকার নূতন শব্দপুষ্প চয়ন করিয়াছেন,—'হরিণাখি।' পদার্থটি কি, বুঝিতে পারিয়াছেন? হরিণ+আঁখি,=অর্থাৎ কুরঙ্গনয়না। চন্দ্রবিন্দুটি বোধ করি চীন দেশে অনুনাসিকের প্রবল দলে মিশিতে গিয়াছে। নরেন্দ্রচাঁদ লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আই মা হরিণের শিং! তুমি কি পড়?" 'হরিণাখি' পাইলে হতভাগা হরিণের শিং ধরিয়া টানাটানি করিত না,—ইহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রত্নাসুন্দরী" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। ফরাসী ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত মেঠাঁ "ভারতের পল্লীগ্রাম ও বিলাতে মাল রপ্তানি" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সার অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের উপকৃত করিয়াছেন। এ দেশের সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা সুপ্ত ও অসমর্থ না হইলে বহু পূর্ব্বে আমরা এই সকল রচনার পরিচয় লাভ করিতাম, এবং এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইতাম। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামীর "পৃথ্বিরাজ" একখানি 'নাটক',—ক্রমশঃপ্রকাশ্য। গৈরিশ ছন্দে রচিত। অঙ্কুর দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি। দেখা যাক,—'সব ভালো যার শেষ ভালো।' শ্রীমতী সরলা দেবীর "বাঙ্গালী-পাড়ায়" কতকটা চলিত বাঙ্গলায়ও কতকটা আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন দুরবগাহ দেব ভাষায় রচিত। শঙ্খ-দুন্দুভির কি গুরু-গম্ভীর ধ্বনি! বিষয়টি ভারত-জাগানো। Sublimeকে Ridiculous করিলে যদি ভারত জাগে ত মন্দ কি? কবি গাহিয়াছিলেন,—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।"

হতভাগ্য ভারতের ঘুম না ভাঙ্গুক,—আর এই ত সবে বাছার হাজার বছরের কাঁচা ঘুম,—এত কাল পরে এক জন 'ভারতললনা' যে জাগিয়াছেন, ইহাই আমরা প্রাচীর ললাটে উষার সিন্দুরবিন্দুর ন্যায় উদয়ের আভাসস্বরূপ মনে করি। কিন্তু এই সুরাশার ফলে একালের ভারতীখানি যদি মাসিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবে না।

ভুল।

১

বিধবা ভগ্নী সারদাসুন্দরী ও তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা সুষমাকে বাটীতে রাখিয়া পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মিশর-দেশ-পরিভ্রমণে গিয়াছিলাম। তখন সুদানে লড়াই বাধিয়াছিল। পিতৃমাতৃবিয়োগের পর যাহা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি পাইয়াছিলাম, তাহা বিক্রয় করিয়া প্রায় তিন হাজার টাকা হইয়াছিল। সেই টাকার মধ্যে কিছু পথের সম্বল করিয়াছিলাম, এবং অধিকাংশ দ্বারা বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া বণিকের বেশে মিশরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম।

স্থাবর সম্পত্তিও অধিক ছিল না। যাহা ছিল, তাহার বিলি বন্দোবস্ত করিয়া, বিধবা ভগ্নীর ভরণপোষণ ও সুষমার লেখাপড়া শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলাম। মিশরযাত্রার দুই বৎসর পরেই নয় বৎসরের সুষমা অতি সরল সুন্দর ভাষায় আমাকে পত্র লিখিত। আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সুষমার জন্য একটা মিশরদেশীয় উষ্ট্র আনিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, এবং সুষমাকে সুন্দর বর সংগ্রহ করিয়া দিব, তাহাও অনেকটা ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলাম।

ঈশ্বরের কৃপায় আমার বাণিজ্যের ফলাফল অতি শুভ হইয়া পড়িয়াছিল। দুই সহস্র টাকার মূলধন হইতে লক্ষাধিক টাকা লাভ হইয়াছিল, এবং তাহার উপর সুষমার উষ্ট্র ও আমার একটি আরবীয় ঘোটক লইয়া একদা অমাবস্যা রজনীতে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। ইহা প্রায় দশ দিন পূর্ব্বে।

টাকা কড়ি কিছু ব্যাঙ্কে রাখিতে, কিছু অন্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে কলিকাতায় প্রায় এক মাস কাটিয়া গিয়াছিল। কলিকাতায় কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বৈমাত্র ভ্রাতা বিনোদ নামক একটি যুবকের সহিত আমার দেখা হয়। বিনোদ দেখিতে সুন্দর, অর্থাভাবে বি. এ. পাশ করিতে পারে নাই, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, এবং শান্ত-মধুর-স্বভাব।

কেন জানি না, একবার মনে হইয়াছিল, বিনোদের সহিত সুষমার বিবাহ দিলে মন্দ হয় না। বিনোদ আমার সহিত আসিয়াছিল। আমার অর্থের পরিমাণ বিনোদ কিছু কিছু জানিয়াছিল। আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে অন্য কেহ জানে নাই। আমি বিনোদকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, ভিতরের কথা তাহার দ্বারা কখনই প্রচারিত হইবে না। মানবচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া আমার

কর্ম্মক্ষেত্রে বিপুল জ্ঞান হইয়াছিল, এবং সময় থাকিলে ধর্ম্ম প্রভৃতিরও চর্চ্চা করিতাম ; কিন্তু অদৃষ্টক্রমে তাহা মিশর দেশেও হইয়া উঠে নাই।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া সকলই নূতন বোধ হইতে লাগিল। সাহারার মরুভূমির স্মৃতি, বঙ্গের শস্যশ্যামল ক্ষেত্র ও পল্লীগ্রামের পচা ডোবা ও পুষ্করিণী দৃশ্যপটে উদিত হইয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার ভাবের সৃষ্টি করিল। কিন্তু তাহারও মধ্যে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ শীতলতা ছিল। পুরাতন বস্তু জীর্ণ হইয়া গেলেও প্রকৃতি তাহা বিচক্ষণা গৃহিণীর মত রাখিয়া দেন। পুরাতন সাধ, পুরাতন শৈশবের অর্থশূন্য লক্ষ্যহীন খেলাধূলা, বৃদ্ধ প্রপিতামহীর স্বহস্তনির্ম্মিত জীর্ণ কন্থার ন্যায়, জীবনের জীবন্তসংগ্রাম হইতে অবসর লইয়া গৃহের শান্তিময় অন্ধকারে আসিলে, আবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে ভাল লাগে।

যদিও আমার বয়স অধিক হয় নাই, তথাচ ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মত আমার মানসপটে পুরাতন স্মৃতিগুলি অঙ্কিত ছিল। অনুধাবন করিয়া দেখিলাম যে, যাহা নূতন বোধ হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিক প্রাকৃতিক কিংবা সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন নহে। বোধ হয় সেটা মনের ভুল।

প্রাতঃকালে কতকগুলি প্রবীণ প্রজার সমক্ষে অঙ্গভঙ্গি পূর্ব্বক সুদানে লর্ড গর্ডনের বীরত্ব, মাধি সৈন্যের সমরকৌশল ও নাইল নদীর দৃশ্য প্রভৃতির বর্ণনা করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে গ্রামের তহশীলকারী পঞ্চায়েত নফর মণ্ডল কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া প্রবীণতাসহকারে অথচ নম্রতার সহিত নিবেদন করিল যে, "কর্ত্তা"র (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) সংসারধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ একটি গৃহলক্ষ্মী ঘরে আনিয়া বংশের মুখ উজ্জল করা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

অনেকে উৎফুল্ল হইয়া এবং অনেকে গম্ভীরভাবে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে বাধ্য হইল। এমন কি, দীনু ঘোষ পূর্ব্বপ্রথানুসারে জমীদারের বিবাহকালীন "পঞ্চা" দিতে স্বীকৃত হইল।

আমি স্থিরভাবে সকলকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, ব্রাহ্মণসন্তানের বিবাহ সম্বন্ধে বেগ পাইতে হয় না। আপাততঃ আমার ইচ্ছা যে, সুষমার বিবাহ দিয়া একবার তীর্থভ্রমণে যাইব। প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের ধর্ম্মপথে ও তীর্থপথে কিয়ৎকাল বিচরণ করিয়া চরিত্রসংগঠন নিতান্ত আবশ্যক। সমাজে ক্রমশঃ যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফল কিছু দিন পরে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। জগতে ভাল মন্দ না বুঝিয়া এবং সৎপাত্রীর অনুসন্ধান না করিয়া আমার বিবাহ করা কোনমতেই অভিপ্রেত ছিল না। যে আপনাকে বুঝিতে পারে নাই, এবং যে ত্রিশ

বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বাণিজ্যক্ষেত্রে ও যুদ্ধক্ষেত্রে কালযাপন করিয়াছে, তাহার পক্ষে হঠাৎ বিবাহ করা অত্যন্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ প্রজাপীড়ন না করিয়া আত্মসংস্থানের উপর নির্ভর করাই ক্ষুদ্র জমীদারগণের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

সকলকেই মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিলাম। সুষমা উষ্ট্র দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। আমি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে, মিশর দেশের বালিকাগণ উষ্ট্রে চড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু সুষমার কেবল উষ্ট্র দেখিবার সাধ ছিল, চড়িবার সাধ হয় নাই। কাজেই উষ্ট্র বাটীর উত্তর দিকের খর্জ্জুর বৃক্ষের তলায় মার্চ্চেণ্ট হউসের মুচ্ছুদ্দির মত পড়িয়া রহিল।

বেলা তিনটার সময় পিতার ক্ষুদ্র জমীদারীটুকু প্রদক্ষিণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আরবীয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম।

২

আমার জমীদারীর অধিক অংশই পার্ব্বতীয় ভূমি। মেদিনীপুর জেলায় স্থিত। আমার বসতবাটীর পুরাতন ভগ্নাংশ একটা ক্ষুদ্র নদীর তটে স্তূপাকার হইয়াছিল। বাল্যকালে সেইখানে বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতাম, এবং সহপাঠিগণের সহিত পরদিনের খেলাধূলার তালিকা স্থির করিতাম।

প্রখর কার্ত্তিক মাসের রৌদ্রে পড়িয়া গিয়া শিশিরস্নাত সন্ধ্যাবায়ু উত্তপ্ত মস্তক শীতল করিতেছিল। এমন সময় স্মৃতি পুরাতন ইতিহাসের পাতাগুলি একে একে উদ্ঘাটন করিয়া মানস-পটের সম্মুখে ধরিতে লাগিল। আমার স্নেহময়ী রোগ-ক্লিষ্টা জননী দশ বৎসর পূর্ব্বে সেই ভগ্নস্তূপের একপার্শ্বে একটা তুলসীগাছ রোপণ করিয়াছিলেন। সেই তুলসীগাছের নিকটেই একটা পুরাতন কূপ ছিল। কূপের কিয়দ্দূরে কতকগুলি দরিদ্র প্রজা ও দুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে গৃহগুলির দিকে কোন প্রাণীর সঞ্চার দেখিলাম না। দূর হইতে বোধ হইল, যেন তুলসীগাছটা এখনও আছে।

অশ্বের বল্গা ফিরাইলাম। বোধ হয়, অশ্ব কোন কল্পিত ছায়া দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। কি হইল, বুঝিতে পারিলাম না। চকিতের ন্যায় আমি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞাশূন্য হইলাম।

উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া জানিতাম যে, নায়কগণের অদৃষ্ট-রাশিচক্রে এই সুবর্ণ মুহূর্ত্তে একটা নায়িকার আবির্ভাব হয়। বাস্তবিক তাহাই হইল। যাহা নাইল নদীর তীরে ঘটে নাই, সুদানের যুদ্ধক্ষেত্রে, লোহিতসাগরের বক্ষে

ধাবমান অর্ণবপোতের ফাষ্টক্লাস-ক্যাবিনে ঘটে নাই, সেই আদম-হিবার সময়-ব্যাপী অদৃষ্টসূত্র পল্লীগ্রামের একটা সাদাসিধা ভগ্নস্তূপের গোড়ায় বাধিয়া গেল। আমার দক্ষিণ হস্ত তখন অসাড়, দক্ষিণ পদ প্রায় ভগ্ন, চক্ষুর সম্মুখে শত শত খদ্যোতিকার ন্যায় প্রাণাগ্নি জ্বলিতেছিল, এবং নিভিতেছিল।

মুখে জল পাইলাম। খাইলাম। শরীরে বল পাইলাম। উঠিলাম। যে জল দিয়াছিল, এবং কোমল বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া আমাকে ধীরে ধীরে তুলিয়াছিল, সে আমার অপেক্ষা স্থূলকায়া রমণী। সুন্দরী কি কুৎসিতা, তাহা অন্ধকারে বুঝিতে পারিলাম না। বালিকা কি প্রৌঢ়া, তাহাও জানিলাম না।

প্রাণ লইয়া টানাটানি হইলে ইন্দ্রিয়গণ দৃশ্যপটের অন্তরালে লুক্কায়িত হয়।

আমি কম্পিতস্বরে জানাইলাম যে, আমি সেই গ্রামের জমীদার। অদূরে আমার বাটী। যদি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তদীয় বামবাহুতে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় প্রদান করিয়া বাটী পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কৃতজ্ঞ হইব।

রমণী বলিল, "আমি বাবাকে ডাকিয়া আনি।"

আমি বলিলাম, "যাও।"

কিয়ৎক্ষণ পরে একটি ক্ষুদ্রবর্ত্তিকা হস্তে রমণী ফিরিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার পিতা কোথায়?"

বর্ত্তিকার আলোকসাহায্যে দেখিলাম, একটি হৃষ্টপুষ্টা পরমসুন্দরী বালিকা। বিবাহের বয়স হইয়া গিয়াছে।

বালিকা নতবদনে উত্তর দিল, "পিতা শয্যাগত।"

আমি। তোমার স্বামী?

বালিকা। আমার বিবাহ হয় নাই।

আমি। তুমি সুষমাকে জান?

বালিকা। সুষমা আমার সই।

আমি। আমি সুষমার মামা। যদি লজ্জা না কর, তবে আমাকে ধরিয়া লইয়া চল, নচেৎ আমাদের বাটী হইতে লোক ডাকিয়া আন।

তখন শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদ উঠিতেছিল। বর্ত্তিকাহস্তে বালিকা আমাকে পুনরায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিল।

বাটীর নিকট আসিয়া আমি বলিলাম, "তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। আমি বড় ভারী।"

বালিকা। আপনি খুব হাল্‌কা; তাহা না হইলে আমি স্বীকার করিতাম না।

আমি। তবে তুমি হাঁপাইতেছ কেন?

বালিকার কোমল স্বরে ও মৃণালবৎ বাহুসংস্পর্শে প্রাণ আহতস্থানগুলি ছাড়িয়া একটু বিশ্রাম লইতেছিল। বালিকার সরল উত্তর আমার মিশর দেশের মরুভূমির ও সুদানের যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতি অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি মনে করিলাম, এরূপ সাহায্য পাইলে লর্ড গর্ডন সুদানে মরিতেন না।

আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "সুষী, এ দিকে আয়!"

৩

সুষমা আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সুষমা বলিল, "সই! তুমি কোথা থেকে?"

তের বৎসরের মেয়ের মুখে "সই" প্রভৃতি আমার ভাল লাগিত না।

আমি কাতর স্বরে বলিলাম "সুষী, তোর আক্কেল কি! আমি হস্তপদভগ্ন মৃতপ্রায়, তা দেখ্‌লিনে?" সুষমা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুষমা অন্ধকারে অতটা বুঝিতে পারে নাই। আমি হতাশ হইয়া ভাবিলাম, এহেন বোকা মেয়ের বিবাহ দেওয়া বৃথা!

আমি আপাততঃ প্রাণদাত্রী বালিকাকে বলিলাম, "তুমি চলিয়া যাও।" সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় চলিয়া গেল। আমি সুষমাকে বলিলাম, "তোর মাকে ডাক্, আর বিনোদকে ডাক—"

সুষমা দৌড়িয়া বাড়ীসুদ্ধ লোককে ডাকিয়া আনিল। আমি সকলকে স্বীয় জীবনের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিয়া বিদায় করিলাম, এবং আমার মিশর দেশের প্রিয় খানসামা ইস্‌মায়েলের স্কন্ধে ভর দিয়া দ্বিতল গৃহে উঠিলাম। সিঁড়ির উপর উঠিবার সময় ইস্‌মায়েলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুই অত হাঁপাচ্ছিস কেন?"

ইসমায়েল। প্রভুর ওজন বীর পুরুষের ন্যায় (ইহা ফার্সি ভাষায়)।

আমি। কিন্তু কেহ কেহ বলে, আমি খুব হাল্‌কা।

ইসমায়েল। সেটা তাহাদিগের ভুল। সুদান সমরের সময় আপনি দুই মণ তের সের ছিলেন। তখন আপনার শরীর ক্ষীণ ছিল, এখন অপেক্ষা বোধ হয় স্থূল।

আমি মনে করিলাম, হয় ত প্রাণদাত্রী মিথ্যা কথা কহিয়াছিল, কিংবা তাহার অনুমান (আমার শরীরের ভার সম্বন্ধে) ভুল হইয়াছিল। কিন্তু এবম্প্রকার ভুল কেবল অতিশয় বলিষ্ঠারই হওয়া সম্ভব।

গৃহে প্রবেশানন্তর মিশরদেশীয় কৌচে শরীর লম্বমান করিলাম। এবং সুষমাকে ডাকিলাম।

আমি। সুষী! ও মেয়েটির নাম কি?

সুষমা। মামা, আপনার বড় লেগেছে?

আমি। (হাস্য করিয়া) এটা বুঝি পূর্ব্বশিক্ষার ফল? আমার কথার উত্তর দে না।

সুষমা। কি?

আমি। তোর সইয়ের নাম কি?

সুষমা বলিল, সইয়ের নাম "লতিকা।" লতিকা আমাদিগের কুল-পুরোহিত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের কন্যা।

আমি। উহার বিবাহ হয় নাই কেন?

সুষমা। ওরা বড় গরীব। ওর বাবা বড় মদ খায়। যখন তুমি ছিলে না, তখন সই আমাদের বাড়ী কাঁদিয়া কাঁদিয়া আসিত, মার নিকট শুইয়া থাকিত।

আমি। আর তোরা তাকে রাত্রিকালে কি খাইতে দিতিস্?

সুষমা। সই তেমন মেয়ে নয়। সে আমাকে বরাবর লেখাপড়া শিখিয়েছে, কিন্তু কখনও আমাদের বাড়ীর এক মুঠো অন্ন খায় নাই।

আমি। তুই বড় বোকা। আমার বলিবার উদ্দেশ্য যে, তোর সইয়ের গায়ে খুব বল আছে। সেরূপ বল কেবল পাঞ্জাবী এবং শিখ মেয়েদের হয়। এই মনে কর, আমার বল প্রসিদ্ধ। আমি অনায়াসে একটা সৈনিককে চূর্ণ করিয়া দিতে পারি। এত বড় সুদান যুদ্ধ আমার চখের উপর দিয়া গেল। কিন্তু আমাকে ঐ মেয়েটি অবলীলাক্রমে বহিয়া আনিল!

সুষমা বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল।

আমি পুনরায় বলিলাম, "তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম ও 'কি' খায়?"

সুষমা। দীন দুঃখীর গায়ে এত জোর হয়, তারা কি আমাদের মত খাইতে পায়? ভগবান্ তাদের গায়ে জোর দেন।

আমি সুষমার উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তার কচি মুখ কোলে টানিয়া লইলাম।

আমি। তোকে ভগবানের কথা কে শিখাইল?

সুষমা। সই। সই লতিকা ঠাকুমার তুলসী-তলায় প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ভগবানকে ডাকে

আমি। কেন?

সুষমা। তার বাপ মদ খায়, তাই নিবারণ করিবার জন্য। সই বলিয়াছে, ভগবান হিমালয়ে থাকেন, পৌষ মাঘ মাস ভিন্ন বাহির হন না। এই আস্‌ছে পৌষে সইয়ের পিতার মতিগতি ভাল হবে।

আমি। কৈলাসে থাকেন বুঝি?

সুষমা। হাঁ।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তুই তোর মাকে ডাকিয়া দে"। ভগ্নী সারদাসুন্দরী আসিলে পর আমি বলিলাম, "সারি, তোর মেয়ে অতি বোকা, ওকে তুই একখান উপন্যাস পড়্‌তে দিস্‌নি কেন? ওর বিবাহের বয়স হইয়াছে, অথচ বিশ্বাস যে, ভগবান্ পৌষ মাসের পূর্ব্বে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন—"

সারদা। ওটা লতিকা শিখিয়েছে। কেমন সুন্দর মেয়ে! যেমন লেখা-পড়া জানে, তেমনিই শান্ত। ওর বাপ ওকে সংস্কৃত পড়িয়েছিল।

সাতকড়ি ডাক্তার শীঘ্রই আসিয়া আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। নিশীথে স্বপ্ন দেখিলাম সুদান সমরক্ষেত্রে আহত অবস্থায় পড়িয়া আছি, এবং আমার উষ্ট্র শিয়রে রোমন্থন করিতেছে। কি মধুর স্মৃতি!

৪

ভগ্নীর অসাধারণ শুশ্রূষায় ও সাতকড়ি ডাক্তারের ঔষধে আহত হস্তপদ প্রকৃতিস্থ হইতে আরম্ভ হইল। সুষমা সকালে সন্ধ্যায় নিকটে বসিয়া একমনে সুদান যুদ্ধের ইতিহাস শুনিত। সুষমাকে আর বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠাইতাম না। আমি বলিলাম, "সুষী! তোর খুব বিদ্যা হয়েছে, এখন একটু সংসারের কল কৌশল শিখিতে চেষ্টা কর্।"

সুষী। সংসারের কল কৌশল কি?

আমি। রান্না বান্না, কাপড় শেলাই প্রভৃতি।

সুষী। আমি কিছু কিছু শিখেছি।

আমি। তাহা অপেক্ষা দরকারী শিক্ষা আছে। তোর বিয়ে হ'লে শ্বশুর-বাড়ী গিয়া যাহা যাহা করিতে হইবে, তার কিছু জানিস্?

সুষী। মামা, আমার বিয়ে দিও না, বিয়ে হ'লে মা'র খাইতে খাইতে প্রাণ যাইবে। সইয়ের বাবা আবার তাহার স্ত্রীকে মারিতেছে। সুষমার স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে জ্ঞান লতিকার পিতা মাতা দিয়া। আমি সুষমাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, স্বামিরূপ পদার্থমাত্রেই তাহার সইয়ের পিতার ন্যায় নহে। স্বামী সংসারের

অবলম্বন, প্রেমের সামগ্রী, স্নেহের আধার। স্বামী আবদার শুনিবে, অশ্রুজল মুছাইয়া দিবে, দুঃখ হইলে হাসাইবে, সুখ হইলে কাঁদাইবে। স্বামী জাহাজের দিক্‌নিরূপণ যন্ত্রের মত।

সুষমা বুঝিতে পারিয়া একটা ছোট খাট দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

প্রায় মাসাবধি বিনোদকে আমার জমীদারীর উত্তর ভাগে তত্ত্বাবধান করিতে পাঠাইয়াছিলাম। বিনোদ সুকৌশলে ও বিনাযুদ্ধে প্রজাগণের নিকট বাকী খাজনা ষোল আনা আদায় করিয়াছিল, এবং কতকগুলি খামারভূমিতে আখের চাষ পরিবর্দ্ধিত করিয়া বৎসরে প্রায় পাঁচ শত টাকা আয়ের গোড়াপত্তন করিয়াছিল। বিনোদের পিতা স্বয়ং এক জন নিষ্করভোগী প্রজা ছিলেন, এবং বোধ হয়, বিনোদ বংশানুক্রমে পিতৃধর্ম্ম অনেকটা লাভ করিয়াছিল। তাহার কৃষিকার্য্যে দক্ষতা দেখিয়া আমার মনে হইত, বিনোদকে একটা নিষ্কর ভূমি উপহারস্বরূপ প্রদান করিলে, সৎপাত্রকে যথাযোগ্যরূপে পুরস্কৃত করা হয়।

আমি বিনোদকে বসতবাটীতে লইয়া আসিলাম।

একদিন বিনোদকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ বিনোদ, সুষীর একটু গণিতবিদ্যায় পারদর্শিতা চাহি। রজকের হিসাব, সংসারের জমা খরচ, আগামী মাসের আয়ব্যয়ের 'এস্‌টিমেট' প্রভৃতি ছোট ছোট বালিকাদিগকে প্রথমেই শিখান উচিত। হয় ত সুষীর আগামী বৎসরেই বিবাহ হইতে পারে। তুমি যদি একটু পরিশ্রম করিয়া উহাকে সহজ উপায়গুলি শিখাইয়া দাও, তাহা হইলে স্কুলের বেতনের দায় হইতে অব্যাহতি পাই।"

বিনোদের সম্মতিলক্ষণ দেখিয়া স্লেট পেন্সিল প্রভৃতি নূতন করিয়া কিনিয়া দিলাম, এবং শিক্ষক ও ছাত্রীর বসিবার জন্য আমাদিগের বিরাট বটবৃক্ষের তলে একখানা লম্বা বেঞ্চ পাতিয়া দিলাম। পাঠের জন্য সকালে এক ঘণ্টা ও বিকালে দুই ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম।

সুষমা আগ্রহসহকারে বিনোদের নিকট গণিত শিক্ষা করিতে লাগিল, এবং দুই একটা গাছপালা, ফুল ও পাখী আঁকিতে শিখিল।

আমি একদিন স্লেটের উপর বহু যত্নে অঙ্কিত একটা কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুষী, এ সুন্দর ময়ূরের ছবি আঁকিতে শিখাইল কে?" সুষমা, সলজ্জে উত্তর দিল; "বাবা ওটা ময়ূর নহে, উট।" আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, উষ্ট্রের ওষ্ঠযুগল অনেকটা ময়ূরচঞ্চুর মত, তাহা স্বীকার্য্য; কিন্তু উষ্ট্রের চারিটা পা এবং মাত্র ময়ূরের দু[illegible]

সুষমা সগর্ব্বে বলিল, "আমি চারিটা পা আঁকিয়াছিলাম, কিন্তু বিনোদ দুইটা পা মুছিয়া দিয়াছে।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "সুষী, তুই মাষ্টার মশায়ের নাম ধরিয়া ডাকিস্?"

সুষমা ভয় পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি সাদরে তাহার অশ্রু মুছাইয়া ললাটে চুম্বন করিলাম, এবং বলিলাম, "অমন করিয়া পুরুষ মানুষের নাম ধরিয়া ডাকিতে নাই, তাহা হইলে বিবাহ করিয়া ফেলিবে। তোর কি মনে একটুও ভয় নাই?"

ইতিমধ্যে সারদাসুন্দরী আসিয়া বৃক্ষের আড়াল হইতে আমার বক্তৃতা শুনিতেছিল। সারদা বলিল, "দাদা, এ কাজ ত তোমারই। ইচ্ছা করিয়া দুটাকে একত্র ফেলিয়া দিয়াছ।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "সুদান যুদ্ধকৌশল ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর!"

৫

আমার আরবীয় অশ্বের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট খোরাকী হইতে দুই সের দানা কমাইয়া দিলাম, এবং জমীদারীর কোন সুদূর প্রান্তে চরিয়া খাইতে পাঠাইলাম।

অশ্বের অন্তর্দ্ধানের সহিত উষ্ট্রের প্রতি মায়া বর্দ্ধিত হইল। উষ্ট্র পশুদিগের মধ্যে সন্ন্যাসিবিশেষ। অতি ধীরস্বভাব; অথচ ক্ষিপ্রগামী; অধিকন্তু ঈশ্বর-পরায়ণের ন্যায় ঊর্দ্ধগ্রীব, বন্ধুরপৃষ্ঠ ও মিতাহারী। কুৎসিত কদাকার হইলেও, উষ্ট্র বহুমূল্য পশু ও যত্নের সামগ্রী।

খঞ্জ, অন্ধ, বধির, রুগ্ন ও আহত,—সকলেই নির্ভয়ে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে চড়িতে পারে। আমি বিনা শ্রমে, সহজে, ইস্‌মাযেলের সাহায্যে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিলাম।

মিশর দেশ হইতে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার যোদ্ধার বেশের উপর অত্যন্ত টান ছিল। দামাস্কাসের তরবারি, সুদানের ছোরা, মিশর দেশের বন্দুক প্রভৃতি আমার শয়নগৃহের চারি কোণে সজ্জিত থাকিত। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্য সামগ্রী আমার ঝোলায় লুক্কায়িত থাকিত। তাহার মধ্যে মিশর দেশের "পাপিরাস" ও আরব দেশের কতকগুলি ছদ্মবেশের উপকরণই উল্লেখযোগ্য।

আমার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল যে, যোগী সন্ন্যাসীর বেশে জমীদারীটা

প্রদক্ষিণ করি। এই বেশ মাধীর এস্‌লাম রাজ্যেও সমাদৃত। হিন্দু ফকীর দেখিলে মিশরবাসী মুসলমানগণও অভিবাদন করে। না জানি পুরাকালে এই হিন্দু সন্ন্যাসীর কি অদ্ভুত প্রভাব ছিল!

উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ঝুলিটি সযত্নে রক্ষা করিয়া পূর্ব্বকথিত ভগ্নস্তূপের দিকে চলিলাম। চন্দ্রকে পদদলিত করিয়া কৃষ্ণ মেঘখানা আকাশে অবিরামগতি ছুটিতেছিল। রাত্রি তখন প্রায় দশটা।

নিঃশব্দপদবিক্ষেপে উষ্ট্র অতিশয় দক্ষ।

তাই যখন ভগ্ন ইষ্টকস্তূপের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন দুইটি কলহরত মনুষ্য আমার আগমন লক্ষ্য করে নাই। তন্মধ্যে একটি পুরুষ, অন্যটি স্ত্রী।

পুরুষ একটা কণ্ঠমালা লইয়া যাইতেছে, স্ত্রী তাহার পদযুগল বাহু দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক বিনীতভাবে বাধা দিতেছে;—"ওগো, ঐ আমার শেষ সম্বল, ওটা মদের দোকানে দিও না।"

পুরুষ রুক্ষস্বরে বলিল, "কেন?"

স্ত্রী। ওটা বেচিয়া আমার লতিকার বিবাহ দিব।

পুরুষ চক্ষু ঘূর্ণমাণ করিয়া কঠোর ভাষায় বলিল, "রাখিয়া দে তোর বিবাহ। টাকা না দিলে আমাকে জেলে যাইতে হইবে। এত গুলা ছেলে মরিয়া গেল, কিন্তু মেয়েটা মরিল না কেন?"

ইহা বলিয়া নেশায় মত্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্য সহধর্ম্মিণীকে পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়া মুক্তার মালা লইয়া রাজপথের দিকে চলিয়া গেল। আচার্য্যের স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

আমি উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আচার্য্যের গৃহের দিকে চলিলাম। আমার ভয় হইল যে, বোধ হয় স্ত্রীলোকটা আত্মহত্যা করিবে। সুদান যুদ্ধের পরে অনেক মিশর-বধূ স্বামি-বিরহে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

ধীরে ধীরে আচার্য্যের শেফালিকা-বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া দেখিতে পাইলাম যে, শয়নগৃহে ক্ষীণ দীপালোকে আচার্য্য-গৃহিণী লতিকাকে ক্রোড়ে লইয়া কি ভাবিতেছে। লতিকা বলিল, "তুমি কেন দুঃখ কর মা?"

মাতা। মা, আমার ইচ্ছা করে, মায়ে ঝিয়ে জলে ডুবিয়া মরি।

কন্যা। সে ত খুব সোজা মা। আমরা সংসারে ত মরিতেই আসিয়াছি, আমি মরিলে বাবা যদি সুখী হন, তবে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?

মাতা। মা, আমার সাধ ছিল, তোকে তোর বরের হাতে সঁপিয়া দিয়া মনের

সুখে মরিব। আমার কপালে যে সুখ ঘটিল না, ঈশ্বর যদি তোর কপালে সে সুখ দিতেন, তাহা হইলেও জানিতাম, জগতে ধর্ম্ম আছে!

কন্যা। মা, ধর্ম্ম যদি মৃত্যু চায়, তবে মৃত্যুই ভাল। কেহ সুখে ধর্ম্ম পায়, কেহ কেহ দুঃখে পায়। মা, চারিটি ভাত খাও না মা।

মাতা খাইল না। কন্যা ধীরপদবিক্ষেপে আমার মাতার স্বহস্তরোপিত তুলসী বৃক্ষের নিকটে আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইল।

৬

আমি শেফালিকা বৃক্ষতল হইতে অন্ধকারমণ্ডিত ছোট ছোট ঝোপের মধ্য দিয়া উষ্ট্রের নিকটে আসিলাম। মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এরূপ শোকাবহদৃশ্যের মধ্যে আমার উপস্থিতি যুক্তিসিদ্ধ কি না।

হৃদয়ের দুঃখে বিগলিত অশ্রুবারির স্রোত রুদ্ধ করা যুদ্ধকৌশলের কোন অঙ্গ নহে। অথচ ইহাও বিশ্বপালকের একটা অপূর্ব্ব লীলা। আমি অন্যমনস্কভাবে যুদ্ধসাজ খুলিয়া ঝুলি হইতে সন্ন্যাসীর বেশটা বাহির করিলাম। দীর্ঘ সুপক্ক দাড়ি ও গোঁফ, গৈরিক বস্ত্রের অঙ্গরাখা, মিশরদেশের শ্বেত মৃত্তিকার বিভূতি প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিয়া আমি একবার নৈশ গগনের দিকে চাহিলাম।

মনে একটা কল্পনা আঁটিতেছিলাম। এমন সময়ে চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, অদূরে সুষমা একটা কি হাতে করিয়া তুলসীবৃক্ষের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে।

সুষমা লতিকাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বলিল, "সই, সই, তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা; আমি যাঁর ছবি তোমাকে দেখাইব বলিয়াছিলাম, সে ছবি এই। মামার ঘরে ছিল, লুকিয়ে এনেছি।"

আমি অবাক হইয়া রহিলাম। সুষমা ফটোগ্রাফখানা আমার ঘরের দেরাজ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছে! কলিকাতার বোর্ণ শেফার্ডের বাটীতে আমি ও বিনোদ একত্র ফটো তুলাইয়াছিলাম। এ সেই ছবি।

লতিকা অঞ্চলে চক্ষুজল মুছিয়া ফটোগ্রাফখানি দেখিল। সুষমা বলিল, "সই, ওটা আমার মামা, আর এইটে—এইটে—সই, সই, তুমি কাঁদছ কেন?"

সুষমার মুখ ভার হইয়া আসিল।

লতিকা বলিল, "না সই, কাঁদিব কেন? ও মুখটি বড় সুন্দর—ঐ যে বিনোদ বাবুর মুখ! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও।" সুষমা সুখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমার বোধ হইল, মানব চরিত্রে এখনও কিছু শিক্ষা করিতে বাকি ছিল।

ইহারই মধ্যে কচি মেয়ে সুখী মনের কথা সইকে খুলিয়া বলিয়াছে! এবং ইহারা কি অকৃতজ্ঞ! সুষমার কাছেও বিনোদ সুন্দর, লতিকার চক্ষেও সুন্দর। আর আমার উন্নত দেহ, বিশাল বাহু, ধীর মূর্ত্তি, 'কাহার'ও চক্ষে পড়িল না?

লতিকা বলিল, "সই, আমার আজ শেষ দিন।"

সুষমা। কেন সই?

লতিকা। আজ ভগবানের ইচ্ছা আমি মরিব। তাই মরিতে আসিয়াছি। তুমি বাধা দিও না, যাও।

সুষমা। কেন? তোমার বাবা মারিয়াছেন?

লতিকা। আমি মরিলে বাবা সুখী হইবেন; ঈশ্বর তাই আমাকে ডাকিয়াছেন।

সুষমা অনেক অনুনয় বিনয় করিল। সকাতরে বলিল, "সই, মরিও না, আমি তোমাকে সব দিব।" কিন্তু লতিকা কৃতসঙ্কল্প।

লতিকা কূপের নিকট গেল। আমার পিতার খোদিত বিশাল পুরাতন কূপ, তাহার তল দেখা যায় না।

সুষমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল. "ভগবান, তুমি একবার এস। এই ত মাঘ মাস। কই, তুমি ত সইয়ের দুঃখ দেখিলে না।"

সপ্তস্বর্গ ভাঙ্গিয়া তখন চন্দ্র ভূলোকের দিকে আসিতেছিল। মেঘমালা অপসৃত হইয়াছিল। সেই চন্দ্রকিরণপুলকিত নৈশগগনে সুষমার স্নেহকোমল করুণবাণী উদ্ভ্রান্ত পাপিয়ার কলকূজনের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল।

ঈশ্বর পশুদিগের মন গড়ান্। ভক্তের মন লইয়া খেলা করেন। কিন্তু স্নেহলালিত বালিকার হৃদয়-দর্পণে সাধ মিটাইয়া আপনার রূপ দেখেন। তবে সেখানে মৃত্যুর কালো ছায়া কোথা হইতে আসে?

যখন লতিকা সুষমার আর্ত্তনাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, তখন আমি উভয়েব সম্মুখে চন্দ্রকিরণে জটাজূটধারী মহাদেবের বেশে দাঁড়াইলাম।

উভয়ে দ্বিগুণতর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

হঠাৎ ভগবানের সশরীরে আবির্ভাবরূপ অলৌকিক ঘটনা যে মর্ত্ত্যধামে সম্ভব, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু উন্মুক্তহৃদয়া সুশীলা বালিকা দুইটি বোধ হয় তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিয়া ফেলিল।

সুষমা ভয়ে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। লতিকা গলদেশে বস্ত্র দিয়া সাষ্টাঙ্গে লুণ্ঠিত হইল।

আমি বলিলাম, "তোমাকে মরিতে হইবে না। আমার মাঘমাসের প্রথমেই

আসিবার কথা ছিল; কিন্তু কার্য্যবশতঃ কৈলাসে থাকিতে হইয়াছিল। তোমার এখনও মরিবার সময় হয় নাই। তোমার মাতাকে বলিও,—স্বয়ং কৈলাসনাথ আজ্ঞা করিয়াছেন যে, তোমরা সহিষ্ণু হইয়া কিছু দিন অপেক্ষা কর। তোমাদের বাটীর শেফালিকা-বৃক্ষতলে আমার ভৃত্য নন্দী পাঁচ শত মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছে। কল্য প্রভাতে তোমার পিতাকে খুঁড়িয়া বাহির করিতে বলিও। তদ্দারা তাঁহার ঋণশোধ হইবে। কণ্ঠমালা বিক্রয় করিতে হইবে না। সেটা তোমার বিবাহের সময় আবশ্যক হইবে।"

অতঃপর সুষমার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তুমি এ দিকে এস।" সুষমা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। আমি বলিলাম, "তোমার চুরি করা অভ্যাস হইয়াছে। যে চুরি করে, ভগবান তাহার কান কাটিয়া লন। এবার তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম। তুমি ফটোগ্রাফখানি যথাস্থানে রাখিয়া আইস।"

এইরূপে মন্ত্রমুগ্ধ বালিকাদ্বয়কে সম্মুখসমরে পরাভূত করিয়া আমি ভগ্নস্তূপের মধ্যে অদৃশ্য হইলাম। বাটীতে গিয়া দেখি, সুষমা যথাস্থানে ফটোগ্রাফ রাখিয়া দিয়াছে। তখন দ্বিপ্রহর নিশি।

সারদা বলিল, "দাদা, তুমি কোথায় গিয়াছিলে? সুষমা ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার খুব জ্বর হইয়াছে। বোধ হয়, কোন কারণে ভয় পাইয়াছে। আমার বিশ্বাস, ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটার দিকে ভূত আছে।" মাতার মন কি সন্দিগ্ধ!

আমি বলিলাম, "কোন ভয় নাই, উহার ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। পার্ব্বতীয় দেশে কার্ত্তিক মাসের হিমে বেড়াইতে দিও না।"

সেই রাত্রিকালে আমি পাঁচ শত মুদ্রা লইয়া শেফালিকা-বৃক্ষতলে প্রোথিত করিয়া আসিলাম।

প্রত্যুষে চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যের বাটীতে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল। গতনিশার ভগবানের আবির্ভাব-ইতিহাস লতিকা তাহার মাতাকে বলিয়াছিল, এবং মাতা প্রত্যাগত ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অপদেবতা প্রভৃতি বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনে মনে একটু সন্দিগ্ধ ছিলেন। যখন বাস্তবিক শেফালিকা-বৃক্ষতলে পাঁচ শত মুদ্রা পাওয়া গেল, তখন চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যের ঈশ্বরের মহিমায় দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল। ভট্টাচার্য্য কাঁদিয়া বলিল, "প্রভু, আর কখনও মদ খাইব না। যাহার কন্যার নিকট স্বয়ং মহাদেব দেখা দিয়াছেন, সে ত প্রজাপতি।"

এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য আড়ম্বরের সহিত সজলনয়নে পূজা করিতে বসিল, এবং শান্তিজল প্রভৃতি স্ত্রী ও কন্যার মস্তকে দিল। ক্রমে দুই একটি দরিদ্র প্রজা সেই অলৌকিক ঘটনার সন্ধান পাইয়া শেফালিকা-মূলে 'দণ্ডবৎ' করিতে বসিয়া গেল।

সুষমার জ্বর হইয়াছিল। বিনোদকে তাহার নিকট বসিতে বলিলাম।

বিনোদ গিয়া সুষমার নিকট বসিল। আমি চলিয়া গেলাম। সুষমা বিস্ফারিতলোচনে বিনোদের দিকে চাহিল।

সুষমা বলিল, "ভগবান আর একবার আস্‌বেন না?"

বিনোদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোন ভগবান্?"

সুষমা। রাত্রিকালে যাঁহাকে দেখেছি। তোমার ফটোগ্রাফ চুরি করিয়া সইকে দেখাইতে গিয়াছিলাম, তিনি বড় বকিয়াছেন। আর চুরি করিব না।

বিনোদ বলিল, "সুষমা তোমার বড় জ্বর হইয়াছে। চুপ করিয়া থাক।"

৮

বালিকার প্রণয় বড়ই মধুর। সাহারা মরুভূমিতে গোটাকতক পীতবর্ণ বনকুসুম একটা ওয়েসিসের মধ্যে ফুটিয়াছিল, সুদানের যুদ্ধাবসানে তাহা দেখিয়াছিলাম। সংসার-মরুভূমির মধ্যে বালিকার প্রণয় সেইরূপ। সুষমার জ্বর সারিয়া গেল; বিনোদের মুখও প্রফুল্ল হইল।

লতিকা পিতার অলৌকিক পরিবর্ত্তনে সহসা ফুল্ল কুসুমের মত ফুটিয়া উঠিল। লতিকা সুষমাকে দেখিতে আসিল।

সুষমা আমার শয়নগৃহে শুইয়াছিল। আমি স্নানে গিয়াছিলাম। স্নান করিয়া আহার করিতে যাইব, এমন সময় দুইটি বালিকার অপরিস্ফুট হাস্য আমার কর্ণগোচর হইল।

আমি লুক্কায়িতভাবে গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলাম।

সুষমা বলিল, "সই, এই সেই ছবি।"

লতিকা ফটোগ্রাফের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সুষমা বলিল, "সই, এখানে থাক, আমি মামার জন্য লেবু কাটিয়া দিইগে।"

এই অবসরে আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম।

আমি বলিলাম, "লতিকা, তুমি একটু রোগা হইয়া গিয়াছ।"

লতিকা সলজ্জবদনে চুপ করিয়া রহিল।

আমি। লতিকা! তোমার পিতা আর মদ পান না ত?

লতিকা। না।

আমি। লতিকা! তুমি সেদিন বলিয়াছিলে, আমি বড় হাল্‌কা। সেটা কি ঠিক কথা? আমি ওজনে দুই মণ দশ সের। আমার বোধ হয়, তোমার সেটা ভুল হইয়াছিল।

লতিকা কিন্তু পূর্ব্বের মত সরলা নির্ব্বুদ্ধি বালিকার ন্যায় কথা কহিল না। বোধ হয়, এই কয় মাসের ঘটনাস্রোতে লতিকার মনের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়াছিল।

আমি বলিলাম, "লতিকা, তুমি বলিয়াছিলে, বিধাতা মোটা লোককে বড় কষ্ট দেন। তবে তুমি বিধাতার দেখা পাইলে কেন? আমার বোধ হয়, ওটাও প্রকাণ্ড ভুল।"

লতিকা বলিল, "আমরা বড় দুঃখী—আমাদের প্রায়ই ভুল হইয়া থাকে।"

আমি বলিলাম, "লতিকা, ভুলের মধ্যে বিধাতা সৌন্দর্য্য ও সত্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন। ভুলের মধ্যেই বিশ্বাস, স্নেহ, মমতা। সংসারের জীবনটাই ভুলের মধ্যে প্রবাহিত। প্রণয়টাও একটা ভুল, কিন্তু বড় মধুর।"

লতিকা সুষমা অপেক্ষা এক বৎসরের বড়। বোধ হয়, তাহার প্রণয় সম্বন্ধে জ্ঞান সুষমা হইতে একস্তর বেশী। লতিকা লজ্জাবতী লতার মত কুঞ্চিত হইয়া গেল।

সারদাসুন্দরী আসিয়া ডাকিল, "দাদা, ভাত যে ঠাণ্ডা হইয়া যায়।" আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া ভাত খাইতে গেলাম।

ভীষণ সুদান সমরক্ষেত্রে, আফ্রিকার ভয়ঙ্কর মরুভূমে যাহার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নাই, তাহার পক্ষে আজ ভাত খাইবার সময় একটু বিচলিত হওয়া আশ্চর্য্য বটে।

আমি বলিলাম, "সারদা, আমার একটু শীত লাগিয়াছে।"

সেই মাঘমাসের শীতে ঠাণ্ডা ভাত গিলিতে যেন কষ্ট হইতে লাগিল।

সারদা বলিল, "দাদা, তোমার সুদানের বীরত্ব রাখিয়া দিয়া এখন শীঘ্র শীঘ্র লতিকাকে বিবাহ করিয়া ফেল। আমি সব যোগাড় করিয়াছি।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম! জেনারেল গর্ডন এক মাসের মধ্যে আবিসিনিয়ার দুর্গে সৈন্য লইয়া যাইতে পারেন নাই, আর ইহারা ইতিমধ্যে সব যোগাড় করিয়াছে!

আমি বলিলাম, "তোমরা মনের কথা জানিলে কিরূপে?"

সারদাসুন্দরী হাসিয়া বলিল "আমরা তোমার গর্ডনের মত বোকা নহি। এখন তোমার মত আছে ত ?"

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

২৫ শে চৈত্র। পঙ্কুরামের অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে। শিশুটি নিতান্ত শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয়, তাহার বিশেষ কষ্ট হইতেছে। নহিলে আজকাল এত বেশী কাঁদে কেন ? আমি পুরাতন বাড়ীতে শুইয়া থাকি ; মাঝে মাঝে রাত্রে তাহার কান্না শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ছুটিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হই। সেদিন রাত্রি প্রায় তিনটার সময় এরূপ ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছিল যে, কেহই শান্ত করিতে পারে নাই। আমি তাহাকে বুকে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া, কিয়ৎকাল বেড়াইয়া, তবে নিরস্ত করি। শিশুটি শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। তার পর ঘরের ভিতর দিয়া আসিলাম। * * * অসহায় শিশুটির কষ্ট দেখিয়া মনে বড়ই ক্লেশ পাইয়া থাকি। আমি বুঝিতেছি, ভগবান আমাকে শাস্তি দিবার জন্যই এত করিতেছেন। কিন্তু সে কষ্টটা আমার নিজের শরীরের উপর দিয়াই হয় না কেন, আমি তাই ভাবি। বাছা কেমন করিয়া ভাল হবে, কে জানে।

২৬শে চৈত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যাকাশের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য সহসা অস্তমিত হইয়াছে। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজ বেলা ৩-২৩ মিনিটের সময় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু যে এত সত্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহা কে ভাবিয়াছিল ? বাঙ্গালী তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার নিকট এখনও অনেক মণি-মাণিক্যের প্রত্যাশা করিতেছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। সহস্র হৃদয়ের সেই আশা সফল হইল না। তাঁহাকে হারাইয়া বাঙ্গালা ভাষা আজ প্রকৃতই অনাথিনী হইয়া পড়িল। জাতীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রের কতটা স্থান তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবিতকালেই বাঙ্গালী পাঠক তাহা বুঝিয়াছিল। এক্ষণে, তাঁহার মৃত্যুতে সে জ্ঞান আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরিত হইবার সম্ভাবনা ত দেখিতেছি না। বাঙ্গালীর বহুভাগ্যফলে বহু শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার ন্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী সাহিত্য-সেবক এখানে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আসন মহাত্মা মাই-

কেলের উপর। কারণ, মাইকেল-কবির প্রতিভা এরূপ সর্ব্বতোমুখী ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগে আজি আমরা শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, শ্রেষ্ঠ সমালোচক, শ্রেষ্ঠ সম্পাদক, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবেত্তা, এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৌন্দর্য্য-পিপাসীকে হারাইলাম। আমাদের দুঃখের অবধি নাই।

৪টার সময় সংবাদ পাইয়া বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে গমন। সেখান হইতে ৩টার সময় বাহির হইয়া গঙ্গার ঘাটে আগমন। প্রায় ৪ শত লোক সমাগত হইয়াছিল। সময়ে খবর পাইলে বোধ হয় আরও হইত। ঘাট হইতে নয়টা রাত্রির সময় গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

২৭শে চৈত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূলতত্ত্ব (key-note) বাহির করিবার ভার যোগ্যতর লেখকদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আমি এখানে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটা সামান্য সাদা কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। প্রথম কথা, তাঁহার উদ্ভাবিত লিখনপদ্ধতি। বিদ্যাসাগর-প্রমুখ লেখকদিগের ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও সংস্কৃতবহুল। উহাতে যেন হ্রাস-বৃদ্ধি উত্থান-পতন নাই। সমতলবিহারিণী তটিনীর ন্যায় চিরদিন একই পথে একই ভাবে ধাবমান হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার প্রধান গুণ এই যে, সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও উহা বিশুদ্ধ সাধারণ প্রচলিত বাঙ্গালার প্রাণের সহিত গাঁথা। একমাত্র দামোদর নদের গতিই উহার সহিত তুলনীয়া। দেশ ও কালভেদে উহার অবস্থাভেদ পরিলক্ষিত হয়। বালুকাকণার উপর দিয়া ধীরে ধীরে নীরবে বহিয়া যাইতেছে; আবার কখনও বা প্রলয়কালীন প্লাবনের ন্যায়, দুই পার্শ্ব পরিপ্লুত করিয়া গ্রাম নগর মাঠ প্রান্তর ভাসাইয়া দিয়া, উত্তাল তরঙ্গে, তাণ্ডবে নাচিয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। এক কথায়, তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র ভাবেরই অনুগামিনী। দ্বিতীয় বক্তব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলির অন্তর্নিহিত শিক্ষা। আমার বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র ইন্দ্রিয়জয়কেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাই তাঁহার সকল পুস্তকেই একটা না একটা এই কঠোর সংগ্রামের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। কোথাও জয়লাভের অসীম উল্লাস, আর কোথাও বা পরাজয়ের অন্তহীন আর্ত্তনাদ। যে দিক দিয়াই হউক, শিক্ষাটা সর্ব্বত্রই এক,—ইন্দ্রিয়জয়ই মনুষ্যত্বের চরম।

২৮শে চৈত্র। চৈত্র মাসের "সাধনা"য় রবীন্দ্রনাথ বাবুর একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটির নাম "এবার ফিরাও মোরে।" কবি বলিতেছেন,—এতদিন তিনি সংসারের বাহিরে কেবল তাঁহার কল্পনার বাঁশীটি

লইয়া, কোথায়, কোন্ স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বিদ্যালয়ে, শিক্ষার অবস্থায়, তিনি পাঠে মনোনিবেশ না করিয়া, স্কুলগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল নিকুঞ্জের ছায়ায়, গাছের তলায় উপবেশন করিয়া নবেল পড়িয়া সময় অতি-বাহিত করিয়াছেন। তার পর, কতদিন জীবন-সংগ্রামে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবে আপনার আনন্দবিলাসে আপনি কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। কালধর্ম্মে এরূপ জ্ঞানোদয় সকলেরই হইয়া থাকে। তবে এই চেতনা কিছু দিন পূর্ব্বে হইলে আরও ভাল হইত। তিনি এখন আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া, আপনার অভীষ্ট দেবতাকে বলি-তেছেন,—আমি বহুকাল কেবল বিলাসে হাসি ও বাঁশী লইয়া, আনন্দ উল্লাসে বৃথা অপব্যয় করিয়াছি। আর আমি এরূপে থাকিতে চাহি না;—"এবার ফিরাও মোরে।" রবীন্দ্র বাবুর প্রত্যাবর্ত্তনে আমার ন্যায় আর কাহারও হৃদয়, বোধ করি, এত দূর উৎফুল্ল নহে। আমি আজীবন তাঁহাকে এবং তাঁহার সহধর্ম্মী কবিদিগকে যে কথা বলিয়া আসিতেছি, আজ তাহারই সাফল্য দেখিলাম। উদা-সীন বিলাসপ্রিয় জীবন, কবির যোগ্য নহে। কবি যদি এক জনেরও হৃদয় হইতে দুঃখ দৈন্যের পাথরখানা নামাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার জন্ম সার্থক।

২৯শে চৈত্র। সকালে ৫—৩০ মিনিটের সময় গাত্রোত্থান করিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, চেয়ারে বসিয়া, "মেঘমালা"র শেষ গল্প ফাঁদিয়া লিখিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে পাচক মহাশয় চৈত্র মাসের খরচের হিসাব আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সুতরাং কবিতা মাথারই ভিতর রহিল। আজ কাল কবি-তার অপেক্ষা আয়-ব্যয়ের হিসাবটার উপর একটু বেশী দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাদের সে কাজটা অপরে করিয়া দেয়, প্রত্যহ তিন বেলা যথাসময়ে যথাযোগ্য খাদ্যসামগ্রী যাঁহাদের হাতের কাছে যেন কলে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা যদি চব্বিশ ঘণ্টা কবিত্ব করেন, সে একদিন মানাইতে পারে। কিন্তু আমার মতন খুচরা বুভুক্ষু কবির পক্ষে তাহা নিতান্তই অমার্জ্জনীয়। লোকে ত মার্জ্জনা করিবেই না। তাহার উপর আকাশের ন্যায় উদার উদর মহারাজ ক্ষুধারূপ দারুণ বেত্রদণ্ডহস্তে এই শীর্ণ শরীরটার উপর বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করেন। কবিতা-রূপসী হৃদয়-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বোধ হয় নয়নের সেই লবণাক্ত সলিলের ভিতর আত্মগোপন করিয়া কোথায় কোন দূর দেশে পলায়ন করেন। তার পর তাঁহার সন্ধান করিতে আবার কত কাল কাটিয়া যায় এ জীবনটা এইরূপেই চলিতেছে। একটা সামান্য কল্পনা আজ ক্রমাগত সাত আট

বৎসর ধরিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। তাই দিবারাত্রি কেবল ডাকি,—"নিতান্ত কি হে দেবতা এ দুরন্ত রণে" ইত্যাদি।*

৩০ শে চৈত্র। আজ চৈত্রসংক্রান্তি। এতদুপলক্ষে স্কুল দুই দিবস বন্ধ। গতকল্য বৈকালে কলিকাতায় আসিয়াছি। কলিকাতার চাঁপাতলা-বাসী জেলেরা প্রতিবৎসর এই সংক্রান্তির সময়ে নানাবিধ সং-তামাসা বাহির করিয়া থাকেন। তাহাই দেখিবার নিমিত্ত চারুচন্দ্রের পুরাতন বাসায় গিয়া এক বারান্দায় আশ্রয় লইলাম। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর একটি একটি করিয়া তামাসা-ওয়ালারা দেখা দিতে লাগিলেন। ক্রমে দলে দলে, কেহ বা গাড়ী করিয়া, কেহ বা পদব্রজে সং মহাশয়েরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গলির ভিতর শ্রীযুক্ত * * রায় মহাশয়ের বাটী। তাঁহার পরিবারবর্গকে তামাসা দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার এক ইয়ার পুলীস কর্ম্মচারী গলির মোড় হইতে সং-ওয়ালাদিগকে ধরিয়া আনিতে লাগিলেন। আমরা একবার এ দিক, একবার ও দিক করিতে আরম্ভ করিলাম। সংগুলির অধিকাংশই বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু কয়েকটি দলের কার্য্যে আকার ইঙ্গিতে এবং অশ্লীল কথাবার্ত্তায় আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। শুনিয়াছি, ইহাদের পৃষ্ঠপোষক কয়েক জন ভদ্রলোক আছেন। তাঁহারা কিরূপে এই সব অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেন, বুঝিতে পারি না।

১লা বৈশাখ। * * * আহারের পর দিবসের ভাগটা কিয়ৎকাল ঘুমাইয়া কিয়ৎকাল Shelleyর Revolt of Islam পড়িয়া কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাকালে হী— বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। "মেঘমালা"র অন্তর্গত "শোভা" নামক কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে একটু আলোচনা হইল। নায়কের দ্বিতীয়া পরিণীতা স্ত্রীকে তিনি পূর্ব্বে মারিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। আজ বলিলেন, না, তাহা ভাল হইবে না। যেমন আছে, তাহাই ভাল। দু'এক স্থলে ঘটনা একটু পরিস্ফুট করিয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহার মতগুলি অধিকাংশ স্থলেই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। কাব্যের ভাষা বিষয়ে তাঁহার কান খুব সূক্ষ্ম। তবে কখনও তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যের অনুরাগী দেখা যায়। আমার মত এই, ভাষা সর্ব্বস্থলে ভাবের অনুগামী হইলেই হইল। জগতের সকল কথাই কিছু গম্ভীর নহে।

২রা বৈশাখ। অদ্য সকালে কোন্নগরে গিয়া পূর্ব্ববৎ ২-৩০ মিনিটের গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু গাড়ীখানির কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। সে জন্য কলিকাতায় পঁহুছিতে প্রায় ৪॥০ হইয়া গেল। আসিবার

সময় * * * কলেজের প্রিন্সিপাল বাবু * * * মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ। কথায় কথায় তাঁহার সহিত একটা বিষম তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি বলেন,—বঙ্কিম বাবুর Memorialএর জন্য আপনারা এত ব্যস্ত কেন? এইরূপ মানুষ মরিলেই তাঁহার নিমিত্ত যদি লোককে চাঁদা দিতে হয়, তবে ত সংসারে বাস করা ভার হইয়া উঠে। এই প্রথার একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আর বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, এই কারণে ভক্তিবশতঃ যদি আপনাদের এত মাথা-ব্যথা হইয়া উঠে; তবে জিজ্ঞাসা করি, Mill (J. S.) এর জন্য আপনি কত চাঁদা দিয়াছেন? Mill কি বঙ্কিমের অপেক্ষা জগতের অধিকতর উপকারী নহেন? আমি বিনীতভাবে বলিলাম,—মহাশয়! ঘরের কথাই ভাবিতে পারি না, তা আবার বাহিরের কথা!—তিনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন,—কি? Republic of Lettersএর ভিতর আবার আপন-পর বিবেচনা! তখন আমি আর একটি কথা বলিলাম,—মহাশয়! একটু শান্ত হউন। জগতের অধিকাংশ লোকের উপকার, এই কথাটা নিতান্ত অর্থহীন। সমগ্র জগতের অধিবাসীর সংখ্যা ধরিলে আপনার Millকে কয় জন পাঠ করিয়াছেন? এ বিষয়ে আমাদের কাশীদাস ও কৃত্তিবাস তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। Millএর উপাসকগণকে একটা Coterie বলিলেও হয়। গাঙ্গুলী মহাশয় পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিলেন, "কি স্পর্দ্ধা! আপনি Millএর শিষ্যগণকে Coterie (অল্পসংখ্যক) বলেন? তবে আপনার সঙ্গে তর্ক চলিতে পারে না।" আমিও হৃদয়হীন স্বার্থপরতার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। শ্যামবাবু (বঙ্কিমচন্দ্রের) ঔপন্যাসিক হিসাবে সুখ্যাতি করেন, কিন্তু তাঁহার মতে ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিম বড়ই নিন্দার্হ! কি বিচিত্র ভাষা-জ্ঞান! বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাহা বঙ্গদর্শনে বিঘোষিত করিয়াছিলেন।

৩রা বৈশাখ। মৃত মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে Indian Nation ও বঙ্গবাসীর লেখাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। বঙ্গবাসী বিবাদের দিকে বড় যান নাই; কিন্তু Nation মহাশয় কয়েকটি এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত পাঠকের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় সাহিত্য বলিয়া কোনও পদার্থই ছিল না। এ প্রকার মতপ্রকাশ নিতান্ত অনভিজ্ঞতা এবং অনধ্যয়নের ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণব কবিকুল, মাইকেল দত্ত, ইহাঁরা কেহই কি একটা সাহিত্য গঠন করিয়া যান নাই, বা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহেন? হইতে পারে, সে সাহিত্য অতি

সঙ্কীর্ণ, তবুও উহা সাহিত্য বটে। সম্পাদক মহাশয় বঙ্কিমের সহিত মাইকেল ও রাজেন্দ্রলালের (মিত্র) তুলনা করিয়াছেন। প্রথমোক্তের সহিত তুলনা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু, বঙ্কিমের সহিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তুলনা করিয়া, তিনি বলিতেছেন যে, ঔপন্যাসিকের অপেক্ষা প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রয়োজনীয়তা বেশী। এ কথার অর্থ আমরা বুঝিলাম না। মিত্র মহোদয়ের পুরাতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকাবলী দুই এক জন দার্শনিক ও পণ্ডিতের কাছে বিশেষ আদরণীয় হইতে পারে; কিন্তু উহাদের সহিত বাঙ্গালী জাতির অথবা বাঙ্গালা-সাহিত্যের সম্পর্ক বড় বেশী নহে। অথবা অতি অল্প। উহারা প্রধানতঃ ইংরাজীতে লিখিত বলিয়া জাতীয় সাহিত্যের ভিতর ত আসিতেই পারে না। তার পর প্রয়োজনীয়তার বিচার। দুই লেখকের পাঠক-সংখ্যার হিসাব করিলে এ বিষয়ের মীমাংসাও অতি সহজ হইয়া পড়ে।

৪ঠা বৈশাখ। Nation-সম্পাদক মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে গুটি কতক বেশ সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি নূতন নহে; কিন্তু বড়ই সত্য। কেহ কেহ আক্ষেপ করেন,—"আহা! বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি প্রাকৃত জনের ন্যায় উদরান্নের জন্য খাটিয়া মরিতে না হইত! আমরা তাহা হইলে আরও কত বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর লাভ করিতে পারিতাম।" সম্পাদক এই কথার বেশ জবাব দিয়াছেন। শুনিয়াছি, Goethe বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর একটা করিয়া চাকুরী বা ব্যবসায় থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সাহিত্যসেবী যদি সংসার-সংগ্রামে যোগ না দিয়া, লোকের সহিত না মিশিয়া, সুখ-দুঃখের আবর্ত্তে স্বয়ং না ভাসিয়া, কেবল বিদ্যার উপর নির্ভর করেন, তাঁহার গ্রন্থসমুদয় কিছুতেই লোকের হৃদয়-গ্রাহী হইবে না। জীবন নাটকে কবি কেবল দর্শকের স্থান অধিকার করিলে চলিবে না। সকলের সঙ্গে মিশিয়া, সকলের মনের কথাগুলি প্রতিনিধির ন্যায় বর্ণনা করাই কবির কার্য্য। গৃহের কোণে বসিয়া মাকড়সার মত নিজের ভিতর হইতে টানিয়া নিজেরই সঙ্কীর্ণ ভাবের সূতায় জাল বুনিলে, তাহাতে জগতের কোন উপকার নাই। কর্ম্মক্ষেত্র ও ভাবুকতার ক্ষেত্র উভয়ে উভয়ের বিরামস্বরূপ। কর্ম্মে শ্রান্ত হইলে ভাবের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কবি শান্তিলাভ করিবেন, আবার ভাব রাজ্য হইতে তেজ এবং উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। ইহাতেই প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি।

৫ই বৈশাখ। Asiatic Society দ্বারা প্রকাশিত (১৮৫৯)

"বাসবদত্তা"র ইংরাজী ভূমিকায় ইংরাজ সম্পাদক হল্ সাহেব বলিতেছেন,—" Natural scenery, though boundless in variety, is to the Hindu, an object of impassive in curiousity and unconcern, and low indeed must he that type of humanity to which this imputation can fairly be brought home." আর এক স্থলে অশ্লীলতা সম্বন্ধে—"In delicacy tinges it (বাসবদত্তা) throughout ; as it tinges, in some degree, where it does not indeed, swell into an absolute quagmire of pollution nearly the complete compass of the Hindu polite letters." হল সাহেব কর্ত্তৃক হিন্দুজাতির প্রকৃতিনির্ণয় ও তাঁহার হিন্দুসাহিত্যের জ্ঞান দেখিয়া অবাক হইতে হয়। আবার ইঁহারই সজাতীয় মহাশয়েরা হিন্দুসাহিত্যের শিরোভূষণ ঋষি-দের মন্ত্রগুলিকে স্বভাবসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ সরল ঋষি-হৃদয়ের সহজ উপাসনা বলিয়া বর্ণনা করেন। জাতিবিদ্বেষ ইউরোপীয়দিগকে কিরূপ অন্ধ করিয়া ফেলে, ইহা তাহারই চূড়ান্ত নিদর্শন। ইউরোপীয় সমালোচকেরাই বলেন যে, ইংরাজী সাহিত্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ বড় বেশী দিবসের নহে। কাউপার হইতে উহার আরম্ভ। ইংরাজেরা ঋগ্বেদের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ত হিন্দুজাতি ইউরোপীয়দিগের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বক্ষ্যমাণ সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইতে শিখিয়াছিলেন। অশ্লীলতা সম্বন্ধে সাহেব মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোনও কোনও স্থলে সত্য স্বীকার করি। কিন্তু জগতের কোন্ সাহিত্য একবারে অশ্লীলতা-বিবর্জ্জিত? আর দেশকালভেদে রুচিরও পরিবর্ত্তন হয়, ইহা সাহেব বোধ হয় জানিতেন না। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীতে বঙ্কিমচন্দ্র এই রুচিরহস্য বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

৬ই বৈশাখ। "বাসবদত্তা"র কবি সুবন্ধু বলিয়াছেন,—

"অবিদিতগুণাপি সুকবের্ভণিতিঃ কর্ণেষু কিরতি মধুধারাম্।
অনধিগতপরিমলাপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা ॥"

সুতরাং কবিতার এই অত্যাবশ্যক গুণ যে আজ কেবল Mathew Arnold নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন, এমন নহে। সৎকাব্যমাত্রেরই যে একটা সুমহান ঝঙ্কার অনুভূত হয়, ইহা চিরদিন সমালোচকেরা স্বীকার করিয়া আসিতে-ছেন। কিন্তু এই ঝঙ্কার সকলে বুঝিতে পারেন না। তাহা হইলে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের এত প্রশংসা শুনিতে পাইতাম না। জয়দেবের কাব্য

শ্রুতিসুখকর বটে; কিন্তু উহাতে উচ্চ শ্রেণীর কবিতার যে ঝঙ্কার, তাহা নাই বলিলেও হয়। পাঠকেরা ভ্রমবশতঃ কেবল শব্দের লালিত্যকে সৎকাব্যের অঙ্গীভূত সেই ধ্বনি মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। একমাত্র শব্দযোজনায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য। ভাবেরও একটা গাম্ভীর্য্য থাকা আবশ্যক। ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্য্য একত্রিত হইলে, তবেই সেই ঝঙ্কার অনুভূত হইতে পারে। কারণ, বাক্য এবং অর্থের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, একটির অভাবে আর একটির গাম্ভীর্য্য ও মধুরতা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গালার বর্ত্তমান কবিগণ এ বিষয়ে সর্ব্বদা মনোযোগী হন না বলিয়াই আমি বরাবর আক্ষেপ করিয়া আসিতেছি।

৭ই বৈশাখ। অসাধারণপ্রতিভাশালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনও কোনও পুস্তকের নূতন নূতন সংস্করণকালে যে সকল পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে, অনেক শিক্ষালাভ করা যায়। এ প্রকার পরিবর্ত্তন কোন মতে লজ্জার কারণ নহে। কবিবর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার কাব্যসমূহের বহুল পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ডাউডেন সাহেব তাঁহার এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ পরিবর্ত্তনে কবির রচনায় উৎকর্ষেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার বর্ত্তমান কোনও কোনও দাম্ভিক কবি এই মহাজন-অনুমোদিত পন্থার অনুসরণকে এক প্রকার হীনতা বলিয়া মনে করেন; আর তাঁহারা যে ঠিক লিখিয়াছেন, জবরদস্তী পূর্ব্বক তাহা সাব্যস্ত করিতে চান। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবর্ত্তন-পদ্ধতির দুই একটা নমুনা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। বিষবৃক্ষের অতি পুরাতন সংস্করণের কতকগুলি পাতা আমার হস্তগত হইয়াছে; তাহা হইতেই দৃষ্টান্ত কয়েকটি সংগ্রহ করিলাম।—

১। "আমার আঁটা ঘরে সিঁদ মেরেছে, কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতি" দেবেন্দ্র বাবুর এই গান তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২। কমলমণি পূর্ব্বে কুন্দকে বলিয়াছিলেন,—"দেখিতে পাও না যে দাদা তোকে ভালবাসে?"—পরবর্ত্তী সংস্করণে "দাদা"র পর ড্যাশ্ দিয়া কথা চাপা রাখিয়াছেন। ইহার জন্যে স্থানান্তরে আরও একটু আধটু বদলাইতে হইয়াছে।

৩। "উপপত্নী"র বদলে "সাহসিনী"।

৪। হীরা দাসী দেবেন্দ্র-ভবনে দ্বিতীয় দিবস এই গান করিতে করিতে

প্রবেশ করিয়াছিল,—"আমার নাম হীরামালিনী। মাতাল হ'য়ে বাচাল হলে দেখতে নারি আমি ধনী।"—পরে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫। "যেতেছিল বলদ একটা তেঠেঙ্গে এক ঘোড়ায় চোড়ে।"—এইটুকু দেবেন্দ্রের গান হইতে লুপ্ত করা হইয়াছে।

৬। "ও সূর্য্যমুখী, রাক্ষসী! ওঠ! দেখ আপনার কীর্ত্তি দেখ! অনাথিনীকে (কুন্দকে) ফিরাও।"—লুপ্ত করা হইয়াছে।

৮ই বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নাটকের আলোচনা প্রায়ই করিয়া থাকি। আজও উহার পাতা উল্‌টাইয়া এখানে সেখানে দেখিতেছিলাম। সমগ্র পুস্তকের মধ্যে চারিটি কি পাঁচটির বেশী ভাল এবং Spirited passage নাই। আমি সেই চারি পাঁচটি স্থল সর্ব্বদাই পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু আজ সে কথা লেখা আমাব উদ্দেশ্য নহে। আমি আজ তাঁহার অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে আপত্তি করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ একদিন স্বীকার করিয়াছিলেন বটে যে, তিনি অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে যে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সমীচীন নহে। তথাপি মনের ভিতর আজ যে কথাটা জাগিতেছে, তাহা লিখিয়া রাখায় কোন দোষ নাই। রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর অধিকাংশ স্থলেই চতুর্দ্দশাক্ষরপরিমিত মাপকাটির সাহায্যে কাটিয়া লওয়া সাধারণ গদ্যমাত্র। বাক্যের আরম্ভ এবং শেষ সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই দৃষ্টিহীন। মাঝখানটাকেও সব সময়ে বাদ দেওয়া যায় না। স্বীকার করি, গল্পের গদ্যময় সামান্য অংশগুলাকে কাব্যের ভাষায় আবৃত করা অনেক সময়েই অসম্ভব। আর অসম্ভব না হইলেও তাহা সর্ব্বস্থলে বাঞ্ছনীয় নহে। উহাতে ভাষা যেন কতকটা কৃত্রিম (affected) হইয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি, আমার বিশ্বাস যে, কবি সাবধান হইলে উভয় দিক বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন।

৯ই বৈশাখ। শনিবার প্রাতঃকালে স্কুল বসিয়াছিল। ৮-৩০ গাড়ীতে কলিকাতায় গমন করিলাম। পঞ্চুরামের নিমিত্ত মনটা চঞ্চল ও বিমর্ষ হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া, আর আমাকে কয়েক দিবসের পর আবার দেখিতে পাইয়া তাহার যে নীরব আনন্দ—তাহা অনুভব করিয়া, হৃদয়টা একবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। —কে স্মরণ করিয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। হায়! দশ মাসের এই শিশুর হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহার বিরহ-ব্যথা কে বুঝিবে? সমস্ত সপ্তাহটা, বোধ হয়, সে কেবল আমারই বিরহে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। জ্ঞানহীন, শুভ্রমনা নিষ্কলঙ্ক শিশুটি। সে, বুঝে না, যে জন মাঝে মাঝে সপ্তা-

হাতে আসিয়া তাহাকে কত স্নেহ কত আদর-যত্ন করে, আবার কেন অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। সংসারের এই বিষম বিরহ-মিলনের বিষয়টা সে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারে না। তাই বুঝি কেবল কাঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে। শৈশবসুলভ খেলা-ধূলার মাঝখানে তাই বুঝি কখনও কখনও তাহার অধরের হাসি অকস্মাৎ শুকাইয়া গিয়া, শান্ত সুকুমার চক্ষু দুইটি জলভরে অবনত হইয়া আইসে। এখন সে যেন বিরহের কথাটা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিয়াছে। তাই এখানে আসিবার সময় আমাকে আজ কাল সহজে ছাড়িয়া দিতে চাহে না। বক্ষ হইতে নামাইয়া অপরের কোলে দিবার সময়, বোধ করি সপ্তাহব্যাপী ভাবী বিরহ-বেদনা তাহার প্রাণে জাগিয়া উঠে। তাই দুটি ক্ষীণ-শক্তি শৈশব-সুকুমার বাহুর সাহায্যে গলাটি বুঝি সেইরূপ প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া রাখে।

১০ই বৈশাখ। সমস্ত দিনস সু—চন্দ্রের বাটীতে কাটিয়া গেল। বৈকালে একবার বাজারে গিয়া দুই একটা জিনিস কিনিয়া আনিলাম। চারুচন্দ্র চাকুরী পাইয়া রামপুরহাটে চলিয়া গিয়াছেন। মশারী, কাপড়-চোপড়, যেখানে যাহা হাতে পাইয়াছেন, লইয়া গিয়াছেন। ঝী-মহাশয়া মশারীর জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার শয়ন-সুখ-সাধনোদ্দেশে একটা মশারী আজ্ঞামাত্র আনিয়া দিলাম।—সন্ধ্যার পর প্রিয়বর নবকৃষ্ণকে লইয়া খানিকটা সময় নানারূপ কথোপকথনে আনন্দে অতিবাহিত করিলাম। চৈত্র মাসের "সাহিত্যে" পরলোকগত কবি বাবু রাজকৃষ্ণ রায় সম্বন্ধে যে কয়েকটা অন্যায় কথা লিখিত হইয়াছে, তিনি তাহার উল্লেখ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন। বাস্তবিক সম্পাদক * * এইরূপ অসাবধানতার দ্বারা মাঝে মাঝে অনেকের মনে ক্লেশ দিয়া থাকেন। সাহিত্যের লেখক মহাশয় বলিতেছেন, কবির কাব্যের ন্যায় তাঁহার জীবনীতেও লোকের অধিকার আছে। ইহা নিতান্ত ভ্রম। কবি কাব্য প্রকাশ করেন বলিয়াই, তাহাতে লোকের অধিকার জন্মে। এ অধিকার কবি কর্ত্তৃকই প্রদত্ত। কিন্তু, তিনি যদি তাঁহার জীবন-সম্পর্কীয় private ঘটনাগুলি সাধারণকে দিতে অসম্মত হন, তাহাতে লোকের কি স্বত্ব আছে? লেখক মহাশয় সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কয়েকটি মিথ্যা বা অনিশ্চিত কথার অবতারণা করিয়া বড়ই অবিবেচনা এবং নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন।

১১ই বৈশাখ। সময়াভাবে পড়াশুনা কিছুই করিতে পারিতেছি

না। ছুটীর দিবসগুলা কলিকাতায় কাটিয়া যায়। সেখানে কোন প্রকার অধ্যয়নের সুবিধা হইয়া উঠে না। একটা সুদীর্ঘ সপ্তাহ কর্ম্মস্থলে বন্দিবৎ কাটাইবার উপযোগী শক্তি এবং উৎসাহসঞ্চয়ের জন্য একটু আধটু আমোদ-আহ্লাদে যোগ না দিলেও চলে না। তার পর, এখানে আসিয়া সময় অতি অল্পই পাইয়া থাকি। আজি কালি সেই সামান্য সময়টুকু "মেঘমালা"র গল্প-রচনায় অতিবাহিত হইতেছে। গল্পটি শেষ না হইলে আর স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন-আলোচনায় মন দিতে পারিতেছি না। সময় সম্বন্ধে আমাদের প্রিয়কবি রবীন্দ্রনাথ বাবু খুব সৌভাগ্যশালী। কবি-জীবন যাপন করিতে হইলে, কাব্য লিখিয়া লোকের মনোহরণ করিতে হইলে যে অসীম সাধনার আবশ্যক, তাহার অবসর রবীন্দ্র বাবুর ত যথেষ্ট। আর একটা বিষয়েও তাঁহার খুব সুবিধা। উদরান্নের নিমিত্ত রাত্রিদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয় না। তিনি সম্প্রতি যে কাজ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়নিহিত শক্তিসমূহ-পরিস্ফুটনের বিশেষ সুবিধাই হইয়াছে। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, নানাবিধ লোকের সহিত মিশিয়া, তিনি মনুষ্য-হৃদয়ের বৈচিত্র্য চর্চ্চা করিবার বেশ অবকাশ পাইয়াছেন। বাহ্য ও অন্তর্জগত দুই-ই তাঁহার সহায়। তিনি কবি হইতে না পারিলে আর কে হইবে? কাব্য-সমুদ্রের অভ্যন্তরে রত্ন-সংগ্রহার্থ তিনিই প্রবেশলাভ করিতে পাইয়াছেন। আমরা কেবল তীরে দাঁড়াইয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।

১২ই বৈশাখ। ডাক্তার Blair প্রণীত Rhetoric পাঠ করিতেছি। আজ সকালে Metapher নামক পরিচ্ছেদটি শেষ করিয়াছি। সেক্ষপীয়র অনেক সময় উৎপ্রেক্ষায় গোলমাল করিয়া ফেলেন, ইহা দেখাইবার জন্য অধ্যাপক মহাশয় মহাকবির Tempest হইতে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"The charm dissolves apace,
And as the morning *steals* upon the night,
Melting the darkness, as their rising senses
Begin to *chase* the *ignorant fumes* that *mantle*
Their clearer reason."

ডাক্তার সাহেব বলিতেছেন,—"So many ill-assorted things are here Joined, that the mind can see nothing clearly." এই কথার প্রমাণস্বরূপ নিম্নরেখ* শব্দগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। দুই একটা কথার মধ্যে কতকটা

* আমরা 'ইটালীক' করিয়া দিলাম।—সাহিত্য-সম্পাদক।

বিসংবাদ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে অর্থগ্রহের কোনও বাধাই ত হইতেছে না। আলোকের প্রকাশে অন্ধকার যেমন দ্রবীভূত হইয়া ক্রমশঃ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি জ্ঞানের প্রকাশ হইলে অজ্ঞানরাশিও দূরীভূত হয়। ইহাতে আমার মনে ত বেশ একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়া গেল। সেক্ষপীয়রের অনবধানতার সমর্থন করিতেছি না। আমি কেবল ডাক্তার সাহেবের উপরি-উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতেছি। Blair অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক; তাঁহার অতি-সাবধানতা মার্জ্জনীয়। কিন্তু, আমাদের দেশে কোনও কোনও সাহিত্য-সম্পাদক যেরূপ ভাষাগত সমালোচনার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠেন, তাহা নিন্দার্হ।

১৩ই বৈশাখ। ভ্রাতৃবধূ মহাশয়া আক্ষেপ করেন যে, সমস্ত সপ্তাহটা আমি কোন্নগরে বসিয়া থাকি, পঞ্চুরামের কোনও খবর লই না। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত এবং আপনার হৃদয়ের ঔৎসুক্য-নিবারণের জন্য, আর কতকটা কর্ত্তব্যবোধেও বটে, অদ্য ২-৩০ মিনিটের গাড়ীতে কলিকাতায় আসিলাম। দেখিলাম, পঞ্চুরাম ভাল আছে। দিনের বেলা তাহার শরীরটা একটু কেমন গরম হয়। কিন্তু তাহা বোধ হয় গ্রীষ্মজনিত, কিংবা সে হয় ত —র প্রকৃতিটি পাইয়াছে। * * * এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে যাতায়াত বড়ই কষ্টকর। অর্থাভাবে সকল সময়ে গাড়ীভাড়া করিতে পারি না। পদদ্বয়ের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু কি করিব, কর্ত্তব্য ত পালন করিতেই হইবে। ছোটদাদা মহাশয়কে দেনার টাকা দিব বলিয়া, বাবাকে এ মাসে ১০৲ দশ টাকা কম পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাকেও দিতে পারিলাম না। ন—— ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১০৲ ধার লইয়াছেন বটে। তাহা হাতে আসিলেও যে ছোটদাদার দেনা দিতে পারিব, এমন ত বোধ হয় না। মাসকাবার হইবার এখনও কয়েক দিবস বাকী আছে। পকেট প্রায় শূন্য হইয়া আসিল। টাকাগুলা যে কোন দিক দিয়া কিরূপে খরচ হইয়া যাইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারি না।

১৪ই বৈশাখ। দুই চারি জন খৃষ্টান ভদ্রলোক স্কুলগৃহে সন্ধ্যার সময় ৮টা হইতে ৪—৩০ মিনিট পর্য্যন্ত কয়েকটি বেশ সুন্দর সুন্দর magic দেখাইলেন। একবার সাহেব কতকগুলি কাগজ খাইয়া ফেলিলেন। তার পর খাইতে খাইতে অবশেষে মুখের ভিতর হইতে হাতীর দাঁতের মতন দুইটা লম্বা (কাগজেরই বোধ হয়) ছড়ী বাহির করিলেন। সর্ব্বশেষের কৌশলটি বিস্ময়কর। দুই জন ছাত্র সাহেবকে একখানি চেয়ারের সহিত মনের মতন দড়ীর দ্বারা হস্ত-

পদাদি সমেত বন্ধন করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বা পশ্চাতে কোনও লোকজনও নাই, দেখা গেল। চেয়ারের নিম্নে সাহেব দুই একটা টুপী রাখিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে দেখা গেল, রকম রকম টুপী সাহেবের মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে! অবশেষে সাহেব নিজে বন্ধনমুক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। প্রখর গ্রীষ্মে এত অধিক পরিশ্রম করিয়া সাহেব যে কিছু লাভ করিতে পারিলেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এ দিকে লাভ নাই বটে; কিন্তু টিকিট অনেকগুলি ব্যয় করিতে হইয়াছিল। মাষ্টার মহশয়েরা ত আছেনই। তার উপর অবৈতনিক ছাত্রেরা আসিয়া আবদার করাতে, তাহাদেরও বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইল।

১৫ই বৈশাখ। "রাজা ও রাণী"র অধিকাংশ চরিত্রই কতকটা রহস্যময়। যেন আগাগোড়া সঙ্গতি নাই। প্রথমে বিক্রমদেবের চরিত্র ধরা যাক। বিক্রমদেব বিলাসপরায়ণ বটে। প্রেমের গাম্ভীর্য্যের অপেক্ষা উদ্দামতাই তাঁহাতে বেশী বর্ত্তমান। প্রকৃত প্রেম যে কর্ম্মাত্মক ও বুদ্ধিবৃত্তিমূলক, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না। তিনি উহাকে কেবল ক্রিয়াহীন ভোগের অবস্থা বলিয়াই জ্ঞান করেন। এরূপ চরিত্রের বিপরিবর্ত্তন দেখাইতে হইলে উহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতে হয়। কবিও তাহা করিয়াছেন। আবার মাঝে মাঝে তাঁহার হৃদয়ে যে পুরাতনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে, কবি তাহাও দেখাইয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু কবিকে অবশেষে একটু ভ্রান্ত দেখিতে পাই। কবি বিক্রমকে আবার "নব প্রেমে"র জন্য ক্ষেপাইয়া তুলিলেন কেন? ইলার প্রতি বিক্রমের প্রেমটা নিতান্ত ইতরজনোচিত হইয়াছে। বিক্রমকে ইতর করা বোধ হয় কবির উদ্দেশ্য নহে। আবার যখন বিক্রম শুনিলেন যে, ইলা অন্যের প্রতি আসক্তা, অমনি তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া পুনর্ব্বার সেই পুরাতনের পশ্চাতে ছুটিলেন। বিক্রমচরিত্রে এরূপ চাঞ্চল্যের কিছুতেই সামঞ্জস্য হয় না। যে ছিল কেবল স্বপ্নময় আর চিন্তাময়, কবি তাহার পরিণাম শক্তিময় আর কর্ম্মময় করিতে পারেন। ইহাতেই বিক্রমের জয়। অথবা, তাহাকে কেবল ঘটনা-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, কবি তাহার পরাজয়ও দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু আমরা বিক্রমকে অব্যবস্থিত চিত্ত দেখিবার আশা করি নাই। কুমারসেনের চিত্রও এইরূপ অসঙ্গত। বাহুবল ও প্রেমবলের আধার বীর কুমারসেনের মুণ্ডটা যে আমরা অবশেষে একটা থালের উপর আম জামের 'তত্ত্বের' ন্যায় দেখিব, এমন আশা করি নাই। আর সুমিত্রা যে শেষে ভ্রাতৃহত্যারূপ একটা মহাপাপ করিবে, ইহাও নিতান্ত অস্বাভা-

বিক ও অনাবশ্যক। নাটক লিখিতে হইলে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির প্রয়োজন। রবীন্দ্র বাবু আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার চরিত্রগুলিতে তাঁহাকেই ছদ্মবেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬ই বৈশাখ। ৯—৩০ গাড়ীতে যাত্রা করিয়া আজ প্রায় ১১টার সময় কলিকাতায় আসিলাম। চৈতন্য-লাইব্রেরী কর্ত্তৃক আহূত বঙ্কিমচন্দ্রের শোক-সভায় যোগ দিবার জন্য বৈকালে ষ্টার-থিয়েটার-গৃহে উপস্থিত হইলাম। সভাস্থলে উপস্থিত হইতে আমার প্রায় ৫—৩০ বাজিয়া গেল। তখন রজনী বাবুর বক্তৃতা শেষ হইয়া রবীন্দ্রবাবুর রচনা-পাঠ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে নিতান্ত স্থানাভাব। সুতরাং বাহিরে কখনও বেঞ্চের উপর বসিয়া, কখনও দুই এক জন বন্ধুর সহিত গল্প করিয়া, কখন বা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটু-আধটু শুনিবার চেষ্টা করিয়া, সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে অক্ষয়বাবু আসিলেন। তিনি ভিতরে না যাইয়া ছাড়িলেন না। গ্যালারীর সর্ব্বশেষ বেঞ্চের উপর কষ্টে স্রষ্টে একটুকু আসন করিয়া লইলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রায় এক ঘণ্টা কাল চলিল। আমি বক্তৃতা শুনি নাই, সুতরাং সে বিষয়ে আজ কিছুই লিখিতে পারিলাম না। সু—চন্দ্র হস্তলিপিখানা লইয়া আসিয়াছেন। আর "সাধনা"তেও ছাপা হইতেছে। পরে পাঠ করিয়া তাহার আলোচনা করিব। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা পাঠ করিবার কায়দা আছে। সুরটি বেশ মিষ্ট। তার উপর আবার সুন্দর চেহারার সম্মিলন। ইহাতে যে অনেকটা কাজ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

১৭ই বৈশাখ। দেশ হইতে আমাদের অনুগত ও প্রিয় কবিরাজ যুবকের বিবাহার্থ সাহায্য-প্রার্থনার জন্য তাহার মা ও ভ্রাতা আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমার হাতে কিছুই নাই। কিছু দেওয়াও কর্ত্তব্য। সুতরাং সু—চন্দ্রের নিকট সকালবেলা উঠিয়াই চলিলাম। তাঁহারও পকেট শূন্য। দুই এক জায়গায় চেষ্টা করিয়াও পাইলেন না। তখন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া অখিলের মাতার নিকট হইতে পাঁচ টাকা লইয়া উহাদিগকে দিলাম। তাঁহারা খুসী হইয়া গেলেন। অখিলের মাকে শনিবার টাকা পরিশোধের কথা বলিয়াছি। সন্ধ্যার পর হীরেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাতের জন্য অক্ষয়বাবু, চুণীভায়া ও সামন্ত মহাশয়ের সহিত যাত্রা করিলাম। অক্ষয়বাবু প্রথমতঃ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে দেখিয়া আসিবার কথা বলিলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম না। কিন্তু তাঁহাদের সহিত যত যাই, রাস্তা আর ফুরায় না, সুতরাং

বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট দূর হইতে বিদায় লইয়া আমি একা হীরেনের গৃহে প্রবেশ করিলাম। হীরেন্দ্রনাথ বাটীতে নাই। তাঁহার ঘরে কবিরাজ মহাশয় বসিয়াছিলেন। তাঁহারই সহিত দুই চারিটা আলাপ করিতে করিতে নরেন্দ্রবাবু ও পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হীরেনের দেখা নাই। শুনিলাম, সভা, ভোজের নিমন্ত্রণ, একবারে অনেক কাজ সারিতে হইবে। তাই আর বেশী অপেক্ষা না করিয়া সে গৃহ ত্যাগ করিলাম।

১৮ই বৈশাখ। কি বিষম গ্রীষ্মই পড়িয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তার উপর আমার আবার ভীষণ সর্দ্দী। মাথাটায় বিষম ব্যথা। নাক দিয়া অনবরত সর্দ্দী নির্গত হইতেছে। বড় কষ্টই পাইতেছি। অক্ষয়বাবু কাল "মেঘমালা"র নিমিত্ত তাগাদা করিতেছিলেন। মনে করিয়াছিলাম, আগামী শনিবার সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিব। কিন্তু শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সে আশা সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। এক একবার বড় ভয় হয়। মনে হয়, এখন যেন কেবল একটা কষ্টকল্পনা করিয়া লিখিতে হইতেছে। আগে যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত রচনা করিতে পারিতাম, এখন আর সেরূপ হয় না। তবে ইহা সতর্কতার এবং সাবধানতার ফলও হইতে পারে। যাহাই হউক, পুস্তকখানি শেষ করিয়া প্রচারিত করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছি।

পঞ্চুরামের সর্দ্দী হইবার উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি। মাঝে মাঝে খুক্-খুক্ করিয়া কাসিতেছে। গ্রীষ্মের জন্য ঘরের ভিতর থাকিতে চাহে না। কেবল বাহিরে বেড়াইবার জন্য ব্যস্ত। বোধ হয়, সকাল সন্ধ্যা, যখন, তখন, এইরূপ অনাবৃত গাত্রে বাতাস লাগাইবার জন্যই এইরূপ হইয়াছে। তাহার জন্য চিন্তিত রহিয়াছি; সংবাদ দিবার জন্য অখিলকে বলিয়া আসিয়াছি। গ্রীষ্মের অবকাশের নিমিত্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। শরীরটা বড়ই খারাপ তাহার উপর দারুণ গরম। কাজ কর্ম্মে আর মন যায় না। কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া একটু শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারিলে, এ দেহ বুঝি আর বেশী দিন বহিবে না। তাই শনিবারের আগমনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি। শনি-বার স্কুলের ছুটী হইবে। সপ্তাহখানেক কোন্নগরে থাকি, তাহাতেই মনে ভয় হয়, ইতিমধ্যে যদি তাহার কোন প্রকার অসুবিধা বা অসুখ হইয়া উঠে! কে তাহার তত্ত্বাবধান করিবে? তা ছাড়া তাহাকে যত্ন ও আদর করিয়া দুই এক দিনে তৃপ্তি হয় না। ছুটীর এক মাস ধরিয়া ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাহাকে দেখিতে

পাইব, তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিসমূহের উন্নতি দেখিতে পাইব, এই কথা মনে মনে চিন্তা করিয়াও হৃদয় আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। এ বারে তাহাকে ছাড়িয়া আসিবার সময়ে সে আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই। তবুও তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। সে হয় ত মনে মনে কত কষ্ট পাইয়াছে।

১৯শে বৈশাখ। কবিবর নবীনচন্দ্র বলেন, কৃষ্ণ-চরিত্রের মহত্ত্ব বর্ত্তমান সময়ে তিনিই সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়াছিলেন। হীরেন্দ্র বাবুও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া "সাহিত্যে" এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। হীরেনের প্রবন্ধ পাঠ করিলে নবীন বাবুর কথাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান আবশ্যক। ১২৮১ সালের চৈত্র-সংখ্যা "বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্র "প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহের" সমালোচনা উপলক্ষে যে "কৃষ্ণ-চরিত্র" প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহার এক স্থলে লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষের ঐক্য তাঁহার (কৃষ্ণের) উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে খণ্ডে এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন, যে, এই সসাগরা ভারত একছত্রাধীন না হইলে ভারতের শক্তি নাই; শক্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাই; উন্নতি নাই। * * কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পরে নিহিত হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। ইহারই পৌরাণিক নাম পৃথিবীর ভারমোচন।" আমাদের এখন বোধ হইতেছে, কৃষ্ণের মহত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়েই প্রথমে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহার মত ক্রমশঃ উন্নত ও মার্জ্জিত হইয়াছে। তিনি এই প্রবন্ধে কৃষ্ণকে ক্রূরকর্ম্মা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু পরিণামে তাঁহাকে সকল মহত্ত্বের আধার আদর্শ মনুষ্য, এমন কি ঈশ্বরাবতার পর্য্যন্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

২০শে বৈশাখ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চন্দ্রশেখর উপন্যাসে স্বপ্নাবস্থায় শৈবলিনীর নরক-দর্শন-বর্ণনায় কি আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন! মহাকবি সেক্ষপীয়র Lady Macbethএর প্রায়শ্চিত্ত যেরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা তদপেক্ষা হীন নহে। যখন পিশাচেরা শৈবলিনীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিবে বলিয়া অতি ঊর্দ্ধ হইতেও ঊর্দ্ধতর লোকে লইয়া যাইতেছে, তখনকার সেই বর্ণনা পাঠ করিলে, আর শৈবলিনী যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে, তখন-

কার সেই অদ্ভুত চিত্র কল্পনা করিলে, আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়। অন্তরাত্মা নিবিড়, অতি ভীষণ অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা শব্দশাস্ত্রের উপর কেমন অপূর্ব্ব আধিপত্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মনে হয়, কোনও কথার নিমিত্ত তাঁহাকে যেন কখনও অপেক্ষা করিতে হয় নাই; তাঁহার ইচ্ছানুসারে লেখনী যেন, আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বেই, অনুরক্তা দাসীর ন্যায় বাক্যগুলিকে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। যে সকল লেখকের তাদৃশ প্রতিভা নাই, একটা সামান্য ভাবপ্রকাশের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কতই সাধ্যসাধনা করিতে হয়। কিন্তু মানবহৃদয়ের এমন কোনও বৃত্তি নাই, মানব-কল্পনার এমন কোনও লীলা নাই, যাহা বঙ্কিমের ভাষায় সহজেই পরিস্ফুট না হইয়াছে।

২২শে বৈশাখ। কাল শনিবার ছুটী হইবে। এক মাস এখন আর এই কর্ত্তব্যরূপ কারাগারে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে না। কাল হইতে বহুদিন-প্রত্যাশিত সংবৎসরের সাধ সেই গ্রীষ্মাবকাশের আরম্ভ। একবার শৈশবকালের সেই আনন্দ-উৎফুল্ল-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিবার বাসনা হইতেছে—ছুটী! ছুটী!! ছুটী!!! প্রত্যেক শনিবার ২টার সময় তাড়াতাড়ি করিয়া আর ষ্টেশনাভিমুখে দৌড়াইতে হইবে না। গাড়ী আসিতে বিলম্ব হইলে, সেইরূপ দূরবর্ত্তী সিগ্‌নালের দিকে যাইয়া, নিষ্ঠুর রেলওয়ে কোম্পানীর উপর অভিসম্পাত প্রদান করিতে হইবে না। তার পর হাবড়ায় নামিয়া, কোনও দিন শ্রান্তি বা ঔৎসুক্যের আধিক্যবশতঃ অশ্বযানে, আবার কোনও দিন বা অর্থের অপ্রতুল প্রযুক্ত পদব্রজে, দারুণ-রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে, কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর সভ্য মিউনিসিপ্যালিটির ধূলায় অঙ্গ ধূসরিত করিতে করিতে, অর্দ্ধমৃতপ্রায় বাদুড়-বাগানের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে না। আবার দেড়টা দিবস, কখন ফুরায়,—কখন ফুরায়, এই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, নিমিষের ন্যায় কাটাইয়া দিয়া, সোমবার দিন সকালে সেইরূপ দুই একখানি কাপড় কি পুস্তক হস্তে করিয়া, গলদ্‌ঘর্ম্মশরীরে হাবড়ায় গাড়ীর ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিতে হইবে না। এক মাস কাল—সুদীর্ঘ এক মাস—আমি স্বাধীন। আমি কত প্রকারে, কত শত শত উপায়ে, আপনাকে আপনি উপভোগ করিব—কত গান গাহিব—কত খেলা খেলিব—কত নাচ নাচিব—

"—Merrily, merrily shall I sing now
Under the hawthorn that hangs on the bough."

২৩শে বৈশাখ। "পুরোহিত" মাসিকপত্রিকার ফাল্গুন-সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা প্রকাশিত হইয়াছে। দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের পরবর্ত্তী ও নূতন সংস্করণে জলনিমজ্জনে আত্মঘাতী গোবিন্দলালকে আবার বাঁচাইয়া দিয়াছেন। লেখক ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন,—"বঙ্কিম বাবু গোবিন্দলালকে কেন পুনর্জীবিত করিলেন, তাহার কিছু নিশ্চয় নাই। ...... এত দূর যদি করিলেন, তবে ভ্রমরের জীবনদান করিতে কি ক্ষতি ছিল?" ভ্রমরের জীবনদানে ক্ষতি অনেক, তাহা এক কথায় বুঝাইবার নহে। তবু একটা কথা বলিয়া রাখি যে, তাহাতে কাব্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। কিন্তু কবি গোবিন্দলালকে কেন বাঁচাইলেন, এ কথা জিজ্ঞাসার যোগ্য বটে। তিনি যে দৃশ্যে গোবিন্দলালের আত্মবিনাশ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বড়ই গম্ভীর ও মহান্। আমরা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি যে, ইহাই বর্ত্তমান কাব্যের সঙ্গত, প্রকৃত উপসংহার। গোবিন্দলালের পরিণাম দেখিয়া আমরা ভীত হই। ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রতি একটা বিজাতীয় বিরাগ জন্মে। সুতরাং কাব্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বলিয়া, পাপীর পাপের দণ্ড দেখিলাম বলিয়া, আমরা আনন্দিত হইয়া উঠি। গোবিন্দলালের দুঃখে আমাদের প্রাণে সহানুভূতির উদয় হয় না, এমন কথা বলিতেছি না। তাঁহার পরিণামদর্শনে আমাদের প্রাণ বাস্তবিকই কাঁদিয়া উঠে। ইহা ত কাব্যের একটা উদ্দেশ্য। কিন্তু গোবিন্দলালের পুনর্জীবনলাভে এ সকল উদ্দেশ্যের কিছুই ত সিদ্ধ হইল না। সুতরাং আমার মতে বঙ্কিমচন্দ্রের এ পরিবর্ত্তন ভাল হয় নাই।

২৪শে বৈশাখ। "সাধনা"য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। লেখক বাঙ্গালীর অকৃতজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া, বিদ্যাসাগর রাজেন্দ্রলালের কোনরূপ স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। তার পর রামমোহন যে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত করেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র আপনার অসীম প্রতিভার সাহায্যে কিরূপ সৌন্দর্য্য এবং সম্পূর্ণতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতি উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের যে বিশালতা, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই কীর্ত্তি। তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আদর্শের সাহায্য পান নাই। নিজেরই হৃদয়-মন্দিরে মাতৃভাষার যে অভীপ্সিত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন, আজীবন তাহারই প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এই আদর্শপ্রতিষ্ঠার্থ তাঁহাকে লেখক ও সমালোচক উভয়েরই আসন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এক হস্তে

মাতৃসম মাতৃভাষার সুবর্ণমন্দিরপ্রতিষ্ঠাপনার্থ অমূল্য উপাদান সকল সংগ্রহ করিতেছেন, অপর হস্তে আবর্জ্জনারাশি দূরীকৃত করিতেছেন। শাস্ত্র ও যুক্তির কিরূপে সমন্বয় করিতে হয়, বঙ্কিমই তাহার প্রকৃত আদর্শ দেখাইয়াছেন। ইত্যাকার বহুবিধ কথার সুন্দর আলোচনায় প্রবন্ধটি বেশ মনোরম হইয়াছে। সেদিনকার সভার রবীন্দ্রই মান রাখিয়াছিলেন; নহিলে কেবল রজনীগুপ্ত মহাশয়ের উপর নির্ভর করিলে শ্রোতৃবৃন্দকে বড়ই নিরাশ হইতে হইত।

২৫শে বৈশাখ। সকালে পঞ্চুরামের আদর। আহারের পর ১২—৩০ মিনিটের সময় সু—চন্দ্রের বাটীতে গমন। সু—চন্দ্র গৃহে অনুপস্থিত; সুতরাং কাগজ পড়িতে পড়িতে নিদ্রার আয়োজন। এইরূপে তিনটা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। তা'র পর আপনার কুটীরে আসিয়া shelleyর Revolt of Islam পাঠ। অপরাহ্ণ ছয়টার পর হী—নাথের সহিত সাক্ষাৎ। দেখিলাম, তাঁহার বিবিধ সাজসজ্জায় বিভূষিত অপেক্ষা প্রপীড়িত গৃহমধ্যে একটা তাকিয়ার উপর তাঁহার কোট-পেণ্টুলুনধারী ব্যারিষ্টার খুল্লশ্বশুর মহাশয় আড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পশ্চাতে এবং পার্শ্বে দুইটি বালক,—তাঁহার পুত্র হইলেও হইতে পারে। সন্দেহভঞ্জনের তেমন প্রয়োজন দেখিলাম না। হী—নাথ যে আমাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি বেশী লক্ষ্য করেন নাই, ইহা তাঁহার বিশেষ সুশিক্ষা এবং বন্ধুপ্রীতির ফল বলিতে হইবে। ঘণ্টা খানেক বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। কাব্য-সাহিত্য বিষয়ে নানা কথাবার্ত্তা হইল। "সাহিত্যে"র "সহযোগী সাহিত্য" প্রবন্ধ এবার হীরেন্দ্রের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সু—র সহিত বিবিধ ঘরের কথায় অতিবাহিত হইল।

মৃগলুব্ধ।

এই প্রাচীন পুঁথিতে শিবমাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। দীনেশ বাবু বলেন, "হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে বোধ হয় শৈবধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম শির উত্তোলন করে। স্বীয় পূজা-প্রচারের জন্য চণ্ডী ও বিষহরির দিনে শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়া মনে হয়। দু একখানা প্রাচীন পুঁথিই শৈবধর্ম্মের ভগ্নকীর্ত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। এই সকল পুঁথি (মৃগলুব্ধ প্রভৃতি) শৈবধর্ম্মের প্রাবল্যসময়ে লিখিত। উক্ত ধর্ম্ম শাক্ত ও

বৈষ্ণব ধর্ম্মের আড়ালে পড়িয়া যাওয়াতে শিব-গীতির আর বিকাশ হইতে পারে নাই।” সুতরাং এতদ্বিষয়ে যে অল্পসংখ্যক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে আমাদের বিশেষ আদরের সামগ্রী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সর্ব্বপ্রথম কে মৃগলুব্ধের * উপাখ্যানটির কল্পনা করেন, তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। এই উপাখ্যান রতিদেব কর্ত্তৃক বিরচিত হইবার পর পুনশ্চ রঘুরাম রায় সেই প্রসঙ্গে কাব্য-রচনা করেন। সমালোচ্য কাব্য ভিন্ন আরও একখানি এই নামধেয় পুঁথির আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। এই চারিখানি গ্রন্থই সেই মৃগলুব্ধের উপাখ্যানমূলক ;—শিব-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক জয়ধ্বজাস্বরূপ বর্ত্তমান। এখন এই গ্রন্থচতুষ্টয়ের রচনা-কাল ও তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারিত করিতে পারিলে, বঙ্গভাষায় উক্ত আখ্যানের আদি প্রবর্ত্তক কে, তাহা সহজেই বলিতে পারা যায়। কিন্তু গ্রন্থগুলি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত সে চেষ্টা দুঃসাধ্য হইয়া থাকিবে।

সমালোচ্য গ্রন্থের রচয়িতার নাম রামরাজা। নিম্নে কয়েকটি ভণিতি উদ্ধৃত করা গেল ;—

(১) শঙ্কর-কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ।
মৃগলুব্ধ গাইল প্রথম অধ্যায়॥

(২) শঙ্কর-চরণে, আনন্দ কবিএ মনে,
ভক্ত লোক তরিতে বাখান।
গাইল রামরাজে, মৃগীর বিলাপ কাজে,
মৃগলুব্ধ সম্বাদ কথন।

(৩) শঙ্কর-কিঙ্কর রামরাজা ভণে।
দ্বিতীয় অধ্যায় নরক লক্ষণে॥

(৪) হরষিত হইয়া রামরাজা গাএ।
ব্যাধের গমন শুনি তৃতীয় অধ্যায়॥

এই গ্রন্থের অপর একখানি প্রতিলিপিতে একটি ভণিতি-স্থলে ‘শ্যাম রায়’ নাম পরিদৃষ্ট হয়। পদ মিলাইবার অনুরোধে দুই এক স্থানে ‘রামরাজা’র পরিবর্ত্তে ‘রাম রায়’ পাঠও দেখিতেছি। উক্ত ‘শ্যাম রায়’ ভণিতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমরা সহজেই উপেক্ষা করিতে পারি, আর ‘রাম রায়’কে ‘রাম রাজা’ নামের রূপান্তরজ্ঞানে অভিন্ন বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু রামরাজা

* শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ভ্রমক্রমে ‘মৃগলুব্ধ’ স্থলে তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র ‘মৃগলব্ধ’ নাম প্রচারিত করিয়াছেন।—লেখক।

কে? তিনি কি প্রকৃতই 'রাজা', না 'রাজা' কেবল 'রায়' শব্দের দ্যোতক পদ-বিশেষমাত্র?

এই গ্রন্থে শিবচতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্যবর্ণনচ্ছলে এক মৃগ ও লুব্ধের (ব্যাধের) কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সেই গল্পটি কোনও সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া সহজেই মনে হয়। প্রাচীন কবিগণ অগাধ সংস্কৃতসাহিত্যসমুদ্র মন্থন না করিয়া কোনও স্বতন্ত্র পথের পথিক হইতে পারিতেন, ইহা বোধ হয় তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। তাহা হইলে আর শাস্ত্রীয় আখ্যানগুলি পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত হইতে হইতে এরূপ অস্থি-সার হইয়া উঠিত না। এ পর্য্যন্ত বক্ষ্যমাণ উপাখ্যানেরও চারিটি বঙ্গীয় কবিমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই উপাখ্যান-সরোজের মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আরও কত 'গৌড়ীয়জন' যে মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কে বলিবে? এই গল্পটিতে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বহু কথার অবতারণা আছে। তাহা হইলে কি হয়, মৃগীর মত জন্তুর মুখে ধর্ম্মের কাহিনী শুনিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না! মৃগীর মুখে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া তাহাকে ছদ্মবেশী ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া বারংবার আমাদের ভ্রম হইয়াছিল!

দীনেশ বাবুর মতে, শৈবধর্ম্মের প্রাবল্যসময়ে এই শ্রেণীর গ্রন্থরাজির প্রচার হয়। সুতরাং এই পুঁথিখানি যে বহু প্রাচীন, তাহাতে সংশয় নাই। ইহাতে রচনাকালের কোনও উল্লেখ নাই; প্রতিলিপির তারিখ ১১৯২ মঘী ৩১শে ভাদ্র। সে আজ ১২৩ বৎসরের কথা। এ সময়ের বহু পূর্ব্বেই যে পুঁথিখানি বিরচিত, তাহা বলাই বাহুল্য। রতিদেব-কৃত 'মৃগলুব্ধে'র রচনাকালটি এই,—

"রস অঙ্ক বধি শশী শাকের সময়।
তুলা মাস সপ্তবিংশ শুক্র বাসরএ॥"

অর্থাৎ, ('অঙ্কস্য বামা গতিঃ' সূত্রানুসারে'), ১২১৬ কি ১২১৯ শকাব্দ, ২৭শে কার্ত্তিক, শুক্র বাসর: অতএব বলা যাইতে পারে, রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' ৬০৬ কি ৬০৯ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। আমাদের অনুমান, আলোচ্য পুঁথিখানি তদপেক্ষাও প্রাচীন। শৈবধর্ম্মের প্রাচুর্ভাবকাল স্মরণ করিলে উক্ত মতের সমীচীনতায় সন্দেহের অবসর থাকে না। এতদুভয় গ্রন্থের ভাষার আলোচনা করিলেও এ বিষয়ের তথ্য নিরূপিত হইতে পারে।

এমন প্রাচীন গ্রন্থে রচনা-সৌন্দর্য্য দেখিতে যাওয়া এ যুগে দুরাশামাত্র। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে, শিক্ষা ও রুচির তারতম্যবশতঃ, সেকালের রচনাপ্রণালী বর্ত্তমানের নব্য প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল, তাহা ত না বলিলেও চলে।

অনুরাগাঞ্জন চক্ষে দিয়া না দেখিলে এ সব প্রাচীন গ্রন্থের অগ্নি-সংকারের ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই করা যাইত না। কিন্তু কেবল সৌন্দর্য্য-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্যই কাব্য-কলার সৃষ্টি হয় নাই। বিশেষতঃ, প্রাচীন গ্রন্থের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য আমরা তত লালায়িত নহি।

সমালোচ্য গ্রন্থের রচনার পদ্ধতি অতীব প্রাচীন বোধ হয়। সেই প্রাচীনতার নিদর্শন আমরা পরে দিব। রতিদেব-রচিত মৃগলুব্ধ অপেক্ষা ইহাকে আমরা অধিকতর প্রাচীন বলিয়াছি। রতিদেব অনেক কথা ফেনাইয়া তুলিয়াছেন, রামরাজা কিন্তু তাহাই সংক্ষেপে সারিয়াছেন। রতিদেবের রচনা প্রায় সরল ও বিশুদ্ধ; রামরাজার রচনা একটু জটিল ও অস্পষ্ট। এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিলেই দেখা যায়, যেন এক কবি অপর কবির চিত্ররেখার উপর রং ফলাইয়াছেন। অনেক স্থলে রচনায় সাদৃশ্য আছে, অনেক স্থল অনুকরণ বলিয়াও বোধ হয়। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, রতিদেব রামরাজার গ্রন্থ দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তবে এরূপ সাদৃশ্য ও অনুকরণ-চিহ্ন বিদ্যমান বলি কেন? তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, এই উভয় কবিই কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন। যাহা হউক, রতিদেবের গ্রন্থ রামরাজার গ্রন্থের পরের রচনা, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। তুলনার জন্য আমরা উভয় গ্রন্থ হইতেই কয়েকটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

অএ প্রভু শুন কহি সানন্দিত মনে।
কহিব উত্তম কথা শুন সাবধানে॥
মুনিপত্নী কহিলেন আহ্মার স্থানএ।
যে কথা কহিল চিত্রকূট পর্ব্বতএ॥
মৃগের ব্যাধের এক অপূর্ব্ব কথন।
কহিমু তোহ্মাতে কথা শুন দিয়া মন॥
রুক্মিণীর এ সকল শুনিআ উত্তর।
জিজ্ঞাসিলা পুনি তবে হস্তিনা-ঈশ্বর॥
যেই কথা কহিলা তুহ্মি কুট পর্ব্বতএ।
কোন দেশে চিত্রকূট পর্ব্বত আছএ॥—রামরাজা।

আহ্মি কিবা কথা জানি কি কৈমু তোহ্মাত।
শুনিআছি এক কথা শুন প্রাণনাথ॥
যে কথা শুনিছি এক মুনিপত্নীমুখে।
সেই কথা কৈমু আহ্মি পরম কৌতুকে॥

ভুবনবিখ্যাত চিত্রকূট পর্ব্বতএ।
অতি বড় পুণ্যস্থল মুনির আলয়॥
পুনি বোলে নরপতি রুক্মিণীর পাশ।
কাহার সৃজন পর্ব্বত বৈসে কোন দেশ॥
কহিবা সে সব কথা মোর বিদ্যমান।
মুনিপত্নী কি কৈছে কহ মোর স্থান॥—রতিদেব।

(২)

শুনিয়া ব্যাধের বাক্য যম মহাশয়।
সেই বর দিয়া গেলা আপনার আলয়॥
তবে হরসিত হইয়া ব্যাধ মহাশয়।
পুনি আর জাল আর পাতিল বনএ॥
ঘরেত চলিল ব্যাধ হরসিতমনে।
সত্বরে মিলিল গিয়া আপনার স্থানে॥
ব্যাধ মাংস না নিল ব্যাধিনী নৈরাশ।
বসিল ব্যাধের পাশে এড়িয়া নিশ্বাস॥
ভার্য্যাএ বিনয় করি বুলিল বচন।
কালি কেনে না আইলা রহিলা কি কারণ॥
শীতে ভাতে বড় বৃষ্টি হইল বহুতর।
কেমতে আছিলা কালী বনের ভিতর॥
সিংহ ব্যাঘ্র হোতে প্রভু কেমতে এড়াইলা।
ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ প্রভু বড় দুঃখ পাইলা॥—রামরাজা।

*   *   *   *   *   *

এবমস্তু বোলি যম, চলি গেলো নিজাশ্রম,
রতিদেবে রচিল লাচারি॥

তপনের তাপে ব্যাধ শীত গেল দূর।
বর পাইআ ব্যাধ-মনে হরিষ প্রচুর॥
শীতে ভাতে যত দুঃখ পাএ দুষ্টমতি।
সর্ব্ব দুঃখ দূরে গেলো হরসিত মতি॥
যার যে স্বভাবধর্ম্ম কভু নহি ছাড়ে।
অঙ্গার ধবল নহে পাখালিলে ক্ষীরে॥*
কঠিন জনের চিত্ত কভু নহি ভাল।
সেই বনে পুনর্ব্বার ব্যাধে পাতে জাল॥

---

*ধর্ম্মহীন ব্যাধ পাপী মতি নহি এড়ে।
অঙ্গার শতধৌত মলিন নহি ছাড়ে॥ রামরাজা।

জাল পাতি ঘরে গেলো ব্যাধ পরিবার।
পন্থ নিরখিআ রৈছে পুত্র পরিবার॥
ব্যাধের রমণী যদি ব্যাধেরে দেখিলো।
পুত্র কন্যা সমে ঘরে আগু বাড়ি নিলো॥
ঘরে না আসিলা বাপু শিশু সবে বোলে।
উপবাসী ছিলাম মোরা কালুকা বিকালে
প্রণামিআ বসাইলো ব্যাধের রমণী।
জল দিআ পাখালিলো চরণ দুইখানি॥
স্বামী প্রণমিআ বোলে মধুরস বাণী।
কালু কোথা ছিলা প্রভু না আসিলা কেনে॥
শিলা বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত ঘোরতর নিশি।
কেমতে আছিলা প্রভু বনে উপবাসী॥
সিংহ ব্যাঘ্র মৈষ ভয় এ ঘোর কানন।
আহ্মি সবের ভাগ্যে প্রভু রহিছে জীবন॥—রতিদেব।

আর উদ্ধৃত করিবার প্রযোজন নাই। ফলতঃ, এই দুই গ্রন্থের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। রামরাজার অপেক্ষা রতিদেবের গ্রন্থের ভাষা যে অপেক্ষাকৃত সুসংস্কৃত, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশসমূহ হইতে প্রতীয়মান হইবে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশসমূহের ভাষার প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ জন্মিতে পারে। তাহার নিরসন-কল্পে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, যে পুঁথির লেখা যত প্রাচীন, সে পুঁথির ভাষাও তত প্রাচীন হইয়া থাকে, প্রাচীন সাহিত্যিকমাত্রই তাহা অবগত আছেন। পুঁথিগুলি প্রতিলিখিত হইবার সময়ে ভাষার বরাবরই সংস্কার সাধিত হইয়া আসিয়াছে, ইহার প্রমাণ-প্রদর্শন এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। সমালোচ্য গ্রন্থের ভাগ্যেও এই দশা ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, ১০০।১৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পাণ্ডুলিপির সাহায্যে ৬০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনার সম্যক পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার অবসর উপস্থিত। সমালোচ্য গ্রন্থে—

(১) অনেক স্থলেই যতিভঙ্গ দোষ দেখা যায়।

(২) কোন কোন স্থলে পয়ার ছন্দে ১৭।১৮ অক্ষর পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) আমি, তুমি, আমা, আমরা, তোমরা ইত্যাদি সর্ব্বনাম শব্দগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই আহ্মি, তুহ্মি, আহ্মা, আহ্মারা, তোহ্মারা রূপে ব্যবহৃত।

(৪) উত্তমপুরুষে নামপুরুষের ক্রিয়ার ব্যবহার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়।

(৫) কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহারও সেইরূপ।

(৬) সপ্তমী বিভক্তির 'এ'কার, যুক্ত না করিয়া, বিযুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার এত প্রয়োগ আমি আর কোথাও দেখিয়াছি, মনে পড়ে না। রতিদেবেও ইহার ব্যবহার আছে; কিন্তু তত অধিক নহে। দৃষ্টান্ত যথা,—

সত্বরে মিলিল গিআ বিন্ধ্য পর্ব্বতএ।
লুকাইআ রহিল গিআ গাছের আলয়॥

(৭) মারন্তি, লয়ন্তি প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ব্যবহারও অল্প নহে। যথা,—

(ক) লক্ষ লক্ষ প্রাণী সবে করে হাহাকার।
উপরে মারন্তি দূতে দারুণ প্রহার॥

(খ) প্রাণি লয়ন্তি দন্তে কামড়াইআ কারে।
মৈষে চিরি শিঙ্গে কারে ভ্রমাইআ পাকাড়ে॥

(৮) চাহসি, করসি প্রভৃতি ক্রিয়ারও বহুল প্রয়োগ আছে। তাহার দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

(৯) অকারান্ত শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'এ'র স্থলে অনেক স্থানে 'য়' ব্যবহৃত হয়। যথা,—

ব্যাধের গমন শুনি তৃতীয় অধ্যায়।

(১০) উত্তমপুরুষে করিমু, লইমু ইত্যাদি ক্রিয়া সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত প্রাচীন শব্দগুলির ব্যবহার পাওয়া গিয়াছে; যথা,— কাকালি বা কেকালি, লড়, একেশ্বর, ফাফর, রাও, বেলি (বেলা), দেহি (দেয়), পরিকর (পরিবার), উভাধড়া, ঠাঠার, কথা (কোথা), নানান (নানা), কভো (কভু), পরিহার ('বিনয়' অর্থে), বাপু, ভেস (বেশ), পেলাএ (ফেলায়) ইত্যাদি।

(ক) 'হে' অর্থে 'হের' পদের প্রয়োগ এ গ্রন্থেও আছে; যথা,—

অরে প্রিয়া শুন হের মধুর বচন।

(খ) উত্তমপুরুষে অতীত কালের ক্রিয়ায় 'হারাইলু' বা 'হারাইলুম' প্রযুক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

(গ) অনুজ্ঞা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলিতে অন্তে 'ও' এবং 'য়' স্থলে 'অ' ও 'আ' ব্যবহৃত। যথাঃ—যাইঅ, যাইআ, ইত্যাদি।

(ঘ) পঞ্চমী বিভক্তিতে 'তুন'এর ব্যবহার দেখা যায়; যথা,—

প্রাণতুন অধিক বড়, দুর্ল্লভ যে স্বামী মোর,
বন্দী হইল তোহ্মার জালএ।

'এ' বিভক্তির ব্যবহার চট্টগ্রামে অদ্যাবধি খুবই আছে।

বলিতে ভুলিয়াছি, এই গ্রন্থখানি আকারে রতিদেবের গ্রন্থের ⅓ অংশের সমান হইবে। উভয় গ্রন্থেরই আকার তত বড় নহে। আমরা যে আর এক-খানি গ্রন্থের প্রাপ্তি-সংবাদের উল্লেখ করিয়াছি, সেই পুঁথিখানি অতি ক্ষুদ্র;—উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের ⅓ অংশ সমান হইতে পারে। তাহা এই দুই গ্রন্থ অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। আজ সে পুঁথি নিকটে নাই বলিয়া কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। সে গ্রন্থের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি যে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বা অনুকৃতি, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতাগুলিতে উল্লিখিত ১ম, ২য় ইত্যাদি অধ্যায়-বিভাগেও বুঝা যাইতেছে।

রতিদেব ত খাস চট্টগ্রামীই বটেন,—নিবাস পটীয়া থানার নিকটবর্ত্তী সুচক্রদণ্ডী গ্রামে (এই প্রবন্ধ-লেখকের জন্মভূমিতে)। রামরাজার জন্মস্থানও কি এখানে নহে? পূর্ব্বে যে সকল প্রাচীন শব্দ ও নিয়মাদি দেখাইয়া আসিয়াছি, তাহার প্রায় সমস্তই চট্টগ্রামে আজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চট্টগ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তেমন বিস্তার হয় নাই। শৈবধর্ম্মের প্রভাব এ প্রদেশে কিছু অধিক বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীআবদুল করিম।

নবকৃষ্ণের জীবনচরিত ও নন্দকুমার।

ঘোষ সাহেবের দ্বিতীয় কথা এই যে, কতকগুলি আধুনিক বঙ্গীয় লেখক নন্দকুমারকে একটি মহাপুরুষ করিয়া তুলিয়াছেন, এবং তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়া-ছেন যে, হেষ্টিংস চক্রান্ত করিয়া ইম্পে সাহেবের দ্বারা নন্দকুমারকে বৈচারিক হত্যার (Judicial murder) বলিস্থানীয় করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখনভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, যেন এই তত্ত্বটি আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণের মস্তিষ্কপ্রসূত। কারণ, তিনি এ সম্বন্ধে কোন ইংরাজ লেখকের কথা উল্লেখ করেন নাই; তজ্জন্য কেবল বাঙ্গালী লেখকদিগকে দায়ী করিয়াছেন। নন্দকুমার hero বা মহাপুরুষ ইহা বাঙ্গালী লেখকগণের কল্পিত কথা নহে। ঐ কথা বার্ক প্রভৃতি মনীষিগণ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, তাহা বাঙ্গালী লেখকগণের মস্তিষ্কপ্রসূত উক্তি নহে, সে উক্তি

হৃদয়বান্ ইংরাজের আন্তরিক বাণী। বার্ক বলিয়াছেন, "The character here given of him is that of an excellent patriot." বার্ক তাঁহাকে "Great Rajah Nandacoomar" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বেভারিজ সাহেব প্রভৃতিরও ঐরূপ মত। বাঙ্গালী লেখকগণের অপরাধ যে, তাঁহারা এই সকল উদারহৃদয় ইংরাজের উক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, বঙ্গদেশে নন্দকুমার সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল, বাঙ্গালী লেখকগণও তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় খাতের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ঘোষ সাহেব সাধারণ বঙ্গবাসীর হৃদয়ের কথা জানিবার অবকাশ পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আবার হেষ্টিংস যে ইম্পে সাহেবের সাহায্যে নন্দকুমারের হত্যা সম্পাদন করাইয়াছিলেন, ইহাও কি আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের মস্তিষ্কপ্রসূত? আর কেহ কি এ বিষয়ে কোন কথাই পূর্ব্বে প্রকাশ করেন নাই? ঘোষ সাহেব কি এ সমস্ত কথা অবগত নহেন? এক্ষণে আমরা ঐ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখকগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, ইহা কেবল বাঙ্গালী লেখকগণের উক্তি নহে। নন্দকুমারের হত্যার এক দিন পরে কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য ফ্রান্সিস সাহেব মান্দ্রাজ নগরে কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—

"Francis to sir Edward Hughes at Madras August 7. 1775. The death of Rajah Nundkumar, will probably surprise you. He was found guilty of a forgery committed seven or eight years ago: Condemned, executed on saturday last. My brother-in-law in virtue of his office, was obliged to attend him, Through every part of the ceremony he behaved himself with the utmost dignities and composure and met his fate with an appearance of resolution, that approached to indifference. Strange judgments, I fancy will be formed of this event in England. Whether he was guilty or not of the crime laid to his charge, *I believe no man here has a doubt that, if he had never stood forth in politics his other offences would not have hurt him.* This is a delicate subject, and rather open to speculation than discussion."

নন্দকুমারের মৃত্যুসময়ে লোকের মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহা

ফ্রান্সিস ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে তিনি হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ঘোষ সাহেবের নিকট তাঁহার উক্তি অগ্রাহ্য হইতে পারে। আমরা কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করি না। তাহার পর ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত Transactions in India নামক গ্রন্থে কিরূপ লিখিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। গ্রন্থখানি হেষ্টিংসের বিচারারম্ভের পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—

"Circumstances were implicated in this transaction, which roused and interested the feelings and attention of all considerate persons in both countries. A man of illustrious rank and distinction, suffering death for a crime not capital by the laws under which he lived, and punished in this manner, only in consequence of a foreign and posterior institution; the commencement of the prosecution at the critical moment when Nandacumar stood forward to convict the Governor-General of the most abandoned prostitution of the authority, under which he filled the highest situation in the patronage of the company, the extreme unrelenting rigour with which the process was carried on, in direct violation of all those regards and decencies which the remotest antiquity, and universal usage, had rendered, the violent eagerness of Mr. Hastings, and his partizans to expose, to blacken, to criminate, and even to execute and vilify the character of an individual, thus hapless and degraded; and the gross profusion of foul intemperate language which stamps every apology which has yet been offered for these proceedings, are premises on which few competent and impartial judges would be apt to conclude, that in this *political trial* no species of sympathy subsisted between the Governor-General and the Supreme Court. Justice the suttle security of property and life, when impartially administered, was in this instance

converted into a dastardly engine of tyranny."—Transactions in India pp 246-48.

তাহার পর বার্কের এ বিষয়ে কি রূপ মত, তাহা তাঁহার Impeachment of Warren Hastings নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। হেষ্টিংসের বিচারে এই বিষয় সম্বন্ধে অন্যান্য মনীষীর মত Debrett's History of the Trial of Warren Hastings, Minutes of Evidence of Hasting's trial প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ আছে। তাহার পর মিল বলিতেছেন,—

"No transaction, perhaps, of this whole administration more deeply tainted the reputation of Hastings, than the tragedy of Nundcumar. At the moment when he stood forth as the accuser of the Governor-General, he was charged with a crime, alleged to have been committed five years before; tried, and executed; a proceeding which could not fail to generate the suspicion of guilt, and of an inability to encounter to weight of his testimoney, in the man whose power to have prevented, or to have stopped (if he did not cause) the prosecution; it is not easy to deny.

"The severest censures were very generally passed upon this trial and execution, and it was afterwards exhibited as matter of impeachment against both Mr. Hastings and the Judge who presided in the tribunal"–Mill's History of British India. Vol III.

উইলিয়ম উইলবারফোর্সেরও ঐরূপ মত। তাহার পর মেকলে বলিতেছেন,—

"On a sudden, Calcutta was astounded by the news that Nundcomar had been taken up on a charge of felony, Committed and thrown into the common goal. The crime imputed to him was that six years before he had forged a bond. The ostensible prosecutor was a native. But it was then, and still is, the opinion of every body, idiots and biographers excepted, *that Hastings was the real mover in the business.*"

"Of Impey's conduct it is impossible to speak too severely. We have already said that, in our opinion, he acted unjustly to respite Nundcomar. *No rational man can doubt that he took this course in order to gratify the Covernor-General.* If we had ever had any doubts on that point, they would have been dispelled by a letter which Mr. Gleig has published. Hastings, three or four years later, described Impey as the man 'to whose support he was at one time indebted for the safety of his fortune, honour, and reputation.' These strong words can refer only to the Case of Nundcomar, and they must mean *that Impey hanged Nundcomar in order to support Hastings.* It is therefore, our deliberate opinion that Impey, sitting as a judge, put a man unjustly to death in order to serve a political purpose."—Essay on Warren Hastings.

Memoirs of Sir Philip Francis প্রণেতা Merivale বলিতেছেন,—

"Yet when Hastings, through Sir Elijah Impey, the Chief Justice, took Nundcomar's life by way of reply, Francis seems to have been paralysed by their determination. This Judicial murder—for such it undoubtedly was—does not appear noted in his correspondence with any of that bitter indignation which was accustomed to lavish on for less flagrant subject."—Vol. II., Page 35.

বেভারিজ সাহেব তাঁহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন,—The Trial of Maharaja Nundakumar, A Narrative of a Judicial Murder, এবং তাঁহার তৃতীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ের তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"That there is strong circumstantial evidence that Hastings was the real prosecutor." তাঁহার গ্রন্থে তিনি নানা প্রমাণ প্রয়োগের সহিত ইহা প্রতিপন্নও করিয়াছেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ওয়ালস্ সাহেবের মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের কথা

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আবার এ স্থলেও তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে।

"Personally I think with Mr. Beveridge that the execution of Nundakumar was grave miscarriage of justice."—Walsh's History of Murshidhabad District.

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই অগষ্ট তারিখে মহারাজ নন্দকুমারের হত্যা সম্পাদিত হয়। উক্ত অব্দের ৭ই অগষ্ট তারিখের পত্র হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ লেখকগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা সাধারণের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কি আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের মস্তিষ্কপ্রসূত যে, হেষ্টিংস ইম্পের সাহায্যে মহারাজের হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করাইয়াছিলেন? যে সমস্ত ন্যায়পর নিরপেক্ষ ইংরাজ লেখকগণ সাহসসহকারে এ কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, ঘোষ সাহেব তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সাহসী না হইয়া কেবল যে আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণকে আপনার লক্ষ্যস্থানীয় করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী লেখকগণ সেই সমস্ত নিরপেক্ষ ইংরাজ লেখকগণের উক্তির প্রচার করিয়াছেন মাত্র। ইহা যে তাঁহাদের পক্ষে একটি গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এবং ঘোষ সাহেব যে পরিশেষে তাঁহাদিগকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আহ্বান করিবেন, তাহাও তাঁহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশলাভ করে নাই। হেষ্টিংস যে ইম্পের সাহায্যে নন্দকুমারকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছিলেন, ইহা জলন্ত সত্য, এবং নন্দকুমারের মৃত্যু হইতে আজ পর্য্যন্ত সাধারণেরও সেইরূপ বিশ্বাস। মেকলের উক্তি-অনুসারে কেবল নির্ব্বোধ ও জীবনবৃত্ত-লেখকগণ সেই সাধারণের গণ্ডীর বহির্ভূত। ঘোষ সাহেব যে শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। জীবনবৃত্ত-লেখক না হইলে বিচক্ষণ ঘোষ সাহেবের নিকট হইতে বোধ হয় আমরা ঐরূপ মন্তব্য শুনিতে পাইতাম না।

ক্রমশঃ।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

কীর্ত্তন।

বাহির কর্‌ছি খবর-কাগজ এবার একখান নতুন রকম দাদা !
তার, একটি পাতা রইবে লেখা, আর একটি পাতা র'বে সাদা !

অন্য খবর-কাগজ পড়েই ফেলে দিতে হয়, কোনও কাজেই লাগে না। কিন্তু এ কাগজ সে রকম নয়। এর সাদা পাতায় চিঠি লেখা, বাজারের হিসাব রাখা, ধোপার হিসাব রাখা, পদ্য লেখা—সব চলবে। চাই কি,—

এর, জড় করে' সাদা পাতায়
যদি ইচ্ছা হয় ত বাঁধো খাতায়,
ইচ্ছা হয় ত বিক্রয় করো, কেহ দিবেনাক বাধা !

২

আবার যে পাতাটা লেখা, তা'তে অন্য কোনও উপকার হোক না হোক, তা গৃহস্থের অনেক কাজে লাগবে। কাগজ অনেকখানি দেবো, ভাঁজ করে' কিংবা ভাঁজ না করেও অনেক কাজ চল্‌বে। যেমন, উনোনে আগুণ জ্বালা, আবর্জ্জনা সাফ করা, ডুগডুগি তৈরী করা, ওজোন হিসাবে বিক্রয় করা,—সব চল্‌বে। উপরন্তু—

তা, নাড়লে গ্রীষ্মে হবে হাওয়া,
ত, পাড়্‌লে হবে লুচি খাওয়া,
মাথায় দিলে হবে টুপী, মুড়্‌লে হবে জুতো বাঁধা।

৩

তবে সে কাগজটা সাহিত্যিক হিসাবেও যে বড় কম যাবে, তা নয়। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি থিয়েটারনীতি, কি সুনীতি, কি কুনীতি, সব বিষয়েরই চর্চ্চা তাতে থাক্‌বে। আমরা বিপুল ব্যয়ে বহু পরিশ্রমে এই পত্রিকার জন্য অমানুষীপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে এর লেখকপদে অভিষিক্ত করেছি। সকলের নাম দিতে গেলে আমাদের handbillএ কুলোয় না। তবে গুটিকতকের নাম করি,—

হনুমানের সঙ্গে সর্ত্ত—
লিখিবেন ভাগবতের অর্থ,
মর্কট লিখবেন কৃষিতত্ত্ব, অর্থনীতি লিখবেন গাধা

তার উপর আবার ভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তি এ কাগজে রীতিমত সংবাদ পাঠাবেন বলে' প্রতিশ্রুত হয়েছেন। আমেরিকা, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা (উত্তর ও দক্ষিণ), নিউজীলণ্ড, সুমাত্রা ও দক্ষিণ 'পোল্'এ যে দেশের আবিষ্কার হব-হব হয়েছে—সে দেশ, এক কথায় স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সব জায়গায় special correspondent যোগাড় করেছি। কত নাম কর্‌ব ? তবে দু' এক জনের নাম করি,—

শুনুন, সে কাগজে লিখবে কে কে,—
লুলু কামস্কট্‌কা থেকে,
সিংহল থেকে মন্দোদরী,— বৃন্দাবন থেকে রাধা !

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

"ক্লাইবের গর্দ্দভ"।

মীরজাফর ইংরাজের জন্য চিরকলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়াও ইংরাজের ইতিহাসে "ক্লাইবের গর্দ্দভ" বলিয়া উপহসিত হইয়াছেন। তাঁহার এই অকীর্ত্তিকর উপাধি কিন্তু ইংরাজ-দত্ত নহে। মীরজা সমসের উদ্দীন নামক তাঁহার এক জন পরিহাস-রসিক স্পষ্টভাষী বাল্যসহচর ছিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত একদা ক্লাইবের "গোরা লোকের" বচসা হইয়াছিল। সে কথা মীরজাফরের কর্ণগোচর হয়। মীরজাফর ক্লাইবের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য সর্ব্বদা এরূপ তটস্থ থাকিতেন যে, তিনি এই সামান্য কারণেই মীরজা সাহেবের উপর কুপিত হইয়া প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলেন,—"তুমি কি এখনও কর্ণেল সাহেবের পদমর্য্যাদা অবগত হও নাই ? তাঁহার বন্ধুগণের এরূপ অপমান করিতে সাহসী হইয়াছ কেন ?" মীরজা তৎক্ষণাৎ বিনয়াবনত রাজভৃত্যের ন্যায় কৃত্রিম কাতরতাপ্রদর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি কথা ? আপনি আমার প্রতিপালক ! আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ক্লাইবের গর্দ্দভকেই তিনবার করিয়া যথারীতি সেলাম করিয়া থাকি, আমি কি কর্ণেল সাহেবের মুখের দিকে দৃঢ়নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহস পাই ?" * এই সূত্রে মীরজাফরের অভিনব উপাধি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল !

---

* "Meer Jaffer reproved him, saying, 'know you not the rank of the

মীরজা সাহেব ব্যঙ্গচ্ছলে মীরজাফরকে যে অকীর্ত্তিকর উপাধি দান করিয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিকসত্যানুসন্ধাননিপুণ সাহিত্যসেবকগণ সত্যের অনুরোধে তাহাই মীরজাফরের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া লোকসমাজে ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।* গৃহস্থের গর্দ্দভ যেমন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নানাবিধ ভারবহন করিয়া, দিনান্তে তৃণোদক ভিন্ন আর কিছুই উপভোগ করিতে পায় না; ইংরাজের ভারবহন করিতে গিয়া, বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াও, মীরজাফর সেইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে লাগিল! মীরজাফরের অদৃষ্টবিড়ম্বনা তাঁহার স্বকৃতব্যাধি বলিয়া,—কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী,—কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিল না!

সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনরক্ষার্থ রাজকোষের অধিকাংশ ধনরত্ন অপাত্রে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন; মীরজাফর যাহা কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, ইংরাজের ঋণপরিশোধ করিতেই তাহা ফুরাইয়া গেল;—সেনাদল বেতন না পাইয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল; রাষ্ট্রবিপ্লবে কাহার ভাগ্যে কিরূপ দণ্ড পুরস্কার বিতরিত হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে ভয়ে অনেকেই আত্ম-স্বার্থরক্ষার্থ অনেক অকার্য্য কুকার্য্য করিতে লাগিল সুতরাং মীরজাফরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ ক্লাইবকে কিছু দিনের জন্য সসৈন্যে রাজধানীতে অবস্থান করিতে হইল।—এই সকল ও অন্যান্য অনেক কারণে ইংরাজেরাই সিংহাসনের মালিক হইয়া উঠিলেন। ইতিপূর্ব্বে কেহ ইংরাজদিগকে মুরশিদাবাদে গতিবিধি করিতে দেখিত না; কালে ভদ্রে কেহ বাণিজ্যাধিকারলাভের জন্য রাজধানীতে উপনীত হইলেও, কত সন্তর্পণে, কত সতর্ক পাদবিক্ষেপে, মোগলের রাজপথে পদার্পণ করিত! পলাশির যুদ্ধাবসানে তাহারাই কি না মুরশিদাবাদের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল! † লোকের আর অপরাধ কি? তাহারা দেখিল যে, ইংরাজেরাই

Colonel, that your people should dare to insult any of his friends?' The Mirza, putting on a look of submission, exclaimed, 'my patron, how dare I even look the Colonel in the face with steadiness, who every morning of my life, make three obeisances to his *ass*!—"Scotts' History of Bengal, p. 376.

* Mills' History of British India, vol. III.

† Before the capture of Calcutta. no Englishman appeared at Murshedabad, except as supplicants for trading privileges. Since the battle

প্রভু--মীরজাফর তাঁহাদের দাসানুদাস। সুতরাং তাহারা স্বার্থরক্ষার্থ ক্লাইবের মনস্তুষ্টির জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।* প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমান অমাত্য ওমরাহেরা পর্য্যন্ত ক্লাইবের কৃপা-কটাক্ষের ভিখারী হইয়া ইংরাজের পদমর্য্যাদা সহসা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন!

লোকে মীরজাফরের অদৃষ্টবিড়ম্বনায় সমুচিত সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলেও, আপনার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে মীরজাফরের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তখন "পাশা হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে!" তিনি আত্মাবস্থা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর পাইয়াও তাহার প্রতিকার করিবার অবসর পাইলেন না! সন্ধিপত্রের অঙ্গীকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া ইংরাজের নিকট "চোর" হইলেন। অনেকে বলিতে লাগিল যে, মীরজাফর নবকৃষ্ণ মুন্সীর মন্ত্রণাবলে গুপ্তধনাগারের বহুমূল্য রত্নরাশি অপহরণ করিয়া ইংরাজদিগকে প্রতারণা করিয়াছেন! † সিপাহীদিগের পূর্ব্ববেতন পরিশোধ করিতে না পারিয়া, মীরজাফর আত্মভৃত্যবর্গের নিকট বিশ্বাস-ঘাতক শঠ প্রবঞ্চক বলিয়া প্রতিভাত হইলেন; তাহাদের ভয়ে ধনমানজীবনরক্ষার্থ ইংরাজসেনার কণ্ঠলগ্ন হইয়া উঠিলেন! যে সকল মুসলমান আত্মীয় অন্তরঙ্গ এতদিন প্রাণপণে তাঁহার সিংহাসনলাভের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এখন অবসর পাইয়া কেহ পূর্ণিয়ার ফৌজদারী,—কেহ পাটনার নবাবী,--কেহ বা মুরশিদাবাদের দেওয়ানী প্রভৃতি যথাযোগ্য "রাজপদে মন্ত্রিপদে" প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ‡ হিন্দু অমাত্যবর্গ তাহার সন্ধান পাইয়া আত্মাধিকার-রক্ষার্থ ক্লাইবের শরণাগত হইলেন! ইংরাজেরা যখন সন্ধিসূত্রে

---

of Plassey, the English were lords and masters.—Early Records of British India, p. 263.

* For the moment, the grandees at Murshedabad regarded Clive as the symbol of power, the arbiter of fate, the type of omnipotence, who could protect or destroy at will. One and all were eager to propitiate Clive with presents; such has been the instinct of Orientals from the remotest antiquity.—Early Records of British India, p. 261.

† It is also well known that besides this treasury, there existed another in the Harem, which fact Meer Jaffier concealed from Col. Clive, at the instigation of the Dewan and Colonels' Munshi.—Tarikh-i-Mansuri.

‡ Mutakherin.

কলিকাতার জমীদারী লিখাইয়া লইলেন, তখন, মীরজাফরকে স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া সনন্দে লিখাইয়া দিতে হইল যে,—"এতদ্দ্বারা চাক্‌লে হুগলীর জমীন্দার বর্গ, চৌধুরীবর্গ প্রভৃতি হরিয়েক ভূম্যধিকারিবর্গকে জানান যাইতেছে যে, তোমরা অদ্য হইতে কোম্পানীর শাসনাধীন হইলে;—তাঁহারা ভাল মন্দ যেরূপ আচরণ করুন না কেন, তোমরা তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লইবে, ইহাই আমার বিশেষ রাজাজ্ঞা!" * জগৎশেঠের লাভের পথে কণ্টকরোপণ করিয়া, ইংরাজদিগকে কলিকাতায় টঙ্কশালা সংস্থাপন করিবার সনন্দ প্রদান করিতে হইল।† খোজা বাজিদের লাভজনক সোরার ব্যবসায় উৎখাত করিয়া ইংরাজদিগকেই বেহারের সোরার ব্যবসায়ে একাধিপত্য প্রদান করিতে হইল।‡ উপযুক্ত অবসরলাভ করিয়া, ইংরাজ-বণিক সদর্পে বাণিজ্যবিস্তারে অগ্রসর হইলেন।§ নানারূপে মীরজাফরের অর্থ শোষণ পূর্ব্বক রাজকোষ শূন্য করিয়াও, তাঁহাদের ক্ষুৎক্ষাম দামোদর পূর্ণ হইল না; লবঙ্গের ব্যবসায়, পান সুপারীর ব্যবসায়,—যাহাতে দেশের লোকের দু' পয়সা উপার্জ্জনের পথ দেখিতে পাইলেন,—সেই ব্যবসায়মাত্রই ইংরাজদিগের অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল!‖ সিংহা-

---

* Know then, Ye Zamindars &c, that Ye are dependents of the Company, and that Ye *must* submit to such treatment, as they give you, *whether good or bad*, and this is my express injunction.—Perwanah for the granted lands.

† A Mint has been established in Calcutta, continue coining gold and silver into Siccas and Mohurs, of the same weight and standard with those of Murshedabad : the impression to be *Calcutta*; they shall pass current in the Provinces of Bengal, Behar and Orissa, and be received into the Cadjana : *there shall be no obstruction or difficulty for Kussoor.*—Perwanah for the Mint.

‡ At this time, through the means of Col. Clive, the Salt-peter lands of the whole province of Behar have been granted to the English company, * * * in the room of Coja Mahomed Wazeed.—Perwanah for the Saltpeter of Behar.

§ Orme, II., 189.

‖ As it is the nature of man to err with great changes of fortune, many, not content with the undisputed advantages accruing from the

সনে পদার্পণ করিবার "এক মাসের" মধ্যেই মীরজাফরকে এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে হইল; কিন্তু তাঁহার অভিযোগ কেবল আকুল আর্ত্তনাদ ও অরণ্যরোদনে পরিণত হইল। তাহাতে রোগের কারণ নষ্ট হইল না; বরং ইহা হইতেই ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল! *

দেশের লোকের অন্নরক্ষার্থ ইংরাজবণিকের স্বাধীন বাণিজ্যের গতিরোধ করিতে গিয়াই যে সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, সে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। "যাঁহারা সিরাজদ্দৌলার উচ্ছৃঙ্খলতায় এবং শাসনকার্য্যে অসহিষ্ণু হইয়া আশা করিয়াছিলেন যে, মীরজাফর হয় ত বর্ষীয়ান আলিবর্দ্দীর দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়াই প্রজাপালন করিবেন, তাঁহারও মীরজাফর ও মীরণের অসচ্চরিত্রতায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া সিরাজদ্দৌলার কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।"† দেশের দশা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল!

ইংরাজেরা মীরজাফরের দুর্দ্দশার কারণ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কল্যাণসাধনের জন্য উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিলেন। রাজকোষের অর্থহীনতাই যে সকল দুর্দ্দশার মূল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখনও পূর্ণিয়া ও বিহার প্রদেশ মীরজাফরের হস্তগত হয় নাই; তাহা হস্তগত করিতে না

---

revolution, immediately began to trade in Salt, and other articles, which had hitherto been prohibited to all Europeans.—Ibid.

* Meer Jaffier complained of these encroachments within a month after his accession, which although checked for the present, were afterwards renewed, and at last produced much more mischief than even disinterested sagacity could have foreseen.—Ibid.

† The greatest number of the principal people of the Provinces, disgusted with the bad qualities and tyranny of the late Nawab, had been pleased at his disposal, judging, that as Meer Jaffir was advanced in years and had long served Mohubut Jung, he would follow his example; but upon his accessian to power, experiencing his behaviour, and more particularly the cruel actions of his son Meerun, a Monster of his time, they now regretted the fall of Seraj-ad-Dowla, and the old saying of "Bless our Former Ruler", was renewed in the tongues of the wise and the simple.—Scott's History of Bengal p. 379—80.

জানি কত অর্থব্যয় ও কত সেনাক্ষয় করিতে হইবে! এ সময়ে রিক্তহস্তে সিংহাসন রক্ষা করা যে কত কঠিন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল। সুচতুর ক্লাইব উপযুক্ত অবসর লাভ করিয়া মীরজাফরকে বুঝাইতে বসিলেন,—"সেনাবিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়বাহুল্য; আমরাই যখন সিংহাসনরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর বহুসংখ্যক সিপাহী পুষিবার প্রয়োজন কি? অর্দ্ধেক সিপাহী বরখাস্ত করা হউক।" * ব্যয়সংক্ষেপের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর সরল উপায় কি হইতে পারে? কিন্তু মীরজাফর ভাবিলেন যে, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে করতলগত করিবার জন্যই সুচতুর ক্লাইব এইরূপ আপাতরম্য সদুপদেশ বিতরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন! তিনি ক্লাইবের উপদেশ অবহেলা করিতেও সাহস পাইলেন না, গ্রহণ করিতেও অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার এইরূপ আচরণের কারণ কি, সে কথা কিন্তু সকলেই বুঝিয়া ফেলিল। মীরজাফর যে আত্মাপরাধের পরিণামচিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন, তিনি যে বন্ধু বলিয়া পরম শত্রুকে স্বগৃহের প্রবেশদ্বার দেখাইয়া দিয়া, এখন বন্ধুবরকে কোনরূপে তাড়িত করিবার জন্যই সমধিক লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন,—ইংরাজেরা তাহা আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়া ফেলিলেন!* এই সূত্রে মীরজাফর ও ক্লাইব, এই উভয় বন্ধুর মধ্যে মনোভঙ্গের উপক্রম হইল। মৌখিক আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি রহিল না; কিন্তু উভয়েই আত্মগোপন করিয়া স্বকীয় অভীষ্টসাধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মীরজাফর কি কৌশলে সন্ধিপত্রের অবশিষ্ট দায়িত্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন, তাহার জন্য নানারূপ অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহা বুঝিতে পারিয়া কর্ণেল ক্লাইবও আত্মপক্ষ প্রবল করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সে আয়োজন তাঁহাকে নূতন করিয়া শিখিতে হইল না। কি কৌশলে সিরাজদ্দৌলার ন্যায় প্রবলপ্রতাপ তেজস্বী ভূপতিকে এত সহজে

---

* In vain did Colonel Clive represent to him that, instead of drawing his treasury for keeping such an immense army on foot, he had better dismiss one half of them, and rely on the English.—Scrafton.

† No sooner was Meer Jaffir advanced to the Subahship, then he began to feel his own strength; and to look on us rather as rivals than allies, and his first thoughts were, how to check our power and evade the execution of the treaty.—Scrafton.

ভূপাতিত করিয়াছিলেন, ক্লাইব তাহা মীরজাফরের নিকটেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন "গুরুদক্ষিণা" দিবার অবসর উপস্থিত হইল! তখন রাজভক্তি, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিরক্ষণ—এই সকল উচ্চভাবে অল্প লোকেই পরিচালিত হইতেন; সকলেই আত্মস্বার্থরক্ষার্থ পরস্পরের গলায় ছুরী বসাইয়া দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। পাত্রমিত্রগণের এইরূপ চরিত্রহীনতার ছিদ্রলাভ করিয়া, ক্লাইব তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি বাধাইয়া দিয়া এক দলের কর্ত্তা হইয়া বসিলেন।* তখন মীরজাফরের গুপ্তমন্ত্রণার প্রত্যেক কথা ক্লাইবের কর্ণগোচর হইবার সুবিধা হইল;—গৃহভেদী বিভীষণগণের যত্নানুরাগে ইংরাজের নবোদ্গত রাজশক্তি মীরজাফরকে উত্তরোত্তর পদবিদলিত করিবার অবসর লাভ করিল। মীরজাফর দেখিলেন যে,—তাঁহার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে! এত করিয়া যে রাজসিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছেন, যাহার জন্য দয়াধর্ম্ম কর্ত্তব্যবুদ্ধি স্নেহ মমতা অতল সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া ইস্লামের নামে কলঙ্কলেপন করিয়াছেন, প্রিয়পুত্র মীরণের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া ভগবানের পুণ্যনামে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই, সেই সিংহাসন পদতলগত। কিন্তু হায়! তথাপি সিংহাসনারূঢ় "সুজা-উল্ মোলক্ হাসামোদ্দৌলা-মীর-মহম্মদ-জাফর আলি-খাঁ-বাহাদুর-মহবৎজঙ্গ" বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব নহেন;—তিনি কেবল কর্ণেল ক্লাইবের স্নেহানুপালিত ইঙ্গিতানুচালিত তৃণোদকপুষ্ট ভারবহনক্লিষ্ট কঙ্কালাবশিষ্ট দুরদৃষ্ট গর্দ্দভ।

শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্র।

---

* (Meer Jaffir) formed his plan quite differently and seemed to think himself sufficiently powerful to dispute the remainder of the treaty; and to this he bent all his future politics:—the natural consequence of which was, that we were necessitated to strengthen ourselves, by forming a party in his own court to be a continual check upon him; a matter by no means difficult, in a country where loyalty and gratitude are virtues almost unknown.—Scrafton.

সহযোগী সাহিত্য।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

বদরিকাশ্রম।

যে দৃশ্যবৈচিত্র্যমনোরম আশ্রম ভারতগৌরব ঋষিগণের বেদগানে প্রতিধ্বনিত ও পবিত্র হইত; সর্ব্বপ্রথম যেখানে মুনিগণের জ্ঞানপ্রদীপ্ত হৃদয়ে অমৃতময়ী ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল, যেখানে বসিয়া পুণ্যপ্রাণ মনীষিগণ উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, বহুবেণীবিলোলা গঙ্গা যেখানে অলকনন্দা মন্দাকিনী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আবর্ত্তে উৎসের প্রপাতে ও প্রবাহাকারে গাহিয়া গর্জ্জিয়া দিগ্‌দিগন্ত অপূর্ব্ব সঙ্গীতে নিনাদিত করিতেছে, যে আশ্রম ব্যাস বশিষ্ঠ শঙ্করাদির স্মৃতিতে পবিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ নারদের পদাঙ্কপূত;—সম্প্রতি রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথ মহোদয় নভেম্বর মাসের "ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রিকায় সেই বদরিকাশ্রমের একটি রমণীয় ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সাহিত্যের পাঠকদিগের জন্য নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদান করিলাম।

আলমোরা হইতে বদরিনাথ তীর্থ—১৩০ মাইল। ১৩ই মে আমি আলমোরা হইতে তীর্থযাত্রা করিলাম। এই সুদীর্ঘ সঙ্কটসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথে স্থানে স্থানে বিশ্রামবাস আছে। কুমায়ুন জেলার প্রান্তবর্ত্তী পথ সুগম ও দৃশ্যবৈচিত্র্যে মনোরম। শোভাসম্পদসমৃদ্ধ হিমালয়ের এই তীর্থপথ তরঙ্গের ন্যায় উন্নমিত। পথের ধারে কোথাও উপত্যকা, মধ্যে কলনাদিনী উপলঘাতিনী রামগঙ্গা দ্রুতনৃত্যে বহিয়া যাইতেছে; বৃক্ষবীথিমধ্যে পাখী ডাকিতেছে। চারি দিকে সারি সারি পর্ব্বত, পর্ব্বতের উপর বিপুল অরণ্য; পুষ্পপুঞ্জপুলকিত বন্যগোলাপ ও আখরোটের ছায়াকুঞ্জ! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, আর যিনি এই নয়নাভিরাম নাগাধিরাজের স্রষ্টা, তাঁহার কথা মনে পড়ে;—ও চিত্ত তাঁহার বিচিত্রশক্তি অপূর্ব্ব মহিমার ধ্যানে উন্মুখ ও উন্নত হইয়া উঠে।

মহালচোরিতে আসিয়া আমরা গাড়োয়ালের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ অংশের পার্ব্বত্যদৃশ্য ভীমকান্ত। লোভা আদিবদরী ও কর্ণপ্রয়াগের পুষ্পপাদপদৃশ্য কুমায়ুনের অনুরূপ। লোভা ও আদিবদরীর মধ্যবর্ত্তী দেয়ালীখালী উঠিবার পর একেবারে ছয় মাইল পথ নীচে নামিয়া যাইতে হয়। পথের উভয়পার্শ্বস্থ অচলমালার উপর শালবৃক্ষের বন। স্থানে স্থানে সুশীতল নির্ঝরবারি পর্ব্বতপথ পরিসিক্ত করিতেছে। উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশিখর হইতে প্রপাতের উচ্ছ্বসিত জলরাশি অট্টকলরবে নীচে পড়িতেছে। প্রভাতপ্রফুল্ল বিহঙ্গ কোমল কলকূজনে পথিকদিগের প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। কোথাও অচলের পাদমূল বেড়িয়া কোথাও বিলোলপল্লব লতাকুঞ্জের ভিতর দিয়া পথ প্রসারিত। পথপ্রান্তে একবার বসিলে পবনের কোমল স্পর্শে, পুষ্পের গন্ধামোদে পথিকের শ্রান্ত দেহ জুড়াইয়া যায়।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় আমরা আদিবদ্‌রীতে পঁহুছিলাম। তীর্থের নাম আদি-

বদ্‌রী কেন হইল, জানিতে কৌতূহল জন্মিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, নর-নারায়ণের সময় এই খানে আদি বদরিকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে দুইটি পাহাড় আছে। শৈলযুগলের নাম নর-নারায়ণ। পাহাড় দুইটি পরস্পর প্রায় সংলগ্ন। উভয়ের মাঝখানে একটি স্বল্প সলিলা নদী,—পদব্রজে পার হওয়া যায়। শৈলশ্রেণী সব্জ শৈবালে সমাচ্ছন্ন। উপত্যকাদেশে শীতাতপের আধিক্য অনুভূত হয় না। তাপস-জীবনের উপযোগী ও অনুকূল সকল দ্রব্যই এখানে অনায়াসলভ্য। দৃশ্যের গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে সহজেই চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। এখানে হিন্দু প্রথায় নির্ম্মিত কতকগুলি পুরাতন মন্দির আছে। একটি মন্দির নাকি স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরটি তাহা হইলে হাজার কি বার শত বৎসরের পুরাতন বলিতে হইবে। প্রধান মন্দিরের চারি পার্শ্বে অনেকগুলি ক্ষুদ্রায়তন মন্দির। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বড় মন্দিরের সমসাময়িক, আর অবশিষ্টগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মন্দিরাধিষ্ঠিত বিগ্রহমূর্ত্তিসমূহ তত পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে স্থানীয় অবস্থাভিজ্ঞ লোকের সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল; শুনিলাম, বদ-রিকাশ্রম স্থূল সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ, এই কয়টি ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে এই স্থূল আদিবদ্‌রী পৌরাণিক বদরিকাশ্রম।

যতই তীর্থের সন্নিহিত হইতেছি, পথও ততই দুর্গম হইয়া উঠিতেছে। আহার্য্যাদিও দুর্লভ। শুদ্ধ বদ্‌রী বা বর্ত্তমান বদরিকাশ্রমে না পঁহুছিতে পারিলে আর খাদ্য মিলিবে না। হিমালয়ের ক্রোড়ে পার্ব্বত্য মূল, অলকনন্দার জল ও তুষার ভিন্ন অন্যরূপ খাদ্য, পানীয় লাভের সম্ভাবনা নাই। আদিবদ্‌রী কর্ণপ্রয়াগ হইতে গোরুদা গঙ্গা অবধি বিস্তৃত স্থূল বদ্‌রী-প্রদেশে পথ সুগম, এবং প্রকৃতিও করুণাময়ী। আদিবদ্‌রী হইতে কর্ণপ্রয়াগ বার মাইল। এখানে অলকনন্দা ও কর্ণগঙ্গার সঙ্গম। এই স্রোতস্বিনীযুগলের পুণ্যপ্রবাহ-সম্মিলন-দৃশ্য অতি অপরূপ। বিমলসলিলকুন্তলা কর্ণগঙ্গার নীলবেণী অলকনন্দার কুন্দধবল স্ফটিক-স্বচ্ছ নীররাশির মধ্যে আনন্দকলরবে মিলাইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা এই তীর্থে স্নান করিয়া দেহ পবিত্র করে। কিন্তু স্রোত এরূপ প্রখর যে জলে নামিয়া অবগাহন করি-বার যো নাই। কর্ণপ্রয়াগ হইতে নন্দপ্রয়াগে আসিতে হয়। এখানে অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম। এখানকার পথ নবনির্ম্মিত, এবং পূর্ব্ববর্ণিত পথের অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত। এই তুষার স্তূপ সমাচ্ছন্ন শৈলসমাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশ নন্দপ্রয়াগের একটু বাণিজ্য গৌরব আছে। আলমোরা ছাড়িবার পর আর এরূপ স্থান চক্ষে পড়ে নাই। এখানকার দোকানগুলিতে পিতল ও কাংস্যের পাত্র ও হিন্দী ও সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া যায়। এখানে একখানি রোকড়ের দোকানও দেখিলাম। কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগের মধ্যবর্ত্তী পথ এক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ভগ্ন স্থান অতিক্রম করিবার জন্য বিশাল শিলাস্তূপের মধ্য দিয়া শত শত ফিট নীচে নদীগর্ভ পর্য্যন্ত নামিয়া যাইতে হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে যখন এখানে পথ ছিল না, সেতু ছিল না, খাদ্য-আহরণ-যোগ্য পর্ব্বতপল্লী ছিল না, তখন পুণ্য প্রয়াসীদিগের পক্ষে এই তীর্থ কিরূপ দুরধিগম্য ছিল, ইহাতে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

নন্দপ্রয়াগ হইতে চামলি পর্য্যন্ত পথ আট মাইল। চামলি বা লালসঙ্গ গাড়োয়াল জেলার সদর। এক জন ডেপুটী কলেক্টর এখানে থাকেন। কেদারের পথ এইখানে আলমোরা ও গাড়োয়ালের পথে মিশিয়াছে। এ পর্য্যন্ত পথ একরূপ সুগম ছিল। কিন্তু লালসঙ্গ হইতে পথ ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। এদিককার চড়াই ও উৎরাই-গুলি অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরারোহ। স্থানে স্থানে পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; এক পার্শ্বে মাথার উপর পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ সমুদ্যত, আর এক পার্শ্বে সহস্র হস্ত নিম্নে পর্ব্বতপথচারিণী গঙ্গার গভীর গর্জ্জন। নীচের দিকে চাহিলেই মাথা ঘুরিয়া যায়। একবার পদ স্খলিত হইলেই সব ফুরাইল। এখান হইতে পিপলপটী পনের মাইল দূরবর্ত্তী। সেখানে পঁহুছিতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে। পূর্ব্বে এখানে দড়ির সাঁকো ছিল। এখন গবর্মেণ্টের কৃপায় দোদুল্যমান লৌহসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। হরিদ্বার, বদরীনাথ, রাণীক্ষেত ও কাঠগুদামের অনেক স্থানে এইরূপ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজরাজ তীর্থযাত্রীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সকল সেতুই সুদৃঢ়। কেবল নন্দপ্রয়াগের সেতুর সন্ধিসমূহ শিথিল হইয়া গিয়াছে, এবং দুই এক স্থান ভগ্ন হওয়াতে অনবধান পথিকের পক্ষে বিপদাবহ হইয়া উঠিয়াছে। চামলির কয়েক মাইল উর্দ্ধে ব্রীহিগঙ্গা। একটি প্রকাণ্ড শৈল স্খলিত হইয়া প্রবাহপথ রুদ্ধ করাতে গোহানা (ঘোনা?) হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। হ্রদের জল কয়েক শত ফিট গভীর। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই হ্রদের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া অলকনন্দায় বিপুল প্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল। বন্যার প্রবল প্রবাহে সন্নিহিত স্থানসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। এখন আবার হ্রদটি ক্রমশঃ জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং আবার ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। ব্রীহিগঙ্গা উল্লেখযোগ্য নদী নহে; কিন্তু হ্রদাকারে পরিণত হওয়ায় লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পিপলপটী হইতে কুমারচটী প্রায় বার মাইল। কুমারচটীর তিন মাইল দূরবর্ত্তী গোলার কুটীতে একটা প্রকাণ্ড চড়াই আরম্ভ হইল। পথের মধ্যে এরূপ বিপদ-সঙ্কুল বন্ধুর স্থান আর নাই। কুলীরা বলিল, ইহার নাম মৃত্যু দোয়ারা;—যমের দ্বারই বটে! শিথিলসন্নিবিষ্ট উপলরাশির উপর দিয়া কয়েক হাজার ফিট্ উর্দ্ধে উঠিতে হয়। নীচের খাদ ও উপরের পাহাড়ের দিকে চাহিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক স্থানে খাদ একেবারে খাড়া হইয়া নামিয়া গিয়াছে। উষর শৈলমালা শষ্পশৈবালশূন্য, ভীষণ। আর যাহারা দিবাভাগে পর্ব্বতারোহণ করে, তাহাদের কষ্ট অপরিসীম। তৃষ্ণাদগ্ধকণ্ঠ যাত্রীরা যখন "জল জল" করিতে করিতে পর্ব্বতপথে আরোহণ বা অবরোহণ করিতে থাকে, তখন তাহাদিগের কষ্ট দেখিলে হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হয়। তীর্থযাত্রীদিগের অধিকাংশই দরিদ্র। বিলাসকোমলতনু আরামপ্রিয় নব্যসভ্যতা-দীক্ষিত কাহাকেও এ পথে দেখিলাম না। যাত্রীদের মধ্যে এবার ভিখারীর সংখ্যাই অধিক। ধনবান যাত্রী যে কয় জন দেখিলাম, তাঁহারা কেহ বঙ্গ, কেহ বোম্বাই, কেহ বা পঞ্জাব হইতে আসিয়াছেন। চটিতে চটিতে ভিখারীদের অট্টকোলাহল,—কেবল "দেহি দেহি" রব। ইহাদের মধ্যে নাগারাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। পরস্ব ইহাদিগের উপজীবিকা,—তা ভিক্ষালব্ধই হউক, আর লগুড়লব্ধই হউক। বেনিয়ারা ইহাদের উপদ্রবে অস্থির। ধর্ম্মের কথায় না পারিলে ইহারা বাহুবলে

আপনাদিগের কার্য্যসিদ্ধি করে। সুতরাং দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারটা উত্তমরূপে চলিয়া যায়। দিগম্বর দেহগুলিও বেশ কান্তিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। এখানে খাদ্যাদি অতি দুর্ম্মূল্য। টাকায় আটা ৪।৫ সের, গুড় দুই সের, ডাইল তিন সেরের বেশী পাওয়া যায় না। ফল মূল শাকসবজী অপ্রাপ্য। এক স্থানে দীপতৈলেরও অভাব দেখিলাম। গাড়োয়ালে উল্লেখযোগ্য শস্যক্ষেত্র নাই বলিলেই হয়। ভারবাহী পার্ব্বত্য ছাগেরা সুদূর পল্লী হইতে এখানকার অধিবাসীদের জন্য শস্যাদি বহিয়া আনে। দোকানদারেরা দুর্ম্মূল্য দ্রব্যাদি বেচিয়া বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে গবর্মেণ্টের তরফ হইতে লোক আসিয়া চটিতে সঞ্চিত খাদ্যাদি পরীক্ষা করিয়া যায়। ডাইল, আটা, ঘৃত কদর্য্য হইলে যাত্রীদের মধ্যে বিসূচিকা বা অন্যবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

এইবার আমরা শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত যোশীমঠ বা জ্যোতির্মন্দিরে আসিলাম। শঙ্করাচার্য্য যে চারিটি জ্ঞানপীঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাহাদিগের অন্যতম। গ্রামে বড় একটা জনসমাগম নাই; সন্নিহিত কোন গ্রামে ওলাউঠা দেখা দিয়াছিল;—প্রাণভয়ে গাড়োয়ালীরা জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে। "বেমারী'র ভয় ইহাদিগের এত অধিক যে, পালাইবার সময় স্ত্রী-পুত্র পরিবার কিছুই ইহাদিগের মনে স্থান পায় না। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসীরা যোশীমঠে বাস করেন। বহু শতাব্দী হইল, এইরূপ রীতি চলিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন সদুত্তর পাই নাই। বোধ হয়, আশ্রমস্বামীকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া এই প্রদেশের অধিপতিরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মঠের ভার ভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নামানুসারে মঠের বর্ত্তমান নাম যোগীমঠ, বা যোশীমঠ হইয়াছে। মঠের বর্ত্তমান পুরোহিত এক জন দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ। শুনিলাম, এখানকার পুরাতন বাসুদেবমন্দিরটি শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহসমূহের অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বকালে এখানে তপঃপরায়ণ সন্ন্যাসীদিগের পুণ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং স্বয়ং শঙ্কর না হউন, তাঁহার শিষ্যবর্গও এই আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। এখানকার নরসিংহ-মন্দিরটি অন্য দুইটি মন্দিরের ন্যায় পুরাতন নহে। প্রবাদ, মন্দিরমধ্যবর্ত্তী বিগ্রহের একখানি বাহু ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যেদিন বাহুখানি স্খলিত হইয়া পড়িবে, সেইদিন বদরিকাশ্রমতীর্থের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইবে। জনসাধারণের এই বিশ্বাস কোনও নৈসর্গিকতত্ত্বমূলক, অথবা নিরবচ্ছিন্ন কুসংস্কারমাত্র, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সনৎকুমার-সংহিতায় এ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে। বোধ করি, সেই শ্লোকটি এই বিশ্বাসের মূলসূত্র। শীতসমাগমে বদরীনাথ মন্দির যখন তুষারতলে প্রোথিত হয়, তখন মন্দিরের পুরোহিত ও কর্ম্মচারিগণ যোশীমঠে আসিয়া বাস করেন। উপরের পাহাড় হইতে দুইটি সুন্দর ঝরণা মধুর নিক্কণে নীচে নামিয়া আসিয়াছে। নির্ঝরিণীজলে স্নান করিলে মন প্রাণ পুলকিত হয়। কয়েক মাইল উপরে বৃক্ষতলে জ্যোতির্লিঙ্গ নামক মহাদেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। বৃক্ষটির বয়স ৮০০।১০০০ বৎসর হইবে।

যোশীমঠ হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ দেড় মাইল; কিন্তু চড়াই বড় দুরারোহ ও উপলবন্ধুর।

অলকনন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গম,—বিষ্ণুপ্রয়াগ। গিরিগাত্রলগ্ন শৃঙ্খল ধরিয়া যাত্রীরা এখানে স্নান করে। সেদিন একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতে আসিয়া প্রবল প্রবাহবেগে ভাসিয়া গিয়াছে। পথ এখন কেবল দুর্গম নহে, পদে পদে প্রাণের আশঙ্কা বর্ত্তমান। এ তীর্থে আসিয়া যে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে ফিরিয়া যায়, সে নিঃসন্দেহ পরমসৌভাগ্যশালী। শুনিলাম, এই পথের সহিত গবর্মেণ্টের কোন সম্পর্ক নাই। বদরীনাথ মন্দিরের অধ্যক্ষেরা মন্দিরের অর্থে ইহার সংস্কার করিয়া থাকেন। আজ কাল পথ অতি বিঘ্নসঙ্কুল। প্রত্যহ নানা দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। শুনিতেছি, গবর্মেণ্ট ১০বৎসরে তীর্থপথের জন্য চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে বদরীনাথ পর্য্যন্ত কুড়ি মাইল পথ সংস্কারের অভাবে অতি ভীষণ হইয়াছে। আসিয়া দেখিয়াছি, স্থানে স্থানে পথের প্রসার দুই হাত সওয়া দুই হাতের অধিক নহে, আবার ইহার এক পার্শ্বে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ। অপর পার্শ্বে সুগভীর খাদ। বিষ্ণুপ্রয়াগ ও পাণ্ডুকেশ্বরের মধ্যে লোকপাল তীর্থ। এই তীর্থে লোকে পিতৃতর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। তীর্থ সরোবরের তীরে অনেকগুলি পক্ষী দেখিলাম ; ইহারা নাকি জলে তৃণাদি পড়িলে তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ফেলে।

এখন আমরা পাণ্ডুকেশ্বর বা পাণ্ডবক্ষেত্রে আসিয়াছি। নদীর পরপারে একটি দুর্গম শৈলশিখরে একখানি সুবৃহৎ শিলা আছে। প্রবাদ,—এই শিলাতলে পাণ্ডবদিগের জন্ম হয়। মহারাজা পাণ্ডু নাগসত্ব, কালকুট ও গন্ধমাদন গিরি পরিভ্রমণ করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদে গমন করেন, তৎপরে শতশিখর পর্ব্বতে উপনীত হন। কিন্তু লোকপাল তীর্থ, ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ ও পাণ্ডুকেশ্বর শৈল শতশীর্ষ পর্ব্বত কি না সন্দেহ। পাণ্ডুকেশ্বরে যোগবদরী নামে এক অতি পুরাতন বিষ্ণুমন্দির আছে। লোকে ইহাকেও শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত বলিয়া থাকে। মন্দির শঙ্করের পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত হইয়া থাকিলেও, ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মন্দিরে চারিটি পুরাতন তাম্রশাসন পরিলক্ষিত হইল। তাম্রফলকে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত শ্লোক কালপ্রভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই মন্দিরের নাম অতিসূক্ষ্ম বদরী।

ইহার পরেই বৃদ্ধবদরী।—তীর্থযাত্রিগণের বাঞ্ছিত পুণ্য-নিকেতন। আর এগার মাইল পথ অতিক্রম করিলেই অভীষ্ট স্থানে উপনীত হওয়া যায়। এখন পথও আর পূর্ব্ববৎ দুর্গম ও ভয়াবহ নহে। পথের মাঝে মাঝে ভাগীরথীর উপত্যকাভূমি তুষারমগ্ন পাষাণমরুর মধ্যে পরম রমণীয় দেখাইতেছে। পথের কষ্ট শেষ হইয়া আসিতেছে। যাত্রীদিগের আনন্দের আর সীমা নাই। তাহারা "বদ্রী বিশাল লালা কি জয় !" শব্দে পর্ব্বতপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া ধাবিত হইতেছে। মস্তকোপরি তুঙ্গ শৃঙ্গ, নিম্নে শিলাসংঘর্ষণ-নাদিনী গঙ্গার গর্জ্জন। তথাপি চিত্ত ভয়শূন্য। হনুমানচট্টিতে পাণ্ডারা মরুৎ রাজার যজ্ঞভূমি দেখাইল। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও এখানে যজ্ঞাবশিষ্ট অঙ্গাররাশি বর্ত্তমান। মৃত্তিকা খনন করিলেও কয়লা পাওয়া যায়। এই অঙ্গার নিসর্গসম্ভূত, কি মরুৎ রাজার যজ্ঞাবশেষ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এখন আমরা হিমালয়ের তুহিনাচ্ছন্ন প্রদেশে আসিয়াছি। সম্মুখে হিমকিরীটমণ্ডিত গগনস্পর্শী শিখরসমূহ সমুন্নত। অনতিদূরে গঙ্গাবক্ষে অর্দ্ধক্রোশব্যাপী প্রকৃতিরচিত তুষারসেতু। তুষারগিরি ভেদ করিয়া জলপ্রবাহ বিপুলবেগে সহস্র সহস্র হস্ত

নিম্নে অবতীর্ণ হইতেছে। শুদ্ধবদরীর এক ক্রোশ নিম্নে ঋষিগঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। গঙ্গার উপর তুষারসেতু। বামে দক্ষিণে উর্দ্ধে নিম্নে যে দিকে চাও, সর্ব্বস্থান তুষারসমাকীর্ণ। তুষারাবৃত শৈলরাজির অন্তরালে পৃথিবী একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সংসারের এই নিভৃত নেপথ্যে দাঁড়াইলে মনুষ্যচিত্ত নিসর্গ হইতে যদি নিসর্গনাথের অভিমুখে ধাবিত না হয়, তাহা হইলে আর কোথায় মানব-হৃদয় উন্নত হইবে? মহিমমণ্ডিতা প্রকৃতি এখানে একেবারে মৌন হইয়া রহিয়াছেন,—যেন বলিতেছেন, "আমার রহস্যোদ্ভেদে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিও না; বিস্ময়ে ও ভক্তিভাবে মস্তক অবনত কর, চতুর্দ্দিকবর্ত্তী শৈলমালায় যে সকল বিচিত্র ব্যাপার দেখিতেছ, তাহার তুলনায় তুমি কত ক্ষুদ্র!" ঋষিরা হিমালয়কে স্বর্গ বলিয়াছেন। সংসারের মায়াপাশমুক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হিমাদ্রি যে স্বর্গদ্বার, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

২৪শে মে অপরাহ্ণে আমরা বদরীনাথে পঁহুছিয়াই মন্দিরসন্নিহিত তপ্তকুণ্ডে স্নান করিতে গেলাম। প্রবল শীতে শরীর শীতল স্পন্দহীন হইয়া আসিয়াছে। এখন এই উষ্ণ-উৎস-জলে অবগাহন কি প্রীতিকর, কি শ্রমহারী! একবার স্নান করিলেই শ্রান্তিশিথিল শরীরের সমস্ত অবসাদ অপনীত হয়। অদ্ভুত সিংহ-মুখাকৃতি উৎসমুখ হইতে জলধারা কুণ্ডে পড়িতেছে। উৎসের জল অত্যুষ্ণ, কিন্তু কুণ্ডে পড়িয়াই জল শীতল হইতেছে। যে কক্ষের ভিতর দিয়া ঝরণা বহিয়া গিয়াছে, সেটি দেখিতে তুরুষ্ক স্নানাগারের অনুরূপ।

স্নানান্তে যাত্রিগণ "শ্রীবদরীবিশালের" পূজা করিতে যায়। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় যাত্রিগণের কণ্ঠনিঃসৃত "বদরী বিশাল কি জয়" এই উচ্চ কোলাহলসহকারে মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হয়। পাষাণসোপান বহিয়া চতুর্ভুজাকৃতি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরে শিল্পসমৃদ্ধি লক্ষিত হইল না। তবে মন্দিরটি অতি পুরাতন—শঙ্করাচার্য্যের সময়ে নির্ম্মিত। পূর্ব্বে এখানে বদরীনাথের মন্দির ভিন্ন অন্য গৃহাদি ছিল না;—দেড় শত বৎসর হইল, বদরীনাথপুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। বদরীনাথ ক্ষেত্রের পরিমাণ পূর্ব্ব-পশ্চিমে দেড় ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে উহার অর্দ্ধেক হইবে। এই স্থানের উচ্চতা প্রায় দশ হাজার চারি শত ফিট। আরও উপরে সমুদ্রসমতল হইতে ২৩ হাজার ফিট উর্দ্ধে হিমপ্রবাহ। এইখানে গঙ্গার উৎপত্তি। তীর্থক্ষেত্রের কেন্দ্রবর্ত্তী দেবালয় শঙ্করাচার্য্যের সময়ে নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষীয় কালতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে এই দেবালয় দুই হাজার বৎসর, এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটি হিন্দুরীতি-অনুসারে শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ তাম্রমণ্ডিত। ঘণ্টাগৃহ ও অন্যান্য গৃহসমূহ মন্দিরনির্ম্মাণের বহুকাল পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবসেবার জন্য বহুসংখ্যক পুরোহিত, পাঠক ও ভৃত্য নিযুক্ত আছে। গাড়োয়াল ও তিহরীর রাজা দেবালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কাশী-নরেশের হস্তে মন্দিরসংক্রান্ত তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। কিন্তু দূরত্বনিবন্ধন মন্দিরের কার্য্যপরিচালনে বিশৃঙ্খলা ঘটায় তিনি এই কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেবোত্তর সম্পত্তি ও যাত্রিদত্ত অর্থে মন্দিরের বার্ষিক আয় ৪৮০০০ টাকা। এই উপস্বত্বের মধ্যে ২৮০০০ টাকা দেবসেবা প্রভৃতির জন্য ব্যয়িত হয়। উপস্বত্বের

উদ্ধৃত অর্থ হইতে এখন প্রায় ৪০০০০ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। 'রাওল' উপাধিধারী প্রধান পুরোহিত দক্ষিণাপথের কেরলদেশীয় ব্রাহ্মণ। পুরোহিতের পদ উত্তরাধিকারমূলক নহে। কেরল হইতে প্রধান পুরোহিত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। পুরোহিতের মাসিক বেতন ১০০৲ এক শত টাকা। প্রতিবৎসর তীর্থক্ষেত্রে ৬০।৭০ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

এখন বিগ্রহের ভোগের সময় হইয়াছে। নিবেদন শেষ হইলে নির্দ্দিষ্টপরিমাণানুসারে মন্দিরের কর্ম্মচারী ও ভৃত্যদিগের মধ্যে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। পাণ্ডাদিগের অনুগ্রহে যাত্রীরাও কিছু কিছু প্রসাদ পায়। বেলা ৯টার সময় বিগ্রহের স্নান হয়। ভাগ্যবান ব্যক্তির অদৃষ্টেই "নির্ব্বাণদর্শন" বা রত্নভূষণ ও বেশবিমুক্ত সমাধিমগ্ন দেবমূর্ত্তির দর্শনলাভ ঘটে। যে গৃহে দেবতার স্নান হয়, তাহার দ্বারদেশ রজতমণ্ডিত। বাহিরের ঘর তাম্র-মণ্ডিত। ইহার পরিমাণ ২৪×১৮ ফিট। ভিতরের কক্ষটি আরও ক্ষুদ্র। অন্তঃকক্ষের কিছু দূরে একটা রেলিংয়ের নিকট যাত্রীরা সমবেত হয়। অন্তঃকক্ষ এরূপ অন্ধকারময় যে, দেবমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যায় না। বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ বিগ্রহের নিকট গিয়া দেব-দর্শন করিতে পারে না। কক্ষামধ্যস্থ দীপালোক অনুজ্জ্বল। ঘৃতপ্রদীপ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার আলোক এখানে নিষিদ্ধ। দিবারাত্রি মন্দিরে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। বিশিষ্ট যাত্রীদিগের আগমন উপলক্ষে পুরোহিতেরা যখন কর্পূর প্রজ্বলিত করে, তখনই বিগ্রহমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যায়।

বদরীনাথমূর্ত্তি অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক। শঙ্করাচার্য্য সাত বার নারদকুণ্ডে ডুব দিয়া এই মূর্ত্তি উত্তোলন করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটি পদ্মাসনসমাধিমগ্ন ও ধূসরপ্রস্তরনির্ম্মিত। বিগ্রহমূর্ত্তির নিকট উদ্ধব নারদ প্রভৃতি ভক্তগণের মূর্ত্তি সংস্থাপিত। বিগ্রহ যখন বসনভূষণে সজ্জিত হন, তখন তাঁহার মূর্ত্তি অতি রমণীয় হইয়া উঠে। কিন্তু বদরীনাথের নির্ব্বাণ-মূর্ত্তি দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে গভীর আনন্দ ও ভক্তির সঞ্চার করে। যে সিংহাসনে বিগ্রহ স্থাপিত হয়, তাহার মূল্য চারি হাজার টাকা। দেবতার রত্নালঙ্কারাদির মূল্য ৭।৮ হাজার টাকা হইবে। শীতসমাগমে যখন দেবমন্দির তুষারমধ্যে সমাহিত হয়, তখন মন্দিরের ধনরত্নরাজি যোশীমঠে আনীত হইয়া থাকে। মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিবার সময় দুই মণ ঘৃতের এক প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয়। যাহাতে প্রদীপ জ্বলিবার কোনও বিঘ্ন না হয়, তজ্জন্য মন্দিরে বায়ুসঞ্চারের পথ থাকে। ছয় মাস পরে তুষাররাশি অপসারিত করিয়া মন্দিরদ্বার প্রথম উন্মোচন করিবার সময় মন্দিরমধ্যে ধূসর আলোকশিখা দৃষ্টিগোচর হয়। এই দ্বারমোচনের পূর্ব্বে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে লোকে তাহা অনাবৃষ্টি ও সংক্রামক রোগ প্রভৃতি অশুভ ব্যাপারের নিদর্শন বলিয়া মনে করে।

বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে এই তীর্থ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই হিন্দুধর্ম্ম আদিম অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে কুত্রাপি মুসলমানের সমাগম দৃষ্ট হয় না। চর্ম্মকারজাতীয় কোন ব্যক্তির এখানে প্রবেশাধিকার নাই। মৎস্য মাংস প্রভৃতি কোনপ্রকার আমিষ খাদ্য ও মদ্যাদি এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। আমরা পুরীর বহির্ভাগে বিচরণ করিতে লাগিলাম। চারি দিকে কি অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে! যত দূর দৃষ্টি চলে, শুধু হিমালয়ের

শুভ্র তুষারশোভা। বহুদূর নিম্নে ব্রহ্মকপাল। এখানে যাত্রীরা পিতৃতর্পণ করে। এখানে নারদ-কুণ্ড হইতে শঙ্করাচার্য্য বিগ্রহমূর্ত্তি উত্তোলন করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের অধিবাসীরা অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি। চৌর্য্য, মিথ্যাবাদ, চতুরতা, প্রতারণা প্রভৃতি ইহাদিগের অগোচর। এক জন পর্ব্বতবাসীর হস্তে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও বিশ্বাস করা যায়। ইহাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা এরূপ প্রবল যে, সমতলের অধিবাসী জনসমূহের মধ্যে সেরূপ ধর্ম্মভাব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। পর্ব্বতীয়া রমণীদিগের মূর্ত্তি অতি সুন্দর। শতগ্রন্থি বসনও তাহাদিগের অঙ্গে মনোরম শ্রী বিস্তার করিতেছে। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ভোটরমণীরা অতুলনীয়া বলিলেই হয়। ইহাদের নিকট আমাদের দেশের অনেক প্রাসাদচারিণী রূপাভিমানিনী বিলাসিনীর রূপগর্ব্ব খর্ব্ব হয়। অপরিচিত পুরুষের সহিত তাহারা যেরূপ সবল ও স্বাধীনভাবে আলাপ করে, তাহা বাস্তবিকই অতি প্রশংসনীয়। এই রমণীরা সাধারণতঃ অতি সুশীলা; সেই জন্য ইহাদিগের অসঙ্কোচ সরলতা আগন্তুকদিগের নিকট এরূপ রমণীয় বোধ হয়। ইহাদের শরীরে বিলক্ষণ বল আছে; পর্ব্বতপথবিচরণে ইহাদের নৈপুণ্য অসাধারণ।

এই প্রদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। এখানে কেবল মৃগনাভি, পশুচর্ম্ম, কম্বল প্রভৃতি কতিপয় পার্ব্বত্য দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায়। কৃষিকার্য্য এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান অবলম্বন। গৃহপালিত পশুই ইহাদিগের প্রধান সম্পত্তি। পার্ব্বত্য ছাগ এ অঞ্চলের ভারবাহী পশু। গো মহিষাদি কেবল দুগ্ধ ও ঘৃত সংগ্রহের নিমিত্ত পালিত হয়। বদরীনাথে দুইটি অন্নছত্র আছে। দরিদ্রেরা এখানে প্রতিদিন আহার প্রাপ্ত হয়। এখানে একটি ডাকঘর আছে বটে, কিন্তু চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা বা ঔষধালয় নাই। এখানকার আবহাওয়া সমতলবাসী লোকদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। যাহারা তীর্থ-দর্শনার্থ এখানে আগমন করে, তাহাদের অনেকেই পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এবং কেহ কেহ দেবতার প্রসাদস্বরূপ দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করে। তীর্থযাত্রীরা এখানে আসিয়া যেরূপ ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাত্রীদিগকে অধিকাংশ সময়েই কুলীদিগের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয়। তিহরী অঞ্চলের কুলীরা লোক ভাল নহে। যাত্রীদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা অর্থো-পার্জ্জনের দিকেই তাহাদের সমধিক দৃষ্টি। অনেক সময় কুলীরা দুরারোহ পর্ব্বতপার্শ্বে ডাণ্ডি নামাইয়া রাখে; ঐরূপ সঙ্কটজনক স্থান হইতে প্রতি মুহূর্ত্তেই পতনের আশঙ্কা। কুলীদিগের অসতর্কতানিবন্ধন সে দিন একটি বৃদ্ধা আমার সম্মুখেই ডাণ্ডি হইতে পড়িয়া নিহত হইয়াছে। বিসূচিকা, উদরাময়, কাশী প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত যাত্রীরা পথে পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। চটীগুলিও অত্যন্ত আবর্জ্জনাপূর্ণ ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। চটীগুলি পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য গবর্মেণ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ কিছুই হয় না। চটী-পরিমার্জ্জনের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য গবর্মেণ্টের বেতনভোগী চৌকিদার আছে, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা কিছুই কাজ হয় না। বদরীনাথ তীর্থে যাত্রীদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই সকল ত্রুটী বর্ত্তমান থাকাতে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক যাত্রী পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গবর্মেণ্ট নিম্নলিখিত অভাব ও অসুবিধাগুলির প্রতিকারে যত্নশীল হইলে তীর্থযাত্রিগণের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। (১) মন্দিরের আয় হইতে অথবা গবর্মেণ্টের ব্যয়ে বিষ্ণু প্রয়াগ হইতে পাণ্ডুকেশ্বর পর্য্যন্ত তীর্থপথের সংস্কার। (২) তীর্থযাত্রার সময় যাত্রীদিগের তীর্থপথে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। (৩) বিনামূল্যে যাত্রীদিগকে কুইনাইন পিপারমেণ্ট, ক্লোরোডাইন, ক্যাম্ফার প্রভৃতি বিতরণার্থ দোকানদার ও পাটোয়ারীদিগের নিকট উক্ত ঔষধসমূহ রাখিবার ব্যবস্থা। (৪) যে সকল স্থানে ঔষধালয় আছে, সেখানে দুই জন Hospital Assistantএর নিয়োগ; তাঁহাদের এক জন ঔষধালয়ে থাকিবেন, অপর ব্যক্তি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া রোগার্ত্ত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা করিবেন। (৫) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চটীতে প্রয়োজন-অনুসারে এক বা দুই জন ঝাড়ুদারের নিয়োগ। (৬) বদরীনাথমন্দিরে দেবদর্শনার্থ উপযুক্ত আলোকের ব্যবস্থা, এবং নাগাদিগের ন্যায় উপদ্রবকারী ভিক্ষুকদিগের দমন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রদীপ। আশ্বিন। "সৌরজগৎ" শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত একটি সুগম্ভীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। "অর্জ্জুনের দূতো" নামক ধিক্কারজনক রচনাটি প্রকাশিত হইল কেন, তাহা বলিতে পারি না। "কুমারকল্পিত কান্তি" কিরূপ? কুমারের তুল্য, এই অর্থ কি মহাকবির অভিপ্রেত? 'কল্পিত' শব্দটি গালভরা বটে, কিন্তু যেখানে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানে তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক, তাহা জানেন কি? "কর্ণকুবলয়" সম্পূর্ণ মৌলিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কর্ণের অনেক উপমা বিদ্যমান, এবং তাহার মধ্যে গৃধ্রটিই এই কবিতা-'ভাগাড়ে'র সম্পূর্ণ উপযোগী;—কবি তাহাকে ত্যাগ করিয়া কুবলয় আনিতে পদ্মবনে ছুটিলেন কেন, বলা যায় না। মর্ত্তের মানব তিলকাদি ললাটে অঙ্কিত করে, কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতনামা কবি অর্জ্জুনের ললাটে "সুদীর্ঘ পৌণ্ড্রক রেখা অঙ্কিত" করিয়া দিয়াছেন! বর্ণনা করিতেছেন কামুকী বারবিলাসিনীর,—কিন্তু নিঃসঙ্কোচে ঊষার সহিত তাহার উপমা দিয়াছেন। উর্ব্বশী বলিতেছে,—

> "...............কুন্তীর নন্দন
>
> তুমি, আমি ত্রিদিবের বারবিলাসিনী;

অর্থাৎ, 'ঘরে ও বরে' মিলিয়া যাইতেছে! উর্ব্বশীর মুখেও না হয় এরূপ উক্তি শোভা পায়, কিন্তু কবিবর কোন্ সাহসে ভদ্র-সমাজে এমন সুরুচির পরিচয় দিলেন? কবিরা 'নিরঙ্কুশ' বটেন, কিন্তু শিষ্ট-সমাজও কি একবারেই 'নিশ্চাবুক' ভাবিয়াছেন? ইহার উপর আবার "আল্‌গরীময়" ও "অন্তর্দ্ধান হইল" প্রভৃতি সাধু ও শিষ্টপ্রয়োগ আছে! পৃথিবীতে রোগ অসংখ্য, আবার অনেক রোগ চিকিৎসার অতীত; এবং এই শ্রেণীর 'কবি'দের কলম কাড়িয়া লইবার বিধানও আইনে নাই। সুতরাং এমনতর অপূর্ব্ব কবিতার উৎপত্তি একরূপ অনি-

বার্য্য। কিন্তু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় এই সকল কাণ্ডজ্ঞানহীন 'চন্দ্রাহত'-গণের প্রলাপ স্থান পায় কেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের "আসামের নাগা জাতি" প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। লেখক বলিতেছেন,—"যে পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধটি সঙ্কলিত হইল, তাহা অনেক দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে; ইতিমধ্যে অসভ্য নাগাদিগের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিনা, জানি না।" ইচ্ছা করিলে, সেন্সসের বিবরণ পড়িলে, জানিতে পারিতেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর "হুনড্রু জলপ্রপাত" ভ্রমণবৃত্তান্ত। বিষয়টি মনোরম, কিন্তু ভাষাটি নামের মত উৎকট। বন্দুকের বদলে 'নালিকাস্ত্র' প্রভৃতি আর এ কালে চলিতে পারে না।

বঙ্গভাষা। শ্রাবণ ও ভাদ্র; ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। এই নবপ্রকাশিত মাসিক-পত্রের দুই এক সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজকুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা এই পত্রের সম্পাদক। বাঙ্গলা ভাষা রাজকুটুম্বগণের সমাদরলাভ করিতেছে, ইহা আনন্দের বিষয় বটে। আশীর্ব্বাদ করি, নবীন সম্পাদক এই পবিত্র ব্রতে সাফল্য লাভ করুন। শ্রাবণ-সংখ্যার আদ্যোপান্ত দেখিতেছি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "রামচন্দ্র" নামক সুদীর্ঘ 'একঘেয়ে' প্রবন্ধেই প্রায় পরিপূর্ণ! রামায়ণখানি সম্পূর্ণ কম্পোজ করিয়া গেলেও "বঙ্গভাষা"র অনেক দিন চলিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু রামায়ণ বাজারে নিতান্ত দুর্লভ নয়, তাহা "বঙ্গভাষা"র পুনর্মুদ্রিত না করিলেও চলিতে পারে। কেবল দীনেশ বাবুর স্বাক্ষর ও তথাকথিত রামায়ণী কারুকার্য্য দেখিবার লোভে একখানি মাসিকের আদ্যন্ত অধ্যয়ন করা যায় না,—রাজদপ্তরের পরোয়ানা সত্ত্বেও তাহা অসাধ্যই থাকিয়া যায়। বাল্মীকির কবিত্বের উপর পল্লবগ্রাহী ভাবুকের চুণকাম দুই এক পৃষ্ঠা চাট্নীর মত চলিতে পারে; পরিমাণ অত্যন্ত অধিক ও অতিরিক্ত হইলে সহিষ্ণুতার সীমা লঙ্ঘন করিতে হয়। প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনকালে সম্পাদক মহাশয় যদি বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইব। শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দের "জড়ের উত্তেজনশীলতা" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভাষার জাতীয় অধঃপাতের প্রতিবিম্ব" নামক প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য মনে করি।

উদ্বোধন। কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত স্বামী পরমানন্দের "স্বাধীনতা" নামক প্রবন্ধটি চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত স্বামী প্রকাশানন্দের "জ্বালামুখী-যাত্রা" মনোরম ভ্রমণকাহিনী। স্বামীজী পঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর হইতে পদব্রজে জ্বালামুখী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় পথের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করিয়া স্বীয় সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। মনে হয়, যেন আমরাও স্বামীজীর তীর্থ-পথের সাথী হইয়া পর্য্যটনের আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। "জাপানদর্শন" শ্রীযুক্ত স্বামী সদানন্দের একখানি ক্ষুদ্র পত্র। এত সংক্ষিপ্ত যে তৃপ্তি হয় না। আশা করি, স্বামীজী বিস্তৃতভাবে জাপানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

২৬শে বৈশাখ। ফ্রান্সিস্ এডাম্‌স্ সাহেব "নিউ রিবিউ" পত্রিকায় কবিবর টেনিসনের উপর এক বড় কড়া সমালোচনা জাহির করিয়াছেন। সকালে সু—র "সাহিত্যে"র জন্য তাহারই কয়েকটি প্যারা অনুবাদ করিলাম। বর্ত্তমান্ সময়ের ইংরাজী ভাষাটা এরূপ জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, উহা হইতে কোনও কথা ভাষান্তরে অনুবাদ করা বড় সহজসাধ্য নহে। আজকাল লেখক-গণের প্রধান দোষ এই যে, তাঁহারা প্রাঞ্জলতা ও সারল্যের দিকে পুরাতন মনীষীদিগের ন্যায় ততটা মনোযোগ দেন না। তবু গদ্যরচনা বরং কতকটা পদে আছে। কিন্তু Swinburne প্রমুখ কবিতা-লেখকেরা যেরূপ ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, শব্দযোজনার যেরূপ অদ্ভুত প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়া-ছেন, তাহাতে দন্তস্ফুট করে কাহার সাধ্য? আর আমরা ত বিদেশী; অনেক ইংরাজও তাহার ভিতর অনায়াসে প্রবেশলাভ করিতে পারেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখকগণ যেন আর স্পষ্ট করিয়া কোনও বিষয় কাহাকেও দেখাইতে চান না। ছায়াময়, অতি দুরার্থপ্রকাশক কতকগুলা শব্দ একত্রিত করিয়া কেবল যেন পাঠককে একটা গোলক-ধাঁধার ভিতর ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

২৭শে বৈশাখ। সকালে রবীন্দ্র বাবুর সাক্ষাৎ পাইয়া দুই চারিটা শিষ্টালাপ; গোপাল বাবুর সহিত কাব্যালোচনা; তা'র পর বন্ধুবর মথুরা-নাথ সিংহ মহাশয়ের সহসা সাক্ষাৎকারলাভ। গতকল্য শুনিয়াছিলাম যে, তিনি আসিতেছেন। কিন্তু তিনি যে এরূপ অতর্কিতভাবে একবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন, তাহা ভাবি নাই। শরীরটি দিন দিন আড়ে বাড়িতেছে। সে বিষয়ে উন্নতির অভাব নাই। কিন্তু তাঁহার ওকালতীর পসার বিষয়ে বেশী কিছু আশার কথা বলিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি যে এইরূপ অনু-গ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে বন্ধুদিগকে স্মরণ করেন, ইহা আমাদের বড়ই সৌভাগ্যের কথা। আহারের পর কিছুকাল Shelleyর Revolt of Islam, আরও কিয়ৎ-কাল তাঁহার Cenci-নামক নাটকের আলোচনা। বৈকালে চুণী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ। তিনি আগামী জুন মাসে Homœpathic Medical Schoolএ পাঠারম্ভ করিবার মনঃস্থ করিয়াছেন। এই ছার উদরটা পুরাইবার জন্য

কে যে কোন পথে যাইতেছে, তাহার হিসাব নাই। এখন চুণীবাবু ডাক্তার বাবু হইয়া পসার করুন, ইহাই এই দীন বন্ধুর কামনা।

২৮শে বৈশাখ। সমস্ত দিবস ঘরে বসিয়া কাটাইলাম। The Cenci নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ করিলাম। Shelley চেঞ্চীর চরিত্র যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেন নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। সন্তানদিগের উপর এমনতর কঠোর নির্ম্মম অত্যাচার কোনও পিতা করিতে পারেন, তাহা আমাদের সহজে বিশ্বাস হয় না। তবে মানুষ স্বভাবতঃ পশুমাত্র। পশুদিগের মধ্যে অপত্য-প্রীতি দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু এমন পশুও আছে, যাহারা সন্তান ভূমিষ্ঠ. হইবামাত্র উহাদিগকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। সুতরাং মনুষ্য-পশুদিগের মধ্যে এরূপ প্রকৃতির লোক বিরল হইলেও, একেবারে অসম্ভব বা দুষ্প্রাপ্য নহে। মাঝে-মাঝে সংবাদপত্রের মুখেও আমরা এইরূপ পশুদিগের খবর পাইয়া থাকি। সন্ধ্যার প্রাকালে সু—চন্দ্রের সন্ধান করিলাম। শুনিলাম, বাবুজী যতীশ ভায়ার সহিত মুন্নীর বিবাহ-উৎসবে বিরাজমান হইতে গিয়াছেন। দুই দিন ধরিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইবার মতটা যে স্থির করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে, আর কিছু না হউক, মনের দ্বিধাটা ত মিটিয়া গেল। আমাদের প্রিয় মথুর মহাশয় নিমন্ত্রণ-পত্র হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই সেই মিলনতীর্থাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন। আমি এইরূপ Intermarriageএর পক্ষপাতী বটে। কিন্তু মুন্নীর বিবাহের অনুমোদন করিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, নবদম্পতী চিরসুখী হউন, এখনকার এই কামনা।

২৯শে বৈশাখ। গত July মাসের Contemporary Reviewতে প্রকাশিত Book of Job পাঠ করিতেছি। ইহা জবের আদিম গ্রন্থ—বাইবেলের বিকৃত ও মার্জ্জিত Book of Job নহে। এই কাব্যে জব যেন সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া বিশ্বের হৃদয়-কন্দর হইতে আবহমান কাল যে গভীর বিষাদ ও যাতনার ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে, তাহাই জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গময় ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "সাহিত্যের" * * * মহাশয় বাঙ্গালী কবি-দিগকে এই গ্রন্থ অনুবাদ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমি সে কার্য্যের যোগ্য নহি বটে; তবু কৌতূহলনিবারণের নিমিত্ত দুই একটা শ্লোক বাঙ্গালায় কিরূপ শুনায়, তাই দেখিতেছি—

"ধিক্! সেই! অভাগার জনমের দিন!
ধিক্ নিশি! মাতৃগর্ভে পশিনু যখন;

কেন বিধি সেই নিশা করিলে সৃজন ?
কেন বা উদিল পুন রবির কিরণ ?
কেন না রহিল উহা অন্ধকার-ময় ?
কেন না নিবিড় মেঘে হইল বিলয় ?
হায় ! কেন বর্ষমধ্যে তাহারে গণয় ?
মাসের ভিতরে কেন সংখ্যা তার হয় ?

বোধ হয়, * * মহাশয় কথিত "পাতি-কবি"র মতই হইয়াছে'!

৩০শে বৈশাখ। প্রিয়বর মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ। "পুরোহিত" সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তিনি সম্পাদকীয় টীকা-টিপ্পনীতে যে সকল ছেলেমানুষী ও নিন্দার্হ রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া দিলাম। তিনি কতকগুলিকে দোষাবহ বলিয়া স্বীকার করিলেন, আবার কতকগুলিকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এইরূপ অনবধানতার পরিচয় দিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় অনেকেরই কাছে নিন্দনীয় হইতেছেন। সাময়িকপত্র পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ বহুদর্শিতা আছে। তাঁহার নিকট হইতে আমরা এইরূপ ছেলেমানুষীর আশা করি নাই। বেণোয়ারী বাবুর বিসর্জ্জন কবিতা প্রকাশিত করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বিশেষ লজ্জিত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, গোস্বামী মহাশয়ের নাম দেখিয়া কবিতাটা পাঠ না করিয়াই তিনি উহা প্রকাশ করিবার জন্য দিয়াছিলেন, এক্ষণে বুঝিয়াছেন, কাজটা ভাল হয় নাই। বাস্তবিকই তিনি যদি পাঠ না করিয়াই উহা মুদ্রিত করিয়া থাকেন, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। এক জন সম্পাদকের পক্ষে ইহা গুরুতর দোষের কথাও বটে ; ভরসা করি, ভবিষ্যতে তিনি সাবধান হইবেন।

৩১শে বৈশাখ। আজ সন্ধ্যার সময় মনটা বড় খারাপ হইয়া উঠিল। প্রথম কারণ সু—চন্দ্রের অকারণ ক্রোধ। দ্বিতীয় কারণ, আমার তাস খেলায় অপটুতাদর্শনে প্রিয়বর অক্ষয় বাবুর মনঃক্ষোভ। সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় কবে "নব্যভারতে"র সম্পাদকের প্রবন্ধ সর্ব্বাগ্রে মুদ্রিত হইতে দেখিয়া, উহাকে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন। নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার নূতন বৎসরের প্রারম্ভে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছেন। প্রতিশোধটা সুদ সমেত।—"পরনিন্দাব্যবসায়ী," "গাঁয়ে মানে না", "হাম্‌বড়া" ইত্যাদি। ইহাতে "নব্যভারত"-সম্পাদকের উপর ক্রুদ্ধ হইবার কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু

আমি বেচারী, আমার একমাত্র অপরাধ এই যে, আমি সাহিত্য-সম্পাদকের বন্ধু, আর নব্যভারতে দৈবাৎ দু' একটা প্রবন্ধ দিয়া থাকি। সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় চাহেন যে, যাঁহারা তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বথা তাঁহারই মতে চলিতে হইবে; তিনি কাহারও সহিত কলহ করিলে তাঁহার বন্ধুদিগকেও কোমর বাঁধিয়া সেই কলহে যোগ দিতে হইবে। এরূপ করিলে জগতের বন্ধুত্বটা বড় শুভকর হইবে না। সম্পাদক মহাশয়ের পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই। তাঁহার মধ্যেই নিবদ্ধ হউক; আমরা আদার ব্যাপারী সামান্য বন্ধুমাত্র; তাঁহাদিগকে কেবল ভালবাসিয়াই সুখী। ঝগ-ড়ার কি ধার ধারি।

১লা জ্যৈষ্ঠ। "The Original Poem of Job" পড়িয়া শেষ করিলাম। টেনিসন্, কার্লাইল্ প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসা সত্ত্বেও আমি ইহার তত দূর সুখ্যাতি করিতে পারিতেছি না। দুই হাজার ছয় শত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া ইহার উপর উপরোক্ত মহাত্মাগণের একটা মায়া জন্মিয়া থাকিবে, বোধ হয়। ইহার যত দূর গুণকীর্ত্তন শুনিয়াছি, তত দূর সমর্থন করিতে না পারিলেও, ইহাতে যে একটা সরল, স্বাভাবিক ক্রন্দনের ধ্বনি আছে, তাহা বাস্তবিকই বিলক্ষণ মর্ম্মস্পর্শী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উপসংহারটিও আলোচনার যোগ্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানের মঙ্গল ও শুভপ্রদ অভিপ্রায়ে বিশ্বাস ভিন্ন আমাদের আর অন্য পথ নাই। আমাদের বাসনার অন্ত নাই বটে; কিন্তু ক্ষমতার যে অত্যন্ত অভাব। মানুষ চিরদিন এই বিশ্বপদ্ধতি বুঝিয়া আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই যুগযুগান্তরব্যাপী যত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত. একাল পর্য্যন্ত যে জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, তাহার তুলনা করিলেই, আমরা যে কোনও কালে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিতে পারিব, এরূপ আশা অন্তর হইতে একবারে লুপ্ত হইয়া যায়। তাই বলিতেছি, ভগবানের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগে কোনও ফলই নাই; উহা আমাদেরই শান্তির অপহারক। Job আপনার হৃদয়-ভেদী আক্ষেপের নিষ্ফলতা বুঝিতে পারিয়া অবশেষে ঈশ্বরেরই করে আত্মসমর্পণ করিলেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ। Frondes Agrestes নামক গ্রন্থে প্রসিদ্ধ লেখক Ruskin বলিতেছেন,—"A great Idealist never can be egotistic. The whole of his power depends upon his losing sight and feeling of his own existence and becoming a mere witness

and mirror of truth, and a scribe of visions,—always passive in sight, passive in utterance, lamenting continually that he cannot completely reflect nor clearly utter all he has seen,—not by any means a proud state for a man to be in. But the man who has no invention is always setting things in order and putting the world to rights, and mending and beautifying, and pluming himself on his doings, as supreme in all ways."

রস্‌কিন্‌ তাঁহার উক্তির প্রথমাংশে যাহা বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ প্রতিভার তাহাই লক্ষণ বটে ; কিন্তু সে প্রতিভা জগতে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে সত্য ও মিথ্যা সর্ব্বত্রই জড়িত হইয়া রহিয়াছে। প্রতিভাকে যদি কেবল নিষ্ক্রিয় দর্পণের ন্যায় বলা যায়, তবে ত সত্য মিথ্যা উভয়েই উহাতে প্রতিফলিত হইবে। সুতরাং প্রতিভাকে ঠিক দর্পণ বলা যায় না। উহা বরং নিকষের সহিত তুলনীয়। কারণ, সত্য ও মিথ্যার এরূপ পরীক্ষা আর কোথাও হয় না। উহাকে দীপ্ত দীপার্চ্চিঃস্বরূপও বলা যাইতে পারে। কারণ, মানুষ উহার সাহায্যে বহুদূরস্থিত সত্য পদার্থ দৃষ্টিগোচর করেন। আর একবারে সোজা পথে তাহার সন্নিধানে গিয়া উপনীত হন। প্রতিভাহীন ব্যক্তিকে পদে পদে, সন্তর্পণে, যুক্তিতর্কের দ্বারা পথ হাতড়াইয়া যাইতে হয়। রস্কিনের উক্তির শেষভাগ তত সুস্পষ্ট নহে। তিনি কি বলিতে চান যে, উদ্ভাবনী শক্তি শৃঙ্খলা ও সংস্কারের নিতান্ত বিরোধী ?

৩রা জ্যৈষ্ঠ। সকালে সাতটার সময় বেণিয়াটোলা-নিবাসী এক জ্যোতির্ব্বিদের নিকট গমন করিলাম। ভাগ্য-গণনা ইঁহার ব্যবসা নহে ; তবে গুরুর বরে যে বিদ্যালাভ করিয়াছেন, তাঁহারই আজ্ঞানুসারে বন্ধু বান্ধবদিগের উপকারার্থ সেই বিদ্যার পরীক্ষা করিয়া থাকেন। লোকটির উপর তেমন বেশী কিছু ভক্তি বা বিশ্বাস হইল না। তবুও, তিনি আমার জীবন সম্বন্ধে যে কয়টা ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, তাহা এই স্থলে লিখিয়া রাখিতেছি। পরে মনে না থাকিতে পারে।—আমাকে এখনও তিন চারি বৎসর শিক্ষকতা করিতে হইবে। তৎপরে ওকালতী, অথবা যাহাতে সামান্য লোকের সাহায্য প্রয়োজন, এরূপ কোনও কার্য্য করিতে হইবে। পুস্তক প্রকাশ করিয়া আমার রীতিমত আয় হইবে। ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে বিষম রোগাক্রান্ত হইব ; কিন্তু প্রাণটা একবারে

যাইবে না। কাশ, * * * * মস্তিষ্ক-রোগ প্রভৃতি এই শরীরকে অধিকার করিবে। ৩৫ বৎসরের পর আমার বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা। এক ম্লেচ্ছজাতীয় ভদ্রলোক আমার সহায় হইবেন। ম্লেচ্ছ অর্থে সাহেব, মুসলমান, বা ব্রাহ্ম। বিবাহ বিষয়ে গণক মহাশয় বলিলেন যে, উহাতে আমার বিদ্বেষ আছে। যদি ৩৫ বৎসরের মধ্যে না হইয়া যায়, তবে আর কখনও হইবে না।—উক্তিগুলা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম বটে; কিন্তু যে কয়টা রোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়া আর কিছু সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবার সম্ভাবনা অতি কম। আমার ত এই মনে হয়।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ। Cenci-নাটকের পাঠ শেষ হইল। বহু দিন হইল, প্রথম যখন পুস্তকখানি পাঠ করি, তখন ইহার বিশেষত্ব ততটা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। Cenciকে নরদেহধারী একটা পিশাচের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, এবং তাহার প্রাকৃতিকবন্ধনোচ্ছেদকারী কঠোর হৃদয়ের গাঢ় কালিমায় মন যেন ভয়ে ও বিস্ময়ে একবারে অভিভূত হইয়া পড়িত। এখন সে ভীতির ভাব আর নাই। কতকটা ঘৃণা, কতকটা দুঃখ করুণা এক্ষণে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। Shelleyর কৌশল Beatriceএর চরিত্রচিত্রণে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। Beatrice পিতৃবধের পাপভাগিনী বটে; কিন্তু কবি তাহাকে যে কোমলতাময়ী সুন্দরী রমণীরূপে পরিচিত করিতে চান, তাহা আমরা কখনই বিস্মৃত হই না। Cenciর হত্যার পর Beatrice-এর ব্যবহার কতকটা রহস্যময় এবং অসঙ্গত বলিয়া প্রথমতঃ মনে হয় বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে উহার ভিতর কবির অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। Beatrice-চরিত্রে কোমলতা ও সৌকুমার্য্যের সহিত দৃঢ়তা ও কঠোরতার সামঞ্জস্য হইয়াছে। কিন্তু রমণী যতই দৃঢ়তার ভান করুক না কেন, পরিণামে রমণীই থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান চরিত্র তাহারই দৃষ্টান্ত।

৫ই জ্যৈষ্ঠ। বৈশাখ মাসের "সাহিত্যে" প্রিয়বর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের "সন্ধ্যা" নামক একটি পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতার ভাষাটা খুব গম্ভীর করিবার নিমিত্ত আয়াস ও পরিশ্রমের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইল। অবশ্য, সকল স্থলে এরূপ আয়াস ও শ্রম নিতান্ত নিন্দার কথা নহে; কিন্তু সে আয়াস-শ্রম পাঠকবর্গ যাহাতে ধরিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য;—There is an art to conceal art, অক্ষয় বাবু তাহা করিতে পারেন নাই। পরন্তু, তাঁহার কবিতার আগাগোড়া অসঙ্গতি-

দোষে দুষ্ট, এবং অনেক স্থলে কোনও অর্থই ঠিক করিতে পারা যায় না। অক্ষয় বাবুর আজ-কালকার রচনার এই দোষটা বড় বেশী মাত্রায় প্রবেশ করিতেছে। তিনি বাছিয়া বাছিয়া যে শব্দগুলি নির্ব্বাচন করেন, তাহারা প্রায়শঃ অতি সুন্দর ও সুমিষ্ট; কিন্তু যে যে স্থলে উহাদিগকে প্রয়োগ করিতেছেন, সেই সেই স্থলে সেরূপ শব্দের কোনও প্রকার সার্থকতা আছে কি না, তাহা আদৌ ভাবিয়া দেখেন না। ইহাতে রচনা নিতান্ত কৃত্রিম হইয়া পড়ে, এবং কষ্ট-কল্পনা-সম্ভূত বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বক্ষ্যমাণ কবিতাটি প্রাকৃতিক সন্ধ্যার বর্ণনা বটে, কিন্তু উহা যেন ঘরের ভিতর বসিয়া, দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া, গ্যাসের আলোকে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

৬ই জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কাব্যের প্রথম কবিতা "সোনার তরী"র আলোচনা করিতেছিলাম। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ এ পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেবল সু—চন্দ্র ও ন— বাবু, বাস্তবিক বুঝুন আর না বুঝুন, বুঝিবার ভান বিলক্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্দেশ্যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা তিনি সেদিন এক বন্ধুর নিকট বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—আমি মাতৃভূমিকে আমার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট অক্ষয় যশ প্রতিদান স্বরূপ চাহিলাম। কিন্তু প্রতিদান পাইলাম না, অর্থাৎ আমি নিতান্ত দীন দরিদ্র, আমার যাহা কিছু ছিল, তাহাও অতি সামান্য, সুতরাং আমি বঙ্গীয় সমাজে স্মরণীয় হইতে পারিলাম না। অর্থ মন্দ নহে; কিন্তু কবিতার ভাষায় এই অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া, উদ্দেশ্য ও অর্থ মিলাইতে মিলাইতে শেষ শ্লোকের নিকট এক রকমে পঁহুছিলাম। তার পর,

> ঠাঁই নাই; ঠাঁই নাই; ছোট সে তরী,
> আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি;

এইখানে আসিয়া একবারে হাল ছাড়িয়া দিতে হইল। সুতরাং রবীন্দ্র বাবুর নিজকৃত ব্যাখ্যা সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

৭ই জ্যৈষ্ঠ। সংসারে সচরাচর দুই রকম লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল কিছু গম্ভীরপ্রকৃতি; জীবনের সকল কার্য্য, সকল ঘটনা একটু তলাইয়া বুঝিয়া দেখিতে চান। প্রয়োজন না দেখিলে কোনও বিষয়ে হাত দেন না। চিরদিন একটা মহান আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া জীবনগত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ কথাবার্ত্তা নিয়মিত করেন। ইহারা হাস্যরস রসিকতার বিরোধী নহেন;

কিন্তু উঁহাকে হৃদয়ের সমগ্র ভাগটা ছাড়িয়া দিতে বড়ই নারাজ। সংসারে হাস্যের, রস-রসিকতার স্থান আছে বটে, কিন্তু সে স্থান গাম্ভীর্য্যের অনেক নিম্নে। যেমন ভোজনকালে চাটনী নহিলে চলে না, সেইরূপ সংসারসংগ্রামে হাস্যেরও প্রয়োজন আছে। তবে ইহাও সর্ব্বদা স্মরণীয় যে, চাটনীর উদ্দেশ্য কেবল রসসঞ্চয়ের সাহায্য, উদরপূর্ত্তি নহে। দ্বিতীয়দলভুক্ত মহাশয়েরা মানুষের জীবনটাকে বালকের ক্রীড়াপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য কেবল রস, কেবল রঙ্গ, কেবল প্রহসন। একটা কাজের কথা দৈবাৎ কর্ণগোচর হইলে সলিলস্পৃষ্ট অহিফেনসেবীর ন্যায় ইঁহারা একবারে ভয় ও বিস্ময়ে আঁৎকিয়া উঠেন। সে যাহা হউক, ইঁহাদিগকেও সহ্য করিতে পারা যায়। কিন্তু উপরোক্ত দুই দলের মধ্যবর্ত্তী আর এক তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছেন, ইঁহাদের কার্য্যকলাপ এবং কথা-বার্ত্তা নিতান্তই অসহ্য। ইঁহারা গাম্ভীর্য্যের সহিত রঙ্গ রসের, সত্যের সহিত মিথ্যার এরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করিয়া একটা অদ্ভুত খিচুড়ী প্রস্তুত করেন যে, তাহা গলাধঃকরণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইঁহারা এক মুখ দিয়া উষ্ণ ও শীতল দুই প্রকার নিশ্বাসই বাহির করিয়া থাকেন। ইঁহাদের চরিত্র অতি দুর্জ্ঞেয়।

৮ই জ্যৈষ্ঠ। কবিবর Wordsworth প্রণীত Excursion কাব্যের প্রথমাধ্যায় পাঠ করিলাম। দেখিলাম, কলেজের পড়া কোনও কাজেরই হয় নাই। সামান্য সাধারণ ঘটনা ও চরিত্রের উপর নির্ভর করিয়া কবিবর কি চমৎকার কাব্যই গ্রথিত করিতেন! Margaretএর বিবরণে উপন্যাসোচিত কোনও প্রকার আতিশয্যের সাহায্য নাই। নায়ক নায়িকার উদ্দাম হৃদয়োদ্গারিত প্রেমের অগ্নিস্রাব নাই। বাঙ্গালা নাটকের একমাত্র সম্বল হা হতোস্মি হা দগ্ধোঽস্মি ইত্যাদি ক্রন্দনের কোনও প্রকার পন্থাই অবলম্বিত হয় নাই। কবি নিতান্ত সরলভাবে সরল জীবনের সরল ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই সরল বর্ণনার কি অপূর্ব্ব প্রভাব! যেমন ধীরে ধীরে নীরবে অভাগিনীর অদৃষ্টচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তেমনই নীরবে ধীরে ধীরে পাঠকের হৃদয়াকাশে একটা ছায়াময় গাঢ় মেঘ যেন ঘনাইয়া উঠিতেছে। অবশেষে যখন অভাগিনীর জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৃহস্থলীর সর্ব্বত্র একটা বিষাদময় পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ অনুভূত হইতে লাগিল। তখনকার সেই করুণ বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে হৃদয়াকাশের সেই মেঘ যেন বর্ষণোন্মুখ হইয়া উঠে। কিন্তু বিন্দুমাত্র অশ্রুও ত ঝরে না। কাব্য শেষ

হইয়া গেল। কবির প্রদত্ত আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিলাম, আমরা কাঁদিতেও পারিলাম না; কেবল ঘনমেঘময়ী সেই ছায়া আমাদের হৃদয়দেশকে যেন চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া রহিল। অভাগিনীর কাহিনী যেন আমাদেরই জীবনের এক অংশরূপে পরিণত হইল।

৯ই জ্যৈষ্ঠ। সু—চন্দ্রকে গৃহপরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। সুতরাং "সাহিত্যে"র পুরাতন আখড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নূতন বাড়ী এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে; এই গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে সর্ব্বদা যাতায়াতের আর সুবিধা নাই; কাজেই এখন দিনগুলা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিজের কুটীরে বসিয়াই কাটাইতে হইতেছে। বৈকালে ছয়টার পর একবার বাহির হইলাম; পথিমধ্যে নূতন সাহিত্য আফিসের ঠিকানাটা জানিতে পারিয়া একবার তাহার অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু সফল হইলাম না। হীরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইলাম। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত নানাবিধ কথোপকথনে কাটিয়া গেল। হীরেন্দ্র বলিতেছিলেন যে, বঙ্কিম বাবুর কতকটা সন্দেহ হইয়াছিল যে, গীতার শেষ ছয় সর্গ প্রক্ষিপ্ত। তাহার কতকটা প্রমাণ এই যে, বিশ্বরূপ-দর্শনেই ইহার পরিসমাপ্তি হইলে আমাদের আর কোনও আকাঙ্ক্ষাই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবু সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথ বলেন, গীতায় যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, এই মত প্রথমতঃ বঙ্কিম বাবুই প্রচারিত করেন। হীরেন আর একটা কথা বলিলেন; তাঁহার মতে, উক্ত মহাগ্রন্থে বেদান্ত, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল, এই ত্রিবিধ দর্শনের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।

১০ই জ্যৈষ্ঠ। Goethe বলিয়াছেন,—"The rhythm is an unconscious result of the poetic mood. If one should stop to consider it mechanically, when about to write a poem, one would become bewildered and accomplish nothing of real poetical value."—মহাকবির উক্তি সত্য হইলেও কাব্যগত ছন্দের ঝঙ্কার যে নিতান্তই কোনও অনির্দ্দেশ্য-কারণ-সম্ভূত, চেষ্টার সহিত যে ইহার আদৌ কোনও সম্পর্ক নাই, এ কথা বলা যায় না। মহাকবিদিগের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া সমালোচকগণ যে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। ঝঙ্কারের মধুরতা-সাধন সম্বন্ধে বাক্যালঙ্কারের সাহায্য যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা কাব্যামোদিমাত্রেই স্বীকার

করিবেন। কিন্তু এই সকল অলঙ্কারের অতিরিক্ত যে পদার্থ, তাহা এতাধিক সূক্ষ্ম যে, এ পর্য্যন্ত কোনও সমালোচক উহাকে ধরিতে পারেন নাই। Mathew Arnold উহাকে "high seriousness" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই seriousness কেবল ভাষা বা ভাবগত নহে,—উভয়ই। তবে এই seriousness বুঝিবার নিমিত্ত আবার আরণল্ডের ন্যায় সমালোচকের আবশ্যক; ইহা সাধারণ পাঠকের সর্ব্বদা আয়ত্তাধীন নহে। সে যাহা হউক, পদার্থটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, কেবল বাক্যালঙ্কারে যদি কার্য্য সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" কাব্যকে কাব্যগত ঝঙ্কারের একখানি উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়।

১১ই জ্যৈষ্ঠ। জার্ম্মন-কবি Goethe প্রণীত Faust এবং বঙ্গীয় কবি রবীন্দ্রনাথ প্রণীত "ছবি ও গান", এই দুই পুস্তকের অল্পাধিক আলোচনায় সমস্ত দিবাভাগটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় প্রিয়বর অক্ষয় বাবুর উদ্দেশে বাহির হইলাম। রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত নানা কথায় অতিবাহিত হইল। বড়াল-কবি নূতন প্রণীত একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। বিদায়-কালে চুণী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অক্ষয় বাবুর শিশুটির অকস্মাৎ জ্বর হইয়াছে; তিনি দেখিবার জন্য চলিয়া গেলেন। আমরাও নিজ নিজ গৃহাভিমুখে চরণদ্বয় চালনা করিলাম। একত্র উপবিষ্ট গোপাল বাবু ও চণ্ডী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। চণ্ডী বাবু তাঁহার "বিদ্যাসাগর-জীবনচরিতের" কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "উপক্রমণিকাভাগ শ্রবণ করিয়া নারায়ণ বাবু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন; তিনি অর্থ-সাহায্য পর্য্যন্ত করিতে চাহিয়াছেন। উপক্রমণিকাংশ আপনি পাঠ করিলেও নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন। উহা যে আমার চেষ্টায় এত দূর সুন্দর হইয়াছে, তাহা নহে; কেমন শুভ মুহূর্ত্তে কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছিলাম, জিনিসটা দৈবাৎ কেমন খুব ভালই বাহির হইল।"—ইত্যাদি। আর বেশীক্ষণ সেখানে অবস্থান করিলে আবার কি শুনিতে হয়, এই ভয়ে আমি বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। গোপাল বাবুও উঠিলেন। তার পর যথা পূর্ব্বং— আহার ও নিদ্রা।

১২ই জ্যৈষ্ঠ। নিজের ক্ষুদ্র কুঁড়ের ভিতর বসিয়া সমস্ত দিবস Faust পাঠ। সন্ধ্যার সময় গোপাল বাবুর সহিত সু—চন্দ্রের বাটীতে গমন। তার পর তোপের শব্দে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ভোজন আর শয়ন। দিনগুলা ত প্রায় এইরূপেই যাইতেছে। চিরদিন একই ভাব। রীতিমত একটা বৈচিত্র্য

বা নূতনত্ব কোনও দিন অনুভব করিতে পারিলাম না। উদয়ের পর অস্ত, অস্তের পর উদয়, রবিদেবের এই সনাতন ব্যবহার হইতেই বুঝিতেছি, যে জীবনের এক একটা দিন চলিয়া যাইতেছে। নতুবা দিন গণনা করিবার আর ত উপায় খুঁজিয়া পাই না। তাই ভাবি, এই ত মহাপুরুষের জীবন; ইহার আবার ডায়ারী কি? প্রতিদিন সকালে উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, ভাঙ্গা তপ্তপোষের উপর, এই শতধা-বিচ্ছিন্ন মাদুর-আসনে বসিলেই, একটা মহাভাবনা—কি লিখি? দুটা ভাল কথা লেখা ত চাই। যখন মনের কথাগুলা অক্ষরবদ্ধ হইতেছে, তখন অবশ্যই কোনও কালে কাহারও না কাহারও হাতে পড়িবে। সেই ভবিষ্যৎ পাঠক মহাশয় যেন আমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ, দাম্ভিক, অন্তঃসারশূন্য বলিয়া মনে না করেন। কিন্তু ভাল বিষয় ত মাথার ভিতর খুঁজিয়া পাই না। তাই অনেক সময় এই ঝকমারীর উদ্‌যাপন করিতে বাসনা হয়। তার পর, একবারে মূক, স্তব্ধ, নির্ব্বাক!

১৩ই জ্যৈষ্ঠ। Faust কাব্যের প্রথমাংশ শেষ করিলাম। পুস্তকখানিতে তদানীন্তন কালের ঘটনা এবং লোক জনের এত উল্লেখ দৃষ্ট হয় যে, পদে পদে টীকার সাহায্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। টীকার আলোচনা করিয়াও আমি যে সকল স্থানের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি, এমন মনে হয় না। সকল দৃশ্যের সহিত সমগ্র গ্রন্থাংশের সম্পর্ক কি, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। Faust বিষয়ে কাব্য লিখিতে গিয়া মহাকবি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় সাহিত্য-সম্বন্ধীয় শত্রুদিগের উপর এরূপ তীব্র বাণ বর্ষণ করিয়া কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। কোনও সমালোচককে ত এ বিষয়ে কোনও কথা বলিতে দেখি না। কিন্তু সে সব কথা থাক্। মহাকবির কল্পিত Margaretএর বৃত্তান্তটি কি মর্ম্মভেদী! মানুষ ও সয়তান উভয়ে মিলিয়া এক জন অসহায়া সরলা বালিকার যে সর্ব্বনাশসাধন করিবে, ইহা বড় বিস্ময়কর নহে। সংসার-রঙ্গভূমের এ ত নিত্যনৈমিত্তিক খেলা। তাই বলিয়া আমরা মনকে ত বুঝাইতে পারি না। মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে এই সকল ঘটনার সম্ভাবনা কেন, মানুষ সহস্র চেষ্টা করিয়াও ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব-মোচনে সমর্থ হয় না কেন, ইত্যাকার শত শত প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়। তাহাদের মীমাংসা করে কে? গ্রন্থের প্রারম্ভে Faust জানিতে চাহিয়াছিল,—"Thee, boundless Nature, how make thee my own?" মনুষ্য-সমাজ চিরদিন এই প্রশ্ন করিয়া আসিতেছে। এই চির-অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে?

১৪ই জ্যৈষ্ঠ। চৈতন্যের জীবনী পাঠ করিতেছিলাম। তাঁহার মৃত্যু-কাহিনী পড়িলে পাষাণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমিও উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারি নাই। নিম্নে তাহার পরিচয়,—

চৈতন্যের দেহত্যাগ।

১

নিশীথের শুভ্র মেঘাসনে
পূর্ণশশী শোভিছে গগনে ;
কিরণ-বসন-পরা
শোভে সুপ্ত বসুন্ধরা
বসন্তের কুসুম-শয়নে।

২

শব্দহীন, স্তব্ধ চারিধার,—
চিত্রে যেন সমুদ্র অপার !
শুধু দূরে কদাচিৎ
কম্পিত হ'তেছে গীত
উচ্চকণ্ঠে নৈশ পাপিয়ার।

৩

গভীর-গম্ভীর সব ঠাঁই ;—
সৌন্দর্য্যের-আদি অন্ত নাই।
নয়ন নিমেষহীন ;
আত্মহারা উদাসীন,
শূন্যমনে ফিরিছে নিমাই।

৪

গন্ধামোদে মুগ্ধ অতিশয়,
স্বপ্নভরা শান্ত সে নিলয়,
যুগ-যুগান্তের কথা
অযুত বিস্মৃত ব্যথা
উচ্ছ্বসিয়া উঠে সমুদয় !

৫

কি নির্ঝর অন্তরে উথলে,
গোরা শুধু ভাসে আঁখিজলে ;
হৃদয়-বীণাতে তাঁর
কি সঙ্গীত অনিবার,
মুখে 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' শুধু বলে !

৬

সমুখে বিশাল শোভে পদ্মদহ ;
হেরে গোরা ভাবে গদগদ ;—
যেন কালিন্দীর নীর
অচল, স্তম্ভিত, স্থির ;
তাহে দিব্য নীল কোকনদ।

৭

তদুপরি স্থাপি' দু' চরণ
নাচে কালা বৃন্দাবন-ধন ;
অধরে মুরলী খেলা,
গলে দোলে বনমালা,
কটিতটে পীত আবরণ।

৮

"হা কৃষ্ণ ! কপট, সুচতুর !
দয়া তব হ'ল কি নিঠুর !
এতদিন পরে, হায়,
এই সেই যমুনায়
দেখা আসি দিলে কি ঠাকুর !"

৯

প্রাণপদ্ম উঠিল বিকশি,
আজন্মের ঘুচিল তামসী,
যেন কোন্ মন্ত্রবলে
ঝাঁপিয়া পড়িলা জলে—
অস্ত গেলা নদীয়ার শশী !

১৫ই জ্যৈষ্ঠ। Goethe বলিয়াছেন,—"I was very careful not to write down a line which was not good and might not be allowed to stand." রচনা-সম্বন্ধে কবিগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইংরাজ-কবি টমাস্ গ্রে, মনের ভিতর কোনও পংক্তির উদয় হইলে, মনে মনে তাহার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া তবে লিপিবদ্ধ করিতেন গোল্‌ড্‌স্মিথের প্রথা আরও সতর্কতার পরিচায়ক। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার ভাবরাশিকে গদ্যে লিখিয়া যাইতেন; তার পর উহাদিগকে পদ্যে পরিণত করিতেন; অবশেষে, বিশেষ পরিশ্রমসহকারে লাইনগুলিকে সংস্কৃত এবং মার্জ্জিত করিতেন। আর এক দল তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছেন, ইহাঁরা সংশোধন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভব করিতে পারেন না। ইহাঁরা মনে করেন যে, কলমের মুখে যাহা কিছু বাহির হইতেছে, তাহাই বেদবাক্যবৎ লোকের আদরণীয় হইবে। "আমার কবিতায় কাটাকুটি করিতে হয় না"—এই কথা বলিয়া অনেককেই গর্ব্ব করিতে শুনা যায়। কিন্তু বড় বড় কবিদিগের কথা ভাবিলে ইহাতে গর্ব্বের কোনও কারণই লক্ষিত হয় না। ইহাতে বরং যত্নাভাব ও অসাবধানতারই পরিচয় পাওয়া যায়। গেটে এবং গ্রের অবলম্বিত প্রথায় অনেক সুবিধা আছে। আমি উহার সম্পূর্ণ অনুরাগী।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। "সখা" "সাথী"র সহিত সম্মিলিত হইয়া "সখা ও সাথী" নামে বাহির হইয়াছেন। এই সম্মিলন প্রীতিকর হয় নাই। যে "সখা" আজ একাদশ বৎসর ধরিয়া সম্মানের সহিত চলিয়া আসিতেছিল, যাহা বালক-বালিকাদিগের সহিত বাস্তবিকই একটা আজন্মের সখিত্ব স্থাপন করিয়াছিল, তাহা যে এরূপে অকস্মাৎ একটা আধুনিক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট "সাথী"র সহিত এক হইয়া যাইবে, তাহা কেহই আশা করেন নাই। শুনিলাম, এ বিষয়ে, "সখা"র ভূতপূর্ব্ব পরিচালক মহাশয়ের বড় দোষ নাই। তাঁহাকে নিতান্ত বাধ্য হইয়া এই সম্মিলনে সম্মতি দিতে হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা * * * এই অঘটন ঘটাইলেন, তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করা দূরে থাক্, স্পষ্টাক্ষরে নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। প্রমদাচরণ স্বর্গে থাকিয়াও ইহার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। * * * * *
লাভের মধ্যে কেবল আমাদের প্রিয় "সখা" মাটী হইয়া গেল। চক্রে পড়িয়া কত জীবন্ত মানুষই মাটী হইয়া যায়, "সখা" ত "অচল পদার্থ"!

১৭ই জ্যৈষ্ঠ। পিতৃদেব মহাশয় বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার এই

বৃদ্ধ বয়সের একান্ত বাসনা যে, পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সুখী করি। প্রথম বিবাহের সময়ও তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও কত সময়ে, কত বিষয়ে তিনি যে ঠিক উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার হিসাব নাই। যাহাতে তাঁহার অসম্মান করা হয়, এরূপ কোনও কথা বলিতেছি না, তাঁহার প্রতি অভক্তিসূচক কোনও চিন্তাও যেন ভগবান এই মনের ভিতর উদিত না করেন। কিন্তু "ভালবাসার অত্যাচার" বলিয়া যে কথাটা "বঙ্গদর্শন" প্রচার করিয়াছেন, তাহা যে নিতান্ত কাল্পনিক নহে, সেই কথাই বলিতেছি। পিতৃদেব আমাকে এবার মার্জনা করিবেন, তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা। আমি একবার তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিয়া উপস্থিত বিষয়ে যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধাচারী হইতে কিছুতেই সাহস হয় না। বাবু উপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় Thackeray, Dickens প্রভৃতির দুই একখানা নবেলের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিবাহে ইহাঁরা সুখপূর্ণ জীবনের বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল মনীষী জগত্তত্ত্ব ত রীতিমত বুঝিতেন। কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র হইতে এ সব বিষয়ে কোনও নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করা যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। সুতরাং উ—বাবুর কথায় সায় দিতে পারিলাম না।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ। প্রতিভার মৌলিকতা সম্বন্ধে গেটে বলিতেছেন,— "People talk for ever of Originality, but what does it all mean? As soon as we are born, the world begins to operate upon us, and continues to do so to the end. And everywhere, what can we call especially our own, except energy, strength, and will? If I should declare for how much I am indebted to great predecessors and contemporaries, there would not be a great deal left." আর এক সময়ে Eckermann কে বলিয়াছিলেন—It is true that we bring capacities into life with us, but we owe our development to the thousand influences of a great world, from which we assimilate all we can ... ... The main thing is that a man has a soul loving the Truth and accepting it wherever he finds it. But the world is now so old, and for thousands of years past so

many important men have lived aud thought, that few positively new things can be discovered and said." কবিবরের কথা যে নিতান্ত সত্য, তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক করে না। তবে কোনও কোনও বিষয়ে দুই একটি নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত না হইতেছে, এমন নহে।

চট্টলে ইছামতী।

মানবপ্রকৃতি বহুলপরিমাণে নৈসর্গিক-নিয়ম-পরতন্ত্র। ইন্দ্রিয়গোচর কার্য্যমাত্রেরই তত্ত্ব বা কারণের অনুসন্ধানে মানবের স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। যতক্ষণ কার্য্যের যথার্থই হউক অযথার্থই হউক একটি কারণনির্দ্দেশ করা না যায়, ততক্ষণ অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। যেখানে পরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মে সমস্যার সমাধান-সম্ভাবনা লক্ষিত হয় না, সেইখানেই প্রকৃতিবহির্ভূত অলৌকিক শক্তির আশ্রয়গ্রহণ অপরিহার্য্য; সেইখানেই দেবত্বের প্রভাব কার্য্যের অন্তরালে লুক্কায়িত। যেখানেই সাধারণ অবস্থার অতীত বিশেষত্বের উপলব্ধি হয়, সেইখানেই প্রাকৃত লোকে দেবতার আবির্ভাব স্থির করিয়া লয়। এই বিশেষত্বের ফলেই দেবতার অভ্যুদয়। এইরূপে জলের বা স্থলের বিশেষত্বে তীর্থের উৎপত্তি। মানবপ্রকৃতি যুগে যুগে কত দেবতা ও তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বিশেষত্বে বা অদ্ভুতত্বেই তীর্থের পুণ্যতা। শাস্ত্র বলিতেছেন,

> প্রভাবাৎ অদ্ভুতাৎ ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
> পরিগ্রহবিশেষাৎ তু তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥

ভূমির কোন অদ্ভুত শক্তি (আশ্চর্য্য উর্ব্বরতা প্রভৃতি) সলিলের কোন অদ্ভুত শক্তি (রোগনিবৃত্তিকরণাদি) অথবা, কোনও মহাপুরুষের জন্মস্থান, বা আবাস বলিয়া, তীর্থের পুণ্যতা কীর্ত্তিত হয়। ভারতে যতগুলি তীর্থ ছিল, বা আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি যে শাস্ত্রোক্ত একটি না একটি কারণে হইয়াছে, চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। যে কয়েকটি জলময় তীর্থ আছে, তাহাদের সকলেরই সলিলে বিশেষ তেজ বিদ্যমান। স্নানে মনের তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি। "অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি"। দেহের সহিত মনের নিত্য সম্বন্ধ। একের পবিত্র ভাবে অন্যে পবিত্রতা না আসিবে কেন?

দেখিতে পাওয়া যায়, সলিলপূজা ও সলিলোপাসনা পৃথিবীর প্রায় সকল সম্প্রদায়ের ভিতর কোন না কোন প্রকারে বিদ্যমান। পাশ্চাত্য দেশের আদিম সভ্য মিশর, এসিরিয়া, গ্রীস, রোম হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সভ্যজাতি পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই সলিলের অর্চ্চনা বা জলসংস্কার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে ঋগ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সলিলপূজা বিদ্যমান রহিয়াছে।

সলিলের বিশেষ শক্তি দেখিয়া প্রথমতঃ তাহাতে একটি অলৌকিক বা দৈব প্রভাবের সত্তা কল্পিত হয়। দেবতা জলময়ী মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হন। ক্রমে ব্যাবৃত্তির সহিত জলময়ী মূর্ত্তি হইতে সূক্ষ্ম মনোময়ী মূর্ত্তি বিশ্বাস-আসনে প্রকাশিত হয়। পরে পূজোপহারের সুবিধার জন্য ভৌতিক মূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে প্রথমে জলের পূজা, পরে সলিলাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা, অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের ইছামতী পূজা ইহার একটি প্রমাণ।

ইছামতী নামটি ইচ্ছামতী নামের অপভ্রংশ। ইচ্ছামতী কর্ণফুলী নদীর একটি করপ্রদায়িনী স্রোতস্বতী। কর্ণফুলী উত্তর-পূর্ব্বে চট্টল নগরীকে মেখলার ন্যায় ঘিরিয়া দক্ষিণাভিমুখে বঙ্গসাগরে পড়িয়াছে। উত্তর-পূর্ব্বস্থ বংশতৃণাচ্ছাদিত নানাবৃক্ষপরিবৃত পাহাড় হইতে নিঃসৃত হইয়া কুল-কুল রবে কর্ণফুলীতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। ইছামতীতে কখনও জোয়ারে স্রোত ফিরে না। জল সর্ব্বদাই নিম্নগামী। এই প্রকারের স্রোতস্বতীকে চট্টগ্রামে "ছরা" বলে। ইছামতীর বিস্তার ও গভীরতা সামান্য। ইছামতী কর্ণফুলীর সহিত যেখানে মিলিয়াছে, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে শিলক নামক ক্ষুদ্র নদ আসিয়া পড়িয়াছে। এই তিন প্রবাহের মিলনস্থলে জলের আবর্ত্ত বা "পাক" অতিশয় ভয়াবহ। অনেক সময় নৌকা জলমগ্ন হইতে দেখা গিয়াছে। যাহারা বাঁশ বা কাঠ কাটিবার জন্য ইছামতী দিয়া পাহাড়ে যাইত, তাহারা নিরাপদে প্রবাহত্রয়ের সঙ্গম অতিক্রম করিবার মানসে ইছামতীর মানত করিত। ছাগ, হাঁস, হাঁসের ডিম্ব, পারাবত, ফল, পুষ্প ইত্যাদি ইছামতীর তৃপ্তির জন্য প্রদত্ত হইত। শিলক নদেও ঐরূপ উপহার দিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ, সকলেই ঐরূপ পূজোপহার প্রদান করিত। ক্রমে ইছামতীতে স্নান করিয়া অনেক রোগী রোগমুক্ত হইল। ইছামতীর উভয় পার্শ্বে লোকের বসতি আছে। স্থান বেশ স্বাস্থ্যকর, এবং ফলাদিও প্রচুর জন্মে। ক্রমে সাধারণের ইছামতীর প্রতি ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হইল। তাঁহার ভয়াবহ শক্তি ও সলিলের অদ্ভুত প্রভাবে সাধারণের

বিশ্বাস জন্মিল। ইছামতী সম্বন্ধে অনেক ভীতিজনক ও বিস্ময়োদ্দীপক গল্পও প্রচলিত আছে। তাহার যথার্থ কোনও ভিত্তি লক্ষিত হয় না। এইরূপে ইছামতী সলিলময়ী দেবীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ইছামতী যেখানে কর্ণফুলীর সহিত মিলিয়াছে, তাহার কিছু উত্তরে ইছামতীর তীরে এক খণ্ড সমান ভূমি আছে, তাহাকে ইছামতীর চর বলে। ঐ স্থানটি রাঙ্গুনিয়া থানার এলাকায়। যাহারা মানত করিত, ঐখানে নদীতীরে ছাগ বলি দিয়া ছাগদেহ সলিলে নিক্ষেপ করিত। ইছামতীর স্বচ্ছ সলিল শোণিতরঞ্জিত হইয়া ভক্তের মনে অনির্ব্বচনীয় ভাব জাগাইয়া অভিনব শোভা ধারণ করিত। ক্রমে ইছামতীর স্বীয় পূজা-প্রচারে ইচ্ছা হইল। রাঙ্গুনিয়ায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া বলিলেন, তুমি আমার মূর্ত্তি গড়াইয়া মন্দিরে স্থাপনপূর্ব্বক পূজা প্রচার কর ; তোমার দরিদ্রতা দূর হইবে। দেবীর ধ্যান মন্ত্রাদিও স্বপ্নে উপদিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্বপ্নদৃষ্টানুরূপ মূর্ত্তি গঠন করাইলেন। ভিক্ষা করিয়া খড়ের চালের মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, এবং মূর্ত্তিস্থাপন করিয়া প্রত্যহ পূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমে স্বপ্নের প্রবাদ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। লোকে আরোগ্যকামনায় ইছামতীর পূজা মানত করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক পুত্রকামনায়, ব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ের উন্নতিকামনায়, ইছামতীর মানত আরম্ভ করিল। কামনা সিদ্ধ হইলে ছাগাদি বলিদান সহ পূজা দিয়া আসিতে লাগিল। চট্টগ্রাম জেলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানের লোকই ইছামতীর পূজা দিতে আসিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের দরিদ্রতা ঘুচিল। পাকা মন্দির নির্ম্মিত হইল।

বর্ত্তমান সময়ে চট্টগ্রামের প্রায় গৃহে গৃহে ইছামতীর পূজা মানত করিবার কথা শুনা যায়। যাহারা আরোগ্যকামনায় মানত করেন, তাঁহারা মস্তকের দক্ষিণ ভাগে এক গোছা চুল রাখিয়া দেন ; কেহ কেহ বা নখ রাখিয়া থাকে। পূজা দিবার সময় ইছামতীতে গিয়া ঐ কেশগুচ্ছ বা নখ কর্ত্তন করিতে হয়। কেহ মস্তক মুণ্ডনও করিয়া থাকেন। পরে মানতকারী ইছামতী নদীতে স্নান করিয়া পূজা দেন। বসন, ছাগ, ফল পুষ্পাদি দেবীর পূজার উপকরণ। স্ত্রীলোকে মানত করিলে পূজা দিবার সময় কেশের অগ্রভাগ কর্ত্তন করে। ইতর ভদ্র সকলেই ইছামতীর মানত করে ; তবে ইতর শ্রেণীতে কিছু বেশী। মুসলমান ও বৌদ্ধেরাও অনেক সময় ইছামতীর পূজা মানত করে। অনেক স্থলেই তাহারা হংস পারাবত হংসডিম্ব ফলপুষ্পাদি ইছামতীতে উপহার দিয়া নিবৃত্ত

হয়। কোথাও কোথাও বা ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজা দিবার কথাও শুনা যায়। ইছামতীর পূজা প্রায়শঃ ছাগাদি পশুবলি সহ সম্পন্ন হয়, তবে পশুবলি ভিন্ন ফলপুষ্পোপহারেও হইতে পারে। উৎসর্গীকৃত পশু ছাড়িয়া দিবার কথাও কখনও কখনও শুনা যায়। পূজাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের নানা স্থানে ইছামতীর অভ্যুদয় হইতে লাগিল।

সম্প্রতি রাঙ্গুনিয়ায় ইছামতীর চরে পূজাভূমিতে তিনখানি গৃহ দৃষ্ট হয়। একখানি দেবীর মন্দির (মাটীর দেওয়াল); দ্বিতীয় পূজারি ব্রাহ্মণের থাকিবার স্থান; অপরখানি দূর হইতে সমাগত পূজাদানেচ্ছু ব্যক্তিদিগের বাসস্থান। এখানে প্রত্যহই পূজা হয়। দশমী ভিন্ন অন্য তিথিতে বলিদানের নিয়ম। বলির পশু ছাগ, মহিষ ও মেষ। সাধারণতঃ ছাগবলিই প্রশস্ত। দুই তিনটি পূজা ও পশুবলির প্রায় অভাব হয় না। পূজারী বেশ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন। মন্দিরনির্ম্মাণ ও মূর্ত্তিস্থাপন ৪০।৪৫ বৎসরের অধিক হয় নাই। ইছামতীর তীরে পূজা দিবার প্রথা, মূর্ত্তিগঠনের দশ বার বৎসর পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তখন ইছামতীর তীরে ছাগবলি দিয়া ছিন্নমুণ্ড অবিলম্বে নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইত। দেবী সলিল-মুখে ছাগশোণিত পান করিয়া তৃপ্ত হইতেন! কিছু পরে ছাগদেহ অনুসন্ধান করিয়া নদীগর্ভ হইতে তোলা হইত। ইছামতীর প্রসাদ ভক্তগণ গ্রহণ করিতে পারেন। কখন কখন বা স্রোতোবেগে ছাগদেহ কোথায় চলিয়া যায়, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তখন, ইছামতীই ছাগদেহ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, অনুমিত হয়। মন্দির হইবার পর হইতে কেহ নদী তীরে কেহ বা মন্দিরসম্মুখে বলি দিতেন। ছাগমুণ্ড কখনও বা মন্দিরে দেবীর সম্মুখে উপস্থাপিত হয়; কখনও বা ইছামতীর চরে বিচরণশীল দেবীর অনুচর হাড়গিলাগণের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হয়। এত বড় বড় হাড়গিলা সেখানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, একটিতে একটি ছাগমুণ্ড একেবারে গলাধঃকরণ করিতে পারে। ছাগদেহ নদী হইতে তুলিবার পর তাহার চর্ম্ম ও অন্ত্রাদিও হাড়গিলার তৃপ্তি-সাধন করে। এখন প্রায়ই মন্দিরে দেবীর সম্মুখে ছাগমুণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আনোয়ারার ইছামতী ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত। কেহ কেহ বলেন, ৩০।৩৫ বৎসর হইবে। এই ইছামতী মুরারিঘাট নামক নদের একটি ক্ষুদ্রশাখা, দক্ষিণে মরিয়া গিয়াছে। মুরারিঘাট শঙ্খ নদে পড়িয়াছে। শঙ্খ নদ দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমমুখে সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে। এই ইছামতী নদী আনোয়ারা থানার এলাকায়; এই জন্য ইহাকে আনোয়ারার ইছামতী বলে।

প্রবাদ আছে যে, এখন যে স্রোতস্বতী ইছামতী নামে অভিহিত, পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। দেবী স্রোতস্বতী-রূপে আবির্ভূত হন। পূজারী স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া অনুসন্ধানে ঐ স্রোতস্বতীগর্ভে দেবীর একটি মূর্ত্তি, অসি, ও ঘট প্রাপ্ত হন। পূজারী সেই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও ঘটস্থাপন করিয়া পূজা আরম্ভ করেন। শুনা যায়, ইছামতী দেবীর আনোয়ারায় অভ্যুদয়ের দুই তিন বৎসর পরে দেবীর আদেশে পূজারী কর্ত্তৃক একটি নরবলি প্রদত্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বের মূর্ত্তি সম্প্রতি দেখিতে পাওয়া যায় না। কি হইয়াছে, কেহই বলিতে পারে না। অসি ও ঘট অদ্যাপি মন্দিরে রক্ষিত আছে। পূর্ব্বমূর্ত্তির অনুকরণে যে মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমান সময়ে মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইছামতী নদী পূর্ব্ব-পশ্চিম বোধে প্রবহমানা। নদীর দক্ষিণ তীরে মন্দির। মন্দির দক্ষিণমুখী। সুতরাং নদী তাহার পশ্চাতে। মূর্ত্তি চতুর্ভুজা। নদীর তীর হইতে মন্দির একটু অন্তরে। মন্দিরাভ্যন্তর দিবাভাগেও প্রায় অন্ধকার। বাতি জ্বালিয়া পূজা হয়। সেখানে উপস্থিত হইলে মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হয়। মূর্ত্তি মৃন্ময়ী। এক হস্তে অসি। অন্য কয়েক হস্তে বিশেষ কিছু নাই, পুষ্পাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেবী দণ্ডায়মানা, বসনপরিহিতা, শ্বেতবর্ণা। বর্ণ বরং ঈষৎ হরিদ্রামিশ্রিত শ্বেতের আভাযুক্ত। পদতলে সলিলবিহারী কুম্ভীর। বদনে প্রসন্নভাব। লক্ষ্মী বা সরস্বতীর মুখের মত মুখ। মূর্ত্তি গঙ্গার কি কালীর, ঠিক বলিতে পারি না। তবে সাধারণ লোকে অনেক সময় ইছামতীর বাড়ীকে কালীবাড়ী বলিয়া থাকে। রাঙ্গুনিয়ার ইছামতী জাগ্রত দেবতারূপে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে বহু দূরের লোক ইছামতীর পূজা আরম্ভ করিল। অনেক ব্রাহ্মণ দেবীর ধ্যান মন্ত্রাদি জানিয়া লইলেন। দেবীও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য নানা স্থানে আবির্ভূত হইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে আনোয়ারা (সহর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব), বাঁশখালি (সহর হইতে ১০।১২ মাইল দক্ষিণ), ফতেয়াবাদ (সহর হইতে ৬।৭ মাইল উত্তর), ছোটকমলদহ (সহর হইতে ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিম), পড়িকোড়া (সহর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ), সাতকানিয়া (সহর হইতে ৩০।৩৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব) ইত্যাদি অনেক স্থান ইছামতী পূজার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল।

আনোয়ারার ইছামতী ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত। এখানকার ইছামতী নদী মুরারিঘাট নামক নদের একটি ক্ষুদ্র শাখামাত্র। এখন দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। মুরারিঘাট শঙ্খনদে পড়িয়াছে। শঙ্খনদ সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে।

প্রবাদ এই যে, এখন যে নদী ইছামতী নামে খ্যাত, পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব

ছিল না। দেবী স্রোতস্বতী-রূপে আবির্ভূত হন। পূজারী স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া অনুসন্ধানে স্রোতস্বতী-গর্ভে দেবীর একটি মূর্ত্তি, অসি ও একটি ঘণ্টা প্রাপ্ত হন। তিনি সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও ঘটস্থাপন করিয়া পূজা আরম্ভ করেন। শোনা যায়, আনোয়ারায় আবির্ভাবের দুই তিন বৎসর পরে দেবীর আদেশে পূজারী কর্ত্তৃক একটি নরবলি প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বতন মূর্ত্তির কি হইল, কেহই বলিতে পারে না। অসি ও ঘট অদ্যাপি মণ্ডপে রক্ষিত আছে। অন্তর্হিত মূর্ত্তির অনুকরণে যে মূর্ত্তি ঘটিত হয়, বর্ত্তমানে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তি মৃণ্ময়ী, চতুর্ভুজা, কুম্ভীরপৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা। এক হস্তে অসি।

ইছামতী নদী পূর্ব্ব-পশ্চিম রোখে প্রবহমানা। নদীর দক্ষিণতীরে মন্দির, সুতরাং নদী পশ্চাতে।

পূজার পদ্ধতি, দশমী ভিন্ন অন্য তিথিতে বলিদানের বিধি, বলির পশু ছাগ মহিষ, আরোগ্যকামনায় মস্তকে কেশগুচ্ছ রাখিবার নিয়ম ও অন্যান্য সকল ব্যবস্থাই রাঙ্গুনিয়ার ইছামতীর ন্যায়। পূজা-মানত ইত্যাদির নিয়মও তদ্রূপ। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সকলেই পূজা দিয়া থাকে। গাভীর পীড়াশান্তি ও গোবৎসের জন্য মানত করিয়া সুফল হইলে ইছামতীর সলিল-মুখে দুগ্ধধারা ঢালিয়া দেওয়া হয়। রাঙ্গুনিয়ার মতন এখানেও ইছামতীর সলিলে সচন্দন-কুসুম-বিল্বদলে অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় মন্দিরে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত আরতি হয়। ক্ষুদ্র তটিনীবক্ষে প্রতিহত হইয়া মঙ্গলবাদ্যধ্বনি চতুর্দ্দিকস্থ বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করে। এখানে বিক্রমপুরনিবাসী খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত অভয়চরণ মিত্র রায় বাহাদুরের একটি কাছারী আছে। তাঁহারই যত্নে ইছামতীর একটি কাঁচা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পূজারী ব্রাহ্মণের জীবিকা পূজোপহারের আয়ে উত্তমরূপেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমীর দিন আনোয়ারার ইছামতীর মেলা হয়। মেলায় বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। নানা সম্প্রদায়ের লোক যোগ দেয়। মেলা এক দিবস থাকে। ঐ দিনে বলির সংখ্যা অধিক হয়। মানতকারীদিগের অনেকেই ঐ সময় পূজা দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ, প্রত্যহ দুই একটি পূজা আসিয়া থাকে।

বাঁশখালী থানার অন্তর্গত গুণাগরী গ্রামে ইছামতী বিরাজমানা। শুনা যায়, প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল, মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইছামতী নামে এখানে কোনও নদী নাই। মন্দির একটি দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। ঐ দিঘী ইছামতী নামে আখ্যাত। পশ্চিমে কোদালা খালের সহিত উক্ত দিঘীর

যোগ আছে। কোদালা খালের এক শাখা শঙ্খ নদে পড়িয়াছে। অন্য শাখা জল-কন্দর দিয়া সমুদ্রে গিয়াছে। প্রবাদ এই যে, প্রসিদ্ধ উকীল তারাকিঙ্কর মুন্সী ইছামতী প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে স্বপ্নাদিষ্ট হন। পল্লীবাসীদিগের চাঁদায় বাঙ্গালাঘরে মৃণ্ময়ী, চতুর্ভুজা, শ্বেতবর্ণা, আলোহিত-আভাযুক্ত-রক্তবসন-পরিহিতা দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। দেবীর প্রসন্নতা, শরীরবসনে আচ্ছাদিত বিলম্বিত কেশপাশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাঙ্গুনিয়া ও আনোয়ারার ইছামতী ঐরূপে আবির্ভূত হন। দেবীর পদতলে সলিলবিহারী মকর। মূর্ত্তিস্থাপন অবধি পূজারী ব্রাহ্মণ প্রত্যহই পূজা করিয়া থাকেন। পূজার নিয়মাদি সমস্তই রাঙ্গুনিয়ার ইছমতীর ন্যায়। ছাগ, মহিষ ও মেষ এখানে বলি হইতে দেখা যায়। এখানে দুইটি ইছামতী-মূর্ত্তি নদীতীরে দুই স্থানে স্থাপিত। দেবী কুম্ভীরপৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা। সাধারণ লোকে গঙ্গামূর্ত্তি বলিয়া থাকে। পূজা ইত্যাদির সকল নিয়মই রাঙ্গুনিয়ার ইছামতীর মত।

ছোটকমলদহে একটি পুষ্করিণীর তীরে ইছামতী স্থাপিত। দেবী মকর-বাহনা। অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা রাঙ্গুনিয়ার ইছামতীর মত।

পড়িকোড়াতে ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে ইছামতীর পূজা হইয়া থাকে। মূর্ত্তি নাই; মন্দিরও নাই

সাতকানীয়াতেও একটি স্রোতস্বতীর তীরে ইছামতীর পূজা হয়। দুইখানি বাঁশ আড়াআড়ি রাখিয়া হাঁড়িকাট করিয়া ছাগবলি দেওয়া হয়। মূর্ত্তিও নাই, মন্দিরও নাই।

এখন দেখা যাউক, ইছামতী কি? ইছামতীর পূজা গঙ্গাপূজার রূপান্তর, বা কালীপূজার ভাবান্তর? চট্টগ্রাম জেলায় তিনটি প্রধান জলপ্রবাহ। তিনটিই সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম, কর্ণফুলী নদী; যাহার তীরে চট্টগ্রাম সহর অবস্থিত। দ্বিতীয়, শঙ্খ নদ; চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগে সমুদ্রে পড়িয়াছে। তৃতীয়, ফেণী; উত্তর দিক দিয়া পশ্চিমে সমুদ্রে গিয়াছে। তিনটি নদী তিনটি অলঙ্কার-বাচক। কথিত আছে, পতিনিন্দাশ্রবণে দক্ষ-যজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর বিষ্ণু যখন সতীদেহ চক্রে ছিন্ন করেন, তখন দেবীর নিম্নকর্ণের কর্ণফুল কর্ণফুলীতে, মধ্যকর্ণের ফেণী (চক্রাকার অলঙ্কারবিশেষ) ফেণী নদীতে, এবং হস্তের শাঁখা শঙ্খ নদে পতিত হয়। দেবীর দেহের অংশ সকল যে যে স্থানে পতিত হইয়া-ছিল, তত্তৎ স্থান এক একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক পীঠস্থানেই এক একটি কালীমূর্ত্তি বিরাজমানা। পূর্ব্বোক্ত তিনটি জলপ্রবাহে দেবীর তিন

খানি অলঙ্কার পতিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহাতে যে কালীর প্রভাব বর্ত্তমান নাই, তাহা কি করিয়া বলিব ? আমরা দেখিয়াছি, যেখানে যেখানে ইছামতী (ছরা, খাল, নদী, বা দিঘীরূপে) বিদ্যমান আছেন, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই পূর্ব্বোক্ত একটি না একটি প্রধান জলপ্রবাহের সহিত সম্বন্ধ আছে। সুতরাং ইছামতী মূর্ত্তিতে যে কালীর ভাব বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা বিচিত্র কি ? আবার ইছামতী-পূজা প্রকৃতপক্ষে সলিলপূজা। বঙ্গে সাধারণতঃ সলিলপূজা গঙ্গাপূজা বলিয়া অভিহিত। সুতরাং গঙ্গাদেবীর অনেক ভাব যে ইছামতীর মূর্ত্তিতে থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি, ইছামতীর মন্দিরকে সাধারণ লোকে কোন কোন স্থানে কালীবাড়ী ও কোন কোন স্থানে গঙ্গাবাড়ী বলিয়া থাকে। ইছামতীর মূর্ত্তিতে আমরা গঙ্গা ও কালীর ভাব জড়িত দেখিতে পাই। ইছামতী সর্ব্বত্রই সাধারণ কালীর ন্যায় চতুর্ভুজা। ইছামতী গঙ্গার ন্যায় প্রায়ই শ্বেতবর্ণা। ইছামতী কালীর ন্যায় দণ্ডায়মানা। ইছামতী গঙ্গার ন্যায় জলজন্তুবাহনা। ইছামতী কালীর ন্যায় অসিহস্তা। ইছামতী গঙ্গার ন্যায় প্রসন্নবদনা। ইছামতী কালীর ন্যায় রুধিরলোলুপা। ইছামতী গঙ্গার ন্যায় পুষ্পোপহারে পরিতৃপ্তা। ইছামতী কালীর ন্যায় উন্মুক্ত-বিলম্বিত-কেশা। ইছামতী গঙ্গার ন্যায় বসনপরিহিতা। অতএব, কালী ও গঙ্গা, দুই দেবীর ভাবই যে ইছামতীতে সম্পূর্ণ বিজড়িত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধগণ অনেক স্থলে ইছামতীর পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের অনেক পূজা অর্চ্চনা বৌদ্ধগণ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে, বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ হইবার পর অবধি, এইরূপ অনুকরণ অনেক কমিয়া আসিতেছে। এখনও বোমাং ও চাকমার রাজবাটীতে সরস্বতীপূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কালীপূজা ইত্যাদিরও অনুষ্ঠান হইত, এরূপও শুনা যায়।

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত।

নিরাবরণা ।

১

বনদেবি, এ কি রঙ্গ !—কুহেলিকা-রাশি
রূপ সরসীর জলে পড়েছিল আসি' !
জলপুষ্প-লতা-চয়
কুৎসিত-কুহেলিময় ;
হেসেছিল ম্লান উষা ম্লানিমময় হাসি ,
বালার্কের ক্ষীণরশ্মি ছিল গো উদাসী !
কুমুদ কুন্দ কহ্লার,
অরবিন্দ সুধাধার,
ছিল সখি ! ম্রিয়মাণ ; আঁধার তামসী,
আঁধার করিয়াছিল রূপের সরসী !
শোভাহারা বনস্থলী ;
সরসীতে জলকেলি
করিত না চিত্ত-হংস ; কুহেলিকা-রাশি—
অঞ্চল, তামসী চেলী—জলে পড়ে আসি' !
বরি কত আকিঞ্চন,
অপহৃত আবরণ ;
বনদেবি, তবু তুমি কেন গো উদাসী ?
তর-তর ঢল-ঢল,
ভরা সৌন্দর্য্যের জল ;
জুড়াইয়ে গেল মোর নয়ন পিয়াসী !
বিটপীতে ঢাকি' মুখ,
লাজে কেন অধোমুখ ?
সরসীতে হেরি, সখি, নিজ মুখশশী,
ব্রীড়া-রক্ত ছু' অধর, ভয়-ত্রস্ত হাসি !

২

সরে গেল কুহেলিকা,—
সৌন্দর্য্যের প্রহেলিকা

বুঝিব, বুঝাব সখি, তীরে তব বসি';
আমি গো গন্ধর্ব্ব-কবি লো বন-রূপসী!
ধরা-পানে কেন চাও?
বুঝিব, বুঝায়ে দাও,
কে রাখিল সরসীতে কনক-কলসী?
কে নাগরী? নাগরালি
আর তার চতুরালি
বুঝিবারে নারি; জল ভরিবারে আসি',
গাগরী ভাসায়ে জলে, লুকাইল হাসি'!
অথবা চির-সধবা
অনন্ত যৌবন-বিভা
জ্বলে তার নেত্রকোণে;—চুপে চুপে আসি,
রূপ-হ্রদে কোকনদ ভাসাইল হাসি!
নাহি রে মৃণাল-সূতা,
শূন্যে সরসীতে গাঁথা,
ঐ রহস্যের পদ্ম; লাবণ্য বিকাশি'
করিয়াছে সারা-দেহ-জীবন উল্লাসী!
বুঝা ও বোঝান বৃথা—
প্রকৃতির-আত্মকথা
কে জেনেছে? এইমাত্র বুঝিয়াছি সার,
অনন্ত জগত যুড়ি' প্রীতি-পারাবার
নিশিদিন ছুটিতেছে,
নামিতেছে, পড়িতেছে,
ফুল হয়ে, ফল হয়ে,
নারী হয়ে, নর হয়ে;—
সেই চির-সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ চটুল,
রূপ-হ্রদে কোকনদ ভুবনে অতুল!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

জ্ঞান-সাগর।

জ্ঞানসাগর একখানি প্রাচীন পুঁথি। আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; পদ-সংখ্যা প্রায় এক সহস্র হইবে। মূল প্রতিলিপিটি আধুনিক বলিয়া মনে হয়।

'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' আলিরাজা এই পুঁথির রচয়িতা। * চট্টগ্রাম—বাঁশখালী থানার অন্তর্গত 'ওশখাইন' নামক গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। অদ্যাপি তথায় আলিরাজার বংশ বিদ্যমান। সাধারণতঃ তিনি এ দেশে 'কানু ফকীর' নামেই প্রসিদ্ধ। আলিরাজা ফকীর হইলেও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি দুই বিবাহ করেন। এর্শাদোল্লা ও এক্রামোল্লা মিঞা তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত, এবং সর্ফোল্লা মিঞা তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। উক্ত এর্শাদোল্লা 'বড় মিঞা' ও এক্রামোল্লা 'ছোট মিঞা' নামে অভিহিত হইতেন। বহুক বৎসর হইল, সর্ফোল্লা মিঞা লোকান্তরিত হইয়াছেন। যখন ইহাঁর বয়ঃক্রম প্রায় সতের আঠার বৎসর, তখন, প্রায় আশী বৎসর বয়সে, আলিরাজা নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন। এখন তাঁহার পৌত্র প্রভৃতি জীবিত আছেন।

জ্ঞানসাগর ব্যতীত আলিরাজার রচিত "ধ্যান মালা" ও "সিরাজকুলুপ" নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ "যোগকালন্দর" নামক যোগ-গ্রন্থকেও আলিরাজার লেখনীপ্রসূত মনে করেন। সম্প্রতি তাঁহার রচিত "ষট্‌চক্রভেদ" গ্রন্থের কথাও কর্ণগোচর হইতেছে। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত তাহার রচিত অনেক বৈষ্ণবপদ পাওয়া গিয়াছে। 'কানু ফকীরে'র নামে দুই একটি পারমার্থিক গীতি বিদ্যমান আছে। শাহ কেয়ামদ্দিন নামধেয় জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী সাধু পুরুষ আলিরাজার মুর্সিদ বা গুরু ছিলেন। আলিরাজা তাহার প্রত্যেক গ্রন্থেই স্বীয় গুরুদেবের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

আলিরাজা এক জন প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ফকীর ছিলেন। তিনি ফকীর হইলেও হজরত মোহম্মদ মস্তফাকে মানিতেন। অন্যান্য ফকীরদের মত তিনি বনবাসী ছিলেন না, বা উলঙ্গ থাকিতেন না। তাঁহার সাধনাদি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা শুনা যায়। তিনি একাধারে গৃহী ও সংসার-বিরাগী ছিলেন।

আলিরাজার পুত্রগণও কবি ও ফকীর ছিলেন। আমরা এর্শাদ ও সর্ফ-

* ভূতপূর্ব্ব 'আলো' পত্রে ইঁহার যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা ঠিক নহে। সেরূপ ভ্রমের একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাহা সময়ান্তরে বলিবার বাসনা রহিল।—লেখক।

তোল্লা মিঞার রচিত কয়েকটি পারমার্থিক গীত সংগ্রহ করিয়াছি। সে সমস্ত গীতেও রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলিরাজার গীতে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণন আছে। মুসলমান হইয়া তিনি এরূপ করিলেন কেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কেহ কেহ বলেন, মুসলমান ফকীরদের মতে মানবদেহই রাধা ও মনই কানু। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আলিরাজা প্রভৃতি কবিগণকে 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামে অভিহিত করা সঙ্গত হয় না। পাঠকগণকে আলিরাজার রচিত একটি বৈষ্ণবপদ উপহার দিলাম।

মারহাটি।

সই না গো হে, আমার দুঃখনাশী পীতাম্বর। ধু।
সর্ব্ব জগ দেখি ধান্ধা।
অই চতুর্ভুজ বিনে, আনেরে না মানে মনে,
সে রাঙ্গা চরণে প্রাণি বান্ধা॥
বিষ লাগে বসন্তের বাও;
নগরে বেড়াও তুমি, কুলবতী বধূ আমি,
অবলাকে দেখা দিয়া যাও।
রহিতে না দিলা সুখে॥
আলি রাজা গাহে কালা, সহন না যায় জ্বালা,
বিষানল দিলা মোর বুকে॥

আলি রাজা অনেক পদেই আপনাকে 'রাধাকানু-চরণভক্ত' বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সকল স্থলেই পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে কি না, বলিতে পারি না।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি, আলি রাজার রচিত দুইটি শ্যামা-সঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে। সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হইতেছে, কিন্তু তাহার মীমাংসা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

"জ্ঞান-সাগর" একখানি দরবেশী গ্রন্থ। ইহার আদ্যোপান্ত আধ্যাত্মিক কথায় পূর্ণ। সে আধ্যাত্মিকতায় আবার হিন্দু-মুসলমানী ভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়। অনেক স্থলে সহজ দৃষ্টিতে কোনও অর্থ আছে বলিয়াই মনে হয় না। গুরূপদেশ ব্যতিরেকে এইরূপ গ্রন্থের মর্ম্মপরিগ্রহ সম্ভব নহে। আমরা অনধিকারী, এবং ফকিরী পথের পথিক নহি। এরূপ অবস্থায় এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়প্রদানের চেষ্টা আমাদের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা। জ্ঞানসাগরের স্থানে

স্থানে মুসলমানী শব্দাদির প্রয়োগ থাকিলেও, ইহা হিন্দুগণেরও আদরের সামগ্রী বটে। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া আমরা গ্রন্থের কয়েক স্থল হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।—

মনের কল্পনা সঙ্গে পবনের সুতে।
ধ্বনি মূলে ধ্যান ঘন টানিব ইঙ্গিতে॥
ধ্বনি মূলে ব্রহ্ম নাম বায়ুর সঙ্গতি।
সেই নামে পবন চলএ প্রতিনিতি॥
সেই ধ্বনি পরমহংস কহে সিদ্ধাগণ।
হংস নাম জেপেত নির্ম্মল তন মন॥
মিশাই পরম হংস পবনের সনে।
পূরক রেচক সঙ্গে হৃদের কম্পনে॥
পূরক রেচক সঙ্গে রাখি মহা হংস।
এক যুগ সাধনে শরীর হএ ধ্বংশ।
এই কল্প এক যুগ যদি সে করএ।
ধ্বনি মূলে তনু বহু কল্পি স্থির হএ॥
হুঙ্কারে মনুরা ঘট শুদ্ধ হএ তিন।
বহু কল্পে স্থির হএ সার তত্ত্ব চিন॥
কল্প বিনু সিদ্ধার নাহিক নিষ্কিফল।
মন কায়া শুদ্ধ হএ কল্পএ সকল॥
ব্রহ্মা তত্ত্ব পন্থ এই সিদ্ধিমূল সার।
নাহিক পরম তত্ত্ব ইহাতুধিক আর॥
তার নাম অজপা কহেন্ত জ্ঞানী কুল।
ত্রিশ হাজার জ্ঞান মধ্যে এই মহা মূল॥
ঈশ্বর ভজনা জ্ঞান আছে নানা মতে।
সে সব প্রধান নহে অজপার হন্তে॥
যাহাকে অজপা কহে সেই জ্ঞান মূল।
আর সব জ্ঞান তরু শাখা দল ফুল॥

আঁজি হএ বসন্ত হেমন্ত ম অক্ষর।
ত্রিলোক হেমন্ত বুলি বসন্ত ঈশ্বর॥
বৃক্ষ বুলি হেমন্ত বসন্ত হএ মূল।
যে বৃক্ষ যথা নিশা ধরে পুষ্প ফুল॥

বসন্ত পুরুষ হএ হেমন্ত রমণী।
বসন্ত জনক হএ হেমন্ত জননী॥

*　　*　　*　　*

পূরক বসন্ত হএ হেমন্ত রেচক।
বসন্ত ভাবিনী বলি হেমন্ত ভাবক॥

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই পাঠকগণ জ্ঞান-সাগরের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

আধুনিক মুসলমানসমাজ এরূপ সাধন-গ্রন্থের প্রতি একান্ত বিরূপ। "যোগ-কালন্দর" প্রকাশ করিতে গিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তাই মনে হয়, "জ্ঞান-সাগর" মুসলমানসমাজে সমাদৃত হইবে না। ভেদ-জ্ঞান জগতের সমস্ত অনর্থের মূল। এই ভেদ-জ্ঞানে ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এখনও যে ভারতের হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে ভেদদৃষ্টিতে দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। হিন্দু বা মুসলমানী ভাবের অস্তিত্ব থাকিলেই গ্রন্থবিশেষ অস্পৃশ্য হইবে, নিতান্ত অর্ব্বাচীন ব্যতীত আর কেহ তাহা স্বীকার করিবেন না। এই গ্রন্থখানি মুসলমানের জ্ঞান-গরিমার পরিচায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশা করি, আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ মুসলমান কবির কীর্ত্তিরক্ষাকল্পে অবহিত হইবেন।

শ্রীআবদুল করিম।

সুলতান আলাউদ্দীন।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট জালালউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রধান সেনাপতি আলাউদ্দীন দেবগিরি জয় করেন। দেবগিরির দুর্গপ্রাকারে মোসলমানের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইলে জালালউদ্দীন পরম আনন্দলাভ করিয়া প্রমোদোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সে প্রমোদোৎসবে যোগ দিবার জন্য আলাউদ্দীনকে দেব-গিরি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে আহ্বান করিলেন। আলা সুলতানের অনুমতিগ্রহণ না করিয়াই দেবগিরি আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সুলতানকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "রাজদরবারে আমার শত্রুর অভাব নাই। আমি দেবগিরিবিজয়ে নিরত হইবার পূর্ব্বে আপনার অনুমতি গ্রহণ করি নাই

সম্ভবতঃ আপনার শক্রকুল এই সূত্র অবলম্বন করিয়া আপনাকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য রাজাদেশ প্রতিপালন করিতে আমার মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইতেছে। অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমাকে একবার দর্শন দিলেই আমি নির্ভয়চিত্ত হইতে পারি।" এই লিপি পাঠ করিয়া স্থলতান বলিলেন, "আমি স্বয়ং গমন করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিব; আলা আমার পুত্রতুল্য।" মন্ত্রিগণ আলার দুরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্তি করিবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু তিনি স্নেহে অন্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। জালালউদ্দীন আলাউদ্দীনের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে করা প্রদেশের তদানীন্তন রাজধানী মলিকপুরে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইলে আলার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলম খাঁ তাঁহাকে বলিলেন, "আপনাকে দলবল সহ দেখিলে আলার আশঙ্কা দূর হইবে না।" স্নেহান্ধ স্থলতান এই কথা শুনিয়া একাকীই আলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আলা স্থলতানকে দেখিয়া তাঁহার পদযুগলধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। স্থলতান আলার হাত ধরিয়া তুলিলেন, তার পর সস্নেহে বলিলেন, "আলা, আমি তোমাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি, তবে কেন এ অবিশ্বাস?" এই সময় আলা পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত সঙ্কেতধ্বনি করিলেন; এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রাঘাতে স্থলতানের জীবননাশ করিল।

স্থলতান জালালউদ্দীনের হত্যা-সংবাদ দিল্লীতে পহুঁছিলে, আপামর সাধারণ সকলেই সর্ব্বগুণাধার অধিপতির তাদৃশ শোচনীয় মৃত্যুতে একান্ত দুঃখিত হইল। এই সময় জ্যেষ্ঠ রাজকুমার আরকলি মুলতানে অবস্থান করিতেছিলেন। এ জন্য রাজমহিষী পতিহত্যার সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাড়াতাড়ি কনিষ্ঠ রাজকুমার রুকনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

এ দিকে আলাউদ্দীন ঝড়ের মত অর্থবর্ষণে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি রাত্রিযাপনের জন্য কোন স্থানে শিবিরসংস্থাপন করিলেই পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা কৌতূহলপরবশ হইয়া তথায় আসিত। তখন তিনি ফিঙ্গা যন্ত্রসংযোগে তাহাদের মধ্যে স্বর্ণবৃষ্টি করিতেন। আলাউদ্দীন শনৈঃশনৈঃ অগ্রসর হইয়া দিল্লীর দ্বারদেশে উপনীত হইলে, রুকন তাঁহার গতিরোধের জন্য সসৈন্যে বহির্গত হইলেন। কিন্তু অধিকাংশ ওমরাহ আলার কৌশলে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করায় তিনি ভয়ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় মাতাকে সঙ্গে লইয়া মুলতানের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। দিল্লী নগরী আলার হস্তগত হইল। তিনি স্বনামে

খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিয়া মহাড়ম্বরে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন তার পর কৌশলবিশারদ আলাউদ্দীন ধনবিতরণ ও নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজন করিয়া জনসাধারণের প্রীতিভাজন হইলেন। সিংহাসন-লাভের পর এক বৎসরের মধ্যেই গুজরাটে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যেই আলাউদ্দীন রাজ্য অধিকার, শত্রুকুল নির্ম্মূল, রাজকোষ পূর্ণ ও গুজরাট জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ জন্য তিনি গর্ব্বে স্ফীত হইয়া নানারূপ কল্পনায় মত্ত হইলেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন; নিজের নামও স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না। (১) তাঁহার সভায় জ্ঞানী জনের আদর ছিল না। তিনি সর্ব্বদা নীচমতি তোষামদজীবিগণে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। সুতরাং তাঁহার অহমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিনব ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত করিয়া তরবারির সাহায্যে তাহার প্রচার ও ভারতবর্ষে এক জন প্রতিনিধি রাখিয়া সেকেন্দরের ন্যায় দিগ্বিজয়ে বহির্গমন, এই দুই কল্পনাই তাঁহার জপমালা হইল। ফলতঃ, দুরাকাঙ্ক্ষ আলাউদ্দীন মহাপুরুষ মহম্মদ ও বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজেন্দারের ন্যায় অবিনশ্বর কীর্ত্তিসংস্থাপনের অভিলাষী হইলেন। দিগ্বিজয়বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সাতিশয় প্রবল ভাব ধারণ করায় তিনি সেকন্দর সানি উপাধি গ্রহণ করেন। আলাউদ্দীন এইরূপ অসম্ভব কল্পনায় কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া একদা সহরকোতায়ালের মতজিজ্ঞাসু হইলেন। সহরকোতায়াল জ্ঞানী ও সৎসাহসী ছিলেন। তিনি অকাট্য যুক্তিপরম্পরায় সুলতানের অভিলষিত সঙ্কল্প অসাধ্য, তাহা সপ্রমাণ করিলেন। তাঁহার হিতবাক্যে সুলতানের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি অভিনব ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তন ও দিগ্বিজয় করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি-সংস্থাপনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষেই স্বাধিকার বিস্তার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তদনুসারে সুলতান প্রথমেই রিন্তাম্বরের বিরুদ্ধে উত্থিত হন, এবং বিপুল বাহিনী সহ তথায় স্বয়ং গমন করিয়া দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গ দুর্ভেদ্য ও দুর্গবাসিগণ পরাক্রমশালী ছিল। এ জন্য দুর্গাধিকার করিতে এক বৎসর অতি-

(১) আদৌ লেখাপড়া না জানায় কর্ম্মচারিগণের পক্ষে স্বার্থসাধন করা সহজসাধ্য হইয়াছিল। তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, এবং কঠোর পরিশ্রমে অল্পকালের মধ্যেই তাহাতে ব্যুৎপন্ন হন।

বাহিত হয়। এই এক বৎসর আলাউদ্দীন রিস্তাম্বরে অবস্থান করিয়া নিজেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। এই সময়ের মধ্যে দুরাকাঙ্ক্ষ রাজপুরুষগণ উপর্যুপরি কয়েকবার দিল্লীতে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, (১) কিন্তু আলাউদ্দীন কিছুতেই বিচলিত না হইয়া অবরোধ কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন, এবং এক বৎসর অন্তে কৌশলে দুর্গাধিকার করিয়া নৃশংসাচরণের একশেষ প্রদর্শন করেন। (২)

---

(১) আলাউদ্দীন রিস্তাম্বর গমনকালে পথিমধ্যে তিলপত নামক স্থানে বিশ্রামের জন্য কয়েক দিন অবস্থান করেন। এই সময় তিনি একদিন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অকত খাঁকে সঙ্গী করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে মৃগয়ায় গমন করেন। অকত খাঁ তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। আলাউদ্দীন স্বীয় পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। অকত খাঁও স্বীয় পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। মৃগয়া উপলক্ষে তাঁহাকে একাকী দেখিয়া তিনি আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে উদ্যোগী হন, এবং তাঁহার প্রতি কয়েকটি তীর নিক্ষেপ করেন। তীরের আঘাতে সুলতান অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হন। অকত খাঁ তাঁহাকে ভূপতিত দেখিয়া শিরশ্ছেদন করিতে অগ্রসর হন। এক-জন ক্রীতদাস তাঁহাকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলে, "সুলতানের মৃত্যু হইয়াছে; শিরশ্ছেদনের আর আবশ্যক নাই।" এই কথা শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি রাজশিবিরে গমন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ দিকে সুলতানের চৈতন্যসঞ্চার হইলে তিনি বহুকষ্টে ক্রীতদাসের সাহায্যে শিবিরে গমন করেন। সৈন্যগণ আসিয়া সানন্দে তাঁহার সঙ্গে যোগ প্রদান করে। অকত খাঁ পলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ধৃত হইয়া অনুচরগণ সহ নিহত হন। এই ঘটনার পর হইতে আলাউদ্দীন অশ্বে আরোহণ পরিত্যাগ করেন। আলাউদ্দীন আরোগ্য লাভ করিয়া তিলপত পরিত্যাগ পূর্ব্বক রিস্তাম্বরে গমন করেন। তিনি রিস্তাম্বরে উপনীত হইয়াই ওমর খাঁ ও মঙ্গু খাঁর বিদ্রোহের সংবাদ প্রাপ্ত হন। ওমর ও মঙ্গু খাঁ রাজধানীতে বিশিষ্ট রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা সুলতানের অনুপস্থিতিনিবন্ধন উৎসাহিত হইয়া রাজ্যলালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আলাউদ্দীন এই সংবাদ শ্রুত হইয়া কতিপয় সেনানায়ককে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। প্রেরিত সেনানায়কগণ বিদ্রোহীদের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়া সুলতানের নিকট লইয়া যান। সুলতান তাঁহাদের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান করেন। এই বিদ্রোহ দলিত হইতে না হইতেই দিল্লীতে আর এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। মৌলা নামক এক জন ক্রীতদাসপুত্র এই বিদ্রোহ উপস্থিত করে। তাহার বিদ্রোহ প্রবলাকার ধারণ করিয়া সমস্ত নগরবাসীকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু হামিদ খাঁ নামক এক জন সেনাপতি বিপুলবিক্রমে মৌলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করেন।

(২) রিস্তাম্বর দুর্গ দুর্ভেদ্য ছিল। আলাউদ্দীন এক বৎসর চেষ্টা করিয়াও দুর্গাধিকার করিতে না পারিয়া বহু চিন্তার দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য এক কৌশলের উদ্ভাবন করেন,

আলাউদ্দীন জয়মাল্যে ভূষিত হইয়া সগৌরবে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; তার পর ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোন প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মূল উচ্ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উহার কারণনির্ণয় করিবার জন্য বিশিষ্ট ওমরাহদিগকে সমবেত করিলেন। সমবেত ওমরাহগণ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "জাঁহাপনাই প্রধানতঃ দোষী; প্রজার হিতসাধনে শৈথিল্য ও উৎপীড়িত ব্যক্তির দুঃখ-অপনয়নে ঔদাসীন্যই বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মূল কারণ। তার পর অত্যধিক সুরাপানও আর একটি কারণ। লোকে এক সঙ্গে মিলিত হইয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই তাহাদের মনোভাব পরস্পরের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে; তাহারা মদের উত্তেজনায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সকল প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ পরস্পরে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। ইহাও বিদ্রোহের আর একটি কারণ। এক জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া উঠিলেই, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ আছেন, তাঁহারাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েন। বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের চতুর্থ কারণ, ধনের অসম বিভাগ। সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের ধনরাশি কেবলমাত্র কতিপয় সৌভাগ্যশালী

এবং তাহাতেই কৃতকার্য্য হন। তিনি মৃত্তিকাপূর্ণ বস্তা সকল সারি সারি সজ্জিত করিয়া অবতরণিকা প্রস্তুত করেন, এবং তৎসাহায্যে দুর্গাভ্যন্তরে উত্তরণ করিয়া দুর্গজয় করিতে সমর্থ হন। দুর্গজয় সম্পন্ন হইলে তিনি হিন্দু রাজাকে সপরিবারে হত্যা করেন। মহম্মদ নামক এক জন মোগল সেনাপতি দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি বিপুলবিক্রমে আলার অবতরণে বাধা প্রদান করেন। তিনি যুদ্ধকালে শত্রুহস্তে আহত হন। আলা যন্ত্রণাদগ্ধ আহত মহম্মদকে অপমানসূচক বাক্যে জিজ্ঞাসা করেন, "আমি তোমাকে নিরাময় করিলে তুমি কি কৃতজ্ঞ হইবে না?" মোগল তেজোব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করেন, "আপনি অত্যাচারী, আমি আপনাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত নহি। রাজপুত্রই আমার একমাত্র কৃতজ্ঞতার পাত্র।" এই উত্তরে আলা ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বধ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মৃতদেহ যথোচিত সম্মানসহকারে সমাহিত করিবার আদেশ দেন। মহম্মদ বীরপুরুষ ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার মৃতদেহের প্রতি তাদৃশ সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল। আলাউদ্দীনের প্রলোভনে পতিত হইয়া ধনমল প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গে যোগ প্রদান করিয়াছিলেন। আলা ইঁহাদিগকেও তরবারিমুখে সমর্পণ করেন। "যাহারা স্বীয় প্রভুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহারা আবশ্যক হইলে আমার সঙ্গেও তদ্রূপ ব্যবহার করিবে।"—প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবার সময় আলা ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন। এই সকল হত্যাকাণ্ডেও আলার রক্তপিপাসা নিবারিত হয় নাই। তাহার পর তিনি নগরের সমস্ত লোককে নিহত করেন।

ব্যক্তির হস্তগত থাকে বলিয়াই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ কখন কখন স্বাধীনতার প্রয়াসী হন।

আলাউদ্দীন ওমরাহগণ-প্রদর্শিত কারণ সকলের সারবত্তা স্বীকার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি প্রথমতঃ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের চরিত্র-অনুসন্ধানে এবং ন্যায়বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের গৃহকথারও সংবাদ পাইবার বন্দোবস্ত করিলেন, দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংবাদ আনয়ন করিবার জন্য নানা স্থানে গুপ্তচর পাঠাইলেন। তিনি এরূপ কঠোর ভাবে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে লাগিলেন যে, দেশ হইতে দস্যু ও তস্করসম্প্রদায় সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পথিকগণ নিশ্চিন্তচিত্তে রাজ-পথপার্শ্বে নিদ্রা যাইত, কেহ তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিত না। আলাউদ্দীন সুরাপানের নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করিলেন। আলাউদ্দীন নিজে মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি এই আদেশ প্রচার করিয়া নিজের মদ্যপূর্ণ ভাণ্ডগুলি ঢালিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অনুকরণে আপামর সাধারণ সকলেই মিতাচারী হইয়া উঠিল। আমীর ওমরাহগণের মধ্যে রাজানুমতি ব্যতীত বিবাহের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে না, এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল। তাঁহার কঠোর শাসনে আমীরওমরাহগণ গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে অথবা পরস্পরের গৃহে মিলিত হইতে পারিতেন না। এ জন্য সামাজিক আমোদ প্রমোদ রহিত হইয়াছিল। এমন কি, রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে আত্মীয় স্বজনকেও গৃহে নিমন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদের জন্য এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই আলাউদ্দীন ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের অভ্যুত্থানের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের ধন অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল করিতে লাগিলেন।

দেশ শাসিত, সুরাস্রোত রুদ্ধ, আমীর ওমরাহদিগকে নানা প্রকার কঠোর নিয়মে আবদ্ধ, এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, আলাউদ্দীন হিন্দু প্রজাদিগকে নিষ্পিষ্ট করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন। আমরা জিয়া-উদ্দীন বর্ণির ভাষায় এই অত্যাচারকাহিনীর বর্ণনা করিতেছি। "হিন্দু প্রজার এইরূপ দুরবস্থা করিবার কথা ছিল, যেন তাহারা অশ্বে আরোহণ, অস্ত্রধারণ, উত্তম বস্ত্রপরিধান ও বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করিতে না পারে। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ, পরিমাণে অল্পই হউক, বা অধিকই হউক, কৃষির জন্য প্রত্যেক বিশওয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট

মাপে পরিমাণ করিয়া লইতে হইত। উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক রাজস্বস্বরূপ গৃহীত হইত। কোনও কারণে এই পরিমাণের ন্যূনতা ঘটিত না। খুতাস ও বলাহর উভয়বিধ জমী সম্বন্ধেই এই নিয়ম ছিল। কোনও কারণে এই উভয় শ্রেণীর জমীর মধ্যে ইতরবিশেষ হইতে পারিত না। দ্বিতীয় নিয়ম, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। গোচারণের মাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে কর আদায় করা হইত। অতিবৃদ্ধ বা রুগ্ন পশুও যাহাতে বাদ না পড়ে, তাহার জন্য প্রতি গৃহ হইতে কর আদায় করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। দরিদ্রকে গুরুতর ভারগ্রস্ত করা হইত না; কিন্তু কর আদায়সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। সমস্ত উৎকোচগ্রাহী ও অসাধু রাজস্ব-কর্ম্মচারীকে বরতরফ করা হইয়াছিল। সরফকই-নায়েব-উজীর-ই-মশনিক এক জন লিপিপটু, তীক্ষবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী ছিলেন। কার্য্যদক্ষতা ও সাধুতায় কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। প্রত্যেক নগরে ও পল্লীতে প্রাগুক্ত নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি কতিপয় বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই সকল নিয়ম এত দূর সূক্ষ্মভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, চৌধুরী, খুতস ও মুকাদ্দিমগণও অশ্বে আরোহণ, অস্ত্রসংগ্রহ, উত্তম বস্ত্র পরিধান, অথবা তাম্বূলচর্ব্বণ করিতে পারিতেন না। আদায় সম্বন্ধে একই নিয়ম সকলের প্রতিই প্রযোজ্য ছিল। প্রজাসাধারণ কঠোরশাসনে এরূপ নিরবলম্ব ও সাহসহীন হইয়াছিল যে, এক জন রাজস্বকর্ম্মচারীই কুড়ি জন চৌধুরী, খুতস অথবা মুকাদ্দিমের গলদেশে রজ্জুবন্ধন করিয়া বলপ্রয়োগে কর আদায় করিতেন। কোন হিন্দুর গৃহে সোনা, রূপা, তঙ্কা, অথবা অন্য কোন প্রকার স্বচ্ছলতার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইত না। অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের মূলাধার ধনশালিতার চিহ্ন কোন স্থানেই দৃষ্ট হইত না। দুরবস্থানিবন্ধন খুতস ও মুকাদ্দিমগণের স্ত্রীরাও মোসলমানদিগের গৃহে কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। নায়েব-উজীর-সরফকই সংগ্রহকারিগণের নিকট হইতে এত দূর সূক্ষ্মরূপে রাজস্বগ্রহণ ও হিসাব পরিষ্কার করিতেন যে, গ্রাম্য পাটওয়ারীর হিসাবে তাঁহাদের দেয় প্রত্যেক জিতল বাহির করিতে পারা যাইত। রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাদিগকে প্রহৃত, কারারুদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইত। হিন্দু বা মোসলমান, কাহারও নিকট হইতে অসদুপায়ে এক তঙ্কাও উপার্জ্জন করিবার উপায় ছিল না। রাজস্বসংগ্রহকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতির এত দূর কঠোরভাবে শাসন ও নিগ্রহ করা হইত যে, তাঁহারা পাঁচ শত অথবা হাজার তঙ্কার জন্যও বহুকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকিতেন। রাজস্বকর্ম্মচারিগণ

লোকের নিকট জর অপেক্ষাও অধিক ভয়াবহ ছিলেন। কেরাণীগিরি বড় দুষ্কার্য্য ছিল, এবং কেহই কেরাণীর সহিত কন্যার বিবাহ দিত না। রাজস্বকর্ম্ম-চারিগণের অদৃষ্টে সর্ব্বদা কারাবাস, প্রহার ও বেত্রাঘাত ঘটিত।"

কঠোর শাসন, সুরাপাননিবারণ, আমীর ওমরাহগণের নির্য্যাতন, সমৃদ্ধি-শালী ব্যক্তিগণের সর্ব্বস্বহরণ ও হিন্দু প্রজার নিষ্পেষনে আলাউদ্দীনের সমগ্র সময় অতিবাহিত হয় নাই। তিনি পররাজ্যহরণেও ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার উদ্দাম তাণ্ডবে যে সকল রাজ্য হতশ্রী হইয়াছিল, তন্মধ্যে চিতোরের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আলা ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করেন। ইন্দ্রিয়লালসার পরিতৃপ্তিই চিতোর আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে লক্ষ্মণ সিংহ চিতোরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভীমসিংহের পত্নীর নাম পদ্মিনী। পদ্মিনী-রূপসী-কুলরাজ্ঞী ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য রূপরাশির কথা ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। ইন্দ্রিয়বিলাসী আলা তাহাকে হরণ করিবার অভিলাষে চিতোরপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। তেজস্বী রাজপুতগণ প্রবল শত্রুর আক্রমণে ভীত না হইয়া স্বদেশের রক্ষাকল্পে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন। আলা দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের পরও জয়শ্রী লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রচার করিলেন যে, তিনি পদ্মিনীকে লাভ করিতে পারিলেই স্বদেশে প্রতিগমন করিবেন। কিন্তু রাজপুতগণ এই ঘৃণ্য প্রস্তাব যথোচিত অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন আলা প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি সেই লোক-বিমোহিনী রমণীর প্রতিবিম্ব দর্পণে দেখিতে পাইলেই স্বদেশে প্রতিগমন করিবেন

রাজপুতগণ এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। আলা অতিথিভাবে চিতোরে প্রবেশ করিয়া দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি শিষ্ট-ব্যবহারে ভীম সিংহকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় শিবিরাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভীমসিংহ ভদ্রতার রীতি-অনুসারে তাঁহার সঙ্গে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করিতেছিলেন। তাঁহারা নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে বিশ্বাসঘাতক আলার পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত কতিপয় সশস্ত্র সৈন্য আসিয়া অসতর্ক ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া গেল। আলা ভীমসিংহকে হস্তগত করিয়া প্রচার করিলেন যে, পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাকে মুক্তিদান করিবেন।

ইহার পর অল্পকালের মধ্যেই এক জন দূত যবনশিবিরে উপনীত হইয়া

বলিল, আপনি চিতোর নগরীর অবরোধ পরিত্যাগ করিলেই পদ্মিনী আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। তাঁহার বাল্যসহচরী রাজপুতমহিলাগণ চিরবিদায় গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে এই শিবির পর্য্যন্ত আগমন করিবেন; যে সকল পরিচারিকা তাঁহার সহগামিনী হইবে, তাহারাও তাঁহার সঙ্গে আসিবে। ইঁহারা সকলেই অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরবাসিনী। অতএব কেহ যেন কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাঁহাদের শিবিকার বস্ত্র উত্তোলন না করে। কামান্ধ আলাউদ্দীন এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া চিতোরের অবরোধ পরিত্যাগ করিলেন।

নিরূপিত দিবসে সাত শত বস্ত্রাবৃত শিবিকা মোসলমান-শিবিরে প্রবেশ করিল। পদ্মিনী সহচরী ও পরিচারিকাগণের সহিত আগমন করিয়াছেন ভাবিয়া আলা-উদ্দীন উৎফুল্ল হইলেন, এবং চিরবিদায়ের পূর্ব্বে ভীমসিংহকে পদ্মিনীর সঙ্গে এক-বার সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অর্দ্ধ ঘণ্টার অবকাশ দিলেন। ভীমসিংহ সেই সুযোগে চিতোর পুরীতে পলায়ন করিলেন। আলা কিয়ৎকালপরে শিবিকাগুলির নিকট উপনীত হইলেন। এই সকল শিবিকায় রাজপুতরমণীগণের পরিবর্ত্তে রাজপুতবীরগণ লুক্কায়িত ছিলেন। তাঁহারা আলাকে দেখিবামাত্র প্রবলপরা-ক্রমে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু আলা অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিলেন বলিয়া রক্ষা পাইলেন। রাজপুতের এই চাতুরীতে তাঁহার রোষাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মোসলমান সৈন্য দুর্গের সিংহদ্বারে আসিয়া পুনর্ব্বার দুর্গাবরোধ করিল। চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীরগণ তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এই কালসমরে বীরকুল-তিলক গোরা ও তদীয় দ্বাদশবর্ষবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল লোকাতীত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া জগৎ চমৎকৃত করেন। (১) তুমুল যুদ্ধে রাজপুতবীরগণ দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী আলার কণ্ঠে জয়মাল্য অর্পণ করিলেন। কিন্তু আলা রাজপুতজাতির অসম সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া বিহ্বল হইলেন; এবং নিজ পক্ষের বহু সৈন্য বিনষ্ট হওয়াতে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া দিল্লীতে প্রতিগমন করিলেন।

---

(১) এই যুদ্ধে বীরবর গোরা প্রাণপরিত্যাগ করেন। বাদল ক্ষতবিক্ষতশরীরে গৃহে প্রতিগমন করেন। তাঁহার পিতৃব্যপত্নী তাঁহাকে একাকী ফিরিতে দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, তদীয় পতি যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করিয়াছেন। তিনি পতির অকালমৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাকুল হন। কিন্তু আপন শোকাবেগ রুদ্ধ করিয়া তাঁহার হৃদয়দেবতা কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। বাদল একে একে পিতৃব্যের অলৌকিক বীরত্বের বর্ণনা করেন। তিনি পতির বীরত্বগাথা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করেন, তার পর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া ইহসংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্ত করেন।

মোসলমান সেনার তিরোভাবে রাজপুতগণ শান্তিলাভ করিলেন, এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে ক্ষতি পূর্ণ হইতে না হইতেই আলাউদ্দীন বিপুল বাহিনী সহ পুনর্ব্বার চিতোর পুরী আক্রমণ করিলেন। শত্রুর পুনরাগমনে বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুতগণ প্রবল তেজে অসিহস্তে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। এক দিন নিশীথকালে রাণা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন গম্ভীরকণ্ঠে বলিতেছে, "মৈ ভুখা হুঁ।" তিনি শব্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলেন। চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। দেবী বলিয়া উঠিলেন, "আমি রাজবলি চাহি। দ্বাদশ জন রাজকুমার চিতোর রক্ষা-কল্পে আত্মবলি না দিলে আর রক্ষা নাই।" দেবীর বাক্যে স্বদেশপ্রাণ রাজ-কুমারগণ জন্মভূমির রক্ষাকল্পে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। (১) জ্যেষ্ঠানুক্রমে একাদশ জন রাজকুমার একে একে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করিলেন। একমাত্র অজয় সিংহ অবশিষ্ট রহিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে রাজকুল নির্ম্মূল হইবে, বংশে বাতি দিতে আর কেহ থাকিবে না বলিয়া, রাণা তাঁহাকে যুদ্ধে গমন করিতে নিষেধ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হইলেন।

তাহার যুদ্ধায়োজন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ভীষণ জহর ব্রত আরব্ধ হইল। রাজপুতমহিলাগণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া শত্রুর হস্ত হইতে পাতিব্রত্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। ইহার নাম জহর ব্রত। আলার হস্তে চিতোর পুরীর পতন অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া রাজপুতরমণীগণ ভীষণ জহর ব্রত আরম্ভ করিলেন।

জহরব্রত উদযাপিত হইলে রাণা সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু হৃদয়শোণিত দান করিয়াও চিতোর রক্ষা করিতে পারিলেন না। চিতোর মোসল-মানের করতলগত হইল। আলা পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই তাঁহার চিত্তহারিণী পদ্মিনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পদ্মিনী জহরব্রতে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; আলা তাঁহার দর্শন না পাইয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার অগণ্য সৈন্যনাশ, বিপুল অর্থব্যয় ও উৎকট সাধনা, সমস্তই ব্যর্থ হইল। তিনি

---

(১) Whether we have merely the fiction of the Poet, or whether the same was got up to animate the spirit of Resistance, matters but little. It is consistent with the belief of the tribe.—*Todd's Rajasthan.*

মানদেব নামক জনৈক সরদারের হস্তে চিত্তোরের শাসনভার অর্পণ করিয়া ভগ্ন-হৃদয়ে দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। (১)

সুলতান পরিশ্রান্ত সৈন্য সহ চিত্তোর হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের এক মাস পরেই মোগলনায়ক তারঘি ৩০।৪০ সহস্র সৈন্য লইয়া যমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশে উপনীত হইলেন। রাজসৈন্য পরিশ্রান্ত, এবং মুলতান, সামানা ও দিনেপুর প্রভৃতি স্থান অরক্ষিত ছিল। এ জন্য আলাউদ্দীন মোগলের আকস্মিক আক্রমণে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি অল্প-সংখ্যক সৈন্য সহ শত্রুর সম্মুখীন হইয়া গড়বন্দী শিবির সংস্থাপন করিলেন। দুই মাস অবরোধের পরও শত্রুশিবির দখল করিতে না পারিয়া তারঘি নিরুৎ-সাহ হইয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। মোগল সৈন্য বহুসংখ্যক ও পরাক্রান্ত ছিল। সমস্ত রাজপথগুলি তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে রাজসৈন্য নগণ্য ও পরিশ্রান্ত ছিল, এবং আর সৈন্য সংগ্রহ করিবারও উপায় ছিল না। এরূপ অবস্থায় মোগল আক্রমণের নিষ্ফলতা বিস্ময়ের বিষয় ছিল, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, দিল্লীর সাম্রাজ্য দৈবাধীনেই রক্ষা পাইয়াছিল।

মোগলের আক্রমণে আলাউদ্দীনের চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি সীমান্ত প্রদেশ অভেদ্য ও দিল্লীর দুর্গ সংস্কার করিতে আদেশ করিলেন, এবং স্থানে স্থানে দুর্গনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য বহুসংখ্যক শিল্পকুশল কারিগর নিযুক্ত হইল, এবং যুদ্ধকালে রসদসংগ্রহ করিবার জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বিত হইল। অতঃপর আলা সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদিগকে রণকুশল ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিলেন। কি কি উপায়ে এই দুরূহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে মন্ত্রণা করিবার জন্য সুলতান অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমার অভিলাষানুরূপ সৈন্য প্রতিপালন করিতে অর্থের আবশ্যক। এক্ষণে রাজকোষ পরিপূর্ণ, এ কথা সত্য। কিন্তু তাহাতে অপরি-মিত ব্যয়ে ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িবে। অর্থ ব্যতীত শাসনকার্য্য সম্ভবপর নহে। আমি মনে করিয়াছি যে, সৈন্যদিগকে নিয়মিতভাবে ২৩৪ তঙ্কা প্রদান করিব, এবং যে সকল অশ্বারোহী সৈন্য দুইটি করিয়া অশ্ব-পোষণ করিবে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত (?) ৭৮ তঙ্কা দিব। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমার অভিলাষানুরূপ সৈন্য প্রতিপালন করা যাইতে

(১) আলার জীবনের শেষভাগে রাণা লক্ষ্মণের পৌত্র বীরবর হামীর চিতোরে পুনরায় স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

পারে, তৎসম্বন্ধে তোমরা পরামর্শ প্রদান কর।" তদুত্তরে অমাত্যগণ নিবেদন করিলেন, অল্প বেতনে উৎকৃষ্ট সৈন্য নিয়োজিত করা সম্ভবপর নহে। যদি আহার্য্য বস্তু সকলের মূল্য কোন উপায়ে হ্রাস করা যায়, তাহা হইলে জাঁহাপনার প্রস্তাবমত অল্পব্যয়ে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট সৈন্য প্রতিপালন করা যাইতে পারে।" অতঃপর সুলতান তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া শস্যাদির মূল্য হ্রাস করিবার জন্য নিম্নোদ্ধৃত বিধি কয়েকটি প্রবর্ত্তিত করেন।

১ম। সুলতান শস্যাদির মূল্য নিরূপিত করিয়া দিয়াছিলেন।

১ মণ ময়দা	...	...	...	৭॥ জিতন।
১ মণ যব	...	...	...	৪ ঐ।
১ মণ চাউল	...	...	...	৫ ঐ।
১ মণ মাষ	...	...	...	৫ ঐ।
১ মণ মটর	...	...	...	৩ ঐ।

কোন দোকানীই এতদপেক্ষা অধিক মূল্য গ্রহণ করিতে পারিত না।

২য়। সুলতান রাজকীয় গোলাতে যথেষ্টপরিমাণে শস্য মজুদ রাখিতেন। তিনি দোয়ার প্রভৃতি স্থানের খোলসা ভূমি হইতে রাজকরের পরিবর্ত্তে শস্য গ্রহণ করিতেন। এই সকল শস্য রাজকীয় গোলাতে মজুদ থাকিত। অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে শস্যের আমদানী হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে রাজকীয় ভাণ্ডারস্থিত শস্য দ্বারা সে অভাব পরিপূরিত হইত।

৩য়। সুলতান যমুনার তীরবর্ত্তী পল্লীসমূহে শস্যবিক্রেতৃগণের বসতি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। যমুনার তীরবর্ত্তী পল্লীসমূহে তাহাদের বসতি সংস্থাপিত হওয়ায় সমস্ত শস্যই বিক্রয়ার্থ দিল্লীতে আনীত হইত, এবং তজ্জন্য শস্যের মূল্য রাজনির্দ্ধারণ অপেক্ষা বর্দ্ধিত হইত না।

৪র্থ। সুলতান আড়তদারী প্রথার বিলোপসাধন করিয়াছিলেন। এই কারণে শস্যবিক্রেতৃগণ শস্য মজুদ রাখিতে পারিত না। ফলতঃ, তাহারা রাজনিরূপিত মূল্যেই শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত।

৫ম। কৃষিজীবী প্রজাবর্গ শস্যবিক্রেতৃগণের নিকট কি মূল্যে শস্য বিক্রয় করিবে, তাহাও সুলতান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রাজাদেশ প্রতিপালিত হয় কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য রাজস্বকর্ম্মচারিগণ আদিষ্ট ছিলেন।

৬ষ্ঠ। সুলতান বাজারের মূল্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যহ তত্ত্ব লইতেন। বাজারের

অধ্যক্ষ ও গুপ্তচরগণ তাঁহার নিকট সমস্ত তত্বই প্রেরণ করিবার জন্য আদিষ্ট ছিলেন।

আলাউদ্দীন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এই সকল কৃত্রিম উপায়ে শস্যের মূল্যের সমতা হইয়াছিল। মালিক উন্নুগ খাঁ নামধেয় এক জন কার্য্যকুশল ব্যক্তি বাজারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সৈয়দ মর্তুজার পদাবলী।

এ পর্য্যন্ত বিংশতির অধিক 'মুসলমান বৈষ্ণবকবি' আবিষ্কৃত হইয়াছেন ; ইহা বোধ হয় পাঠকগণের অবিদিত নাই। তন্মধ্যে সৈয়দ মর্তুজা এক জন শ্রেষ্ঠ কবি। দুই দিকে দুই জন সৈয়দ মর্তুজার কীর্ত্তিচিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে। "পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থে এক সৈয়দ মর্তুজার পদাবলী দৃষ্ট হয়। তিনি মুর্শিদাবাদ-বাসী ছিলেন। * আর আমরা চট্টগ্রামে এক সৈয়দ মর্তুজার বহুল পদাবলীর আবিষ্কার করিয়াছি। আমাদের সংগ্রহে পদাবলীর সংখ্যা অনেক অধিক। এই উভয় কবিকে অভিন্ন বলিতে কিছু সঙ্কোচ বোধ হয়। যে কবির কীর্ত্তি চট্টগ্রামে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, তিনি মুর্শিদাবাদ-বাসী, ইহা বিশ্বাস করিতে সহজেই দ্বিধা জন্মে। "পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত কোন পদই এ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নাই ; সুতরাং আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইতেছে। যাহা হউক, এ বিষয়ে বৃথা বাগাড়ম্বর অনাবশ্যক। তাঁহারা অভিন্নই হউন, আর ভিন্নই হউন, তাঁহাদের কীর্ত্তিরাজি যে আবিষ্কৃত হইতেছে, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি।

মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণন করিয়াছেন। ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। সৈয়দ মর্তুজার অনেকগুলি পদ সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে হিন্দু-কবির রচনার সমকক্ষ হইতে পারে। পূর্ব্বে "পূর্ণিমা" ও "বীরভূমি" পত্রে তাঁহার বহু পদ প্রকাশিত হইয়াছে। "ভারত-সুহৃদে"ও তিনটি পদ প্রকাশিত করিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহার যে দুইটি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে, "সাহিত্যের" পাঠকবৃন্দকে তাহা উপহার দিতেছি। এই পদগুলি বহুদিনের পুরাতন হস্তলিপি হইতে

---

* সুধা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যায়, "সৈয়দ মর্তুজা" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, রাগের নাম পাই নাই; বোধ হয়, লিপিকরপ্রমাদে বা অন্য কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রতিলিপি হইতে তাহা লুপ্ত হইয়া থাকিবে।

১

কি কহিব অএ সখি কালা গুণনিধি।
অনেক পুণ্যের ফলে মিলাইয়াছে বিধি॥
সাত পাঁচ সখী মিলি যমুনাতে আসি
কালা নিল জাতি কুল প্রাণি নিল বাঁশী
চূড়াএ কদম্বপুষ্প পত্র সারি সারি।
দেখেছি অবধি রূপ পাসরিতে নারি॥
চৌদিকে নিকুঞ্জ লতা মধ্যেরে যমুনা।
তার মাঝে বসিয়াছে নন্দের নন্দনা॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন প্রাণসখি।
এমন বিনোদ রূপ কভু নাহি দেখি॥

২

কালা রূপ কেনে উপজিল গোকুলে কুলবা (')
কালা আসন কালা বসন বর চিকন কালা।
কালা কালা পুষ্পে গাঁথিয়া পৈর মালা॥
সাত পাঁচ সখী মিলি যমুনাতে গিয়া।
চিত্ত উড়া করে মোর ওই বন্ধের লাগিয়া॥
সিন্দূরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা।
নবীন মেঘের আড়ে চান্দে দিল দেখা॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন রে কালিয়া।
পর কি আপনা হএ পিরীতি লাগিয়া॥

শ্রীআবদুল করিম।

ভবভূতি।

প্রাচীন ভারতের আলঙ্কারিক যুগের কবিগণের মধ্যে, কালিদাস ভবভূতির শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন গুণে উভয়েরই বিশিষ্টতা আছে বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট, এ কথার বিচার করা চলে না; করাও

উচিত নহে। কালিদাস বড় বিচিত্রক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি মহাকাব্য, গীতি-কাব্য, নাটক প্রভৃতি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সে সমুদায়ই অতুল্য বলিয়া আদৃত হইতেছে। ভবভূতির কেবল নাট্যরচনারই আমরা উত্তরাধিকারী।

বীরচরিত কবির প্রথম গ্রন্থ। উত্তরচরিত ও মালতীমাধবে যে কবিত্বশক্তি সুপরিস্ফুট, বীরচরিতে তাহার উন্মেষমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে সাহসে তিনি আপনার মনের মত রামায়ণকথার পরিবর্ত্তন করিয়া, রাম সীতার নব আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বীরচরিত-কথাতেও তাহা সম্যক পরিদৃষ্ট হয়। করুণ-রস-প্রধানতায় ও ভাবগাম্ভীর্য্যে উত্তরচরিতের সমকক্ষ হইতে পারে, এমন নাটক পড়ি নাই ; স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন সাহিত্যেই পড়ি নাই।

নাট্যকৌশল সম্পূর্ণ অনুভূত না হইলে রসগ্রহণের সুবিধা হয় না। কথাগ্রন্থ সহজে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান করিয়া না পড়িলে নাটকের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই জন্য তৃতীয় অঙ্কের কাব্যকৌশল বুঝাইতে গিয়া ভূদেব বাবু সমগ্র নাটকের সৌন্দর্য্য বিষয়ে যে বিচার করিয়াছেন, তাহা উত্তরচরিত-পাঠকের নিকট অমূল্য। ভূদেব বাবু যদি ঐ নাটকখানির অন্যান্য দিকের কথা লইয়া আরও দুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে অশেষ উপকার সাধিত হইত। বঙ্গের কবিকুলতিলক বঙ্কিমচন্দ্রও রামবিলাপ পড়িয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ভবভূতি-সৃষ্ট শ্রীরামচন্দ্রে গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। কিন্তু ভূদেব বাবুর তৃতীয় অঙ্কের সমালোচনা পড়িলে সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে, এবং রামবিলাপের গাম্ভীর্য্য ও মাহাত্ম্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইবে।

প্রথম অঙ্কের প্রারম্ভে শ্রীরামচন্দ্র যে ভাবে সীতার সহিত কথোপকথন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, কথায় কথায় মুখের উপর সীতার প্রতি এত স্তুতিবচন প্রযুক্ত হইয়াছে কেন? পতিপত্নী সুখে এক সঙ্গে বাস করিতেছেন, উভয়ের মনের কথা উভয়ের হৃদয়-দর্পণে প্রতি-বিম্বিত হইতেছে, তথাপি রাম এত চাটুবচন ব্যবহার করিতেছেন? কথাগুলি একটুখানি অস্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছিল বলিয়া, সীতাও যেন অপ্রতিভ হইতে-ছিলেন। তিনি "ভোহ্‌ অজ্জউত্ত ভোহ্‌" বলিয়া অন্য কথা পাড়িবার চেষ্টা করি-তেছেন, দেখিতে পাই। এই স্থানে প্রথম অঙ্কের নাট্যকৌশলটা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা পড়িবার সময়েই দেখিতে পাই যে, সীতার নামের কলঙ্ক লইয়া প্রজাসাধারণের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে ; এবং বুদ্ধিমানেরা তাহার জন্য

দুঃখ করিতেছেন। দুর্মুখ যে এই সংবাদটা প্রথম অঙ্কে প্রথম দিয়াছিলেন, তাহা নয়; রাম পূর্ব্ব হইতেই সকল কথা জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই সে কথার প্রকৃতি ও প্রসারটা বুঝিয়া লইবার জন্য চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাম রাজা; রাজকার্য্য বা কর্ত্তব্যপালনের জন্য তাঁহাকে হয় ত হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত ছিন্ন করিতে হইবে, মনে মনে সে আশঙ্কাও হইয়াছিল। লোকপ্রবাদের জন্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতেছিলেন, কিন্তু কথাটা আপনার মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। কি জানি কখন কোন ঋষি আসিয়া লোকরঞ্জনের জন্য কি আদেশ করেন, এ আশঙ্কাও ছিল। তাই যখন অষ্টাবক্র আসিয়া প্রজানুরঞ্জন ধর্ম্ম বুঝাইতে বসিলেন, তখন রামচন্দ্র যে কথা সর্ব্বদা ভাবিতেছিলেন, তাহা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। রাম বলিলেন যে, আমি প্রজাদের আরাধনার জন্য যাহা করিতে হয়, সকলই করিব; যদি স্নেহ, দয়া, সৌখ্য প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহাও দিব; যদি সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাজ্যা জানকীকেও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও দিব।—

স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

শ্রীরামচন্দ্র আপনার অপরিসীম মর্ম্মবেদনা সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকারের ছায়া, সীতার হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই বলিয়া, এবং প্রাণপ্রিয়া জানকীর কাছে মনে মনে অপরাধী হইতেছিলেন ভাবিয়া, কথায় কথায় চাটুবচন ও স্তুতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্যই অগ্নিশুদ্ধির কথা পড়িতে না পড়িতে রামচন্দ্র অধীরচিত্তে বলিয়া উঠিলেন,—

কষ্টং জনঃ কুলধনৈরনুরঞ্জনীয়ঃ
তন্নো যদুক্তমশিবং নহি তৎ ক্ষমং তে।
নৈসর্গিকী সুরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা
মূর্দ্ধ্নি স্থিতির্ন চরণৈরবতাড়নানি॥

আজ বিশেষভাবে কুসুমটি মাথায় তুলিয়া লইবার প্রবৃত্তি হইতেছিল বলিয়াই, এত কথা। এই জন্যই আজি সেই গৃহলক্ষ্মী, নয়নের অমৃতবর্ত্তী, চন্দনসুশীতল-স্পর্শময়ীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিরহাশঙ্কায় কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ।"

আমি মহাকবির কাব্যকৌশলের সবিশেষ সমালোচনা করিতে বসি নাই; কিন্তু উহার যথার্থ অনুভূতি না হইলে সে কাব্য পাঠ বিফল হইয়া যায়, তাহাতেই

একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। একালেও কাব্যকৌশলের দিকে লোকের বড় মনোনিবেশ নাই বলিয়া, বুদ্ধিমানদের মধ্যেও কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন"-খানিকে "গীতিনাট্যে"র দলে ফেলিয়া দিয়া বসেন ; এবং উহাতে যথার্থ লৌকিক ছবি অঙ্কিত হয় নাই, বলিয়া থাকেন।

কেন যে উত্তরচরিতের মত নাটক প্রাচীন সময়ে আদৃত হইতে পারে নাই, তাহা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এত বড় কবি যে সমাজে অনাদৃত ছিলেন, তাহা মালতীমাধবের ভূমিকা পড়িয়াই জানিতে পারা যায়। গৌড়বহো-প্রণেতা বাক্‌পতি ভবভূতির স্তুতিবাদ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু ঐ প্রকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সুবৃহৎ সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে এত নাটকের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, অথচ উত্তরচরিতের নাম নাই। ঐ গ্রন্থে মহাবীরচরিত ও মালতীমাধব উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু উত্তরচরিতের কথা নাই। ইহাতে এ কথাও মনে হয় যে, কবি উত্তরচরিতে নূতন আদর্শ গড়িয়াছিলেন বলিয়া হয় ত লোকের বিরক্তি-ভাজন হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য উত্তরচরিতের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন বলিয়া বড় আনন্দ হয়। তিনি আর্য্যাসপ্তশতীতে লিখিয়াছেন,—

ভবভূতেঃ সম্বন্ধাৎ ভূধরভূরেব ভারতী ভাতি
এতৎকৃতকারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা ॥

যাঁহার কবিতা পড়িলে পাষাণ কাঁদে, তাঁহার এই অনাদর দেখিয়া, তিনি কি প্রকার সমাজে কখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করে। এবারে সেই কথার অনুসন্ধান করিব।

শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত অতি দক্ষতার সহিত সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, যশোবর্ম্মার রাজত্বকাল ৬৭৫ হইতে ৭১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ; এবং কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল ৬৯৫ হইতে ৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে, ললিতাদিত্যের হস্তে যশোবর্ম্মার পরাজয়ের কথা আছে, এবং ঐ প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লিখিত আছে যে,—

কবির্বাকপতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্ ॥

যদি এই শ্লোকটির অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে যশোবর্ম্মাকেই কবি করিতে হয়, এবং তিনি বাক্‌পতিরাজ ও শ্রীভবভূতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক সেবিত বলিয়া বুঝিতে হয়। সম্ভবতঃ পাঠটি একটু অশুদ্ধ, সেটুকু বাদ দিয়া, "কবি

বাক্‌পতিরাজ” ইত্যাদি করিয়া লইতে হইবে। এখন এই শ্লোকের ভবভূতি, উত্তরামচরিতাদির প্রণেতা কি না, তাহা দেখিতে হইতেছে।

রাজতরঙ্গিণী দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইলেও, ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে কাশ্মীরের রাজাদের তারিখ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কারণ, রাজতরঙ্গিণীর প্রণেতা, এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী লিপি ও সংগ্রহাদি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য কথা প্রায় প্রবাদের মত লিখিত বলিয়া, সহসা তাহাতে আস্থা-স্থাপন করা যাইতে পারে না। বাক্‌পতিরাজ যে যশোবর্ম্মার সভাকবি ছিলেন, তাহা ঐ কবির প্রণীত গৌড়বহো কাব্য হইতেই জানা যায়। কবি বাক্‌পতি ঐ প্রাকৃত কাব্যে যে ভাবে ভবভূতির নাম করিয়াছেন, তাহাতে ভবভূতি যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া প্রমাণিত হয়েন, তাহা দেখাইতেছি।

গৌড়বহো কাব্যখানি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ, সংকল্পিত কাব্যের ভূমিকামাত্র। পাঠকদের কৌতূহল হইলে এ বিষয়ে পরে কিছু লেখা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে যেখানে অন্য কবিদের নাম ও গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে, সেখানে যদি কেবল ভবভূতির নাম থাকিত, তাহা হইলে ভবভূতিকে সমসাময়িক বলিলে হয় ত চলিত। কিন্তু সেখানে যখন বহুপূর্ব্ববর্ত্তী ভাস, জ্বলনমিত্র, কুন্তীদেব, হরিচন্দ্র, কালিদাস ও সুবন্ধুর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন ভবভূতিকে বাক্‌পতির সমসাময়িক বলা চলে না। কবি প্রথমতঃ কাব্য বিষয়ে নিজের গুরু কমলায়ুধকে নমস্কার করিয়াছেন। এই স্থানে কমলায়ুধকে শ্রীসংযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া, তিনি তখন জীবিত ছিলেন, বলা যাইতে পারে। ভবভূতি কিংবা অন্য কোন কবির নামে শ্রী সংযুক্ত হয় নাই। কমলায়ুধের কথায় আছে, “সিরি কমলাউহ-চলণেহিঁ কহবি জংগহিয বহমাণো।” অর্থাৎ, শ্রীকমলায়ুধচরণে কথমপি যৎ-গৃহীতবহমানঃ। তাহার পর ভবভূতির কথায় আছে,—

> ভবভূই-জলহি-নিগ্গয়-কব্বামঅ-রসকণা ইব ফুরন্তি।
> জস্‌স বিসেসা অজ্জবি বিয়ড়েসু কহা নিবেসেসু॥

অর্থ,- ভবভূতি-জলধি-নির্গত-কাব্যামৃত-রসকণা ইব, অদ্যাপি যস্য বিশেষা বিকটেষু কথা-নিবেশেষু স্ফুরন্তি। ভবভূতির কাব্য-জলধি মন্থন করিয়া কবি পূর্ব্বে যে সুধা লাভ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা তাঁহার সুরচিত কাব্যে দেখা যাইতেছে, এই কথা বলা হইল। যিনি ভবভূতির কাব্য-জলধি মন্থন করিয়াছিলেন, তিনি লিখিত গ্রন্থই পাঠ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই জলধিমন্থনটা

যে কাব্যরচনার বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা "অন্যাপি" কথা দ্বারাই সূচিত হইতেছে। ঠিক ঐ শ্লোকটির পরেই লিখিত হইয়াছে যে,—

ভাসম্মি জলণমিত্তে কুন্তীদেবে অ জস্স রহুআরে।
সোবন্ধবে অ বন্ধম্মি হরিচন্দ্রে অ আনন্দো॥

অর্থ,—অপিচ, ভাস, জ্বলনমিত্র, কুন্তীদেব, রঘু-কার (কালিদাস), সুবন্ধু ও হরিচন্দ্রের রচনায় যাঁহার আনন্দ। নাটককার ভাসের নাম বাণভট্টের গ্রন্থে ও কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে পাওয়া যায়। হরিচন্দ্রের গদ্যবন্ধের কথাও বাণভট্টের হর্ষচরিতে দেখিতে পাই। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভবভূতি শেষোক্ত শ্লোকের কবিদের পরবর্ত্তী হইলেও, বাক্‌পতির পূর্ব্ববর্ত্তী। গৌড়বহো কাব্যে, কবি আপনাকে রাজা যশোবর্ম্মার প্রিয়পাত্র ও রাজকবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদি ভবভূতি তখন জীবিত থাকিতেন, এবং যশোবর্ম্মার সভাসদ্ হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা উল্লিখিত হইত। ভবভূতি যখন রাজকবিরও পূজ্য, এবং রাজকবি যখন তাঁহার কাব্যপাঠের ফল স্বীয় কাব্যে স্বীকার করিতেছেন, তখন কদাচ তিনি বাক্‌পতির নিম্নে আসন লইয়া যশোবর্ম্মার সভায় ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। রাজা যদি ভবভূতির উপরে বাক্‌পতির আসন দিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে বাক্‌পতিও কদাচ স্বীয় কাব্যে ভবভূতিকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া লিখিতেন না। রাজতরঙ্গিণীতে যে ভবভূতি বাক্‌পতির নামের পর ভবভূত্যাদির দলে সন্নিবিষ্ট, তিনি কখনও কবি প্রশংসিত নহেন।

বাক্‌পতির রচনায় যখন ভবভূতি সুস্পষ্ট উল্লিখিত, এবং সেই উল্লেখ হইতে যখন ভবভূতিকে পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া ধরিতে পারা যায়, তখন রাজতরঙ্গিণীর উল্লেখের উপর নির্ভর করা চলে না। কালিদাসের খ্যাতির পর যখন অনেকে কালিদাস নাম লইয়াছিলেন, জানিতে পারা যায়, তখন অন্য কোন কবি যে ঐ আখ্যায় ভূষিত হয়েন নাই, তাহাও বলা যায় না। সেটা আন্দাজের কথা। যাহা হউক, ভবভূতি যে বাক্‌পতির পূর্ব্ববর্ত্তী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এ গণনায় ভবভূতিকে ৬৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পাওয়া গেল।

ইন্দোরের শ্রীযুত মহাদেব বেঙ্কটেশ লেলে, ভবভূতির মালতীমাধবের একখানি হাতের লেখা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ পুঁথিতে ভবভূতির নাম কুমারিল-শিষ্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঐ লিপিটা নিশ্চয়ই জাল; অন্ততঃ, উহার উপর কোন আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। কবি, আত্মপরিচয়-

স্থলে আপনাকে পরমহংস জ্ঞাননিধির শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তখন আবার যে মালতীমাধবের কয়েকটা অঙ্কের শেষভাগে গুরুত্যাগ করিয়া "কুমারিল-শিষ্য কৃতে" ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। অঙ্কের শেষভাগের ঐ প্রকার লিপি পরবর্ত্তী সময়ের পুঁথিলেখকের আত্মকল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। গ্রন্থমধ্যে যাহা আছে, তাহাই গ্রহণ করিতে হয়। তাহার সহিত যে কথার বিরোধ হয়, এবং সেই বিরুদ্ধ কথা যখন ইতি অমুক অঙ্কের স্থানে লিখিত, তখন তাহা অগ্রাহ্য করিতেই হইবে। ভবভূতিকে কুমারিলের শিষ্য করিলে আমার গণনার সহিত কোনও বিরোধ হয় না, তথাপি ঐ দুর্ব্বল কথাটা সত্যের খাতিরে পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। কুমারিল, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, প্রায় সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে কুমারিলের সময় নিশ্চয়ই ৬৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। এ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য প্রবন্ধে "নব্যভারতে" অনেক কথা লিখিয়াছি। যাহা হউক, এ কথাটার এখানে কোনও প্রয়োজন নাই।

ভবভূতি কোন কাণোজ-রাজের সভায় ছিলেন বলিযা বিশ্বাস করিবার কারণ পাই নাই। তিনি অতি বিস্তৃতভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি আশ্রয়দাতা রাজার নাম করেন নাই। তাঁহার জন্ম বিদর্ভ বা বেরার অঞ্চলে; এবং তিনখানি নাটকই কালপ্রিয়নাথের উৎসবে উপস্থাপিত হইয়াছিল। কালপ্রিয়নাথ কাণোজের রাজাদের দেবতা নহেন; কেহ কেহ এই দেবতাকে উজ্জয়িনীর মহাকাল বলিতে চাহেন। অনুমানটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পদ্যে যদি না মিলাইবার জন্য একটি নামকে সেই অর্থ-বোধক অন্য নামে প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে একটা অনুমান চলে। কিন্তু গদ্য লিপিতে, মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ দেবতাকে কালপ্রিয়নাথ করা হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। এ স্থলে কালপ্রিয়নাথ বেরার প্রদেশের কোন দেবতা বলিয়াই স্থির করা সঙ্গত। নাটক তিনখানি অন্য কোনও স্থানে লিখিয়া আসিবার পর যে কবি কোন কাণোজপতির সভায় বসিয়া কেবল পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কবি ভবভূতির কাণোজ-রাজ-সম্পর্কের কথাটা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইতেছে।

যে সকল কবি ষষ্ঠ-শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকার রচনার সহিত ভবভূতির রচনারীতির বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাদম্বরী, হর্ষচরিত, রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক

প্রভৃতিতে যে শ্রেণীর অব্যক্ত-অনুকরণজাত শব্দের বিশেষ প্রয়োগ পাওয়া যায়, সেগুলি ভবভূতিতেও আছে। ঝংকৃত, মড়মড়ায়িত, গুণ্‌গুণায়মান প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ; এবং রণরণক প্রভৃতি দেশী শব্দের ব্যবহার, বিশেষ পরবর্ত্তী সময়েও হইতে পারে। কিন্তু ভবভূতি যখন ৬৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী, তখন তাঁহাকে প্রায় বাণভট্টাদির সময়ের লেখক বলিয়াই মনে হয়।

সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ভবভূতির গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, ষষ্ঠ-শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তমের প্রথমেও, ঠিক তাহাই দেখিতে পাই। দণ্ডীর দশকুমারচরিতে ঠিক কামন্দকীর মত ধর্ম্মরক্ষিতা নামে শাক্য ভিক্ষুকী পাই, ইনিও আবার কুমারী কামন্দকীর প্রধানা দূতী। শবরের চামুণ্ডা ও শ্মশান, দ্রাবিড়দের শ্রীপর্ব্বত, মন্ত্র, দৈববল, মহামংস-বিক্রয় প্রভৃতিও বাণভট্ট ও দণ্ডীর গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা ভবভূতির অনুরূপ। এবং সকলের কাব্যেই ওগুলি অনার্য্যের নিন্দনীয় আচার, এবং দক্ষিণ-দেশীয় শৈবপদ্ধতি বলিয়া উপেক্ষিত।

গৌড়বহো কাব্যের সময়ে যে ঐ রীতি বহুলপরিমাণে আর্য্য-সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভবভূতি যদি গৌড়বহো-প্রণেতার অধিক নিকটবর্ত্তী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ণিত প্রথাগুলি বাণভট্টাদির বর্ণনার অনুরূপ হইত না। স্বীকার করি যে, গৌড়বহো-প্রণেতার সময়েও বিন্ধ্যাচলের দেবী, অনার্য্যের কালীমাত্র। তখনও তাঁহার পূজক-দল শবর ও কোলি-জাতীয় অনার্য্যেরা; তখনও সেখানে নরবলি হয় বলিয়া আর্য্যেরা শঙ্কিত। কিন্তু তবুও রাজা যশোবর্ম্মা সদলবলে ঐ দেবীর প্রতি যে প্রকার সম্মানপ্রদর্শন করিতেছেন দেখিতে পাই, তাহাতে প্রাচীন ঘৃণা অনেক কমিয়া আসিয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। দণ্ডী প্রায় ৫৯০ খৃষ্টাব্দের কবি, এবং বাণভট্টের সময়, প্রায় ৬০৭ হইতে ৬৪০ পর্য্যন্ত। যে রীতি আর্য্যসমাজে প্রবেশলাভ করিয়া আর্য্যরীতি দূরীভূত করিয়া প্রবল হইয়া উঠিযাছিল, তাহা ৩০।৩৫ বৎসরে যে প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, গৌড়বহো কাব্যে তাহাই সূচিত হয়। এ প্রকার অবস্থায় যদি ভবভূতির কাব্য-প্রণয়ণের কাল ৬০০ হইতে ৬৫০ এর মধ্যবর্ত্তী করা যায়, তাহা হইলেই সঙ্গত হইতে পারে।

ভবভূতি যে সময়ে নাটক লিখিতেছিলেন, তখন কাব্যাদিতে দর্শনাদির কথার উল্লেখ ও নানাপ্রকারে শাস্ত্রীয় বিদ্যার প্রদর্শন রীতি দাঁড়াইয়াছিল ভবভূতি রীতিটি ভাল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কবি মালতীমাধবের মুখবন্ধে

একটু তামাসা করিয়াই লিখিয়াছেন যে, দর্শনশাস্ত্রাদির কথা খুব ভাল হইতে পারে, কিন্তু কাব্যে অন্যরকম জিনিস চাই। কাব্যে চাই,—

ভূম্না রসানাং গহনাঃ প্রয়োগাঃ সৌহার্দ্যহৃদ্যানি বিচেষ্টিতানি।
ঔদ্ধত্যমায়োজিতকামসূত্রং চিত্রা কথা বাচি বিদগ্ধতা চ॥

দেখিতে পাই যে, সুবন্ধু-কৃত বাসবদত্তা গ্রন্থের শ্লেষপ্রায় রচনায়, অনেক দর্শন ও শাস্ত্রের জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। বাণভট্টও কাদম্বরীতে তাহার একশেষ করিয়াছেন। যখন এই শ্রেণীর রচনায় লোকে মুগ্ধ হইয়াছিল, তখনই কবির নাটকগুলি রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে ভবভূতিকে বাণভট্টাদির সমসাময়িক বলিয়াই ধরিতে হয়। বাণভট্ট প্রভৃতি উত্তর প্রদেশে রাজাশ্রয়ে থাকিয়া যে গৌরব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, বিদর্ভ প্রদেশে এক জন দরিদ্র কবির পক্ষে তাহা লাভ করা কঠিন হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ করি, কবি সেকালে খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কাব্যসুন্দরী।

তোমাদের সুকোমল চরণপরশে
শিহরি' উঠিত ফুটি অশোকমঞ্জরী,
বকুল আকুল হ'ত সুধাধর-রসে,
অয়ি দূর অতীতের সহস্র সুন্দরী!
উজ্জয়িনী অলকার উদ্যানমন্দিরে,
স্বচ্ছ অচ্ছোদের রম্য তীরবনচ্ছায়ে,
যমুনা-মালিনী-গঙ্গা-গোদাবরী-তীরে,
চিত্রকূট দণ্ডকের তপোবন-বায়ে,
উছলি' উঠিত নিত্য বিরহ-মিলনে,
তোমাদের অন্তরের হর্ষ প্রেম শোক;
সেই সুখদুঃখরাশি, কি মাহেন্দ্র ক্ষণে,
লভিয়া কবির দিব্য অন্তর-আলোক,
শোভিছে কালের ভালে ইন্দ্রধনু সম!
বিশ্বের বিস্ময়,—সর্ব্বজনমনোরম!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

স্মৃতিশাস্ত্র।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বঙ্গদেশের প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বিচারশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। রঘুনন্দনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে স্মৃতিশাস্ত্রের একটি স্বতন্ত্র মত ছিল না। বঙ্গ-দেশ নানা বিষয়ে মিথিলার মুখাপেক্ষী ছিল। কয়েক জন অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলেন। কাণভট্ট রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিভায় বঙ্গদেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। চৈতন্যদেবের ধর্ম্মভাবে ভারত মুগ্ধ হয়। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও সেই সময়ের এক জন ক্ষমতাপন্ন পুরুষ ছিলেন। অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন না হইলে তাঁহার ব্যবস্থা সমুদায় বঙ্গদেশে প্রচলিত হইত না।

রঘুনন্দন বহুসংখ্যক গ্রন্থ হইতে আপনার মত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রচলিত বিংশতি স্মৃতিগ্রন্থ ব্যতীত অধিকাংশ মুনির মতও এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, কশ্যপ প্রভৃতি সুপ্রাচীন পুরুষদের মত ও বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র, গালব, মার্কণ্ডেয়, শৌনক প্রভৃতির বচন সঙ্কলিত হইয়াছে। ভট্ট, মিশ্র, উপাধ্যায়, ধর, কর, দত্ত উপাধিধারী পণ্ডিতগণের মত বিচারিত হইয়াছে। বিচারের ভাষা সুসংযত। নিজের গুরুবর্গের মতও অপক্ষপাতে আলোচিত হইয়াছে। বিচারপ্রণালীতে ন্যায় ও মীমাংসাদর্শনের আশ্রয় গৃহীত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মিথিলার মতের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থ যে বঙ্গীয় হিন্দুর আদরের সামগ্রী হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূজার পাত্র মনে না করিলে শালগ্রামশিলা শিলাখণ্ড ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যদি মনে করা যায়, যে আকারের হিন্দুধর্ম্ম এখন চলিতেছে, উহা অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হইবে, তখন রঘুনন্দনের গ্রন্থের কোন আদর থাকিবে কি না? স্মৃতিগ্রন্থসমূহের আদর চিরকাল থাকিবে। উহা এক সময়ে এক দেশে প্রণীত হয় নাই। উহা পাঠ করিলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সামাজিক আচার ব্যবহার জানা যায়। রঘুনন্দনের স্মৃতি সেরূপ গ্রন্থ নহে। উহাতে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের আচার ব্যবহার বর্ণিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের আচার ব্যবহারের মধ্যে উৎকৃষ্ট অংশ বাছিয়া উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আচার ব্যবহার এইরূপ

হওয়া শাস্ত্রসঙ্গত, ইহাই কথিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের স্মৃতিতে ইতিহাস-আলোচনাকারীর কোন লাভ হইবে না। রঘুনন্দনের মত গ্রহণ করায় বঙ্গদেশের অনেক লাভ হইয়াছে। কি কি লাভ হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার আলোচনা করিব।

প্রাচীন গৃহ্যসূত্র ও মন্বাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে পূর্ব্বকালীন হিন্দু সমাজের অনেক কথা আমরা জানিতে পারি। লোকের আচার ব্যবহার কেমন ছিল, কি ভাবে রাজ্য শাসিত হইত, ধর্ম্মবিশ্বাস কেমন ছিল, আমরা তাহা অবগত হইতে পারি। ইহাই প্রকৃত ইতিহাস। হিন্দুর ইতিহাস নাই, এই দুর্নাম সম্পূর্ণ সত্য নহে।

ইতিহাস-সঙ্কলনের পক্ষে গৃহ্যসূত্রগুলি সমধিক প্রয়োজনীয়। প্রচলিত বিংশতি স্মৃতিগ্রন্থ যাঁহাদের রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাঁহারা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু এগুলির একখানিও বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে প্রণীত হয় নাই, নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়, এবং ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, প্রচলিত সমুদায় সংহিতারই কোনরূপ প্রাচীন ভিত্তি ছিল, তাহাকে মূল করিয়া এই সমস্ত সংহিতা প্রণীত হইয়াছে। উশনা, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতির প্রাচীন স্মৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রচলিত উশনা, অঙ্গিরাদির স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ের যে ভাষা দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ভাষা তদপেক্ষা আধুনিক। মানবধর্ম্মসূত্র অতি প্রাচীন, কিন্তু এখন ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতা মনুসংহিতা নামে প্রচলিত। সংহিতাগুলির মধ্যে কোনখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। প্রায় সমুদায় সংহিতার মধ্যে মনুর মত ধৃত হইয়াছে। অত্রিসংহিতায় শঙ্খ, আপস্তম্ব, ব্যাস ও যমের মত উল্লিখিত হইয়াছে। অঙ্গিরার সংহিতায় আপস্তম্বের নাম আছে। আপস্তম্ব-সংহিতায় উশনা ও অঙ্গিরার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। কাত্যায়নসংহিতায় বশিষ্ঠ ও গৌতমের নাম পাওয়া যায়। বৃহস্পতি-সংহিতায় ব্যাসের মত লিখিত হইয়াছে। পরাশরসংহিতায় প্রায় সমুদায় সংহিতাকারের নাম দৃষ্ট হয়। শঙ্খ ও লিখিতের সংহিতায় যমের ও বশিষ্ঠ-সংহিতায় হারীত ও গৌতমের মত গৃহীত হইয়াছে। এমন অবস্থায় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, প্রচলিত সংহিতাগুলি সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে সকল সংহিতারই এক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল। নূতন করিয়া সঙ্কলনের সময় সঙ্কলয়িতাদের তৎসমুদায় দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। নূতন সঙ্কলিত স্মৃতিসমূহের মধ্যে মনু-

সংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গৌতম ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানীয়। হারীত ও শাতাতপের সংহিতা আকারে যেমন ক্ষুদ্র, উহা তেমনই আধুনিক। হারীত প্রাচীন ঋষি নন। হারীত পৌরাণিক যুগের অবসানকালে জন্মগ্রহণ করেন। হারীতসংহিতার প্রাচীনত্বপ্রতিপাদনের জন্য ইহা মার্কণ্ডেয়ের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে। ইহা কোন বৃহৎ গ্রন্থের একাংশ মাত্র। রঘুনন্দনের স্মৃতিতে বৃহৎ ও লঘুহারীতসংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সমুদায় সংহিতারই বৃহৎ ও লঘু দুই রূপ আকার আছে। ভিন্ন ভিন্ন পাঠশালায় সঙ্কলিত হওয়ায় এইরূপ হইয়াছে।

হারীত নরসিংহোপাসক ছিলেন। রাজপুতানার কোনও স্থানে হারীতের আশ্রম ছিল। এরূপ জনশ্রুতি আছে, মিবারের রাণাদের পূর্ব্বপুরুষ হারীতের সাক্ষাৎকার ও অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। হারীত বৈশ্য জাতিকে নরসিংহোপাসক হইতে বলিয়াছেন।

মনুর সময় লোকসংখ্যা-বর্দ্ধনের জন্য আর্য্যদিগকে বাধ্য হইয়া শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে হইত। শূদ্রকন্যার গর্ভজাত সন্তানও আর্য্য হইত। তাহা না হইলে সেরূপ বিবাহে কোনও লাভ হইত না। দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে গেলে প্রায়ই শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে হইত। প্রথম সময়ে আর্য্যসমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা বদ্ধমূল হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত। তবে হয় ত মর্য্যাদার কিছু তারতম্য ছিল; কিন্তু পৃথক্ জাতি হইত না। এখনও দেখা যায়, কুলীন-কন্যা-গর্ভজাত সন্তান বিদ্যমান থাকিলে, শ্রোত্রিয়-কন্যা-গর্ভজাত সন্তানকে শ্রাদ্ধ করিতে দেওয়া হয় না। ব্রাহ্মণের শূদ্রাগর্ভজাত সন্তানও ব্রাহ্মণ হইত, কিন্তু তাহাতে সমাজের অবনতি হইতেছে মনে করিয়া, যাজ্ঞবল্ক্য শূদ্র জাতি হইতে ব্রাহ্মণের দারসংগ্রহের অনুমোদন করেন নাই। তখন লোকসংখ্যাও বাড়িয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য মনুর অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং মনু অপেক্ষা যাজ্ঞবল্ক্য আর্য্যসমাজের পরিপুষ্টি দেখিয়াছিলেন।

কোন সংহিতাই শূদ্র জাতির প্রতি বিশেষ অনুকূল নয়। শূদ্র জাতির অবস্থা ভারতের সর্ব্বত্র একরূপ ছিল না। দ্বিজাতির শুশ্রূষা শূদ্র জাতির করণীয় ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি শিল্প কর্ম্ম করিতেন না। শূদ্রেরা শিল্পী ছিল। শিল্প না হইলে সমাজ চলে না। শূদ্রেরা শিল্পদ্রব্য যোগাইয়া দ্বিজাতির অভাব পূরণ করিত, ইহাই শূদ্রের দ্বিজশুশ্রূষা। এবংবিধ প্রয়োজনীয় সম্প্রদায়ের প্রতি

উদার হইলে ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব আরও বাড়িত। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাদৃশ প্রাচীন কালে আর্য্য জাতি শূদ্রদের প্রতি যেরূপ মহত্ব দেখাইয়াছেন, পৃথিবীর কোন জাতি পরাজিতদিগের প্রতি তাদৃশ মহত্ব দেখাইতে পারে নাই। শ্বেতবর্ণ আমেরিকেরা কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোদের প্রতি পিশাচের অপেক্ষাও জঘন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। গ্রীক্ জাতি হেলট দাসদের সহিত ও রোমীয়েরা দাসগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিত, প্রাচীন হিন্দু কখনও শূদ্রদের সহিত তাদৃশ অমানুষ ব্যবহার করেন নাই। শূদ্র সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক ছিল। আর্য্যসমাজের দুর্বৃত্ত লোক সমাজ হইতে তাড়িত হইয়া শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইত. শূদ্রদিগের এত দূর উন্নতি হইয়াছিল যে, কোন কোন স্থানে তাহারা রাজ্যস্থাপনও করিতে পারিয়াছিল। শূদ্র অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জাতি সমাজে বাস করিত; উহাদিগকে অন্ত্যজ বলা হইয়াছে। অধিকাংশ স্মৃতিতে দেখিতে পাই, রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্লকে অন্ত্যজ বলা হইয়াছে। উহাদের অন্নভোজন করিলে শূদ্রদিগকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। তাহাদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট দুর্দ্দান্ত জাতি আর্য্যোপনিবেশের বাহিরে থাকিয়া তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিত। চণ্ডাল ও পুক্কস এইরূপ দুটি জাতি। চণ্ডাল দুই প্রকার ছিল। শূদ্র পিতার ঔরসে উচ্চশ্রেণীর আর্য্য-কন্যার গর্ভজাত একরূপ চণ্ডাল; ভীষণস্বভাব অনার্য্য-জাতিবিশেষ অন্যবিধ চণ্ডাল। শেষোক্ত চণ্ডালেরা সর্পনির্ম্মোকে গৃহ সজ্জিত করিত, কুকুরমাংস ভোজন করিত। ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল প্রভৃতি ভীষণপ্রকৃতি জাতি সুযোগ পাইলে আর্য্য-সমাজের স্ত্রী পুরুষ ধরিয়া লইয়া যাইত। আপস্তম্ব বলেন, ধৃত ব্যক্তিকে যদি তাহারা গোবরাহ খরোষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুর মাংস ভোজন করায়, বলপূর্ব্বক অনুচিত কার্য্য করায়, তথাপি তিন বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসিলে ধৃতব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে গৃহীত হইতে পারিবে। তাহার পর আসিলে সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইলে অনেকে তাহা অবলম্বন করে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ ক্ষত্রিয়। পূর্ব্বদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ হইতে এই দুই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। যে সকল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত আচারমার্গের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন নাই, তাঁহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া স্মৃতিগ্রন্থসমূহে নিন্দিত হইয়াছেন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানসময়ে ব্রাহ্মণ জাতি যেমন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনই অনেক অকার্য্যও করিয়াছেন যাহারা প্রথমে পূর্ব্বধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল,

তাহারা যেমন অনুগ্রহলাভ করিয়াছিল, অন্যে তেমন অনুগ্রহ পায় নাই। বৌদ্ধযুগে বেদবিদ্যার অবনতি হইয়াছিল; কিন্তু জ্যোতিষ ও চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। জ্যোতিষ ও চিকিৎসার অনাদর হইবার কারণ নাই। বৌদ্ধদের বিশেষ বিদ্যা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে চিকিৎসক হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণ হইতে আয়ুর্ব্বেদের জন্ম হইয়াছে। আত্রেয়, ভরদ্বাজ, অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ বৌদ্ধযুগে চিকিৎসা বিদ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সহসা আপনাদের পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সমাজে পরিগৃহীত হন নাই। তাঁহারা পুনরায় হিন্দু আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলেও সমাজ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। আমাদের বোধ হয়, বঙ্গদেশের বৈদ্য জাতি এইরূপ ব্রাহ্মণ। যে সকল ক্ষত্রিয় পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ। উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ বলিবার কারণ এই যে, বর্ত্তমান কায়স্থজাতির মধ্যে বিস্তর শূদ্রের প্রবেশ হইয়াছে। বৈশ্যজাতির মধ্যে অনেকে প্রথমেই হিন্দু হইয়াছিল, নবশাখেরা এই জাতীয় বৈশ্য। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম কখনই অবলম্বন করেন নাই, এমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখগণ এই কারণে নিকৃষ্ট হইয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানসময়ে প্রাচীন সংহিতাগুলি নূতন আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্রমাগত এই পরিবর্ত্তন হইতেছিল। মহাভারত ও রামায়ণে "মনুর মত" বলিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে, এখনকার মনুতে তাহা পাওয়া যায় না। রঘুনন্দনও এইরূপ বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। নতুবা তিনি মাধবাচার্য্য-ধৃত পরাশর, বাচস্পতিমিশ্র-ধৃত ব্যাস, ভট্টনারায়ণ-ধৃত গৌতম, এরূপ লিখিতেন না।

স্মৃতিগ্রন্থগুলির দোষের ভাগ অতি সামান্য, গুণের ভাগ অসামান্য। মনুষ্যের প্রতি, এমন কি, জীবসাধারণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্র অতি উদার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। জগতের হিতার্থ হিন্দুজাতি আপনার সুখকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিতেন। কোনও হিন্দু কেবল আপনার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিতেন না। অতিথিসেবা হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। হিন্দুশাস্ত্র মানবকে কর্ম্মশীল অথচ সংযত, ন্যায়পর অথচ দয়াশীল, সাহসী অথচ ক্ষমাবান করে। কোন শাস্ত্র বলিতেছেন,—

চাণ্ডালো বাথ পাপো বা শত্রুর্বা পিতৃঘাতকঃ
দেশকালাত্যয়গতো ভরণীয়ো মতো মম॥

মনুসংহিতার উপদেশমালা অবসাদগ্রস্তের অন্তরে বলসঞ্চার করে।

সংহিতাগুলির প্রথম সঙ্কলনের সময় অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। অতি সমারোহে অশ্বমেধের অবভৃত স্নান অনুষ্ঠিত হইত। অশ্বমেধাবভৃথে স্নানকারীর পাপ ক্ষমা করা হইত। শুনা যায়, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তখনও ভারত স্বাধীন ছিল। তখনও ভারতে বীরত্বের আদর ছিল।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ব্যর্থযাত্রা।

কালিন্দীর কূল হ'তে একটি ব্রাহ্মণ
উপনীত কাশীধামে; তখন প্রভাত;
আজন্মের সাধ তার,—ভরিয়া নয়ন
নেহারিবে মূর্ত্তিমান দেব বিশ্বনাথ

অনাহারে, পথক্লেশে, দিবসযামিনী
অনিদ্রায় শীর্ণ দেহ অস্থিচর্ম্মসার;
সারা পথে মনে প্রাণে সেধেছে রাগিণী—
গাহিতে বন্দনা-গান ধ্যেয় দেবতার।

তীর্থপথে প্রতিষ্ঠিত পথিক-নিবাসে
কত নিশি গেছে আর কত দীর্ঘদিন,
শীত-বৃষ্টি-রৌদ্রতাপে শিশিরে বাতাসে
ভাবোজ্জল মুখ তার হয়নি মলিন।

জানিতে চেয়েছে কত পান্থজন হ'তে
কোন পথে যে'তে হয় বারাণসীপুরে;
শ্রান্ত পর্য্যটন-ক্লান্ত দূর দীর্ঘপথে
করেছে জিজ্ঞাসা, "কাশী আরো কত দূরে?"

পথখেদে পরিশ্রান্ত যবে পান্থশালে
  নিদ্রা-বিগলিত দেহ পড়িত ঢলিয়া,
স্বপ্নে হেরি' ধ্যেয় মূর্ত্তি কত নিশাকালে
  সুপ্তি হ'তে জাগিত সে উঠি' চমকিয়া।

এত দিন রচিয়াছে মনোবেদিকায়
  যাঁহার অনিন্দ্য মূর্ত্তি, দরিদ্র ব্রাহ্মণ
আসি' কাশীধামে আজি ভাবিয়া না পায়,
  কিরূপে সে দেবতার পাবে দরশন।

ক্রমে আসি' উপনীত অশ্বমেধঘাটে ;
  পশে মন্দাকিনীজলে করিতে গাহন ;
স্থানে স্থানে সমীরিত মন্ত্র বেদপাঠে
  যেন থেমে যায় তার হৃদয়-স্পন্দন।

চারি ভিতে স্নান করে বহু নরনারী ;
  কেহ সন্ধ্যা-রত ; কেহ করিছে তর্পণ ;
কেহ "মাতর্গঙ্গে !" কেহ "জননী !" উচ্চারি'
  দেয় ডুব ; কেহ উচ্চে গাহিছে স্তবন।

বিস্মিত ব্রাহ্মণ ; ভাবে বিভোর হৃদয় ;
  হেরে পুণ্য পদরজঃ তাপস যোগীর
কত যুগযুগান্তরে হয়েছে সঞ্চয়
  প্রতি বারিবিন্দু মাঝে পুণ্য তটিনীর।

রক্ত অন্তরীয়খানি করি পরিধান
  ব্রাহ্মণ সৈকত পানে দেখিল চাহিয়া,
প্রসন্ন শারদী ঊষা দীপিয়া বিমান
  রাখিয়াছে শিবপুরী কনকে রাঙ্গিয়া।

ছুটেছে যাত্রীর স্রোত দেব-দরশনে ;
  ব্রাহ্মণ চলিল সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধ সম ;
অসহ্য পুলক তার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরে,
  উঠে যবে যাত্রীদের "হর, হর, বম।"

আসিয়া মন্দিরদ্বারে হ'ল সে চঞ্চল,
কিরূপে পূজিবে তাঁরে কোন্ উপচারে ?
সে যে অতি দীনহীন, অতি নিঃসম্বল,—
কি দিয়ে পূজিবে মূর্ত্ত বিশ্বদেবতারে ?

চকিতে আসিয়া এক পূজারী ব্রাহ্মণ
সুধা'ল, "পূজিতে চাও দেব বিশ্বেশ্বরে ?
"দেখি কি কি আনিয়াছ পূজা-আয়োজন ;
কিছু না ? শকতি নাই ? চলে যাও দূরে !"

বিদ্ধ মৃগসম দ্বিজ সরি' গিয়া দূরে
কহিল কাতরকণ্ঠে চাহি শূন্যপানে,—
"ওগো বিশ্বনাথ ! আসি বারাণসীপুরে,
ফিরিতেছি দ্বার হ'তে—তোমার সন্ধানে।

"সুদূর পশ্চাতে ফেলি এসেছি সংসার ;
শিশু সম ছুটিয়াছি কত জলে স্থলে,—
পাব না কি ক্ষণমাত্র দরশ তোমার,
হিরণ্ময় পূজাপাত্র মোর নাই ব'লে।

"ওগো প্রিয় ! হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা !
ফিরে যাব ? দিবে না কি মোরে দরশন ?
ফিরে যাব ? শুনিবে না হৃদয়-বারতা
অর্ঘ্য তরে নাহি ব'লে রতন কাঞ্চন ?"

সর্ব্বরিক্ত আপনার অতি দৈন্যভারে
মন্দিরে পশিতে ইচ্ছা রহিল না আর ;
উদ্দেশে প্রণমি' ধীরে দেব বিশ্বেশ্বরে
ফিরিল জগৎ পানে গৃহে আপনার

এখনো রমণী তার প্রত্যহ সন্ধ্যায়
তুলসী-প্রদীপ জ্বালি' একান্ত নির্ভরে—
চেয়ে থাকে পথ পানে তার প্রতীক্ষায় ;
কিন্তু সে ব্রাহ্মণ আজো ফিরে নাই ঘরে!

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

ফরাসীর চক্ষে ভারত।

পীয়ের লোটী।

পীয়ের লোটী ফরাসী সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, প্রাচ্য ভূখণ্ডকে তিনি একটু স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। ইউরোপীয়—বিশেষতঃ ইংরাজ পর্য্যটকদিগের নিকট এরূপ স্নেহভাবের আশা কদাচিৎ করিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি ফরাসী ভদ্রলোক ভারতভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের অনেকেই ভারত সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা স্বদেশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা সাধারণতঃ সহৃদয়তাপূর্ণ। ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব তাহাতে নাই, বরং সহানুভূতি দ্বারা অনুরঞ্জিত হওয়ায় তাহাদের উজ্জ্বল্য অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ফরাসী যাহা দেখে, তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে, এবং এমন সকল বিষয় হইতে সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করে, যাহা অন্যজাতীয় লোকের দৃষ্টি সহজেই অতিক্রম করে। এ অবস্থায় পীয়ের লোটী ভারতভ্রমণে আসিয়া এ দেশের কিরূপ বর্ণচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে। লোটীর এক একটি বর্ণনা এক একটি চিত্র। আমরা এখানে দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

বৌদ্ধক্ষেত্র অনুরাধপুর।

পীয়ের লোটীর বর্ণনা ও সাধারণ পর্য্যটকদিগের বর্ণনার মধ্যে আর একটু প্রভেদ আছে। ভারত সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে অনেকে প্রথম বোম্বে বন্দর বা ভারতরাজধানী কলিকাতা হইতেই আরম্ভ করেন। কিন্তু লোটী তাহা করেন নাই। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের আরম্ভস্থল—অনুরাধপুর; দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যেখানে শিল্প ও ধর্ম্ম আপনাদের অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ত্যাগ ও বিশ্বাসের পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া যাহা সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিয়াছিল, এখন তাহা অতীত গৌরবের সমাধিমাত্র। সেই সমাধিক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া লোটী বলিতেছেন,—"যে পাহাড়ের উপর আমি এখন দণ্ডায়মান আছি, এই স্থানে এক সময়ে একটি সুপবিত্র মন্দির ছিল। সহস্র সহস্র বিশ্বস্তহৃদয় ভক্ত তাহাদের ধর্ম্মসংস্থাপকের গৌরব এই পর্ব্বতের পাষাণময় অঙ্কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রমে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহার পাদভূমি কতকগুলি প্রস্তরময় হস্তী দ্বারা পরি

বেষ্টিত। তাহার সন্নিকটে যে কত দেবমূর্ত্তি ছিল, তাহার সংখ্যা হয় না; কিন্তু সেগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কালের কুক্ষিগত হইয়াছে। তথাপি অতীত কালে দিনের পর দিন কত সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইয়াছে; কত ভক্তের কণ্ঠনাদে গগনতল প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। কল্পনানেত্রে দেখিলাম, অনুরাধপুরের অসংখ্য মন্দির ও প্রাসাদশিখরের সুবর্ণ কলস সৌরকরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; পথে ধনুর্ব্বাণধারী সৈন্যশ্রেণী, হস্তিযূথ, অশ্বরাজি, রথসমূহ ও সহস্র সহস্র লোক প্রতিনিয়তই গতায়াত করিতেছে। কত ঐন্দ্রজালিক, কত নর্ত্তক ও গায়ক এক দিন এই সুন্দর নগরী তাহাদের গীতে, বাদ্যে ও সঙ্গীতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল! কিন্তু এখন সেখানে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ করিতেছে। চারি দিকে অন্ধকার।"

অনুরাধপুর পরিত্যাগ করিয়া পীয়ের লোটী দক্ষিণ-ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মহারাজের অতিথি হইয়াছিলেন। কখনও গোরুর গাড়ীতে, কখনও পাল্কীতে চড়িয়া দক্ষিণ-ভারতের বৈচিত্র্য পূর্ণ দৃশ্য সন্দর্শন করিতে করিতে তিনি নগরপথ অতিক্রম পূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে গমন করেন।

দক্ষিণ-ভারতে।

অভ্যস্ত চক্ষু অনেক দ্রব্য দেখিতে পায় না, আবার অনেক দ্রব্য দেখিয়াও তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে না। যাহারা কখনও সমুদ্র দেখে নাই, মরুভূমিতে পদার্পণ করে নাই, পর্ব্বতের নিকট যায় নাই, তাহারা হঠাৎ সমুদ্র, মরুভূমি বা পর্ব্বত দর্শন করিলে, তাহাদের হৃদয়ে যে কৌতূহলের সঞ্চার হয়, তাহারা যেরূপ বিস্ময় অনুভব করে,—কোনও সমুদ্রবাসী, পর্ব্বতচর, বা মরুপ্রবাসীর হৃদয় সে ভাবে মুগ্ধ হয় না। পীয়ের লোটী ত্রিবাঙ্কুরের পথ দিয়া চলিতে চলিতে যে সকল দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, সে দেশের লোকের আচার ব্যবহার, ভাবভঙ্গি, রুচি, পরিচ্ছদ প্রভৃতি যাহাকিছু তাহার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে সমস্ত জিনিসেরই তিনি ঠিক ছবি তুলিয়া লইয়াছেন। তাহার কোথাও ঊষার মৃদু আলোক, কোথাও মধ্যাহ্ন সূর্য্যের উজ্জ্বল আভা, কোথাও মেঘের ধূসর ছায়া, কোথাও গোধূলির ম্লান সৌম্যভাব। দক্ষিণ-ভারতের একটি আধুনিক হিন্দু রাজধানীর উজ্জ্বল চিত্র তিনি অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

হায়দরাবাদের রাজপথের চিত্র তিনি এইরূপ আঁকিয়াছেন,—"ক্রমে দিবাবসান হইয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে রাজপথের জনতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, রাজপথ দিয়া জীবনের স্রোত বহিয়া চলিল। চারি দিকে নানাবিধ শব্দ, সেই শব্দকোলাহল ক্রমে বর্দ্ধমান ধূলিজালের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। নিশাগমের পূর্ব্বে আর সেই নিশ্বাসধ্বনির বিরাম নাই। ক্রমাগত গাড়ী

হায়দরাবাদের রাজপথে।

চলিতেছে; কেবল অশ্বযান নহে, বলদবাহিত শকটও অসংখ্য। কতকগুলি শকট পর্দ্দা দিয়া ঢাকা; পর্দ্দার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র, সেই ছিদ্রপথে এক একবার বড় বড় দু'খানি কজ্জল-রঞ্জিত চক্ষু হইতে কটাক্ষচ্ছটা জনস্রোতের উপর বিকীর্ণ হইয়া তখনই অদৃশ্য হইতেছে। সুশ্রীমুখকান্তিবিশিষ্ট অশ্বারোহিগণ 'কদমে' চলিয়াছে; তাহাদের মাথায় চূড়াকার টুপি; প্রকাণ্ড পাগড়ী টুপি বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। হস্তে সুদীর্ঘ বর্শা। কুব্জপৃষ্ঠ উষ্ট্রের পৃষ্ঠে

বসিয়া দলে দলে মোসাফীর গন্তব্য পথে যাত্রা করিয়াছে। কারখানার হস্তীগুলি সর্ব্বাঙ্গে ধূলি কাদা মাখিয়া, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, বিশ্রাম করিতে যাইতেছে। নিজাম সরকারের সৌখীন হস্তী সকল বিবাহের উৎসবে ভেরীধ্বনি শুনিতে শুনিতে মন্থরগমনে অগ্রসর হই-তেছে। তাহাদের পৃষ্ঠে হাওদা; হাওদায় মশারি খাটান; তাহার ভিতর বর কনে। বেহারার দল লঘুপদবিক্ষেপে পাল্‌কী লইয়া চলিতেছে; মুখে বৈচিত্র্যবিরহিত অশ্রান্ত শব্দ। পাল্‌কীর ভিতর কারুকার্য্যখচিত বস্ত্রাবৃত গদী আঁটা; কোন পাল্‌কীতে এক জন সৌম্যমূর্ত্তি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ উপবিষ্ট; তাঁহার চক্ষুতে চশমা। কোন পাল্‌কীতে ধ্যানস্তিমিতনেত্র গম্ভীরপ্রকৃতি মোল্লা বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসীর দল ছিন্নবস্ত্রে দেহ ঢাকিয়া সঙ্কুচিতভাবে চলিয়াছে। পাগ-লের দল নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতেছে,—তাহাদের দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর সহিত সে দৃষ্টির কোনও সম্বন্ধ নাই। বৃদ্ধ ফকীরের দল কেশরাশিতে ভস্ম মাখিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে পথ দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে;—দক্ষিণে বা বামে তাহাদের দৃষ্টি নিক্ষেপের অবসর নাই। পথিকগণ সসম্মানে তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে।

"এক দল আরব অশ্বারোহী সৈন্য চলিয়া গেল। তাহার পরই এক জন প্রতিবেশী রাজা অশ্বারোহিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রুতগতিতে পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন।—অশ্বারোহিগণের হাতের বর্শা বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ধূপধুনা জ্বলিয়া তাহা হইতে সুরভিবাশি উত্থিত হইতে লাগিল। পথের ধারে দোকানে পর্ব্বতের ন্যায় স্তূপাকার গোলাপফুল। রাশি রাশি শুভ্র জুঁইফুল ঝোড়া পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যেন ধূলির উপর রাশি রাশি তুষার বিস্তীর্ণ হইয়া আছে! এ সকল দেখিয়া কে বলিবে পশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে,—সীমান্ত প্রদেশে তাহার করালছায়া নিপতিত হইয়াছে? আচ্ছা, কোন্ বাগানে এমন ফুল ফুটিয়াছে, তরুমূলে কোন জল সেচন করিয়া এমন ফুল ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে? ক্রমে সূর্য্য যেমন অস্ত গেল, অমনই আরব্য-উপন্যাসের দৃশ্য নয়নসমক্ষে উন্মুক্ত হইল। চক্ষুতে সুরমা।—দাড়ীতে সিন্দূর, পরিধানে সাচ্চা ও চুমকীর কারুকার্য্যশোভিত মখমলের পোষাক পরা সৌখীনের দল সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছে,—তাহাদের কণ্ঠে মূল্যবান হীরকরত্নের হার, মণিবন্ধে পোষা বুলবুল।"

"রৎলাম হইতে ইন্দোর পর্য্যন্ত রেলপথে আমি ভ্রমণ করিতেছি। এ দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। আমি যে ট্রেণে যাইতেছি, সে ট্রেণ প্রায় খালি; যে অল্পসংখ্যক লোক আছে, তাহারা সকলেই ভারতবাসী। প্রথমতঃ একটা গ্রামে ট্রেণ থামিল। ট্রেণের ঝনঝনি ও চাকার শব্দ থামিতেই একটি অদ্ভুত শব্দ কাণে বাজিতে লাগিল। সে শব্দ কি কাতরতামিশ্রিত। তাহার অর্থ বোধগম্য না হইলেও সহজেই তাহা মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে। এই মৃত্যুসঙ্গীত এখানে আরব্ধ হইল, আর ইহার বিরাম হইবে না; কারণ, আমরা দুর্ভিক্ষের দেশে প্রবেশ করিয়াছি। এক দল ছেলে করুণস্বরে ভিক্ষা চাহি-তেছে, প্রথমটা শুনিয়া মনে হয়, খেলার সময় স্কুলের ছেলেরা সমস্বরে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু একটু কাণ পাতিয়া শুনিলে বুঝিতে পারা যায়, তাহার ভিতর একটি ক্লান্তি-পূর্ণ হৃদয়ভেদী তীব্র উচ্ছ্বাস আছে। সেই শব্দ শুনিতে বড় কঠোর বোধ হয়। আহা!

রাজপুতানার দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে।

বেচারা ছোট ছোট ছেলেগুলি রেলের বেড়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া ভিক্ষা চাহিতেছে,—তাহাদের হাতগুলি শুকাইয়া চামড়া হাড়ের উপর বসিয়া গিয়াছে, হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পীতবর্ণ চক্ষুর নীচে কঙ্কালখানা দাঁড়াইয়া আছে, অতি ভীষণ দৃশ্য! তাহাদের উদর পিঠে আসিয়া ঠেকিয়াছে, দেখিয়া তাহাদের পাকযন্ত্রাদি কিছু আছে বলিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। তাহাদের চক্ষুঃপ্রান্তে মাছি ভন ভন করিতেছে, মুখের উপরেও মাছি বসিয়াছে। তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্তে যে তরল জলবৎ পদার্থ লাগিয়া আছে, তাহাই পান করিতেছে। এ সকল দেহে আর অধিক দিন শ্বাস বহিবে না। দেহে প্রাণকণিকামাত্র বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে এখানে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছে, 'খেতে দাও, কিছু খেতে দাও, বড় ক্ষুধা পেয়েছে গো, কিছু খেতে দাও।' তাহারা হয় ত মনে করিয়াছে, এই সকল সুন্দর গাড়ীতে চড়িয়া যে সকল বিদেশী যাতায়াত করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই বড়লোক, দয়া করিয়া তাহারা তাহাদের দিকে কিছু কিছু ছুড়িয়া ফেলিবে। তাই তাহারা কম্পিত-ক্ষীণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে 'মহারাজ! মহারাজ!' ছেলেদের মধ্যে কাহারও কাহারও বয়স পাঁচ বৎসরেরও কম। তাহারাও তাহাদের শীর্ণহস্ত প্রসারিত করিয়া ডাকিতেছে,—'মহারাজ! মহারাজ!'

"যাহারা এই ট্রেণে আমার সঙ্গে তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীতে যাইতেছে, তাহাদের সকলেই নমপকফি ভারতবাসী। তাহাদের নিকট চাউল ও পয়সা যাহা কিছু ছিল, ছাড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, আর এই সকল অন্নহীন হতভাগা ক্ষুধার্ত্ত জন্তুর মত তাহা লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে। আমার কাছে নগদ টাকা যাহা কিছু ছিল, সমস্তই তাহাদিগকে দিয়া ফেলিলাম আশ্চর্য্য! তা তাহারা সেখানে তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। একটি তিন চারি বৎসরের ছেলে ভিক্ষা করিয়া গুটিকত পয়সা পাইয়াছে, আর একটি বড় ছেলে আসিয়া তাহার সেই কষ্টার্জ্জিত পয়সা কয়টি লইবার জন্য তাহার হাতের উপর ছোঁ মারিল। ছোট ছেলেটি দুই হাত একত্র করিয়া জোরে মুঠি বাঁধিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার মুখে যে ভয় ও নিরাশা অঙ্কিত দেখিলাম, তাহা কেবল অনুভবযোগ্য।"

পীয়ের লোটী উদয়পুরের মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উদয়পুরের মহারাণা প্রতাপের বংশধর ভাবিয়া তিনি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ফরাসী জাতির মত স্বাধীনতার সম্মান পৃথিবীতে আর কেহ বোঝে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু সেই স্বাধীনতার জন্য ফরাসী জাতি এক সময়ে যেমন ক্ষেপিয়াছিল, পৃথিবীতে সেরূপ ভয়ন কাণ্ড করিয়াছিল পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে তাহা অপূর্ব্ব। পীয়ের লোটী মহারাণা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধে আমাদের পোলিটিকেল প্রভুদের সাধারণ মন্তব্যের তুলনা করিলে, উভয় জাতির চরিত্রগত বিশেষত্ব সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

উদয়পুরে, রাণা সকাশে।

" * * * আমার পথপ্রদর্শক একটু থামিল; সসম্মানে নিম্নস্বরে বলিল, "মহারাণা।" আমি একাকী দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলাম। একটা দালানের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। মর্ম্মরনির্ম্মিত কি বিস্তীর্ণ প্রাসাদ! একটি 'হলে'র মেঝেতে বরফের মত শুভ্র একখানি চাদর পাতা। নিকটে কোন অনুচর কি রক্ষী কেহ নাই। নির্জ্জন পুরী। চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্য্য বিরাজিত,—তাহারই মধ্যে দুইখানি চেয়ার পাশাপাশি সংরক্ষিত। দেখিলাম, মহারাণা তাহারই একখানি চেয়ারের ধারে দাঁড়াইয়া, আমার দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে সদাবাসতার্থে শুভ্র পরিচ্ছদ; কণ্ঠে নীলবর্ণ রত্নহার।

"স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট চেয়ারের উপর পরস্পর অনেক কায়দা প্রকাশের পর, উপবেশন করা গেল। এক জন ভিখারী নিঃশব্দে আসিয়া আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইল। সে লোকটি

কথা কহিবার সময় একখানি রেশমী রুমাল নিজের মুখের উপর ধরিতে লাগিল। নতুবা তাহার নিশ্বাস মহারাণার গায়ে লাগিতে পারে। কিন্তু এরূপ সাবধানতা অবলম্বনের কোনও আবশ্যকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তাহার দন্তশ্রেণী উজ্জ্বল, শ্বাসও দূষিত বলিয়া মনে হইল না।

"এই অল্পভাষী মহারাণায় মাধুর্য্য ও পৌরুষ উভয়ই বিদ্যমান। শিষ্টাচারের আদর্শ বলিলেই হয়। তাহার উপর এমন বিনয় অতি উচ্চপদস্থ লোক ভিন্ন অন্য কাহারও মধ্যে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি প্রথমেই অনুগ্রহপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার দেশে আসিয়া আমি বেশ ভাল আছি কি না। আমার ব্যবহারের জন্য তাঁহার লোক যে ঘোড়া গাড়ী নিযুক্ত রাখিয়াছে, তাহা আমার মনের মত হইয়াছে কি না? তাহার পর আমাদের মধ্যে অনেক কথা হইল। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় যাইব, এ সকল কথাও হইল। আমি কেবল ভাবিতে লাগিলাম, যদি আমাদের পরস্পরের মনোভাব অক্লেশে পরস্পরকে জানাইতে পারিতাম, তাহা হইলে কত অদ্ভুত চিন্তা, কত নূতন কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারিতাম।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আশ্বিন। শারদীয় প্রবাসীর প্রবন্ধদৈন্য শোচনীয়। শ্রীযুক্ত মেজর বামনদাস বসুর সঙ্কলিত "গুজরাতি ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য" নামক সুলিখিত সন্দর্ভ ব্যতীত এবার আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "রুমালী" নামক গল্পটি পড়িয়া নিরাশ হইয়াছি। প্রবীণ লেখক 'পাকা গুটী কাঁচাইতে' বসিলেন কেন, বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "রেডিয়ম" নামক বৈজ্ঞানিক রচনাটি দেখিয়া মনে হইতেছে, যোগেশবাবু প্রবাসীর শারদীয় সুরে গলা সাধিয়াছেন। "বেকেরেল ও অন্যেরা য়ুরেনিয়ম ও থোরিয়ম নামক ধাতুদ্বয় হইতে তেজ নির্গত হইতে দেখাইয়াছেন" ও "তাঁহার সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত রেডিয়ম নামক ধাতুর তেজ বিকিরণ ক্ষমতা আরও বিস্ময়জনক" প্রভৃতি জটিল ও অদ্ভুত ভাষা যোগেশবাবুর রচনায় শোভা পায় না। বিদেশী সংবাদপত্রে যাহা সহজে পড়া গিয়াছে, মাতৃভাষায় লিখিত প্রবন্ধ হইতে তাহা আয়ত্ত করিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়, ইহা দুঃখের বিষয় নয় কি? যাহা হউক, প্রবন্ধের দৈন্য সম্পাদক অন্য প্রকারে পূর্ণ করিয়াছেন, সুতরাং পাঠকগণের আক্ষেপের কারণ নাই। এতগুলি লেখকের এক তাড়া লেখনীতে যাহা সিদ্ধ হয় নাই, সম্পাদক একটিমাত্র তুলীতে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। এবারকার তুলীর ফল,—"বঙ্গের এক শ্রেণীর সমালোচকের নমুনা"।—সমালোচকের লাঙ্গুলে "শিশুবোধক" বাঁধা। আচ্ছা, বঙ্গের সমালোচকের ছবি আঁকিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় এলাহাবাদের 'মডেল' গ্রহণ করিলেন কেন? "শিশুবোধক" ত এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে; চোরের উপদ্রবে বিদ্যাসাগরের "বর্ণপরিচয়"ও গতপ্রায়; এ অবস্থায় সমালোচকের ল্যাজে শিশুবোধকের বদলে একখানি "সচিত্র বর্ণপরিচয়" বাঁধিয়া দিলে কেমন হইত? "এক শ্রেণীর সমালোচক" বলিলে কাহাদের বুঝিবে? নিশ্চয়ই যাহারা রামানন্দী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়, যাহারা প্রবাসীর পোঁ ধরিতে অক্ষম, এবং যাহাদের উপদ্রবে চুরী করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিলেই ধরা পড়িতে হয়, তাহারা? —না? সম্পাদক একটি কথা জানিয়া রাখুন, বিশ্ববিদ্যালয় দাগিয়া দিলেই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির গর্ব্ব বৃথা। কোনও শিক্ষাই গাধা পিটিয়া ঘোড়া

করিতে পারেনা, এবং মাতৃস্তন্যের সহিত যাহারা শীলতা ও সৌজন্য আহরণ করিবার অবকাশ পায় নাই, তাহারা দুর্ভাগা ; কৃপার পাত্র। সুতরাং আর অরণ্যে রোদন অনাবশ্যক।

প্রবাসী। কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "রামায়ণ' নামক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। "স্বপ্ন" গল্পটি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। বাঙ্গালীর চরিত্রানুরূপ স্বপ্ন বটে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বঙ্গ-বিপর্য্যয়িক্" মনে পড়ে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচিত "আমার সন্ন্যাস" নামক গল্পটি প্রকাশিত হইল কেন, বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর "মাধব রাওয়ের মৃত্যু"র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রচনাটির ভাষাও যেন বর্গীর ভয়ে একটু 'আড়ষ্ট' হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অপ্সর গান" পড়িয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিলাম না। নরকের গান লিখিলে স্বাভাবিক হইত। শ্রীমতী সরলা দেবীর "পকৃষতা ও রমণীয়তা" আমাদের অনধিগম্য। এক পৃষ্ঠায় "অনিব গান" ও অন্য পৃষ্ঠায় "প্লীহারক্ষক" দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। পরাধীন জাতির মনুষ্যত্ব থাকে না, তাহা জানি। কিন্তু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় ঢাক বাজাইয়া ছবি আঁকিয়া তাহা জানাইবার আবশ্যক কি? গোরার লাথি ও গরীবের প্লীহা উপলক্ষ করিয়া যে কাপুরুষ এইটা দন্তবিকাশ করিতে পারে, সে মনুষ্যনামের যোগ্য নহে। একবিন্দু আত্মসম্মান থাকিলে ভদ্রলোকের এমন প্রবৃত্তি হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রবাসীর তথাকথিত গৌরাঙ্গসমালোচনার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পূর্ব্ব সমালোচক গৌরাঙ্গদেবকে গালি দিয়াছিলেন, দীনেশ বাবু স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকে গালি দিয়াছেন। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, এক জনকে গালি না দিলে আর এক জনের সমর্থন করা যায় না। 'এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার?" আমরা প্রবাসীকে বলি, Forbear your charity, call back your dog. শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, "আমাদের আর্য্যগণের প্রাচীন নিবাস" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের The Arctic Home in Vedas নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা করিতেছেন। এরূপ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা প্রায় দেখা যায় না। যোগেশ বাবু বিশেষ আয়াসসহকারে তিলক মহোদয়ের বৈজ্ঞানিক যুক্তিপরম্পরার বিশ্লেষণ করিতেছেন। আশা করি, তাঁহার সমালোচনা মূল গ্রন্থকারের অবিদিত থাকিবে না, এবং এই আলোচনার ফলে প্রকৃত সত্য নির্ণীত হইবে।

প্রদীপ। অগ্রহায়ণ। এতকাল পরে যখন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যার" সমাধানে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তখন আর ভাবনার ভাবনা নাই। দীনেশবাবু আধ-আধ ভাষায় যাহা লেখেন, তাহাতেই একটু রস থাকে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার লক্ষণই এই যে, সে সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই লিখিয়া ফেলে। বিষয়বিশেষে কলম ধরিবার যোগ্যতা আছে কি না, তাহা কেবল সাধারণ লেখকেরাই বিচার করিয়া থাকেন ; বড় বড় লেখকগণের সে 'ধারা'ই নয়। বলা বাহুল্য, দীনেশ বাবুর প্রবন্ধটি অনেক অপূর্ব্ব তথ্যে ও সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ, কেবল সামাজিক সমস্যার প্রতিষ্ঠা ও তাহার সমাধান, করিতে লেখক এবার ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল মজুমদার 'কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নে"র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উপসংহারে দেখিতেছি, "হতভাগিনী কুন্দনন্দিনী নিবাণ প্রণয়ের শোণিতাক্ত বেদীর নিকট আত্মবলি প্রদান করিলেন।' তাহার পর আছে,—"দুইটি বিভিন্ন মনাবেগ"। প্রবন্ধ ছাপাইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার—বাঙ্গালীর ভাবের একটু অনুশীলন কর্ত্তব্য। নূতন ব্রতীদিগের রচনার পারমার্জ্জন সম্পাদকগণের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত নহে কি! শ্রীযুক্ত আবদুল করিম "প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধার' প্রবন্ধে "শনির পাঁচালী" প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্রের "মহাপ্রয়াণ" নামক কবিতাটির আদ্যন্ত যখন বুঝিতেই পারিলাম না, তখন আর ভাল মন্দ বলিব কি? "নীরব কল্লোলবন্ধ্যা অচঞ্চল অগাধ সে সলিলের থর" বাস্তবিকই বুঝিতে পারিলাম না। "টোপে টোপে আঁখি হতে, পড়ে তার দ্রুত পথে, রক্ত বাহুর ফোঁটা ধূম্র নভো গায়" প্রভৃতি

হেঁয়ালি হইতে পারে, কবিতা নয়। কবি শব্দসমুদ্র মন্থন করিয়া কেবল দুরূহ অপ্রচলিত অস্পষ্ট কর্ণকটু শব্দের হলাহল তুলিয়াছেন। ইহার উপর আবার তাঁহার নিজের শব্দসৃষ্টি আছে। কাজেই আমরা রণে ভঙ্গ দিলাম। যে কবিতায় প্রত্যেক চরণে মল্লিনাথের সাহায্য অপরিহার্য্য, সে কবিতা কখনও সার্থক হইতে পারে না। প্রসাদ গুণ এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, 'প্রাড়্‌বিবাক' বরদা বাবু তাহাকে দাগী 'গলিমুচের' ন্যায় কাব্য-রাজ্য হইতে একবারে চিরনির্ব্বাসিত করিতেছেন? শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নরহন্তা" কি একটি গল্প?

নব্যভারত। অগ্রহায়ণ। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর "আমাদের ভিতর ও বাহির" প্রবন্ধের মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তের "কলিকাতার ইতিবৃত্ত" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেনের "পুনর্জন্ম" প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। লেখক 'রেঙ্গুন গেজেট' হইতে পুনর্জন্মের প্রমাণস্বরূপ একটি কৌতুকাবহ ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'রেঙ্গুন গেজেট' তত মজবুত প্রমাণ না হউক, ঘটনাটি ঔপন্যাসিক বটে। নব্যভারতে ক্রমশঃপ্রকাশ্যের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। এবার কবিতাগুলিও সুনির্ব্বাচিত নহে। কাব্য-কুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রীর "উদ্বেগ" নামক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু রচয়িত্রীর লেখনীর অনুরূপ হয় নাই।

নবপ্রভা। অগ্রহায়ণ। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর "মেঘদূত" নামক প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। "কাটোয়ার পথে" শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর একটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য গল্প। প্রারম্ভে গল্পত্ব কিছু দেখিতেছি না। শ্রীযুক্ত বেণোয়ারীলাল গোস্বামীর "অধম" নামক কবিতাটি মন্দ নহে। "বড়লাট সম্বন্ধে গ্রন্থ" একটি সাময়িক সুপাঠ্য সংগ্রহ।

বঙ্গদর্শন। অগ্রহায়ণ। "সাহিত্যের তাৎপর্য্য" বোধ করি একটি গদ্য কবিতা। তাৎপর্য্যে charm আছে;—অলিভ্‌ ফ্লিনারের ভাষায়,—"that inscrutable charm which hovers for ever for the human intellect over the incomprehensible and shadowy"। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র "বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। আরও প্রমাণের আশা করি। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "আচার্য্য বসুর আবিষ্কারে" এবার 'দৃষ্টিবিভ্রম' প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞের পাঠ্য হইতে পারে, আমাদের মত অনধিকারীর পক্ষে অনধিগম্য। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "রামচরিত" রক্তবীজের ন্যায়, যেখানে একবিন্দু পড়ে, সেইখানেই ধারাবাহী প্রবন্ধ জন্মিতে থাকে। চর্ব্বিতচর্ব্বণের কল্যাণে রাম চরিতেও অরুচি হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবার "সিদ্ধিদাতা" গণেশের নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার করিয়াছেন। গণেশের বয়স ১১ শত বৎসর। চূড়ামণি মহাশয়েরা কি বলেন? শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "আমাদের ভাবী অবতার" প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবুর ভাষাকে এমন চমৎকার দক্ষতার সহিত ভেংচাইয়াছেন যে, দেখিয়া আমোদিত না হইয়া থাকা যায় না। কাহারও প্রতি অসম্মান-প্রদর্শন আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু একটি উপমার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।—রবীন্দ্র বাবুর কবিত্ব কাঁচপোকার কবলে পড়িয়া দীনেশ বাবুর রচনারূপ আরশোলাটি প্রায় রঙ্গীন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু ঠ্যাং ও শোঁয়াগুলি এখনও চেনা যাইতেছে।" যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে" —কথাটি নিতান্ত মিথ্যা নয়।

ধর্ম্মের জয়।

উৎকট প্রত্নতাত্ত্বিকেরাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর ভূমণ্ডলে পাঠশালার সৃষ্টি হইয়াছে; এবং এই তিন হাজার বৎসর ধরিয়া গুরুমহাশয়পরম্পরা বিনীত শিষ্যগণকে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতি অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। আমাদের পুরাণ শাস্ত্রে যমরাজ ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; এবং দণ্ডপাণি গুরুমহাশয়ে সেই দক্ষিণ-দিক্‌পালের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আতঙ্কবিহ্বল ছাত্রবর্গ ধর্ম্মের তাৎকালিক জয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয় বটে; কিন্তু সংসারক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয় হওয়া উচিত কি না, তদ্বিষয়ে তাহাদের মনের মধ্যে একটা সংশয় বাধিয়া যায়। নতুবা মনুষ্যগণ এতকাল ধরিয়া শৈশবকালে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতি কণ্ঠস্থ করিয়া আসিলেও আজিকার দিনে ধর্ম্মকে তাহার চারিখানি পায়ের মধ্যে তিনখানি হারাইয়া নিতান্ত খঞ্জের ন্যায় বিচরণ করিতে হইত না। নতুবা এই তিন হাজার বৎসরে মনুষ্যজাতির অন্য বিষয়ে এত অদ্ভুত উন্নতি সত্ত্বেও ধর্ম্ম বিষয়ে তাহার উন্নতি আদৌ ঘটিয়াছে কি না, সে বিষয়ে বড় বড় ঐতিহাসিক সংশয় করিতেন না।

তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন, এখনও ঠিক্ তেমনি, আর্ত্তের ও ব্যথিতের করুণস্বর দয়াময় জগৎকর্ত্তার অভিমুখে উত্থিত হইতেছে; কিন্তু জগৎকর্ত্তার হৃদয় তাহাতে বিচলিত হইতেছে না। ঠিক্ তেমনি ভাবে সবল দুর্ব্বলের হৃদয়-শোণিত পান করিয়া আপনার তৃষ্ণানিবারণের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোন ন্যায়পরায়ণ বিধাতা সেই অত্যাচারের প্রতীকার করিতেছেন না। ঠিক্ তেমনি ভাবেই অধর্ম্ম অভ্যুত্থিত হইয়া অহরহঃ ধর্ম্মের গ্লানিসম্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু কোন দণ্ডদাতা ধর্ম্মাবতার সাধুর পরিত্রাণের ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য আপনাকে সৃষ্ট করিতেছেন না। দুই সহস্র বৎসর হইতে চলিল, ইহুদীজাতির মধ্যে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের রাজ্য অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই আশ্বাসবাণী ও অভয়বাণী প্রচার করিয়া অশান্তিপূর্ণ নরসমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠাপিত ধর্ম্মসমাজেই অধর্ম্ম ধর্ম্মের ধ্বজা আন্দোলন করিয়া ধর্ম্মের অভিনয় করিয়া ভূমণ্ডলের বিশাল রঙ্গমঞ্চের উপর আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে; ধর্ম্ম তাহা অকাতরে সহিয়া যাইতেছেন।

শ্রোতৃবর্গ কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন, আমরা একবার যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই চিরপ্রচলিত নীতিবাক্যের যাথার্থ্যবিচারে অথবা তাৎপর্য্যবিচারে প্রবৃত্ত হইব। ঐ নীতিবাক্যের যাথার্থ্যে আমি কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করিতেছি, এই মনে করিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যদি কেহ ইতিমধ্যেই হতভাগ্য প্রবন্ধপাঠকের প্রতি বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমি সহিষ্ণুতার ভিখারী হইতেছি।

আমি পূরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, এই সভামধ্যে উপস্থিত কেহই নাই, যিনি, ধর্ম্মের জয় হউক, ইহা অকপটে মনের সহিত বাঞ্ছা করেন না। ধর্ম্মের জয়ে আনন্দলাভ সুস্থ মানবচিত্তের পক্ষে স্বাভাবিক। অতি বড় অধার্ম্মিক, শাস্ত্রে যাহাকে মহাপাতকী বা অতিপাতকী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সে ব্যক্তিও ধর্ম্মের পরাভবে মন ভরিয়া উল্লসিত হয় কি না সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণ আছে। কিন্তু জগৎপ্রণালীর কি বিচিত্র বিধান. আমরা যাহা বাঞ্ছা করি, তাহা সর্ব্বত্র ঘটে না। ধর্ম্মের জয় আমরা বাঞ্ছা করি বটে, কিন্তু ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র ঘটে না, ইহা সত্য কথা। ধর্ম্মের জয় যদি সুপরিচিত নিত্য ঘটনা হইত, তাহা হইলে ক্ষেত্রবিশেষে কোন অধম পাতকীকে অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে পাইতে দেখিলে, আমরা এত উৎসাহের সহিত, এত আনন্দের সহিত, তাহা ধর্ম্মের জয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে গল্প করিয়া বেড়াইতাম না। অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলিলে আমাদিগকে মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য এত চিন্তিত হইতে হইত না। যদি মনুষ্যমাত্রই চক্ষের উপর দেখিতে পাইত, অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ভোগ করিতে হয়, যদি নিজ জীবনে ও প্রতিবেশীর জীবনে ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে অধর্ম্ম এরূপ দর্পের সহিত বুক ফুলাইয়া ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে সাহসী হইত না। তাহা হইলে অধার্ম্মিককে দমনে রাখিবার জন্য রাজার সর্ব্বদা উদ্যতদণ্ড হইয়া থাকিবার প্রয়োজন হইত না। শান্তি-রক্ষার জন্য অশান্তির অবতার পুলিশ প্রহরীকে রাজার পক্ষ হইতে বেতন ও প্রজার পক্ষ হইতে উৎকোচ দিয়া নিযুক্ত রাখিবার প্রয়োজন হইত না। ধর্ম্মাধি-করণের প্রাচীরমধ্যে বিচারকর্ত্তাকে ফরিয়াদীর অভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইত। রাজব্যয়ে নির্ম্মিত কারাগারগুলি নূতন Universities Billএর মর্ম্মানুসারে ছাত্রাবাসে পরিণত করা, এবং জেল-দারোগাদিগকে কালেজ-ইন্-স্পেক্টারিতে নিযুক্ত করা সহজ হইত। সমাজ-শাসনের প্রয়োগের অবকাশ না পাইয়া সমাজপতিগণ কর্ম্মাভাবে তাস পাশাকে দুর্ম্মূল্য করিয়া তুলিতেন। নীতি-

কথার পুস্তকগুলি ক্রেতার অভাবে দোকানের মধ্যে কীটদষ্ট হইতে থাকিত, পুরোহিতেরা যজমানের অভাবে তাঁত বুনিতে আরম্ভ করিতেন; ধর্ম্মপ্রচারকেরা শ্রোতার অভাবে থিয়েটারের দল বাঁধিতেন, সন্ন্যাসীরা শীকারের অভাবে রোমন্থন করিতে আরম্ভ করিতেন; তাঁহাদের গেরুয়া বসন জাদুঘরের গ্লাস কেসের মধ্যে শোভা পাইত।

কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে এ সকল কিছুই ঘটে নাই। রাজশাসন, সমাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন অধর্ম্মকে দমনে রাখিবার জন্য নিয়ত ব্যাতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। পীনালকোডে পুরাতন ধারার সংশোধনের জন্য ও নূতন ধারা বসাইবার জন্য রাজমন্ত্রিগণ মন্ত্রণা আঁটিতেছেন; কারাগারের পরিধি সম্প্রসারিত করিবার জন্য এঞ্জিনীয়ারগণ নক্‌সা টানিতেছেন; এণ্ট্রান্স কোর্সের মধ্যে কয় পাতা ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ও নীতিশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, তজ্জন্য সেনেট সভায় বিতণ্ডা চলিতেছে; গুরুমহাশয়েরা ছাত্রের পৃষ্ঠে বেত্রপ্রয়োগে ধর্ম্মের জয়ের নমুনা দেখাইয়া পাঠশালার পয়সা সংগ্রহ করিতেছেন। কাজেই বলা চলে না, ধর্ম্মের জয় জগৎ সংসারে নিত্য ঘটনা। অধর্ম্মের শাস্তি হাতে হাতে পাইলে এ সকল কিছুই থাকিত না; রাজশাসন ও সমাজশাসন ও ধর্ম্মের শাসনের কিছুই প্রয়োজন হইত না।

তথাপি আমরা প্রতি নিশ্বাসেই বলিয়া থাকি, ও বলিতে চাহি,—যথা ধর্ম্ম তথা জয়। জগৎপ্রণালীর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় বিধানই যেন এইরূপ। ঐ বিধান মানবকল্পিত বিধান নহে। জগদ্‌যন্ত্রের নিয়ামক যদি কেহ থাকেন, তিনি স্বয়ং ঐ বিধান বিহিত করিয়াছেন। উহা রাজার, সমাজপতির ও ধর্ম্মপ্রচারকের কোন অপেক্ষা রাখে না। যে অধার্ম্মিক, সে রাজার চোখে ধূলা দিয়া রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে; সে সমাজপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া তাহাকে প্রতারিত করিতে পারে, সে ধর্ম্মপ্রচারকের সম্মুখে ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া সার্টিফিকেট পাইতে পারে; কিন্তু তাহার পশ্চাতে, তাহার দৃষ্টির অন্তরালে, তাহার নিকট সম্পূর্ণ অদৃশ্য ভাবে ধর্ম্মের ফাঁদ পাতা রহিয়াছে; তাহা এড়াইবার কোন উপায় নাই। সেই ফাঁদে তাহাকে পা দিতেই হইবে। আজি দিতে না হউক, কালি দিতে হইবে; কালি দিতে না হউক, পরশু দিতে হইবে। সেই ফাঁদ সে কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। সেখানে এক দিন ধরা পড়িতেই হইবে। সেই দর্শনের অগোচর নিয়ন্তার ও শাস্তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিবার কোন উপায় নাই, তাঁহাকে ফাঁকি দিবার কোন উপায় নাই, তাঁহা হইতে গোপনে

রহিবার কোন উপায় নাই। মানুষকে ফাঁকি দেওয়া চলে, রাজাকে ফাঁকি দেওয়া চলে, সমাজকে ফাঁকি দেওয়া চলে, মনুষ্যজাতিকে ফাঁকি দেওয়া চলে; কিন্তু এই জগদ্বিধানকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। এই জগদ্বিধানের নির্ম্মম হস্ত সকল সময়ে ক্ষিপ্রতা না দেখাইতে পারে, কিন্তু উহার সন্ধান অব্যর্থ। উহা অজ্ঞের নিকট অন্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা নিবিড় অন্ধকারেও দেখিতে পায়। উহা কখন্ কোথা হইতে কিরূপে অজ্ঞাতসারে অজ্ঞাত প্রণালীতে কাজ করে, তাহা নির্ব্বোধ মানবের বুদ্ধির অতীত, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে উহা কাজ করিতে ভুলে না। উহা অভ্রান্ত, উহা সদা জাগ্রত, উহা সর্ব্বদা চেতন।

যখন আমরা যথা ধর্ম্ম তথা জয়—এই নীতিবাক্যের উল্লেখ করি, তখন আমরা সেই অদৃশ্য দুর্ব্বোধ্য জগদ্বিধানকেই লক্ষ্য করিয়া উহার উল্লেখ করি। অপরাধ করিলে রাজা দণ্ড দিতে পারেন, বা নাও পারেন; সমাজ শাস্তি দিতে পারে, বা নাও পারে, রাজাকে উৎকোচ দেওয়া সহজ, সমাজকে প্রতারিত করা সহজ, কিন্তু যদি রাজার ভয় না থাকিত, সমাজের শাসনের ভয় যদি একেবারেই না থাকিত, তাহা হইলেও ঐ জাগতিক বিধান হইতে কোন পাপী অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত না। যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতিবাক্যের অর্থই ইহাই। উহার অন্যবিধ অর্থ করিলে, উহাকে খাটো করা হয়, উহার অন্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে উহার গৌরব থাকে না।

উহার অর্থ উহাই বটে, এবং অন্য অর্থ করিলে উহার গৌরব থাকে না, তাহাও ঠিক কথা—কিন্তু বস্তুতই কি জগতের বিধান এইরূপ? বস্তুতই কি পাপী জগদ্বিধানকে ফাঁকি দিয়া পার পাইতে পারে না? অমুক ফাঁকি দিতে পারে নাই, অমুক পারে নাই, দেবদত্ত পারে নাই, যজ্ঞদত্ত পারে নাই, নীরো হইতে উমিচাঁদ পর্য্যন্ত পারে নাই, অথবা অনেকে পারে না, বহুলোকে পারে না, অধিকাংশ লোকে পারে না, বলিলে ঐ নীতিবাক্যের সার্থকতা থাকিবে না, উহার গৌরব রক্ষিত হইবে না। দেখাইতে হইবে, কোন ব্যক্তিই পারে না; এই বর্ত্তমান ক্ষণে ধরাপৃষ্ঠে যে দেড় শত কোটি মনুষ্য বাস করে, তাহাদের মধ্যে এক জনও ফাঁকি দিয়া এড়াইতে পারিবে না; ও তাহাদের যে সহস্র কোটি পূর্ব্ব-পুরুষ অতীতকালের কুক্ষিতে লীন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জনও পারে নাই। যদি এই অতীত অনাগত বর্ত্তমান মনুষ্যসঙ্ঘের মধ্যে একজনও এই জগদ্বিধানকে ফাঁকি দিয়া অতিক্রম করিয়া থাকে, বা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে ধর্ম্মের পরাভব হইল, সেই ক্ষেত্রে অধর্ম্মের বিজয় হইল; তাহা

হইলে ঐ নীতিবাক্য আপনার উচ্চ মাহাত্ম্য হইতে ভ্রষ্ট হইল। কেন না, ঐ জগদ্বিধান এরূপ বিধান, উহার কোন এক স্থানে অন্যথা কল্পনা করিলে উহার সার্থকতা থাকে না; উহা এত সংক্ষিপ্ত সূত্র, উহার বিকল্প কল্পিত হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই? বস্তুতই কি ঐ সূত্রের বিকল্প নাই? বস্তুতই কি অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী? বস্তুতই কি অধর্ম্মের ফল সর্ব্বত্র হাতে হাতে ফলে?

অধর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী হউক না হউক, অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলে না, ইহা অস্বীকার করিয়া ফল নাই। ইহা অস্বীকার করিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। এবং ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া একটা মিথ্যা কথা বলা নিতান্তই সাজে না। অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলিলে জগতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের এত দুর্ভিক্ষ হইত না। হাতে হাতে শাস্তি পাইলে এমন সাহসী কেহই নাই, এমন দুর্দ্ধর্ষ কেহই নাই, যে সেই অঙ্কুশতাড়না অহরহঃ সহ্য করিয়াও উন্মার্গগমনে প্রবৃত্ত হইতে পারিত। অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলে না, ইহা সত্য কথা, ইহার অপলাপ উচিত নহে।

কাজেই ঘুরাইয়া বলিতে হয়, অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে না ফলিতে পারে, কিন্তু অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই অবশ্যম্ভাবী শব্দ ব্যবহার করিয়া উহাকে অনাগত ভবিষ্যতের গহ্বরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আজ হউক, কাল হউক, বা অন্য দিন হউক, এক দিন না এক দিন অধর্ম্মের ফল ফলিবে, উহা হাতে হাতে সর্ব্বত্র ফলে না—কিন্তু এক দিন না এক দিন ফলে।

ক্লাইবের না ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাহার ঠিক্ মনে হইতেছে না, কুকর্ম্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া লর্ড মেকলে এই ধর্ম্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, এবং অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিয়াছেন, অধর্ম্মটা কিছু নহে, উহার ফল হাতে হাতে ফলে না বটে, কিন্তু ফলে—in the long run। লর্ড মেকলের সজাতীয়েরা দয়াধর্ম্মের নিতান্ত বশীভূত হইয়া উচ্চতর নীতির শিক্ষা দ্বারা এই পতিত জাতির উদ্ধারসাধনের জন্য এ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং লর্ড মেকলে স্বয়ং নিতান্ত করুণাপরবশ হইয়া আমাদের পুরাতন অসভ্য শিক্ষা-প্রণালীর বদলে সভ্যতর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; অতএব অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা তদুপদিষ্ট ধর্ম্মনীতি শিরোধার্য্য করিয়া লইতে বাধ্য আছি, এবং ক্লাইবের ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল বিলম্বিত হউক, ইহাই অকপটে আমরা প্রার্থনা করি। কিন্তু এই long run এই লম্বা দৌড়—

কত কালের দৌড়, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন এই ধর্ম্মবিচারে আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। আমরা যে উচ্চতর খৃষ্টীয় সভ্যতা গ্রহণের জন্য কখন সাদরে, কখন কর্ণমর্দ্দন-সহকারে, আহূত হই, সেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে না কি একটা কথা আছে, পিতার কর্ম্মের ফল পুত্রকে ভোগ করিতে হয়; তাহাতেই যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতি-বাক্যের সার্থকতা ঘটে। মানবজাতির অতিবৃদ্ধ পূর্ব্বপিতামহ ও অতিবৃদ্ধা পূর্ব্ব-পিতামহী যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হতভাগ্য সন্তানপরম্পরা এত যুগ ধরিয়া তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিতেছে, এবং এই যুগব্যাপী ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বেও তাহাদিগকে সেই অন্তিম দিনের বিচারের পর নরকের অগ্নিকুণ্ডের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে। এইরূপে in the long run—অতি লম্বা দৌড়ে—মানুষকে তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। পিতার কর্ম্মের ফল পুত্রকে ভোগ করিতে হয়, পৌত্রকে ভোগ করিতে হয়, এবং যে পরপুরুষকে সেই মূল দুষ্কৃতকারীর সপিণ্ডীকরণও করিতে হয় না, তাহাকেও ভোগ করিতে হয়। এইরূপে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতিবাক্যের সার্থকতা; এইরূপেই জাগতিক বিধানের নৈতিক সামঞ্জস্য ঘটে।

কথাটা মিথ্যা নহে। দুষ্কৃতকারী পিতার কর্ম্মের ফল পুত্রে ভোগ না করে, এমন নহে। কেবল পুত্র কেন, পিতার কর্ম্মফল সাতপুরুষ ধরিয়া ও চৌদ্দপুরুষ ধরিয়া অধস্তন পুরুষগণের হাড়ে হাড়ে সংক্রমণ করে, তাহার প্রমাণসংগ্রহের জন্য ডাক্তারি শাস্ত্রের সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক নহে। নবীন বঙ্গীয় ঐতিহাসিক-গণের মুখ চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, বৃদ্ধ নরপতি লক্ষ্মণ সেন কি করিয়া-ছিলেন, বা না করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক্ জানি না। কিন্তু যদি তিনি তদারোপিত দুষ্কর্ম্মটুকু করিয়া থাকেন, আমরা সপ্তকোটি বঙ্গবাসী, যাহারা সেন বংশে জন্মায় নাই, যাহাদের ধমনীতে লক্ষ্মণ সেনের শোণিতের এক কণিকামাত্রও বিদ্যমান নাই, তাহারাও তাঁহার কর্ম্মের ফল অদ্যাপি ভোগ করিতেছি। পিতার কর্ম্ম-ফল পুত্রে ভোগ করে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাহাতে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই ধর্ম্মনীতির সার্থকতা হয় কি না বিচার্য্য। খৃষ্টানেরা প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীবের যতটা স্বাধীনতা, যতটা পরের প্রতি অনপেক্ষিতা স্বীকার করেন, আমরা ততটা স্বীকার করিতে চাহি না। আপনাকে সর্ব্বভূতে নিরীক্ষণ করিতে আমরা ভগবদুপদেশ লাভ করিয়াছি; সুতরাং একের কর্ম্মফলে অন্যের শাস্তিলাভ আমাদের নিকট নিতান্ত দুরূহ সমস্যা না হইতে পারে। কিন্তু খৃষ্টানের ন্যায় জীবের স্বাতন্ত্র্যবাদী কিরূপে এক অতিপ্রাচীন অতিবৃদ্ধ পিতামহের স্কন্ধের উপর—যাঁহার পক্ষসমর্থন

করিবার জন্য, যাঁহার অপরাধক্ষালনের জন্য, কোন আধুনিক উকীল ব্রীফ-গ্রহণে সম্মত হইবেন না, যাঁহার জন্মকালনিরূপণে ও মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে গবেষণায় কোন ঐতিহাসিক সাহসী হইবেন না, যাঁহার অস্থিকয়খানি কোন টার্শিয়ারি প্রস্তর হইতে আবিষ্কার করিয়া মিউজিয়মে পাঠাইতে সমর্থ হইত কোন ভূতাত্ত্বিক আশা করেন না—সেই অতি পুরাতন পিতামহের স্কন্ধে এই বিশাল মানবসমষ্টির আধিব্যাধি শোকতাপ জরামরণের দুর্ভর দায়িত্ব কিরূপে অর্পণ করেন, তাহা একটা মহাসমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসার ভার আমাদের উচ্চতর ধর্ম্মনীতির শিক্ষকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া আপাততঃ আমরা স্বীকার করিয়া লইব, একের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যথা ধর্ম্ম তথা জয়—এই ধর্ম্মনীতির ঠিক্ সার্থকতা হয় না—তাহাতে ঐ জগদ্বিধানের নৈতিক সামঞ্জস্য ঠিক্ ঘটে না। যে ব্যক্তি অধর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে ; অন্যে তাহার ভাগ পাইল কি না ; ভাগ পাইবে কি না, তাহা দেখার দরকার নাই ; ইহাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায়। অপরে ফল-ভোগ করুক আর নাই করুক, আমি অধর্ম্ম করিয়া নিষ্কৃতি পাইব না, উহাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায়। আমাকে একাকী আমার কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে, আমি একাকী সমস্ত দণ্ড বহন করিব ; রত্নাকরের আত্মীয়েরা তাহার পাপের ভাগ গ্রহণ করিতে চাহে নাই, আমার আত্মীয় লোকেও সেইরূপ আমার পাপের ফলের ভাগ লইতে চাহিবে না ;—এইরূপ বিধানে পাপীর মনে যতটা ভয়সঞ্চার হইতে পারে, অন্যকেও আমি আমার ফাঁদে জড়াইতে পারিব—কুম্ভীপাকের অগ্নিকুণ্ডেও আমি সহচর পাইব, এই আশ্বাসে নরকাগ্নি তাহার নিকট ততটা আতঙ্কজনক না হইতে পারে। বস্তুতই মানুষের মনের এমনি গতি যে, একাকী কোন নূতন পথে চলিতে তাহার সাহস হয় না, একাকী তাহার স্বর্গে যাইতেও ভয় হয় ; আর দল বাঁধিয়া যাইতে পারিবে এই আশা থাকিলে শয়তানের পুরীতে প্রবেশ করিতেও সে ভয় পায় না। একের কর্ম্ম অন্যকে স্পর্শ করে, ইহা সত্য কথা। একের কর্ম্ম অন্যের স্পর্শ করা উচিত কি না, সে উৎকট তত্ত্বের মীমাংসায় এ স্থলে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, আমরা যখন যথা ধর্ম্ম তথা জয়—এই প্রবচন উচ্চারণ করি, তখন অপরের দিকে চাহি না ; যে ধার্ম্মিক তাহারই জয়, অন্যের নহে ; যে অধার্ম্মিক তাহারই পরাজয়, অন্যের নহে ;—এই সহজ স্পষ্ট কথাই আমাদের অভিপ্রেত হয়।

কাজেই পরের উপর নিজের কর্ম্মফল চাপাইয়া in the long run ধর্ম্মের

জয় হয় বলিলে চলিবে না। আপন কর্ম্মের ফল আপনাকেই ভোগ করিতে হয়, ইহার প্রতিপাদনের দরকার। অথচ মোটের উপর যখন দেখা যায়, অধর্ম্ম জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ধর্ম্মকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া জীবনের নৌকায় সুখের পবনে পাল তুলিয়া ভাসিয়া চলিতেছে, তখন বলা যায়, নৌকা এক দিন না এক দিন ভরাডুবি হইবে, আজি না হউক কালি না হউক, এক দিন হইবেই। কিন্তু যখন আবার দেখা যায়, তরীখানি অবহেলে ভবসমুদ্র পার হইয়া চলিয়া গেল, তখন বলা যায়, ভবসমুদ্র একটা ক্ষুদ্র উপসাগর বৈ ত নহে, বৈতরণীর প্রণালীর অপর পারে যে প্রকাণ্ড মহাসাগর বর্ত্তমান আছে, সেইখানে গেলেই নৌকাখানি উল্টাইয়া যাইবে, তাহার আর সংশয়মাত্র নাই।

পরজন্মের অস্তিত্বে আপনারা বিশ্বাস করেন কি না আমি জানি না, অনেকে হয় ত করেন, অনেকে হয় ত উহা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেন—সেই অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে গিয়া এই সমুখস্থ বিপুল শ্রোতৃসঙ্ঘের সহিত মল্ল-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে এই ক্ষীণদেহ প্রবন্ধপাঠকের ক্ষমতা নাই। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বৈতরণীর ও পার হইতে কেহ কখনও ফিরিয়া আসিয়া যখন আমাদিগকে দেখা দেন নাই—অন্ততঃ আমাদের দুই এক জন থিয়সফিষ্ট বন্ধু ব্যতীত অন্যকে সেরূপ অনুগ্রহ করেন নাই,—তখন অন্য কোন উপায়ে আমরা পরজন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি। ইহ জন্মে যদি সর্ব্বত্র পাপের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় দেখা যাইত, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও তাহার ফল-ভোগ যদি সর্ব্বত্রই ইহজন্মে হাতে হাতে ঘটিতে দেখা যাইত, তাহা হইলে পর-জন্মে যাঁহাদের এখন ধ্রুব বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাসের ভিত্তি হয় ত শিথিল হইত। যিনি পুণ্যবান, তিনি তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার সর্ব্বত্র পান না, ও যে পাপী, তাহার প্রাপ্য তিরস্কার সর্ব্বত্র পায় না, কাজেই আমরা আশা করিয়া বসিয়া আছি, অন্যত্র এই পুরস্কার ও তিরস্কার বিতরণটা ঘটিবেই ঘটিবে। নতুবা যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই বাক্যের সার্থকতা থাকে না; নতুবা অধর্ম্মেরই জয় হয়; কেন না ইহজন্মে অধর্ম্মের জয় প্রত্যক্ষ চোখের উপর ঘটিতে দেখা যাইতেছে, ইহা অপলাপের উপায় নাই। অধর্ম্ম জিতিয়া যাইবে, ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে, কোথাও তাহার অবশ্যপ্রাপ্য দণ্ড লাভ করিবে না, ইহা মনে করিতে গেলে আমাদের জীবনের গ্রন্থি একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে। কেন না, ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবনের ভিত্তি, অন্ততঃ মনুষ্যের সামাজিক জীবনের ভিত্তি; সেই ভিত্তি যদি এরূপ আলগা মাটিতে নির্ম্মিত দেখা যায়, তাহা হইলে

জীবনের উপর ভর দিয়া দাঁড়ান চলে না ; জীবনের পথে সাহস করিয়া এক পা অগ্রসর হওয়া যায় না ; কোথা হইতে কে আসিয়া একটা ধাক্কা দিয়া সৌধখানি ভাঙ্গিয়া দিবে ও আমরা তাহাতে দলিত পিষ্ট হইয়া যাইব, সেই ভয়েই আমাদিগকে সর্ব্বদা ত্রস্ত হইয়া চলিতে হয়। কাজেই আমাদের স্বার্থের জন্য, আমাদের সর্ব্বস্বের জন্য, আমাদের জীবনের অনুরোধে আমরা স্বীকার করি, জীবনের ভিত্তি তেমন শিথিল নহে, ধর্ম্মের দেহ জমাট মশলাতে গঠিত ; উহা কোনরূপে ভাঙ্গিবার উপায় নাই, সেই জন্য আমরা মানিয়া লই যতো ধর্ম্মস্ততো জয় এই বাক্যের কোন বিকার সম্ভবপর নহে। আজি হউক, কালি হউক, ইহজন্মে না হউক, পরজন্মে হউক, কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী, অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমরা ইহা স্বীকার করি। স্বীকার করি, না বলিয়া, আশা করি, বলিলে বোধ হয় ঠিক্ হয়, কেন না ঐরূপ আশার উপর নির্ভর করিয়া আমরা জীবনের নৌকায় দাঁড় ফেলিয়া ভবসমুদ্রের ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া চলিতেছি। ঐরূপ আশা না থাকিলে আমরা কিরূপে অধর্ম্মকে তাহার আস্ফালন হইতে নিরস্ত করিতাম। যদি কোটি মনুষ্যের মধ্যে এক জনও ধর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি পাইবে এরূপ সম্ভব হইত, এ জন্মে বা পরজন্মে কোথাও তাহার শাস্তিবিধান করিবে না, এরূপ সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমার প্রতিবেশী যখন মুদ্গর তুলিয়া আমার মাথা ভাঙ্গিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইতাম যে, সে সেই কোটির এক জন হইবে না ; তাহাকে কি বিভীষিকা দেখাইয়া আমি নিরস্ত করিতে পারিতাম। এখন আমি তাহাকে ঐ বিভীষিকা দেখাই—ভ্রাতঃ! অত আস্ফালন করিও না ; তুমি আপাততঃ আমার মাথায় মুদ্গরাঘাত করিতে পার, তোমার হাতে বল আছে, তোমার মুদ্গরে প্রচুর momentum আছে, আমার মাথার খুলিও ভঙ্গপ্রবণ ; কিন্তু একদিন না একদিন কোন অদৃশ্য হস্ত, কোন মহৎ ভয় বজ্র উদ্যত করিয়া তোমার কপালের ঘাতসহত্ব পরীক্ষা করিবে, তোমার মস্তিষ্ক ছড়াইয়া দিবে, কেহ তাহা নিবারণ করিতে শক্ত হইবে না। এইরূপ আশা করিয়া, এই আশ্বাসে, এই সান্ত্বনায়, আমরা জীবনের পথে চলিয়া থাকি ; নতুবা জীবনের পথে চলা অসাধ্য হইত, নতুবা একেই ত জীবনে অশান্তির সীমা নাই, অশান্তির মাত্রা আরও বাড়িলে অভাগা পথিকদিগকে আত্মহত্যা করিয়া জীবনলীলা অকালে সমাপ্ত করিতে হইত।

সকলের পক্ষে না হউক, অনেকের পক্ষেই পরকাল এইরূপ আশার সামগ্রী ও আক্ষেপের বিষয় ও সান্ত্বনার আশ্রয়। ইহকালে আমরা সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয়

দেখি না বলিয়াই পরকালের আশায় বসিয়া থাকি ; এবং আমরা হিন্দুজাতি, আমরা পরকালেও মানুষে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিবে এরূপ কল্পনায় আনিতে পারি না ; আমরা সেই পরজন্মকৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য জন্মজন্মান্তর,—জন্মান্তরপরম্পরা কল্পনা করিয়া থাকি। এই কোটি জন্মের পরম্পরার নাম সংসার—আমরা এই সংসারের চক্রে ভ্রমণ করিতেছি, এ লোক হইতে ও লোক, ও লোক হইতে সে লোক আমরা কর্ম্মপাশবদ্ধ হইয়া কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ; যেখানেই থাকি, কর্ম্ম করিতেই হইবে ; ভাল হউক মন্দ হউক, কর্ম্ম করিতেই হইবে ; নিষ্কর্ম্মা হইয়া দিন কাটাইবার উপায় নাই ; এবং সেই ভাল কাজের বা মন্দ কাজের ফলভোগও করিতে হইবে ; না করিলে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতি-বাক্যের সার্থকতা থাকে না, নতুবা জগদ্‌যন্ত্র মরিচা পড়িয়া বিকল হইয়া কোন দিন বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা থাকে, নতুবা জগৎপ্রণালীর নৈতিক সামঞ্জস্য ঘটে না ; কবে এই কর্ম্মপাশের বন্ধন হইতে শ্রান্তজীব মুক্তিলাভ করিবে, এই উপায়ের আবিষ্কারে আমাদের পিতামহগণের ধীশক্তি বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া নিযুক্ত ছিল—আমন্তের চক্রে একবার বাঁধা পলে, পায় কি নিস্তার? এই উৎকট প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমরা এতকাল ধরিয়া ব্যাকুল রহিয়াছি।

আমরা আজ সেই উৎকট প্রশ্নের মীমাংসারূপ উৎকট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। সে সাহস আমাদের নাই, সে ক্ষমতা আমাদের নাই ; আমাদের উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ ; আমরা যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই কথাটির সার্থকতা কতটুকু, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহাই কেবল বুঝিতে চাহি। তাহাই বুঝিতে চাহি, কেন না অনেক সময়ে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা বুঝি না ; কি অর্থে বলিতেছি, তাহা অনেক সময়ে নিজেই জানি না—অপরকে কি অর্থ বুঝা-ইতে চাহি, সে সম্বন্ধেও কোন দৃঢ় ধারণা আমাদের থাকে না। একটু চাপিয়া ধরিলেই বুঝা যাইবে, এই বর্ত্তমান ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণা কত অস্পষ্ট। বস্তুতঃ ইহজগতে ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র ঘটে না—ঘটে না দেখিয়াই আমরা জন্মান্ত-রের কল্পনা করি বা অস্তিত্ব স্বীকার করি—জন্মান্তরের আশা করি ও অপেক্ষা করি ; অথচ ইহজীবনেই যে ধর্ম্মের জয় ঘটে না, এরূপও পুরা সাহসের সহিত বলিতে পারি না। অধার্ম্মিক ইহলোকটা ফাঁকি দিয়া উত্তীর্ণ হইল, চোখের উপর দেখিতে পাইলাম—পরকালে সে তাহার দণ্ড পাইবে, এইরূপ প্রত্যাশাও থাকিল, অথচ ভিতরে একটা খটকা রহিয়া গেল। যদি কোনরূপে আবিষ্কার করিতে

পারি, না, লোকটা ইহলোকেই নরকযাতনা ভোগ করিয়াছে, আমরা দেখিয়াও দেখি নাই; ইহলোকেই সে কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে; বাহিরে সে আস্ফালন করিয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে পুড়িয়া মরিয়াছে;—এইরূপ যদি আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। নতুবা আমাদের কাব্যে, উপন্যাসে, কথায়, কাহিনীতে, আমাদের ইতিহাসে, আমাদের বক্তৃতায়, ধর্ম্মপ্রচারে, নীতিপ্রচারে, সর্ব্বত্র, অধর্ম্মের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় দেখিবার জন্য আমরা এত ব্যস্ত কেন? আমাদের যাত্রায়, গানে, থিয়েটারে, আমাদের ঘরকন্নায়, কথাবার্ত্তায়, ঝগড়ায়, দলাদলিতে, আমাদের নাটকে, প্রহসনে, বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে সর্ব্বত্রই আমরা অধর্ম্মকে লাঞ্ছিত ও ধর্ম্মকে শেষ পর্য্যন্ত অভ্যুত্থিত দেখিবার জন্য এত আগ্রহান্বিত কেন? কোন কাব্যলেখক একখানা কাব্য লিখিলেই তাহাতে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় চিত্রিত হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য সমালোচককুল এত ব্যগ্র কেন? কোন ক্ষুৎপীড়িত উপন্যাসিক, যাঁহাকে ভারত গবর্মেণ্টও খাঁ বাহাদুর উপাধি দিবার পূর্ব্বে দুইবার দ্বিধা বোধ করেন,—তিনিও আপনার কুকাব্যমধ্যে অধর্ম্মের নিগ্রহ ও ধর্ম্মের জয় চিত্রিত করিতে বাধ্য হন কেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক। এবং ইহার উত্তর দিতে হইলেই আমরা যথা ধর্ম্ম তথা জয়ে কি অর্থে বিশ্বাস করি ও কতটুকু বিশ্বাস করি, ইহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক হয়। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক; এবং যে উদাহরণটি লইব, তাহা বড় ছোট উদাহরণ নহে। কোন অকাব্যের বা কুকাব্যের উদাহরণ না লইয়া, আধুনিক ক্ষুদ্র ভারতের কোন ক্ষুদ্র কাব্যের উদাহরণ না লইয়া, আমাদের মহা-ভারতের মহাকাব্য মহাভারতকেই দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিব। এই মহাভারতের মহাকাব্য হইতে আমাদের বালক বালিকা টেকস্ট্ বুক কমিটীর অনুমোদিত নীতিকথার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত এণ্ট্রান্স কোর্সের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই ধর্ম্মনীতি শিখিয়া আসিতেছে। এখন আমরা দেখিতে পারি, এই মহাভারতে ধর্ম্মের জয় কিরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

মহাভারতের প্রধান ঘটনা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ—উহা ধর্ম্মযুদ্ধ, উহার উদ্দেশ্য হালের ভাষায় ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন। মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির—তিনি ধর্ম্মপুত্র, অথবা ধর্ম্মরাজ। ঐ নায়কের যিনি আবার নেতা, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ; এবং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানে জয়। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ঘটনা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের জয় এই মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য। যে দিন হইতে

পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে অধর্ম্মের অবতার ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদের নিগ্রহ আরম্ভ করেন। পরম সহিষ্ণুতার সহিত পাণ্ডবেরা সেই নিগ্রহ সহ্য করিলেন। বিষদানে ভীমের হত্যাচেষ্টা, জতুগৃহে মাতার সহিত পঞ্চভ্রাতার হত্যাচেষ্টা, কপট দ্যূতক্রীড়া, প্রকাশ্য সভায় পত্নীর দারুণ অপমান—সহিষ্ণুতা ইহার বহুপূর্ব্বেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তৎপরেও বনবাস ও অজ্ঞাতবাস; তাহার পর প্রতিশ্রুতিরক্ষায় অসম্মতি—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" তখন কৃষ্ণপ্রেরিত হইয়া ধর্ম্মরাজ আর ক্ষমা অবলম্বন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না। কুরুক্ষেত্রে আঠার অক্ষৌহিণী সমবেত হইল। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা সবংশে বিনষ্ট হইল। ধর্ম্মরাজ সিংহাসনে বসিলেন। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল। যথা ধর্ম্ম তথা জয় প্রতিপন্ন হইল।

দেখান হইল, ধর্ম্মের জয় হাতে হাতে ঘটে না। ধর্ম্মের পথ কণ্টকে আকীর্ণ। যিনি ধার্ম্মিক, তাঁহাকে জীবনে নানা বিপদ, নানা অপমান, নানা কষ্ট সহিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। অধর্ম্ম জয়ঢক্কা বাজাইয়া কিছু দিনের জন্য—বহুদিনের জন্য ধর্ম্মকে পীড়ন করে। কিন্তু ধর্ম্মের জয় শেষ পর্য্যন্ত অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্য্যন্ত—in the long run—ধর্ম্মের জয় ঘটে—অধর্ম্ম পরাভূত হয়।

বাল্যাবধি শুনিয়া আসিতেছি, মহাভারতের এই শিক্ষা। ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী—তবে in the long run। কিন্তু যিনি মহাভারতের পাঠক, তিনি পদে পদে ধর্ম্মের নিগ্রহ দেখিয়া মর্ম্মাহত হন তাঁহার সমস্ত সমবেদনা ধর্ম্মের পক্ষে ও অধর্ম্মের বিপক্ষে প্রেরিত হয়; এবং যখন তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মসহায়, দ্রোণসহায়, কর্ণসহায় অধর্ম্মকে পরাভূত হইতে দেখেন, তখন বুঝিতে পারেন, অধর্ম্মকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না—জগদ্বিধাতার অদৃশ্য হস্ত আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত অধর্ম্মকে দণ্ডিত করে। তখন তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন কৌরবেরা এতকাল ধরিয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিয়াছে; শেষে যখন তাহারা তাহাদের কর্ম্মফল ভোগ করিল দেখা যায়, তখনই পাঠকের তৃপ্তিলাভ হয়। তাহার পূর্ব্বে হয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানের পরই মহাভারতের মহানাটকের প্রকৃত অবসান। অন্ততঃ বোধ হয় এইখানেই অবসান হওয়া উচিত ছিল। ভারতবর্ষীয় কবি না হইয়া পাশ্চাত্য দেশের কবি হইলে এইখানেই যবনিকাপাত ঘটিত। কেন না যে অন্তিম অঙ্কের অভিনয় দেখিবার জন্য দর্শকের চিত্ত আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরের প্রেরিত গদাঘাতের সহকারে সেই অঙ্কের অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল। তার পর যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া কি করিলেন,

কত বৎসর রাজ্যভোগ করিলেন, কতগুলি অশ্বমেধ করিলেন, কত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, কতগুলি হাতী পুষিলেন, কত টাকা খরচে প্যালেস তৈয়ার করিলেন, কত টাকার ফর্ণিচার কিনিলেন, এ সকল অবান্তর কথা, এ সকল অপ্রাসঙ্গিক কথা; এ সকল না বলিলেও চলিত—মূল মহানাটকের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই—এ সকল কথা শুনিবার জন্য শ্রোতা বসিয়া থাকিতে চাহেন না—সভাভঙ্গে সভাপতিকে ধন্যবাদের মত এ সকল কথা যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ভাল।

বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেই মহাভারতের সমাপ্তি—উহাতেই ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন হইল। এবং যতদিন পরেই হউক, ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিতেই অধর্ম্ম তাহার উচিত প্রাপ্য পাইল, তাহাই এখানে প্রতিপন্ন হইল। মহাভারতের পাঠক যে পর্ব্বের পর পর্ব্ব, পর্ব্বাধ্যায়ের পর পর্ব্বাধ্যায়, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, শ্লোকের পর শ্লোক অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত শ্রান্ত গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া এই দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিতে পাইলেন, ইহাই তাঁহার পরম লাভ। তৎপরে পরকালে কৌরবগণের কোন্ নরকে গতি হইল, দুর্য্যোধন কোথায় গেলেন, দুঃশাসন কোথায় গেলেন, মামার জন্য কুম্ভীপাকের কোন অংশ নির্দ্দিষ্ট হইল, আর পাণ্ডুপুত্রেরা শচীপতির উদ্যানের কোন কুঠরীতে স্থান পাইলেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের আগ্রহ থাকে না। পাঠক শুনিতে চাহেন না বটে, কিন্তু নাছোড়-বান্দা মহাভারত-কার পাঠককে নিতান্ত জবরদস্তি করিয়া তাহার খুঁটিনাটি শুনাইতে ছাড়েন নাই। কোন রাস্তায় পাণ্ডুপুত্রগণ মহাপ্রস্থান করিলেন, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৈলশিখরের মধ্যে কোনখানে—sea level হইতে কত ফুট উচ্চে—কে কোথায় পড়িতে লাগিলেন, সেখানে টেম্পারেচার কত ডিগ্রী, সেখানকার humidity কত, কে কত ঘণ্টা আগে পড়িলেন, কে পরে পড়িলেন, আর কেন আগে পড়িলেন, কেন পরে পড়িলেন, ইহজন্মকৃত পাপের মাত্রা কার কতটুকু ছিল, নিক্তি ধরিয়া রতি মাষা যবে পরিমাণ করিয়া পাঠককে তাহার হিসাব না শুনাইয়া মহাভারত-কার কিছুতেই ছাড়িবেন না। পাঠকের শ্বাস রুদ্ধ হউক, পাঠক পরিত্রাহি চীৎকার করুন, মহাভারত-কার তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না।

নিতান্তই যখন পাঠক পরিত্রাণ পান, তখন তিনি জানেন, মহাভারতের কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সহিত; ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন হইয়াছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে। তার পর যুধিষ্ঠির যে সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, বা নরকদর্শনমাত্র করিয়াই খোলসা পাইয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন

হয় নাই। যিনি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, অথবা আধুনিক ঐতিহাসিক-দিগের খাতিরে বলিতেছি, যাঁহারা মহাভারত সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি অন্যরূপ বর্ণনা করিতেন—যদি কুরুক্ষেত্রের লড়াইয়ে পাণ্ডবগণেরই পরাজয় হইত, ও কৌরবগণ বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়া শকুনিকে অগ্রে করিয়া ফিরিয়া আসিতেন, দুঃশাসন যদি ভীমসেনের রক্তপান করিত, আর অলম্বুষ যদি শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইত, এবং উপসংহারে পাঠকগণকে আশ্বাস দেওয়া হইত, ইহকালে ধর্ম্মের জয় হয় না বটে; কিন্তু পরকালে জয় অবশ্যম্ভাবী,—কেন না শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে পঁহুছিয়াই নকুল সহদেবকে আপনার আস্তাবল রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, ভীমসেনকে হেড দরোয়ানিতে নিযুক্ত করিয়া জয় বিজয়ের উপর স্থান দিয়াছিলেন, ও যুধিষ্ঠিরের সহিত অন্তঃপুরে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাশাখেলায় সময় কাটাইতেন—অপিচ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ মায় মাতুল কৃতান্তের চার্জে প্রেরিত হইয়াছিল,—যদি মহাভারত-কার এইরূপেই ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী জয় বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে আপনারা সন্দেহ করিবেন না যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইত, গণেশের লেখনীচালনা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত, এবং লক্ষশ্লোকী বৈয়াসিকী সংহিতার কথা দূরে থাকুক, বটতলার মহাভারতও কেহ চারি পয়সা মূল্যে খরিদ করিয়া অর্থ নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইতেন না।

কাজেই বলিতে হইবে, মহাভারতে যদি যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতি সমর্থিত হইয়া থাকে, সেখানে জয়ের অর্থ এই লোকেই জয়—পরকালে জয় নহে, পরজন্মে জয় নহে—ইহকালে ইহজন্মেই ধর্ম্মের জয় হয়, অনেক কষ্টের পর, অনেক দুর্গতির পর শেষ পর্যান্ত—in the long run—এই মর্ত্ত্যধামেই ধর্ম্মের জয় ঘটে। তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কৌরব ও পাণ্ডব—অধর্ম্মাচারী কৌরব সমূলে বিনষ্ট হইল—ধর্ম্মাচারী পাণ্ডব ধর্ম্মরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। অতএব অহে মানব, অহে বালক, অহে বৃদ্ধ, অহে বনিতা, তোমরা অধর্ম্মের তাৎকালিক সমৃদ্ধি দেখিয়া মোহগ্রস্ত হইও না। অধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, এই মর্ত্ত্যধামেই অবশ্যম্ভাবী।

বাল্যকাল হইতেই শিখিয়া আসিতেছি, মহাভারত এইরূপেই ধর্ম্মের জয় শিখাইয়াছেন। এবং সকলের বটে কি না জানি না, অধিকাংশেরই এই বিশ্বাস যে, মহাভারতে ধর্ম্মের জয় এইরূপেই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, আমি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। আমার বিবেচনায় মহাভারতে এই নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে মনে করিলে মহাভারতকে

খাট করা হয়, ক্ষুদ্র করা হয়, মহাভারতের অপমান করা হয়, উহাকে উহার অতুল গৌরব হইতে ভ্রষ্ট করা হয়। মহাভারতের মহাকাব্যকে আজিকালিকার ক্ষুদ্র ভারতের কুকাব্য সকলের শ্রেণীতে নামাইয়া আনা হয়। কেন না আমার বিশ্বাস, মহাভারত স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ধর্ম্মপুত্রের জয় হয় নাই। আমরা যুদ্ধে বিজয়কে জয় বলি, শত্রুনিপাতকে জয় বলি, সিংহাসনলাভকে, রাজ্যপ্রাপ্তিকে জয় বলি, কিন্তু তাহা জয় নহে। সেরূপ জয়ে ধর্ম্মের জয় হয় না। পাণ্ডুপুত্রেরাও সেরূপ জয় লাভ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে জয়ে আমরা মহাভারতের ক্ষুদ্র পাঠকেরা উল্লসিত হইতে পারি, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রেরা তাহাতে উল্লসিত হন নাই। পাণ্ডবেরা সেই জয় লাভ করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন মনে করিলে সেই মহাসত্ত্ব পুরুষগণের গৌরবের হানি হইবে। বস্তুতই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরশূন্যা বসুন্ধরার অধিপতি হইয়া আপনাকে জয়যুক্ত বোধ করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে সহস্র আত্মীয় বান্ধবের চিতাগ্নি তাঁহার মনের মধ্যে যে আগুন জ্বালাইয়াছিল, মৃত্যুর ক্রোড়ে শরশয্যোপরি সুখাসীন বীরোত্তমের শান্তির উপদেশ সেই আগুনের জ্বালা উপশম করিতে পারে নাই। পতিহীনা পুত্রহীনা লক্ষ নারীর করুণ রোদন, যাহা নারীপর্ব্বের প্রতি শ্লোকের মধ্য হইতে অশ্রুর উৎস ঢালিয়া দিয়া ভারতসমাজকে আজি পর্য্যন্ত প্লাবিত রাখিয়াছে, সেই অশ্রুস্রোতে ধর্ম্মরাজের হৃদয় মরুভূমির উপরিস্থিত মৃৎস্তরকে ক্ষালিত করিয়া তাহাকে উষরক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল, অশ্বমেধের মহোৎসব তাহাতে হরিৎ তৃণের অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। যদি ইহাতেও আপনাদের মনে সংশয় থাকে, তাহা হইলে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। যখন দর্পের অবতার কুরুকুলপতি দুর্য্যোধন পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বান্ধবহীন, অনুচরহীন হইয়া বিকলাঙ্গ অবস্থায় দ্বৈপায়ন হ্রদের তটভূমির একপ্রান্তে ধূলিলুণ্ঠিত হইতেছিলেন, যখন মাংসাশী শৃগালকুকুর মাংসলোভে হর্ষের সহিত তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল, ও তখনও তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া নিরাশ হইয়া পরাবৃত্ত হইতেছিল, যখন নরমাংসভোজনে পূর্ণোদর গৃধ্রকুল উচ্চবৃক্ষের উচ্চতম শাখায় উপবিষ্ট হইয়া একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনেতার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই দিন মহানিশায়, যখন বাত্যাসংক্ষুব্ধ মহাসাগর প্রশান্ত হইয়াছে, যখন সেই মহাসাগরের পৃষ্ঠের উপর নিবিড় অন্ধকার ঘনায়মান হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, যখন অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর অষ্টাদশদিনব্যাপী উন্মত্ত রণকোলাহল নিস্তব্ধ নীরবতায় শ্রান্তিলাভ করিয়াছে, সেই সময়ে, পাণ্ডবশিবিরে করালা

মহাকালীর ভীমমূর্ত্তি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া মহানিশার অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া দিল, সুপ্তমানবের মরণকোলাহল নিশীথিনীর নীরবতা বিদীর্ণ করিল, আর সেই নিবিড় অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিয়া অশ্বত্থামার মুক্ত কৃপাণ পরিশ্রান্ত সুখসুপ্ত অসহায় পাণ্ডব সৈনিকগণের ও পাণ্ডববান্ধবগণের ও পাণ্ডবপুত্রগণের কণ্ঠ হইতে রক্তস্রোত ঢালিতে লাগিল। সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের ভীষণ বর্ণনা যাঁহারা মহাভারতমধ্যে পাঠ করিয়াছেন, যে হত্যাকাণ্ডে দ্রোণবিজেতা ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পর্য্যন্ত পদদলিত কৃমির স্থায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও মহাসত্ত্ব কৃপাচার্য্য মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃতের স্থায় যে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া মানবচরিত্রের দুর্বোধ্য রহস্যকে আরও দুর্জ্ঞেয় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি বলিতে চাহেন, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে পাণ্ডুপুত্রেরা জয়লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের জয় হইয়াছিল, অধর্ম্মের পরাজয় হইয়াছিল, তাহা হইলে এই দীন প্রবন্ধপাঠক এইখানেই বিদায় লইতে বাধ্য হইবে।

কিন্তু আমার বিদায়গ্রহণের প্রয়োজন নাই। মহাভারতের মহাকবি যিনিই হউন, তিনিই স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে শত্রুবিনাশ করিয়া পাণ্ডুপুত্র জয়লাভ করেন নাই। ধনঞ্জয় যখন কপিধ্বজে আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার লোমহর্ষ উপস্থিত হইল, তাঁহার গাত্র অবসন্ন হইল, তাঁহার মুখ পরিশুষ্ক হইল, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইল। তিনি সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ; মহাবাহো, আমি এ জয় চাহি না, যাহার জন্য পুত্রকে হত্যা করিতে হইবে, ভ্রাতাকে হত্যা করিতে হইবে, শ্যালক শ্বশুরকে হত্যা করিতে হইবে, আচার্য্য ও পিতামহকে হত্যা করিতে হইবে, সে সিংহাসন পাণ্ডুপুত্রের প্রার্থনীয় নহে। বস্তুতই তাহাই। সে সিংহাসন, সে জয়, ইতরের প্রার্থনীয়, ক্ষুদ্রের প্রার্থনীয়, তাহা পাণ্ডুপুত্রের প্রার্থনীয় হইতে পারে না। পাণ্ডুপুত্র বনবাস আশ্রয় করিতে পারেন, পাণ্ডুপুত্র জতুগৃহে দগ্ধ হইতে পারেন, পাণ্ডুপুত্র পরগৃহে বাস করিয়া পরান্নে শরীর পোষণ করিতে পারেন, যিনি ইন্দ্রসখ্য লাভ করিয়াছিলেন, যিনি উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যিনি কিরাতরূপী পুরুষের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাহসী হইয়াছিলেন, তিনি ভ্রাতার অপেক্ষায় চক্ষুর উপরে পত্নীর নগ্নীকরণও সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তিনি এরূপ জয় বাঞ্ছা করেন না। এ জয় তাঁহার জয় নহে। ইহা পরাজয়। ইহাতে ইতরের জয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। ইহাতে ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন হয় না।

বস্তুতই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অভিনয়ের সহিত মহাভারতের মহানাটকের যবনিকাপাত হয় নাই। উহার পরবর্ত্তী অঙ্কগুলি পরিত্যজ্য নহে। অন্য দেশের অন্য কবির রচিত কাব্য হইলে ঐখানে যবনিকাপাত সম্ভবপর হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের মহাকবিরচিত মহাভারতের যবনিকাপাত ঐখানে সম্ভাবিত হয় নাই। সৌপ্তিকপর্ব্ব ও নারীপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব ও আশ্রমবাসিকপর্ব্ব, মৌষলপর্ব্ব ও মহাপ্রাস্থানিকপর্ব্ব এই মহাকাব্যের সমাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক। নতুবা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির ভ্রম জন্মিতে পারিত, ইহলোকে ধর্ম্মের জয়ঘোষণাই বুঝি মহাভারত-কারের অভিপ্রেত। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে দেখাইতে চাহেন, ধর্ম্মের জয় ইহলোকে অবশ্যম্ভাবী নহে। মানবজীবনের সমস্যা অত সহজ নহে।

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা বিয়োগান্ত কাব্যের প্রতি—ইংরাজিতে যাহাকে ট্রাজেডি বলে, তাহার প্রতি—অনুকূল ছিলেন না। কোন আধুনিক কাব্যলেখক বিয়োগান্তকাব্যরচনায় সাহসী হয়েন নাই। কিন্তু মহাভারত এক প্রকাণ্ড ট্রাজেডি। আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির জাতীয় জীবনের ইতিহাসও এক প্রকাণ্ড ট্রাজেডি; তাহাতেই ভারতবর্ষে মহাভারতের উৎপত্তির বুঝি সার্থকতা। অথবা মহাভারতে ঐরূপ প্রাদেশিকত্ব অর্পণ করিলে বুঝি উহাকে সঙ্কীর্ণ করা হয়। মানবের মর্ত্ত্যজীবনই বোধ করি এক মহা ট্রাজেডি। আমাদের ঋষিগণ জীবনকে দুঃখময় বলিয়া জানিয়াছিলেন। মানবজাতির প্রামাণিক ইতিহাসে যে মহাপুরুষের স্থান সকলের উচ্চে, যাঁহাকে পঞ্চাশৎকোটি এসিয়াবাসী অদ্যাপি উপাসনা করিতেছে, যাঁহাকে পঞ্চবিংশতিকোটি ভারতবাসী ভগবদবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, ত্রিংশৎকোটি ইউরোপবাসী অজ্ঞাতসারে যাঁহার পন্থার অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতেছে, তিনিও মানবজীবনের দুঃখাত্মকতা আর্য্য-সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই দেশে ও এই দেশের মহাকাব্যে শক্রসংহারে ও সিংহাসনলাভে ধর্ম্মের জয় দেখিতে গেলে ধর্ম্মের অবমাননা হয়। কোথায় কাহারও সংশয় থাকিতে পারে বলিয়া মহাভারতের মধ্যে যেন মৌষলপর্ব্বটি নিতান্তই জোর করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে ধর্ম্ম, এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে জয়; অথচ আমরা মুষলপর্ব্বে দেখিতে পাই, কৃষ্ণ যাঁহাদের নেতা, সেই দুর্দ্ধর্ষ যদুবংশ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিয়া নির্ম্মূল হইয়া গেল; কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলেন, তাহার প্রতিবিধান তিনি করিতে পারিলেন না, বা করিলেন না; তৎপরে সেই পুরুষসিংহ, কুরুক্ষেত্রের মহাহবে যিনি অস্ত্রধারণে ঘৃণা করিয়াছিলেন, তিনি গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ

করিলেন ; তাঁহার গৃহস্থিত নারীগণকে দস্যুতে ভোগার্থ অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, আর সংসপ্তকবিজেতা মহারথ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া গাণ্ডীব তুলিতে সমর্থ হইলেন না। ইহাকে জয় বলে না, ইহার নাম পরাজয়। কুরুক্ষেত্রের সমরে যদি বা জয় হইয়া থাকে, ভগ্নহৃদয় দীনচিত্ত মহাপ্রস্থানোন্মত পাণ্ডবগণ জীবনসমরে জয় লাভ করিতে পারেন নাই। ইহজীবনে ধর্ম্মের জয় হয় নাই। মহাভারতই প্রতিপন্ন করিয়াছে, যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতিবাক্য ইহজীবনে প্রযোজ্য নহে

বাস্তবিকই জীবনসমস্যার অত সহজে মীমাংসা হয় না। ধর্ম্মের বিচার এত সহজ নহে। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" সেই গুহা এত অন্ধকার, সেখানে কি যে ধর্ম্ম, কি যে অধর্ম্ম, তাহা বিচার দ্বারা বিতর্ক দ্বারা নিরূপণ করা কঠিন ; কিসেই বা জয়, কিসেই বা পরাজয়, তাহা বলা কঠিন। আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকে লৌকিক জয়কে জয় বলে, রাজ্যপ্রাপ্তিকে ও সিংহাসনপ্রাপ্তিকে জয় বলে ও তদ্দ্বারা ধর্ম্মের জয় প্রতিপাদন করিয়া উল্লসিত হয়। কিন্তু যাঁহারা মানবত্বের উচ্চতর প্রকোষ্ঠে অবস্থিত, তাঁহাদিগের নিকট রাজসিংহাসন খেলার সামগ্রী, উহার লাভালাভে জয়পরাজয় নির্ণীত হইবার নহে। কি যে ধর্ম্ম তাহা চেনাই কঠিন ; তাহার লক্ষণনির্ণয়ে কোন তত্ত্বজ্ঞ এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না জানি না।

যাঁহারা ডারুইনের আবিষ্কৃত তত্ত্বে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ঐ তত্ত্ব কিরূপে ধর্ম্মের গুহাস্থিত মূল অনুসন্ধানে পথ দেখায়। আমাদের শাস্ত্রে বলে, যাহাতে লোক ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। লোকশব্দ মনুষ্যসমাজকে বুঝায়। মনুষ্য সমাজবদ্ধ বলিয়াই ধর্ম্মের অস্তিত্ব। ভূমণ্ডলে মানুষ একজনমাত্র থাকিলে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকিত কি না সংশয়ের স্থল। ডারুইনের মতে মানুষের অতিপূর্ব্বপিতামহ এককালে সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মা ছিল। তখন মানুষের, অর্থাৎ বর্ত্তমান মানুষের সেই পশুধর্ম্মা পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম ছিল না, কেন না পশুর ধর্ম্ম নাই। বাঘ নিরীহ মেষশাবককে অকুণ্ঠিতভাবে উদরসাৎ করে ; তাহাতে তাহার অধর্ম্ম হয় না। জম্বুক প্রতারণায় চিরাভ্যস্ত ; তাহাতে তাহার অধর্ম্ম নাই। পশুর মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তি হয় নাই, কাজেই উহারা কোন কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে। পশুকে অধর্ম্মের জন্য দায়ী করিতে গেলে চৌষট্টি নরকেও স্থান কুলাইত না। যে পশু সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র, কেবল নিজের স্বার্থটুকুই বুঝে, তাহার ত ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই ; যে পশু বা যে ইতর জীব দল বাঁধিয়া বা সমাজ বাঁধিয়া বাস করে,

তাহাদেরও ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই। পিপীলিকা ও মৌমাছি সমাজমধ্যে বাস করে। তাহাদের সমাজের শৃঙ্খলা, শ্রেণীবিভাগ, কর্ম্মবিভাগ দেখিলে চকিত হইতে হয়। তাহাদের প্রত্যেকের নিরূপিত কাজ আছে। কর্ত্তব্যসাধনে ক্রটি হইলে কোন ব্যক্তি সমাজপতির নিকট দণ্ড লাভ করে কি না জানি না—কদা অসম্ভব নয়—তবে প্রকৃতির কাছে দণ্ডিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন নীতিশাস্ত্রকার বা ধর্ম্মশাস্ত্রকার পিপীড়াকে বা মৌমাছিকে কর্ত্তব্য আচরণে প্রত্যবায়ভাগী করিতে সাহসী হইবেন না। পিপীড়াকে নানা দণ্ড ভোগ করিতে হয়, কেবল যমদণ্ড ভোগ করিতে হয় না। কেন না পিপীড়ার ধর্ম্মবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা স্বীকারে কেহ সাহসী হইবেন না। সে যাহা কিছু করে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির বা ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া করে না, সে নৈসর্গিক সহজসংস্কারবশে, যাহাকে ইংরাজিতে instinct বলে, তাহার বশেই করিয়া থাকে। এই সহজসংস্কারের হাতে সে কলের পুতুল; ঘটিকাযন্ত্রের মত যথানিয়মে চলিতে সে বাধ্য। মনুষ্য যখন সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মা ছিল, তখনও সেও ধর্ম্মের দুয়ারে দায়ী ছিল না। সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিলেও যদি তখন তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্গম না হইয়া থাকে, তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের জন্য সে দায়ী ছিল না। অভিব্যক্তির সোপানপরম্পরায় আরোহণ করিয়া যখন সমাজবদ্ধ মনুষ্য ক্রমশঃ উচ্চতর পদবীতে উঠিতে থাকে, তখন ক্রমশঃ তাহাতে ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশ হয়। কেন হয়, কিরূপে হয়, ডারুইন-শিষ্য তাহা বলিতে চাহেন না। সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ডারুইন-শিষ্যের অভ্যাস নাই, তাহার উত্তর দিতেও তিনি বাধ্য নহেন। তবে তিনি দেখান যে, ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্গমে তাহার লাভ আছে। এবং যাহাতে জীবের লাভ আছে, তাহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে—কেমনে বলিতে পারি না—ক্রমশঃ উৎপন্ন ও অভিব্যক্ত হয়। ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশে সামাজিক মনুষ্যের লাভ আছে কি না, এইটুকু দেখাইতে পারিলেই ডারুইন-শিষ্যের কাজ শেষ হইল। লাভ আছে দেখাইতে পারিলেই, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহার অভিব্যক্তিতে সাহায্য করিয়াছে, ইহা মনে করা যাইতে পারে। মানুষ যখন সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মা ছিল, তখন সে সম্পূর্ণরূপে আপন প্রকৃতির অধীন ছিল। ঐ সকল ষোল আনা পাশবিক প্রকৃতির মধ্যে দুইটা প্রধান—ক্ষুৎপ্রবৃত্তি ও কামপ্রবৃত্তি। প্রথমটা আত্মরক্ষার অনুকূল, দ্বিতীয়টা বংশরক্ষার অনুকূল। অনুকূল বলিয়াই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ঐ পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিও উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। এবং পশুর মধ্যে ঐ প্রকৃতি দুইটা অত্যন্ত তীব্র। তীব্র না হইলে পশুর জীবনরক্ষা ও পশুর বংশরক্ষা ঘটিত না।

বোধোদয়ে পড়িয়াছিলাম, ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু সেই ঈশ্বরই আবার জীবকেই জীবের একমাত্র আহারসামগ্রী করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মাটি খাইয়া ও জল খাইয়া ও বায়ু খাইয়া কোন জীবের বাঁচিবার উপায় তিনি করেন নাই। এক জীবকে মারিয়া ভক্ষণ না করিলে অন্য জীবের বাঁচিবার উপায় থাকে না। এই স্থলে আহারদাতৃত্ব ও রক্ষাকর্ত্তৃত্ব উভয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে ঘটিবে, তাহার মীমাংসার ভার শ্রোতৃবর্গের উপর নিক্ষেপ করিলাম। জীবের আহার জীব, অথচ সেই আহারসামগ্রীও অত্যন্ত পরিমিত। বিধাতা গুটিকতক প্রাণীকে ধরাধামে পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ কর। এরূপ ক্ষেত্রে পশুজীবনে ক্ষুৎপ্রবৃত্তির তীব্রতার কারণ বুঝা যায়। যাহার ক্ষুধার তেজ নাই, এই কাড়াকাড়ি ব্যাপারে খাইতে পাইবে কি? এই কাড়াকাড়ি ব্যাপারের নাম জীবনসংগ্রাম। এই জীবনসংগ্রামে লিপ্ত জীবসকল পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সবলের জয়। প্রকৃতির রাজ্যে সবলের জয়ের মূল এইখানে। কিন্তু মানবসমাজে অধর্ম্মের মূল প্রধানতঃ এইখানে। মুষ্টিমেয় খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া বাঁচিতে হয়, কাজেই মানুষ গোড়ায় অধার্ম্মিক। ডারুইন ইহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। ঠিক্ কোন্‌খানে, এখন বলিতে পারিতেছি না, মহাভারতের এক স্থানে অধর্ম্মের মূল অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে ঠিক্ এই কথাই দেখিয়াছি। জলাশয়ের মধ্যে মৎস্যেরা যেমন পরস্পরকে খাইয়া বাঁচে, সমাজমধ্যে মানুষেরা সেইরূপ পরস্পরকে খাইবার চেষ্টা করে। অধর্ম্মের মূল মানুষের এই সনাতন ক্ষুৎপ্রবৃত্তি। ক্ষুৎপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রবৃত্তিটাও বর্ত্তমান। পাঁচটি সন্তান জন্মিয়া যেখানে সেই মুষ্টিমিত আহারসামগ্রীর নূতন ভাগী হইতে বসিবে, সেখানে বংশবৃদ্ধি আত্মরক্ষার প্রতিকূল। জীব ইচ্ছা করিয়া জানিয়া শুনিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া জীবনসংগ্রামের উৎকটতা বাড়াইবে না। অথচ বংশবৃদ্ধির উপায় না থাকিলে মর্ত্ত্যধামে জীবের ধারা রক্ষা হয় না। কাজেই কামপ্রবৃত্তি সময়ে সময়ে তীব্রতায় ক্ষুৎপ্রবৃত্তিকেও পরাস্ত করে। নিতান্ত অন্ধের মত নিজের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া জীবগণ যৌনসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। নতুবা বংশরক্ষা ঘটে না। সেই হেতু উভয় প্রবৃত্তি পশুতে অতীব তীব্র। মনুষ্যও গোড়ায় পশু; কাজেই মনুষ্যেতেও ঐ দুই প্রবৃত্তি তীব্রমাত্রায় বর্ত্তমান। ঐ দুই পাশবিক প্রবৃত্তির তীব্রতা না থাকিলে মানুষ টিকিত না। অথচ এই দুই প্রবৃত্তি মানুষের সকল অধর্ম্মের মূল। মানুষকে সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতে হয়

নচেৎ মানুষ এত দুর্ব্বল, সে একাকী ইতর পশুর সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারে না। মানুষের দাঁতে পান চিবান চলে, হাড় চিবান চলে না; ইতর পশুর সঙ্গে লড়াই করিতে সে দাঁত কোন কাজে লাগে না। দাঁত নাই, নখ নাই, বলিয়া মানুষের পক্ষে দল বাঁধিয়া থাকিলে সুবিধা হয়। কাজেই মানুষের সামাজিকতা। কিন্তু দল বাঁধিতে হইলে আবার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়, প্রবৃত্তিকে সংযত রাখিতে হয়; পূরা স্বাতন্ত্র্যে দল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এক দিকে গোড়ায় প্রবৃত্তি অতীব তীব্র; অন্য দিকে প্রবৃত্তির দমন আবশ্যক। একটা জৈবধর্ম্ম; একটা সামাজিক ধর্ম্ম। অথচ উভয়ের মধ্যে সনাতন বিরোধ। সকল মানুষ যদি অকস্মাৎ ব্রহ্মচারী ও বাতাহারী হইয়া বসে, তাহা হইলে কাল মনুষ্যজাতি অস্তিত্বহীন হইবে। আবার প্রবৃত্তিকে নিরঙ্কুশ করিয়া পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে। মানবজাতি বন্য পশুর দংষ্ট্রাঘাতে ও নখরপ্রহারে লোপ পাইবে। সামাজিক মনুষ্যকে কাজেই দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে হয়। এইখানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল। প্রবৃত্তির সংযমে ধর্ম্ম, উহা সমাজরক্ষার অনুকূল; উহাই সমাজকে ধরিয়া রাখে; প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশতায় অধর্ম্ম; উহা সমাজের বন্ধন শিথিল করে। কখন কোন্ পথে চলিব, মানুষকে বিচার করিয়া চলিতে হয়। আপন ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা বিচার করিতে হয়। পিপীড়ার মত ও মৌমাছির মত সে প্রকৃতির নিকট হইতে এ বিষয়ে সহজ-সংস্কার লাভ করে নাই। প্রকৃতি ঠাকুরাণী সে বিষয়ে কৃপা করিলে ধর্ম্মবিচার দুরূহ হইত না, ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহানিহিত হইত না। সহজসংস্কার যে পথ দেখাইয়া দিত, মানুষকে সেই পথেই চলিতে হইত। তাহাকে ধর্ম্মের দুয়ারে দায়ী হইতে হইত না। কেন জানি না, প্রকৃতি দেবী মানুষের প্রতি সে কৃপা করেন নাই। অধিকন্তু তাহাতে ধর্ম্মবুদ্ধি উদগত করিয়া তাহাকে অত্যন্ত ফাঁফরে ফেলিয়াছেন। সংসারের মধ্যে জীবনসমরে কোন্ পথে চলিতে হইবে, সে ঠিক্ করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, আপনার দিকে চাহিও না; স্বার্থের দিকে চাহিও না; যাহাতে লোকহিত হয়, সেই দিকেই চল; লোক-হিতেই ধর্ম্ম, ইহার নাম হিতবাদ। লোকহিত আবার কি, বলিলে ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে হয়, যাহাতে greatest good for the greatest number—সমাজের মধ্যে যাহাতে অধিকাংশের অধিক পরিমাণ হিত হয়। কিন্তু সে হিসাবটা বড় শক্ত হিসাব। কোনও শুভঙ্কর তাহার জন্য আর্য্যা বাঁধিয়া দেন নাই। আবার সমাজের সঙ্গে সমাজের বিরোধ

আছে। যাহা আমার সমাজের অনুকূল, তাহা অন্য সমাজের প্রতিকূল। এবারে কেহ বলিয়া উঠিবেন, যাহা মানবজাতির পক্ষে মোটের উপর অনুকূল, তাহাই ধর্ম্ম; আত্মসমাজের প্রতিকূল হইলেও যাহা সমগ্র মনুষ্যসমাজের অনুকূল, তাহাই ধর্ম্ম। ইহা Religion of Humanity. কিন্তু এ আরও কঠিন সমস্যা; এখানে patriotismএ আঘাত লাগে। মানবসমাজের অনুরোধে নিজের সমাজের অনিষ্ট করিতে গেলে নিজের সমাজ বাদী হয়, ফাঁসিকাঠে ঝুলাইতে যায়। ও পক্ষ বলিবেন, ভয় কি, Humanityর অনুরোধে এখন ফাঁসিকাঠে চড়; আপীলে বুঝা যাবে। আবার Humanityর হিত কিরূপে হইবে, বলা কঠিন। দৃষ্টান্ত চোখের উপর। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যজাতির এই Humanityর প্রেম এত অধিক যে, তাঁহারা মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যত অসভ্য জাতিকে, যত দুর্ব্বল জাতিকে, নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছেন। কেন না, তাহাতে Humanityর মোটের উপর লাভ—in the long run লাভ।

কাজেই কি যে ধর্ম্ম, তাহার নিরূপণই দুরূহ; মানুষের কর্ত্তব্য কি, তাহা দ্বিধাস্থলে নিরূপণের জন্য কোন যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ধর্ম্মের তত্ত্ব পূর্ব্বের মতই গুহায় নিহিত। যে মনীষী দার্শনিকের মৃত্যুতে পাশ্চাত্য পৃথিবীতে সম্প্রতি এক উজ্জ্বলদীপের নির্ব্বাণ হইয়াছে, যে দীপের আলোকে কেবল পাশ্চাত্য ভূমি নহে, সমস্ত জ্ঞানিসমাজ আলোক পাইতেছিল, যাঁহার মৃত্যুর জন্য প্রকাশ্য সভাস্থলে এই অবকাশে শোকপ্রকাশ আমি কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি, সেই মনীষী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার relative ethics ও absolute ethics সাপেক্ষ ধর্ম্ম ও নিরপেক্ষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে পৃথকভাবে বিচারের প্রয়োজনীতার তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। সকল অবস্থায় সকল সমাজে মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি সমান জাগ্রত নহে। ফিজিবাসীরা বুড়াবাপকে রাঁধিয়া খাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখায়। মিশরের টলেমীগণ ভগিনীবিবাহে সঙ্কুচিত হইতেন না। আমাদের পক্ষে উহা লোমহর্ষকর। কিন্তু ঐ সকল অনুষ্ঠান সভ্যসমাজে ও তৎকালে বর্ত্তমান ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধ নহে। ঐ সকলের জন্য তত্তৎ অনুষ্ঠানকারীদের জন্য নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে গেলে ন্যায়বিচার হইবে না। যাহা এক সমাজে ধর্ম্ম, তাহা অন্য সমাজে অধর্ম্ম। যাহা এক ক্ষেত্রে ধর্ম্ম, তাহা অন্য ক্ষেত্রে অধর্ম্ম। যাহা এক সময়ে ধর্ম্ম, তাহা অন্য সময়ে অধর্ম্ম। কোন ক্ষেত্রে কোন সময়ে কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, তাহা

কিরূপে নির্দ্ধারণ করিব। এই ধর্ম্মের তত্ত্ব কে আবিষ্কার করিবে? ধর্ম্মের তত্ত্ব অদ্যাপি গুহায় নিহিত রহিয়াছে।

অর্জ্জুন যখন জ্ঞাতিহত্যা দ্বারা রাজ্যলাভকে অধর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া ও তাহা জয়কে পরাজয় মনে করিয়া ধর্ম্মসংমূঢ়চিত্ত হইয়া স্তব্ধ হইয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়। ক্ষমা পরমধর্ম্ম সন্দেহ নাই; কিন্তু সময়ক্রমে ক্ষমাও অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়, ধর্ম্মনিরূপণ অতি কঠিন ব্যাপার—ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। খৃষ্টানদিগের প্রতি উপদেশ আছে, এক গালে চড় মারিলে, অন্য গাল পাতিয়া দিবে। খৃষ্টানেরা সে উক্তি কত দূর পালন করেন জানি না—সম্ভবতঃ সেই জন্যই তাঁহারা চড় না মারিয়া প্লীহা ফাটান, কিন্তু তৎপূর্ব্বে অন্য পক্ষকে হাত তুলিবার অবকাশ দেন না। কিন্তু পাণ্ডবেরা যেমন পরপ্রযুক্ত চপেটাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, সকলে তাহা পারে না। ক্ষমাধর্ম্ম অবলম্বনে যুধিষ্ঠির কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের জীবনে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন আর ক্ষমা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না। সহিষ্ণুতার যে সীমা থাকা উচিত, অন্য লোকের বিবেচনায় বহুপূর্ব্বেই সে সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছিল, এখন শত্রুকে ক্ষমা করিলে উহা ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্ম হইত। উহার নাম হইত ক্লৈব্য। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই ক্লৈব্য পরিহার করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। বস্তুতই মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এমন এক সময় আইসে, তখন ক্ষমা ক্লৈব্য হইতে অভিন্ন হয়। ইহার নাম relative ethics পরের প্রাণরক্ষায় বীরের গৌরব আছে, নিজের প্রাণপরিত্যাগে বীরের গৌরব আছে; কিন্তু অকারণে যখন আততায়ী আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তাহার হস্তে প্রাণটাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় গৌরব নাই। শত্রু যখন আসিয়া চোখের উপর পত্নীর বা দুহিতার অপমান করে, তখন তাহার শাস্তিবিধানে অধর্ম্ম হয় না; তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলেই অধর্ম্ম হয়। পরে আসিয়া যখন অকারণে স্বদেশ আক্রমণ করে, তখন স্বদেশের রক্ষার জন্য না দাঁড়াইলে ক্লৈব্য হয়। পাণ্ডবদিগের জীবনে সেই সময় আসিয়াছিল, যখন আর ক্ষমাপ্রদর্শন ক্লৈব্য হইত। তাঁহারা পত্নীর অবমাননা পর্য্যন্ত সহিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও যদি সেই অপমানকর্ত্তার রক্তপানে দ্বিধাবোধ করিতেন, তাহা হইলে ক্লৈব্য হইত। এখন ধর্ম্মরক্ষার জন্য ভ্রাতার সহিত, পুত্রের সহিত, শ্বশুর শ্যালকের সহিত, আচার্য্যের সহিত ও পিতামহের সহিত যুদ্ধ তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইয়াছিল। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন, রাজ্যপ্রাপ্তি তাহার উদ্দেশ্য ছিল না।

সিংহাসনপ্রাপ্তি তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। ধর্ম্মরক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। যুদ্ধের ফল কাহারও অধীন ছিল না, সম্ভবতঃ কৃষ্ণেরও অধীন ছিল না। অভিমন্যুর হত্যাও কৃষ্ণ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই, বা নিবারণ করেন নাই। পাণ্ডবগণের হস্তে জয়লক্ষ্মীর সমর্পণও তাঁহার হয় ত অসাধ্য ছিল। জয় হউক আর পরাজয়ই হউক, যুদ্ধ এখন কর্ত্তব্য হইয়াছিল। সেই জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া যুদ্ধ করিতে কৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া কেবল ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যুদ্ধে কৌরবকুলের ধ্বংস হইয়াছিল; কিন্তু যদি পাণ্ডবকুলেরই ধ্বংস হইত, তাহাতেও কৃষ্ণের পক্ষে ফল সমান হইত। জয় পরাজয় তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না। বস্তুতই পাণ্ডবকুলের জয় হয় নাই। ভ্রাতার ও পুত্রের রুধিরপ্রদিগ্ধ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠির জয়লাভ করিয়াছিলেন, মনে করিতে পারি না। বস্তুতই তাঁহাদের জয় হয় নাই। তাঁহারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যপালনে তাঁহারা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। মনুষ্যের সুস্থ স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি অনেক সময়ে এই ধর্ম্মের জয় দেখাইয়া দেয়—মানবের অভ্যন্তরে সেই পথ দেখাইবার জন্য এক জন বসিয়া আছেন, তিনিই পথ দেখান; ইউটিলিটির বিচারে ক্ষতিলাভগণনায় ও শুভঙ্করী আর্য্যায় এই ধর্ম্মের হিসাব পাওয়া যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে greatest good of the greatest number ঘটিয়াছিল কি না, কে তাহার হিসাব করিবে? আঠার অক্ষৌহিণী মনুষ্যের পত্নী যেখানে অকালে বিধবা হইয়াছিল, পুত্রকন্যা যেখানে অনাথ হইয়াছিল, সেখানে এই ক্ষতিলাভগণনার হিসাব করিয়া ধর্ম্মনিরূপণ করিতে কে সাহস করিবে? কাহারও যদি সেরূপ হিসাবে সাহস থাকে, তিনিই হিসাব করুন, আমরা সে দুঃসাহস করিব না। গাণ্ডীবধন্বা কপিধ্বজ হইতে নামিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে আপাততঃ বসুন্ধরা রক্তক্লিন্ন হইত না। ইতরের বিবেচনায় হয় ত তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। অর্জ্জুনও ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হইয়া উহাই ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়।" ক্রূরকর্ম্ম অধর্ম্ম, কিন্তু সময়ক্রমে উহা ধর্ম্ম হয়। তিনি অর্জ্জুনকে উপলক্ষমাত্র করিয়া পরবর্ত্তী মানবজাতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্ম্মেই তোমার অধিকার—ফলে তোমার অধিকার নাই। যথা ধর্ম্ম তথা জয়—এ নীতি হয় ত সত্য—কিন্তু সত্য হউক আর নাই হউক, তুমি ধর্ম্মরক্ষায় বাধ্য, জয়ে তোমার

অধিকার নাই। তুমি যাহাকে জয় বিবেচনা কর, তাহা জয় না হইতে পারে; তুমি যাহাকে পরাজয় মনে করিতেছ, দুজ্ঞের্য় জাগতিক বিধানে তাহাই হয়ত জয়। কিন্তু জয়পরাজয়বিচারে তোমার ক্ষমতা নাই; ক্ষতিলাভ গণনা করিয়া তুমি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিও না।

আচার্য্য হক্‌স্‌লী—এক জায়গায় বলিয়াছেন, যে বিধানক্রমে জগদ্‌যন্ত্র চলিতেছে, উহা moralও নহে, immoralও নহে, উহা unmoral. জীবেরা পরস্পরকে হত্যা করিয়া ও ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ও তাহার ফলে জীবনসংগ্রামে অযোগ্য জীবের ধ্বংস ঘটিতেছে; ইহা জাগতিক বিধান—ইহা immoral অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নহে, ইহা unmoral অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবহির্ভূত, ভূমিকম্পের ও ঘূর্ণীবায়ুর উৎপাতে পাপ নাই; সেইরূপ বাঘেরও মেষভক্ষণে পাপ নাই। মানুষ যখন জ্ঞানপূর্ব্বক অপকর্ম্ম করে, তখনই ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আসে। তখনই সেই অপকর্ম্মটা immoral হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ যখন নিতান্ত অসভ্য বন্য দশায় পশুর মত পরস্পর মারামারি করিয়া আত্মরক্ষা করিত, তখনও তাহাদের কাজ unmoral পর্য্যায়েই ছিল; কিন্তু উন্নত অবস্থায় কাজটা অন্যায় হইতেছে বুঝিয়াও স্বার্থরক্ষার জন্য বা প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন সে সেই অপকর্ম্ম করে, তখনই তাহা immoral হয়। উচ্চতম মনুষ্যসমাজেও এখনও সেই unmoral জীবনসংগ্রাম থামে নাই; তবে মনুষ্য ক্রমশঃ যাহা unmoral ছিল, তাহাকে immoral বলিয়া গ্রহণ করিতেছে; ইহারই নাম তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির অভিব্যক্তি।

হক্‌স্‌লী বিশ্লেষণ দ্বারা জগৎপ্রণালীকে এইরূপে দুইটা প্রকোষ্ঠে ভাগ করিয়াছেন। জগতে যে বিধান তাহার নাম দিয়াছেন cosmic process—উহা unmoral, উহার সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক নাই; উন্নত মানবসমাজে যে বিধান, তাহার নাম দিয়াছেন ethical process—উহার সহিতই ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এইরূপ বিশ্লেষণ কার্য্যে মজবুত। বিবেকের অণুবীক্ষণ লাগাইয়া ঐক্যের মধ্যে কোথায় অনৈক্য আছে, তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করিতে দক্ষ। আমাদের প্রাচ্যদেশে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কারেই প্রতিভা নিয়োজিত আছে। পাশ্চাত্যেরা যে ঐক্য দেখেন না, তাহা বলিতে চাহি না; প্রকৃতপক্ষে ঐক্যের মধ্যে অনৈক্য আবিষ্কার ও অনৈক্যমধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার, উভয় লইয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র। তবে বিজ্ঞানশাস্ত্রকে কখনও বা এদিকে কখনও বা ওদিকে ঝোঁক দিতে হয়। অনৈক্যমধ্যে ঐক্যের আবিষ্কারেই প্রাচ্য-

গণের ঝোঁক। মানবসমাজেই হউক আর পশুসমাজেই হউক, আর অচেতন জড় জগতেই হউক, একটা নিয়তি কোন একটা অনির্দ্দেশ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বত্রই কাজ করিতেছে; প্রাচ্যগণ জগদ্বিধানকে সেই চোখে দেখেন। যে নিয়তি সৌরজগতের গ্রহউপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিনরাত্রি হয়, ঋতু পরিবর্ত্তন হয়, জলঝড় হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝাবায়ু বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও মাষ্টোডনের বাসভূমিতে মানুষে রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইয়াছে, সেই নিয়তির সহিত, যে নিয়তি মানুষকে সংকর্ম্মে ও অসংকর্ম্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রসে ঝুলাইয়াছিল, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্ত্তমান আছে। আর্য্যঋষি জড়জগতে জীবজগতে ও মানবসমাজে অনৈক্যের মাঝে সেই ঐক্য দেখিয়াছিলেন। যাহাতে মানবসমাজকে ধরিয়া আছে, তাহাকে ধর্ম্ম নাম দাও; আর যাহাতে সৌরজগৎকে ধরিয়া আছে বা জীবসমাজকে ধরিয়া আছে, তাহাকে ধর্ম্ম নাম না দাও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু উভয়ই একটা বৃহত্তর ব্যাপারের অঙ্গ; সেই বৃহত্তর ব্যাপারের নাম ঋত। সমগ্র জগদ্‌যন্ত্র তাহার অধীন; জগদ্‌যন্ত্রের কোন অঙ্গ, কোন প্রত্যঙ্গ, তাহার বন্ধন ছাড়িয়া চলিতে পারে না।

এই যে ঋত, যাহা জগতের নিয়ামক, যাহার নাম নিয়তি, যাহা তোমার আমার অধীন নহে, তাহা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান—তাহা সত্যের সহিত অভিন্ন—তাহার নামান্তর সত্য। আর্য্যঋষি পুরাকালে দেখিয়াছিলেন, এই যে ঋত, এই যে সত্য, তাহা অভীদ্ধ তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল—কাহার তপস্যা হইতে জন্মিয়াছিল কে বলিবে, কবে জন্মিয়াছিল তাহার উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই,—আর্য্য ঋষি দেখিয়াছিলেন, "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ তপসোঽভীদ্ধাদজায়ত"—তাহার পর রাত্রি হইয়াছে, দিন হইয়াছে, সূর্য্যচন্দ্র হইয়াছে, পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গের সৃষ্টি হইয়াছে, জগতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ঋতের জয় সর্ব্বত্র। তাহার পরাজয় সম্ভবপর নহে;—সেই ঋতেই বিশ্ব অবস্থিত, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হিরণ্যগর্ভ হইতে ধূলি-কণা পর্য্যন্ত সকলই তাহার অধীন। ঋতের জয় সর্ব্বত্র; সেই ঋত বিশ্বকে ধরিয়া আছে, অতএব তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মশব্দে এই ব্যাপকতর অর্থ আরোপ করিলে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, উহার পরাজয় কল্পনায় আসে না। এই অর্থে ধর্ম্মের জয় সত্য; ইহা

অস্বীকারের উপায় নাই। সেই ঋত হইতেই এ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃকই এ সকল চালিত হইতেছে, ও তৎকর্ত্তৃকই এ সকলই আবার সংহৃত হইবে। দিন রাত্রি থাকিবে না, চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে না, স্বর্গপৃথিবী থাকিবে না। কোথায় বা জয় আর কোথায় বা পরাজয়; উভয়ই ইহার কাছে তুল্যমূল্য; ধর্ম্ম ইহার দক্ষিণ হস্ত, অধর্ম্ম ইহার বাম হস্ত। মনুষ্যজাতির সমগ্র ইতিহাস ইহার নিকট এক নিমেষ; পলকের পূর্ব্বে সেই ইতিহাস ছিল না, পলক ফেলিবার পরে আর তাহা থাকিবে না। ঋষি যাহা দেখিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহা কর্ত্তব্যমূঢ় অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়া দেখাইয়াছিলেন—জগন্নিয়ামকের সেই বিশ্বরূপের আদি অন্ত কোথায় জানা যায় না, মধ্য কোথায় তাহা বলা যায় না—দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরাল ব্যাপিয়া তাহা অবস্থিত; তাহার অভ্যন্তরে লোকসকল সমৃদ্ধবেগ হইয়া নাশের জন্য প্রবিষ্ট হইতেছে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রবেশ করিতেছেন, সূতপুত্র-জয়দ্রথ প্রবেশ করিতেছেন; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ প্রবেশ করিতেছেন, পাণ্ডুপুত্রগণ প্রবেশ করিতেছেন, রুদ্রগণ আদিত্যগণ বসুগণ বিশ্বদেবগণ সকলেই তাহাতে লীন হইয়া যাইতেছেন। সেখানে জয়ই বা কাহার? আর পরাজয়ই বা কাহার?

এই বিশ্বরূপ দেখাইয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, জয় হইবে কি পরাজয় হইবে দেখিবার প্রয়োজন নাই, হিসাবের খাতায় অঙ্ক কষিয়া কোন্ কার্য্যের কি ফল হইবে, তাহা দেখাইবার প্রয়োজন নাই; ফলে তোমার অধিকার নাই, কর্ম্মেই তোমার অধিকার; অতএব অপ্রমত্ত হইয়া স্বাভাবিক সুস্থ ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় শত্রুর বিনাশই যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে ধর্ম্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হও। ইহলোকে তোমার জয় হইবে কি না, পরলোকে তোমার কোথায় গতি হইবে, তাহার হিসাব করিতে বসিও না—কামনাশূন্য হইয়া ত্যাগ কর্ম্ম কর। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত আছে; হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ পিহিত রহিয়াছে; ক্ষমাও সকল সময়ে ধর্ম্ম হয় না; প্রাণত্যাগও সকল সময়ে ধর্ম্ম হয় না; আততায়ীর বিনাশে সকল সময়ে অধর্ম্ম হয় না।

এতক্ষণে দেখা গেল, যথা ধর্ম্ম তথা জয়—এই নীতিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এখনও সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই, তাহাকে জোর করিয়া ধর্ম্মপথে রাখিবার জন্য প্রলোভনের প্রয়োজন হয় ত থাকিতে পারে—লোকব্যবহারের জন্য, লোকরক্ষার জন্য পুলিশের প্রয়োজন আছে, ফাঁসিকাঠের প্রয়োজন আছে; নীতিকথায় এণ্ট্রান্সকোর্সেরও প্রয়োজন আছে; ঐ সকল বা তাদৃশ নীতি-বাক্যেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু একটু উচ্চ সোপানে উঠিলে ঐ বাক্যের

সার্থকতা লইয়া বিতর্ক উঠিতে পারে। অন্ততঃ আমরা যে সঙ্কীর্ণ অর্থে উহা গ্রহণ করিয়া থাকি, সেই অর্থে উহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সংশয় উঠিতে পারে। বস্তুতঃ জাগতিক বিধানে কিসে জয়, কিসে পরাজয়, তাহাই বলা যখন অসাধ্য, যাহাকে আমরা পরাজয় মনে করি, তাহাই হয় ত যখন জয়, তখন এইরূপে ধর্ম্মের জয় হইল, তাহা প্রতিপন্ন করিব কিরূপে?

এইখানে অনাত্মিক আসিয়া যদি প্রশ্ন করে, যদি ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও আমার জয়ের আশা থাকিল না, তবে কেন আমি এ রাস্তা ছাড়িয়া ও রাস্তায় যাইব? তাহা হইলে তাহাকে নিরস্ত করা কঠিন হয়। নিরস্ত করিবার লৌকিক উপায় আছে বটে;—তুমিও রাস্তায় চলিলে, তোমার কাণ মলিয়া দিব, তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইব, তোমাকে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইব। ওপক্ষ তাহার উত্তর দিবে—গায়ে জোর আছে—যতক্ষণ তুমি সেই জোর আমার উপর প্রয়োগ করিতে পারিবে, ততক্ষণ আমাকে বাধ্য হইয়া নিরস্ত থাকিতে হইবে বটে, কিন্তু যদি তোমাকে ও তোমার ডালকুত্তাকে ফাঁকি দিতে পারি, তাহা হইলে কি করিবে?

ধর্ম্মপ্রচারক আমাকে আসিয়া বলেন, তুমি লোকহিতে প্রস্তুত হও, নিজের হিতে তাকাইও না—কেন না লোকহিতই ধর্ম্ম; কিন্তু লোকহিতে আমার কি লাভ? লোকে যতক্ষণ জোর করিয়া আমাকে এপথে রাখিবে ততক্ষণ থাকিতে পারি, কিন্তু অন্য সময় কেন থাকিব? কেহ আসিয়া বলিবেন, যাহাতে greatest good of the greatest number ঘটে, সেই পথে চল; কেহ বলিবেন, তুমি humanityর জন্য স্বার্থ উৎসর্গ কর; কিন্তু কি আকর্ষণে আমি তাহা করিব? এইখানে পণ্ডিতেরা একটা শেষ উত্তর দিবেন—ধর্ম্মেই সুখ এবং সুখই লাভ; অতএব ধর্ম্মপথে চল। অধর্ম্মে যে সুখ হয়, সে সুখই নহে, ধর্ম্মের সুখের নিকট তাহা দাঁড়াইতে পারে না—সেই সুখই তোমার লভ্য—সেই লাভের কামনায় তুমি ধর্ম্মপথে চল। কিন্তু এ সেই পুরাণ কথা—সুখের নামান্তর জয়; ধর্ম্মে সুখ, তাহার অর্থ যথা ধর্ম্ম তথা জয়। ইতর লোকে যাহাকে সুখ মনে করে, সে সুখ সুখই নহে; ইতর লোকে যাহাকে জয় মনে করে, সে জয় জয়ই নহে। কিন্তু ধর্ম্মের তত্ত্বও যেমন, সুখের তত্ত্বও তেমনি গুহায় নিহিত; ঐ সুখের আলেয়ার উদ্দেশে চলিতে গেলে পথভ্রান্ত হইবারই সম্ভাবনা। মিছা প্রলোভনে লোককে ভ্রান্ত করা উচিত নহে

বস্তুতই ধর্ম্মশাস্ত্রের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট সমস্যা। ধর্ম্মের sanction কি, ইহা নির্ণয়ের জন্য সর্ব্বদেশের তত্ত্বান্বেষিগণ ব্যাকুল। কেহ বলেন, ইহা বিধাতার আদেশ—অতএব ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লও—তর্ক করিয়া ফল নাই। এই আদেশের মূল খুজিবার জন্য কেহ অলৌকিকের ও অতিপ্রাকৃতের আশ্রয় লন। কেহবা প্রাকৃত জগতের বিধানকেই বিধাতার আদেশের সহিত সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করেন। আমাদের শাস্ত্রে এই মূল অনুসন্ধান করিয়া একটি কথা বলা হইয়াছে, অন্য শাস্ত্রে সে কথা আছে কি না জানি না। পরের হিত করিব কেন, ভূতের হিত করিব কেন? ইহার উত্তর—সেই ভূতই তুমি—সর্ব্বভূত তোমা হইতে অভিন্ন। সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি—নিরীক্ষণ করিবে; তুমি সর্ব্বভূত ব্যাপিয়া আছ ও সর্ব্বভূত তোমাতেই অবস্থিত আছে; কাজেই ভূতের উপকার, লোকহিত তোমারই হিত। পরকে পীড়া দিলে তুমি নিজেকেই পীড়া দিবে, পরকে চিমটি কাটিলে তোমার নিজের গায়ে বিঁধিবে। পরকে আনন্দ দিলে তোমার নিজেরই আনন্দ হইবে। যখন তুমি জানিবে তোমাকে ছাড়িয়া আর পর নাই; যেখানে যা কিছু আছে, সে তুমি স্বয়ং; যাহা কিছু তুমি দেখিতেছ, তাহা দ্রষ্টা তোমা হইতে অভিন্ন; যাহা তোমার বিষয়, তাহা বিষয়ী তোমা হইতে অভিন্ন; তখন আর প্রশ্ন করিবে না, কেন আমি স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থ করিব।

বস্তুতই যে তাহা জানিয়াছে, সে আর সে প্রশ্ন করিবে না। যাহারা এখনও জানে নাই, তাহাদিগকে সে উত্তর দেওয়া মিছা। তাহাদিগের জন্য ফাঁসিকাঠ ও ডালকুত্তার ব্যবস্থা করিয়া, স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের বিভীষিকা ব্যবস্থা করিয়া, জগতের লোকে লোকরক্ষার চেষ্টা করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে।

আমার পরমসহিষ্ণু ক্ষমাধর্ম্মের অবতার শ্রোতৃবর্গের সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিতে আর আমার সাহস হইতেছে না, কি জানি তাঁহারা যদি অকস্মাৎ ক্লৈব্য পরিহার করিয়া আমাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে আমার পক্ষে ধর্ম্ম-বিচার অসম্ভব হইবে। একবার ইচ্ছা ছিল, আমাদের অন্যতর জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণে এই ধর্ম্মতত্ত্ব কিরূপে বুঝান হইয়াছে, তাহার আলোচনা করি। আমাদের অনেকের বিশ্বাস এই মহাকাব্যও ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখাইবার জন্য আদিকবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। অধর্ম্মমূর্ত্তি রাবণের সবংশে নিধন ও রামচন্দ্রের সিংহাসন প্রাপ্তি ধর্ম্মের জয়ের—in the long run ধর্ম্মের জয়ের দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় এই ভ্রমটা যেন ঘুচাইবার জন্যই মহাকবি

তাঁহার কাব্যের শেষভাগে—ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পুনশ্চ ক্ষমা করিবেন—মহাকবি তাঁহার মহাকাব্যের শেষভাগে উত্তরকাণ্ডটা ছাড়িয়া দিয়াছেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিসর্জ্জন করিয়া কাজটা ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন, তাহার সমালোচনায় আমার সাহস নাই। সেই বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর ও কুসুমের অপেক্ষাও কোমল লোকোত্তর চরিত্র চিত্তপটে আঁকিবার চেষ্টা করিলে আমার বেপথু হয়, আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হয়। সেই অলৌকিক মাহাত্ম্যের সম্মুখীন হইলে আমার ক্ষুদ্রতা তাহার জ্যোতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণী যাহাতে সংশয় প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বেরই পরিচয় দেয়—সেই ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তিনি সীতাদেবীকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—তিনি পত্নীত্যাগ করেন নাই; তিনি আপনার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়াছিলেন; তিনি আপনার অর্দ্ধেক অঙ্গ ছিন্ন করিয়া হোমানলে আহুতি দিয়া আপনাকে হীন, আপনাকে ভগ্ন, আপনাকে শীর্ণ, আপনাকে অসম্পূর্ণ করিয়া সেই অসম্পূর্ণ আত্মটুকু ধর্ম্মের পরিচর্য্যার জন্য অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। ইহা লোকোত্তর কর্ম্ম ইহা ধর্ম্ম—ইহার তত্ত্ব গুহাতে নিহিত আছে; সেই গুহার অন্ধকার ভিন্ন করা তোমার আমার মত মূষিকের ও ছুচ্ছুন্দরের কার্য্য নহে। তোমার আমার সৌভাগ্য যে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই লোকোত্তর ধর্ম্মের আদর্শ দেখিতে পাইয়াছি। ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাকে প্রেরিত করিয়া এই ধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল—তিনি সুখের আশা করেন নাই, তিনি জয়ের আশা করেন নাই। সীতা সহিত তিনি যখন বনে ছিলেন, তখন তিনি জয়ী ছিলেন; রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়া তিনি জয়ী হয়েন নাই। জয়ের আশা তিনি করেন নাই; শুনিয়াছি তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন, তিনি আপনার মাহাত্ম্য আপনি জানিতেন না; বৈকুণ্ঠ তাঁহার আপন ধাম হইলেও তিনি বৈকুণ্ঠের দিকে চাহেন নাই। নরকের ভয় তাঁহার ছিল না; তিনি নিজের হাতে তাঁহার হৃদয়কুণ্ডে যে তীব্র আগুন জ্বালিয়াছিলেন, শত রৌরবের নরককুণ্ডে তাহার তীব্র যাতনার তুলনা হয় না। যাবচ্চরন্তি ভূতানি যাবদ্‌গঙ্গা মহীতলে, মানবধর্ম্মের সেই মহাদর্শ মানবজাতির নিকট অব্যাহত রহুক।

মানবজাতির ভাবনা ভাবিয়া এখন আমাদের কাজ নাই—আমরা ভারতবাসী যেন চিরকাল ধরিয়া সেই আদর্শের নিকট প্রণত থাকি। ভারতের মহাকবি

যে করুণগীতি গাহিয়া গিয়াছেন, উহা বিজয়গীতি নহে, উহা পরাজয়-সঙ্গীত ; উহা সুখের গীত নহে, উহা দুঃখের গীত। উহা মানবজীবনের দুঃখগীতি— মহাজ্ঞানী কপিলঋষি মানবজীবনকে যে দুঃখের সহিত অভিন্ন করিয়া গিয়াছেন, ভগবান্ তথাগত বোধিদ্রুমতলে মানবজীবনকে যে দুঃখের সহিত অভিন্ন করিয়া গিয়াছেন—উহা মানবের সেই চিরন্তন দুঃখের গীতি। উহা বিশেষতঃ ভারত-সন্তানের দুঃখগীতি। প্রাণিসমাজ ব্যাপ্ত করিয়া নিয়তির বশে যে ঘোর নির্ম্মম নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম চলিতেছে, যাহাতে বাঘ মেষ ধরিয়া খায়, যাহাতে সবল দুর্ব্বলের রক্তপান করে, যাহাতে প্রবল জাতি দুর্ব্বল জাতিকে নিগ্রহ করে বা নির্ম্মূল করে, যে জীবন সংগ্রামের রণবাদ্য সাগরাম্বরা বসুন্ধরা চঞ্চল করিয়া এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে এশিয়া মহাদেশের পূর্ব্বোপকূলে বাজিয়া উঠিয়াছে, সেই জীবন-সংগ্রামে এখন আমাদের পরাজয়। যাঁহারা আমাদের এই পরাজয়ে নিয়তির মঙ্গলহস্ত দেখিতে পান, যাঁহারা প্রতীচ্যের নিকট প্রাচ্যের এই পরাজয়ে জগদ্বিধাতার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পান, তাঁহারা সুখী। তাঁহাদের সেই সুখে আমার অধিকার নাই। আমি এই পরাজয়মাত্রই দেখিতে পাই ; ভবিতব্য আমার নিকট অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ; ভারতবাসীর জাতীয় জীবন কিরূপে সমাপ্ত হইবে তাহা আমি জানি না। ভারতের আদিকবি যেন দিব্যচক্ষে আমাদের এই ভবিতব্য পরাজয় দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং আমাদের সান্ত্বনার জন্য পরাজয় সঙ্গীত ও দুঃখের সঙ্গীত গাহিয়া গিয়াছেন। আমরা জয়ের আশা করিব না—ভারতবাসীর ভবিতব্য কি—সেই দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া আমাদের কাজ নাই। পিপীলিকা যেমন পদতলে দলিত হয়, কেহ তাহার জন্য অশ্রুফোটা ফেলে না—আমরাও হয় ত নিয়তির চক্রে সেইরূপ দলিত বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইব, কেহ আমাদের জন্য অশ্রুফোটা ফেলিবে না। আমাদের আদিকবির সেই দুঃখগীতি এই পরাজয়ের দিনে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে—জয়পরাজয় লক্ষ্য না করিয়া আমরা ধর্ম্মের পথে চলিব। ধর্ম্ম আমাদের লক্ষ্য হউক। সত্য আমাদের লক্ষ্য হউক। জয় পরাজয় নিয়তির বিধান। নিয়তির জয় হউক।*

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

* ২৬শে পৌষ সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটুটের অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

দিব্যদৃষ্টি।

আজি জ্বলিতেছে চিত্তে শোকানলশিখা,
সমস্ত হৃদয়মনে লেগেছে আগুন,—
আজি বুঝিতেছি—আশা শুধু মরীচিকা,
বিষ বৃশ্চিকের মালা—জ্বালা নিদারুণ!
মুগ্ধমনে বাতাসেতে দৃঢ়গ্রন্থি দিয়া,
চেয়েছিনু সুখস্বপ্ন ধরিয়া রাখিতে;
কামনার চারুবর্ণ তুলিকা ধরিয়া
ভবিষ্যৎ সুখ-চিত্র আহ্লাদে আঁকিতে!
স্বপ্ন শেষ—ভগ্ন তুলি—কালের পরশে
মোহময় মিথ্যা আজি পড়িয়াছে ধরা,
আত্মায় ফুটেছে আলো,—এ চিত্ত-সরসে
সত্যের অমিয় মূর্ত্তি!—নিত্যসুখভরা।
জ্বলুক এ চিত্ত তবে নিত্য নিরন্তর,
তোমারে যত্মপি পাই হে সত্য সুন্দর!

অমৃত।

কে বলিবে মৃত তুমি? অমৃত কেবল,
অনন্ত-অন্তর-লগ্ন—মঙ্গল মধুর,
চিদানন্দ-সুধামগ্ন নবীন নির্ম্মল
সনাতন শুভ ধ্রুব সুন্দর সুদূর।
গেহ হ'তে গেছ বিশ্বে, দাহ হ'তে প্রেমে,
বন্ধন-বেদনা হ'তে মহামুক্তি মাঝে।
তৃষালেশহীন তুমি, ব্যথা গেছে থেমে,
ফুটিয়াছ সর্ব্ব জীবে, জীবনের কাজে;
বিশ্বহাস্যময় তব রূপরশ্মিজালে।
তুমি কাম্য কামনার এক আদি মূল,
মহিমা-মুকুট তুমি ত্রিভুবনভালে;
অরূপ অক্ষয় রূপ অগাধ অকূল।

তোমারি সঙ্গীতে বিশ্ব ধ্বনিত ঝঙ্কৃত,
দীপ্তি তুমি—তৃপ্তি তুমি—জীবন-অমৃত!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সদাশিবের জ্ঞান।

১

সদাশিব অতি শান্তপ্রকৃতি শীর্ণকায় যুবা। সুখদুঃখে প্রায় সমভাব। মুখখানি স্নেহমাখা। চক্ষু দুইটী জলন্ত ও ডাগর। মুখে সচরাচর কথা নাই। নম্রস্বভাব, সকলেরই কথা শুনে। সদাশিবের পিতা মৃত্যুকালে সারা জীবনের পরিশ্রমের ফল স্বরূপ কিছু সম্পত্তি ও সদাশিবকে একত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। সম্পত্তির মধ্যে স্থাবর ও অস্থাবর উভয়ই ছিল। সদাশিবের মাতা, স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই সাধ্বী সতীর ন্যায় ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সদাশিবের অন্য কোন আত্মীয় কুটুম্ব ছিল না। এরূপ ছোট খাট মানুষটি ও ছোট খাট সংসার লইয়া একটা ছোট খাট গল্প অনায়াসে লেখা যাইতে পারে। অথচ মাসিক-পত্রিকার অন্ততঃ আট পৃষ্ঠা পরিপূরণ না করিলে গল্প লেখা হয় না; সুতরাং সংসারটা একটু বাড়াইয়া লইতে হইবে। কিন্তু উপন্যাসলেখকেরও, অন্যান্য সাংসারিক কর্ম্ম আছে এবং সমালোচনার তীব্র ভয় আছে। চতুর্দ্দিক ভাবিয়া আপাততঃ তিনটিমাত্র নূতন ব্যক্তির উল্লেখ করা গেল। তাহারা—১। সদাশিবের বিমাতা; ২। সদাশিবের বন্ধু পরেশ; ৩। সদাশিবের পুরাতন ভৃত্য নন্দী।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্ত্রীলোক, এবং তিনি সদাশিবের নিকটসম্পর্কিতা, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইবে, তিনি বিধবা। তাঁহার বয়স সম্বন্ধে, পাঠকবর্গের অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে যে, তিনি যুবতী হউন। অনেকে তাহা দূষণীয় বিবেচনা করিতে পারেন। বয়োধর্ম্ম রক্ষা করিতে গেলে হয় ত তাঁহাকে কঠিন বৈধব্যব্রতধারিণী একটা শুভ্র শীর্ণ রকমের মূর্ত্তিরূপে দাঁড় করাইতে হইবে। ফলে মাঝামাঝি পথে গিয়া আপাততঃ তাঁহার বয়সের পরিমাণ বিশ বৎসর রাখা যাইতে পারে। দেখিতে অতুলনীয়া সুন্দরীও নহেন এবং মন্দও নহেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সুন্দর যুবা পুরুষ, এবং বয়ঃক্রম প্রায় সপ্তবিংশ। তিনি সুশিক্ষিত ও অবিবাহিত। তৃতীয় ব্যক্তি সেকালের লোক;

প্রভুভক্ত ও বিচক্ষণ। লেখাপড়াও কিছু জানে। তাহার বয়স অনুমান করিয়া লউন।

সদাশিবের বিমাতা সদাশিবের পৈতৃক বাসস্থানে আপাততঃ বাস করিতেছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার একটা দাসী থাকা সম্ভব। তাহাও থাকিল। দাসীর নাম বামা। বিমাতা, অর্থাৎ বামার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নাম অপরা।

বাটীর অবস্থা মন্দ নহে। যাহা টাকাকড়ি আসে, বিমাতা তাহা হাতে করিয়া গ্রহণ করেন। ভৃত্য আদায় করিয়া আনে। বিমাতা সদাশিবকে খরচ করিতে দেন, এবং দাসী হাটবাজারে যায়। সদাশিবের মাতার গহনাগুলি ও বিমাতার গহনাগুলি একই সিন্দুকে থাকে. তাহার একটি চাবি সদাশিবের নিকট, অন্য একটি বিমাতার নিকট।

সদাশিবের কলেজে পড়া শেষ হইয়াছে; এইবার চাকুরী করিবে। বামাদাসীর একটি কন্যা আছে, বামা তাহার বিবাহ দিবে। বিমাতার একবার তীর্থ পর্য্যটনের ইচ্ছা আছে, এবং তাহার খরচপত্রের তালিকা প্রায় বৎসরাবধি হইতে প্রস্তুত হইতেছে। ভৃত্য নন্দী ক্রমশঃই বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। বন্ধু পরেশচন্দ্র সদাশিবকে বিবাহের পরামর্শ দিতেছেন। সদাশিব নতশিরে সে পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন, কিন্তু কর্ম্মে পরিণত করিতে সময় লাগিতেছে। উদ্যানে সুন্দর ফুল ফুটিয়া বসতবাটীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। শীত গিয়াছে. বসন্ত আসিতেছে।

সংক্ষেপে সংসারের অবস্থা উপরে বর্ণিত হইল। এখন দেখা যাউক, কাহাকে অগ্রে চালন করিলে গল্পটি মনোরম হয়।

আমাদিগের ইচ্ছা সদাশিব অগ্রে চলুক। কাহারও কাহারও ইচ্ছা, বিমাতাই অগ্রে অভিনয় আরম্ভ করুন। কিন্তু আমাদিগের ইচ্ছাতে কিছু আসে যায় না। হঠাৎ একদিন সকলে সমবেত হইয়া অভিনয় আরম্ভ করিলেন।

২

সমবেত হইবার কারণ, সদাশিবের বিবাহের প্রস্তাব। পরেশচন্দ্র উত্থাপনকর্ত্তা। সদাশিবের বৈঠকখানায় দাসদাসী, বন্ধুদ্বয়, ও পর্দ্দার আড়ালে বিমাতা, অদূরে বামা দাসীর কন্যা, সকলে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া এই অভিনব বিষয়টির সম্পূর্ণ আলোচনা করিতেছিল। পরেশচন্দ্র সদাশিবের জন্য একটি পরমা সুন্দরী ডাগর বালিকা বহু অনুসন্ধানের পর বাহির করিয়াছেন। বালিকা সম্ভ্রান্তবংশীয়া. তাহার পিতা কমিসেরিয়েটে চাকুরী করিয়া অনেক ধন সঞ্চয়

করিয়াছিলেন। সংসারে তাঁহার কন্যা ছাড়া আর কেহই নাই। কিন্তু এ বিবাহে বিমাতা অপরার মত নাই। অপরার এক দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী ছিল। অপরার ইচ্ছা, সদাশিবের সহিত তাহার বিবাহ হয়। অপরা সেই ভগ্নীটিকে বড় ভালবাসিত। সেও পরমাসুন্দরী, এবং প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। বামাদাসীর মত ও তাহার ঠাকুরাণীর মত একই। নন্দীর মত পরেশের অনুকূল।

ভৃত্য নন্দী বলিয়া উঠিল, "মা ঠাকৃরুণ যদি বিমলার (অপরার ভগ্নীর) জন্য সৎপাত্র চাহেন, তবে পরেশ বাবুকেই মনোনীত করুন না—"

ইহাতে বিমাতার মুখ রক্তবর্ণ হইল, এবং পরেশচন্দ্রও কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িল। বিমাতা পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিলেন, "কেন, পরেশবাবুই কমলাকে বিবাহ করুন না।" ইহাতে পরেশ ও সদাশিব উভয়েই লজ্জিত হইল। বলা বাহুল্য, কমলা পূর্ব্বকথিতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া বালিকা।

সদাশিব বলিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি উভয় বিবাহেই প্রস্তুত আছি।"

কিন্তু উভয় বিবাহ সদাশিবের সঙ্গে ঘটা অসম্ভব। কাজেই একটা বিশেষ কিছু স্থির হইল না। সভাভঙ্গ হইল; সকলে এ দিক ও দিক চলিয়া গেল; কিন্তু পরেশ বসিয়া রহিল। সদাশিব দাঁড়াইয়া শান্তভাবে ভবিষ্যতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিতে লাগিল।

এরূপ স্থলে কোন কোন উপন্যাসলেখক একটু বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ মানবপ্রকৃতির কথা কহিয়া ক্ষান্ত হন। কোনও প্রণালী বিশেষ অবলম্বন না করিয়া আমরা সরলভাবে বলিতে পারি, তখন সন্ধ্যা। সন্ধ্যার সময় বহিঃপ্রকৃতির ছায়া, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে, ধূম্রবর্ণ হয়, এবং তাহার মধ্যে উদাসীনতা ও উদ্যম উভয়েই থাকে। কোথাও সারি সারি আলোকমালা, কোথাও ঘন অন্ধকার; কোন কোন স্থানে সঙ্গীতধ্বনি ও বিকট বেসুরা কলরব, কোন কোন স্থানে মৃত্যুর আর্ত্তনাদ ও নিরাশার নিশ্বাস।

সদাশিবের মনশ্চক্ষু আলোক ও অন্ধকার উভয়ই দেখিতেছিল। সদাশিবের কর্ণে জীবন ও মরণ উভয়ের ধ্বনিই প্রবেশ করিতেছিল। ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা সে জানে না। বর্ত্তমান যে কি, তাহাও সে জানে না। ক্রমে সদাশিব স্থিরবুদ্ধিতে একটা বিষয় স্থির করিয়া দেখিল,—তাহ ঈশ্বরের ইচ্ছা। সদাশিব অতি মধুর হাসি হাসিয়া অন্ধকারে আলোকসঞ্চার করিল। তাহা পরেশ দেখিতে পাইল না, কেহই দেখিতে পাইল না।

কিন্তু পরেশচন্দ্রও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। পরেশ গণিতবিদ্যায় পণ্ডিত। সে অন্ধকারের তরঙ্গ ও আলোকের তরঙ্গের সংখ্যা গণনা করিয়া,—মৃত্যুর মসীবর্ণ হইতে জীবনের রক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া, সুখের ঘননিশ্বাসের সংখ্যা হইতে নিরাশার দীর্ঘনিশ্বাসের সংখ্যা বাদ দিয়া একটা জটিল হিসাবে ধীরভাবে ব্যস্ত ছিল।

সদাশিব একটি নির্জ্জন গৃহে সন্ধ্যাবন্দনা করিতে গেল। পরেশ তমসাবৃত উদ্যানের কোনও নির্জ্জন পথ দিয়া একটি বাতায়নের পার্শ্বে গিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। বাতায়নটি যে গৃহের, সেই গৃহের মধ্যে একটি আলোক জ্বলিতেছিল, এবং দুইটি চক্ষু জ্বলিতেছিল। সেই চক্ষু দুইটি লক্ষ্য করিয়া পরেশ ডাকিল, "অপরা!"

৩

যাঁহারা পুরাতন সমঝদার, এবং অনেক উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, অথবা অনেক অভিনয় কর্ম্ম নিজে করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এই নূতন চাল কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে। তবে সকলেরই জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে যে, এইরূপে নির্জ্জনে অনাথিনী একটি বিধবাকে ডাকিবার অধিকার পরেশের কি আছে? তবে কি অপরার চরিত্রে দুর্ব্বলতা ছিল? এবং যদি তাহাই হয়, তবে তাহার বয়সটা আরও কমাইয়া এবং রূপটা আরও বাড়াইয়া গল্পটি অধিকতর মনোরম করিলে না কেন?

বাতায়নপার্শ্বে সমালোচক, পাঠক ও উপন্যাসলেখক যদি এইরূপে অনর্থক গণ্ডগোল বাধান, তবে গল্প লেখা দায় হইয়া পড়ে। তবে আমরা যত দূর জানি, প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে পরেশচন্দ্র অপরাকে ভালবাসিত। বিবাহের দুই বৎসর পরেই সদাশিবের পিতা অর্থাৎ অপরার স্বামীর মৃত্যু হয়। এখন হিসাব করিয়া দেখুন, এই বিবাহিত জীবনের দুই বৎসর এবং বৈধব্যাবস্থার পাঁচ বৎসর উভয়ের কিরূপে কাটিয়াছিল। অবশ্য আপনি বলিবেন, প্রথমোক্ত দুই বৎসর পরেশের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল; কেন না, উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু আপনি কি করিয়া জানিলেন যে, হয় নাই? অবশ্য আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অপরাও নিশ্চয় পরেশের ভালবাসার প্রতিদান করিয়াছিল, নচেৎ পরেশ গোপনে তাহাকে ডাকিতে সাহসী হইত না; কিন্তু আপাততঃ তাহার ভালবাসার গভীরতা ও লক্ষণ প্রভৃতি কিরূপ, তাহা আমরা জানি না, এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি ভাব, তাহাও জানি না। তাহাই জানিতে চেষ্টা করিতে গিয়া পরেশচন্দ্রকে বাতায়নপার্শ্বে দাঁড় করান গিয়াছে। যদি

আপনারা সকলে গোলযোগ করেন, তবে আমরা পরেশকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া উপন্যাস বন্ধ করিয়া দিব।

কিন্তু বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন,—আচ্ছা, তবে গল্প চলুক। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে, সেই নির্জ্জন গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং পরেশ ধীরপাদবিক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অপরা বলিল, "পরেশ! সাত বৎসর হইল, তোমাকে এত নিকটে পাই নাই, (এইবার পাঠক দেখুন আসল কথাটা কি?) আজ পাইয়াছি। যদি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে, তাহা হইলে আজ হয় ত আমার এ দশা হইত না। তখন আমি বালিকা ছিলাম, তুমি বালক ছিলে। তখন ভালবাসিয়াছি। এখন সেই ভালবাসা কি, তাহা জানিতে পারিয়াছি।"

পরেশ। এখন কি চাও?

অপরা তীব্রদৃষ্টিতে পরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি কিছুই চাহি না। তুমি কেবল এই বিবাহে বাধা দিও না।"

পরেশ। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এই বিবাহে সদাশিব সুখী হইবে না।

অপরা। তোমার হিসাব রাখিয়া দিয়া একটি অনাথিনীর কথা শোন—

এই কথা বলিতে বলিতে অপরার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। না জানি কেন, পরেশের হৃদয়ের কোন প্রান্তে গণিত দুর্গ ভেদ করিয়া বিধবার কাতরবাণী প্রবেশ করিল। না জানি কেন, পরেশ অপরার কোমল কর ধরিয়া চুম্বন করিতে গেল—কিন্তু সে হস্ত পরেশের মুখ পর্য্যন্ত না গিয়া হৃদয়ে থাকিয়া গেল।

বাহিরে ঘন-অন্ধকার কম্পিত হইয়া ভীতি উৎপাদন করিতেছিল, অপরার হৃদয় কম্পিত হইয়া সেই ভীতি আলিঙ্গন করিল।

অপরা-করস্নায়ু পরেশের হৃৎস্পন্দন গ্রহণ করিতেছিল। তাহার অনুভূতি অপরার কর্ণে গিয়া বলিতেছিল, "কিসের ভয়?"

ভয় আরও গাঢ়তর হইয়া আসিল। অপরা চকিতার ন্যায় বলিল, "তুমি যাও।" পরেশ আবার উদ্যানের অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

সেই বাতায়নপথে একটি সাক্ষী দাঁড়াইয়াছিল। সন্ধ্যাবন্দনার পর উদ্যানে আসিয়া সদাশিব এই অভিনয় দেখিল। পরেশ চলিয়া গেলে সেই অন্ধকার পথ

লক্ষ্য করিয়া সদাশিব পুনর্ব্বার একটু হাসিল। অন্ধকারে জ্ঞানের স্তিমিত প্রদীপ আবার ঈষৎ জ্বলিয়া উঠিল।

৪

গল্পের প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া আসিয়াছে। দুইটিমাত্র অভিনয়ে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, অথচ অতঃপর কি হইবে, তাহা আমরা জানি না। চরিত্র ও কর্ম্মসূত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলে মানবজীবনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত কত বড় বলিয়া বোধ হয়! অথচ জীবনটা ছোট, এবং মানুষের কল্পনাটা বড়। জীবন একটা উপন্যাস। তাহার মাধুরীর বিন্যাস করিতে গেলে আরও গোটাকতক আনুষঙ্গিক জীবন চাই। আমাদিগের উপন্যাসে তিনটি লোকের কলেবর এখনও অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান। ১—বামাদাসীর, ২-তস্যা কন্যা কাদম্বিনীর, এবং ৩—পুরাতন ভৃত্য নন্দীর।

ইহাদিগের কলেবরবৃদ্ধি করিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। ইহাদিগের সহিত প্রধান নায়ক নায়িকাগণের প্রভু ও ভৃত্য সম্বন্ধ। সুতরাং ইহাদিগকে একটা নিম্নপথে চালনা করিতে হইবে। অথচ গল্পটি জ্ঞানমার্গের। এখন কাহাকে অগ্রে চালিয়া দিই?

আপাততঃ বামা দাসীকে চালনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ। তাহার প্রেমসাধ মিটিয়া গিয়াছে। কিন্তু চুরীর সাধ মিটে নাই। সুতরাং তাহাকে চুরী করিতে হইবে। কাদম্বিনী বালিকা, সে প্রেম কি জানে না, কিন্তু বিবাহের সাধ আছে। পুরাতন ভৃত্য নন্দী অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, কিন্তু তাহার ত্রিসংসারে কেহ নাই। নন্দীর বয়স আপনারা হয় ত অনুমান করিয়াছেন পঞ্চাশ, কিন্তু সে বেচারার বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র। শরীরে যথেষ্ট বল ও বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি দ্বারা সে বামাদাসীর প্রবৃত্তির গভীরতা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া লইয়াছিল, এবং বল দ্বারা সে নিদ্রা জয় করিয়া লগুড়হস্তে সঞ্চিত পাঁচ শত টাকার অলঙ্কার সারা নিশি রক্ষা করিত। এই অলঙ্কারগুলি সদাশিবের মাতা নন্দীকে পুরস্কারস্বরূপ দিয়াছিলেন। বামা অনেক দিন চেষ্টা করিয়াও তাহা চুরী করিবার সুযোগ পায় নাই। আজ সে কাদম্বিনীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া চুরী করিবার পরামর্শ দিল। সরলা বালিকা তাহাতে কিছুতেই রাজি হইল না। উভয়ের বাকবিতণ্ডা নন্দী স্থিরকর্ণে রন্ধনশালার পশ্চাৎভাগ হইতে শুনিতেছিল। তখন তৃতীয় প্রহর নিশি। গগনে তারকা মলিন। সে রাত্রি পরেশচন্দ্রের হঠাৎ মস্তকে অত্যন্ত বেদনা হওয়াতে সে সদাশিবের বাটীতে শুইয়াছিল নন্দীর

শুশ্রূষায় সদাশিব একাকী অসমর্থ হইয়া নন্দীকে ডাকিয়াছিল। বামা তাহা জানে, এবং চুরীর সুযোগও বুঝিয়া লয়। কিন্তু প্রখরবুদ্ধি নন্দী তাহা পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়া যথাসময়ে রন্ধনশালার নিকটে আসিয়াছিল।

বামা কন্যাকে ঠেলিয়া দিয়া নন্দীর গহনার পুঁটুলি বাক্স হইতে চুরী করিয়া বাটীর বহির্ভাগে গেল। নন্দী পশ্চাতে গিয়া তাহাকে ধরিয়া উত্তমমধ্যম মুষ্টি প্রহার আরম্ভ করিল। বামার চীৎকারে, কাদম্বিনীর সকরুণ আর্ত্তনাদে, এবং নন্দীর হুঙ্কারে ছোট সংসারটির সুষুপ্তাবস্থা জাগ্রতে পরিণত হইল।

কাদম্বিনী নন্দীর পদযুগল ধরিয়া সকাতরে বলিল, "ওগো আর মে'র না। মা আমার—"

বালিকার করুণস্বর ও তাহার সংস্বভাব উভয়ে মিলিয়া নন্দীর অপ্রতিহত মুষ্টিবর্ষণ রুদ্ধ করিয়া দিল। নন্দী দেখিল, বালিকাটি বেশ।

সদাশিব বাহিরে আসিয়া নন্দীকে ভৎর্সনা করিল। দাসীর অবমাননায় বিমাতা যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন।

নন্দী বলিল, "দাদাবাবু, আমার সংসারে কে আছে? মনে করিয়াছিলাম, ঐ গহনাগুলি আপনার বিবাহ হইলে বিক্রয় করিয়া দশ জন দরিদ্র পরিবারকে দিয়া কাশীবাস করিব।"

সদাশিব। তোর আরও টাকা আছে?

নন্দী। আছে।

সদাশিব বিমাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, নন্দীর সঙ্গে কাদীর বিবাহ দাও না?"

তখন প্রভাত হইয়া আসিতেছিল। বামার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। কাদী লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল। অপরা সদাশিবকে নিকটে টানিয়া লইয়া কম্পিতস্বরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা, আশীর্ব্বাদ কর, আর জন্মে যেন তোমার মত একটি পুত্র পাই।"

৪

পরদিবস যাহা হইল, তাহা সংসারে নূতন নহে। অর্থাৎ, অনেক চেষ্টার পর এবং অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শের পর ভূতপূর্ব্ব কমিসেরিয়েট কর্ম্মচারী দীনবন্ধু বাবুর কন্যা কমলার সহিত সদাশিবের বিবাহ ঠিক হইয়া গেল, এবং নন্দীর সহিত কাদম্বিনীর বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। প্রথমোক্ত বিবাহে বিমাতা অপরার আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। কিন্তু স্ত্রীলোকমাত্রেই জানে,—যেখানে বিধাতার

নির্ব্বন্ধ, সেখানেই বিবাহ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এই সুখের ঘটনায় অপরার ভগ্নী বিমলা পর্য্যন্ত যথাসাধ্য শারীরিক ও মানসিক যোগদানে বিবাহক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে বসিল।

দুইটি বিবাহ দুইটি শুভদিনে সম্পাদিত হইল। অনেকের মুখে হাসি ধরিল না, অতএব বাহির হইয়া পড়িল। অনেকে মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা হাসি চাপাইয়া দিল। কমলাকে দেখিয়া পাড়ার স্ত্রীপুরুষ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, স্বয়ং লক্ষ্মী সদাশিবের গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

আয়ব্যয় সম্বন্ধে অনেকে হিসাব চাহিতে পারেন। সদাশিবের বিবাহে সাত হাজার টাকা খরচ হইযাছিল, কিন্তু লাভ তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক। প্রথম লাভ যৌতুকের দুই লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় লাভ স্ত্রীলাভ। স্ত্রী একটা লাভের সামগ্রী, ইহা অর্থনীতিজ্ঞ লোকের মত নহে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এটা মোটের উপর লাভ। স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সংরক্ষণ করিতে যাহা ব্যয় হয়, সেটা কোন না কোন রকমে আবার আসে। ইহাতে অশান্তিও আছে, শান্তিও আছে। দুঃখও আছে, সুখও আছে। অনেকের মতে এই শান্তি ও সুখ, অশান্তি ও দুঃখের ঠিক সমান। ইহা সংসারের নিয়ম। যে শক্তি ব্যয় হয়, তাহার অধিক আসে না। তবে লাভ কিসে? আমাদিগের শাস্ত্র বলেন "জ্ঞান"। যতটুকু ফিরিয়া পাওয়া যায় না, তাহার বদলে জ্ঞান আসে। জ্ঞানরূপ লাভ কেহ চুরী করিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, ইহাতে যমেরও অধিকার নাই। তবে লাভ বই আর কি?

অতিধীরে সদাশিব কমলার কোমল দেহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, পূর্ণিমা নিশীথিনীর কোমলতর করে অনেক দিনের পর প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, নিবিষ্টচিত্তে জগতের সুখদুঃখ বিচার করিতেছিলেন।

কমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, স্বামীর অন্তরের সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া বহির্জগতের শোভা ভুলিয়া গিয়াছিল। কমলার বহুজীবনের সাধ আজ মিটিয়াছিল।

আমরা শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রও বলিয়াছেন, (বচন আপাততঃ মনে নাই।) যে জীবনের একটা সাধ থাকিলেও আবার জন্মিতে হয়। সে সাধ মিটিলে আর কাহাকেও জগতে আসিতে হয় না। বোধ হয় কমলারও তাহাই হইয়াছিল। কমলা স্বামীর কোলে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া যে জগতে বিচরণ করিতেছিল, সেখানে সুখ দুঃখ নাই। সেখানে সুখও সুখ, দুঃখও সুখ। . .

ক্রমে সদাশিব দেখিল যে, সেই অপূর্ব্ব জগতে তাহার কমলা হাসিতেছে। সদাশিব তাহাকে ধরিতে গেল, কিন্তু হাসিটুকুই থাকিয়া গেল। দেহ কোথায় গেল, দেখিতে পাইল না। সেই হাসি পারিজাতের সুবাস পূর্ণিমার কিরণ অপেক্ষাও মধুর। সদাশিব ভাবিল, সুধু এই হাসি লইয়া কি করিব? এই হাসি যাহাকে অনুপ্রাণিত করিবে, যাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিবে, সে দেহ কৈ?

ক্রমে ছায়ার ন্যায় একটা কিছু দেহ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সদাশিব তাহাকে ধরিল। কিন্তু সে দেহে জ্যোতি নাই, তাহার মুখে হাসি নাই, তাহা অ.ত শীতল, শবের মত!

সদাশিব জড়জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। সে ক্রোড়স্থিতা প্রাণপ্রতিমার দেহ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে প্রাণের কোন লক্ষণ নাই!

৬

আপনারা মনে করিতে পারেন যে, এ ব্যাপারটা কি? সোজা কথায় কমলার পূর্ব্বে হৃদ্‌রোগ ছিল। আজ সেটা বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়া কমলার প্রাণটুকু এমন স্থানে লইয়া গিয়াছে, যেখানে মানবের দৃষ্টি সচরাচর পঁহুছায় না। কাজেই যাহারা সেই প্রাণ লইয়া খেলা করিতে চাহে, তাহারা বিলক্ষণ ভয় পায়। ইহাতে হাসির কথা নাই, বরং অনেক কান্নার কথা আছে। ভয় পাইয়া সদাশিব বিমাতাকে ডাকিলেন। বিমাতার সঙ্গে বিমলাও আসিল, এবং উভয়ের পরামর্শে পরেশচন্দ্র আসিল। পরেশচন্দ্রের পরামর্শে ডাক্তার আসিল। ডাক্তার আসিয়া এমন স্থলে প্রায়ই ঘাড় নাড়িয়া থাকে, এবং গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করে, এবং সেই গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে একটা কুলক্ষণ বুঝে।

ডাক্তারের মতে আপাততঃ কমলার জীবন দেহের মধ্যেও নাই, এবং চতুষ্পার্শ্বেও প্রায় দশ হস্ত ব্যবধানের মধ্যে কোথাও নাই, তবে থিয়সফির মতে ও শাস্ত্রের মতে তাহা আরও কিছু দূরে থাকিতে পারে। এমন কোন ঔষধ নাই যে, প্রাণকে সে স্থল হইতে টানিয়া আনিয়া দেহে সংলগ্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু ঔষধ দ্বারা দৈহিক উপাদানের স্পন্দন বাড়াইয়া সে স্থল পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিলে হয় ত প্রাণ আবার দেহের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে। সেই ঔষধ আপাততঃ প্রদত্ত হইল।

ডাক্তারের বিচক্ষণতার প্রমাণস্বরূপ পর দিন প্রভাতে সকলের বোধ হইল যে,

অন্ততঃ প্রাণের খানিকটা দেহে যুক্ত হইয়াছে। কেন না, কমলা একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়াছিল।

যে অনুক্ষণ কমলার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিল, সে বিমলা।

বিমলা বালিকারত্ন। জীবের দুঃখে যাহার সহানুভূতি থাকে সেই রত্ন। অনাহারে, অনিদ্রায়, মলিনমুখে, বিমলা কমলার রোগশয্যার পার্শ্বে একমনে দিনরাত্রি ধরিয়া বসিয়া রহিল।

এক ফুল শুকাইয়া যায়, অন্য ফুল প্রাণ দিয়া তাহার শুষ্ক পাপড়িতে সুবাস-সেচন করে, সে দৃশ্য অতি মধুর।

সদাশিব বলিল, "বিমলা, তুমি কাহার জন্য এত করিতেছ? আমার অদৃষ্টে বিধাতা রত্নলাভের সুখ লিখেন নাই।"

বিমলা বলিল, "আমার সুখের জন্য, আপনার নহে" সদাশিব নীরবে সন্ধ্যাগগনের দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর কমলার পিতামাতা আসিলেন। অনেকে আসিল। সকলেই কাঁদিল।

বোধ হয় নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ সকলের আশীর্ব্বাদ পাইয়া একটিবার জ্বলিয়া উঠিল। কমলা স্বামীর হাত দুখানি ধরিয়া অনেক কষ্টে বলিল, "তুমি আবার বিবাহ করিও, আমি স্বর্গ হইতে তোমাদের সুখ দেখিব। সুখ দেখিয়া সুখ হয়। সুখ কেহ পায় না।"

উহাই কমলার পার্থিব দেহের শেষ বাণী। দীপ নিবিয়া গেল, এবং সেই ঊর্দ্ধজগতের অন্ধকার সকলের নয়ন ছাইয়া গৃহদীপগুলিকেও যেন নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

সদাশিব ধীরস্বরে সকলকে বলিল, "আপনারা একবার চলিয়া যাউন, আমি একবার কমলার নিকট বসিব।"

কমলা মরিয়া গেলে কাহারও লাভ কিংবা ক্ষতি হইল কি না, তাহার উত্তর বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। কিন্তু স্নেহের সামগ্রী নষ্ট হইয়া গেলে একটা অদৃশ্য চক্ষু ফুটিয়া উঠে। তাহার নাম জ্ঞাননেত্র। দুঃখ হইতেই ইহার জন্ম। দুঃখই ইহার জ্যোতি

হঠাৎ সংসারের এরূপ পরিবর্ত্তনে নন্দী ও কাদম্বিনীর, পরেশ ও

অপরার, বামা এবং বিমলার অনেক মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। সংসারে কর্ম্ম করে এক জন, ফল পায় সকলে।

পরেশচন্দ্র যাহা হিসাব করিয়াছিলেন, তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

সদাশিব পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শীর্ণকায় হইয়া পড়িল। সকলে তাহাকে ঔষধ খাইতে বলিল।

পরেশচন্দ্র সকলকে লইয়া একবার তীর্থভ্রমণে গেল।

তীর্থভ্রমণ ও বায়ুপরিবর্ত্তন সভ্যসমাজের ও উপন্যাসলেখকগণের একটা বিশেষ সময়োপযোগী উপাদান। চিত্রকরের চিত্রের গর্জ্জন তৈলের মত। ইহাতে একটু চাকচিক্য হয়। অন্ধকারটাও একটু ফুটিয়া উঠে। আলোক ও একটু দীপ্ত হইয়া থাকে।

এই তীর্থভ্রমণে এক বৎসর কাটিয়া গেল।

পরেশচন্দ্র বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিল। পরেশ সদাশিবকে চিন্তায় শীর্ণ হইতে দিল না। নদ, নদী, পর্ব্বত, ও অরণ্য দেখাইয়া, কত ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ দেখাইয়া, কত দেবমন্দিরে লইয়া গিয়া, পরেশ সদাশিবকে মমতায় ও স্নেহে জড়াইয়া ফেলিল।

মমতায় ও স্নেহে জ্ঞানও বশীভূত হয়। জ্ঞানক্ষুধা কেবল প্রেমে ও ভক্তিতে প্রশমিত হয়। সেই জন্য শাস্ত্র কহিয়া থাকেন যে, পরমজ্ঞানী মহেশ্বরও প্রেমে আত্মহারা হইয়া যান।

ক্ষুদ্র জীব সদাশিব যে বন্ধুর অযাচিত শুশ্রূষায় ও স্নেহে একটু হৃষ্টপুষ্ট হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

সেই দিন নক্ষত্রালোকে দুই বন্ধু যমুনার সেতুর উপর বসিয়া বৃন্দাবনের লীলার কথা কহিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে সদাশিব বলিল, "পরেশ! তোমাকে এত দিনেও চিনিলাম না। তুমি সেই মায়াময় ব্রজেশ্বরের মত।"

পরেশ ঈষৎ হাসিয়া সদাশিবের স্কন্ধে বাহু বেষ্টিত করিল।

সদাশিব। বল না ভাই, তোমার মনে কি আছে ?

পরেশ। আমার মনে আছে কেবল তোমার জীবনের অপূর্ণ সাধ।

সদাশিব। আমার কোন সাধই অপূর্ণ নাই।

পরেশ। সত্য ?

সদাশিব। সত্য। তবে আমাকে একটা কথা প্রাণ খুলিয়া বল।

পরেশ। কি ?

সদাশিব। তুমি তাঁহাকে যথার্থ ভালবাস কি না?

পরেশ বুঝিতে পারিল। বলিল, "বাসি।"

সদাশিব। তবে এতদিন আমাকে বল নাই কেন?

পরেশ। তুমি সুখী হইলে বলিতাম। যে বন্ধুর দুঃখে দুঃখী, তাহাকে বন্ধু দুঃখের কথা বলিয়া পীড়িত করে না।

সদাশিব। তোমার এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। তুমি যদি আমার সুখ চাও, যদি আমার জীবন ধন্য করিতে চাও, এবং নিজে ধন্য হইতে চাহ, তবে আমার বিধবা বিমাতাকে বিবাহ কর।

সেই নক্ষত্রালোকে পরেশের মুখমণ্ডলে অনেক আলোক আঁধার উদিত ও বিলীন হইল। সদাশিব আবার বলিল, "প্রতিজ্ঞা কর।"

পরেশ। তুমি আগে প্রতিজ্ঞা কর যে, আবার বিবাহ করিবে।

সদাশিব। কাহাকে?

পরেশ। বিমলাকে।

উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উঠিয়া গেল। যমুনা সন্ধ্যাজ্যোতির সহিত একাকিনী পড়িয়া থাকিল।

৮

গল্পের প্রায় ষোল আনা হইয়া আসিয়াছে। বাকি এক আনা। ইহার মধ্যে দুইটি সুন্দরীকে চালনা করিতে হইবে। অতএব প্রত্যেকের মূল্য দুই পয়সা মাত্র। এই দুই পয়সায় পাঠকবর্গ আশ্চর্য্য কিছু সংগ্রহ করিবেন, এরূপ আশা করা অন্যায়। তবে আপনাদিগের মনোরঞ্জনার্থ আপাততঃ স্বীকার করিতে বাধ্য যে, অপরা নিরুপমা সুন্দরী, এবং ভাদ্রমাসের ভরা নদীর মত তাহার যৌবন। যৌবন একটা অগ্নির মত, তাহাতে জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি আহুতি দিলে আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

বিমলাও সুন্দরী। উভয় ভগ্নীই আগ্রার একটি প্রশস্ত অট্টালিকার প্রশস্ত ছাতে বসন্তবায়ু সেবন করিতে করিতে প্রভাতসূর্য্যের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল।

তাহাদের মনের অবস্থা কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ঘটনাবলী হইতে মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থা অনুমান করিতে অশক্ত, তাঁহাদিগের বড় বড় উপন্যাস পাঠ করা উচিত। ছোট গল্প কেবল ইঙ্গিত করিয়া থাকে।

এই ইঙ্গিতে বুঝা যাইতে পারে যে, উভয় সুন্দরীই উদাসিনী। অপরা

ভাবিতেছিল, এই সুন্দর প্রভাতে জীবনমরুর মধ্যে একটা ভগ্নহৃদয় এক প্রান্তে পড়িয়া হাহাকার করে কেন? বিমলা ভাবিতেছিল, যাহার জীবনে কোন আশা নাই, তাহার সহিত এই সুন্দর সংসারের সম্বন্ধ কি?

উভয় সমস্যাই সদাশিব ও পরেশচন্দ্র আসিয়া পূরণ করিয়া দিল। পরেশচন্দ্র অপরা দেবীকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া উভয় ভগ্ন হৃদয় যোড়া দিয়া একটি করিয়া ফেলিল। সদাশিব ধীরভাবে বিমলাকে লইয়া নদীতটে বেড়াইতে গেল।

এরূপ ব্যবহার সহসা মনোনীত না হইতে পারে, কিন্তু যাহাদিগের কল্পনায় এইরূপ ব্যবহার সম্ভব ও সুন্দর বলিয়া মধ্যে মধ্যে বোধ হইত, তাহারা বাধা দিল না।

সদাশিব বলিল, "বিমলা! তুমি যে কমলার জন্য প্রাণে ব্যথা পাইয়াছিলে, ইহা তাহারই পুরস্কার। আমি জগতে কেহ নয়। তুমি আমি কমলা সকলেই এক।"

বিমলা সদাশিবের পদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল, "আমি তাহা জানি।"

সদাশিব বলিল, "যে জানে, তাহারই জন্য আমার দেহ। অতএব এই দেহ আপাততঃ তোমাকে দিলাম।"

বিমলা সেই দেহে মস্তকরক্ষা করিয়া স্থিরমনে শ্মশানের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন জানিল, কমলা ও সে একই। সদাশিবও তাহা জানিল।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ। জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাধনায়" রবীন্দ্রনাথ বাবুর একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটির নাম "মৃত্যুর পরে।" বোধ হয় স্বর্গীয় উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা লিখিত হইয়াছে। আমাদের সম্পাদক সু—চন্দ্র ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; এমন কি "সাধনা" হইতে সেই কয়েক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবেন, এইরূপ ইচ্ছাও জানাইয়াছেন। আমি কিন্তু সমগ্র কবিতাটির তেমন সুখ্যাতি করিতে পারিতেছি না। আজ কাল রবীন্দ্রের কবিতার একটা প্রধান দোষ এই যে, উহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান কবিতাটির আধখানা বাদ দিলেও বোধ হয় কোন ক্ষতি হয় না। বিষয়টির গাম্ভীর্য্যের সহিত তুলনা করিলে কবির নির্ব্বাচিত ছন্দের গতি কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় দ্রুত বলিয়া অনুভূত হয়। অপেক্ষাকৃত

ভাল শ্লোকগুলি রাখিয়া, অপরগুলি বাদ দিলে কবিতাটি বেশ সুন্দর হইতে পারিত। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল ধরিয়া কবিতার চর্চ্চা করিতেছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার fitness ও propositionএর জ্ঞান যদি দেখিতে না পাই, তবে উহা বড়ই দুঃখের কথা। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি তাঁহার pegasusকে সংযত করিতে পারিতেছেন না; সে স্বেচ্ছানুসারে প্রচণ্ডবেগে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহার ঠিক নাই।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ। স্বর্গগত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী বঙ্গবাসী পত্রিকায় ক্রমশঃ বাহির হইতেছে। জীবনীটি বেশ শিক্ষাপ্রদ। আমি ভূদেব বাবুকে কখনও দেখি নাই। তাঁহার রচিত কোনও গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি কি না সন্দেহ। দুই একটা প্রবন্ধ বা Extract কোথাও কখনও দেখিয়া থাকিব বোধ হয়। ভূদেব একজন প্রতিভাসম্পন্ন চিন্তাশীল লোক ছিলেন। তাঁহার বিষয় পাঠ করিলে তাঁহাকে ভারতের প্রাচীন জ্ঞানসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণগণের উপযুক্ত বংশধর বলিয়া মনে হয়। আধুনিক যুগের ইংরাজীভাবাপন্ন বাঙ্গালী বলিয়া বিশ্বাসই হয় না। দেখিতে দেখিতে দেশের কয়েকজন প্রতিভান্বিত ব্যক্তি পরস্পরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্কিমের পর ভূদেব, ভূদেবের পর "সারদামঙ্গলের" কবি বিহারীলাল। রাজকৃষ্ণ রায় ত প্রথমেই গিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু, তাঁহার জীবনী যেন সম্প্রতি প্রকাশিত না হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কথা আমরা সবিস্তার শুনিতে পাইলাম না। বাঙ্গালার বর্ত্তমান Romantic যুগের আদি কবি বিহারীলালের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হওয়া উচিত।

২০শে জ্যৈষ্ঠ। Shelley প্রণীত skylark এবং Wordsworth রচিত skylark, দুই জন কবির একই বিষয়ের এই দুইটি কবিতার আলোচনা করিলে ইঁহাদের উভয়ের প্রতিভাগত পার্থক্য বেশ বুঝিতে পারা যায়। Shelley প্রধানতঃ ভাবপ্রবণ; তিনি সাময়িক কোন এক বিশেষ ভাবে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তখন তাঁহার হৃদয়ে অন্য কোনও ভাব বা চিন্তার অবকাশ থাকে না। তিনি আপনার মুহূর্ত্তগত ভাবে বিভোর হইয়া যেন আপনার পার্থিব অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যান; তিনি তখন এই মৃত্তিকার রাজ্য পরিহার করিয়া কোথায় কোন্ অদৃশ্য লোকে বিচরণ করেন, তাহার কিছুই ঠিকানা পাওয়া যায় না। কিন্তু Wordsworth কেবল ভাবপ্রধান নহেন। তাঁহার হৃদয়ে মানুষের সমগ্র বৃত্তিগুলি সমভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও পরস্পরের সহিত সমঞ্জসীভূত।

তিনিও কল্পনাব্যবসায়ী; কিন্তু সে কল্পনার প্রভাব তত প্রখর নহে। কারণ উহা জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধির বলে সংযত। তিনি একটিমাত্র ভাবে কখনও আত্মহারা হইয়া পড়েন না। সকলগুলির প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান। তাই Shelley যখন তাঁহার skylarkএর সহিত একপ্রাণ হইয়া কোথায় কোন্ মেঘলোকে হারাইয়া গিয়াছেন, তখনও Wordsworth "true to the kindred.

২১শে জ্যৈষ্ঠ। Faustএর পাঠ চলিতেছে। দ্বিতীয়াংশের দ্বিতীযাঙ্ক প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথমাংশ যেরূপ আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম, দ্বিতীয়াংশে তাহার একবারে নিতান্ত অভাব। প্রথমাংশের বড় দৃশ্য বাদ দিতে হয় নাই; কিন্তু দ্বিতীয়াংশের দৃশ্যগুলির উপর কেবল চোক্ বুলাইয়া যাইতেছি মাত্র। আমার ত কবির কাব্যের অপেক্ষা অনুবাদকের টীকাটিপ্পনীগুলি পড়িতে অধিকতর আনন্দ হইতেছে। সুতরাং আমি যে অধিকাংশ স্থানই ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। যে কাব্য পড়িতে প্রতি ছত্রে, প্রতি পদক্ষেপে টীকার প্রয়োজন হয়, তাহা অধ্যয়ন করা যে কত কষ্টকর, ভুক্তভোগী পাঠক মাত্রেই জানেন। আমাদের হীরেন্দ্রনাথের সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ, তিনি নাকি এই দাঁতভাঙ্গা কাব্যখানি আগা গোড়া ছত্রে ছত্রে, রীতিমত আলোচনা করিয়া, অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে "প্রেমচাঁদ পরীক্ষায়" আট হাজার টাকার প্রলোভনটা ছিল; আমার ত সে রকম কিছু একটাও নাই। আমি স্বাধীন; গেটের কাব্য গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে পারি।

২২শে জ্যৈষ্ঠ। গেটের গ্রন্থ এবং Emile zola প্রণীত The Girl in scarlet নামক উপন্যাসের কিয়দংশ পাঠ। রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় হীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ। দেখিলাম, তিনি কবিবর নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" কাব্যের আলোচনা করিতেছেন। একটা কাজ হাতে লইয়া কিরূপ যত্ন ও সতর্কতার সহিত সাধন করিতে হয়, তাহা হীরেন্দ্রনাথ জানেন। ইতিমধ্যে তিনি "কুরুক্ষেত্র" চারিবার পড়িয়া ফেলিয়াছেন। আবার সমালোচনার সাহায্য হইবে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতেরও আলোচনা করিতেছেন। তিনি মহাভারত সম্বন্ধে একটা নূতন-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, বলিলেন। তিনি বলেন, "মহাভারত যে তিন স্তরে বিভাজ্য, তাহা Lassen এবং আমাদের বঙ্কিমবাবু দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে, মহাভারতের শেষ তিন পর্ব্ব আদিমস্তরের অন্তর্গত। উহার রচনা অতি সংক্ষিপ্ত। অনেক

স্থলেই দেখা যায় যে মহাভারতের একমাত্র ঘটনার দুইটি করিয়া বর্ণনা আছে,-একটি সংক্ষিপ্ত এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। ঐ সংক্ষিপ্ত অংশগুলি যে আদিম স্তরের অন্তর্গত তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে; তিনি এখন সেই বিশ্বাস দৃঢ় করিবার নিমিত্ত প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এসব বিষয়ে লোকের একটা স্থির সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়া দেওয়া বড় সহজ নহে।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ। এপ্রিল মাসের Nineteenth Century পত্রে Countess Cowper প্রণীত Realism of To-day ইতি-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। অধুনা ইয়ুরোপীয় কাব্য-সাহিত্যে বাস্তব-বাদের কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। Realismএর যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা লুপ্ত হইয়া অবশেষে ইহা দারুণ অশ্লীলতায় পরিণত হইয়াছে। কাউণ্টপত্নী বলিতেছেন, ইহার জন্য বাস্তব-বাদী লেখকগণই দায়ী। ডাক্তার জনসনের মতে "The real is true, genuine. The ideal is mental, intellectual conceived." অর্থাৎ জগতে আমরা প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতে পাই, তাহাই real. আদর্শবাদী লেখক সেই প্রত্যক্ষের উপর ভিত্তি করিয়া আপনার বুদ্ধিবৃত্তি এবং কল্পনার সাহায্যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন। বর্ত্তমান সময়ের বাস্তব-বাদিগণ তাঁহাদের শাস্ত্রের এই প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রের শিক্ষারও অপব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল বাস্তব-বাদিগণ real অর্থে কেবল কদর্য্য, কুৎসিৎ, অশ্লীল ভিন্ন আর কিছুই বুঝেন না। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। কাব্য-গ্রন্থে এতদুভয়েরই প্রয়োজন। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আদর্শ-সৌন্দর্য্য বটে; কিন্তু আমাদের অভাব কি, জানিতে হইলে, আমাদের কি আছে, তাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান নহিলে ত চলে না। তাই realএরও আবশ্যকতা।—

২৪শে জ্যৈষ্ঠ। গতকল্য যে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছি, সাহিত্য পত্রের নিমিত্ত তাহার সার-সঙ্কলন ও সমালোচন করিলাম। আমাদের মত অব্যব-সায়ীর পক্ষে কাযটা তত সহজসাধ্য নহে। সে দিন হীরেন্দ্রনাথ আমাকেই এ বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার লইতে বলিতেছিলেন। ইহা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ, আমার যৎকিঞ্চিৎ যা জানা আছে, তাহা প্রধানতঃ সাহিত্য, কাব্য-নাটক সম্বন্ধে। "সাহিত্য" পত্রের প্রবন্ধে বৈচিত্র্য থাকা খুব দরকার। আমার সঙ্কীর্ণ চিন্তা জ্ঞান লইয়া সে বৈচিত্র্য রক্ষা করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আর, বিষয়টা এক জনের হাতে বদ্ধ করিয়া রাখাও ভাল নহে। তাহাতে মতের

স্বাধীনতা একবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রবন্ধগুলা নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িবে। এখন যেরূপ পাঁচ জনের সাহায্যে চলিতেছে, এরূপ বরাবর বজায় থাকিলে মন্দ হইবে না। এবার হীরেন্দ্রনাথ Asiatic Societyর Journal হইতে "বাঙ্গালার মুসলমান" ইতি বিষয়ক একটা প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছেন। সু—চন্দ্র কেবল 'মন খারাপ' 'মন খারাপ' ইত্যাকার বচন লইয়া বসিয়া আছেন, খারাপ মনটাকে ভাল করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা ত দেখি না।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ। এপ্রিল্ সংখ্যা সেঞ্চুরী পত্রে Early Social Self Government প্রবন্ধে লেখক সার জন সিমন K. C. B. আদিম মানবের মনে কি প্রকারে কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রথমোন্মেষ হইয়াছিল, তাহার একটা ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত অন্যায় বা অসঙ্গত বোধ হয় না। প্রাচীন জাতিমধ্যে প্রচলিত অনৈতিহাসিক কালের কিম্বদন্তী সমুদায় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অতি পুরাতনকালে মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন বংশোদ্ভব ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। আত্মরক্ষা ও আত্মসুখই তখন তাঁহাদের মনে অতিশয় প্রবল ছিল। ক্রমে ক্রমে অপত্যস্নেহ আসিয়া সেই স্বার্থপরতাকে কতকটা দমন করিয়া ফেলিল। সে সময়ে এই সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ, বিগ্রহ, কলহে নিযুক্ত থাকিত। এইরূপে পরস্পরের সাহায্যহেতু এক এক জাতিগত ব্যক্তিসমূহের মধ্যে একটা স্নেহের বন্ধন আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে নরহত্যা খুব প্রচলিত ছিল। কেবল যে যুদ্ধে ধৃত শত্রুগণকে হত্যা করা হইত, তাহা নহে; অনেক সময়ে খাদ্যের অপ্রতুল হইলে, বৃদ্ধ, রুগ্ন, শিশু, অকর্ম্মণ্য প্রভৃতিকে নিহত করা হইত। ক্রমে এই বিষয়ে একটু বিবেচনার বিকাশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। কে বেশী বৃদ্ধ বা রুগ্ন, দুর্ব্বল বা অকর্ম্মণ্য, এতৎ সম্বন্ধে তুলনা-তারতম্য আরম্ভ হইল। এইরূপে বিচারশক্তির ক্রমিক পরিচালনায় উহা কর্ত্তব্যজ্ঞানে পরিণত হইল। এমন লোকও দৃষ্ট হইতে লাগিল, যাহারা হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতাবশতঃ নরহত্যার একবারে বিরোধী হইয়া উঠিল। ক্রমে সভ্যতার অভ্যুদয়।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ। মে মাসের Merry-go-Round নামক পত্রে ইংরাজকবি উইলিয়ম মরিসের সহিত কোনও লোকের সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই সাক্ষাৎকালে কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গে কবি মহোদয় কাব্য-শিল্প সম্বন্ধে আপনার দুই একটা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কবিদিগের সাধারণের নিকট হইতে কোন প্রকার পুরস্কার বা লাভের প্রত্যাশা করা অন্যায়।

কারণ, অন্যান্য ব্যবসায় যেরূপ পরিশ্রমসাপেক্ষ, কাব্য-প্রণয়ন সেরূপ নহে। আর যদি তাহাই হয়, সে পুরস্কারকল্পে,কবি রচনাকালে যে আনন্দ পাইয়াছিলেন, তাহাই যথেষ্ট।" মরিস্ মহাশয়ের কথায় আমরা সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিলাম না। কবিতা নিজেই নিজের পুরস্কার বটে; কিন্তু কাব্যগ্রন্থপাঠে লোকের যেরূপ আনন্দ হয়, সে আনন্দের মূল্যস্বরূপ তাঁহাদের কিছু না কিছু দেওয়া ত নিতান্ত কর্ত্তব্য। নহিলে উপকার পাইয়া প্রত্যুপকার-বিরতিরূপ পাপভাগী হইতে হয়। কবিবরের আর একটা কথা এই যে, তিনি কাব্যগ্রন্থের কোনও নৈতিক উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি বলেন,— "If people want to teach some cult, philosophy, or what not, why do they not write upon it frankly, without trying to wrap it up in fiction and force it down people's throats like a sugared pill?" মরিসের মুখে এ কথা শুনিয়া আমরা আদৌ বিস্মিত হই নাই। কারণ, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি এক জন "Idle singer of an empty day." সূর্য্যালোকে মশকের মত যাঁহারা মুহূর্ত্তে জন্মিয়া, মুহূর্ত্তে গাহিয়া, মুহূর্ত্তেই মরিয়া যাইতে চান, তাঁহারা মরিসের ন্যায় কাব্য লিখুন, আপত্তি নাই।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ। সে দিন বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ বিষয়ে যেরূপ আলোচনা করিয়াছি, অদ্যকার Statesman পত্রে তাহারই প্রতিধ্বনি দেখিলাম। Statesmanএর লেখক কেবল চিত্রবিদ্যার ভিতরেই আপনার বক্তব্যগুলি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ সূক্ষ্মশিল্প বা কলাবিদ্যামাত্রেরই উপর প্রযোজ্য। ফরাসী লেখকেরাই যে আজ কাল অশ্লীলতা সম্বন্ধে বিশেষ অপরাধী, তাহা লেখকও বলিয়াছেন। তিনি প্রাচীন চিত্রবিদ্যার সহিত আধুনিক কালের তুলনা করিয়া পুরাতনকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রাচীনেরাও উলঙ্গমূর্ত্তির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ছবিগুলি দেখিলে আমাদের মনে কোনও প্রকার কুভাবের উদয় হয় না। সেগুলিকে দেবীপ্রতিমা বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, প্রাচীনেরা বাস্তবের সহিত আদর্শ মিশাইতেন; সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব সমুদয় বুঝিতেন। আধুনিকদিগের মত কেবল বিবসনা দিগম্বরী মূর্ত্তি দেখাইয়া মানুষের কুৎসিত কৌতূহল নিবারণ করিতে চাহিতেন না। Shelly বলিয়াছেন, কবিতা কেবল "unveils the hidden loveliness of the earth and describes familiar things as if they be not familiar." কিন্তু কবিতা ঠিক ইহাই নহে; ইহার উপর আর একটু কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে

তাহা কি, কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"The gleam that never was on sea or land,
The consecration and the poet's dream."

২৮শে জ্যৈষ্ঠ। George Eliot প্রণীত Middlemarch উপন্যাস পাঠ করিতেছি। প্রথমাংশ পড়িতে পড়িতে Mr. Casaubon ও Dorotheyর জীবনকাহিনী সম্বন্ধে ক্রমশঃ একটা বেশ কৌতূহলের উদয় হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কয়েক পরিচ্ছেদ পরেই গ্রন্থকর্ত্রী তাহাদের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া কতকগুলি বাজে চরিত্র ও বাজে কথাবার্ত্তায় পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয়াংশেরও দুই তিন পরিচ্ছেদ শেষ হইয়া গেল; এখনও সেই বাজে লোকের কথাই চলিতেছে। কত দূরে আবার আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদিগের সাক্ষাৎ পাইব, বলিতে পারি না। ইংরাজী নবেলের একটা প্রধান দোষ এই যে, উহারা প্রায়শঃ অতি দীর্ঘ। উপন্যাসিকদিগের মনে কেমন একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, তিন ভলুম না হইলে কোন উপন্যাসই উপন্যাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা প্রকাশকদিগের অর্থোপার্জ্জনের একটা সুন্দর সুবিধা বটে। কারণ, এক ভাগ কিনিলেই অপরগুলিও ক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু এ প্রকারে পাঠক ঠকাইয়া পয়সা উপায় করা সঙ্গত কি না, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। অথবা এমনও হইতে পারে যে, ইংরাজ-পাঠকেরা সাধারণতঃ সুদীর্ঘ নবেলেরই পক্ষপাতী। সুতরাং সে বিষয়ে অনুসন্ধান না করিয়া আমাদের সমালোচনা করা অনুচিত।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ। "ভারতী" ও "সাহিত্যে"র ভ্রমণকারী বাবু জলধর সেন কলিকাতায় আসিয়াছেন। "সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে আপ্যায়িত * * * করিবার নিমিত্ত আজ রাত্রে একটা প্রীতিভোজের জোগাড় করিয়াছিলেন। জলধরের উপলক্ষে লক্ষ্যটা আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের উপরেও পড়িয়াছিল। ব্যাপারটা বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। আমার মাংসভোজনে বিরতি দেখিয়া, সু—চন্দ্র, আহারে তৃপ্তি হইল না বলিয়া দুঃখ করিলেন? আর আম্বাই করিয়া কয়েকটা বোম্বাই বেশী মাত্রায় খাওয়াইয়া দিলেন। এখন কথা এই, জলধর বাবু "ভারতী"তে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাইতে দিবেন কি না? প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া বড় দুরূহ। "সাহিত্য"-সম্পাদক "ভারতী"র প্রিয় প্রকাশচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াই [illegible] করিয়া দিলেন [illegible]

জলধরকে যেরূপ পাকড়াও করিয়া ধরিয়া বচনের ধারা ছুটাইয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বাস হয় না যে, জলধর ভারতীকে সহজে ভুলিতে পারিবেন। তা না পারুন, "সাহিত্যে"র খাতির এড়ানও সহজ হইবে না। সম্পাদক মহাশয় যে দুই চারি বুলি দিয়াছেন, তাহাই উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে প্রচুর। আর বেশী কিছুর দরকার নাই। সেন মহাশয়ের ভ্রমণ-কাহিনী অনেক স্থলে উপন্যাসের ন্যায় হইলেও পড়িয়া আমোদ পাওয়া যায়।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ। সাধের ছুটি ফুরাইয়া গেল। কাল আবার সেই পুরাতন লাঙ্গলে আপনাকে জুড়িয়া দিতে হইবে। ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয়টা যেন জড়ীভূত হইয়া উঠিতেছে। বেলা ছয়টার সময় শয্যা হইতে সেই স্বেচ্ছাময় উত্থান; ধীর, নিশ্চিন্ত ভোজন; ক্ষুদ্র উপাধানটি টানিয়া লইয়া নীরবে, নিভৃতে শয়ন; তার পর নিতান্ত স্বাধীন বাসনার অনুগামী হইয়া গেটে, জর্জ ইলিয়ট প্রভৃতি বড় বড় মস্তিষ্কের পরিমাণ-গ্রহণ;—কাল সকলেরই শেষ। বেলা অপরাহ্ণ ৬টার সময় রবিদেবকে অস্তের পাটে বসাইয়া, প্রিয়বর সু—চন্দ্রের নবগৃহাভিমুখে বিজয়াভিযান; রাত্রি ৯-৩০ পর্য্যন্ত, কোনও দিন বা যত্নের আতিশয্যে তাহারও অধিককাল অবস্থান;—কাল হইতে জীবনের এই চরম সুখেরও শেষ। প্রভাতে উঠিয়াই পঞ্চুরামকে ক্রোড়ে লইয়া ভ্রমণ; তাহার বিচিত্র শৈশবলীলা-সন্দর্শন; উপরে চারিটি, নিম্নে দুইটি, এই ছয়টি কুন্দ-দন্তে হাসির ছটা দেখিয়া জগৎ-সংসার-বিস্মরণ; হায়! ভাবিয়া প্রাণ যে শুকাইয়া যাইতেছে!—কাল তাহারও শেষ! চরণ আর চলিতে চাহিতেছে না। রাত্রিটির অবসান হইলেই আবার সেই কোন্নগরের কারাগৃহে একাকী বসিয়া সপ্তাহব্যাপী সুদীর্ঘ বিরহের প্রতি-মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত গণনা করিতে হইবে। তাই প্রাণাধিক পুত্রের নির্ব্বাসনোন্মুখ রাজা দশরথের ন্যায় কেবল বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—"আমার সুখের নিশি প্রভাত হয়ো না।" হায়! নিশি যদি কথা শুনিতে পাইত!

৩১শে জ্যৈষ্ঠ। হাবড়ার ষ্টেশনে ৯—৩০ মিনিটের গাড়ী ধরিব বলিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া আসিতেছি, এমন সময় পথিপার্শ্বে শুনিতে পাইলাম, গৃহমধ্য হইতে আমাদের এক আত্মীয়ের শিশুটি রোগ-যন্ত্রণায় অতি ক্ষীণস্বরে "মা! মা!" বলিয়া ডাকিতেছে। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমার প্রাণাধিক প্রশান্তও এইরূপ ডাকিয়া ডাকিয়া, অবশেষে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। হায়! অবোধ শিশু! কাহারে ডাকিতেছিস্? যে জন তোর পার্শ্বে বসিয়া বীজন করিতেছে, সেই কি তোর মা? ও যে তোরই মত

অসহায় অনাথা। উহাকে ডাকিয়া ত কোনও ফলই নাই। ও কেবল কাঁদিতে পারে। তোর ওই আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিবার উহার সামর্থ্য কই? হায়! তবে কোন্ মাকে ডাকিব? যে মাকে ডাকিতে চাই, সে কি বাস্তবিকই এরূপ উদাসীন?—'কই মা! কই আমাদের মা!'—জগৎসংসার চিরদিনই এই চীৎকার করিতেছে;—হায়! মানুষের মত এমন নিরাশ্রয়, অসহায় জীব আর কে আছে? চিন্তা করিতে করিতে চলিলাম। হুগলী সেতুর উপর আসিয়া, পার্শ্বে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, দলে দলে, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোক দশহরা উপলক্ষে ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে স্নান করিতেছে, আর ঊর্দ্ধকণ্ঠে কেবল 'মাতর্গঙ্গে!' 'মা! মা!' বলিয়া ডাকিতেছে। বড় সাধ হইল, একবার এই অসংখ্য নরনারীকে ডাকিয়া বলি,—"এস ভাই! এস বোন্! আমরা সকলে মিলিয়া সমস্বরে, আকাশ কম্পিত করিয়া একবার ডাকি,—"মা! মা!—হায়! তবুও কি মা শুনিতে পাইবেন না?"

১লা আষাঢ়। ডাক্তার ব্লেয়ার প্রণীত Rhetoric and Belles letters গ্রন্থে কাব্য-পরিচ্ছেদ পাঠ করিলাম। ডাক্তার সাহেব কাব্যের এই সংজ্ঞা নিরূপিত করিয়াছেন,—"Poetry is the language of passion, or of enlivened imagination, formed, most commonly, into regular numbers." বক্তা, ঐতিহাসিক বা দার্শনিকের উদ্দেশ্য কেবল লোককে স্বাভিমতে আনয়ন, অথবা সংবাদ বা শিক্ষাদান। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ আনন্দ-দান, অথবা চিত্তাকর্ষণ। সুতরাং কবির কার্য্য কেবল কল্পনা ও ভাব লইয়া। শিক্ষাদান ও সংস্কারও কবির উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। তবে ইহা গৌণ উদ্দেশ্য। কিন্তু গৌণ হউক; এ উদ্দেশ্য না থাকিলে, সৎই হউক, আর অসৎই হউক, আনন্দমাত্রেরই উত্তেজনা করিলে, পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। আমাদের সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন,—"কাব্যং কান্তাসম্মিততয়া উপদেশ-যুজে।"—অর্থাৎ কাব্য কান্তার ন্যায় আনন্দ ও উপদেশ প্রদান করেন। এই বাক্যে গৌণ বা মুখ্য উদ্দেশ্যের কোনও বিচার নাই। শিক্ষা ও সংস্কার অপরাপর শাস্ত্রেরও উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু কাব্যশাস্ত্রের সহিত তাহাদের পার্থক্য এই যে, কাব্যের উদ্দেশ্য কেবল শিক্ষা নহে—আনন্দ ও উল্লাসের সহিত শিক্ষা। কাব্য কখনও বলেন না,—"নরহত্যা করিও না; তাহা হইলে তোমাকে ফাঁসী দিব।" কিন্তু কাব্যে নরহত্যার ফলাফল এরূপ ভাবে বর্ণিত হয় যে, উপরোক্ত আদেশ বাক্যের যাহা উদ্দেশ্য, কাব্যেও তাহা কতকটা সিদ্ধ হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হইল, অথচ কাব্যকে হাতে চাবুক লইতে হইল না। আবার এমন কতকগুলি বিষয়ও আছে, যাহা কাব্য ভিন্ন আর কিছুতেই সুসিদ্ধ হইবার নহে।

২রা আষাঢ়। সুদীর্ঘ অবকাশের পর কার্য্যের কঠোরতা একবারে সহ্য হইবে না, এই ভাবিয়া ভগবান বুঝি আগামী কল্য ও পরশ্ব এই দুইটা দিবসের ছুটি জুটাইয়া দিলেন। কিন্তু স্কুলের কাজ পূর্ণমাত্রায় চারিটা পর্য্যন্তই করিতে হইল। চিরদিনের বন্দোবস্ত দুইটা ত্রিশ মিনিটের গাড়ী আজ আর কপালে ঘটিয়া উঠিল না। আড়াইটার বদলে সাড়ে ছয়টার ট্রেণ সহায় করিয়া রাত্রি প্রায় আটটার সময় কলিকাতার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হায়! রেলওয়ে কোম্পানী কি নিষ্ঠুর! চারিটার সময় স্কুল ভাঙ্গিল। আমাকে অন্ততঃ ছয়টার সময় প্রাণাধিক প্রিয় শিশুটির (পঞ্চুরামের) কাছে পঁহুছাইয়া দিতে পারিল না। অন্ততঃ সাড়ে ছয়টা কি সাতটার সময় আসিতে পারিলেও তাহাকে জাগরিত দেখিতে পাইতাম। সে আমাকে চিনিতে পারিয়া, নীরবে ছয়টি দন্তে যে প্রথম হাসি হাসিত, তাহা উপভোগ করিতে পাইতাম। লৌহ ও কাষ্ঠ লইয়া কোম্পানীর ব্যবসায় বলিয়া, কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত রক্তমাংসময় মানুষগুলার প্রকৃতিও কি লৌহ ও কাষ্ঠবৎ হইয়া পড়িয়াছে? নহিলে ৪টা হইতে ৬—৩০ টার মধ্যে একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত তাঁহারা করিলেন না কেন?

৩রা আষাঢ়। "বঙ্গনিবাসী" নামক পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এক্ষণে "সমীরণ" নামধেয় একখানা মাসিকের সম্পাদক হইয়াছেন। বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই অবস্থার পরিবর্ত্তনকে পদের উন্নতি বলিব কি অবনতি বলিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। তা না পারি, তাহাতে বড় কিছু ক্ষতি হয় না। সম্প্রতি সম্পাদক মহাশয় আমাকে কিন্তু একটা বড় বিষম সমস্যায় ফেলিয়া দিয়াছেন। কোথায়, কবে, কার কোন্ কাগজে তিনি আমার এক আধটা প্রবন্ধ দেখিয়া আমাকে এক জন লেখক বলিয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই পত্রের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহার 'সমীরণে'র সাহায্যার্থ আমি সময়ে সময়ে দু একটা "লেখা"রূপ ফুৎকার দিলে কিংবা হাই তুলিলে তিনি বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন। ভদ্রলোক পত্রের উত্তর পাইবার জন্য ব্যগ্রতাও জানাইয়াছেন। তাই ভাবিতেছি, এখন কি করি? সমস্যা বড় সহজ নহে। লেখক বলিয়া বাজারে একটা খ্যাতি কোনও রকমে জন্মিয়া না থাকিলে তিনি যে কালি-কলম-কাগজ, তদুপরি আবার দুই পয়সার টিকিট খরচ করিয়া, এই কোন্নগর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিতেন, তাহা ত বিশ্বাসই হয় না! অন্ততঃ

বিশ্বাস করিয়া প্রাণের তৃপ্তি হইতেছে না। বাজারে প্রতিপত্তিটা যদি বাস্তবিকই হইয়া থাকে, তাহা বজায় রাখিবার উপায় কি? ভাবিয়া ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে না পারায় ভালমানুষের পত্রখানার জবাব দেওয়া হইতেছে না।

৪ঠা আষাঢ়। আজ একটা মজার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। পথিমধ্যে একদিন আমার পুরাতন বন্ধু ব্র—বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি কবিবর * * * মহাশয়ের সহিত তাঁহার নূতন আলাপের বিষয়টা উত্থাপন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, কি একখানা বাঙ্গলা কাগজে * * বাবুর কি একখানা পুস্তক সম্বন্ধে কি একটা কথা লেখা হইয়াছে, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি কি না? সৌভাগ্যের বিষয়, আমি তাঁহার সমস্ত ফাঁকগুলা (Ellipses) পূরাইয়া দিতে পারিলাম। তিনি তখন বলিলেন, * * বাবুর সহিত প্রথম দিন আলাপেই তিনি বড় অপ্রতিভ হইয়াছেন। কবিবর কত আগ্রহের সহিত * * প্রকাশিত * * * * নামক প্রবন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার কথায় অভিলষিত উত্তর দিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারিলেন না। এইবার আসল রহস্য। আজ অকস্মাৎ ব্র—বাবু আসিয়া একখানা চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন, * * বাবু আপনাকে খুব Compliment দিয়াছেন। ব্যাপারখানা কি জানিতে বড়ই আগ্রহ হইল। দেখিলাম, বাস্তবিকই কবিবর * * লিখিয়াছেন,—— "I am proud of the opinion of Nitya Babu whom I esteem as a very superior literary man." কথায় কথায় ক্রমে সব রহস্যই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে দিন ব্র—বাবুর প্রশ্নে * * কাব্যের যে একটু প্রশংসা করিয়াছিলাম, তাহাই এইরূপে কাকের মুখে নীত হইয়া কবিবরের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিরাগ ও অবজ্ঞার ভাবটা একেবারে ভুলিয়া গিয়া অকস্মাৎ এই নিতান্ত অজ্ঞ, দীনহীন সাহিত্যানুরাগীকে এক জন "very superior literary man" বলিয়া বুঝিয়া ফেলিয়াছেন! হা প্রশংসা-প্রয়াস! তোমারই জয়!

৫ই আষাঢ়। * * * জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাধনায়" রবীন্দ্রনাথের "মৃত্যুর পরে" ইতি শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটি কাহার মৃত্যুর পরে লিখিত, তাহা স্পষ্ট বুঝিবার যো নাই। অথচ সাধারণ ভাবে লইলে আদ্যোপান্ত অর্থ তত সঙ্গত হয় না। দু' একটা কথা বারংবার পুনরুক্ত হইয়াছে। তাহা ব্যক্তিগত বলিয়াই বোধ হয়। আমি প্রথমতঃ বঙ্কিম বাবুর

মৃত্যুই উপলক্ষ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে গোপাল বাবুর কথা শুনিয়া, উহা যে * * * মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ দৃঢ়রূপে প্রতীত হইতে লাগিল। * * * উপলক্ষ যাহাই হউক, কবিতার শেষ কয়টি শ্লোক আমার বেশ লাগিয়াছে। এত দীর্ঘ না করিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া, নিকৃষ্ট ও অনাবশ্যক অংশ সমুদয় বাদ দিয়া প্রকাশ করিলে কবিতাটি বেশ সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইতে পারিত। আজকাল রবি বাবুর একটা প্রধান দোষ, তিনি বিনা প্রয়োজনে অতি দীর্ঘ হইয়া পড়েন। পাঠকের সহিষ্ণুতার উপর এতটা জুলুম চলে না।

৬ই আষাঢ়। কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয় আমার জন্য যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার অনুপানের আয়োজন করিয়া আজ বৈকালে সেবন করিলাম। সিম্‌লার বাজার হইতে আমি যে শ্বেত বেড়েলা আনিয়া-ছিলাম, তাহা আমাদের এক জন আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ শিক্ষক মহাশয়কে দেখাইলে, তিনি বলিলেন, উহা প্রকৃত পদার্থ নহে। তাঁহার নিজের বাটীতে আসল গাছ ছিল; তিনি অনুগ্রহ করিয়া আনিয়া দিলেন। তা'র পর আবার শালপাণি। অধিকন্তু, আধ সের জল, আধ পোয়া দুগ্ধ, আধ পোয়া শেষ, ইত্যাদি নানা উপদ্রবের পর তবে কবিরাজ মহাশয়ের ব্যবস্থা পালিত হইল। এখন শরীর যদি সারে, তবেই সব সার্থক। ভগবান না করুন, কিন্তু অবস্থাটা কতকটা George Eliotএর ক্যাসাবনের মত বলিয়া বোধ হয়। শরীরটা ত ব্যাধির মন্দির নয়, একবারে রাজপ্রাসাদ হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদের কথায় বিশ্বাস করিলে, প্রাসাদের আয়তন ক্রমশঃ বাড়িবে বই কমিবে না। দুই একটা যে সামান্য কল্পনা মনের ভিতর রহিয়াছে, কিংবা অর্দ্ধসম্পূর্ণমাত্র হইয়াছে, তাহা সুন্দররূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব কি না, সন্দেহের বিষয়। প্রাণের ভিতর এই সন্দেহ। জীবনটা নিতান্ত বন্ধন-বিহীন। তেমন স্থির উদ্দেশ্যও কিছু নাই। ঠিক যেন রবীন্দ্রের সহিত "নিরুদ্দেশ যাত্রা" করিতেছি। এ যাত্রার শেষ কোথায়, কে জানে? যাত্রী কিন্তু বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! তাহার এই সশঙ্ক চাঞ্চল্যে ক্ষুদ্র ডিঙ্গীখানা যদি হঠাৎ উল্টাইয়া যায়, তাহা কি তেমন সুখের হইবে?

সহযোগী সাহিত্য।

ইলোরার গুহামন্দির।

শিল্পসম্পদ, কল্পনাকৌশল, বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতিতে ইলোরার গুহামন্দিরসমূহ ভারতভূমির শৈলক্ষোদিত সহস্র গুহামন্দিরের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ইলোরায় (ভেরুলা, ইরুলা, অথবা বেলোরায়) বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও জৈন, এই তিন শ্রেণীর প্রায় ত্রিশটি গুহামন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বৌদ্ধ গুহাসমূহই অতি প্রাচীন ও সংখ্যায় অধিক। সাম্‌সুল-উলমা সৈয়দ আলি বেলগ্রামি সম্পাদিত Guide to the cave temples of Ellora নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, ইলোরার গুহামন্দিরনিচয় বৌদ্ধ মহাযানশ্রেণীভুক্ত, এবং ৩৫০ হইতে ৫০০ খ্রীষ্টীয় অব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত। প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে এই মন্দিরসমূহের পরেই ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীভুক্ত শৈব ও বৈষ্ণব গুহামন্দিরসমূহের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চতুর্থ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালে এই মন্দিরনিচয় ক্ষোদিত হইয়াছিল। জৈন গুহামন্দিরমালা অধিকতর আধুনিককালে অর্থাৎ প্রায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এই মন্দিরসমূহের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সেগুলিও পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ক্ষোদিত হয় নাই। বিচ্ছিন্ন শৈল বা পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী শিলা ও সিকতাস্তরাবলী দেখিয়া ভূতত্ত্ববিৎ যেরূপ ভূস্তরনিচয়ের ইতিহাস অবগত হন, সেইরূপ এই চন্দ্রলেখাকৃতি মন্দিরগুহাগর্ভ শৈলের উপবিভাগ নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিলে পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

এই গুহামন্দিরমালার প্রবেশদ্বার সমুদ্র সমতল হইতে দুই সহস্র, এবং দক্ষিণাপথের সমভূমির শত শত ফিট্ ঊর্দ্ধে অবস্থিত। দক্ষিণাপথের এই বিশাল শস্যশ্যামল মালভূমি সুদূর দিগ্‌চক্রবালে মিশিয়া গিয়াছে, এবং ইহার উত্তর-দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তী দৃশ্য আংশিক ভাবে পূর্ব্বোল্লিখিত শশাঙ্কলেখাকৃতি শৈলের শৃঙ্গযুগলের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধেরা গুহানিবাস ও মন্দিরসমূহের নির্ম্মাণার্থ এই শান্তিস্নিগ্ধ নিভৃত ভূমি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। গুহার অভ্যন্তরে গিরিগাত্র-ক্ষোদিত মূর্ত্তিসমূহ নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, প্রকৃত বুদ্ধোপাসনা অপেক্ষা বুদ্ধের স্মৃতি জাগরূক রাখাই বৌদ্ধদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই মূর্ত্তিসমূহ অতি বিশাল। কতিপয় মূর্ত্তি সিংহাসনে আসীন, পদযুগল প্রসারিত, বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা পরিধৃত, এই মূর্ত্তির নাম বুদ্ধের অধ্যাপনা মূর্ত্তি। অন্যান্য কতিপয় গুহামধ্যেও এইরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মূর্ত্তিনিচয় ভিত্তিকোটরে সংস্থিত, এবং উহার উভয় পার্শ্বে দ্বারপালরূপী বিরাট মূর্ত্তিদ্বয় বিরাজিত। পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধগুহামন্দিরমধ্যে অন্যপ্রকার প্রতিমাসমূহ

দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গুহার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যগুহামন্দিরস্থিত পাষাণময়ী নারী-মূর্ত্তির ন্যায় বহুসংখ্যক রমণীমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। উত্তরকালের বৌদ্ধ গুহাসমূহে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল চতুর্ভুজমূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছে।

গিরিগর্ভে গুহামন্দির ক্ষোদিত করিবার রীতি বৌদ্ধেরাই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত মন্দিরসমূহ উহার অনুকরণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দিরনিচয় অতি বিস্তৃত ও অলঙ্কারবহুল; কিন্তু এই মন্দিররাজিমধ্যে ক্ষোদিত প্রতিমাসমূহের অধিকাংশই অতি অপরূপ, ললিতকলাসুলভ-সৌকুমার্য্য-বর্জ্জিত। জৈন গুহাসমূহের কারুকার্য্যে উক্তসম্প্রদায়গত বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই সকল মন্দিরে প্রতিমার সংখ্যা অল্প, এবং মন্দিরস্থিত ইন্দ্রমূর্ত্তিনিচয় বৌদ্ধমূর্ত্তির অনুরূপ। ভারতের জৈনধর্ম্মকে রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করিলেও, এই মূর্ত্তিগত সাদৃশ্যদর্শনে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ও জৈন গুহামন্দিরে স্থিত প্রতিমানিচয় মুসলমানদিগের উৎপাতে ভগ্ন ও অঙ্গহীন হইয়াছে। সম্ভবতঃ অউরঙ্গজেবের শাসনকালে মূর্ত্তিসমূহের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। অউরঙ্গজেবের নামানুসারে অউরঙ্গাবাদের নামকরণ হইয়াছে। ইলোরার সন্নিহিত রয়া নামক স্থানে উক্ত সম্রাটের আড়ম্বরপরিশূন্য গগনভেদী সমাধিমন্দির পরিলক্ষিত হয়। গুহাসমূহের ঊর্দ্ধদেশে শৈলশিখরে কতিপয় ডাক্-বাঙ্গলো আছে। নিজামের প্রতিনিধি অথবা অউরঙ্গাবাদস্থিত Hydrabad Contingentএর কর্ম্মচারিবর্গের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক দর্শকেরা এই সকল বাঙ্গলোয় অবস্থিতি করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ভ্রমণকারীদিগের অবস্থানার্থ এখানে একটি বাঙ্গলো আছে। ভ্রমণকারীদিগের পরিচর্য্যার জন্য এই বাঙ্গলোতে এক জন পাচক নিযুক্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নন্দগাঁও হইতে জি. আই. পি. রেলযোগে ইলোরায় যাইতে হইত। নন্দগাঁও হইতে ইলোরার ব্যবধান ৫০ মাইল। নিজামরাজ্যের নূতন রেলযোগে গমন করিলে গুহামন্দিরসমূহের কয়েক মাইল দূরে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইতে হয়। মানমার জংসনের ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী দৌলতাবাদ ষ্টেশন ইলোরা হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী, এবং অউরঙ্গাবাদের দূরত্বও উহার অনুরূপ যাত্রীরা আদেশ করিলে অউরঙ্গাবাদ হইতে দৌলতাবাদ ষ্টেশনে টোঙ্গা প্রেরিত হয়। দৌলতাবাদে একটি ভোজনগৃহ (refreshment room) ও একটি বিশ্রামাগার আছে। বড়দিনের পূর্ব্বে ও পরে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত ইলোরার বাঙ্গলোগুলি জনপূর্ণ ছিল। কিন্তু প্রতিবৎসরই এখানে এরূপ লোকসমাগম হয় না।

গুহামন্দিরসমূহের মধ্যে কৈলাসমন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। শুনা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুবৃহৎ কারুকার্য্যখচিত গিরিক্ষোদিত মন্দির আর নাই। এই পাষাণ-ক্ষোদিত মন্দিরটি দেখিলে উহা ভূপৃষ্ঠনির্ম্মিত প্রস্তরমন্দির বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি প্রকাণ্ড শিলার অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ ক্ষোদিত করিয়া এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। "Balfour's Ciclopœdia of India" নামক গ্রন্থ হইতে কৈলাসগুহার নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইল।—এই মন্দির সম্পূর্ণরূপ দ্রাবিড়ীয়

(Dravidian) প্রণালীতে নির্ম্মিত, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, এবং সমতলনির্ম্মিত মন্দিরের অনুরূপ। শৈলের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ ক্ষোদিত করিয়া এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখভাগের পরিমাণ ১২৮ ফিট; অভ্যন্তরভাগের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ২৪৭, বিস্তারে ১৫০ ফিট। কোন কোন স্থানে মন্দিরের উচ্চতা এক শত ফিট্ হইবে। শুনা যায়, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইলিচপুরের রাজা ইদু এই মন্দিরের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানের সন্নিহিত কোনও উৎসের জলে তিনি রোগমুক্ত হইয়া, কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ইলোরা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের অত্যুচ্চ পাদদেশে শ্রেণীবদ্ধ হস্তী প্রভৃতির বিরাট মূর্ত্তিনিচয় দৃষ্ট হয়। এই মন্দির বিষ্ণু ও সমগ্র পৌরাণিক দেবপরিবারে পরিবৃত।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস।

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ও তিব্বততত্ত্বজ্ঞ রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই. ই. কলিকাতার "Literary Society" নামক সভায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

রাজা স্রংৎ সান গাম্পোর অন্যতর অমাত্য অনুর পুত্র থন্ মি সর্ব্বপ্রথমে তিব্বতে লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। প্রথমে তিনি লিপিকর দত্ত নামক জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের নিকট ও পরে অনেক বর্ষ যাবৎ মগধের বিখ্যাত বৌদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেন। পবিত্র বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি তিব্বতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তত্রত্য প্রথিতনামা নরপতি পরমসমাদরে তাঁহার অভিনন্দন করেন। মগধরাজ্যে অবস্থানকালে (৬৩০খৃঃ—৬৫০খৃঃ) সকলে তাঁহাকে "সাম্ভোটা" [উৎকৃষ্ট তিব্বতবাসী] বলিয়া সম্বোধন করিত। তখন তিব্বত ভারতবর্ষে "ভোট" নামে পরিচিত ছিল। নবোদ্ভাবিত লিপিবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি কতিপয় প্রবন্ধ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাহার প্রণীত একখানি পদ্য ব্যাকরণও তিব্বতে প্রচলিত আছে; শিক্ষার্থী বালকমাত্রকেই উক্ত গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে হয়। রাজা স্রংৎ-সান্ গাম্পো ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গের রাজত্বকালে নলন্দাপ্রবাসী তিব্বতী ছাত্রেরা কখন কখন সংস্কৃত পুস্তকাদির অনুবাদ করিতেন বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তিব্বতীয় ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ করিবার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা কেহ করেন নাই। এই সময়ে সাম্ভোটা স্বরবর্ণ চিহ্ন চতুষ্টয়-সংবলিত ত্রিংশৎটি মাগধ অক্ষর তিব্বতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই অক্ষরনিচয় কিয়ৎপরিমাণে মগধের "ওয়ারতুলা" (wartula) বর্ণমালার আদর্শ অনুসারে গঠিত হওয়ায় ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইয়াছিল। তখন তিব্বতীয় ভাষার নিতান্ত শৈশব অবস্থা, তথনও এই ভাষায় ভারতীয় অথবা চৈনিকভাষামূলক কোনও শব্দ প্রবেশলাভ করে নাই। তিব্বতীয় ভাষায় সুপণ্ডিত হাঙ্গেরীর Cosma de koros তিব্বতীয় ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন;— "তিব্বতীয় ব্যাকরণলেখকদিগের মতে, তিব্বতীয় বর্ণমালা মধ্যভারতে সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত দেবনাগরী অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বর্ণমালার সহিত বিবিধ সংস্কৃত

শিলালিপির, বিশেষতঃ মিষ্টার উইল্‌কিন্স (পরে সার্ চার্লস হইয়াছিলেন) কর্ত্তৃক অনূদিত গয়ার সংস্কৃত শিলালিপি, অথবা কাপ্তেন ট্রিবর ও ডাক্তার মিল কর্ত্তৃক অনূদিত এলাহাবাদের স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত সংস্কৃত লিপির তুলনা করিলে, দেবনাগর অক্ষরের সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।"

নরপতি থিস্‌-রং-দেন্‌ৎসানের (Thisrong den stan) রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মই তিব্বত দেশের রাজকীয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাজানুমতিক্রমে বন্‌ফিটচ (Bon fetisch) ধর্ম্মের প্রচার বন্ধ হইয়াছিল, এবং হিমবৎ অথবা তুহিনপ্রদেশ ভারতীয় বৌদ্ধদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। শান্তিরক্ষিত (Sante Rakshita) নামে নলন্দার বৌদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক তিব্বতদেশে আগমন করেন। সেখানে তিনি রাজার গুরুপদে বৃত হন। যেরূপ প্রবল ধর্ম্মানুরাগ সম্রাট্ অশোকের চরিত্র সমুজ্জ্বল করিয়াছিল, রাজা থিস্‌রংও সেইরূপ একাগ্রতাসহকারে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তদবলম্বিত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে তিনি অশোকের পদাঙ্কানুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। শান্তি-রক্ষিতের পরামর্শানুসারে তিনি মধ্য তিব্বতে অনেকগুলি ধর্ম্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ে সামান্য সামান্য সংস্কারসাধন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে আপনার রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধবিহার স্থাপনার্থ অনুরোধ করিলেন। এই অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠানে শান্তিরক্ষিতের সহায়তা করিবার জন্য রাজা উদয়নবাসী (আধুনিক কাবুল) পদ্মসম্ভবকে আমন্ত্রণ করেন। পদ্মসম্ভব তখন ভ্রমণোপলক্ষে মগধে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই ভারতীয় পণ্ডিতযুগলের সহায়তায় রাজা প্রায় ৭৪০ খ্রীঃ অব্দে মগধের ওদন্তপুরি বিহারের আদর্শে বিখ্যাত সাম্‌ইয়া (Sam yea) মঠ স্থাপিত করেন। তিনি এই মঠের পরিচালনার্থ বহু সম্পত্তি দান করেন। মগধস্থিত বিহারের অনুকরণে এই মঠের মধ্যে এক শত আট জন ভারতীয় ব্রাহ্মণের বাসোপযুক্ত প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই ভারতীয় পণ্ডিতদ্বয় সাত জন তিব্বতদেশীয় যুবককে ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বৌদ্ধ বিহারের কার্য্য আরম্ভ করেন। সাম্‌ইয়া মঠের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে, পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য বৌদ্ধ আচার্য্যদিগকে মগধ হইতে আনয়ন করিলেন। এই নরপতি ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গের রাজত্বকাল হইতে বৌদ্ধধর্ম্মত্যাগী লঙডারমার (Longdarma) তিব্বত-সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত অনুবাদ কার্য্য বিশেষ উৎসাহসহকারে সম্পাদিত হইয়াছিল। সংস্কৃতচর্চ্চা তিব্বতীয়দিগের সহজসাধ্য করিবার ও সংস্কৃতশিক্ষাভিলাষী তিব্বতীয় ছাত্রগণের ভারতে আগমন ও অবস্থানজনিত পর্য্যটন ও প্রবাসকষ্টের মোচন করিবার অভিপ্রায়ে তিব্বতীয় লোকাভাগণ (scholars in Sanskrit) সংস্কৃত ব্যাকরণের টীকা প্রণয়ন ও সংস্কৃত অভিধান তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের পুস্তকাবলীও অনূদিত হয়; বাল্মীকি, ব্যাস, পাণিনি, ইন্দ্র, চন্দ্র, কালিদাস প্রভৃতির পুস্তকাবলীও এই অনূদিত গ্রন্থনিচয়ের অন্তর্গত। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, যে ভাষা স্বভাবতই একমাত্রিক, তাহাকে সংস্কৃতের মত বহুমাত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করিতে অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। এই দুইটি বিপরীত

বলের ফলে তিব্বতীয় কথোপকথনের ভাষা দ্বিমাত্রিকভাষায় পরিণত হইয়াছিল। তিব্বতীয়েরা বহুমাত্রিক কথার ও একটিমাত্র স্বরবর্ণের আশ্রয়ে উচ্চার্য্য কতিপয় ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণে অনভ্যস্ত বলিয়া, ধ্বন্যাত্মক উচ্চারণের নূতন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইল। যদিও তিব্বতীয় গ্রন্থকারগণ ছাত্রবর্গের সুবিধার জন্য এ ভাষা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, তথাপি বংশানুক্রমে এই ভাষার মৌখিক অনুশীলন প্রচলিত ছিল।

চীনদেশীয় অধ্যাপক সান্-থান্-সান্সি (San-than Sanssi) রাজা থিস্ রং-দেন্-সানের (This rong den-san) আহ্বানে তিব্বতে আগমন করেন। ধ্বন্যাত্মক উচ্চারণ-পদ্ধতি-সংবলিত চৈনিক ভাষার শব্দনিচয়প্রকাশে তিব্বতীয় ভাষার অসামান্য শক্তিদর্শনে তিনি অতিশয় চমৎকৃত হন। অতঃপর তিনি কতিপয় চৈনিক ও তিব্বতীয় পুস্তক উভয় ভাষায় ভাষান্তরিত ও বর্ণান্তরিত করেন। সমগ্র ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরিয়া সাক্যপা (Sakyapa) ধর্ম্মনেতৃগণ ভারতীয় গ্রন্থকারগণের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই উভয় শ্রেণীর গ্রন্থাবলী বিশেষ উৎসাহের সহিত ভাষান্তরিত করেন। এই সময়ে মগধদেশীয় ও বঙ্গদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তিব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সুধা। অগ্রহায়ণ, পৌষ। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "সাধন-সঙ্গীত" একটি 'গীতি-পদ্য'। গোলাপকে যে নামেই অভিহিত করা যাক, তাহা গোলাপই থাকে। অতএব বিড়ম্বনার নাম 'গীতি-পদ্য' দিলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণ্যাল হইতে "কাঙ্গরা-সঙ্গীত" নামক প্রবন্ধটি 'না বলিয়া গ্রহণ' করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন,—"কাঙ্গরা জেলার ভাষা আমাদের নিকট অবোধ্য, এবং তদ্দেশের আচার ব্যবহার আমাদিগের নিকট কৌতুকাবহ। আমরা নিম্নে কতিপয় কাঙ্গরা-সঙ্গীত অনুবাদ সহ প্রকাশ করিলাম" ইত্যাদি। কতকটা হেঁয়ালির মত নয়? পাঠকের মনে হইতে পারে, যে ভাষা লেখকের 'নিকট অবোধ্য', সে ভাষার সঙ্গীত তিনি কোন্ ইন্দ্রজাল-বলে বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলেন? কিন্তু এত বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সোসাইটির জর্ণালে গানগুলি ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সান্যাল মহাশয় তাহা হইতে বেমালুম-ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় অনুবাদে যে অপরূপ 'আর্টে'র পরিচয় দিয়াছেন, আমরা নিশ্চয় তাহাকে 'বড় বিদ্যা' বলিতাম,—যদি ধরা না পড়িত। আমরা 'আর্টের' সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ, সুতরাং অনুবাদের বিচারে অক্ষম, তাহা না বলিলেও চলে। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম "প্রাচীন-সাহিত্য-কীর্ত্তি" প্রবন্ধে দ্বিজ রতিদেব কর্ত্তৃক রচিত "মনসার ধূপাচার" প্রকাশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-কল্পে মৌলবী মহাশয় যেরূপ

আন্তরিক যত্ন, অসাধারণ অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের পরিচয় দিতেছেন, তাহা আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে আদর্শস্বরূপ মনে করি।

বঙ্গদর্শন। পৌষ। "মন্দিরের কথা" একটি সুপাঠ্য চিন্তাপূর্ণ রচনা। ভুবনেশ্বরের পাষাণমন্দির রবির কিরণে অনুরঞ্জিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র "শ্রমণ" নামক প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক সন্দর্ভে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। অক্ষয় বাবুর মতে 'শ্রমণ' বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রতিশব্দ নহে। অক্ষয় বাবু বলেন, "শাক্য সিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই যে এই শব্দ ভারতীয় পুরাতন সাহিত্যে সুপরিচিত ছিল, তাহার নানা নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ উপাসনা, উপাসক, ভিক্ষু প্রভৃতি পুরাতন শব্দের ন্যায় শ্রমণ শব্দও প্রচলিত সাহিত্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।" লেখক বিবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া নিজের মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি শ্রমণের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পবিত্র ও উজ্জ্বল। প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ; অথচ উপন্যাসের ন্যায় মনোরম। বাঙ্গলা মাসিকে বহুকাল এরূপ প্রবন্ধ দেখি নাই।

বান্ধব। আশ্বিন, কার্ত্তিক। "উড্ডীন পর্ব্বত" কবিতা ও হেঁয়ালি, দর্শন ও বিজ্ঞান, জল্পনা ও কল্পনা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। রাজধানীতে অভাব নাই, সুতরাং কষ্ট করিয়া ঢাকা হইতে এত দূর পাঠাইবার আবশ্যক ছিল না। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "সার্ উইলিয়াম ক্রুক্স্" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই সুপ্রথিত বিজ্ঞানাচার্য্যের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "বিজয়া" নামক তথাকথিত কবিতায় দেখিতেছি,—

"উদিলে চন্দ্রমা, উথলে সাগর,
—জ্যোৎস্না মাখিয়া গায়"

ইহা স্বতঃসিদ্ধ পুরাতন তথ্য, সুতরাং বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। কিন্তু—

"নদ-নদী-নালা- হ্রদ-সরোবর,
সকলই উছলি ধায়"

তাহা জানিতাম না। নিরঙ্কুশ কবিরা 'সত্যে'র ধার ধারেন না, এবং এ দেশে কবিদের কাছে বিজ্ঞান কখনও 'কল্‌কে' পাইবে না, এই গীতিকবিতাটি পড়িয়া তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ কবিতায় অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ কবিতায় শ্রেষ্ঠ। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বজন-বিদিত সত্য। তথাপি আত্মপ্রসাদের অনুরোধে আর একবার দেশের গৌরব ঘোষণা করিলাম। কবিতায় যদি পেট ভরিত, তাহা তাহা হইলে ভারতবর্ষে—অন্ততঃ বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষে কখনও মানুষ মরিত না। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের "প্রাচীন ভারতে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থান" নামক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। লেখক বলিতেছেন,—"পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের অস্তিত্ব একবারেই ছিল না।" কিন্তু লেখক পৌরাণিক যুগের কালনির্দ্দেশ করেন নাই। এরূপ উক্তির পূর্ব্বে কালনির্ণয় আবশ্যক। নতুবা সিদ্ধান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে।

বান্ধব। অগ্রহায়ণ। "মা উমা—কালিদাস ও কবি গুণাকরের চিত্রতুলনা" একটি বিরাট প্রবন্ধ, এবার প্রথম অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের "মোগলের অধঃপতন" উল্লেখযোগ্য। "সান্ত্বনা" নামক রচনাটির প্রতিপাদ্য কি, তাহা বচন-গহনে এমন প্রচ্ছন্ন যে, আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। শ্রীমৎ কল্যাণভট্টের "প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের মনোজ্ঞ পাত্রী" প্রবন্ধে প্রাণহীন সাধুভাষার উৎকট নমুনাগুলি মনোজ্ঞ বটে।

পূর্ণিমা। শ্রাবণ, ভাদ্র। "নচিকেতার উপাখ্যান" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম গোবিন্দ দাসের রচিত "কালিকা-মঙ্গল" নামক প্রাচীন কাব্যের পরিচয় দিয়া ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। "মেরিয়ন" সুপাঠ্য, ইংরেজী কোটেশনের এত বাহুল্য না থাকিলে আরও সুপাঠ্য হইত. "সাবেক কথা" একটি ঐতিহাসিক রচনা। মনোরম জল্পনায় পরিপূর্ণ। "হুগলীর কথা" এখনও চলিতেছে। মোটের উপর এবারকার পূর্ণিমা মন্দ হয় নাই। "মৃত্যুর পর" এখনও চলিতেছে। এত বড় ক্রমশঃপ্রকাশ্য দার্শনিক রচনার সূত্রানুসরণ সহজসাধ্য নহে। সাধারণ পাঠকসম্প্রদায় সেরূপ স্মৃতি ও মেধার অধিকারী নহেন।

পূর্ণিমা। আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "শারদ-গীতি" নামক কবিতাটি মন্দ নহে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, "সে কালের কবি" প্রবন্ধের মুখবন্ধে তাহার বেশ পরিচয় আছে "গদাই পুরুত" নামক অদ্ভুত উপন্যাসেই এবারকার "পূর্ণিমা" প্রায় পরিপূর্ণ।

নবপ্রভা। পৌষ। 'বিপদের প্রতি" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি কবিতা : মঙ্গলবাদী কবি বলিতেছেন,—

> "এস, এস, হে বিপদ, ধরি উদ্যত ফণা,
> ফোঁস ফোঁস ফণীর মতন।
> আমি জানি মন্ত্রতন্ত্র—হরি আরাধনা,
> ভাঙ্গি দিব বিষাক্ত দশন।
> শিরে তোর, লো নাগিনি, করে চিক্ চিক
> ইন্দুশুভ্র পবিত্রতা—অপূর্ব্ব মাণিক !"

এই সংসার-গহনে বিপদ-নাগিনীর ফণায় ইন্দুশুভ্র পবিত্রতার অপূর্ব্ব মাণিক যে কবির চক্ষে পড়ে, তিনি ধন্য। বিপদের বিষে জর্জ্জরিত না হইয়া যে কবি এমন মঙ্গলগান গাহিতে পারেন, তিনি জগতের উপকারী বন্ধু, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আর কোনও বাঙ্গালী কবি বিপদকে কবিতার কাম্যকাননে আশ্রয় দিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্র বাবুর রচিত এই ভাবের যে কয়টি কবিতা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি যেমন মনোহারী, তেমনই হিতকারী, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। "ভিক্টোরিয়া ও ভারতবর্ষ," প্রবন্ধের অধিকাংশই ইংরেজী ;—ক্রমশঃপ্রকাশ্য। "কালিন্দীকূলে" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের রচিত একটি ক্ষুদ্র কবিতা

"স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সুবিমল, স্বাদু, সুমধুর
আকাশে সন্ধ্যায় তারা ভাবিয়া মুকুর
হেরিছে আনন!"

পড়িয়া পাঠকবর্গ স্বভাবতঃ বিস্মিত হইবেন, বিস্ময়চিহ্ন দিবার বিন্দুমাত্র আবশ্যক ছিল না। আজ কাল কি সোম-কবি আকাশ আস্বাদন করিতেছেন? আকাশ যে স্বাদু, তাহা কে জানিত? কামচারী কবির কল্যাণে এত কাল পরে জানা গেল। ধন্য কবির ব্যোম-স্বাদিনী রসনা! তাহার পর,—

"জড়িত বিশ্বের তৃষা; তাই তব জলে
জীবন জুড়ান শান্তি লভে জীবদলে।"

বিশ্বের তৃষা কি বস্তু ও কোথায় জড়িত, বুঝিতে পারিলাম না। যে তৃষার জ্বালায় আকাশ চাটিতে হয়, তাহাই কি "বিশ্বের জড়িত তৃষা"? হায় কালিন্দী! "তব জলে জীবন জুড়ান শান্তি লভে জীবদলে," আর এই তৃষিত কবিতাটিকে 'শান্তি' না দাও, তোমার বক্ষে একটু স্থানও দিলে না? তুমি কি নিষ্ঠুর!

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

৭ই আষাঢ়। Middlemarch উপন্যাসের পাঠ চলিতেছে। Casaubonএর মৃত্যু হইয়াছে। Lydgate ডাক্তার যেরূপ বলিয়াছিলেন, Casaubonএর মৃত্যুটা সেইরূপ অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মৃত্যুর এই আকস্মিকতাবশতঃ তাঁহার পাঠকের হৃদয়ে যথেষ্ট শোকের সঞ্চার হয়। আমার নিজের ত প্রথম হইতেই তাঁহার সহিত বিশেষ সহানুভূতির উদয় হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে হঠাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল দেখিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারি নাই। Casaubonএর চিত্রটি অতি জীবন্ত। ইহাতে শিক্ষার বিষয়ও যথেষ্ট। কবি দেখাইয়াছেন, মানবজীবন বড় অনিশ্চিত। এ অবস্থায় অতি বৃহৎ কোনও উদ্দেশ্য লইয়া জীবনের সামান্য সহজসাধ্য কার্য্য-গুলিকে উপেক্ষা করিলে, হয় ত সকলই নিষ্ফল হইয়া যাইতে পারে। ক্যাসাবনের কল্পনার বিশালতা এত বেশী যে, তিনি নিজেই তাহা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সে কল্পনা (Key to the Mythologies) কার্য্যে পরিণত হইলেও যে জগতের নিশ্চিত উপকার হইবে, এ কথাও সকলে স্বীকার করিত না। Casaubonএর একটু সাংসারিক জ্ঞান থাকিলে, তিনি জীবন-সংগ্রামে কখনই এরূপে একবারে পরাজিত হইতেন না। শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অতিরিক্ত অধ্যয়নশীলতা তাঁহার আর একটা দোষ। এইরূপ নানা কারণে তাঁহার জীবন, তাঁহার গৃহ-সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠিল। তিনি অজ্ঞানে অসমাপ্ত-উদ্দেশ্যে বিফল-মানসে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন।

৮ই আষাঢ়। Casaubonএর চরিত্রে একটা অতি গুরুতর অপূর্ণতা লক্ষিত হয়। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সমুদয় যেরূপ প্রস্ফুরিত হইয়াছিল, হৃদয়বৃত্তি-নিচয়ের তাদৃশ অনুশীলন হয় নাই। তিনি যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত দাম্পত্য-প্রেমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারেন নাই। Dorotheyর সহিত তিনি পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইলেন, হৃদয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষাপূরণের নিমিত্ত নহে; কেবল বিদ্যানুশীলনের বিশেষ সুবিধা ও সাহায্য হইবে, এই আশয়ে। জ্ঞানোন্নতির পথে সাহচর্য্য প্রেমের একটা অবান্তর উদ্দেশ্য হইতে পারে; কিন্তু এ বিষয়েও ত Dorothey

তাঁহার তেমন সহায় হইতে পারিল না। মুগ্ধা অনভিজ্ঞা বালিকা প্রথমতঃ সেই উদ্দেশ্য লইয়াই কেতাব-কীট ক্যাসাবনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল; কিন্তু দুই দিনে সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। হৃদয়ের মিলন হইল না; সুতরাং, সত্বরেই বিষম বিচ্ছেদ আসিয়া উপস্থিত হইল। "The end of Man is an Action, and not a Thought"—এই মহান্ সত্যও ক্যাসাবন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে তিনি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল কেতাব লইয়া দুর্লভ মানবজীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন না। লোক-হিতসাধনের সহস্র সহজ উপায় থাকিতেও তিনি একটা উদ্দেশ্যহীন অলক্ষিত-ফলোদয় পুস্তক প্রণয়নেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রান্তির অবসানের পূর্ব্বেই জীবনের অবসান হইয়া আসিল, তিনি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

৯ই আষাঢ়। Middlemarch উপন্যাসের পাঠ শেষ হইল। আমি যে আদ্যোপান্ত রীতিমত পাঠ করিয়াছি, এমন নহে। এরূপ বৃহৎ গ্রন্থের (বিশেষতঃ অতি দীর্ঘ ইংরাজী নভেলের) যিনি প্রতি পৃষ্ঠা প্রতি লাইন যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিতে পারেন, তিনি অসাধারণ মনুষ্য, সন্দেহ নাই। আমি সেরূপ অসাধারণ নহি; সুতরাং বোধ হয় গ্রন্থের প্রায় আধখানা বাদ দিয়া, কেবল Casaubon ও Dorothey এই দুইটি চরিত্রের বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছি। গ্রন্থমধ্যে এই দুইটিই প্রধান চরিত্র। উপন্যাসের গল্পও প্রধানতঃ ইহাদিগকে লইয়া। কবি কতকগুলি সামান্য চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের সকলের সহিত মূল গল্পাংশের তেমন কোনও স্পষ্ট সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ Fred Vincy ও Mary Garthএর প্রেমকাহিনীর উল্লেখ করিলাম। ইহা উপন্যাসের একটা দোষ। চরিত্রগুলি যে ফুটে নাই, এমন কথা বলিতেছি না। সে বিষয়ে জর্জ এলিয়টের ক্ষমতার সীমা নাই। তিনি যাহার সম্বন্ধে দুইটা কথা নিজে বলিয়াছেন, অথবা কথোপ-কথনচ্ছলে বলাইয়াছেন, তাহাকেই জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের প্রধান আপত্তি এই যে, একবারে এতগুলি লোকের কথা ভাবিতে হইলে, কাহারও কথা ভাল করিয়া ভাবা হইয়া উঠে না, সুতরাং সহানুভূতিও বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়ে। আমি অপরাপর চরিত্র একপ্রকার বাদ দিয়া কেবল ক্যাসাবন-দম্পতির অনুসরণ করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অসুবিধা ত কিছুই অনু-ভব করিলাম না।

১০ই আষাঢ়। ডরোথি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিবার আছে। কবি তাহাকে লইয়া যেন কতকটা বিপন্ন বলিয়া বোধ হয়। তাই প্রথমে একটা ভূমিকা ফাঁদিয়া এবং উপসংহারে কএকটা প্যারাগ্রাফ লিখিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভূমিকা ও উপসংহার পাঠ করিয়াও আমি ডরোথির দুঃখে দুঃখী বা সুখে সুখী হইতে পারিলাম না। জর্জ এলিয়ট তাহাকে St. Theresaর সহিত তুলনা করিয়া ভাল করেন নাই। সেণ্ট থেরেসার প্রতিভা বা অসাধারণত্ব তাহাতে কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। কেবল এইরূপ দুই চারিটি অসামান্ত রমণীর কথা পুস্তকে পাঠ করিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিল, আমিও এক জন! আমিও জগতে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া যাইব। তাই আত্মীয় স্বজনের নিষেধ সত্ত্বেও সে কেতাব-কীট ক্যাসাবনের সহিত সম্মিলিত হইল। কিন্তু সে যেরূপেই আত্মপ্রতারিত হউক না কেন, তাহার অন্তরের অন্তরে যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় গুমিয়া গুমিয়া জ্বলিতেছিল। Casaubon প্রায় বার্দ্ধক্যগ্রস্ত, মৃত্যুর দ্বারস্থ। তাঁহার দ্বারা সে অনল ত নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এমন সময়ে Will Ladislaw, রতিপতি সাক্ষাৎ মদনের ন্যায়, তাহার নয়ন-পথে পতিত হইল। ভস্মাবৃত বহ্নি ইন্ধন প্রাপ্ত হইল। শিখা ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল। হায়! হতভাগ্য ক্যাসাবন! তোমার বিদ্যানুশীলনের সাহায্য হইবে বলিয়া শেষ বয়সে এ কাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে? ছার জ্ঞানচর্চ্চায় কি সুখ! ঐ দেখ! তুমি মরিতে না মরিতে, তোমার নিষেধবাক্যে পদাঘাত করিয়া, তোমারই পবিত্র পাঠগৃহে, সে কাহার সহিত কোন্ বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল!—"পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল, উপরহি ঝকমকি সার!"

১১ই আষাঢ়। * * কবিরাজ মহাশয়ের ব্যবস্থায় তাদৃশ উপকার দেখিতে পাইলাম না। * * * আর একটা গোলযোগ অনুপান লইয়া। কবিরাজ মহাশয়েরা অনুপানের কথা কাগজে লিখিয়া দেন; কিন্তু প্রকৃত পদার্থটাকে তাঁহারা নিজেই অনেক সময় চিনিতে পারেন না। আমি ত এক বেড়েলা লইয়া বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে যে জিনিস আনিয়াছিলাম, তাহা এখানকার এক জন ব্যবসায়ী বাতিল করিয়া, তাঁহার নিজের মনোমত গাছ দিলেন। তাহা আবার আর এক জন কবিরাজ ঠিক নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। মীমাংসার জন্য দ্বিতীয় বিজ্ঞ মহোদয়ের প্রদত্ত গাছটির দুই একটা ডাল লইয়া কলিকাতায় পাচন-ব্যবসায়ীকে

দেখাইলাম। তিনি প্রথমে বেড়েলা বলিয়া আমার হাত হইতে উহা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে আর কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না! পণ্ডিতে পণ্ডিতে এইরূপ লড়াই হইলে মীমাংসা করে কে? যাহা হউক, আমি একটি সুপথ আবিষ্কার করিয়া লইলাম। ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া দিয়াছি!

১২ই আষাঢ়। একটা চাকুরী খালি হইয়াছে। এম. এ.র দলে মহা-হুলুস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। দরখাস্ত বোধ হয় শ' এক দু' শ' জমিবে। আমি ত একখানা পাঠাইব, মনে করিয়াছি। কিন্তু বাজার যেরূপ, কেবল দরখাস্ত বা পারদর্শিতার জোরে আজ কাল আর কাজ হয় না। সুতরাং দুই এক জন বান্ধবের পরামর্শে একটু তৈলের ব্যবহারে মন দিলাম। আজিকার দেবতা বাবু ম— রায় এম্.এ., বি. এল্, হাইকোর্টের উকীল, স্কুলের সেক্রেটরী মহাশয় স্বয়ং।—তাঁহার সহিত হাইকোর্টে সাক্ষাৎ করিলাম। পরিচয়কারী আমাদের প—বাবু ও মু—বাবু। রায় মহাশয় বলিলেন, আমার তেমন হাত কি আছে? আমি কেবল দরখাস্তগুলি একত্রিত করিতেছি। দুই একটা কথার পর আবার বলিলেন, কি জানেন, আপনারা সকলেই পড়াইতে ভাল রকমই পারিবেন; কিন্তু আমার প্রয়োজন প্রধানতঃ এক জন ছাত্রশাসক। এখনকার ছেলেগুলা বড় দুষ্ট, আমাদের সময়ে এতটা কেন, এরূপ কিছুই ছিল না! কেউ গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকে। কেউ বা জানালা দিয়া পলায়। যিনি কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি যে মন্দ লোক, তাহা নহে, কিন্তু, "He is too good to be a head-master!"

১৩ই আষাঢ়। * * * কাল সকালে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তিনি হাবড়া ডিষ্ট্রীক্‌ট বোর্ডের মেম্বর, স্কুল-কমিটীর এক জন কর্ত্তা। আবার ম—বাবু বলিয়াছেন, তিনি এক জন দলের মধ্যে প্রধান। সুতরাং তাঁহাকে তৈলের ভাগ না দেওয়া ভাল দেখায় না। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে শ্রান্ত এবং পদদ্বয়ের অতিরিক্ত ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে প—বাবুর বাটীতে উপনীত হইলাম। কিন্তু বাবুজী আফিস হইতে এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। কি করি, মনের মানসটা এক টুক্‌রা কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া, মু—র বাটীতে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি ৯-১৫ হইল। বাবুর দেখা নাই। শরীরটা বড় অবসন্ন। মনে বড় ধিক্কার উপস্থিত হইল। হায়! আমাদের দুর্দ্দশার আর বাকী কি? সামান্য উদরান্নসংস্থানের নিমিত্ত এই

অবিনশ্বর মহান্ আত্মাটাকে কিরূপ চিন্তিত করিয়া তুলিতেছি। চাকুরীর উপর বিষম চটিয়া উঠিয়া, ঘরে আসিয়া আহার করিলাম। তার পর নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইলাম। চাকুরীর স্বপ্ন দেখি নাই।

১৪ই আষাঢ়। "ধ্রুবাণি"র উদ্দেশে আসিব বলিয়া যোগাড় করিতেছি, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, প—বাবু স্মরণ করিয়াছেন। স্ব—চন্দ্র সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, ন্যায়রত্নের কাছে কাপড় পরিয়া যাইও না। আমিও তাহা করিলাম না। তা' ব'লে উলঙ্গ হইয়া যাই নাই। একটা পেণ্টেলুন, একটা শার্ট, একটা চাপকান, ইত্যাদি। আরও অনেক রকম শ্রী-অঙ্গে ধারণ করিলাম। তা'র "নাহি লেখা যোখা।" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি চাকুরিটি খালি হইবার কথা শুনেন নাই। আমাকে সে স্থলে যাইতে নিষেধ করিলেন। কারণ, মেম্বর মহাশয়েরা, বিশেষতঃ সেক্রেটরী মহোদয় কোনও বিষয়েই প্রধান শিক্ষকের উপর নির্ভর করিতে চাহেন না। তাঁহার হাতে একটুমাত্র কর্ত্তৃত্ব থাকে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। অথচ Discipline ভাল হয় না বলিয়া আক্ষেপ করেন। যত দূর সম্ভব, হাত পা বাঁধিয়া রাখিব, অথচ তোমায় রীতিমত ঘোড়দৌড় করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমি নিরস্ত হইলাম না। টাকার লোভ এখনও ত্যাগ করিতে পারি নাই। তা'র উপর, আবার অভাব।—দারিদ্র্য।—

১৫ই আষাঢ়। এপ্রিল মাসের Calcutta Review পত্রে Two Russian Poets নামক প্রবন্ধের লেখক বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর কবিকুলের বিষাদময় জীবন ও অকালমৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, এই বিষাদব্যাধি কোনও বিশেষ দেশ বা পাত্রে নিবদ্ধ নহে। ইহা সর্ব্বত্র সংক্রামিত। ইংলণ্ডে শেলী, কিট্‌স, বায়রণ; ফ্রান্সে চিনিয়র, আলফ্রেড্ ডি মুসেট্; জর্ম্মনীতে হীন; ইতালিতে লিওপার্ডি; রুসিয়ায় পুশ্‌কিন্, লারমন্‌টফ্, কলট্‌সফ্;—ইহাঁদের সকলেরই জীবন এক অকারণ বিষাদজালে জড়িত। লেখক এই ব্যাধির কারণনির্দ্দেশে অগ্রসর হন নাই। তিনি বলেন, ইহার হেতু-নির্দ্দেশ নিতান্ত সহজও নহে। লেখকের কথা বড় মিথ্যা নহে। এই বিষাদ-ব্যাধি বঙ্গীয় কবিদিগের ভিতরেও আজ কাল প্রবেশ করিয়াছে। আমার বোধ হয়, কবিদিগের এই মর্ম্মগত অসুখের দুই একটা কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কবি-হৃদয় স্বভাবতঃ অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ও অনুভূতিময়। বর্ত্তমান কালে জীবন সংগ্রাম যে সকলেরই পক্ষে বড় কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে,

তাহাতে সন্দেহ নাই। হৃদয়ের আত্যন্তিক কোমলতাবশতঃ কবিরা এই যুদ্ধে তেমন তেজ ও সহিষ্ণুতার সহিত যুঝিতে পারিতেছেন না। দুর্ব্বলের বল রোদন; তাই অনেক প্রতিভাশালী মহাত্মার জীবন রোদনেই অবসিত হই-তেছে। তা ছাড়া, পরলোকের প্রতি বিশ্বাসের শিথিলতাও এই বিষম রোগের একটা কারণ। ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে আস্থা না থাকিলে দুঃখ দৈন্যে সংযম বা সহিষ্ণুতা জন্মে না। সুতরাং আমরা সকলেই অধীর, অসহিষ্ণু,—সকলেরই "দুর্ব্বহ জীবন"।

১৬ই আষাঢ়। কিছু দিন পূর্ব্বে "নব্যভারতে" "মুসলমান সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মনে করিয়াছিলাম, মুসলমানেরা সাহিত্য সম্বন্ধে নিতান্তই দরিদ্র। কিন্তু এপ্রিলের Calcutta Review পত্রে এ বিষয়ে এক প্রবন্ধ দেখিয়া সে ভাব কতকাংশে দূরীভূত হইল। "নব্যভারতের" প্রবন্ধ লেখক মুসলমান-সাহিত্যের দোষভাগ লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। এখন বুঝিতে পারিতেছি, মুসলমানদের মধ্যেও ভাল জিনিস আছে। তবে, মন্দের সহিত তুলনায় তাহা যে অতি সামান্য, তাহা এখনও স্বীকার করিতেছি। সুরা ও সুন্দরীর গুণগান করিতেই মুসলমান কবিকুল বিশেষ দক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, যিনি নিজে মদ্য স্পর্শ করিতেন না, তাঁহাকেও লোকরঞ্জনার্থ এই দুইটি পদার্থের শতমুখে প্রশংসা করিতে হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে কবি-সম্প্রদায়ের অপেক্ষা পাঠকসমাজের অধিক নিন্দা করিতে হয়। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, যিনি স্ববলে লোকের রুচি পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদের হৃদয় মনকে ঊর্দ্ধে, পবিত্রতার পুণ্যরাজ্যে উত্তোলিত করিতে পারেন, এমন অশেষপ্রতিভা-শালী মহাজন মুসলমান সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন নাই। যে দুই এক জন প্রতিভান্বিতের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদয় এত দুর্ব্বল যে, স্রোতের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করেন নাই; কেবল হাত পা গুটাইয়া ভাসিয়া গিয়াছেন।

১৭ই আষাঢ়। শরীরটা অকস্মাৎ অতি খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। * * * হঠাৎ এমন কেন হইল, বুঝিতে পারিলাম না। আহারের কোনও প্রকার অত্যাচার করি নাই। অত্যাচার করিবার অবকাশ বা সামর্থ্যও নাই। দেখিতেছি, দিন দিন দেহটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এ পর্য্যন্ত জীবনটা যেরূপে কাটিয়াছে, তাহাতে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়া কিছু বিস্ময়কর নহে। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া বড়ই দুঃখ হয়। আমি যে এত সহ্য করিতেছি, তাহার সুফল কি কিছু দেখিতে পাইব না? সংসারের সর্ব্বপ্রকার সুখের আশায়

বিসর্জন দিয়া ইদানীং এক প্রকার সন্ন্যাসীর ন্যায় কালযাপন করিতেছি। মনটাকে স্থির করিয়া এইরূপে যদি মৃত্যু পর্য্যন্ত কাটাইয়া যাইতে পারি, এখনকার তাহাই সুখ। কিন্তু, ইহাতেও ত নানা বিঘ্নের উৎপত্তি দেখিতেছি! ভগবান কি জন্য এই অধমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই জানেন। এই সামান্য জ্ঞানের ক্ষীণ প্রদীপটির সাহায্যে সে উদ্দেশ্য ত স্থির করিতে পারিলাম না। এখন কেবল ভাবি, আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে কোনও একটা অকিঞ্চিৎকর কিছুও কি করিয়া যাইতে পারিব না? এইরূপে অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া কর্ম্মের সন্ধান করিতে করিতেই কি জীবনটা অতিবাহিত হইয়া যাইবে? —প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম, প্রতি মাসের প্রারম্ভে এই তারিখহীন সাদা পৃষ্ঠাখানায় কি করিতে হইবে, বা কি করিবার ইচ্ছা হইতেছে, তাহারই সম্বন্ধে দুই একটা কথা লিখিয়া রাখিব। এখন দেখিতেছি, তাহাতে কোনও ফলই নাই। প্রতিজ্ঞা করা খুব সহজ; পালন করা ততটা অনায়াস-সাধ্য নহে। সুতরাং প্রতিজ্ঞার প্রথা ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন হইতে কালের স্রোতে আপনাকে সম্পূর্ণ ভাসাইয়া দিলাম। কোনও বিষয়ে সংকল্প আর কিছু করিব না। ঘটনাবশে যাহা ঘটিয়া উঠে, তাহার অতিরিক্ত এ জীবনে আর কিছুই হইবে না। আজ হইতে তাই

হে প্রকৃতি, প্রসূতি আমার,
তোমারই চরণ-তলে লইনু শরণ।

ভগবানের রাজ্যে কিছুই ত নিরর্থক বা উদ্দেশ্যহীন নহে। যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট বা পতঙ্গ জন্মিয়াই মরিল, তাহারও জন্ম-মরণে যে ঈশ্বরের কোনও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, এমন কথা আমরা নিতান্ত অজ্ঞ হইয়া কি প্রকারে বলিতে সাহস করি? এই বর্ষাকাল; ঝর্ ঝর্ শব্দে বৃষ্টিবিন্দুগুলি অত্যুচ্চ আকাশ হইতে মাটিতে আসিয়া পড়িতেছে, আর কোথায় গিয়া মিশাইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু এই অধঃপতন কি জগতের অসীম কল্যাণকর নহে? আমার যদি এইরূপ পতনও হয় ত বাঁচিয়া যাই।

১৮ই আষাঢ়। আষাঢ় মাসের সাহিত্যে বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "মাধুরী" নামক উপন্যাস শেষ হইয়াছে। শুনিয়াছি, দুই এক জন পাঠিকা "মাধুরী" পাঠ করিবার জন্য নাকি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িতেন। হরিদাস বাবু গল্পের শেষ করিয়া দিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন কি না, বলিতে পারি না। আমার কিন্তু গল্পটি আদৌ ভাল লাগে নাই। সমগ্র পুস্তক-

খানির মধ্যে কেবল তারাসুন্দরীর চরিত্রেই কতকটা ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের পূর্ব্বে প্রকাশিত উপন্যাস "রায় মহাশয়ে"র সহিত তুলনায় দাঁড়াইতেই পারে না। আমার বোধ হয়, হরিদাস বাবু আপনার শক্তির প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার যে একটু প্রতিভা আছে, তাহা, যিনি "রায় মহাশয়" পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে লেখক সে প্রতিভার অপব্যবহার করিয়াছেন। আদর্শ চিত্রের অঙ্কনে তাঁহার লেখনী তেমন সৌভাগ্যশালিনী নহে। মাধুরীতে তিনি আদর্শ আঁকিতে গিয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা বাস্তব-চরিত্র-বর্ণনে। মানবপ্রকৃতির নিকৃষ্টাংশ লইয়া তিনি যেরূপ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, মহত্ত্বের আদর্শ দেখাইতে গিয়া সেরূপ পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভার সে প্রকৃতিও নহে। তাই তাঁহার তারাসুন্দরী বা গোবর্দ্ধন খুড়ায় যে জীবন আছে, মাধুরী বা ভুবন বা অপর কাহাতেও তাহা নাই।

১৯শে আষাঢ়। শ্রীমতী হাম্‌ফ্রী ওয়ার্ড কর্ত্তৃক অনুবাদিত ফরাসী লেখক এমিয়েলের Journal In time নামক পুস্তক পাঠ করিতেছি। এমিয়েলের দিবসগুলা কি প্রকারে কাটিত,কখন কোন্ চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইত, এই জর্ণালে তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। অনুবাদিকার ভূমিকাপাঠে বুঝিলাম, এমিয়েল আপনার জীবনের উপযোগী প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সাক্ষাৎ না পাইয়া চিরদিন আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমতী ওয়ার্ড বলিতেছেন, তাঁহার আক্ষেপের কোনও কারণ নাই। এমিয়েল নিজে বুঝিতে পারুন, আর নাই পারুন, তাঁহার জীবন নিতান্ত বিফলে যায় নাই। তিনি যে ডায়েরী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট লোক-হিতসাধন হইয়াছে, এবং তিনিও সাহিত্য-জগতে আপনাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। এমিয়েলের অবস্থার সহিত এই অধম সাহিত্যসেবীর কতকটা সাদৃশ্য অনুভূত হইল। আমার এই অসম্বদ্ধ ছাই-গুলাও যে কখনও কাহারও আদরণীয় হইতে পারে, সে চিন্তাও যে দুই একবার মনের ভিতর উদয় না হইল, এমন নয়। কিন্তু আমি বোধ হয় এখনও এত দূর বুদ্ধিহীন ও আত্মপ্রতারিত হই নাই যে, সেই আশায় আপনাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারিব।

২০শে আষাঢ়। সভ্যতা ও জ্ঞানের বৃদ্ধিসহকারে বিশ্বাসের কঠোরতা কমিয়া যাইতেছে। পিতৃপিতামহগণের অপেক্ষা আমরা কোনও কোনও বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু জ্ঞান যেখানে পঁহুছিতে

পারে না, মানুষের প্রতিভাপ্রদীপ সেখানে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেই চিররহস্য-ময় গভীরতম প্রদেশের উপর প্রাচীনদিগের যে সরল স্বাভাবিক একটা বিশ্বাস ছিল, সেই অমূল্য পদার্থ আমরা যে হারাইয়া ফেলিয়াছি। জ্ঞানোন্নতির সহিত মানবের সুখ-শান্তির বৃদ্ধি না হইলে, সে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা ত বুঝিতে পারি না। কর্ত্তব্যে অপরাঙ্মুখতা ও হৃদয়ে শান্তি, ইহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারের ভিতরে থাকিয়াও যদি সেই দুর্লভ শান্তিসুখ লাভ করিতে পারা যায়, তাহাও সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। আমি জ্ঞানের নিন্দা করিতেছি না। বিশুদ্ধ জ্ঞানালোচনায় যে কখনও কিছু-মাত্র শান্তিলাভ করা যায় না, তাহাও বলিতেছি না। বরং জ্ঞান ও বিশ্বাসের যিনি সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার জীবনকেই আদর্শ বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু তাহা যে আজকালকার অধিকাংশ লোকের পক্ষেই অসম্ভব। তাই আমাদের জীবন এত বিষাদভাবাক্রান্ত। "Great God ! I would rather be a pagan in a creed out worn."

২১শে আষাঢ়। হায়! যাঁহারা অতিরিক্ত Sentimental বলিয়া আমায় নিন্দা করেন, তাঁহারা কি দেখিতে পান না যে, আমার এই শ্মশানসম হৃদয়ে ভাবের উৎস একবারে শুকাইয়া গিয়াছে? ভাবপ্রবণতার নিমিত্ত শত তিরস্কার সহিতে প্রস্তুত আছি;—কিন্তু, হায়! আমার সেই প্রাণসম প্রাণের উচ্ছ্বাস কোথায় গেল! কবি-হৃদয়ে কল্পনার প্রথম প্রবেশবৎ, সন্ধ্যা-সমাগমে রজনীগন্ধার শ্বেতাধরে যত্নোপভোগ্য প্রথম সুবাসবৎ, ধীরে ধীরে অলক্ষিতে চিন্তা-সখীর সেই লজ্জানম্র পদক্ষেপ কোথায় গেল? তার পর, দেখিতে দেখিতে ভাব-মন্দাকিনীর সেই মহান্ জলোচ্ছ্বাস,হৃদয়-মনের উভয় কূল বিপ্লাবিত করিয়া সেই সাধের তরঙ্গোৎক্ষেপ, সেই অভ্যঙ্গনিমজ্জন, সেই জগৎসংসার-বিস্মরণ, সেই অনির্ব্বচনীয় সুখস্পন্দন,—সে সকলই গিয়াছে! ক্ষয়িতমূল অন্তঃসারশূন্য এই দেহতরু যে কি লইয়া আজও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। সে পূর্ণিমা নাই, সে শশাঙ্ক নাই, সে অগণিত নক্ষত্রের "বাসর" নাই, শূন্যগর্ভ আকাশচক্র কেবল রাশি রাশি অন্ধকার ক্রোড়ে লইয়া মাথার উপর স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। হায়! আমি আজীবন ভাবের ব্যবসায়ী, ভাবের ভিখারী; আমার সেই জীবনাধিক ভাবের ভাণ্ডার কে কাড়িয়া লইল? আমি অন্য ধনের অভিলাষী নহি; কুবেরের রত্নাগারতুল্য আমার সেই কল্পনা-ধনের আগার কে লুণ্ঠন

করিয়া লইল? হা ভগবান! এই দরিদ্রাধিকের দারিদ্র্য কেমন করিয়া ঘুচাইব?

২২শে আষাঢ়। পুণ্যময় ভাবময় আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এমিয়েলের কি অসীম আগ্রহই ছিল! তিনি এক স্থলে বলিতেছেন,—

"Be man, that is to say, be nature, be spirit, be the image of God, be what is greatest, most beautiful, most lofty in all the spheres of being, be infinite will and idea, a reproduction of the great whole. And be everything while being nothing, effacing thyself, letting God enter into thee as the air enters an empty space, reducing the age to the mere vessel which contains the divine essence." কল্পনা অতি সুন্দর, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ উপায়ে কি তপস্যা করিলে অভীপ্সিত অবস্থায় আপনাকে উত্তোলিত করা যাইতে পারে, মানুষ এ পর্য্যন্ত তাহা ত আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না। হিন্দু যোগীর অবলম্বিত প্রণালীর পরীক্ষা কখনও করি নাই; সুতরাং তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। আর, যোগমার্গে উপরি-উক্ত পুণ্যাবস্থা লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহা কত দূর বাঞ্ছনীয়, বলা যায় না। এই জগৎ, এই সমাজ, এই আমার আত্মীয় স্বজন, এই আমার মাতৃরূপিণী মাতৃভূমি;—ইহাদের ন্যায় সুন্দর কি আছে? যদি এমন কোনও যোগ থাকে, যাহার সাধনার্থ এই সকলের পরিহার প্রয়োজনীয় নহে, আমি তাহাতে আপত্তি করি না। আমি প্রেম চাই, পবিত্রতা চাই, পাপের বন্ধন একবারে ছেদন করিতে চাই, জগতের সুখে হাসিতে চাই, আর দুঃখ যদি একান্তই অপরিহার্য্য হয়, তবে স্বজনের স্বদেশবাসীর গলা জড়াইয়া কাঁদিতেও চাই। আমার অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা "The true poetry is that which raises you towards heaven, and fills you with divine emotion; which sings of love and death, of hope and sacrifice, and awakens the sense of the infinite"—Henri Frederic Amial.

২৩শে আষাঢ়। বহুদিন হইল, একটা "বসন্তের বোধন" লিখিয়াছিলাম; এখন আর সে দিন নাই, এখন একটা "বর্ষার বোধন" লিখিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু একটা বড় অসুবিধা অনুভূত হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায়, ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন হইলেই ভাষা আর আপনি ছুটিয়া আইসে না। এখন যেন তাহাকে

অন্বেষণ করিয়া ধরিয়া আনিতে হয়। কথা যে একবারে যোগায় না, এমন নহে; কিন্তু যাহা না ডাকিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রাণের তৃপ্তি হয় না। কারণ, কবিতায় যেরূপ ভাষার প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করি, যদৃচ্ছালব্ধ বাক্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় না। সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে আমি কবিবর ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের প্রথার পক্ষপাতী ছিলাম। যে ভাষায় আমরা সচরাচর কথোপকথন করিয়া থাকি, কবিতা সম্বন্ধেও তাহাই অবলম্বনীয়, এইরূপ ভাবিতাম। কিন্তু সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, কবিতার ভাবের ন্যায় ভাষার ভিতরেও একটা উচ্চ অঙ্গের গাম্ভীর্য্য থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। উহা নহিলে কবিতা প্রাণহীন হইয়া পড়ে। সরল সহজ কথার ভিতর যে গাম্ভীর্য্য থাকিতে পারে না, এমন নহে। কিন্তু তাহা সকল বিষয়ের উপযোগী নহে। সুতরাং শব্দ-নির্ব্বাচন করিয়া কবিতায় বসাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তবে কাব্য-সাহিত্যে আমি শিক্ষানবিশমাত্র, হয় ত অভ্যাসবশে একটু দক্ষতা লাভ করিতে পারিব

২৪শে আষাঢ়। দুই সপ্তাহের পর আজ সু—চন্দ্রের সাহিত্য-গৃহে উপস্থিত হইলাম। কথাবার্ত্তা বেশী কিছু না হওয়াতে তাদৃশ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। প্রিয় সোমরাজকে দেখিলাম না। রাত্রি ৮—৩০ পর্য্যন্ত কেবল সু—র চিরসঙ্গী তাস খেলায় অতিবাহিত হইয়া গেল। রা—র সহিত কিরূপ ভাব যাইতেছে, দাম্পত্য-প্রেমটা কত দূর অগ্রসর হইল, জিজ্ঞাসা করিবার বড়ই সাধ ছিল; কিন্তু অবকাশ পাইলাম না। প্রিয়বন্ধু ন—বাবুর দেখা নাই। শুনিলাম, ইতিপূর্ব্বে একদিন আসিয়াছিলেন। মুখোমুখী না হইলে তাঁহার হৃদয়-রাজ্যের নূতন খবর পাইবার আর উপায় নাই। উৎসাহের অবতার ম—নাথ আসিয়াছেন; সহোদরার জন্য এক জন জীবনের সঙ্গী খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং বেচারীর অবস্থাটা বড়ই বিষম বলিতে হইবে। ন—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তিনি কি করিতেছেন বা করিবেন, অথবা কিছু করিবেন কি না, তাহার কোনও সংবাদ পাইলাম না। হাবড়ায় যে নূতন কাজটার জন্য চেষ্টা হইতেছে, উ—নাথ মজুমদার মহাশয় অনুরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তৎপক্ষে একটু সাহায্য করিয়াছেন, শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। আর আমাদের প—বাবুর ত কথাই নাই। বন্ধু-প্রীতি তাঁহার ন্যায় বড় বেশী লোকের দেখা যায় না। তাঁহার অনুগ্রহের নিমিত্ত মনে মনে ধন্যবাদ দিতেছি

২৬শে আষাঢ়। কাল প্রভাতে প—বাবুর সহিত হাবড়ার মুসলমান ডেপুট আ—কা—সাহেবের নিকট নূতন চাকুরীটার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলাম। ডিপুটি-সাহেবটিকে বিশেষ ভদ্র বলিয়া মনে হইল। সাহেব স্নানে যাইতেছিলেন; আমাদের চিঠি পাইয়াই গোসলখানার কাজটা বন্ধ করিয়া প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা কাল নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় আপ্যায়িত করিলেন। কথোপকথন যা' কিছু আমার সহচর বাবুজীর সহিত হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। আমি নিতান্ত নিরীহ শ্রোতার ন্যায় বসিয়া বসিয়া মাঝে মাঝে বাহবা দিতে লাগিলাম। কাজের বিষয়ে বড় বেশী কিছু হইল না। সাহেব বলিলেন, (অবশ্য আমার বন্ধুটিকে উল্লেখ করিয়া) "আপনার কোনও উপকার করিতে পারিলে, আমি নিজের ভাইয়ের প্রতি একটা কর্ত্তব্য পালন করিলাম বলিয়া মনে করিব। কিন্তু আমি এখানে নূতন আসিয়াছি। উপস্থিত বিষয়ে অধিকাংশের মতেই আমাকে সায় দিতে হইবে।" কাজের কথা এই পর্য্যন্ত। এখন ডিপুটী সাহেবের অপূর্ব্ব অশ্বারোহণ-পটুতার একটা পরিচয় এইখানে লিখিয়া রাখিলাম। কা—সাহেব বলিলেন, তিনি দশ বারো ঘণ্টার মধ্যে পঁয়ষট্টি মাইল পথ ঘোড়ার সাহায্যে অতিক্রম করিয়াছেন। টুপীর ভিতর দিয়া বায়ু চলাচল করিতে পারে, সাহেব তাহার এক অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি ঘোড়া ছুটাইয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে এক জন ভৃত্য যেন তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে চলিয়াছে। সুতরাং তাঁহার শরীর উষ্ণ হইতে পায় নাই।

২৭শে আষাঢ়। যাহাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে; জীবনের উদ্দেশ্য নাই, অথচ জীবন রহিয়াছে; কর্ত্তব্যের ঠিকানা নাই, কিন্তু কর্ত্তব্য-পরিপালনের আন্তরিক আগ্রহ রহিয়াছে, তাহাদের অবস্থা কি শোচনীয়! জীবন-যুদ্ধে যাহার উপর নির্ভর করিতেছি, তাহাই বাষ্পের ন্যায় বায়ুমণ্ডলে মিশাইয়া যাইতেছে; কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। সংসারের প্রতি তেমন যে কোনও একটা আসক্তি আছে, তাহাও নহে; অথচ রীতিমত বৈরাগ্যের ভাবটাও জাগিয়া উঠিতেছে না। বাঁচিবার সাধ সম্পূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু কেন বাঁচিতে চাই, তাহাই বুঝিতে পারি না। দুর্দ্দশাটা বড় সামান্য নহে। প্রাণের ভিতর চাহিয়া এখন কেবল দুইটিমাত্র আকর্ষণের পরিচয় পাই। যে অসহায় শিশুটি আমার অতীতের বন্ধনরূপে জীবনে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে কোনও প্রকারে কি বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব না? দ্বিতীয় বন্ধন, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা। সে

জননীর স্তন-সুধা পান করিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি, তাঁহার ঋণ কি পরিশোধ করিয়া যাইতে পারিব না? আমি ক্ষীণশক্তি,নিতান্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি। অধিক কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করি না। কেবল, আমি যে এই সহস্র-সন্তান পরিসেবিতা জননীর নিতান্ত কুপুত্র নহি, তাহারই পরিচয় দিয়া যাইতে চাই। হে বিশ্বাধিপ! আমার অন্তর্জগতের এই দুই ক্ষুদ্র কামনা কি পূর্ণ করিবে না?

২৮শে আষাঢ়। সমালোচকের আবশ্যক গুণ সম্বন্ধে এমিয়েল্ তাঁহার জর্নালের এক স্থলে বলিয়াছেন,—"The faculty of intellectual *metamorphosis* is the first and indispensable faculty of the critic; without it he is not apt at understanding other minds and ought, therfore,if he loves truth,to hold his peace,the conscientious eritic must first criticise himself; what we do not understand we have not the right to judge,"—বাস্তবিক লেখকের যে ভাবাবস্থায় যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, আপনাকে কতকটা ঠিক সেই অবস্থাপন্ন করিতে না পারিলে কোনও গ্রন্থেরই প্রকৃত মর্ম্মগ্রহ বা রহস্যোদ্ভেদ হইতে পারে না। আর, কোনও পুস্তকের আভ্যন্তরিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, তাহার প্রকৃত সমালোচনাও অসম্ভব। বাঙ্গালার বর্ত্তমান পত্র-সম্পাদকদিগের মধ্যে অধিকাংশের বিদ্যাবুদ্ধি যে প্রকার, কাব্যের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে তাঁহাদের যেরূপ বিচিত্র ক্ষমতা, তাহাতে তাঁহাদের কাহাকেও সমালোচন-রূপ গুরুতর কর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালা-সাহিত্যে 'কবি'র ন্যায় 'সম্পাদক' কথাটাও ক্রমশঃ একটা গালাগালির সামিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। সচরাচর দেখা যায়, যাঁহারা অপর কোনও উপায়ে আপনাদের জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারেন না, প্রায়শঃ তাঁহারাই এক একখানা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক বা মাসিক বাহির করিয়া তাহার সম্পাদক হইয়া বসেন। সাহিত্য-রাজ্যের সকল বিভাগেই যে একটা কঠোর সাধনার প্রয়োজন, ইহা অনেকেই সম্যক বিবেচনা করিয়া দেখেন না।

২৯শে আষাঢ়। পঞ্চুরামের অসুখ দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার জন্য মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আর সে প্রফুল্লতা নাই। * * * মহরম উপলক্ষে আজ স্কুল বন্ধ হইবে। তিন দিবস অবকাশ পাইতেছি, কলিকাতায় যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছি। এইবার একটু যত্নসহকারে সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিব,যদি শিশুটির অসুখের কারণটা ধরিতে পারি

৩০শে আষাঢ়। বন্ধুবর হী—বাবুর সহিত সাক্ষাৎ। ফুল্‌তার অবতার ম—নাথ সঙ্গে ছিলেন। দেখিলাম, হী—নাথ তাঁহার সহকারীর সহিত Relief Societyর বাৎসরিক বিবরণীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছেন। ম—নাথও বাঁকিপুরের নূতনস্থাপিত খোলা ভাঁটীর বিরুদ্ধে একটা কি আবেদন না কি লইয়া বসিয়া গেলেন। আমি নিরুপায় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। দেখিতে দেখিতে বাবুদের রাজনৈতিক ব্যাপারগুলা সাঙ্গ হইয়া আসিল। তখন বিস্রম্ভালাপ আরম্ভ হইল। ম— "উদাসিনী" নামক কি একখানা কাব্যের কথা পাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা তাহা পাঠ করিয়াছি কি না? আমার কিন্তু "উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা" ছাড়া আর কোনও পুস্তকের নাম পর্য্যন্ত মনে আসিল না। সুতরাং বন্ধুকে আপ্যায়িত করিতে পারিলাম না। তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন; নিকটেই একটা লাইব্রেরী ছিল, সেখানে খবর পাঠাইলেন। বড়ই আক্ষেপের কথা, তাঁহারাও "Not in stock" বলিয়া জবাব পাঠাইলেন। তখন ম—নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া, যে দুই চারিটা বুলি তাঁহার স্মরণ ছিল, তাহাই আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় কাব্যপ্রিয় লোক সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু তাঁহার রুচি বা সৌন্দর্য্যানুভাবকতার সর্ব্বদা প্রশংসা করিতে পারি না। তিনি অনেক সময়ে বড় অন্যায় তর্ক আরম্ভ করেন।

৩১শে আষাঢ়। কবিবর * * * আসিয়াছেন। আজ সমস্ত দিবস তাঁহারই লীলাখেলা দেখিয়া কাটাইলাম। সু—চন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি, * * কবিকে ভৃত্যে তৈল ম্রক্ষণ করাইতেছে। আমি ভদ্রতার খাতিরে একটা সম্ভাষণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু সেটা বোধ হয় কবিবরের কানে পঁহুছিল না। তিনি গোসলখানায় নামিয়া গেলেন। আহারান্তে একটা বড় মজা হইয়া গেল। আমার হাতে "নব্যভারত" একখানা দেখিয়া কবিবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহাশয়, নব্যভারতের বিজ্ঞাপন পড়িতেছেন না কি?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে না; কাব্যকুসুমাঞ্জলি সম্বন্ধে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মনোযোগের সহিত ভাল করিয়া পাঠ করিতেছি।" সু—চন্দ্র অমনি "A noble revenge!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কবিবরের মুখখানা মলিন হইয়া উঠিল। আমিও কতকটা অপ্রতিভ হইলাম। তার পর কবিবর অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়া Bengal Academyতে বিরাজ করিতে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর আবার হী—র গৃহে মিলিত হইলাম। এখানে কবিবর আমার প্রতি অকস্মাৎ একটু অনুগ্রহ দেখাইয়া ফেলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি একাডেমীতে গেলেন না?" কবিবরের এরূপ হঠাৎ অনুগ্রহের কারণ বুঝিলাম না। "—"র কোনও প্রশংসা আমার মুখ দিয়া আজ বাহির হয় নাই। সুতরাং ব্যাপারখানা রহস্যে আবৃত রহিয়া গেল।

৩২শে আষাঢ়। "জন্মভূমি" পত্রিকায় প্রকাশিত ব—কবির "আবাহন" না "আহ্বান" নামক কবিতা সম্বন্ধে সু—চন্দ্র সাহিত্যে যে মত বাহির করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া ব—মহাশয়ের প্রাণে বিষম আঘাত লাগিয়াছে, বোধ হয়। তিনি আজ একটা সনেট লিখিয়া সাহিত্যের সম্পাদককে উপহার দিলেন। তাহাতে সাহিত্য-সম্পাদককে বায়স, ব্যাঙ, পেচক, কুক্কুর প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্ট নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ব—মহাশয়ের বুদ্ধির বিকার দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। সু—চন্দ্রের মনের ভিতর কি হইল, বলিতে পারি না; মুখে কিন্তু সনেটটির প্রশংসা করিয়া সাহিত্যে প্রকাশিত করিতে চাহিলেন। ব—কবি তাহাতে তেমন আপত্তি করিলেন না। ইহাতে আরও বিস্মিত হইলাম। * * * তাই আমি ব—কে বন্ধুভাবে উহা প্রকাশিত করিতে নিষেধ করিলাম। কথা শুনিবেন কি না, বলিতে পারি না। হী—নাথ ব—মহাশয় সম্বন্ধে একবার যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ বিলক্ষণ সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। "ব—কবির ক্ষমতা বড় বেশী নহে। তিনি বুড়ো আঙ্গুলে ভর করিয়া বড় হইতে চান।" ব—বলেন, "সু— কিছু অতিরিক্ত দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছে; তাই তিনি এই সনেট লিখিয়া তাহাকে শিক্ষা দিলেন।" কিন্তু, তিনি যাহা লিখিবেন, তাহাই যে কবিতাপদবাচ্য হইতে পারে না, এ বিষয়ে তাঁহার নিজের একটা শিক্ষা আবশ্যক।

১লা শ্রাবণ। * * * হৃদয়টা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হায়! আমার অদৃষ্ট কি ভয়ানক! প্রতি মুহূর্ত্ত কেবল ভয়ে ভয়ে কাটাইতেছি। কখন কি হয়, কিছুরই স্থিরতা নাই। সেই ভয় আজ অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। শিশুটি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? তাহার জন্য আমি যে প্রাণ পণ করিয়াছি। আমার জীবনের অপর কোনও উদ্দেশ্য নাই। সমস্ত আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রাণাধিক বালকটিকে কি ভগবান আমার ভাগ্যে স্থায়ী করিবেন না? আমার অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের সান্ত্বনা, ভবিষ্যতের একমাত্র আশা, তাহাও কি বিসর্জ্জন দিতে হইবে? হা ঈশ্বর, আমি যে নিতান্ত অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতেছি; আমার এ কি দুর্দ্দশা উপস্থিত করিলে?

জগৎজীবনের মনসার গীত

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের রচনা দেশভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে। জগৎজীবন কোন দেশের লোক, তাহা জানা যায় নাই। কবির সম্বন্ধে এইমাত্র জানিতে পারি,—

(ক) বীর নারায়ণ নাম লক্ষ্মীনাথ অনুপাম তার সুত প্রাণনারায়ণ
তার দেশে প্রাণ রায় তাহার নন্দন গায় দ্বিজ কবি জগৎজীবন।

এই কবিতাপাঠে জানা যায়, জগৎজীবন বীরনারায়ণের পুত্র প্রাণনারায়ণের দেশে বাস করিতেন। তাঁহার পিতার নাম প্রাণ রায়। প্রাণনারায়ণ কোন্ দেশের রাজা ছিলেন?

(খ) খোসান ব্রাহ্মণের বাড়ী মহারাজ নারায়ণের দেশে
জগৎজীবন গায় বন্দিয়া পদ্মার পায় পুরাণ করিল অবশেষে।

এই কবিতাপাঠে জানা যায়, জগৎজীবনের বাড়ী খোসান কি খোসাল গ্রামে ছিল।

(গ) চতুর্ভুজ রূপ রায় * সর্ব্ব শাস্ত্রে গুণ গায় অজানন্দ ‡ দ্বিজের নন্দন,
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার শিশু অনুপাম বিরচিল জগৎজীবন।

(ঘ) চিত্রবুদ্ধি রূপ রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে গুণ গায় জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন,
তার পুত্র ঘনেশ্যাম তার পুত্র অনুপাম বিরচিল জগতজীবন।

অন্য গ্রন্থে দেখিলাম, জয়ানন্দই বটে। "তার পুত্র" স্থানে "তার শিষ্য" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইল।

পরিচয়ে গোল বাধিল। অজানন্দ কি জয়ানন্দের পুত্র? চতুর্ভুজ রূপ রায় কি চিত্রবুদ্ধি রূপরায়? তার পুত্র অনুপাম না ঘনেশ্যাম? ইঁহাদের সঙ্গে জগৎজীবনের সম্পর্ক কি? প্রাণ রায় ইঁহাদের কে হইতেন?

আমার বোধ হয়, কবি রাজসাহী জেলার লোক। কবির পত্নীর নাম পদ্মমুখী ছিল। গ্রন্থান্তরে দেখিলাম, খোসান ব্রাহ্মণের বাড়ী কুড়িয়ামোড়াতে, রাজা প্রাণনারায়ণের দেশে। তাহা হইলে কবির বাড়ী কুড়িয়ামোড়া। খোসাল ব্রাহ্মণবাড়ীতে কাহার নিবাস ছিল?

---

* গ্রন্থান্তরে দেখিলাম, চতুবর্বুদ্ধি রূপ রায়।

‡ জয়ানন্দ।

কবির পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত,—দেব খণ্ড, বানিয়া খণ্ড। দেব খণ্ডের রচনা নারায়ণ দেবের রচনার ন্যায় সুন্দর নয়। বানিয়া খণ্ডের রচনা অতি উৎকৃষ্ট। কবি এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন,—

"শ্রীরামায় নমঃ। শ্রীগণেশায় নমঃ। সর্প সর্প ভদ্রন্তে গচ্ছ সর্প বনান্তরে। জন্মেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তিকবচনং স্মরন্। আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা। জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসা দেবী নমোঽস্তু তে।

অখিলে কৃষ্ণের নাম না ভজিলে হেলায়। ধুয়া॥

সেই হরি বিলাসিতে বসুধা কৈলা বাস।
নররূপে বসুদেব সুত হৃষীকেশ॥
সকলের গতি পতি অকিঞ্চন ধারা।
গোকুলেতে রাধাকৃষ্ণ করিল পসরা॥
বন্দো সরস্বতী দেবী বাক্যস্বরূপিণী।
লক্ষ্মীর চরণ বন্দো বিষ্ণুর ঘরণী॥
হংসরথে ব্রহ্মা বন্দো গজে পুরন্দর।
সপ্তঋষি বন্দিব নারদ কামচর॥
বন্দিব সাগরশায়ী যাদ্যজোন থির। (?)
ছাগলে অগ্নি বন্দো হরিণে গম্ভীর। (?)
অষ্ট দিকের বন্দো দুই অষ্ট দিকপতি।
বন্দিব গণেশ গঙ্গা সিংহে ভগবতী॥
বন্দিব বিনয় করি দুর্গা গণনাথ।
ভক্তি করি বন্দিব আমি গুরুর ঘরণী॥
গুরু-গুরু বন্দিব আর গুরু-মাও।
দীক্ষা-শিক্ষা-গুরু বন্দো গুণিজনার পাও॥
গুরুগণসাগরে করিব বন্দিত। (?)
হস্ততালে শিখাইল মনসার গীত।
বন্দিব সভার মধ্যে গুণিমুনিজন।
জয়া জরা শিশু (?) বন্দো ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
এতেক বন্দিতে যে গায়নে চড়ায় ঘাও।

* * * *

জগৎজীবন গায় মনসার দাস।
পদচ্ছন্দে পাঁচালী করিল পরকাশ॥"

জগৎজীবনের পরবর্ত্তী রচনার সঙ্গে তুলনা করিলে, প্রথমাংশ তাঁহার লেখনী-

নিঃসৃত বলিয়া বোধ হয় না। কবি বলিয়াছেন,—গৌড়নগরে বিক্রমকেশরী নামক রাজা যে সময়ে রাজত্ব করিতেন, তৎকালে তাঁহার রাজ্যের অন্তঃপাতী চম্পাই (নানা স্থানে চম্পানী নাম আছে) নগরে কোটীশ্বর নামে ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করিতেন। চন্দ্রপতি কোটীশ্বরের পুত্র। ইনিই বিখ্যাত চাঁদ সদাগর। মালদহ জেলার চম্পাই নামক গ্রাম, এ জেলার লোকের বিশ্বাস, চাঁপাইনগর। চাঁপাইয়ের নিকট বেহুলানাম্নী নদী আছে। এ জেলায় নেতো ধোপানীর পাটও নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট সামুয়েল সাহেবের বিশ্বাস ছিল, যে মূল ঘটনা লইয়া বেহুলার সুবৃহৎ মনোরম উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মালদহ জেলার গৌড় নগরের নিকটে ঘটিয়াছিল। অসম্ভব নয়। এ দেশে জনপ্রবাদ আছে, বেহুলা ভাসিতে ভাসিতে যখন মালদহের নিকট দিয়া যাইতে-ছিলেন, তখন মালদহের স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করিয়াছিল; তাহাতে সতী বেহুলা অভিসম্পাত দেন যে, তোমাদের দেশে বিধবা অধিক হইবে। মালদহে বিধবার সংখ্যা অধিক বটে। কবি তর্ত্তিপুরের নিকট গঙ্গা দিয়া বেহুলার মান্দাস ভাসা-ইয়া লইয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রাচীন কবি স্বপ্নে দেবতার নিকট আদেশ পাইয়া কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। জগৎজীবনও স্বপ্নে আদেশ পাইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বেহুলার উপাখ্যান কত দূর ঐতিহাসিক, তাহা বুঝিতে পারি না; কিন্তু উহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন অনেক আচার ব্যবহার জানিতে পারা যায়।

এই গ্রন্থে নখিন্দরের রূপ দেখিয়া যুবতীগণের স্বামি নিন্দার বর্ণনা আছে। বিবাহ-বাসরে বরের রূপ দেখিয়া যুবতীগণের স্বামি-নিন্দা অনেক কাব্যেই আছে। কোন্ কবি ইহার প্রথম রচয়িতা, তাহা জানি না। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের ঐরূপ বর্ণনা আছে। নখিন্দরের লোহার ঘরের চিত্র পাঠ করিয়া কবিকঙ্কণের রচিত বিশ্বকর্ম্মার ভগবতীর কাঁচলিনির্ম্মাণের বিষয় মনে পড়ে। কবির রচনা দুই এক স্থান হইতে উদ্ধৃত হইল।—

চান্দো বোলে শুন নেতা বচন আমার।
যত সব দ্রব্য তোলো ডিঙ্গার উপর॥
ঘৃত মধু চিনি কলা নাড়ু গঙ্গাজল।
* * * * *
এতেক শুনিয়া নেতা সত্বর গমনে।
ভাণ্ডারে প্রবেশি তোলে যত সব ধনে॥

নানা দ্রব্য তোলে নেড়া ডিঙ্গার উপর ।
ঘৃত মধু চিনি কলা নাড়ু গঙ্গাজল ॥
মিঠা নারিকেল তোলে বদলের সাজ ।
পাটনে যাইবে বেদে বানিয়ার রাজ ॥
চান্দো বোলে নেঙ্গা মন্ত্রী শুন মোর বাণী ।
ডিঙ্গাতে চাপাও ভাই নানা দ্রব্য আনি ॥
চক্ষে যত দেখ তাহা ডিঙ্গাতে চাপাও ।
ঘরে পরে কিবা চাহিতে যত পাও ॥
চান্দোর আজ্ঞাতে নেঙ্গা শীঘ্রগতি যায় ।
নানা দ্রব্য আনি নেঙ্গা সত্বরে চাপায় ॥
প্রথমে তুলিল মাত্র চাউল তৈল লোণ ।
খাইবার কারণে নয় লক্ষ চারি যোণ ॥
তার পর তুলিল ডিঙ্গাতে মিষ্ট জল ।
ছয় মাস খায় যেন যত পরদল ॥
কাচা হরিদ্রা তোলে পুরাণ শুকুতা ।
পাটনে বদল করিব প্রবাল মুকুতা ॥
মাষকলাই আদার শুটি আর তোল জিরা ।
মরীচ লবঙ্গ তোল বদলাব হীরা ॥
করোয়া সান্কী সেই লক্ষ তিন চারি ।
বদল করিব সোবর্ণ থাল ঝারি ॥
নারিকেল তাল বেল কাঁঠাল আম্র ।
সেহি সব ফল তোল আছে বড় কর্ম্ম
দশ শঙ্খ বদলাব এক নারিকেলে ।
তেজপত্র নিব এহি তালের বদলে ॥
সোনের ঘড়া নিব কাঁঠাল বদলে ।
আম্র বদলে নিব অমৃতের ফল ॥
পাট মেখল আর খোকড়ার সাড়ি ।
যত্ন করিয়া আন পুরাণ খোকড়ি ॥
নানা রঙ্গে তুলিলেক করিয়া যতন ।
খোকড়ের বদলে পাব পাটের বসন ॥
যোল লক্ষ চারি সেই কদলীর ক্ষার ।
এক ভার বদলে নিব সোণ শত ভার ॥
জায়ফল দিবা দিয়া হর্ত্তকী আর জাম ।
তাবাক বদলে নিবো সাড়ী শুয়া নাম ॥

চামর বদলে নিব দিঞা পাঠশণ।
ভাঙ্গিয়া আসিব দেশ দক্ষিণ পাটন॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরিয়া সাধুকে দিল জান।
ভাণ্ডারী কাণ্ডারী সব হৈল সাবধান॥

পাঠক! দেখিবেন, সে কালের বাণিয়ারা কিরূপ ঠগ ছিল।

প্রাণ তেজিল গন্ধবাণিয়ার নন্দন।
নিদ্রা ভাঙ্গি বিদ্যাধরী পাইল চেতন॥
স্বামীর চরণ বামা হাত দিঞা চায়।
দেখে অচেতন তনু পাথর মিশায়॥
প্রদীপ জ্বালিয়া বালী বদন নেহালে।
নিশ্চয় জানিলে প্রভু নাগিনী খাইলে॥
চোখ আছে মুখ আছে প্রভু মোর মৈল।
সোবর্ণ পঞ্জর আছে সুয়া উড়ি গেল॥
এখনি খাইলাম প্রভু এক বাটার গুয়া।
কে মোর হরিয়া নিল পঞ্জরের সুয়া॥
হায় হায় করে বালী গালে থায় চড়।
মূর্চ্ছা হৈঞা পড়ে বালী ভূমির উপর॥
স্বামীর চরণ ধরি কান্দে বাণিয়ানী।
সুমেরু উপরে যেন চক্ষে পড়ে পাণি॥
আকুল হৃদয়ে বালী কান্দে উচ্চস্বরে।
জগৎজীবন গায় মনসার বরে॥
কে মোর মারিল স্বামী মোহন মুরতি।
অন্ধকার হৈল যেন পুরী চম্পাবতী॥
কাষ্ঠের সদৃশ তনু সুকোমল অঙ্গ।
কাল বরণ হৈল প্রভু সুবর্ণের বর্ণ॥
কার কিছু হিংসা না করিনু এ বয়সে।
বিনি দোষে স্বামী মোর গেল কর্ম্মদোষে॥
কার আমি কাড়িঞা লইলাম ঘরবাড়ী।
কার সাপে বিবাহের রাত্রে হৈলাও রাড়ী॥
কার আমি কাড়িঞা লইলাম মুখের গ্রাস।
সেহি মোকে গালি দিল হৈতে নৈরাশ॥
কার বা কাড়িঞা খাইনু এক বাটার পান।
সেহি কাড়িঞা নৈল প্রাণের পরাণ॥

কার ঘা কাটিঞা খাইনু কোছার গুয়া।
পড়ি আছে পঞ্জর উড়ি গেল সুয়া॥
উচ্চ নহে কপাল বদন নহে খোল।
চিরণ দন্ত খড়ম পা কিছু নহে মোর॥
নহে গজস্কন্ধ মোর নহে দীঘল কেশ।
বিধবা লক্ষণ মোর কিছু নহে লেশ॥
কে মোর করিল চুরি আচলের সোণা।
চিহ্নিঞা ধরিব কারে চোর কোন জনা॥
অনাথ করিলে নাথ। বাপার দুলাল।
সোণার সুন্দর তনু মুখে বহে লাল॥—ইত্যাদি।

ভাষার বিশেষ প্রয়োগ।

(ক) যোগান ধরিঞা আছে যত দেবগণ।—যোগান ধরিয়া থাকা শব্দের অর্থ অবিচ্ছেদে আজ্ঞামত কার্য্য করা।

(খ) ইন্দ্র আদি দেবগণ না সহে মোর টান।—টান না সহার অর্থ পরাক্রম সহিতে না পারা।

(গ) হাকান্দনে কান্দি মাতা দিল এক লড।—হাকান্দনে কান্দার অর্থ উচ্চৈঃস্বরে হায় হায় করিয়া কাঁদা

(ঘ) হাপুতির পুত কিছু নাহি জানে মোর।—হা পুতির পুত শব্দের অর্থ, যে মাতা হা পুত্র হা পুত্র করিয়া ব্যাকুল হন, তাঁহার পুত্র।

ব্যাকরণঘটিত বিশেষ প্রয়োগ।

(ক) বালা শব্দ বালকের স্থানে, এবং বালিকার স্থানে বালীর ব্যবহার।

(খ) সেবকিনী, তাম্বুলিনী ও চণ্ডালিনী প্রভৃতি পদের প্রয়োগ।

প্রাচীন কবিদের দক্ষিণ পাটন কোন্ দেশ? এ দেশ বঙ্গের প্রাচীন বণিক্‌গণের বিশেষ আদরের দেশ ছিল। পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে বণিকেরা বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাঁহাদের বাণিজ্যযাত্রার অস্ফুট উপাখ্যানগুলি রূপান্তর গ্রহণ করিয়া, ধনপতি, শ্রীমন্ত, চন্দ্রপতি সদাগরদিগের উপাখ্যানরূপে পরিণত হইয়াছে।

বাঙ্গালার মেঘডম্বর শাড়ী, গঙ্গাজল লাড়ু ও তেজপত্র প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য ছিল। গ্রীকদের কথায় জানিতে পারি, তৎকালে উত্তর বাঙ্গালার তেজপাত বিদেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হইত।

রামায়ণ ও মহাভারত ভাষায় অনূদিত হওয়াতে বেহুলার উপাখ্যানের আদর

ভদ্রসমাজে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন মনোহর উপাখ্যানের আদর হওয়া উচিত।

কবির দোষে,—সে দোষ কবির না বলিয়া কবির সময়ের দোষ বলিতে হয়,—কাব্যে মধ্যে মধ্যে পবিত্রতার হ্রাস হইয়াছে। মাতুলানীর সহিত নখিন্দরের কুব্যবহারের কুচিত্রাঙ্কন জগৎজীবনের গুরুতর অপরাধ।

শক্তি।

হায়! মুগ্ধ সর্ব্বরিক্ত স্বপন-সম্বল,
আপনার মাঝে রচি' সুখমরীচিকা,
পুড়িছ তৃষার তাপে—হে আত্মবিহ্বল,
মরণ বহ্নির ও যে স্বর্ণময়ী শিখা!
বিপুল বিচিত্র বিশ্ব আনন্দচঞ্চল
সৌন্দর্য্যসুধায় সিক্ত—হারে স্বপ্নাতুর!
ভেবেছ কি, কোন্ আদি উৎস সমুজ্জ্বল
করেছে এ বিশ্ব চির-মঙ্গলমধুর?
স্বপ্ন নহে—পরাশক্তি শোভন স্বাধীন
সুখের সহস্রমুখী গোমুখী নির্ম্মল!
শক্তির সাধক তাই সুখী চিরদিন—
দুর্ব্বলের নহে সুখ, দীন হীনবল
চিরতপ্ত অভিশপ্ত পথধূলিলীন,
কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত আর্ত্ত দলিত মলিন!

৩১শে শ্রাবণ, ১৩১০।

খেলা।

নগ্নদেহে সিন্ধুতীরে সুশুভ্র সৈকত 'পরে
ধীবরের বালা,
ক্ষুদ্র ঝিনুকের তরী তরঙ্গে ভাসায়ে ধরি'
অবিশ্রান্ত খেলা
উপকূলে একা সারাবেলা।

আহরি' শৈবালদলে শয্যা রচি' কুতূহলে,
ক্ষুদ্র মীনে করায়ে শয়ন,
স্নেহভরে করে নিরীক্ষণ।

নয়ন শফরী তুল পৃষ্ঠে এক রাশি চুল,
কৃষ্ণ কণ্ঠে প্রবালের মালা।
কৃষ্ণ প্রস্তরের গায় ক্ষোদিত প্রতিমা প্রায়,
উপকূলে বালিকা একেলা।

দূরে কৃষ্ণ বিন্দু প্রায় জেলেডিঙ্গি ভেসে যায়,
তরঙ্গের সাথে করে লুকোচুরী খেলা,
ঝিকি মিকি বেলা।
ভাসায়ে তরণী তার পিতা গেছে পারাবার,
ফিরিবেক অবসানে বেলা,
খেলে তীরে বালিকা একেলা।

তীরে সিন্ধু কল কল ফেন হাস্য খল খল,
আঘাতি' উপলদল ভেঙ্গে ফেলে বেলা,
অবিশ্রান্ত খেলা।

সহসা উদিল মেঘ, সাথে সাথে বায়ুবেগ,
মুহূর্ত্তেকে ছাইল আঁধার,
গর্জ্জিয়া উঠিল পারাবার।
চকিতা কুরঙ্গী প্রায় বালিকা চমকি' চায়,
ফুলিতেছে তরঙ্গ বিপুল,
নৃত্য করে পাথার অকূল।
বালিকা দাঁড়ায়ে তীরে দেখিল তরঙ্গ-শিরে
উত্তোলিত পিতার তরণী।
প্রসারিত করি' কর আশ্বাসে ধীবরবর,
'দাঁড়া মাগো! যাইব এখনি।'

বালিকা তুলিয়া কর ডাকিতেছে, 'আয় ঘর,'
ডুবে গেল ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি,
এল—তীরে আছাড়ি' তরণী।

প্রবল স্রোতের ঘায় ভাসিল বালিকা-কায়,
পিতৃকণ্ঠ ধরিল জড়ায়ে,
ভেসে গেল খেলাঘর, পিতাপুত্রী একস্তর
সৈকতেতে রহিল ঘুমায়ে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

নূতন মুসলমান বৈষ্ণব-কবি।

ইত্যগ্রে সাহিত্য-সংসারে অনেকগুলি মুসলমান বৈষ্ণব-কবির নাম ও কীর্ত্তি প্রচারিত হইয়াছে। আজ আর এক জন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-পূর্ব্ব কবির নাম ও কীর্ত্তি বঙ্গীয় সাহিত্যামোদিগণের গোচরীভূত করিতেছি।

আমাদের এই কবির নাম লাল বেগ। লাল বেগের রচিত একটিমাত্র পদ ভিন্ন তাঁহার অপর কোনও কীর্ত্তি বা পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পদটি প্রায় দুই শত বৎসরের পুরাতন হস্তলিপি হইতে সংগৃহীত হইল।

মুসলমান-বৈষ্ণব-কবিদের মধ্যে সাল বেগ নামধেয় এক কবি আছেন। তাঁহার একটি পদ প্রকাশিত আছে। তদ্ভিন্ন, আমাদের নিকটেও তাঁহার একটি পদ সংগৃহীত আছে। সাল বেগ ও লাল বেগ নামদ্বয়ে কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহাদিগকে অভিন্ন কল্পনা করা সমীচীন হয় না।

লাল বেগের এই একটিমাত্র পদ হইতেই দেখা যাইবে, তিনি নিতান্ত অক্ষম কবি ছিলেন না। তাঁহার এই পদটি সুন্দর ও মধুর। কি কারণে জানি না, মূল প্রতিলিপিতে পদটির রাগ রাগিণীর নামটা বাদ পড়িয়া গিয়াছে পদটি এই,—

কি করিল সখী সবে মোরে নিদে জাগাইয়া। ধু
আইল চিকণকালা সময় জানিয়া।
চাপিল প্রেমের নিদে শ্যাম কোল পাইয়া॥
কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিয়া।
যৌবনের গরবে মুই না চাইলু ফিরিয়া॥
পিউ পিউ বুলিয়া বালিস লৈলু উরে।
চৈতন্য পাইয়া দেখো পিয়া নাই মোর কোলে॥

মনের আকুতে মুই এখনা নিদ যাম্ ।
কেনেরে দারুণ বিধি মোরে হৈল বাম ॥
কহে কবি লাল বেগে স্বপ্নেত জাগিয়া
হরিল জন্মের দুঃখ চান্দমুখ চাহিয়া ॥

শ্রীআবদুল করিম ।

সেকালের ‘অকাল’ ।

অনেকেরই ধারণা আছে যে, ভারতবর্ষ চিরকালই শস্য-শ্যামল, এবং কেবল ইংরাজের রাজত্বকালেই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত হইয়াছে। এমন কি, কতকগুলি সাহিত্য-সেবী শিক্ষিত ব্যক্তিও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ভারতের সিংহাসনাধিকারী বৈদেশিকগণ, বোধ হয়, একপ্রকার অভিশপ্ত। কোনও বিজাতীয় রাজা অবিচ্ছিন্নভাবে বহুকাল দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পান নাই। পর্জ্জন্যদেবের কৃপার উপর ভারতের সুখ নির্ভর করে; কিন্তু তিনি কোনও কালেই কোনও রাজার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই।

মুসলমান-শাসনকালেও ভারতে দুর্ভিক্ষ ছিল। এখন সংবাদপত্রাদি থাকাতে বিস্তর আন্দোলন হয়, সে কালে তাহা হইত না। মুসলমানের ঐতিহাসিক সাহিত্যে গত এক সহস্র বৎসরের বড় বড় দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ ইতিহাস "তারীখ বদাউনি"তে আছে যে, ৯৬০ খৃষ্টাব্দে আগ্রা ও দিল্লীতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। গোধূম ও তণ্ডুলের ত কথাই নাই, যব পর্য্যন্ত ছিল না। শত সহস্র হিন্দু মুসলমান কিছু দিন কাঁটা গাছ ও মৃত জন্তুর চর্ম্ম ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিল, এবং তৎপরে অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইল। এই দুর্ভিক্ষ মুসলমান ইতিহাসে খশ্মে ঈজদ্ অর্থাৎ ঈশ্বরের কোপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তারীখ বদাউনির লেখক প্রসিদ্ধ মুল্লা আব্দুল কাদর। এলফিন্‌ষ্টনের ভারতের ইতিহাসে ও বাইয়গ্রাফিক্যাল ডিক্‌সনারিতে ইহাঁর উল্লেখ আছে। ইনি সংস্কৃতও জানিতেন, এবং কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর পারস্যভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া খ্যাত। তারীখ ফিরোজশাহী আর একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস। ইহার রচয়িতা জিয়াউদ্দিন্ বর্ণি। চিরস্মরণীয়

ফিরিস্তা ইঁহার কাছে ঋণী। এই ইতিহাসে বিবৃত আছে যে, জলালউদ্দিনের রাজত্বকালে, ১২৯০ খৃষ্টাব্দে, এমন ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল যে, শত শত হিন্দু ও মুসলমান পরিবার কয়েক দিন উপবাসে সন্তান হারাইয়া শোকাশ্রুসিক্তনেত্রে দিল্লীতে যমুনায় আত্মহত্যা করিয়াছিল। বর্ণি বলেন যে, আর একবার সুল্‌তান মহম্মদের সময়ে ঘোর অন্নকষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহার কিছু দিন পরে মালওয়া ও গুজরাতে দুর্ভিক্ষে শত শত লোকের কষ্টের অবধি ছিল না। ভিক্ষালব্ধ মুষ্টিমেয় অন্নের লোভে পুত্র পিতাকে হত্যা করিয়াছে, এবং অনেকে নরমাংস ভক্ষণ করিয়াও জীবনধারণে অসমর্থ হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

জফর নামাহ্ পারস্যভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস। ইহার প্রণেতা শর্ফুদ্দিন্ ইয়জদি ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। জাফরনামা, মলফি-জাত-ই-তৈমুরী হইতে সংগৃহীত। প্রসিদ্ধ রউজত্-উস্-সফা-প্রণেতা মীর খুন্দ,—যাঁহার অমৃতময়ীলেখনীবিনিঃসৃত গ্রন্থাবলী চিরকাল তাঁহাকে ইসলাম সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থাপিত রাখিবে,—বলেন যে, ইহাতে অনেক ঐতিহাসিক নূতন তত্ত্ব আছে, এবং ইহা একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও ইহার বিশেষ আদর করিয়াছেন। প্রথমে ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় (Histoire de Timur, Paris, 1722, 4 vol. 12 mo) এই ফরাসী অনুবাদ হইতে গিবন্ অনেক বিষয় তাঁহার ইতিহাসের জন্য সংগ্রহ করেন। তৎপরে ব্রাডুত্তি (Bradutti) ইটালীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন, এবং ১২৬২ খৃষ্টাব্দে Delli Archæological Journalএ ইহার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও উহা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। জফর নামা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এক সময়ে অন্নকষ্টের সীমা ছিল না। প্রাণের মায়ায় সকল বন্ধন এরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, অতি বীভৎস কাণ্ডেও ঘৃণার উদ্রেক হইত না। যখন কোনও ধনাঢ্য মুসলমান গোবধ করিতেন, শত শত ক্ষুধার্ত্ত লোক গোরক্তপানের লোভে সেখানে আসিয়া জুটিত, এবং তাহাও না পাইলে মৃত অশ্বের চর্ম্ম ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিত।

অকবর সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন. তাঁহার শাসনকাল, মুসলমান আধিপত্যে রামরাজ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বাল-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী ছিলেন বলিয়া খ্যাত। কিন্তু ইঁহার রাজত্বকালেও তিনবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। অবুল্ ফজল অল্লামির দুইখানি সুপরিচিত গ্রন্থ আছে; (১) আইন অকবরি, যাহাতে অকবরের

সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের সাধারণ নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ও (২) অক্‌বর নামাহ, অর্থাৎ অক্‌বরের জীবনবৃত্ত। অকবরনামায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্নকষ্টবশতঃ লোকে নরহত্যা করিয়া মাংসভক্ষণ করিত ; এবং আইন অক্‌বরিতে স্পষ্টই আছে যে, দুর্ভিক্ষের সময়ে পিতামাতা তাঁহাদের পুত্রকন্যা বিক্রয় করিতে পারিতেন। অকবরের সময়ের ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দের এই ভারতব্যাপী মহাদুর্ভিক্ষের কথা শেখ্ নুরুল্ হক্ তাঁহার জুব্দত্-উৎ-তওয়ারীখ নামক ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্রমাগত চারি বৎসর অন্নাভাবে অকবরের প্রজা হাহাকার করিয়াছিল। এক প্রকার প্লেগও (তাউন্) দেখা দিয়াছিল। ভয়ানক মড়ক হয়। চতুর্দ্দিকে এত মৃতদেহ পতিত ছিল যে, পথ চলা ভার। লোকে ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া নরমাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিল। অকবর যদিও অনেক বিষয়ে রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন অভিনব সুপ্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া দুর্ভিক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারেন নাই। যিনি পারিবেন, তিনি জনসমাজে এক জন রাজনীতি-চূড়ামণি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

শাহজহানের সময়েও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অল্প হয় নাই। পাদ্‌শাহনামাহ ইতিহাসে মহম্মদ অমিন কাজ্‌ভিওয়ানি বলেন যে, দাক্ষিণাত্যে দৌলতাবাদ ও বালাঘাটে অন্নকষ্টের ইয়ত্তা ছিল না। শাহজহানের দরিদ্র প্রজা অস্থি গুঁড়াইয়া খাইত, এবং প্রাণসম পুত্রের ভালবাসা অপেক্ষা তাহার মাংসে অধিক তৃপ্তিলাভ করিত।

তারীখ তাহিরী, সফরনামাহ-ইব্‌ন-ই-বতুতহ, মুন্তখিবুল্লুবাব ও মুখ্‌তসির-উৎ-তওয়ারীখ্ প্রভৃতি পারস্য গ্রন্থে ভারতের অনেকগুলি ভীষণ দুর্ভিক্ষের বিবরণ আছে। যদিও কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, এই গ্রন্থগুলিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসের উপযোগী সমস্ত উপকরণ সুরক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু ঘটনার সংগ্রহ, সুশৃঙ্খল সমাবেশ ও যথেষ্ট লিপিনৈপুণ্য আছে, এবং সেই জন্যই পাশ্চাত্য সাহিত্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মুসলমান ইতিহাসলেখক মুসলমান রাজ্যের এরূপ ভয়ানক অন্নকষ্ট ও মড়কের কথা, সত্য না হইলে, কখনই লিখিতেন না।

ইংরাজ বিস্তর গবেষণা ও পরীক্ষাদি করিয়া দুর্ভিক্ষের কঠোরতা উপশমিত করিবার অনেক চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু ইহা আশা করা অসম্ভব যে, মনুষ্যবুদ্ধি অনন্ত বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে, এবং এই সুবিশাল ভারতবর্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিবে।

চট্টলে ইছামতী।

গত পৌষ মাসের সাহিত্যে প্রকাশিত শীর্ষোক্ত প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় লেখক মহোদয় যে কয়েকটি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আবশ্যকবোধে আমরা এ স্থলে তাহাই দেখাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছি। প্রতিবাদ আমাদের অভিপ্রেত নহে। আশা করি, লেখক মহাশয় আমাদের কথাগুলি বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবেন।

লেখক মহাশয় রাঙ্গুনিয়ার ইছামতীর তীরে পূজা দিবার প্রথা অনূ্ন ৬০ বৎসরের অনধিক কালে সৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু জনপ্রবাদ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্যই প্রদান করে। আমরা শুনিয়াছি, ইছামতীর তীরে পূজা দিবার প্রথা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই বহুকাল দুই শত বৎসর অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া কখনও অনুমিত হইতে শুনি নাই। ইছা-মতী ও সিরাজুদ্দিন মিজ্জি ঘটিত প্রবাদে উক্ত অনুমানের কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

আনোয়ারার ইছামতী ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বের স্থাপিত নহে, ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বের স্থাপিত। ইহার কিছু পরেই গ্রামবাসী আর এক জন ব্রাহ্মণ ঈর্ষ্যান্বিত ও লোভপরতন্ত্র হইয়া বর্ত্তমান ইছামতী-বাটীর অনতিদূরে পূর্ব্ব ভাগে আর এক মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য্য হইয়া ব্রাহ্মণ পৃষ্ঠভঙ্গ দেন। এখনও সেই ভিটাটি পড়িয়া আছে। আনোয়া-রার ইছামতীর নিকট কখনও কোনও নরবলি প্রদত্ত হয় নাই। এরূপ উদ্ভট প্রবাদের সংবাদ প্রদান করিয়া কে লেখক মহাশয়কে বিড়ম্বিত করিল? এখানে স্বপ্নে যে মূর্ত্তি, অসি ও ঘট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল বলিয়া কথিত হয়, বর্ত্তমানে তাহার কিছুই নাই। স্বপ্নে প্রাপ্ত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে যে মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, তাহাও অনেকবার পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইছামতীর বাড়ীকে লোকে এখানে গঙ্গা-বাড়ী বলিয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ উহা স্বীয় নামেই অভিহিত হয়।

ইছামতী নদী মুরারিঘাট নামক নদের শাখা নহে; উহা মুরলী বা মুরলা নদীর শাখা। মুরলা নদী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া মুরলী বা মুরারিঘাটে চাঁদ-খালির সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। চাঁদখালি শঙ্খ নদে পতিত হইয়াছে মুরারিঘাট নদ নহে; উহা একটি ঘাট মাত্র; তাহা নামেই স্পষ্ট সূচিত

হইতেছে। পটীয়া-আনোয়ারা রাস্তা এখানে আসিয়া উক্ত চাঁদখালি কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে। তাই এখানে একটি পারাপারের ঘাট স্থাপিত হইয়াছে। ঘাটটি বৎসর বৎসর নীলাম হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই ঘাট চট্টগ্রামের স্বনাম-প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়দের অধিকারভুক্ত ছিল। এখন উহা গবর্মেণ্ট খাস করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন।

লেখক মহাশয় জলকন্দর নামক যে খালের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত নাম জোলকদর হইবে। চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা নবাব জোল-কদর খাঁর নামানুসারেই খালের নামকরণ হয়। আর এক স্থলে তাঁহার উল্লিখিত একটি গ্রামের নাম 'পড়িকোড়া' না হইয়া 'পইরকোড়া' হইবে।

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী, শঙ্খ ও ফেণী নদীর নামোৎপত্তি সম্বন্ধে লেখক মহাশয় যে প্রবাদের উল্লেখ করিযাছেন, আমরাও তাহার সহিত আর একটি প্রবাদ যুক্ত করিতেছি। চট্টগ্রাম পূর্ব্বে 'পরী'দিগের নিবাসস্থল ছিল। সুপ্রসিদ্ধ আউলিয়া 'বদর সাহেবে'র প্রভাবেই পরীগণ এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই প্রস্থানের সময়ে পরী-রাণীর কর্ণফুল, শঙ্খ ও ফেণী যে যে স্থানে পতিত হইযাছিল, তাহাই উত্তর কালে কর্ণফুলী ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। চট্টলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে অদ্যাপি অচলশিখরে 'কয়রা পরী' প্রভৃতির 'টঙ্গি' অবস্থিত, এইরূপ প্রবাদ আছে। যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকসমাজে এইরূপ কৌতুকাবহ নানা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—মুসলমানেরাও ইছামতীর পূজা দেয। তাহা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। চট্টলের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বাঁশ কাটিবার জন্য যাহারা 'আগার' সহর যাইত, পূর্ব্বে তাহারাই রাঙ্গুনিয়ার ইছামতী খালে ডিম্ব পারাবত ইত্যাদি উপহার দিত। 'আগারুয়া' ভিন্ন অপর লোকের মধ্যে কচিৎ কোনও ইতরজাতীয় মূর্খ মুসলমান (বিশেষতঃ স্ত্রীলোক) পূজোপহার দিত, এবং এখনও দিতে পারে। আনোয়ারার ইছামতী সম্বন্ধেও এই কথা।

শ্রীআবদুল করিম
শ্রীকালীকুমার চক্রবর্ত্তী।

———

ঋণমুক্ত।

১

লোচনপুরের জমীদার রামরতন রায় বারো আনার মালিক হইলেও চারি আনার সরীক হরিচরণ রায়কে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। সামাজিক বা বৈষয়িক সকল বিষয়েই এই যুবা হরিচরণ প্রৌঢ় রামরতনের উপর টেক্কা দিয়া চলিত। জমীদারী নীতির সূক্ষ্ম ও কুটিল কৌশলজাল বিস্তার করিয়া যখন রামরতন কোনও ঋণপীড়িত বিধবার সর্ব্বস্ব বা দরিদ্রের ভদ্রাসনটুকু আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেন, হরিচরণ তখন আশ্রয় দিত। অর্থবলে শ্রেষ্ঠ হইলেও রামরতন এই শালপ্রাংশু কপাটবক্ষ জ্ঞাতি-পুত্রটির দেশপ্রসিদ্ধ লৌহকঠোর বলিষ্ঠ বাহুযুগলের কথা স্মরণ করিয়া প্রকাশ্য শত্রুতা সাধিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্যর্থ রোষের রুদ্ধ অনলে দিবারাত্রি দগ্ধ হইলেও রামরতন তাঁহার অদৃষ্টাকাশের এই শনিগ্রহটিকে সর্ব্বদা সুদূরে রাখিয়া সাবধানে চলিবার চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু সে দিন প্রকাশ্য দিবালোকে, দশ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সাক্ষাতে, সে তাঁহাকে যেরূপ লাঞ্ছিত করিয়াছিল, তাহা দুঃস্বপ্নের মত অহর্নিশি তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। "খুড়া মহাশয়, সাবধান, যদি আর কখনও কোন গৃহস্থ-কন্যার উপর দৃষ্টি দাও, তাহা হইলে তোমার মাথাটি আস্ত রাখিব না।"

হতভাগা কুলাঙ্গার বাঁচিয়া থাকিতে তিনি কিছুতেই এ অপমানের তীব্রজ্বালা ভুলিতে পারিবেন না। কোনও রূপে এই চিরশত্রুর হস্ত হইতে কি নিষ্কৃতিলাভ করা যায় না?

শ্রাবণের রাত্রি। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। পৃথিবী অন্ধকারে নিমগ্ন। রায়মহাশয় তখনও নিমীলিতনেত্রে ধূমপানে নিরত।

বাহিরের দরজা খুলিয়া গেল। বিশ্বস্ত নায়েব মহেশ দাস প্রণাম করিয়া শয্যার এক প্রান্তে উপবেশন করিল। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহেশ, খবর কি?"

"আজ্ঞা, সংবাদ বড় শুভ।"

মুখের নল নামাইয়া রামরতন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কি রকম?"

মহেশ দাস কানের কাছে মুখ আনিয়া কি বলিল।

অর্দ্ধোত্থিত ভাবে রামরতন বলিলেন, "বল কি?" শুভ্র দশনপংক্তি বিকশিত করিয়া মহেশ দাস বলিল, "দৈবের বলে মাছ জালে পড়িয়াছে।"

রায় মহাশয়ের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতি মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "সে কোনরূপ সন্দেহ করে নাই ত? দেখিও, শেষে বিপদে না পড়িতে হয়।"

"আজ্ঞা, সে ভয় নাই। মহেশ দাস আট ঘাট না বাঁধিয়া কোনও কাজ করে না। যে জাল ফেলিয়াছি, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সোজা কথা নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, পরের উপর দিয়া কাজ শেষ করিব।"

রামরতন রায়ের মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এ কাজ হাঁসিল্ করা চাই। যত টাকা লাগে, আমি দিব। কিন্তু খুব সাবধান।"

২

সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া রায় মহাশয় আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। গৃহিণী জল-খাবারের থালাখানি স্বামীর নিকট সরাইয়া দিলেন। রামরতন পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কি? কিছু বলিবার মতলব্ আছে নাকি?"

জমীদার-গৃহিণী বলিলেন, "ও বাড়ীর হরিচরণের স্ত্রী আসিয়াছে।"

রায় মহাশয়ের মুখমণ্ডলে যেন একখানা বিদ্যুৎপূর্ণ কৃষ্ণ মেঘ সহসা আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীরভাবে তিনি বলিলেন, "কেন?"

"তা তুমি আমার চেয়ে ভাল জান। কখনও সে এ বাড়ীতে আসে না, আজ কেন সে আসিয়াছে, তাহাও বলিয়া দিতে হইবে?"

উচ্ছিষ্ট থালাখানি ঠেলিয়া রাখিয়া রামরতন বলিলেন, "তা আমি কি করিতে পারি? আমার কোনও হাত নাই। ইচ্ছা করিয়া যে আগুনে ঝাঁপ দেয়, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। এত দিনের সঞ্চিত পাপের ফল এখন সে ভোগ করুক।"

গৃহিণী ধীরে ধীরে বলিলেন, "হাজার হোক্, বংশের ছেলে ত বটে! তোমার সঙ্গে যতই মন্দ ব্যবহার করুক না কেন, এমন সর্ব্বনেশে বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করা তোমার উচিত। তা' না হ'লে তোমার বড় অখ্যাতি হবে।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া রায়মহাশয় তীব্রস্বরে বলিলেন, "দেশের সকলকে সে চির-কাল জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে। এখন তাহারা ছাড়িয়া দিবে কেন? কেহই আমার কথা শুনিবে না। দেশের লোকের বিরুদ্ধে আমি একা কি করিতে পারি?"

করুণাস্নিগ্ধস্বরে জমীদারপত্নী বলিলেন, "আমার একটা অনুরোধ রাখ।

এ যাত্রা যাহাতে রক্ষা পায়, তার উপায় কর। বউমার জন্য বড় কষ্ট হয়। আর মনে করিয়া দেখ, একদিন তোমার জীবনরক্ষার জন্য সে নিজের প্রাণ -- "

রামরতন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "থাম! কেন বৃথা অনুরোধ করিতেছ। সে হতভাগার জন্য আমি কিছুই করিতে পারিব না, করিবও না।"

দ্বারপার্শ্বে মৃদু পদশব্দ শোনা গেল। আট বৎসরের বিষণ্ণমূর্ত্তি এক বালক সসঙ্কোচে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে বালক বলিল, "দাদামহাশয়, আমার বাবাকে বাঁচান।"

গৃহিণী অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিলেন। দরজার পার্শ্বে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। কেবল রায় মহাশয় পাষাণমূর্ত্তির মত অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি বলিলেন, "তোর বাবা মানুষ খুন করিবে, লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়াইবে, তা আমি কি করিব? গ্রামের সব লোক একজোট হইয়াছে, আমার কোনও সাধ্য নাই।"

দ্বারপ্রান্ত হইতে অশ্রু নিরুদ্ধ-কণ্ঠে কে বলিল, "আজ আমার লজ্জা করিবার সময় নয়। আপনি পিতৃতুল্য; তাঁহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন, এ যাত্রা তাঁহাকে রক্ষা করুন। আমাদের যাহা কিছু আছে, সমুদয় লইয়া এবার তাঁহাকে বাঁচান। আমরা আর কখনও এ গ্রামে আসিব না। তাঁহার দ্বারা আপনার এতটুকু অনিষ্টও আর কখনও হইবে না। দেশের লোক আপনার বাধ্য। আপনি বলিলে কেহই তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াইবে না। দয়া করুন, এ যাত্রা তাঁহাকে রক্ষা করুন।" বলিতে বলিতে মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায় রোরুদ্যমানা বিষাদিনী রায় মহাশয়ের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া রামরতন রায় দ্রুতপদে বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

তখন পূজার চণ্ডীমণ্ডপে সানাই পূরবী ছাড়িয়া উদাস করুণ ইমন রাগিণী আলাপ করিতেছিল। সন্ধ্যারতি দেখিবার জন্য সমাগত গ্রামের স্ত্রী ও পুরুষ দর্শকে প্রাঙ্গণতল পরিপূর্ণ।

৩

কারাগারের লৌহকপাট ঝন্ ঝন্ শব্দে উন্মুক্ত হইল। দুর্গন্ধপ্লাবিত খানিকটা বদ্ধ বায়ু যেন নিস্তব্ধ নিরুদ্ধ অন্ধকারের সঙ্গে বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

কারারক্ষী বলিল, "এইখানে, বাবু।"

আগন্তুক সেই বৃহৎ লৌহদ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হৃদয়স্পন্দন কষ্টে কতক সংযত করিয়া তিনি ডাকিলেন,—"হরিচরণ।"

কেহ উত্তর দিল না। শব্দ কেবল গম্ভীর প্রতিধ্বনি তুলিয়া কারাকক্ষের নিবিড় অন্ধকারে ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল। আগন্তুক আরও একটু সরিয়া গেলেন। অন্ধকার তখন চক্ষে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। বোধ হইল, অদূরে কঠিন মাটীর উপর কেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। স্বর আর একটু উচ্চে তুলিয়া আগন্তুক আবার ডাকিলেন,—"হরিচরণ!"

এবার লৌহশৃঙ্খলের ঝন্ ঝন্ শব্দ শোনা গেল। বন্দী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। আগন্তুক আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "হরিচরণ! চাহিয়া দেখ, আমি আসিয়াছি।"

উদাস শুষ্ক কণ্ঠে বন্দী বলিল, "কেন আসিয়াছ রমেশ?"

রমেশ সে স্বরে চমকিয়া উঠিলেন। আজন্মের সহচর প্রিয়তম বন্ধুকে ষড়-যন্ত্রের মৃত্যুপাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া আজ সে নিষ্ঠুর সংবাদ তিনি প্রকাশ করিবেন!

বন্দী স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "বলিবার আবশ্যক নাই রমেশ, আমি পূর্ব্বেই সমস্ত সংবাদ পাইয়াছি।"

রমেশের উদ্বেলিত হৃদয় ধৈর্য্যের বাঁধ আর মানিল না। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ভাই! আমার সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; কিছুতেই তোমায় রক্ষা করিতে পারিলাম না।"

হরিচরণ বলিল, "দুঃখ করিও না ভাই; আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছি। মুক্তি পাইলেও এ দেশে আর আমায় এক মুহূর্ত্তও বাঁধিয়া রাখিতে পারিতে না। যাহাদের উপকারের জন্য আমার নিজের দিকে একবারও চাহি নাই, অর্থলোভে আজ তাহারা অনায়াসে শপথ করিয়া আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। এত দিনের উপকার তুচ্ছ টাকার লোভে অনায়াসে ভুলিয়া গেল!" বলিতে বলিতে বন্দীর চক্ষু একটা অস্বাভাবিক আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হরিচরণ তীব্র স্বরে বলিল, "কিন্তু আমার এই ক্ষোভ রহিয়া গেল, যাহার ষড়যন্ত্রে আজ আমার চিরনির্ব্বাসন, আমি নরঘাতী বলিয়া গণ্য, সেই পাষণ্ডকে উচিত শাস্তি দিয়া যাইতে পারিলাম না!"

রমেশ বলিলেন, "স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে একবার দেখা করিবে না? তোমার স্ত্রী একবার দেখা করিবার জন্য পাগলের মত হইয়াছেন।"

বন্দী মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা কর রমেশ! ও কথা আর বলিও না। সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, আমি অপরাধী। তোমায় মিনতি করিতেছি, তাহাদের এখানে আনিয়া আমার শান্তিনাশ করিও না।"

কারারক্ষী আসিয়া জানাইল, সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

৪

উদার উচ্ছল নীলাম্বুরাশির উপর সায়াহ্নের ম্লান আলোক তরঙ্গিত। সফেন ঊর্ম্মিরাশি, প্রতিমুহূর্ত্তে উন্মাদ উচ্ছ্বাসে বালুকাময় সমুদ্রতটে তীরস্থ পাষাণশৈলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। দূরে, বহু দূরে, বারিবিস্তারের প্রান্তদেশে আকাশ ও জল মিশিয়া গিয়াছে। চারি দিকে কেবল সমুদ্রের গর্জ্জন, তরঙ্গের ঘাত প্রতি-ঘাত, বায়ুর চঞ্চল নিশ্বাস এবং আলোক ও ছায়ার অবিরাম নৃত্য। প্রকৃতির বাধাবন্ধহীন এই বিচিত্র দৃশ্যের একমাত্র দর্শক একটি অনুচ্চ খণ্ডশৈলের উপর উপবিষ্ট। দশ বৎসরের অবসাদে তাহার প্রশস্ত ললাট রেখাঙ্কিত। জীবনের যে বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলি সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিল, স্মৃতির তূলিকাস্পর্শে দিন দিন তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। তাহার পরিপূর্ণ শুভ্র যৌবনের উপর দশটি বৎসর অভিশাপের যে মসীচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, ভারতসমুদ্রের সমুদয় জলরাশি তাহা কখনও মুছিয়া দিতে পারিবে কি? যে আগুন দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, পৃথিবীতে কি এমন কোনও শক্তি নাই—যাহা মুহূর্ত্তের জন্য সে তীব্র অগ্নিশিখা নিভাইয়া দিতে পারে? এই অসহ্য যন্ত্রণার যে মূল কারণ, তাহাকে কি সে একবার মুহূর্ত্তের জন্যও কাছাকাছি পাইবে না? কোনও মন্ত্রবলে এই যোজনব্যাপী সমুদ্রের ব্যবধানটা একবার যদি সরিয়া যায়! পলিত-কেশ শয়তানের মাথাটা একবার যদি তাহার দুই হাতের মধ্যে আসে!—

মুষ্টিবদ্ধ হস্ত প্রচণ্ডশব্দে রূঢ় পাষাণগাত্রে প্রতিহত হইল। মাংস ফাটিয়া রক্তধারা ছুটিয়া বাহির হইল।

কল্পনার মায়াজাল সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। বর্ত্তমানের কঠোর সত্য নির্ম্মম বিদ্রূপের মত মানস নেত্রে ভাসিয়া উঠিল। সব মিথ্যা! কল্পনা মায়াবিনী! দুই জানুর মধ্যে ক্লান্ত মস্তক রাখিয়া হতভাগ্য নির্ব্বাসিত ব্যর্থরোষের তীব্র বেদনায় বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

নীল জলে সূর্য্য ডুবিয়া গেল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "হরিচরণ!"

হরিচরণ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ডাক্তার বিনয়কৃষ্ণ। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "তুমি এখানে বসিয়া? অথচ আমি তোমায় এমন জায়গা নাই, যেখানে না খুঁজিয়াছি।"

বিস্মিতভাবে সে বলিল, "কেন?" ডাক্তার বলিলেন, "সু-খবর আছে"।

হরিচরণের মুখে অবিশ্বাসের ও উপহাসের ভাব প্রকটিত হইল। তাহার আবার সুখের সংবাদ!

বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন, "নূতন রাজার অভিষেক উপলক্ষে যে সকল বন্দী মুক্তি পাইবে, তোমার নাম তাহাদের মধ্যে দেখিলাম।"

হরিচরণ দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া শূন্যপানে চাহিয়া রহিল।

৫

বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়া বাজিয়া কখন থামিয়া গিয়াছে। কয় দিনের উৎসব-শ্রান্ত গ্রামবাসী সুপ্তির স্নেহক্রোড়ে তন্দ্রামগ্ন। দীপহীন পর্ণকুটীর অন্ধকার।

ঘন মেঘরাশি শারদলক্ষ্মীর বিয়োগশোকে আকাশপ্রান্তে স্তম্ভিত হইয়া আছে, এবং বাতাস এক একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চণ্ডীমণ্ডপের আশে পাশে যেন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা একটা দীপ্ত অগ্নিশিখা রায়বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্ব উদর-সাৎ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার রক্ত জিহ্বা চারি দিকে প্রসৃত হইতে লাগিল।

কে চীৎকার করিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ, আগুন!"

নিদ্রাতুরনেত্রে ভয়ার্ত্ত গ্রামবাসী চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আগুন তখন লম্ফে লম্ফে চারি দিকে রক্তনিশান তুলিয়া ছুটিতেছিল। অগ্নি সহস্র দর্শকের সমবেত চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিতে করিতে বিজয়গর্ব্বে অট্টালিকার সম্মুখভাগ অধিকার করিল।

বৃদ্ধ রায় মহাশয় দুই হাতে মাথার পক্ককেশ উৎপাটন করিতে করিতে ছুটা-ছুটী করিতেছিলেন। আজ তাঁহার সর্ব্বনাশ হইতেছে। পৈতৃক ইমারতখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। দ্বিতলের গৃহে তাঁহার আজন্মসঞ্চিত লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, গহনাপত্র, দলীলদস্তাবেজ, সব পুড়িয়া যায় যে! রক্ষার কি কোনও উপায় নাই? মা মঙ্গলচণ্ডী! তোমার আজন্ম সেবা করিয়া শেষে বৃদ্ধ বয়সে পথের ভিখারী হইতে হইল? বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "জল ঢাল্, জল ঢাল!"

সহসা তাঁহার মনে পড়িল, দোতালার ঘরে তাঁহার পীড়িতা পত্নী শুইয়াছিলেন, তিনি কি নামিয়া আসিতে পারিয়াছেন ?

পত্নীর নাম ধরিয়া তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, কেহ উত্তর দিল না। চারি দিকে উন্মত্তের মত ছুটাছুটী করিয়া তিনি সকলকেই পত্নীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহ তাঁর স্ত্রীকে দেখে নাই।

বৃদ্ধের বক্ষঃস্পন্দন যেন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া নির্ব্বাক স্তম্ভিত রায় মহাশয় ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন।

প্রজ্বলিত অট্টালিকার দিকে চাহিয়া তাঁহার যেন বোধ হইল, জানালার ধারে দাঁড়াইয়া তাঁহার রুগ্না পত্নী উদ্ধারের জন্য চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার পদপ্রান্তে বহ্নির মৃত্যুশিখা চারি পার্শ্বে জ্বালাময় অগ্নিতরঙ্গ প্রত্যেক মুহূর্ত্তে উদ্দাম-তাণ্ডবে অগ্রসর হইতেছে !

চীৎকার করিয়া হৃদয়ভেদী স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "দোতালার ঐ ঘরে আমার পীড়িতা স্ত্রী আছেন,—যে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে, আমার সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাহাকে দিব। বাঁচাও, রক্ষা কর।"

কিন্তু অর্থলোভে কে এই ধ্রুব মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ করিবে? দর্শকেরা স্তম্ভিত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পূর্ব্বে যাহারা অগ্নিনির্ব্বাণের চেষ্টা করিতেছিল, দৈবশক্তির বিরুদ্ধে মনুষ্যশক্তির অসারতার প্রমাণ পাইয়া, তাহারাও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অগ্নি অট্টহাস্যে দ্বিগুণ উদ্যমে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

সহসা চকিত দর্শকেরা দেখিল, এক দীর্ঘাকার মনুষ্যমূর্ত্তি বৃহৎ একগাছা যষ্টির সাহায্যে অবলীলাক্রমে প্রজ্বলিত প্রাচীরের এক পার্শ্ব উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত কম্বলে আবৃত। বিস্ময়মুগ্ধ গ্রামবাসীরা দেখিল, সেই মূর্ত্তি অতিক্রতবেগে অট্টালিকাসংলগ্ন এক উচ্চ স্তূপ বাহিয়া আরোহণ করিতেছে। সে দিকে অগ্নি তীব্রক্ষুধা লোলরসনা তখনও বিস্তৃত করে নাই। অপরিচিত পুরুষ কৌশলে আপনাকে ছাদের উপর নিক্ষিপ্ত করিল। আনন্দে দর্শকদল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কম্বলাবৃত অপরিচিত সিঁড়ির দরজার পার্শ্বে কুণ্ডলিত ধূমরাশির মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

এক, দুই, পাঁচ, সাত, দশ মিনিট,—ক্রমে আধ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু এই অসমসাহসী অদ্ভুত লোকটি এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না কেন? দর্শকগণ অধীর হইয়া উঠিল।

তাহাদের হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল।

অগ্নিতরঙ্গ ক্রমশঃ রুদ্রতেজে উর্দ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। জনমণ্ডলীর মধ্যে আবার আনন্দকোলাহল উঠিল। দীর্ঘাকায় পুরুষ মূর্চ্ছিতা রমণীমূর্ত্তি পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া আলিসার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। লম্বিত বস্ত্রখণ্ড সকল রজ্জুর আকারে বাঁধিয়া অভ্যস্ত ক্ষিপ্রহস্তে সিঁড়ির দরজায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল। তার পর সেই রজ্জু অবলম্বনে অট্টালিকার পশ্চাৎ দিক দিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিল।

যদি বন্ধন দৈবাৎ ছিন্ন হইয়া যায়! উদ্ধারকারীর হস্ত কোনরূপে আশ্রয়রজ্জু হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে! শোচনীয় পরিণামের আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। উত্থিতপ্রায় জয়ধ্বনি তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্তে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ঠিক সেই সময়ে প্রচণ্ড শব্দে দগ্ধ অট্টালিকার এক অংশ ভূমিসাৎ হইল।

রায় মহাশয় চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

* * * * *

চৈতন্য লাভ করিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন, তাঁহার পত্নী শিয়রে বসিয়া। অদূরে গ্রামবাসীরা দ্বিগুণ উৎসাহে আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতেছে।

পত্নীকে নিরাপদ ও সুস্থ দেখিয়া রায় মহাশয় ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃক্ষতলে অপরিচিত উদ্ধারকারী দাঁড়াইয়াছিল। উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে বৃদ্ধ তাহার কাছে ছুটিয়া গেলেন।

দীর্ঘকায় পুরুষ একটা বাক্স রায় মহাশয়ের হাতে দিয়া বলিল, "তোমার কোম্পানীর কাগজ ইহার মধ্যে আছে। মিথ্যা নরহত্যা অপবাদ দিয়া যাহাকে চিরনির্বাসনে দণ্ডিত করিয়াছিলে, যাহার চরিত্রে ঘোর কলঙ্ক কালিমা ঢালিয়া দিয়াছিলে, আমি সেই। আজ তোমার ঋণের কিছু পরিশোধ করিলাম।"

নিবিড় অন্ধকাররাশির মধ্যে অপরিচিতের মূর্ত্তি চকিতে অন্তর্হিত হইল।

কেবল নৈশবায়ু সেই বৃক্ষতলের শুষ্ক পত্ররাশি আলোড়িত করিয়া একবার মর্ম্মরধ্বনি তুলিয়া বহিয়া গেল।

অনুমান ও হনুমান।

অনুমান ও হনুমানের মধ্যে ব্যবধান দেখিতে বড় কম। অথচ হনুমানের সহিত অনুমানের সম্বন্ধ কি, তাহা বিশদরূপে আলোচিত হয় নাই।

আমরা অনেক বিষয় অনুমান করিয়া থাকি; তাহা অনেকটা হনুমানের মত। অনুমানের ও হনুমানের লম্ফ প্রায় একই প্রকার। তবে কিছু তফাৎ আছে। জড় জগতে ইহাদিগের গতি শঙ্কুর মত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি ইহাকেই Parabola বলিয়া থাকেন?

অনেকে যাহা অনুমান করেন, তাহা ঘটে না। মিঃ ঘোষ মনে করিয়াছিলেন যে, মমতা তাঁহাকে প্রত্যেক পরমাণু দিয়া ভালবাসিবেন। অধ্যাপক কুরি অনুমান করিয়াছিলেন যে, "রেডিয়ম" ধাতুর আদ্যোপান্ত আবিষ্কার করিয়া "শক্তিসাতত্যবাদের" মস্তকে কুঠারাঘাত করিবেন। তর্কালঙ্কার মনে করিয়াছিলেন যে, বিভক্তির মধ্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষটাই সোজা।

অনেকে অনুমান করেন, জগতে সম্পূর্ণ আনন্দময় পুরুষ থাকা সম্ভব। কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনিই সম্পূর্ণ নিরানন্দ। সম্প্রতি জাপ-রুসীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে পৃথিবীর চতুর্থাংশ লোক প্রত্যহ সকালে বৈকালে অনুমান করিতেছেন।

ইহারা সকলেই হনুমানের মত। কিছু কিছু তফাৎ।

এই অনুমানের দর্পে জড়জগতে পরমাণুসমষ্টি বিলোড়িত হয় কি না, তাহা আমরা জানি না। থিয়সফিষ্টগণের মতে হয়। যদি হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা। কিন্তু সকলেই অনুমান করিতে বাধ্য। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। অনন্ত-প্রবাহিত জ্ঞানসমুদ্রে ইহার প্রতিকৃতি বড়ই সুন্দর। কর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্রান্ত হইয়া যখন আমরা সকলে এই সমুদ্রের তটে গিয়া বসি, তখন আমাদিগের স্মিতমুখ নীলজলে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থির গম্ভীর আকার ধারণ করে। অনুমান তখন হনুমানের মত মনে করে, "এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রটা পার হই কিসে?" কিন্তু হনুমানের মত পার হইতে পারে কি না সন্দেহ।

আমরা একটা সমিতি স্থাপন করিয়াছি,—তাহার নাম "অণু-সমিতি"। তাহার সভাপতি হনুমান। পরমাণু, কীটাণু, কোষাণু, জীবাণু প্রভৃতি এই সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে বিশদরূপে আলোচিত হয়। অনুমান ইহার ভিত্তি। "মানব ঈশ্বরের সৃষ্টি করে, কি ঈশ্বর মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন,"

"বেদান্তের পঞ্চকোষ ও বিজ্ঞানের আবরণ," "জ্ঞান ও ভক্তির সহিত জড়শক্তির সম্বন্ধ" প্রভৃতি জটিল বিষয় ইহাতে বিশদভাবে বুঝান হয়। এই সকল সূক্ষ্ম বিষয় নস্যের মত সভ্যগণের নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া হাঁচির উৎপাদন করে। তাহার শব্দ রন্ধ্রের আয়তন অনুসারে ছোট বড় হয়।—

এই সমিতির প্রথম অধিবেশনে "অণু"র সহিত "হনু"র সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছিল।

সভাপতির বক্তৃতার সারভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ওহে পরমাণুসমষ্টি সকল! অদ্য আমরা সমবেত হইয়া যে সমিতি স্থাপিত করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য দুরূহ। প্রথমতঃ, আমার আকার তোমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহ। ইহা সংক্ষেপে একটা "হ"। বিশ্লেষণ করিলে অনেকটা অধ্যাপক কচ্ প্রভৃতির আবিষ্কৃত ব্যাসিলির মত দেখায়। ইহার তিন ভাগ আছে। প্রথম ভাগ ০, অর্থাৎ পরমাণুর মত। ইহা কারণশরীর। দ্বিতীয় ভাগ), ইহা সূক্ষ্মশরীর। একটা বক্র রেখার মত। তৃতীয় ভাগ ৲, সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল। ইহাই আমার সারাংশ, অর্থাৎ দেহ। দর্শনশাস্ত্র ইহাকে অসার ভাগ কহিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না।

"আমি গুরু, তোমরা চেলা। আমি নেতা, তোমরা চালিত হও মাত্র। আমি লাঙ্গূল নাড়িলে তোমরা মনে কর, তোমরা আস্ফালন করিতেছ। তোমরাই আমার পৃষ্ঠপোষক। যদিও ইহাতে আমার নাম দ্বাপরযুগে ছোট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে বড় ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইহা আমার প্রকৃতি, এবং আমি আমার প্রকৃতি দ্বারাই প্রকাশিত হই। আমার প্রকৃতি না থাকিলে আমাকে চিনিত কে?"

এমন সময় এক জন বলিয়া উঠিল,—"তবে মনুষ্য হইতে হনুকে নিকৃষ্ট কহে কেন?"

সভাপতি বলিলেন, "বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি মনু। যখন বিজ্ঞান বলেন যে, হনু হইতেই মনুষ্য, তখন কিছু অন্যায় কথা বলেন না। আমি প্রত্যেক বর্গেই আছি। কিন্তু "নিকৃষ্ট" কথাটা খাটিতে পারে না। উহা কেবল "অনুমান"মাত্র, অর্থাৎ, তোমার স্বভাবের দোষ। উহা হনুমান নহে।

"এই স্বভাবের দোষে তোমাদিগকে মধ্যে মধ্যে লাঙ্গূল হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিই। ইহাই কীটাণু প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ। তাহারা তোমাদিগেরই শরীরের অংশ। তোমরা যদি অনুমান ছাড়িয়া স্থিরভাবে আমার শরীরে

বিচরণ করিতে থাক, তবে এই সূক্ষ্ম বিষাক্ত কীটাণুগণ বাহির হইতে পারে না। মনে কর, তাহাদিগের লাঙ্গল ছাড়া অন্য কোনও স্থান নাই। কীটাণু জীবাণুর অন্তর্গত। তোমরা কেবল অনুমান করিয়া জঞ্জাল বাধাও। আমি ঝাড়িয়া ফেলিলে তোমরা আমার লাঙ্গূলের দক্ষিণ ভাগে যাও। অর্থাৎ, তোমরা মর। তোমাদিগের অনুমানের ভাগ বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে কিছুদিন আহার সংগ্রহ করিয়া আবার লাঙ্গূলের উত্তর ভাগে আসে। তাহাদিগের জ্বালায় নিরীহ লোকের প্রাণ যায়। যাহা হউক, ইহাও প্রকৃতির নিয়ম। কখনও আমার লাঙ্গূলের দক্ষিণ ভাগ, কখনও উত্তর ভাগ, স্থূলাকার ধারণ করে।

আজ আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছি, আমার পক্ষে উগ্রমূর্ত্তিধারণ হাস্যকর। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে, তোমাদিগের এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি অতীব বিরক্তিজনক। সংসারে তোমাদিগেরও সময়ে সময়ে এই বিরক্তিভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়ে। তোমরাও স্ত্রীপুত্রের অযথা আচরণে বিরক্ত হও। অথচ আমি তোমাদিগকে ভালবাসি, এবং তোমরাও তাহাদিগকে ভালবাস। নচেৎ লাঙ্গূলের গৌরব থাকে না। শোভা থাকে না। সৃষ্টি থাকে না।

"কিন্তু অদ্য তোমাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য ইহাই যে, এই গৌরবের মূলে যাহা অপ্রতিহতভাবে বর্ত্তমান, তাহার নাম কর্ম্ম। মনে করিয়া দেখ, আমার পক্ষে তিনটিমাত্র কর্ম্ম সার। প্রথমতঃ, লম্ফপ্রদান; দ্বিতীয়তঃ, আনন্দে লাঙ্গূল-সঞ্চালন; এবং তৃতীয়তঃ, নিরানন্দে লাঙ্গূল-ঝাড়ন। এ তিনটাই আমার কর্ম্ম-ভোগ; কিন্তু ইহার মধ্যে ইতরবিশেষ আছে।"

তখন সভাপতি একটা ছোট খাট লম্ফ প্রদান করিলেন। উহার প্রাবল্যে পরমাণুসমূহ ওতপ্রোতভাবে এ দিক ও দিক সরিয়া গিয়া আবার মাধ্যাকর্ষণের গুণে পরস্পরের পূর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া স্থির হইয়া বসিল। সভাপতি পুনর্ব্বার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

"এই যে লম্ফটা দেওয়া গেল, ইহার সম্পূর্ণ রূপ তোমরা কেহই জানিতে পার নাই। ইহাই জড় জগতের শক্তি। আমি কোথা হইতে কোথায় লম্ফ দিলাম,এবং তাহার উদ্দেশ্য কি, সে কথা তোমরা কেহই জান না,এবং বুঝাইলেও বুঝিবে না। কিন্তু তোমরাও এই লম্ফে আলোড়িত হইয়াছ। লম্ফপ্রদান করিবার সময় আমি লাঙ্গুল স্থির রাখিয়াছিলাম; কেন না, ল্যাজ নাড়া ও লাফ দেওয়া দুইটা স্বতন্ত্র কর্ম্ম, এক সঙ্গে হইতে পারে না। অন্ততঃ আমার অভ্যাস নাই।

"কিন্তু লম্ফে যে শক্তির ব্যয় হইয়াছে, তাহা তোমরা লইয়াছ। এই লম্ফের গুণে তোমরা বাঁচিয়া আছ। যখন লম্ফ দিয়াছিলাম, তখন তোমরা ভয় পাইয়া আমার লাঙ্গূল দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছিলে। না ধরিলে তোমরা Nebulous Mass হইয়া পড়িতে। তোমাদিগের এই আত্মরক্ষণের চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে, আমার এই লম্ফ হইতে তোমাদিগের অন্তরস্থ মাধ্যাকর্ষণের উৎপত্তি। আমার লম্ফ কর্ম্ম তোমাদিগের মাধ্যাকর্ষণ প্রবৃত্তিতে পরিণত হইল। [সকলে—Applause.]

"এই রূপে সৃষ্টির আদিম অবস্থায় যখন আমি প্রবল লম্ফ দিয়াছিলাম, তখন অনন্তদেশব্যাপী পরমাণুপুঞ্জের পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। যতক্ষণ আমি লম্ফ দিয়া থাকি, তোমরা প্রাণের দায়ে আমার লাঙ্গূলের সারভাগ (Nuclus) আঁকড়াইয়া থাক। আমি যখন চঞ্চল, তখন তোমরা সকলে স্থির। স্থির হইয়া থাকাই পুরুষের কর্ম্ম। আমার লম্ফে তোমরা তাহা শিখিলে। ইহারই নাম যুক্ত হওয়া। যতক্ষণ আমার লম্ফ, ততক্ষণ তোমরা কর্ম্মযোগী। অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তোমরা এই কর্ম্মে কষ্ট পাও; কেন না, এই লম্ফ তোমাদিগের শরীরের প্রত্যেক ভাগে কার্য্য করিতে থাকে। তোমরা এটাকে মনে কর কর্ম্মভোগ, এবং বাস্তবিক জড়জগতে ইহাই প্রত্যেক জীবের কর্ম। এই যে লম্ফজনিত তোমাদিগের ওতপ্রোতভাব, অথচ আঁকড়াইয়া ধরা, ইহার মূলে আমার সহিত তোমাদিগের গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান। [হাততালি।]

"এই লম্ফ শেষ হইলে কিছুক্ষণ আনন্দে আমার লাঙ্গূল নড়িতে থাকে। আমার লম্ফদান তোমাদিগের শিক্ষার জন্য। আমি শক্তিব্যয় করিয়াছিলাম তোমাদিগের পরিপুষ্টির জন্য। তাহার সফলতা নিরীক্ষণ করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম। যেমন 'মেসে'র বালকগণ 'স্যাণ্ডোর ডম্বেল্' ভাঁজিয়া বাহুর মাংসপেশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দলাভ করে, আমারও সেইরূপ আনন্দ হয়। তোমরা হর্ষাপ্লুত হও, আমারও লাঙ্গূল নড়ে। বাস্তবিক তোমাদের সুখেই আমার লাঙ্গুল নড়িতে থাকে। লাঙ্গূলের কোনও সুখ হয় না। আমার লম্ফও তোমাদিগের হিতার্থ,—লাঙ্গূল নাড়াও তাহাই। তোমরা লাঙ্গূলের অংশ। তোমাদিগের অন্তরস্থ জ্ঞান ও আনন্দলিপ্সা তোমাদিগের প্রবৃত্তি, আমার প্রকৃতি। এই প্রবৃত্তি হইতে আমার লম্ফ ও তোমাদিগের চৈতন্য, আমার লাঙ্গূল নাড়া ও তোমাদিগের আনন্দ।

"অতঃপর শুন! যখন আমার এই কর্ম্মজনিত আনন্দ হয়, তখন আমি যাঁহার সেবক, তাঁহাকে মনে পড়ে। তিনি আমার ঈশ্বর, পরমপূজ্য, আমার আদর্শ, আমার প্রাণ ও আনন্দের আকার। তখন আমি লাঙ্গূল স্থির রাখিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া থাকি। এই সময় তোমাদিগের পক্ষে বড় শোচনীয়।

"যতক্ষণ আমি বক্তৃতা করিতেছি, ততক্ষণ তোমাদিগের মন নিশ্চয়ই এই 'অনুপ্রবৃত্তি' কিংবা অনুমান লইয়া খেলা করিতেছে। ইহা নিতান্ত হাস্যকর। যাঁহারা যথার্থ কর্ম্মী, তাঁহারা আমার লাঙ্গূলের আইন ও গতি নিরীক্ষণ করিয়া সেই ওজনে আমার সহিত লাফ দেন। বিজ্ঞানজগতে, ধর্ম্মজগতে, কর্ম্মজগতে যাঁহারা যথার্থ সেই পথে আমার সহিত শক্তিব্যয় করেন, তাঁহারাই ভক্ত ও জ্ঞানী। আমার যখন লাঙ্গূল স্থির থাকে, তাঁহাদিগেরও থাকে। তাঁহাদিগের আণবিক আস্ফালন নাই

"কিন্তু লম্ফের সময় প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকা ও সুযোগ পাইলে অকর্ম্মা হইয়া 'অনুমান' করা নিতান্ত কদাকার প্রবৃত্তি। আমি প্রায় সহস্র বর্ষ ধরিয়া তোমাদিগের এই প্রবৃত্তি গম্ভীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছি। তোমাদিগের এই অনুমান-লম্ফ, হনুমান-লম্ফ হইতে বিভিন্ন। আমি যখন লম্ফ দিই, তখন একটা স্থির ভিত্তি হইতে অন্য স্থির ভিত্তির উপর যাই; তাহার উদ্দেশ্য আছে। তোমরা লম্ফ দিয়া আমার লাঙ্গূল হইতে অস্থির ও অসার শূন্যের উপর যাও, এবং ক্রমাগত লাঙ্গূলে ফিরিয়া আসিয়া আহার বিহার কর। ইহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। দ্বাপরে রাবণ রাজা তোমাদিগের এই গতি দেখিয়া আমার লাঙ্গূল দগ্ধ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আমি না সামলাইলে সেই সময় তোমরা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতে। কিন্তু এখনও তোমাদিগের সে স্বভাব যায় নাই। [সকলের অনুতাপ।]

"তোমরা এই অণুসমিতিতে যোগদানের পূর্ব্বে নানা সমিতির সভ্য হইয়া গিয়াছ, এবং প্রত্যেক সমিতিকে আমি লাঙ্গূল হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তোমাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছি। তোমরা অনুমানের চোটে ঈশ্বর গড়াও। তোমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেল, এবং বল, ঈশ্বর নাই। ইহা কেবল তোমাদিগের কুস্বভাব। কখন কখন তোমরা আমারই মত লাঙ্গূলবিশিষ্ট ঈশ্বরের কল্পনা কর, এবং স্ব স্ব লাঙ্গূলের সহিত সেই কল্পনাজাত লাঙ্গূলের তুলনা কর। ফল কথা, তোমরা সভাপতির ও তাঁহার ইষ্টদেবতার অবমাননা কর।

"তখন আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়। আমি চটিয়া যাই। আমি বিরক্ত হই

লাঙ্গুল হইতে তোমাদিগকে ঝাড়িতে থাকি। তোমাদেরই গুণে তোমরা লাঙ্গুল প্রদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া শূন্যাকার ধারণ কর, Nebulous mass হও। এটা কি বড় সুখের ও গৌরবের কথা ? কিন্তু আমাকে এ কার্য্যও করিতে হয়। কিরূপে আবার লম্ফ দিলে তোমরা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান হইবে, তাহারই কল্পনা করি। ইহাই যুগের অবসান।

"আমি পুনঃপুনঃ লাঙ্গুল ঝাড়িলে মহামারী, মহাযুদ্ধ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। তোমরা কষ্ট পাও। তোমরা স্বার্থপর হইয়া পরস্পরের জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সুখ দুঃখের আলোচনা কর ; ইহাতে গণ্ডগোল বাধে। আমার লাঙ্গুলে যথেষ্ট আহারের সংস্থান আছে। কিন্তু প্রত্যেকেরই সমগ্র লাঙ্গুল অধিকার করিয়া চালাইবার শক্তি ও অধিকার জন্মে নাই।

"তোমাদিগকে আমি ভালবাসি। তোমাদিগের প্রবৃত্তি আমারই লম্ফের মধ্যফল। তাহাই বুঝাইবার জন্য এই সমিতির আবাহন। বুঝিতে গেলে কষ্ট করিতে হয়। কর্ম্ম করিতে [illegible]। তোমরা কল্পনায় লক্ষ যোজন লাফ দাও, কিন্তু তাহাতে জ্ঞান হয় না। কল্পনায় তোমরা দিল্লী আগ্রায় যাত্রা কর, ভালবাস কল্পনায়। ইহাতে দিল্লী আগ্রা যাওয়াও হয় না, ভালবাসাও হয় না। শক্তিব্যয় না করিলে, প্রাণ না দিলে, জ্ঞান ও প্রেম হয় না। যাহা ব্যয় করিবে, তাহাই অন্য আকার ধারণ করিবে। যদ্বিষয়ে ব্যয় করিবে, তদ্বিষয়ের আকার ধরিবে। তোমরা পিতামাতাকেও যথার্থ ভালবাস না, স্ত্রী পুত্রকেও না, বন্ধুকেও না, বিশ্বের মধ্যে কাহাকেও না, অথচ আপনাকে একটা প্রকাণ্ড প্রেমিক ও ভক্ত মনে কর। এটা অনুমানের লক্ষণ, হনুমানের নহে। হনুমানের কেবল 'কর্ম্ম'। কর্ম্মই প্রেমের, ভক্তির, জ্ঞানের, আনন্দের মূল।

"এই যে জগতে প্রবীণ অধ্যাপকবৃন্দ জীবন দিয়া আমার লাঙ্গুলের দেশ, কাল, আকর্ষণ, সঞ্চালন প্রভৃতির আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা আমারই বলে বলী। তাহা জানিয়াই তাঁহাদিগের জ্ঞান ও আনন্দ। কিন্তু তোমরা কোন ছার ? তোমরা চীৎকার করিয়াও লোক জুটাইতে পার না, অন্দরমহলে বকিয়াও গৃহিণীর ভালবাসা পাও না, এক পয়সার কর্ম্ম করিয়া দশ পয়সার আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা চরিতার্থ হয় না। ইহার ফলে কেবল আমি লাঙ্গুল ঝাড়িতে থাকিব, এবং তোমরা ফলভোগ করিতে থাকিবে।"

ইহা বলিয়াই সভাপতি লাঙ্গুল ঝাড়িতে লাগিলেন। পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূম্রাকারে পরিণত হইল। সে দিনের মত সভাভঙ্গ হইল।

মহম্মদ।

বাঙ্গলা দেশে মহম্মদপন্থীগণের প্রথম আগমনে মহান হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। অনেক দিন হইতে শুনা যাইতেছিল যে, পশ্চিম দেশে মহম্মদপন্থীগণের তুমুল উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। ইহারা সকলেই তৎকালে "তুরষ্ক" এই সাধারণ নামে এতদ্দেশে বিখ্যাত ছিল। গজনবী সুলতান মহম্মদ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাব প্রদেশে লুটপাট আরম্ভ করেন। এবং তদবধি আক্রমণের স্রোত পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। তাঁহার বংশধরগণ দুর্ব্বল ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলে কিছু কাল তাহা স্তম্ভিত ভাবে থাকে, কিন্তু মহম্মদ ঘোরী আবির্ভূত হইলে ইহার বেগ অপ্রতিহতভাবে সঞ্চালিত হয়। বেদপন্থী রাজারা যেন মূর্ত্তিমান কলিযুগ প্রত্যক্ষ করিলেন, এবং অদৃষ্টচক্রের গতিরোধের চেষ্টা বিফল বিবেচনায় অবশেষে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বখ্‌তিয়ার খিলজী ও তাঁহার পাঠানগণের আগমনে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ হইতে পলায়নপর হয়েন। তদীয় প্রধান পাত্র হলায়ুধ মিশ্র এই ঘটনাটিকে একটি সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা জনশ্রুতিতে আজিও জাগরূক রহিয়াছে। পরে এরূপ একটি গল্পের সৃষ্টি হয় যে, বিক্রমাদিত্যের সভায় এই শ্লোকটি একটি পত্রে লিখিত হইয়া আকাশ হইতে নিপতিত হয়। শ্লোকটি এই,—

"চতুর্ব্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রেকশতাব্দিকে।
বেহারপাটনাৎ পূর্ব্বং তুরষ্কঃ সমুপাগতঃ॥"

এই প্রমাণ অনুসারে ১১২৪ শকাব্দে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা দেশে মুসলমান সৈন্যদল দেখা দেয়।

বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার তুল্য প্রসিদ্ধ ঘটনা দ্বিতীয় নাই। এই ঘটনার পরে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিগণ হিন্দু মুসলমান এই দুই বিসংবাদী সম্প্রদায়ে ক্রমশঃ বিভক্ত হইয়াছে। ঐক্যের স্থলে অনৈক্য, মৈত্র ভাবের স্থলে বৈরভাব, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেখা দিয়াছে। হিন্দু মুসলমানকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করে, মুসলমান হিন্দুকে নিরয়গামী বিবেচনা করে।

বখ্‌তিয়ার খিলজীর আগমনে যে নূতন রাজত্বের সূত্রপাত হয়, তাহা এক্ষণে শতাধিক বৎসর হইল নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের

প্রতি বিদ্বেষভাব নির্ব্বাণ পায় নাই। কত দিনে যে নির্ব্বাপিত হইবে, তাহা ঈশ্বর জানেন।

হিন্দু মুসলমান ১১২৫ শকাব্দের পূর্ব্বে এতদ্দেশে এক ছিল ; আবার কোনও সময়ে এক হইবে কি? মহাকাল কি কোন সময়ে হিন্দু মুসলমানকে ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করিয়া গঠন করিবেন? এ কথা এক্ষণে স্বপ্নবৎ বিবেচনা হয়। ভবিষ্যতের অমানিশার মধ্যে দৃষ্টি চলে না।

১১২৪ শকাব্দের পূর্ব্বে "হিন্দু" শব্দ এ দেশে প্রচলিত ছিল না। বাঙ্গলার অভিধানে তৎপূর্ব্বে "হিন্দু" এরূপ কোন শব্দ ছিল না। এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান রাজারা আমাদিগকে যেমন "নেটীভ্" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বখ্‌তিয়ারের অনুচরেরা এতদ্দেশবাসিগণকে তদ্রূপ "হিন্দু" বলিতে আরম্ভ করেন। দেশের নূতন নরপতিগণ মুসলমান, এবং দেশের অবশিষ্ট লোক হিন্দু।

ব্রাহ্মণ, রাজপুত্র, কৈবর্ত্ত, বাগদী, মুড়ী মুড়কীর ন্যায় মিশিয়া গিয়া হিন্দুতে পরিণত হইল। ফলতঃ, তুরষ্কগণের পূর্ব্বে "বাঙ্গালী" ও "গৌড়ীয়" ছিল, "হিন্দু" ছিল না।

যে নাম বিজেতৃগণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে অর্পণ করিলেন, তাহা গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে, এমনই বিধিবিড়ম্বনা যে, অনেকে এই "হিন্দু" নাম গৌরব বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন যে, এই নামের উৎপত্তিক্ষেত্রে গৌরবের নামগন্ধ নাই।

গৌড়ীয় ও বাঙ্গালীগণ মিশিয়া এক্ষণে সাধারণ বাঙ্গালী জাতি হইয়াছে। ইহাদিগকে এক জাতি বলা যায় ; কেন না, ইহাদের সকলেরই মাতৃভাষা এক বাঙ্গলা। ইহারা সকলেই এক মাতার সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। এই বাঙ্গালী জাতি সম্প্রতি উপাসনার পন্থাভেদে প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত,—বেদপন্থী ও মহম্মদপন্থী। বেদপন্থীগণ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি অবান্তর সমাজে বিভক্ত হইয়াও একমতাবলম্বী ; তাঁহারা সকলেই সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনকর্ত্তাকে "ঈশ্বর" ও "পরমেশ্বর" নামে পূজা করেন। মহম্মদপন্থীগণ তাঁহাকে "আল্লা" বা "খোদা তালা" নামে পূজা করেন। ইহারা পরস্পরকে অবজ্ঞা করেন বলিয়া যেন "ঈশ্বর" ও "আল্লার" মধ্যেও বিবাদ বাধিয়াছে, বোধ করেন।

কিরূপে মহম্মদপন্থীর উৎপত্তি হইল, অদ্য আমরা তাহারই বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে ধারণ করিব।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীর দক্ষিণে এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশের পশ্চিম দিকে লবণসমুদ্রের যে ভাগ প্রসারিত রহিয়াছে, ভূতত্ত্বশাস্ত্রে তাহার নাম আরব উপসাগর। ইহার অপর প্রান্তে আরব দেশ। পারস্য, সীরিয়া, মিসর এবং হাবসী দেশের মধ্যে এই দেশ অবস্থিত। উত্তরে ইয়ুফ্রেটীস নদীতীরে বিনিসের উত্তর প্রান্ত হইতে ধরিয়া দক্ষিণে বাবেলমাণ্ডেব অন্তরীপ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে সার্দ্ধ সপ্ত শত ক্রোশ পূর্ব্বে বসোরা নগর হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত পারস্য উপসাগর হইতে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত, ইহার বিস্তার দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্দ্ধেক। কেবল আয়তনে ইহা জর্ম্মণি বা ফ্রান্সের চতুর্গুণ। কিন্তু ইহার অধিকাংশই প্রস্তর ও বালুকাময় মরুভূমি। তথায় তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না। এবং প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে তাহা দগ্ধ হইয়া থাকে। পথিক যখন এই মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যায়, তখন চারি দিকে কেবল বালি ধূ ধূ করিতেছে, দেখিতে পায়; এবং স্থানে স্থানে তরুলতাবিবর্জ্জিত দুরারোহ নগ্ন পাহাড় পর্ব্বতমাত্র এই বালুকাসমুদ্রমধ্যে যেন ভীষণ জীব জন্তুর ন্যায় মাথা তুলিয়া রহিয়াছে বোধ হয়। এই ভীষণ স্থানে যখন বায়ু সঞ্চালিত হয়, তখন শরীর স্নিগ্ধ হয় না, প্রত্যুত তাহাতে চারি দিকে একপ্রকার বিষময় কুজ্ঝটিকা আবির্ভূত হয়, এবং বায়ুবিক্ষোভে বালুকণা সকল সঞ্চালিত হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এবং তন্মধ্যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তু সমাহিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এইরূপে কারবারী লোকের দল, এমন কি, সময়ে সময়ে প্রকাণ্ড অনীকিনীও বালুকার ঝড়ে প্রোথিত হইয়া মারা যায়। জল এমন দুর্লভ যে, এখানে সামান্য জলাশয়ের অধিকার লইয়া তুমুল সংগ্রাম ঘটে। বৃক্ষের অসদ্ভাবে ইন্ধন দুর্লভ। আরবদেশে নাব্যা নদী নাই। বৃষ্টির জল বালুকাতে চুষিয়া লয়। দুই একটা তিন্তিড়ী বা বাবলা গাছ যাহা পর্ব্বতে জন্মে, তাহা অধিক-পরিমাণে নিশার শিশিরে জীবনধারণ করে। সামান্যপরিমাণ বৃষ্টিজল স্থানে স্থানে গর্ত্তে বা জলপ্রণালীতে সঞ্চিত হয়, এবং কোথাও কোথাও বা দুই একটি কূপ বা নির্ঝর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মরুর বক্ষে এই ক্ষুদ্র জলাশয়গুলি যেন এক একটি মহার্হ রত্নস্বরূপ; কিন্তু ইহাদেরও আবার অনেকের জল লবণাক্ত বা বিস্বাদ! আরব দেশের অধিকাংশ স্থানেরই চিত্র এইরূপ ভীষণ;—মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে তরুচ্ছায়ায় স্বাদু জল ও শ্যামল-শস্পাচ্ছাদিত স্বল্পপরিমাণ স্থান দৃষ্টিগোচর হয়, এবং তথায় এক একটি আরব উপনিবেশ দৃষ্ট হয়। অধিবাসীরা পশুপালন এবং দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুর বৃক্ষের চাষ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সমুদ্রের উপকূলে উচ্চ ভূমিতে এইরূপ স্থান

সমধিকপরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। তথায় জল ও তরুলতা অপেক্ষাকৃত প্রচুর, বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল, ফল অপেক্ষাকৃত মিষ্ট, এবং মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তু অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় অধিক। এই স্থানের ভূমি উর্ব্বরা হওয়ায় কৃষির অনুশীলন হইয়া থাকে; এবং এই স্থানে গন্ধদ্রব্য ও কাফী জন্মে বলিয়া বিদেশ হইতে বণিকদেরও সমাগম হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী মরুর তুলনায় এই স্থান অতীব সুখের বলিয়া গণ্য হয়। পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ বেহরিন ও ওমান নামে বিখ্যাত, এবং ভারতসমুদ্রের তীরবর্ত্তী প্রদেশ য়ীমেন নামে প্রসিদ্ধ। লোহিত সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থানে মহম্মদের জন্ম হয়, এবং এই স্থানে হজ বা তীর্থদর্শন হয় বলিয়া ইহা হেজাজ্ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

আরবের মরুস্থলীতে কেবল বেদুয়ীন নামক আরবেরা প্রধানতঃ পশুপালন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। বিখ্যাত আরবীয় অশ্ব ও উষ্ট্র ইহাদের প্রধান সম্পত্তি। কিন্তু সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে কৃষি ও বাণিজ্যের দ্বারাই অধিবাসীরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই প্রদেশে অতি পূর্ব্বকাল হইতে অনেকগুলি নগরের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে লোহিত সাগরের উপকূলে মক্কা ও মদিনা নগর ইতিহাসে অতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মক্কা নগর মহম্মদের জন্মস্থান, এবং মদিনা নগরে মহম্মদের প্রচারিত অভিনব পন্থা সর্ব্বপ্রথমে প্রাধান্য লাভ করে।

মক্কা সহর একপ্রকার মরুর মধ্যে অবস্থিত বলিলেও চলে। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ প্রস্তরময়; তথায় কৃষিকার্য্যের সুবিধা বড়ই কম। এই স্থানের জলও সুস্বাদু নহে। এমন কি, মক্কায় পবিত্র বলিয়া গণ্য জমজম কূপের জলও বিস্বাদ। গোচারণের উপযুক্ত ঘাসের ভূমি সহরের অনেক দূরে, যে তৈয়াফ নগর হইতে মক্কায় দ্রাক্ষা ফল আসে, তাহা ৩৫ ক্রোশ দূরে। কোরেশ-বংশীয় আরবেরা মক্কার অধিপতি ছিল; ভূমির অনুর্ব্বরতাবশতঃ ইহারা কৃষির অনুশীলন করিতেন না, বাণিজ্যই ইহাদের ধনাগমের প্রধান উপায় ছিল। মক্কার কুড়ি ক্রোশ দূরে সমুদ্রের উপকূলে জেড্ডা নামক বন্দর অবস্থিত। তাহার অপর পারে হাবশীদের দেশ, এবং ঐ দেশের মূল্যবান পণ্য সামগ্রী সকল মক্কার উপর দিয়া বেহরিন্ প্রদেশের নগর সকলে নীত হইত, এবং তথা হইতে মুক্তাফল ও অন্যান্য পণ্যের সহিত ইয়ুফ্রেটীস্ নদীতে প্রবিষ্ট হইত। এ দিকে উত্তরে সীরিয়া ও দক্ষিণে য়ীমেন প্রদেশের প্রায় সমান দূরে মক্কা অবস্থিত। উভয় স্থানই মক্কা হইতে প্রায় এক মাসের পথ। মক্কার সার্থবাহেরা শীতকালে য়ীমেন প্রদেশে এবং গ্রীষ্মকালে

সীরিয়া প্রদেশে বাণিজ্যের জন্য গতিবিধি করিত। ভারতবর্ষের পণ্য দ্রব্য লোহিত সাগর অতিক্রম না করিয়া য়ীমেন প্রদেশেই বিক্রীত হইত, এবং মক্কার বণিকেরা তাহা ক্রয় করিত। এইরূপে সীরিয়া ও ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় পণ্যদ্রব্য বিনিময় ও বহনের দ্বারা মক্কায় বণিকদের সমাগম হইত। এবং মক্কা সহরের প্রধানেরা যুদ্ধ ও বাণিজ্যে তুল্য বিশারদ ছিলেন।

আরবেরা প্রাচীনকাল হইতে যুদ্ধকুশল ও স্বাধীনপ্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত, এবং তন্মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় সর্ব্বকালেই প্রচলিত ছিল। কেহ কাহাকেও মানিত না, এবং আপন হস্তে অপরাধের প্রতিশোধ লওয়া ইহাদের দেশাচার। ইহারা যেমন বৈদেশিক লোকের নিকট সহজে মস্তক অবনত করে না, তেমনই আপনা-আপনির মধ্যে সর্ব্বদা কাটাকাটি হানাহানি করিয়া থাকে। দেশ যেমন কঠিন, ইহাদের হৃদয়ও তেমনি উগ্র, এবং শত্রুর প্রতি দয়ামায়াশূন্য। পরস্বলুণ্ঠন এবং হত্যাকাণ্ডে ইহারা একপ্রকার প্রীতিই অনুভব করে। তথাপি বাণিজ্যের অনুশীলনে এই কঠোর ভাবের আংশিক উপশম হইয়াছে, এবং আরবেরা যে একবারে বর্ব্বর, তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে সাহিত্য-বিজ্ঞানেরও অনুশীলন কিয়ৎপরিমাণে দেখা যায়। ইহাদের চারিদিকেই সভ্যজাতীয় লোক, এবং তাঁহাদের সংস্রবে সভ্যতার জ্যোতিঃ কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের মধ্যেও বিকীর্ণ হইয়াছিল।

এইরূপ ভীষণ ও কঠোর প্রদেশে একটি যুদ্ধকুশল, স্বাধীন ও উগ্রপ্রকৃতি, এবং কিয়ৎপরিমাণে সভ্য বণিক-বংশে মহম্মদের জন্ম হয়। এই বংশের নাম কোরেশ। মহম্মদের প্রপিতামহের নাম হাশীম। তিনি এক জন ধনশালী ও বদান্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। মক্কা নগরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি আপন দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করিয়া অনেক লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। হাশীমের পুত্র আবদুল মোতালিব এক জন নির্ভীক বীরপুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার শৌর্য্যে মক্কা নগর হাবশীদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। তৎকালে য়ীমেন প্রদেশ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হাবশী রাজাদের অধিকৃত ছিল। য়ীমেনের শাসনকর্ত্তা আব্রাহা কোনও কারণে বহুসংখ্যক হস্তী ও পদাতিক সহ মক্কা নগর আক্রমণ করেন। এবং মক্কার প্রসিদ্ধ মন্দিরবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। কিছু দিন যুদ্ধের পর সন্ধির প্রস্তাব হইলে আবদুল মোতালিব আপনার গোধন প্রত্যর্পণের কথা সর্ব্বাগ্রে উত্থাপন করেন। আব্রাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি? তুমি মন্দিররক্ষার জন্য ভিক্ষা না করিয়া আপন গোধন ভিক্ষা করিতেছ?

তুমি কি অবগত নহ, আমি তোমাদের মন্দির নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি? মহম্মদ-পিতামহ ইহারা উত্তরে বলিয়াছিলেন, গোধন আমার সম্পত্তি, আর মন্দির দেবতাদের সম্পত্তি। দেবতাদের সম্পত্তি দেবতারাই রক্ষা করিবেন। এই ঘটনার পরে কোরেশ-বংশের সমরকৌশলেই হউক, বা খাদ্যের অসদ্ভাববশতঃই হউক, হাবশীরা মক্কার অবরোধ উঠাইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

কথিত আছে যে, আবদুল মোতালিব এক শত দশ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহার ছয় কন্যা ও তের পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। এই পুত্রের অন্যতম আবদালা দেখিতে যেমন সুশ্রী, ব্যবহারেও তেমনই সুশীল ছিলেন, এবং পিতার প্রিয়তম পুত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। জাহ্‌রাইট বংশের আমীনা নাম্নী কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। মহম্মদ আবদালার ও আমীনার একমাত্র পুত্র। ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের জন্ম পরিগণিত হয়। শৈশবেই তিনি মাতৃহীন হয়েন। তাঁহার পিতামহের সন্তান সন্ততিসংখ্যা অনেক থাকায় পৈতৃকধনবিভাগের সময় মহম্মদের অংশে কেবল পাঁচটি উষ্ট্র ও একটি হাবশীজাতীয়া দাসী পতিত হয়। তাঁহার পিতৃব্যগণের মধ্যে আবুতালেব তাঁহার অভিভাবক ছিলেন।

মক্কা নগরে খদিজা নাম্নী এক বিধবা রমণী বাস করিতেন। তাঁহার বাণিজ্য-ব্যবসায় ছিল। ২৫ বৎসর বয়সে মহম্মদ খদিজার এক জন কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হয়েন, এবং ক্রমে তিনি মনিবের এতাদৃশ বিশ্বাসভাজন ও স্নেহপাত্র হইয়া উঠেন যে, খদিজা তাঁহাকে পতিত্বেঃবরণ করেন। খদিজাকে বিবাহ করিয়া মহম্মদ প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েন, এবং চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি খদিজার সহবাসে গৃহস্থাশ্রমের সুখভোগ করেন। ইহার পর তাঁহার জীবনের স্রোতঃ ধর্ম্মের নূতন পন্থা-প্রবর্ত্তনের দিকে পরিণত হয়।

মহম্মদের সময়ে আরব দেশের লোকেরা অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করিত, এবং ঐ সকল দেবদেবীর নানাপ্রকার আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তৎসমক্ষে পূজা ও বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিত। ইহাই তাহাদের চিরাগত উপাসনাপদ্ধতি। প্রত্যেক বংশের, এমন কি, প্রত্যেক পরিবারের ইষ্টদেবতা বিভিন্ন ছিল। সকলেই স্বাধীনভাবে আপন আপন ইষ্টদেবতার পূজা করিত। তদ্ভিন্ন তাহাদের জাতীয় সাধারণ কয়েকটি দেবদেবী ছিল। এবং মক্কা নগরে একটি মন্দির ও তন্নিহিত একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ শিলা আরবমাত্রেরই চক্ষে পবিত্র ও পূজনীয় ছিল। এই মন্দিরের নাম কাবা। ইহার সন্নিকটে জেমজেম নামক কূপও পবিত্র বলিয়া গণনীয় ছিল। কাবা মন্দির অতীব প্রাচীন। খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেও এই মন্দিরের

অস্তিত্বের কথা শ্রুত হওয়া যায়। ইহার প্রশস্ত আয়তন চারি দিকে প্রাকারে বেষ্টিত, এবং প্রশস্ততোরণবিশিষ্ট। মন্দির শিলা ও কর্দ্দমে নির্ম্মিত। ইহার আকার সমচতুর্ভুজের ন্যায়। দৈর্ঘ্যে ২৪ হস্ত, বিস্তারে ২৩ হস্ত পরিমিত। কেবল একটি দ্বার ও একটি গবাক্ষ দিয়া আলোক প্রবিষ্ট হয়। মন্দিরের ছাদ তিনটি কাষ্ঠনির্ম্মিত স্তম্ভের উপর নিহিত। *

৺ উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

শঙ্কর দেব।

প্লাবনে নদী গিরি জল স্থলের, উপত্যকা ও সমতলের বিভিন্নতা থাকে না; সব একাকার হইয়া যায়। চৈতন্যদেবের কীর্ত্তনপ্লাবনের প্রখরতা ও গম্ভীরতা, যুগবিপর্য্যয়-শক্তি ও চিরস্থিতিত্বের ইতিহাস এখনও বঙ্গীয় ঐতিহাসিক অনুধাবন করিতে পারেন নাই। জাতি কুল, আচার ব্যবহার, ভাষা ব্যাকরণ, সে দিন একাকার হইয়াছিল;—জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্র সে দিন সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসারিত হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে সকলেই এক জাতি, সকলেই সকলের ভাষা বুঝে। আসামী ও উড়িয়া, শ্রীহট্টী ও মৈথিলী, বাঙ্গালা ও হিন্দী, সব ভাষা এক হইয়া যায়। চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ে সমগ্র বাঙ্গালার ভাষা—গান ও কীর্ত্তনের ভাষা এক হইয়া গিয়াছিল। উড়িয়ার করন্তি, অছন্তি, একবচন কর্ত্তার বহুবচন ক্রিয়া, অতীতে বর্ত্তমান, বর্ত্তমানে ভবিষ্যৎ, সেই মহোৎসবে সব হরিচ্ছত্র হইয়া গিয়াছিল। জ্ঞানদাসের কবিতার অর্থ, সম্বলপুরের আহীরিণীর মুখে শুনিয়া, চণ্ডীদাসের ক্রিয়ার রূপ শ্রীহট্টে বসিয়া, বুঝিতে পারি। বৈষ্ণবপদাবলী পরীক্ষা করিয়া যাঁহারা ভাষার স্তর বা বাঙ্গালা ভাষার ক্রমবিকাশের নির্ণয় করিতে অগ্রসর হন, বা ভাষার বিশেষত্ব দেখিয়া গ্রন্থকারের আবির্ভাব-কাল-নির্ণয়ে অগ্রসর হন, তাঁহাদের অসমসাহসিকতার প্রশংসা করিতে হয়। রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামে এখন যে সকল কবিতা রচিত হইতেছে, স্থান কালের উল্লেখ না করিয়া সাহিত্যপরিষদে তাহা তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা ভাষার নমুনা বলিয়া সপ্রমাণ করিয়া ভাষাতীর্থ কি ইতিহাসচুঞ্চু উপাধি লইতে কোনও কষ্ট হয় না।

* দুর্ভাগ্যক্রমে স্বর্গীয় লেখক প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।—সাহিত্য সম্পাদক।

শঙ্কর দেব ও মাধব দেবের রচিত বড়গীত মুদ্রিত হইয়াছে। ইঁহাদের কীর্ত্তনমালা এখনও পাই নাই। গ্রন্থখানি পড়িয়া গ্রন্থকারদের আবির্ভাবকালের নির্ণয় করা যায় না। শঙ্কর আপনাকে 'কৃষ্ণকিঙ্কর' বলিয়া সর্ব্বত্র, এবং মাধব আপনাকে এক স্থলে 'কৃষ্ণকিঙ্কর-কিঙ্কর' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শঙ্কর এক একটি গানে মল্ল নৃপতি বা মল্লদেবের ও শুক্লধ্বজ নৃপতির গুণগরিমার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহার আবির্ভাবকাল ঠিক বুঝা যায় না। ভাষা ব্রজবুলী, বাঙ্গালা ও আসামী। দুই তিনটি গান সংস্কৃত ভাষায় রচিত। পদলালিত্যে এগুলি জয়দেবের রচনার সমতুল্য।

মধুদানব দারণ-দেববরঃ
বরবারিজলোচনচক্রধরঃ
ধরণীধরধারণধোষপরঃ
পরমার্থবিদ্যাদ্ভুতনাশকরঃ।
* * * *
নতবন্ধুসুন্দরদীর্ঘভুজঃ
ভুজগাধিপতল্পশয়ানমজঃ
অজবাসববিগ্রহবিষগুরুঃ
গুণগোধনকামদকল্পতরুঃ।
* * * *
সহজাগ্রতসংযমলাক্ষচরঃ
চিদানন্দবিনোদনবেদবিদঃ
নিরুপমনবমঙ্গলকম্বুগলঃ
গলশোভিতকৌস্তভভীমবলঃ।

পদলালিত্য দেখিয়া রচনাকালের নির্ণয় করিতে হইলে, হিমালয়দর্শন-প্রণেতা তারা-মার তারাকুমার ও রামায়ণকার বাল্মীকিকে সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হয়। ব্রজবুলি ব্রজের ভাষা নহে। ব্রজসুন্দরের রসকেলিবর্ণনা সচরাচর যে ভাষায় হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রজবুলি বলে; ইহা ঠিক মৈথিলী ভাষা নহে, তবে তাহার সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বিদ্যাপতি হইতে ভানু সিংহ পর্য্যন্ত অনেকে অদ্যাপি এ ভাষায় মধুর রস বর্ণনা করিতেছেন।

মৈথিলী, আসামী, বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষা সংস্কৃতের কন্যা; বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের দৌহিত্রী। বাঙ্গালার পিতা অজ্ঞাতীয়। বয়ানুসারে বাঙ্গালা নিকৃষ্ট ভাষা। এবং সময়ানুসারে আসামী ও উড়িয়া প্রাচীন ভাষা। আসামীর

সহিত মৈথিলী, বাঙ্গালা ও উড়িয়ার সাদৃশ্য এত অধিক যে, আসামী ভাষায় রচিত কবিতা পড়িয়া বুঝিতে কোনও কষ্টবোধ হয় না। উচ্চারণের বিভিন্নতা হেতু শুনিয়া বুঝিতে একটু কষ্ট হয়, কিন্তু অন্তঃস্থ বয়ের উচ্চারণ সংস্কৃতের মত, এ জন্য দেব ও কেব লিখিত হয়। প্রাচীন লিপিতে অন্তঃস্থ ব ও র যেরূপে লিখিত হইত, অদ্যাপি আসামীয় ভাষা সেইরূপে লিখিত হয়। আমাদের বাঙ্গালা ডাগর শব্দ আসামী ডাঙ্গর শব্দসম্ভূত ;—শ্রেষ্ঠ জনকে আসামীয়েরা ডাঙ্গরীয়া বলিয়া সম্বোধন করে। বাঙ্গালা ভাষার দরদীর মত আসামী মরম ও মরমর সখী বড় মিষ্ট ; বাঙ্গালা ভাষায় এ দুটি শব্দ নাই। একটি আসামী কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসে যে প্রভেদ, শঙ্কর ও মাধবে সেই প্রভেদ। শঙ্করের পদাবলী অধিকাংশ ব্রজভাষায় রচিত, কচিৎ দু একটি আসামী গীত পাওয়া যায়। মাধবের অধিকাংশ আসামী ভাষায় রচিত, কয়েকটি ব্রজভাষায় পাওয়া যায়।

ভাটিয়ালী।

মোকে ইবর করুণা কবা নারায়ণ করুণাসাগর স্বামী
তোমার অভয় চরণে শরণ আশা করি আছোঁ আমি।
সনৎকুমার নারদ অনন্ত শঙ্কর শুক সনন্দে
তোমার অরুণ চরণপঙ্কজে সেবন্ত কত প্রবন্ধে।
তা সম্বাকে দেখি তোমার চরণ সেবিবাক করোঁ আশা
সিংহর গতিক ক্ষুদ্র মুষ হয়া ইচ্ছা করোঁ মতিনাশা।
মোর দুরাচার গুরুতর নষ্ট নাহি বুলি আছা বাণী
মজি দুরাচার তোমাক ভজিতে আশা করোঁ ভাগে নানি।
তোমার অনাদি অবিদ্যা তিমিরে অন্ধ করি আছে মোরে
তোমার নজানি দেহক মজি বুলি মজিলোঁ এ দুখ ঘোরে,
সন্তর সঙ্গতি তনু গুণ নাম পরম প্রসাদ দিয়া
কহা মাধব ইবার গোবিন্দ দাস কর মোক নিয়া।

বসন্তসঞ্চারে গাছে গাছে পিককুলের কুহুধ্বনি শুনা যায়। চৈতন্য দেবের ভাবতরঙ্গে বাঙ্গালা আসাম উড়িষ্যা যুগপৎ উদ্বেলিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-সঙ্গীতে উড়িষ্যা ও আসামের সাহিত্য জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তর্জ্জনীনির্দ্দেশে উড়িয়া বালক জগন্নাথকে যে ধিক্কার দিয়াছিল,—

দলি বলীরে ছলিলে, সুদামাকে রাজ্য দিলে
বড় দাতা নামের ধ্বজা বেঁধেছ—

সে কথা আজিও ভুলি নাই,—সে আজ পঁচিশ বৎসরের কথা। দুঃখী শ্যামের পরে উড়িষ্যায়, এবং শঙ্কর ও মাধবের পরে আসামে গণনীয় কবি আর কেহ জন্মে নাই।

আসামবুরুঞ্জী-কার স্বর্গীয় গুণাভিরাম বড়ুয়া রায় বাহাদুর শঙ্কর দেব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতা রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ হইতে এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"কুসুম্বর ভূঁয়ার ঘরত শঙ্করদেব জন্মহোবার পাছত ভাটী দেশলৈ গই আছি, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবলৈ ধরিছিল। তেঁও আন আনথি ভূঁয়া আছিল তার মাজত প্রধান হইয়ো বিষয় কার্য্যতকৈ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তোবা ভাল যেন পাই, তাকে করিবর অর্থে অনেক পুথী রচনা করি ধর্ম্মপ্রচার করিছিল" ইত্যাদি।—আসাম-বুরুঞ্জী; চতুর্থ সংস্করণ; ১০০ পৃষ্ঠা।

কুসুম্বর ভুঁইয়ার পুত্র শঙ্কর দেব বাঙ্গালা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। অন্যান্য ভুঁইয়ার মধ্যে প্রধান হইলেও তিনি বিষয়কর্ম্ম অবহেলা করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে আপনাকে নিয়োজিত করেন; বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাছাড়ীদিগের উপদ্রব হেতু বড়দোবাতে থাকিতে না পারিয়া তিনি ধোবাহাটাতে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার সঙ্গে বারভুঁইয়া-বংশীয় অনেকে ছিল। শঙ্কর দেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আসামপ্রচলিত তন্ত্রধর্ম্মা-বলম্বী ব্রাহ্মণেরা দেশের অমঙ্গলকারী ও সমাজবিপ্লব বলিয়া শঙ্কর দেবের বিরুদ্ধে চুহুমুঙ রাজার নিকট আবেদন করাতে, রাজা শঙ্করের নির্দ্দোষতার প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন। ইহার কিছু কাল পরে ভুঁইয়ারা কামরূপ হইতে ধোবাহাটায় যাইয়া বাস করে। রাজা তাহাদিগকে ভয় করিতেন। একদিন হাতী ধরিবার সময় রাজা শঙ্করের শিষ্যদিগকে এক দিকে প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যে দিকে শঙ্করের শিষ্যগণ প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, সেই দিক দিয়া হস্তী পলায়ন করে। তখন রাজা শঙ্করের শিষ্যদিগকে বন্দী করিবার জন্য আদেশ দেন। তখন সকলে পলায়ন করে, কেবল শঙ্করের জামাতা হরি ও শিষ্য মাধব গুরুকে পরিত্যাগ করেন নাই। রাজার আহোম সৈন্যগণ হরিকে হত্যা করে। মাধব বন্দী হন। ছয় মাস পরে মাধব মুক্তি পান। তখন শঙ্কর

ও মাধব কামরূপে যাইয়া বাস করেন। কতকগুলি ভুঁইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। যাহারা রহিয়া গিয়াছিল, রাজা তাহাদিগকে নানা উপাধি দিয়া রাজসরকারে চাকরী দিয়াছিলেন (১৫০৫ খৃঃ)।

শঙ্করের ধর্ম্মকে মহাপুরুষীয ধর্ম্ম বলে। শুক্লধ্বজ রাজার রাজত্বকালে এই ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। মাধবের রামযাত্রা শুক্লধ্বজের প্রাসাদে অভিনীত হইয়াছিল, এবং চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি সত্র স্থাপিত হয়।

মহাপুরুষীয় ধর্ম্মে রাম কৃষ্ণ একই পদার্থ। শঙ্কর ও মাধবের কবিতায় রামকৃষ্ণের বন্দন আছে। বঙ্গীয় বৈষ্ণবকবিদিগের কবিতায় রামের উল্লেখ অতি সামান্য।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবকবিদিগের সহিত শঙ্করের তুলনা করা চলে না। বঙ্গীয় কবিগণ উচ্চতর আকাশে। শঙ্করে ভক্তিরস প্রধান, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসে মধুর রস প্রধান। সংসারের অনিত্যতা, পাপের অনুশোচনা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, শঙ্কর ও মাধবের কবিতা পূর্ণ করিয়াছে। বঙ্গীয় বৈষ্ণবকবি এই নিম্নস্তর হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া রসরাজের লীলাচাতুরী অনুভব করিতেছেন,—সেখানে লুকোচুরি, ঠারাঠারি, সমানে সমানে রসিকতা। কৃষ্ণকে পিতা বা রাধাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন নিম্নশ্রেণীর ; দাস্য ভাবের উপরে সখ্যভাব ; বাঙ্গালী বৈষ্ণবের সখ্যভাব,—সেও নিম্নশ্রেণীর, সখার সহিত ব্যক্তিত্বে প্রভেদ আছে। তত্ত্বমসি মহাবাক্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ ; যখন তাঁহাতে ও আমাতে ভেদজ্ঞান রহিত হইয়াছে, তখন লোকে বৈষ্ণব হইয়াছে। সেই মধুর রস। কত পথ হাঁটিয়া কত কাঁদিয়া কত কষ্ট পাইয়া চৈতন্য শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হইয়া জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দেখিতে পাইলেন না। তিনি রাধা, কৃষ্ণবিরহিণী, কুশাঙ্কুরে চরণ ক্ষত, কণ্টকে বিবসনা, কৃষ্ণের সন্ধানে পাগলিনী,—জগন্নাথকে তিনি দেখিবেন কি করিয়া ? জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার চিরদুঃখ অতীত হইয়াছে ; তাঁহার আনন্দের সীমা কে করিবে ? এত দিনে তিনি কৃষ্ণকে পাইয়াছেন, চুপে চুপে গাহিতেছেন, পাছে হারাইয়া ফেলেন, বুক দুর্ দুর্ করিতেছে, বাম হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সখাকে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইতেছেন,—

> দেখ দেখ দেখ স্বরূপ ঐ শ্যাম রায়,
> ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে কদম্বতলায়।
> যুগল মৃণাল করে, অধরে মুরলী ধরে,
> রাধা রাধা রাধা বলে ডাকে উভরায়।

যদি বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে চাহ, এই চিত্রের সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব ও গভীরতা অনুভব কর। এ চিত্র কেবল বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবি চিত্রিত করিতে পারেন। শঙ্করের বড়গীতে ইহার আভাস পাইলাম না। কীর্ত্তনে কি আছে, জানি না।

শঙ্করের বড়গীতে শৈশব ও কৈশোরের বর্ণনা আছে যৌবনলীলা নাই বলিলে হয়। পূর্ব্বরাগ, সম্ভোগ, খণ্ডিতা, বিরহ, দিব্যোন্মাদ, কিছুই নাই। সুতরাং রসের যাহা সার, তাহার কিছুই নাই। গোষ্ঠ আছে। গোষ্ঠবর্ণনা সুন্দর; কিন্তু এখানেও বঙ্গকবির শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হয়। সে চাতুরী, সে বৈচিত্র্য, সেই এক টানে একখানি পূর্ণ চিত্র, ইহা শঙ্করের নাই। পদের লালিত্য—রুণ্ ঝুনু যথেষ্ট আছে।

পদলালিত্য ও রূপবর্ণনায় শঙ্কর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমতুল্য। আসামের ভুঁইয়ার ঘরে জন্মিয়া কেবল শ্রীচৈতন্যের প্রসাদে তিনি এই অপূর্ব্ব শক্তিসঞ্চয় করিয়াছিলেন।

১

ধরে সখি পেখোরে।
কমললোচন চললি নন্দকুমার।
ইন্দু বদন, কোটী মদন
রূপে ভুল মুহি যারা।
মকরকুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ড,
গলে গজমতি দুলে।
তড়িতাম্বর শ্যামসুন্দর
শিরে শিখিপুচ্ছ ডুলে॥
করকঙ্কণ কিঙ্কিনী কণক
ঝলকে চলে গোপাল।
পঙ্কম পূরে লম্বিত উরে
কেলিকদম্বক মালা।
পদপঙ্কজ মঞ্জীর ঝুরে
হরয় চিত্ত হামারু
শঙ্কর কহ, ছাড় বিরহ,
ওহি জগত আধারু॥

২

হেরহু মায়, চললি বিপিনে সবাই।
বেণু বিষাণ নিশানে আবত,
হরষে হরষে ধেনু ধায়।
ওহি জগমোহন কক্ষে দধি ওদন
গোধন আগু বুলায়।
বঙ্কিম নয়ন সরোরুহ হাসি
হেরইতে ভুবন ভুলায়।
মদন দমন রূপ পেখি পুনু পুনু
মুরুছি পড়য় সুরনারী।
সোহি জগজীব বিয়োগ অব সহবি
কৈচন চিত্ত হামারি॥
হরিবিরহানল আকুল গোপিনী
দরশন দিবসে ন পায়,
হরিগুণ কহি রহি প্রেমে ঝুরয় নীর,
শঙ্কর এহ রস গায়॥

৩

দেখু সখি মধুর মুরতি হরি,
ধরি অধরে পুরে মুরলী।
তনু অভিনব ঘন কালা,
উরে লুলে কদম্বক মালা।
পীত অম্বর তড়িতজ্যোতি
ঝলে কম্বুগলে গজমতি।
মণি কৌস্তুভ কণ্ঠত লুলে,
চারু শিরে শিখণ্ডক ডুলে।
নীল অলক লোল কপোল
কর্ণত মকরকুণ্ডল ডোল।
ভুজকঙ্কণ বন্ধে কেয়ূরে
কটীত কনককিঙ্কিণী ঝুরে।
পদপঙ্কজ মঞ্জীর রোলে,
কৃষ্ণর কিঙ্করে শঙ্করে বোলে।

৪

বালক গোপালে করতরে কেলি,
উচ্ছারা পাঞ্চনী নাচে হাসে গোপ মেলি।
নীল তনু পীতপট ধটী কটি জোর
নবঘন ঘন খেচে বিজুলী উজোর।
শিরে শিখণ্ডক ডোলে, গলে গজমতি,
কোটি মদন মন মোহন মুরতি।
চরণে মঞ্জীর ঝুরে, উরে হেমহার,
শঙ্কর কহ ওহি হরিক বিহার।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

তরাই প্রদেশে বৌদ্ধ যুগের নগরাদি।

নেপালের তরাই প্রদেশে বৌদ্ধ যুগে যে সকল নগরাদি বর্ত্তমান ছিল, সম্প্রতি এক জন নেপালী সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; এই লেখক সাধারণ লোক নহেন, তাঁহার নাম যুবরাজ খড়্গ সমসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর, তিনি পশ্চিম নেপালের শাসনকর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

লেখক বলিয়াছেন, একালে 'রাজ্য' বা 'নগর' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সেকালে ঠিক তাহাই বুঝাইত না। গ্রামগুলি সেকালের নগর ছিল; তালুকগুলিই রাজ্য নামে পরিগণিত হইত। তালুকদারেরা 'রাজা' নামে খ্যাত হইতেন।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে "শ্রাবস্তী" নামক নগরের উল্লেখ দেখা যায়। অযোধ্যা প্রদেশের

শ্রাবস্তী।

উত্তরে অর্থাৎ উত্তরকোশলে এই নগর অবস্থিত ছিল। ইহার নিকটে যে পর্ব্বত ছিল, সেই পর্ব্বতের পার্ব্বত্য অধিবাসিগণের সহিত শ্রাবস্তী নগরের অধিবাসীদের প্রায়ই বিবাদ বিসংবাদ হইত। এই নগর হইতে কপিলাবস্তু নগরের দূরত্ব অধিক ছিল না। উভয় নগর রাজপথ দ্বারা সংযুক্ত ছিল। এই পথের উপরই সম্ভবতঃ সুরাছি, দেওথর, ডগ প্রভৃতি স্থান অবস্থিত ছিল।

সরখেত।

সরখেত নগর কপিলবস্তুর ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। "খেত" শব্দটির অর্থ বস্তী। এই স্থানটিতেই প্রাচীন যুগের শ্রাবস্তী শিকেট নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সরখেতের উত্তরে শালিয়ান ও দেয়লেখ জেলা। এই 'দেয়লেখ' বোধ হয় প্রাচীন কালের দেবলোক। ইহার দক্ষিণে বাঙ্কি জেলা। পূর্ব্বে "ডগ" এবং পশ্চিমে গিরিমালা। এই সকল পাহাড় সারদা নদীর উত্তরে অবস্থিত। বাঙ্কি, বাঙ্ক বা নেপালগঞ্জ হইতে সরখেতের দূরত্ব প্রায় ৩৬ মাইল। সরখেত একটি উপত্যকা, ইহা উত্তর দক্ষিণে পঁচিশ মাইল দীর্ঘ, ইহার বিস্তার আট মাইল। উপত্যকাটি এখন একরূপ জনশূন্য, কেবল শালবন ও বংশবন ইহার আরণ্যশ্রী বর্দ্ধিত করিতেছে। দূরে দূরে দুই চারিখানি গ্রাম। এই সকল গ্রামের মধ্যে রামবিকাদ, দেবখলি, দাউদার নাম উল্লেখযোগ্য। আমার কোন বন্ধু আমার অনুরোধে এই সকল স্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, রামবিকাদে একটি অষ্টকোণ স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভটি অতি সুন্দর, তাহার অগ্রভাগ ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়াছে। এই স্তম্ভটি ভীমসেনের বাণ নামে প্রখ্যাত। সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিয়েনসাং যে স্তম্ভের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এই স্তম্ভ তাহার সহিত অভিন্ন কি না, তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

প্রত্নতত্ত্ব।

এ অঞ্চলে গোধূমাদি শস্য প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সুবিস্তীর্ণ আরণ্য প্রদেশের আর পূর্ব্ববৎ উৎপাদিকা শক্তি নাই। হস্তী ও অন্যান্য আরণ্য জন্তু এই অরণ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করে। বর্ত্তমান সময়ের সুশিক্ষিত গবর্মেণ্ট এই সকল ভূমি উর্ব্বরা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইহার প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ধারের কোনও চেষ্টাই হইতেছে না। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। কথিত আছে, এখানে প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষচিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। আমি এখনও সে স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিতে পারি নাই, আগামী বৎসর উক্ত অঞ্চলে গমন করিব, স্থির করিয়াছি। রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বোধ হয়, প্রমাণিত হইবে যে, প্রাচীন শ্রাবস্তী ও শকেত দুইটি সন্নিকটবর্ত্তী নগর ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যেখানে ডগ, দেওখর ও সরখেত নামক পল্লীসমূহ অবস্থিত, উক্ত নগরদ্বয় সেই স্থানেই বিদ্যমান ছিল।

বাঙ্কির আরও পশ্চিমে দৈবাটের নিকটে কুরু, হাওয়া, তোমলি, নেপালগঞ্জ কিংবা বাপ্তি নদীর তীরদেশে অবস্থিত মাটিপট নামক স্থানে যে জনশূন্য স্থান পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাচীন কালের বাকু নগর সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। এখন যেখানে চানঘর, গোশিঙ্গ, বুদ্ধি প্রভৃতি স্থান বর্ত্তমান, সেইখানেই প্রাচীন চম্পা নগর ছিল। কপিলবস্তুর সন্নিকটে ছাপ নামক একটি স্থান আছে; চাম অথবা ছাপ এই নামের সহিত চম্পা নামটির সাদৃশ্য আছে।

কপিলবস্তু।

শুদ্ধোদন যখন কপিলবস্তুর নরপতি ছিলেন, সে সময়ে ইহা সকদক্ষিণের গিরিশ্রেণী হইতে উত্তরে বাস্তী জেলা পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বে কোঠী হইতে পশ্চিমে বাণগঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সুপ্রবুদ্ধের মৃত্যুর পর দেবদহ রাজ্য কপিলবস্তুর সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। তখন ইহা পূর্ব্ব দিকে তেনাও ও দক্ষিণে গোরক্ষপুর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। কোনও যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে এই উভয় রাজ্য

সম্মিলিত হয় নাই। মৃত্যুকালে সুপ্রবুদ্ধের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার কন্যাই সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হন। এই কন্যাই বুদ্ধের বিমাতা। বুদ্ধের সময় এ ইরাজ্যে যে সকল সমৃদ্ধ নগর ছিল, তন্মধ্যে সাগর হাওয়া, সিগলি হাওয়া, তৌলি হাওয়া, গতি হাওয়া, শিসন হাওয়া, কুওয়া, হাতি হাওয়া, চোতি, সোর হাওয়া, বিকুলি, শ্রীনগর, সাইনামাইনা (পুরাতন রাজধানী) ধাবা, ডহর গ্রাম, কেদলী, পাদারিয়া, লুম্বিনীর নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন আর একটি স্থান ছিল, তাহার নাম 'প্রসিদ্ধবটাবলী'। এই স্থানটি উক্ত প্রদেশের সীমান্তভাগে অবস্থিত ছিল। এখন বৃটীশ-সীমার উত্তরে, অর্থাৎ লোতনের উত্তরে কয়েকটি বট বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি পলাশবৃক্ষও আছে। সম্ভবতঃ এই সকল বট বৃক্ষের নাম অনুসারেই স্থানটির নাম হইয়াছিল প্রসিদ্ধবটাবলী। কিন্তু স্থানটির নামের পূর্ব্বে 'প্রসিদ্ধ' এই বিশেষণ সংযুক্ত হইয়াছিল কেন, কি জন্য উক্ত স্থান প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। ইহার সন্নিকটে যে গিরিশ্রেণী আছে, সেখানে অনেক ঋষি ও মহাত্মা বাস করিতেন। তাঁহারা শাক্যবংশীয়দিগের মঙ্গলের জন্য দেবোপাসনা প্রভৃতি দৈবকার্য্য করিতেন, এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানে অবহিত থাকিতেন।

কপিলবস্তুর উত্তর সীমায় সাগর হাওয়া, শ্রীনগর, চিকুলি নগর, দক্ষিণ সীমায় তাউলি হাওয়া নগর, পূর্ব্ব সীমায় যমনার নদী ও পশ্চিম সীমায় বাণগঙ্গা নদী ছিল। বোধ হয়, পরে নদীদ্বয়ের গতিপথ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

কপিলবস্তু অতি বৃহৎ নগর ছিল। বাণগঙ্গা নদী ইহার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত। তিলোরা কোট একটি সুন্দর দুর্গ। আমি দুইবার তাহা দেখিয়াছি। ইহার অনেকগুলি প্রাচীর, বিশেষতঃ উত্তর দিকের প্রাচীর বিধ্বস্ত অবস্থাতেও দণ্ডায়মান আছে। ইহার পরিধি প্রায় দুই মাইল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ্‌সাংয়ের কোনও কোনও ভক্ত সন্দেহ করিতে পারেন যে, শ্রীনগরেই রাজপ্রাসাদ ছিল; ইহার স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে।

তিলোরা হইতে ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব ও লুম্বিনীর দশ মাইল উত্তরে, কপিলবস্তুর সন্নিকটবর্ত্তি পর্ব্বত-সীমায় যোগদামর নামক একটি স্থান আছে। সেখানে কতকগুলি ইষ্টক ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এ স্থানটির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না, তবে এখানেও ঋষিগণের বাস ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

যোগদামর।

জাপানী কাহিনী।

শ্রীযুক্ত ডগলাস স্লেডেন জাপান ভ্রমণ করিয়া আসিয়া জাপানীদিগকে পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পীয়ের লোটী ভিন্ন আর কেহ বোধ করি এমন করিয়া জাপানের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। স্লেডেনের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, আমরা বুঝি সত্যই

জাপানীদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা লক্ষ্য করিতেছি। বস্তুতঃ জাপান সম্বন্ধে এই ইংরাজ লেখকের পুস্তকখানি অনুপম হইয়াছে।

জাপানী গৃহ।

লেখক বলিতেছেন, জাপানীদের গৃহনির্ম্মাণপ্রণালীতে কিছুমাত্র জটিলতা নাই। চারি কোণে চারিটি খুটী, তাহার উপর ছাদ। ছাদে পীতবর্ণের টাইল। ঘরে যে সকল 'আড়া' দেওয়া হয়, তাহা যে ছাদকে ধরিয়া রাখিবার জন্য, তাহা নহে, দেওয়ালের জন্যই তাহা আবশ্যক। গৃহপ্রাচীর কাগজনির্ম্মিত। মেঝে ভূমি হইতে এক ফিট উচ্চ। জাপানী গৃহমাত্রই একতলা। ছোট ছোট বাড়ীগুলির ভিতর দিনের বেলা কেবল একটা ঘরই দেখা যায়। গৃহস্বামীর যতগুলি শয়নকক্ষ আবশ্যক, রাত্রে সেই বড় গৃহটি ততগুলি কক্ষে পরিণত হইতে পারে, পায়রার খোপের মত কতকগুলি কুঠুরী করিবার জন্য রাত্রে কাগজের দেওয়াল ঝুলাইয়া দিলেই হইল। অবশ্য দরজা থাকে না। কুঠুরীর ভিতর হইতে কোথাও যাইতে হইলে দেওয়াল ঠেলিলেই পথ হয়। গৃহপ্রাচীরের বাহিরের দিকটা কাঠের, ভিতরের দিকে কাগজ। সুতরাং অনেক জাপানী গৃহই এমন কম মজবুত যে, রাত্রে যদি কোন মাতাল তাহাতে দুই চারিটি ধাক্কা দেয়, তাহা হইলে সে সকল গৃহে মহা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। আজ কাল জাপানে কেহ কেহ বাতায়নে কাচ ব্যবহার করিতেছেন, উহা জাপানী প্রথার অনুরূপ নহে। কাগজের ভিতর দিয়া যেটুকু আলোক গৃহে প্রবেশ করে, সেই আলোকেই জাপানীরা সাধারণতঃ সন্তুষ্ট। জাপানীরা বড় বাতাস ভালবাসে। যে দিন বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা না পড়ে, সে দিন গরীব জাপানীরা ঘরের সম্মুখের প্রাচীর খুলিয়া রাখে। রৌদ্র প্রখর হইলে নীল বা বাদামী রঙ্গের পরদা ঝুলাইয়া দেয়। সেই পরদায় গৃহস্বামীর নাম সংক্ষেপে লিখিত থাকে।

জাপানী গৃহের এইরূপ সহজসাধ্য নির্ম্মাণকৌশলের কথা শুনিয়া মহাশয়েরা তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবেন না, কিংবা কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন না। জাপানের প্রাকৃতিক সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এইরূপ গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। জাপানে সর্ব্বদা ভূমিকম্প হয়, বিশেষতঃ প্রবল ঝটিকার অভাব নাই; মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ভূমিকম্প হওয়াতে সানফ্রানসিস্কোর লোকেরা বাধ্য হইয়া কাঠের ঘর করিয়াছে। সেখানে মিঃ ফ্লড্ নামক এক জন মার্কিণ কোটীপতির একটি কাঠের প্রাসাদ দেখিয়াছিলাম,—তাহার নির্ম্মাণে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। তথাপি সেই দারুপ্রাসাদ দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, তাহা বড় রকমের পুতুলের ঘর। তাহার সহিত প্রস্তরের কোনও সম্বন্ধ নাই, কেবল দারু। জাপানী গৃহের এইরূপ নশ্বরতা ও সঙ্কীর্ণতা কিয়দংশে জাপানীদিগের সহায়স্বরূপ হইয়াছে। জাপানীদিগের অভাব যত অল্প, পৃথিবীর কোনও সভ্য জাতির অভাব তত অল্প নহে।

জাপানী গৃহে দরজা নাই, আলমারি বা দেরাজ নাই, এমন কি, জলখাবা টেবিল পর্য্যন্ত নাই। আছে কেবল কতকগুলি বাক্স,—একটির উপর অন্যটি সজ্জিত। রন্ধনগৃহে ডেকচি, হাঁড়ি, কড়া প্রভৃতির কোনও আয়োজন নাই, বৈঠকখানাতেও টেবিল চেয়ারের কোনও বন্দোবস্ত নাই। এদেশী জাপানী গৃহে বৈঠকখানা ও শয়নকক্ষ নাই,—শয়নকক্ষের

খুটিকতক প্রাচীর সরাইয়া দিলেই তাহা বৈঠকখানায় পরিণত হয়। জাপানী গৃহে দুটি জিনিসের একাধিপত্য, মাদুর, আর কয়লার উনন (Charcoal stove)। এই ষ্টোভে হাতের আঙ্গুল হইতে চায়ের কেটলি পর্য্যন্ত সকলই গরম করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এমন কি, আবশ্যক হইলে তাহার সাহায্যে আত্মহত্যা করিবারও অসুবিধা হয় না। এতদ্ভিন্ন আরও দুই একটি জিনিস সেখানে দেখিতে পাইবেন,—খান দুই আসন, দুই একটা তুসুক, এবং উদার শিষ্টাচার। এইগুলিই জাপানী গৃহের প্রধান আসবাব। জাপানীদের কাঁটা নাই, চামচ নাই, টেবিলক্লথ নাই, এমন কি, মদের গেলাস পর্য্যন্ত নাই! অভাবকে যাহারা এমন ভাবে উপেক্ষা করিতে পারে, তাহাদের সহসা বিপন্ন করা সহজ নহে; দীর্ঘকাল তাহাদের রাজ্য অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাহাদিগকে বিপন্ন বা বিপর্য্যস্ত করা যায় না।

সৌন্দর্য্যানুভূতি।

জাপানীদিগের সৌন্দর্য্যানুভূতি বড় প্রবল। বাড়ীর আঙ্গিনায় যদি তাহারা দশ বর্গ ফিট জমী পায়, তাহা হইলে সেইটুকুর ভিতরই তাহারা নন্দনকানন নির্ম্মাণ করিতে পারে। নগরোপকণ্ঠে যে সকল জাপানীর কয়েক বিঘা মাত্র জমী আছে—সেখানে তাহারা এমন সুন্দর সুসজ্জিত বাগান প্রস্তুত করিতে পারে যে, কোন নবাব বাদশাহেরও তাহা আকাঙ্ক্ষার বস্তু। জাপানীরা কৌশলে বৃক্ষ খর্ব্বাকার করিয়া রাখে, অনেক বয়স হইলেও তাহাদিগকে বাড়িতে দেয় না। অতি তুচ্ছ সামগ্রীও জাপানীরা উপেক্ষা করে না, এবং তাহা কাজে লাগাইবার জন্য এমন যত্ন ও পরিশ্রম করে যে, অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। এই ধৈর্য্য ও অবস্থার অস্বচ্ছলতার মধ্যে আনন্দলাভের জন্য এই আন্তরিক যত্ন পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে জাপানীর বিশেষত্ব পরিব্যক্ত করিতেছে।

জাপানী সর্ব্বদাই স্মিতমুখ। কাজ পাইলেই তাহারা কাজে লাগিয়া যায়, কোন কাজ পরে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখে না। সপ্তাহে ছয় দিন অন্তর রবিবারে তাহাদের বিশ্রাম করিবার সুবিধা নাই, কোন জাতীয় উৎসবের দিন তাহারা বিশ্রাম করিতে পায়। সে দিন সে ছেলেমেয়েদের বা পরিবারবর্গকে লইয়া কোনও মন্দিরে উৎসব করিতে যায়। পরিবারের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য ইহারা অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হয় না। ছুটীর সময় ইহারা অনেক দূরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দেখিয়া বেড়ায়, সঙ্গে যে সকল জিনিস লইবার আবশ্যক হয়, তাহা তাহারা একটা বাক্সে পুরিয়া বাক্সটা মোমজাম দিয়া মুড়িয়া লয়। কোন একটা সরাইএ উপস্থিত হইয়া রাত্রিযাপন করিতে হইলে দুই পয়সা বিছানার ভাড়া দিতে হয়। খাদ্যদ্রব্যের জন্যও অধিক অর্থব্যয় করিতে হয় না।

রমণীসমাজ।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে রমণীসমাজের বড় দুর্দ্দশা, পাশ্চাত্যদেশের লোকের এইরূপ ধারণা। জাপানী রমণীদিগের অবস্থা দেখিয়া মিঃ প্লেডেনের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। তিনি বলেন, জাপানের রমণীসমাজে ইউরোপীয় প্রভাবে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সকল শ্রেণীর রমণীই এখানে স্বামীর পরিচারিকামাত্র, তবে স্বামী ইচ্ছা করিলে পত্নীকে দাসীভাবে না দেখিলেও পারেন। মিঃ প্লেডেনের কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচ্যের যাহা বিশেষত্ব, জাপানী রমণীসমাজ তাহা হইতে এখনও বঞ্চিত হয় নাই। আমাদের দেশের হিন্দুললনাগণ সংসারে দাসীত্ব করা অগৌরবের

কাজ বলিয়া মনে করেন না, তাহাতে হীনতা বা নীচতা নাই। জাপানেও পত্নী স্বামীর সকল কাজই করেন, তাঁহার কাপড় সেলাই প্রভৃতি কার্য্যেও আপত্তি প্রকাশ করেন না, স্বামী কথা কহিলে তবে কথা কহিতে পান। স্বামীর সহিত পাশাপাশি যাইবার যথেষ্ট স্থান থাকিলেও তিনি কোথাও যাইবার সময় স্বামীর অনুগমন করেন, পাশাপাশি চলেন না।

এই নিয়মের যে কখনও ব্যতিক্রম হয় না, এমন নহে। সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে এই ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। সম্ভ্রান্তবংশীয় জাপানরমণীগণ (বিশেষতঃ যদি তাঁহারা ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন) সমাজে ঠিক ইউরোপীয় রমণীগণের ন্যায় সম্মানিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদাদি ইউরোপীয় মহিলাগণের অনুরূপ, এবং ইউরোপীয় কামিনীগণের ন্যায় তাঁহারা স্বামীর পার্শ্বচারিণী হইতে পারেন, এমন কি, কখন কখন স্বামীর অগ্রগামিনীও হইয়া থাকেন।

জাপানে যে সকল রমণী শ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদের স্বাধীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের ক্ষমতা আছে বলিয়াই বোধ হয় তাহারা এত স্বাধীন। জাপানে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ অতি সহজ। শতকরা তেত্রিশ বিবাহিতা নরনারী এ দেশে বিবাহবন্ধনচ্ছেদন করে,—শুনিয়া কেহ চিন্তিত হইবেন না। উচ্চ শ্রেণীতে, এমন কি, মধ্য শ্রেণীতেও, বিবাহবন্ধনচ্ছেদের তেমন প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না; কলঙ্কভয়ই ইহার প্রধান কারণ। শ্রমজীবিনী রমণীগণের সে ভয় নাই, তাহারা অনায়াসেই স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে। তাহারা, যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই অনায়াসে তাহাদের দিনপাত হইয়া থাকে। উহাদের কলঙ্কে ভয় নাই।

জাপানে খুব ধনাঢ্যের কন্যারাও পিতামাতার নিকট যৌতুক পায় না, সুতরাং যদি দৈবাৎ বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার সময় আইনানুসারে উহারা স্বামীর নিকট ভরণপোষণের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কোনরূপ বৃত্তির অধিকারিণী নহে। পুত্র না থাকিলে কন্যাই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে। এই প্রকার উত্তরাধিকারিণীদের সৌভাগ্যের ইয়ত্তা নাই, স্বামী তাহাদের গোলাম। স্ত্রীর নামে সে সকল স্বামীর নামকরণ হয়। তাহার পর যদি স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করে, তাহা হইলেই স্বামীর সর্ব্বনাশ ;—পিতৃপিতামহের নামটাও যায়, পেটও ভরে না!

জাপানী রমণীরা খুব পাইপ টানে। এক এক পাইপে তিন তিন টান, ইহাই নিয়ম। পাইপেই জাপানী যুবতীগণের সৌখীনতা ও বিলাসিতা। জাপানের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অল্পে সন্তুষ্ট। জাপানীদের লিখিবার কালি সর্ব্বদাই শুষ্ক অবস্থায় থাকে। কলম বংশনির্ম্মিত, তাহার অগ্রভাগে তুলি সংলগ্ন। ইহারা থলের ভিতর তামাক লইয়া বেড়ায়। তামাক টানিবার জন্য ছোট পিতলের নল আছে; সিগারেট টানিবার জন্য সচরাচর যে সকল নল দেখা যায়, তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

সম্ভ্রান্ত জাপানী মহিলাগণকে বিদেশীরা প্রায় দেখিতে পান না। তবে যখন 'জিন্‌রিক্সা' নামক নরবাহিত যানে চড়িয়া রমণীগণ ভ্রমণে বহির্গত হন, তখনই তাঁহারা নরলোকের নেত্রগোচর হইয়া থাকেন।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

প্রবাসী। মাঘ। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ নামক" সুদীর্ঘ 'সর্মন'টি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। লেখক উপদেশ দিতেছেন,—"বেদান্তনামধারী ও রূপান্তরিত নাস্তিকতাকে তোমরা ঘৃণা কর; উহা হইতে ঘৃণাতে মুখ ফিরাও। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এরূপ উক্তি নিতান্ত গোঁড়ার মুখেও শোভা পায় না, শিবনাথ বাবুর মত মণীষীকে তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই। রাজা রামমোহন রায় বেদান্তের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক ও আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় যে ডালে বসিয়াছেন, অকুতোভয়ে স্বয়ং সেই ডালটি কাটিতেছেন। ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে প্রতিভাশালী দার্শনিকগণ বেদান্তের আলোচনায় প্রাণপাত করিতেছেন, আর শাস্ত্রী মহাশয় দিবালোকে সেই বেদান্তকে ঘৃণা করিতে বলিতেছেন! দুরবগাহ ও সুবিস্তীর্ণ বেদান্তশাস্ত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের অধিকার কিরূপ, আমরা তাহার পরিচয় পাই নাই, কিন্তু বেদান্তে তাঁহার শ্রদ্ধা নাই, উদ্ধৃত উক্তি তাহার প্রমাণ। শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবতঃ জানেন যে, বেদান্ত এ দেশে কেবল 'দর্শন' বলিয়া গণ্য নয়, বেদান্তের মত অনেকের উপজীব্য,—জীবনের প্রিয়বস্তু,—ধর্ম্ম। পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা সভ্যতার ও শীলতার একটা প্রধান লক্ষণ। কোনও কারণে পরধর্ম্মের নিন্দা করিতে নাই। ঘৃণা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। ধর্ম্মমন্দিরের বেদী বা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা হইতে শিষ্যবর্গকে ঘৃণা শিখাইবার আবশ্যক নাই। মানব-হৃদয়ে স্বভাবতঃ ঘৃণারই আতিশয্য,—শ্রদ্ধারই একান্ত অভাব। যাঁহারা লোকশিক্ষক, তাঁহারা শিষ্যসমাজে শ্রদ্ধাবুদ্ধিরই উদ্বোধন করুন। যাহা আপনার মতের বিরুদ্ধ, অথবা আপনি যাহা বুঝিতে পারি না, কিংবা আমার যাহা বুঝিবার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, তাহাই ঘৃণার বস্তু হইতে পারে না। যিনি "বিমল প্রেমে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য শিষ্যবর্গকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, তিনিই বেদান্তকে "রূপান্তরিত নাস্তিকতা" বলিতেছেন, স্বদেশে বদ্ধমূল ধর্ম্মান্তরকে ঘৃণা করিতে শিখাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে। "বিমল প্রেম" কি কেবল সম্প্রদায়বিশেষের একচেটে? বেদান্ত বা অন্য ধর্ম্ম কি তাহার এক বিন্দুর আশাও করিতে পারে না? ধর্ম্ম প্রচারকের ভূমিকায় এতটা পরধর্ম্মদ্বেষ ও ঘৃণার হলাহল অত্যন্ত সাংঘাতিক বলিয়া মনে হয়। অন্য কেহ এরূপ অপরাধে লিপ্ত হইলে আমরা উপেক্ষা করিতাম, ভারতচন্দ্রের উপদেশমত হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় শ্রদ্ধাস্পদ সুধীর অসংযত উক্তি উপেক্ষিত হইতে পারে না। "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরো জনঃ।" আজ তিনি যাহার নিন্দা করিলেন, কালে তাহা আগাছার ন্যায় সকলে পদ

হইতে পারে। তাই আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত এই শোচনীয় ধর্ম্মনিন্দার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "সম্পাদকের বিপদ" নামক গল্পটির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। তবে ইহা "সম্পাদকের বিপদের" একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বটে। প্রত্যেক সংখ্যায় 'গল্প' দিবার রীতি থাকিলে সকল সম্পাদক-কেই এমনতর বিপদে পড়িতে হয়। সুখের বিষয়, 'মুস্কিল-আসান' ঔপন্যাসিকের আজ কাল অভাব নাই। তাই সম্পাদককুলের অনেক 'মুস্কিলে' সহজেই আসান হইয়া যাইতেছে। চারু বাবুর গল্পটি অত্যন্ত বিলাতী, এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। বিলাতী আখ্যানবস্তু ও বঙ্গীয় কল্পনার মিলনে আজ কাল সঙ্কর রচনার অত্যন্ত দলপুষ্টি হইতেছে। সাহিত্যের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ নহে। গল্পের শেষে চারু বাবুর নায়ক বিশ্বরূপ বলিয়াছেন,—"তাঁহারা (সম্পাদকগণ) লেখকদিগকে copying-machine (নকল করিবার কল) ভিন্ন আর কিছু মনে করেন কি না জানি না।" চারু বাবুর নায়কের এরূপ অনুমান করিবার কারণ কি, বলিতে পারি না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইতেছে, আলোচ্য গল্পটি পড়িয়া মনে হয়, এ দেশের লেখক-সমাজে 'নকল করিবার কল' একবারে দুর্লভ নহে! শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর "মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের তৃতীয় যুগ" উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। লেখকের মতে, "এই যুগে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দ্বারা মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের কতকটা উন্নতিসাধন হইয়াছে বটে, কিন্তু যত দূর হওয়া উচিত, তত দূর হয় নাই।" জাতীয় ইতিহাসে মারাঠী সাহিত্য ভারতবর্ষীয় সকল ভাষা অপেক্ষা অধিক অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠ; লেখক তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে আমরা আনন্দিত হইব। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের "প্রবাসে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি" উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্রের তিব্বতে হিন্দু পরিব্রাজক" সুখপাঠ্য কৌতূহলোদ্দীপক রচনা। আমরা মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে অধুনাতিব্বতবাসী বাঙ্গালীর কাহিনীটুকু উদ্ধৃত করিতেছি।—"কর্ণেল ইয়ংহজব্যাণ্ডের সহিত একটি বাঙ্গালী গিয়াছেন। ইনি তিব্বতের অন্তর্গত খাম্বাজঙ্গে প্রায় তিন মাস ছিলেন, এবং এখন দুর্গম্য জলাপলা অতিক্রম করিয়া চম্বি উপত্যকায় উপস্থিত। চম্বিতে এখন ভয়ঙ্কর শীত। মসীজীবীদের বিপদ, দোয়াতের কালী জমিয়া প্রস্তরবৎ, সুতরাং একমাত্র পেন্সিল ভরসা। ইনি পটেড্ মিট্ ইত্যাদির সাহায্যে দুরন্ত শীতকে কদলী প্রদর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাম্বুতে রজনীযাপন করিতে-ছেন। ইহাঁর নাম লিখিলে পাছে, গুপ্তসংবাদ প্রচারের লেঠায় পড়িতে হয়, তাই লিখি-লাম না। কলিকাতায় অনেকেই ইহাঁকে জানেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার ইনি সমস্ত ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়াছেন এবং নেপাল রাজধানী কাটামুণ্ডুতেও কয়েক বৎসর ছিলেন। * * * ইনি অশ্বারোহণে ভন্ গিলপিন্ এবং নারীসেবায় (chivalry) সিদ্ধহস্ত যদিও স্বয়ং ব্রহ্মচারী। কান্ড নেপালে তাঁহার সাধ মিটে নাই, তাই এখন তিব্বত হইতে স্পর্দ্ধা করিয়া দক্ষিণদেশবাসী ভ্রাতাকে লিখিয়াছেন, 'তোমরা বল হিমালয় উত্তরে, আমি বলি হিমালয় দক্ষিণে'।" আমরাও এই 'শালপ্রাংশু মহাভুজ' পরিব্রাজককে চিনি। আশা করি, জগতের ভ্রমণকারিগণের চিরলোভনীয় 'লাসা' নগরী দর্শন করিয়া তিনি সুস্থশরীরে

স্বদেশে ফিরিবেন। বঙ্গের সমতল হইতে পৃথিবীর ছাদবাসী স্বদেশী পরিব্রাজকের উদ্দেশে তদীয় বহুদিন বিস্মৃত বন্ধুর আন্তরিক সম্ভাষণ,—'শিবাস্তে পন্থানঃ।' শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র সোম "বলী দ্বীপ" প্রবন্ধে তদ্দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বালি দ্বীপের প্রকৃত ও বিশুদ্ধ নাম 'বলী'। লেখক কি সূত্রে এই বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে প্রবন্ধটির মর্য্যাদা বাড়িত। আমরা সকলকে এই তথ্যপূর্ণ রচনাটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে বলি। "আড়ি ও ভাব" শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচিত একটি গল্প। গল্পও বড় অল্প। আকারে 'ছোট' হইলেই 'ছোট গল্প' হয় না, এ দেশের অনেক লেখক তাহা জানেন না, বা মানেন না। কিন্তু ফল সমান; বাঙ্গালা মাসিকের গড্ডলিকাপ্রবাহে প্রকৃত 'ছোট গল্প' কচিৎ দেখা যায়। ছোট গল্প তথাকথিত উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ,—ঠাকুরমার উপকথা, বা কথাকাটাকাটি নয়। তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। মোপাসার গল্পগুলি 'ছোট গল্পে'র আদর্শ। যাঁহারা গল্প লিখিতে চান, তাঁহারা মোপাসার গল্পগুলির অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে উপকৃত হইবেন। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী "বঙ্গ-সাহিত্যে গাথাকাব্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের "কথার" সমালোচনা করিয়াছেন। "কথা"র সমালোচনায় 'কথা'র বাহুল্য নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দুই একটি কথা 'অকথা'য় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যথা 'নবীনচন্দ্রের অবসরসরোজিনী' আমরা জানি, 'অবসর সরোজিনী নামক খণ্ডকাব্যখানি স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের রচিত। নবীন বাবুর 'অবকাশ রঞ্জিনী' নামক একখানি খণ্ডকাব্য আছে বটে। গোস্বামী মহাশয় 'উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে' দিলেন কেন?

ভারতী। মাঘ। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "জীবনসঙ্গীত" Pslam of Life'র অনুবাদ। সঙ্গীতে সেন কবির বীণার ঝঙ্কার নাই। শ্রীযুক্ত ইম্‌দাদুল হক জাষ্টিস্ আমীর আলির The Spirit of Islam নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "মোস্‌লেম জগতে বিজ্ঞানচর্চ্চা" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষার নমুনা,—"অজ্ঞান-তামসারি প্রশান্ত-জ্যোতির্বিমণ্ডিত প্রভাতসূর্য্যসদৃশ প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ।" প্রবন্ধের প্রারম্ভেই যদি গুরুভার শব্দ চাপা পড়িয়া পাঠকের মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে প্রবন্ধ পড়িবে কে? প্রসাদগুণ ভাষার প্রাণ, আশা করি, নবব্রতী মুসলমান লেখকগণ তাহা কখনও বিস্মৃত হইবেন না। "ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ঘোর স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল" ইত্যাদি—গালাগালির হিসাবেও যে নিতান্ত পুরাতন। গালি না দিলে যদি প্রবন্ধ না জমে, তাহা হইলে অন্ততঃ নূতন কোনও গালি দিন। পচা কটূক্তি যে নিতান্ত অসহ্য। প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হয়, এমন বিজ্ঞানপ্রিয় জ্ঞানপিপাসু জাতির বংশধরগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত অরুচি কেমন করিয়া হইল? শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায় "চাঁদের বিয়ে" নামক একটি কবিতা লিখিয়াছেন। ফণীন্দ্র বাবুর কল্যাণে চন্দ্রলোকের বিবাহপদ্ধতি কতকটা পরিচয় পাওয়া গেল। রাজধানীর মত চন্দ্রলোকেও বিবাহ উপলক্ষে কবিতা লিখিবার ও ছাপাইবার 'ফ্যাশান' হইয়াছে শুনিয়া ছাপাখানাওয়ালারা নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন। এ ক্ষেত্রে ফণীন্দ্র বাবুই কবিতা লিখিবার ভার লইয়াছেন। চাঁদের বিয়ে 'দক্ষিণাবর্ত্ত' কিরূপ

হইয়াছিল, কবি তাহা লিখিতে ভুলিয়াছেন। চন্দ্রলোকে বিবাহের ভোজে কোনা ব্যাঙের কালিয়া ঘৃতকুমারীর সরবৎ প্রভৃতি ও আতর গোলাপের পরিবর্ত্তে মধ্যমনারায়ণ দিবার ব্যবস্থা আছে কিনা, ফণীন্দ্র বাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই, কেন? শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভাষার গঠন ও উন্নতি" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "শীতের পল্লী" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসুর "থিয়েটারলহরী" ব্যর্থ রচনা। অক্ষম বিদ্রূপ সম্পূর্ণ নিরর্থক। স্বাভাবিক শক্তি না থাকিলে রস রচনায় সাফল্যলাভ অসম্ভব। আলোচ্য রচনায় সে শক্তির পরিচয় নাই। কষ্টকল্পনাই ইহার সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর বর্ম্মার "আগড়তলায় শ্রীপঞ্চমী" একটি চিত্র। লেখকের ভাষায় অধিকার নাই। সাধারণের জন্য লিখিতে গেলে আপনাদের কথা কতটুকু প্রকাশ করিতে হয়, কতটুকু ঢাকিয়া রাখিতে হয়, লেখক সে বিষয়েও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ত্রিপুরার সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুরের যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাহা যেমন কৌতুকাবহ তেমনই মনোরম। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "বাঙ্গালা পুস্তকের বিবরণী" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক "অমৃত-মদিরা"র সমালোচন প্রসঙ্গে যে রুচির পরিচয় দিয়াছেন, আমরা তাহার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"আমরা তদ্রূপ নিন্দাপ্রিয় নহি।" বলা বাহুল্য, আমরা আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু তিনি এতটা "ঘৃণাপ্রিয়" না হইয়া যদি "তদ্রূপ নিন্দাপ্রিয়" হইতেন, তাহা হইলেও এতটা বাক্যব্যয়ের আবশ্যক ঘটিত না। "অমৃত-মদিরা"র কবির ওকালতি এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক কিন্তু সাহিত্য-সমাজের সাধারণ শিষ্টতা ও শীলতার বিচার করিবার অধিকারে আমরা কেহই বঞ্চিত নহি। দীনেশ বাবুকেই আমরা শিষ্টতা ও শীলতার "অথরিটী" মনে না করিতে পারি। অমৃত বাবু "হঠাৎ সরস্বতীর কুঞ্জে আসিয়া কি প্রহসনের সৃষ্টি করিবেন" এই ভাবনায় দীনেশ বাবুর মনে "আশঙ্কার সহিত একটা কৌতূহলের ভাব জাগিয়া" উঠিয়াছিল। সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, "সরস্বতীর কুঞ্জটি" কি কেবল দীনেশ বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গের একচেটে? "অমৃত-মদিরা" লইয়াই কি অমৃত বাবু আজ "হঠাৎ" সাহিত্য-কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দীনেশ বাবুর দলকে 'ছুঁইয়া' অপবিত্র করিয়া দিলেন? এতটা স্পর্দ্ধা কি দীনেশ বাবুর মৌরুসী "সরস্বতীর কুঞ্জে"ও শোভা পায়? দীনেশ বাবু অমৃত বাবুকে তাচ্ছীল্য, উপেক্ষা ও ঘৃণার বাণে বিদ্ধ করিয়া আপনাকে "সেণ্ট্ দীনেশের" স্বর্গে উন্নত করিয়া মনে মনে বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এই কদাচারে লজ্জিত হইয়াছি। দীনেশ বাবু যদি ভদ্রভাবে শীলতার সহিত, "অমৃত-মদিরা"কে সমালোচনা করিতেন, পদে পদে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া অবিনয় ও প্রগল্ভতার পরিচয় না দিতেন, ইঙ্গিতে পলিতকেশ অমৃত বাবুর ব্যবসায় ও ব্যক্তিত্ব আক্রমণ করিয়া আনন্দিত না হইতেন, তাহা হইলে অমৃত-মদিরাকে কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ করিলেও,—আমরা বাঙ্নিষ্পত্তি করিতাম না। সাহিত্যে 'সুরুচি'র অর্থ কেবল 'অশ্লীলতার অভাব' নয়। শীলতা, সংযম, সম্ভ্রম প্রভৃতিও তাহার আদর্শ বটে।

মধুর মরণ।

তোমরা বাজাও বীণা সাজাও বাসর,
ঢাক ঢাক অস্থি-রাশি ফুলদল দিয়া!
জাগুক কবির কণ্ঠে সুধা-কলস্বর
প্রেমের প্রমোদ গানে—কি হবে ভাবিয়া
নিরুপায় নিরন্নের অশ্রুসিক্ত মুখ?
দেখ রমণীর রূপ প্রসন্ন নবীন
তীব্র বাসনায় দীপ্ত, তৃষা-শুষ্কবুক
নারীর সোহাগে সিক্ত কর নিশিদিন!
শান্তি ভাল শ্রান্তি হতে, মহত্ব প্রয়াসে
সুকোমল মনুষ্যত্ব করোনা ব্যথিত,
স্বপ্ন ও সুপ্তির মাঝে উল্লাসে বিলাসে
ক্ষণস্থায়ী এ জীবন হউক অতীত!
প্রেম যদি ব্যাধসম হানে মৃত্যুশর,
প্রণয় প্রমোদে মৃত্যু সার্থক সুন্দর!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

২রা শ্রাবণ। কলিকাতায় আসিয়া পঞ্চুকে দেখিলাম। * * * দেখিতেছি, সে সর্ব্বদা চক্ষের সমক্ষে থাকিলে মনটা আর তাদৃশ চঞ্চল হইয়া উঠে না। কিন্তু অসাক্ষাতে তাহাকে প্রকৃতের অপেক্ষাও অধিক পীড়িত বলিয়া মনে হয়। নানাবিধ দুশ্চিন্তা আসিয়া প্রাণের ভিতর উদ্বেল হইয়া উঠে; কিছুতেই স্থির হইতে পারি না। * * *

৩রা শ্রাবণ। দশটার সময় কবিরাজ মহাশয় দেখা দিলেন। * * * ভয়ের কোনও কারণ নাই বলিয়া একটু আশ্বাস দিলেন। আশ্বাসটা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। আমার উদ্বেগের অনেকটা উপশম হইয়াছে। তা ছাড়া বালকটিকে পূর্ব্বাপেক্ষা আজ বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম। * * *

৪ঠা শ্রাবণ। Lady Anne Hamilton প্রণীত Secret History of the Court of England. (George III and George IV.) নামক একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম। ইহা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়; কিন্তু গবর্মেণ্ট ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এতদিন এক-প্রকার লুপ্ত হইয়াছিল। ১৮৮৩ সালে ইংলণ্ডের কোনও প্রকাশক কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়া আবার প্রচারিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে, তৃতীয় ও চতুর্থ জর্জ্জের রাজসভা যে কিরূপ অত্যাচার, প্রতারণা, * * * নরহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় দুষ্কৃতির আধার ছিল, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এক জন সামান্য লোককে যে সকল অপরাধের জন্য রাজদ্বারে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, তখনকার রাজা, রাণী, রাজপুত্রেরা অবাধে সেই সকল পাপাচরণ করিয়াও স্বচ্ছন্দশরীরে সম্মানের সহিত জগতে কাল-যাপন করিতে পাইতেন। Princess Charlotteর কাহিনী কি মর্ম্মভেদী! পাঠ করিতে করিতে ক্রোধে ও ঘৃণায় শরীর উত্তেজিত ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। পুস্তকখানি পড়িয়া আমার মনে হইল যে, জগতের প্রকৃত ইতিহাস কোনও দেশে কখনও লিখিত হইতে পারে না। এই বসুন্ধরার উপর যিনি যখন আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই স্বপক্ষীয় লোকের সাহায্যে আপনার অশেষ গুণগৌরবের কাহিনী প্রচারিত করিয়া বিপক্ষের সম্প্রদায়কে নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্ক-কালিমায় চিত্রিত করাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বদর্শী সর্ব্বান্তর্যামী

স্বয়ং ভগবান ভিন্ন তাঁহার এই অপূর্ব্ব বিশ্বের সত্য ইতিহাস আর কেহই অবগত নহে।

৫ই শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "স্বপ্ন-প্রয়াণ" কাব্য পাঠ করিলাম। কেহ কেহ বলেন, দ্বিজেন্দ্র বাবু কবিতা ছাড়িয়া দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভাল করেন নাই। শুনিয়াছি, সুকবি রবীন্দ্রনাথ নাকি আরও একটু বেশী দূর যান; তিনি মনে করেন, দ্বিজেন্দ্র বাবু বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। কথাটা কত দূর সত্য, বলিতে পারি না। সত্য হইলে, ইহা ভ্রাতৃপ্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শন বটে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমালোচন-শক্তির বড় সূক্ষ্মতার পরিচায়ক নহে। দ্বিজেন্দ্রবাবু যে কল্পনা-কুশলী, "স্বপ্ন-প্রয়াণ" পাঠ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু তিনি যে ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই কাব্যের উপযোগী নহে। একটা পরিচয় দিতেছি,—

"কে তুমি, আমায় বলিতেছ ভণ্ড?
জান'না, রুষিলে আমি, বীরের প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড
সব হ'বে পণ্ড।
দেখা'ব, পাষণ্ড,
দেবতার কোপদৃষ্টি কেমন প্রচণ্ড? ॥"

এখানে ভাষা ও ছন্দের আদৌ কোনও প্রশংসা করা যায় না। রূপকের গল্পাংশেও তেমন কিছু বাহাদুরী নাই। তাঁহার চরিত্রগুলির অন্তরালে abstract বৃত্তিগুলিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগকে রক্তমাংসময় জীব বলিয়া মনেই হয় না। শ্রেষ্ঠ রূপক Pilgrim's Progress বা Faery Queen হইতে ইহার কত প্রভেদ। সর্ব্বত্র বিচারশক্তিরও প্রশংসা করিতে পারি না। ভাষা ও বিচারশক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে "শান্তিপ্রয়াণ" নামক শেষ পরিচ্ছেদটি বেশ হইয়াছে, বলিতে হয়। সমগ্র কাব্যমধ্যে আমার ত এই অংশটিই ভাল লাগিল। প্রথম পরিচ্ছেদটিও মন্দ নহে।

৬ই শ্রাবণ। আষাঢ় মাসের "সাধনা"য় বাবু রবীন্দ্রনাথের "বিহারীলাল" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। "সারদামঙ্গলে"র স্বর্গগত কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীই ইহার বিষয়। লেখক "সারদামঙ্গলে"র যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। প্রশংসা অনুচিত হয় নাই। কিন্তু তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন, কবির নিজের হৃদয়গত আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখের কথা আমরা বিহারীলালের কাব্যেই প্রথম দেখিতে পাই। মাইকেলের সনেটে তাহা আছে

বটে, কিন্তু উহা চতুর্দ্দশপদীর সঙ্কীর্ণ সীমার ভিতর নিবদ্ধ, সুতরাং পড়িয়া তাদৃশ তৃপ্তি হয় না। রবীন্দ্র বাবু বোধ হয় ঈশ্বর গুপ্তের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন; কিংবা তাঁহাকে কবিশ্রেণীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের পরমার্থ-বিষয়ক কবিতাসমূহে তাঁহার নিজের হৃদয়ের অনেক কথা পাওয়া যায়। তবে তাহা তত মর্ম্মস্পর্শী নহে বটে। কিন্তু মাইকেলের "আত্মবিলাপ" ও "জন্মভূমির প্রতি" এই দুইটি সুন্দর ও হৃদয়ভেদী কবিতার কথা ত ভুলিবার নহে। রবীন্দ্র বাবু ইহাদের উল্লেখ না করিয়া ভাল করেন নাই। আর একটা কথা আছে। এক শ্রেণীর কবিকুল নিজ হৃদয়ের ক্ষণস্থায়ী ও সঙ্কীর্ণ সুখ দুঃখের কাহিনী লইয়া পাঠক সাধারণের সময় অতিবাহিত করিতে চাহেন না। তাঁহারা সমগ্র মানব-হৃদয়ের উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, জগতের অস্তিত্বে আপনাদের অস্তিত্ব একপ্রকার নিমজ্জিত করিয়া ফেলেন। আপনাদের কথা বলিতে হইলেও নিজে না বলিয়া চরিত্রবিশেষের মুখে বসাইয়া দেন। ইহারা মহাকাব্য ও নাটক রচয়িতা; ইঁহাদেরই প্রতিভা শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিরদিন স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

৭ই শ্রাবণ। * * * বালকটিকে পূর্ব্বাপেক্ষা খুব সুস্থ স্বচ্ছন্দ বলিয়া মনে হইল। আজকাল দিন দিন নূতন নূতন কথা উচ্চারণ করিতে শিখিতেছে। "ভাই ভাই" ভুলিয়া গিয়াছিল; সম্প্রতি আবার রীতিমত বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েক দিবস আমার ছোট ভগিনীর একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকের সাহচর্য্যে তাহার আনন্দটা কিছু বাড়িয়াছে। দুই জনে খেলা করে; গোল করে; কত প্রকার রঙ্গভঙ্গ দেখায়। শৈশব-জীবনের এই সরল নিরীহ প্রফুল্লতা বাস্তবিকই হৃদয় ভরিয়া দেখিবার জিনিস। আমরা যত বড় হইতেছি, স্বর্গরাজ্য হইতে ততই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছি। এই সকল অমৃতের অধিকারী সুখ-স্বর্গের অধিবাসীদিগকে দেখিলেও প্রাণে কতকটা আশার সঞ্চার হয়।

৮ই শ্রাবণ। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "সামাজিক প্রবন্ধ" পাঠ করিতেছি। গ্রন্থখানিতে ভূদেব বাবু বিলক্ষণ চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দু ও অপরাপর সমাজের তুলনা করিয়া তিনি যে যে গুণগুলিকে ইহাদের মূল প্রকৃতি বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা এই;—হিন্দু প্রাক্তন, পুরুষকার এবং পরকালবাদী, সুতরাং শান্তিপরায়ণ, ধৈর্য্যশালী ও অনাসক্তচিত্ত। বৌদ্ধের প্রকৃতিও এইরূপ; তবে উহারা দ্রব্যগুণবাদতৎপর, অর্থাৎ ইহাদের ভিতর পুরুষকারের তেজ প্রবলতর। খৃষ্টধর্ম্মী ইচ্ছাশক্তি ও পরকালবাদী; সুতরাং সাহসী, ঐশ্বর্য্যবান, ভোগসুখলিপ্সু। মুসলমানের দশাও খৃষ্টানের অনুরূপ।

ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা পূর্ণমাত্রায় এবং প্রকৃতপক্ষে সাম্যধর্ম্মী। হিন্দু ধর্ম্মে প্রাক্তন ও পুরুষকারের কিরূপ চমৎকার সামঞ্জস্য, ভূদেব তাহা বেশ নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন। হিন্দু জানেন যে, তিনি বর্ত্তমানে তাঁহার প্রাক্তনকর্ম্মসমূহের ফলভোগ করিতেছেন; আবার বর্ত্তমানে যে কর্ম্ম করিতেছেন, পরকালে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে তাঁহার সৎকর্ম্মে বিশেষ প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহাই হিন্দুর চরম শিক্ষা নহে। গীতার উপদেশ,ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। কর্ত্তব্যপালনমাত্র তোমার সাধ্যায়ত্ত; কিন্তু সিদ্ধি অসিদ্ধি তোমার ক্ষমতার বহির্ভূত। ইহা অতি শ্রেষ্ঠ উপদেশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সাধারণ জনগণের হৃদয়ে এই মহতী শিক্ষার তাদৃশ প্রভাব আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভূদেব বাবুও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

৯ই শ্রাবণ। "ছবি ও গান" রবীন্দ্রের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের এই মতটা রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিতান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন। সুকবি রবীন্দ্রনাথের নূতন সংস্করণ "কড়ি ও কোমল" দেখিলাম। বিজ্ঞাপনে কবি বলিয়াছেন, তাঁহার "ছবি ও গান" এবং "ভানুসিংহের কবিতাবলী" এই দুই গ্রন্থের যে সকল কবিতা তিনি পাঠক-সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা এই সঙ্গেই প্রকাশিত করিয়াছেন। সুতরাং এই দুই পুস্তক আর স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইবে না। "কড়ি ও কোমলে"র অনেক কবিতাও বর্ত্তমান দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে তিনখানি গ্রন্থের আয়তন, বোধ হয়, প্রথমপ্রচারিত "কড়ি ও কোমলে"র অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। সুকবির এই সুমতি দেখিয়া বাস্তবিকই বড়ই প্রীত হইয়াছি। তাঁহার বিচারশক্তি যে দিন দিন উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু, আমার বোধ হয়, উহা এখনও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সংস্করণেও এমন কয়েকটি কবিতা রক্ষিত হইয়াছে, যাহাদিগকে বাদ দিলে জগতের কোনও ক্ষতি হইত না, অথচ, পাঠকসম্প্রদায়কে কতকগুলা ছাই ভস্মের হস্ত হইতে রক্ষা করা হইত। এ জন্য আমরা অধিকতর সুসংস্কৃত তৃতীয় সংস্করণের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। পক্ষান্তরে, মনে হয়, "ভানুসিংহে"র দুই একটা কবিতা লুপ্ত না করিলে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইতে পারিত। যাহা হউক, রবীন্দ্রের এই নির্ব্বাচন-প্রথার সম্যক প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আশা করি, তিনি তাঁহার অপরাপর কাব্য-গ্রন্থেও ইহা অবলম্বন করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন।

১০ই শ্রাবণ। আমার মানসিক শক্তিসমূহ ক্রমশঃ যেন নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। কোনও বিষয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া ধারাবাহিক চিন্তা করিবার সামর্থ্য কখনই ছিল না বটে; কিন্তু নভোবিহারিণী সৌদামিনীর দৈব-স্ফুরণবৎ মাঝে মাঝে যে কল্পনাজ্যোতি অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, বহু দিবস হইতে তাহার আর সাক্ষাৎ পাইতেছি না। শূন্যমনে উদাসীনের ন্যায় শূন্যতারই কথা ভাবিতে ভাবিতে এক একটা সত্য ও সৌন্দর্য্যের কণা যেরূপে প্রাণের ভিতর চকিতে চমকিয়া উঠিত, তাহা আজিও বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু হৃদয়দেশটা হঠাৎ এরূপ অনুর্ব্বর মরুভূমিতে কেন পরিণত হইয়া উঠিল, তাহাই ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। দুঃখ, শোক ও দুশ্চিন্তার আধিক্য ইহার একটা কারণ হইতে পারে। ইহা ভিন্ন আর কোনও হেতু খুঁজিয়াও পাই না বটে; কিন্তু দুঃখ সহ্য করিতে করিতে হৃদয়টা আজ কাল এরূপ কঠোর হইয়া পড়িয়াছে যে, নেহাৎ সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশের আঘাত না হইলে আর চেতনা হয় না। সুতরাং বিষাদরূপী বৃহৎ বৃক্ষের অন্ধকার ছায়ায় পড়িয়া মানসোদ্যানের সুকোমল তরু-লতাগুলির বিলোপ স্বাভাবিক হইলেও, এই হৃদয়ের বর্ত্তমান অবস্থায় সে কথাটা তেমন খাটিতেছে না। তাই ভাবি, ইহা নিতান্তই কোন উপদেবতার অভিশাপ। ইহার রহস্যোদ্ভেদ আমার ন্যায় স্বল্পবুদ্ধির অতীত। আর, এই ব্যাধির নিদান স্থিরীকৃত হইলেও যে তাহার নিবারণে সমর্থ হইব, এরূপ আশাও নাই। তবে উৎপত্তিটা বুঝিতে পারিলে একবার নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পারিতাম। তাহাও যে হইল না, এই দুঃখ।

১১ই শ্রাবণ। স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামাজিক প্রবন্ধ" শেষ করিলাম। তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থখানির আলোচনা করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি, এবং আপনাকে এত দূর উপকৃত বোধ করিতেছি যে, ইহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর এরূপ বিষয়ের প্রকৃত সমালোচনের শক্তিও আমার নাই। সুতরাং তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। "সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভূদেবের ন্যায় আন্তরিকতা এ দেশে অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। নানা শাস্ত্র ও সমাজের আলোচনা করিয়া ভূদেব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি আজীবন তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন বিনিয়োগপত্রে আমরা এই কথার শেষ ও চূড়ান্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হই। "সামাজিক প্রবন্ধে"র শেষ ভাগে এ দেশের প্রকৃত শিক্ষক ব্রাহ্মণগণের পুনঃসংস্থাপনকে ভারতবাসী হিন্দুর

একটি প্রধান, এমন কি, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, ভূদেব তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়া গেলেন। তিনি যে দেড় লক্ষ টাকা এই মহদুদ্দেশ্যসাধনার্থ অর্পণ করিয়াছেন, তাহার কত দূর সদ্ব্যবহার হইবে, কিংবা তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার কতটুকু সাফল্য হইবে, বলিতে পারি না; কিন্তু কথায় ও কার্য্যে এরূপ সামঞ্জস্য দেখাইয়া মহাপুরুষ যে মহদ্দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন, তাহা যথাসাধ্য আমাদের সকলেরই অনুকরণীয়।

১২ই শ্রাবণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইয়াছি বটে; কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত যে একটা বিষম ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, আজ কাল তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিতেছি। বিদ্যালয়ে কোনও বিষয় কখনও রীতিমত তলাইয়া বুঝিতাম না; প্রকৃতির স্বাভাবিক চাঞ্চল্য-বশতঃ কেবল এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হইতাম। সেই জন্য কোন ভাব বা পদার্থের একটা স্থায়ী চিহ্ন প্রাণের ভিতর কখনও অঙ্কিত হয় নাই। এক কথায় যদি বলিতে হয়, আমার বহির্বিষয়ক দ্রব্যগত শিক্ষা কিছুই হয় নাই। এখন তাহার ফল বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। বাল্যে বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির উপর তেমন কর্তৃত্বলাভ করিতে শিখি নাই; সুতরাং এখন আর কোনও বিষয়ে ধীরতার সহিত মনঃসংযোগ করিতে পারি না। যে কার্য্যে মন দিতে যাই, তাহাকে ভাল করিয়া প্রাণের ভিতর ধরিয়া রাখিতে পারি না। চারি দিক হইতে নানাবিধ চিন্তা ও দৃশ্য হৃদয়মধ্যে উদিত হইয়া উহাকে একবারে আবৃত করিয়া ফেলে। কি কথা ভাবিতেছিলাম, হয় ত তাহা আর স্মরণেও আনিতে পারি না। এইরূপে মনটা যেন সর্ব্বদাই শূন্য বলিয়া বোধ হয়। সকলই যেন স্বপ্নবৎ;—কোথা হইতে আসিতেছে, কেন আসিতেছে, পরক্ষণেই আবার কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে, তাহার ঠিকানা করিতে পারি না। এ জীবনটা এইরূপ নিরর্থক স্বপ্নেই কাটিয়া গেল, দেখিতেছি। তবে, ভগবান যদি কখনও এমন একটা কিছু কাজ জুটাইয়া দেন, যাহাতে সমস্ত হৃদয় মন সমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলেই রক্ষা। নতুবা, এই পর্য্যন্ত।

১৩ই শ্রাবণ। এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই এক সুমহান্ শৃঙ্খলা ও প্রণালীর অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। যে পথে চলিলে, যে নিয়মে শাসিত হইলে, চরাচর সকলেরই সম্ভবমত উন্নতি ও পরিণতির সম্ভাবনা, তাহা চিরদিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। জড় জগতকে তাহা অন্বেষণ করিয়া লইতে হয় না। বিশ্বের বিধাতা স্বয়ং তাহাকে তাঁহার অভীপ্সিত মার্গে পরিচালিত করিতেছেন। সুতরাং

জড়ের ভিতর বা নিকৃষ্ট জীবের ভিতর ভ্রান্তি বা পদস্খলন কোথাও দেখিতে পাইবে না। কিন্তু মানুষের পক্ষে সে নিয়ম নহে। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানরূপ যে ক্ষীণ দীপশিখাটি জ্বলিতেছে, তাহাকে তাহারই সাহায্যে অতি সন্তর্পণে, সমীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা গন্তব্য পথের সন্ধান করিয়া লইতে হয়। কাজটি বড় সহজ বা সামান্য নহে। চারি দিকে প্রতিকূল অবস্থা ও প্রলোভনের ঝড় প্রতি নিয়তই বহিয়া যাইতেছে। বুদ্ধির আলোকশিখাটি স্বভাবতঃ অতি দুর্ব্বল; কখনও বা একবারেই অদৃশ্য হইয়া যায়। সুতরাং পদে পদে ভ্রম ও অধঃপতনের সম্ভাবনা। তবে জাগতিক শৃঙ্খলার মধ্যে মহাজনক্ষুণ্ণ পথের ভিতর যিনি আপনার জীবনটাকে একবার ফেলিয়া দিতে পারেন, তাঁহার ভয়ের বড় বেশী কারণ থাকে না। কিন্তু ইহা সাধারণ পথ। অসাধারণ লোকদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা কখনও কখনও স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই চিরানুসৃত পথের বাহিরে চলিতে চান। আপনাদের হৃদয়নিহিত তেজের সাহায্যে অনেক সময় তাহাতে কৃতকার্য্যও হন। আমার সে ক্ষমতা নাই; তাই ভয়-ভাবনা-বিহীন সেই সাধারণ পথেরই সন্ধান করিতেছি।

১৪ই শ্রাবণ। আমাদের পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয় বাবু হে[illegible]সাদ ঘোষ একখানি কাব্য গ্রন্থ বাহির করিতেছেন। পুস্তকখানির নাম "[illegible] সু—চন্দ্রের সাহায্যে হেমেন্দ্র বাবু, কবিবর নবীনচন্দ্রের নিকট হইতে ভূমিকা বা Introduction লিখাইয়া লইয়াছেন। ভূমিকাটি দেখিলাম। নবীন বাবু বলিয়াছেন, নব্যতন্ত্রের লেখকেরা সাধারণতঃ অস্পষ্টতার পক্ষপাতী; তাঁহাদের কবিতার অর্থগ্রহ করিতে কবিবরের গলদঘর্ম্ম হয়। কিন্তু বর্ত্তমান কবি প্রাচীন দলের প্রাঞ্জলতার সহিত আধুনিক প্রণালীর সংমিশ্রণ করিয়া একটা নূতন পথ উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছেন। অস্পষ্টতা দোষের উল্লেখ করিয়া কবিবর, বোধ হয়, প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঠাকুর কবি কোনও কোনও স্থলে যে একটুকু অস্পষ্ট বা রহস্যময় হইয়া পড়েন, তাহা আমিও স্বীকার করি। তবে, এমন বিষয়ও আছে, যেখানে আলোকের সহিত ছায়ার মিলন কলাকুশলীর আদর্শ হওয়াই উচিত। সে কথা যাক্। নবীন বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদের যে নূতনত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বাস্তবিকই নিতান্ত নূতন বটে। নবীনচন্দ্র যে ইহা ধরিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার অসীম সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। হেমেন্দ্রপ্রসাদের দুই চারিটি কবিতা আমিও দেখিয়াছি। সুতরাং কবিবর, "সুন্দর, মধুর, মর্ম্মস্পর্শী" প্রভৃতি মর্ম্মস্পর্শী কথা-

গুলি গাঁথিয়া যে অপূর্ব্ব সমালোচনক্ষমতা জাহির করিয়াছেন, তাহার আদৌ সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। তবে, আমাদের নূতন কবিভ্রাতার বয়স অল্প, ভবিষ্যতে শিক্ষা ও সাধনার আধিক্যে ভাল জিনিসের আশা করা যায়।

১৫ই শ্রাবণ। একটা অকিঞ্চিৎকর কবিতা ও তাহার সমালোচনা লইয়া অ—বাবু ও সু—চন্দ্রের হৃদয়ের ভিতর খানিকটা বরফ জমিয়া গিয়াছে। গতকল্য সু—র সাহিত্যগৃহে উভয়েরই যেরূপ ভাব দেখিলাম, তাহা বড় ভাল নহে। সা—সম্পাদক মহাশয় "আহ্বানে"র কবির প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ হইলেও, প্রিয়বন্ধু সু—চন্দ্র প্রিয়বর ব—র সহিত কথোপকথনে একটু অসংযমের পরিচয় দিলেন, তাহার অনুমোদন করিতে পারি না। হ—বাবু ব—র ব্যবহার সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সু—র মুখে পুনরুক্ত হইয়া তেমন ভাল শুনাইল না। অ—বাবু রাগের মাথায় কবিতাটা (উপহার সনেটটা) লিখিয়া ফেলিয়া বোধ হয় আপনাকে এখন কতকটা বিপন্ন বলিয়া মনে করিতেছেন। সু—র বাটী হইতে অত শীঘ্র চলিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "আজ তেমন ভাল লাগিল না।" সাহিত্যগত মতভেদ লইয়া এরূপ বিচ্ছেদ সংসারে সুলভ হইলেও, নিতান্ত দুঃখের বিষয়। "সাহিত্যে"র প্রিয় কবি বাবু দে—নাথ * * মহাশয় ত একটা সমালোচন-বাণ খাইয়াই একবারে গাঢাকা দিয়াছেন। চিঠিপত্রের জবাব পর্য্যন্ত দেন না। কবিতা পাঠান দূরের কথা। তবে দে—বাবুর আঘাতটা কিছু গুরুতর বলিয়াই বোধ হয়। যে ব্যক্তি "সদাপ্রফুল্ল * * কবির" অন্যতম, এমন কি, একমাত্র অনুরাগী ছিলেন বলিলেও চলে, তাঁহারই হস্ত হইতে এরূপ বাণবর্ষণ অসহ্য হওয়া বিচিত্র নহে। গতিক দেখিয়া মনে হয়, সু—চন্দ্র বন্ধু জুটাইতে যতটা মজবুৎ, বজায় রাখিতে ততটা মজবুত নহেন। দোষ কাহার, ঠিক বলা যায় না।

১৬ই শ্রাবণ। শ্রীমতী ব্রাউনিঙের কবিতার আলোচনা করিতেছি। "The Poet's Vow" নামক তাঁহার একটি আখ্যান-কবিতা পাঠ করিলাম। নায়িকা Rosalind এক কবির প্রতি আসক্ত হইলেন। কিন্তু কবির হৃদয় বৈরাগ্যপ্রবণ; তিনি সংসারের কোনও পদার্থের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাহেন না। তাঁহার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া, নিজে এক নির্জ্জন ভগ্ন গৃহে প্রকৃতি ও ঈশ্বরের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। নায়িকাও আপনার হৃদয়ের বেদনা লইয়া নীরবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দিন যায় ;—ক্রমশঃ Rosalind কঠিনরোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর সমীপ-বর্ত্তিনী হইলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পালয়িত্রীকে কয়েকটি হৃদয়ভেদী অনুরোধ করিয়া গেলেন। সেই অনুরোধানুসারে মৃত্যুর পর তাঁহার লিখিত একখানি পত্র তাঁহার বক্ষের উপর সংস্থাপিত হইল ; এবং তাঁহার দুইখানি কোমল হস্ত প্রার্থনাকালের ন্যায় পরস্পরের সহিত সংযোজিত হইল। এই অবস্থায় প্রাণহীনা নায়িকা কবির রুদ্ধ গৃহদ্বারের সম্মুখে স্থাপিত হইলেন। ইত্যবসরে কবি, নিশীথ আকাশের শোভা-সন্দর্শনার্থ বহির্গত হইয়া, তাঁহার প্রেমভিখারিণীর মৃতদেহ যথাবর্ণিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। কবির হৃদয় অকস্মাৎ গলিয়া গেল। তিনি পত্রখানি পড়িলেন। তাঁহার প্রাণের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া আসিল। পরদিন প্রভাতে লোকে দেখিল, শবাধারে দুইটি দেহ আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে। তখন কবি ও নায়িকা উভয়েই সেই অবস্থায় একই সমাধিতে নিহিত হইলেন। গল্পটি বেশ মর্ম্মস্পর্শী। শ্রীমতী ব্রাউনিঙ স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শেষ দুইটি ছত্র তুলিয়া রাখিলাম। বহু বৎসরের পর নায়কের সুহৃদ্ সাব্ রোলান্দ পুত্র সমভিব্যাহারে সমাধিস্থলে আসিয়া, পুত্রটিকে উপরিস্থ বৃক্ষশাখা-স্থিত বিহঙ্গের প্রতি মনোযোগী দেখিয়া বলিতেছেন ;—

Nay boy, look downward ;
Thou may-t not *smile*, like other men,
Yet, like them, thou must *weep*."

টেনিসন তাঁহার Elaineএর উপাদান, বোধ হয়, ব্রাউনিঙের এই রোজালিন্দ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

—মানবমাত্রেরই জীবনে একটা গূঢ় উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অভিপ্রেত একটা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, ইহাই আমার চিরন্তন বিশ্বাস। নিজের জীবনে সেই দেবাভিপ্রেত কর্ত্তব্যের সন্ধান করিতে পারিলাম না বলিয়া, মাঝে মাঝে মনটা অতীব চঞ্চল ও বিষণ্ণ হইয়া উঠে। অতীত জীবনের আলোচনা করিয়া, সে উদ্দেশ্যের কোনও চিহ্নই খুঁজিয়া পাই না। সেখানে কেবল কতক-গুলা ভ্রান্তি, অপকর্ম্ম ও অভিমানের সমষ্টিমাত্র দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সময়টাও যেরূপে কাটিয়া যাইতেছে, তাহাতেও বিধিবিহিত সেই কর্ম্মের কোনও সঙ্কেত অনুভব করিতে পারিতেছি না। এ দিকে জীবন প্রায় ফুরাইয়া আসিতে চলিল। হায়! কি করিলে আমার এই দুর্লভ নরজন্মের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা হইবে? আমার জীবনে বন্ধন নাই, মরণে উন্নতির আশা নাই, পরজন্মে বিশ্বাস

নাই। আমি স্নেহ, প্রেম, ভক্তিতে, বিশ্বাসবিহীন, বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায়ে আস্থাশূন্য, সম্প্রতি আবার সৌন্দর্য্যেও অনুচ্ছ্বসিতচিত্ত, আমার মুক্তির উপায় কি? মাঝে মাঝে পঙ্কিল শুষ্ক জলাশয়ে অস্থানজাত পদ্মের ন্যায়, দুই একটা কোমল কামনা জাগিয়া উঠে, দেখিতে পাই। কিন্তু তাহাও আবার নিতান্ত মৃত্তিকাভিমুখী। তাহাতে পবিত্রতা বা আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নাই। জড়ের বন্ধন মোচন করিতে হইলে অশরীরী সৌন্দর্য্যের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগের প্রয়োজন, তাহা কোথায়? সে অবিচলিত অধ্যবসায়, সে কর্ত্তব্য-কঠোর সাধনা কই? কাহার জন্য, কিসের আশয়ে, দিনগুলা কাটাইয়া দিতেছি, তাহার ঠিকানা নাই। এই জগতের অরণ্যে আমি কেবল "জীর্ণতরু" মাত্র। পত্রহীন, পুষ্পহীন, গীতিহীন; কেবল প্রাণটি অবশিষ্ট রহিয়াছে।

১৭ই শ্রাবণ। Mrs. Browningএর A Romance of the Ganges নামক কবিতাটি পাঠ করিলাম। এদেশের বালকবালিকা-মহলে গঙ্গাবক্ষে দীপ ভাসাইবার একটা প্রথা আছে। কিন্তু তাহার সহিত নায়ক-নায়িকার প্রেমের পরীক্ষা করিবার ভাবটা জড়িত আছে কি না,বলিতে পারি না। সে যাহাই হউক, কবি এই উৎসবের উপলক্ষে দুইটি বালিকার হৃদয়ের বেশ দুই-খানি চিত্র প্রদান করিয়াছেন। নিশীথ-আকাশতলে ভাগীরথীর বর্ণনাটি বড়ই সুন্দর। স্থানের বর্ণনা করিয়া কবি লুতী-নাম্নী একটি বালিকার দীপ ভাসাইবার কথা আরম্ভ করিলেন। তাহার ক্ষুদ্র নৌকাখানি দীপসমেত অদৃশ্য হইয়া গেল! তাহার সকল আশা ফুরাইল! সে তখন তাহার সহচরী নলিনীকে তাহার নৌকা-খানি ভাসাইতে বলিল। নলিনীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তাহার দীপটি প্রশান্ত জল-রাশির উপর হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিল। নলিনীর চক্ষু দুইটি আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া গেল। তখন লুতী বলিল,—ভগ্নী, আমার একটি অনু-রোধ পালন করিও। তোমার বিবাহসময়ে তোমার প্রেমিককে আমার দুঃখের কথা একবার স্মরণ করাইয়া দিও। এই উপায়ে তুমি তাহার প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা করিতে পারিবে। তার পর লুতী বুঝি ভাগীরথী-হৃদয়ে ডুবিয়া মরিল। কবি এই ঘটনার সহিত লুতীর পিতৃবিয়োগবৃত্তান্ত গাঁথিয়া দিয়া বেশ সুকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। যে ভাগীরথীর তীরে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই-খানেই তাহার প্রেমেরও অবসান হইল দেখিয়া লুতী বলিতেছে,—

> "What doth it prove when death and love
> choose out the self-same place?"

উক্তি কি মর্ম্মস্পর্শী!

The river floweth on—প্রতি শ্লোকের শেষে এই ছত্রটি পুনরুক্ত হওয়াতে পাঠকের হৃদয়ে কি করুণ ভাবের উদয় হয়! গঙ্গার জল কেবল বহিয়া যাইতেছে; তাহার তীরে যে একটি ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়টি ভাঙ্গিয়া গেল, সে তাহা দেখিল না। হায়! জড়প্রকৃতির কি নিষ্ঠুরতা!

১৮ই শ্রাবণ। আজ এই সন্ধ্যাকাশতলে বসিয়া মানব-জীবনের অনিত্যতার কথা ভাবিতেছি। এ বিষয়ে জড় জগৎ আমাদের অপেক্ষা কত দূর সৌভাগ্যশালী। মাথার উপর ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল কত কাল ধরিয়া কত জীবসমাজের উত্থান পতন দেখিয়াছে;—কত সুখের রসোল্লাস, কত দুঃখের আর্ত্তনাদ, সম্মিলিতের হাস্যকৌতুক, বিরহিতের দীর্ঘশ্বাস, উহাদের চক্ষের উপর দিয়া হাওয়ার ন্যায় চলিয়া গিয়াছে! অথচ উহারা আপনাদের মধ্যে কোনও পরিবর্ত্তনই অনুভব করে নাই;—অসীম আকাশ-বক্ষে সাতটি সহোদরের মত অনন্তকাল বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে কলনাদিনী ঐ ভাগীরথী। কত শত, কত সহস্র অভাগা ও অভাগিনীর জীবনগ্রন্থি, জীবনসর্ব্বস্ব ঐ পুণ্য-তরঙ্গিণীর তটে চিরদিনের মত ছিন্ন ও অপহৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উহার ত বিরাম নাই। সেই কলনাদ, সেই তটাভিঘাত, সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাস। হায়! হতভাগ্য মানব! এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে তোর মাথা গুঁজিবার জন্য একটু স্থায়ী আশ্রয় কি কোথাও মিলিল না? তুই আজ স্বদেশে, কাল বিদেশে; আজ এ লোকে, কাল পরলোকে; তুই নিতান্ত নানাস্থানী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস্। পথিপার্শ্বে পতিত, অনাদৃত যে ধূলিকণাকে তুই প্রত্যহ দুই বেলা পদতলে দলিত করিয়া যাস্, সেও কি তোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? সে আজ যেমন রহিয়াছে, কালও সেইরূপ থাকিবে, —চিরদিন ধূলিকণারূপেই জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তুই হতভাগ্য মানব! তুই এই মুহূর্ত্তে রহিয়াছিস্,—আছিস্ কি না, তাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিস না! মুহূর্ত্তমাত্র পরে তোর অবস্থার কি ভীষণ পরিণামের সম্ভাবনা।

১৯শে শ্রাবণ। পঞ্চুর খবর জানিবার জন্য সেদিন কলিকাতায় একখানি পত্র দিয়াছি; আজ পর্য্যন্ত কোনও সংবাদই পাইলাম না। মনটা বিষাদভারে অবনত হইয়া পড়িতেছে। শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি, সংসারে নির্লিপ্ত না হইলে প্রকৃত সুখের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু, কি করিলে এই হৃদয়-নদীর সহস্র স্রোতকে সংযত করিয়া একই পথে প্রবাহিত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় ত কেহই বলিতে পারে না। মানুষ চিরদিন আশ্রয়ের ভিখারী; একটা অবলম্বন বা নির্ভরের বস্তু নহিলে তাহার জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। মজ্জমান

ব্যক্তি একটা তৃণের সাহায্যেও আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে চায়। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, চিন্তাহীন বলবত্তর কোনও আশ্রয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম না। সুতরাং চারিদিক হইতে চঞ্চল ও অনিশ্চিত পদার্থগুলিকে টানিয়া লইয়া প্রাণের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে হয়। চিন্তা ও ভাবনা চঞ্চল ও অনিশ্চিতের চিরসহচর। এই ভাবনা হইতে উদ্ধারের উপায় কি ?

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" এই দীন সাহিত্যসেবীকে তাঁহাদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এই অভাজনের দ্বারা তাঁহাদের কি সাহায্য হইবে, বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ বড়লোকের দলে মিশিবার আমার আদৌ অভিলাষ নাই। দলে মিশিয়া নামটা জাহির করিবার একটা সুযোগ পাওয়া যায় বটে। কিন্তু তাহার জন্য একটুকু ক্ষমতারও প্রয়োজন। সে ক্ষমতাটুকু আছে বলিয়াও যে আমার বিশ্বাস নাই। আমি বিষাদ ও দুশ্চিন্তার বরপুত্র, দুঃখের কাহিনী আপনার মনে গাহিয়া নীরবে জীবন শেষ করিয়া যাইতে চাই। * * *

২০শে শ্রাবণ। পঞ্চুরাম সম্প্রতি ভাল আছে। তাহাকে আজ কাল কোনও কোনও দিন ভাত দিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। খাইতে বসিবার প্রণালীটি কেমন সুন্দর! আসন-পীড়ি হইয়া দুইটি ছোট ছোট পায়ের উপর দুইটি ছোট ছোট হাত ঋজুভাবে রাখিয়া, কেমন ধীর শান্ত হইয়া বসিয়া থাকে; কিন্তু মুখে তুলিয়া দিতে একটু বিলম্ব হইলে আর রক্ষা নাই। তখন একবার এ হাতে, একবার ও হাতে করিয়া নিজেই তুলিয়া লইতে আরম্ভ করে। কতক মুখে উঠে, কতক বা সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া যায়। এখন তাহার স্বভাবেরও একটুকু পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। পূর্ব্বের ন্যায় হাত পাতিলেই যা'র তা'র কোলে ছুটিয়া যায় না। আমাকে খুব চিনিয়াছে। দেখিলেই কোলে আসিবার জন্য ব্যাকুল। ঘরের ভিতর থাকিবে না; রাস্তায় লইয়া বেড়াইতে হইবে। তাও আবার ঘরের নিকটে নিকটে বেড়াইলে হইবে না। হাত বাড়াইয়া কেবল দূরে যাইবার ইঙ্গিত করিয়া দিবে। কু—র কি দুর্ভাগ্য! সে চলিয়া গেল, আজ সে এখানে থাকিলে তাহারও কত আনন্দ হইত। কি বিষাদভারই যে ভগবান তাহার হৃদয়ে চাপাইয়া দিয়াছিলেন, তিনিই জানেন। জগতের সুখটা আমাদের নিজ নিজ হৃদয় মনের উপর যতটা নির্ভর করে, বাহিরের ঘটনারাজির উপর ততটা নহে। আমরা যে সকল অবস্থাতেই সুখী হইতে পারি না, তাহা আমাদেরই দোষ। আত্মবশ্যতা না হইলে সুখ কিছুতেই মিলে না।

২১শে শ্রাবণ। বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের লিখিত "নব্যভারতে"

প্রকাশিত "এক অপরিজ্ঞাত কবি" ইতিশীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। "সারদামঙ্গলে"র কবি বিহারীলালকে ঠিক অপরিজ্ঞাত বলা যায় না। তাঁহার কাব্যের যতটুকু প্রচার সম্ভব, আমার মতে, তাহা হইয়াছে। লোকসাধারণের মধ্যে যে কবিতার প্রচলন হইতে পারে, তাঁহার কাব্য সে শ্রেণীর নহে। কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বা ভাবসুষমায় মুগ্ধ হইয়া নিজ হৃদয়ের গভীর গূঢ়তম উচ্ছ্বাস যে কবিতায় ঢালিয়া দেন, তাহা ভাবুক ভিন্ন অপর কাহারও তাদৃশ উপভোগ্য নহে। সাধারণ পাঠকসম্প্রদায় কখনও একই ভাবে ডুবিয়া থাকিতে চাহে না; ভাবে বৈচিত্র্য না থাকিলে কোনও গ্রন্থই তাহাদের নিকট রীতিমত পঁহুছিতে পারে না। বিহারীলালের বিষয়-বৈচিত্র্য নাই। তিনি নিরবচ্ছিন্ন একই স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। অপরন্তু সাধারণ পাঠকের মধ্যে কোনও কাব্যগ্রন্থপ্রচারের আশা করিলে, তাহার একটা সাধারণ ভিত্তি থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে সুখ দুঃখ কবি-হৃদয়ের একান্ত একচেটিয়া সম্পত্তি, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে উপভোগ করিতে হইলে, অপর এক কবিহৃদয়ের প্রয়োজন। সুতরাং "সারদামঙ্গল" যে সাধারণের প্রিয় হইতে পারে নাই, ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। যে শ্রেণীর লোক কবি বিহারীলালের আদর করেন, তাঁহারা ভিন্ন অপর কেহ কখনও তাঁহাকে চিনিতে পারিবে কি না, নিতান্ত সন্দেহের বিষয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পীড়িত; ভক্ত সঙ্গে কাশীপুরের বাগানে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাশীপুরের বাগান। রাখাল, শশী ও মাষ্টার সন্ধ্যার সময় উদ্যানপথে পাদচারণ করিতেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পীড়িত—বাগানে চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছেন। তিনি উপরে দ্বিতলের ঘরে আছেন, ভক্তেরা তাঁহার সেবা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। Good Fridayএর পূর্ব্বদিন।

মাষ্টার। তিনি ত গুণাতীত বালক।

শশী ও রাখাল। ঠাকুর বলেছেন, তাঁর ঐ অবস্থা।

রাখাল। যেমন একটা tower। সেখানে বসে সব খবর পাওয়া যায়, সব দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ সেখানে যেতে পারে না, কেউ নাগাল পায় না।

মাষ্টার। ইনি বলেছেন, এ অবস্থায় সর্ব্বদা ঈশ্বরদর্শন হতে পারে। বিষয়-রস নাই, তাই শুষ্ক কাঠ শীঘ্র ধরে যায়।

শশী। বুদ্ধি কত রকম চারুকে বল্‌ছিলেন। যে বুদ্ধিতে ভগবান লাভ হয়, সেই বুদ্ধি। যে বুদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ী হয়, ডেপুটীর কর্ম্ম হয়, উকীল হয়, সে বুদ্ধি চিঁড়েভেজা বুদ্ধি। সে বুদ্ধি জোলো দইয়ের মত চিঁড়েটা ভেজেমাত্র—শুকো দইয়ের মত উঁচুদরের দই নয়। যে বুদ্ধিতে ভগবান লাভ হয়, সেই বুদ্ধিই শুকো দইয়ের মত উৎকৃষ্ট দই।

মাষ্টার। আহা! কি কথা!

শশী। কালী তপস্বী* ঠাকুরের কাছে বল্‌ছিলেন "আনন্দ কি হবে? ভীলদের ত আনন্দ আছে। অসভ্য হো হো নাচছে, গাইছে।"

রাখাল। গুরু মহারাজ বললেন, সে কি? ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক? জীবেরা বিষয়ানন্দ নিয়ে আছে। বিষয়াসক্তি সব না গেলে ব্রহ্মানন্দ হয় না। এক দিকে টাকার আনন্দ, ইন্দ্রিয়সুখের আনন্দ, আর এক দিকে ঈশ্বরকে পেয়ে আনন্দ। এই দুই কখন সমান হতে পারে? ঋষিরা এ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেছিলেন।

মাষ্টার। কালী এখন বুদ্ধদেবকে চিন্তা করেন কি না, তাই সব আনন্দের পারের কথা বল্‌চেন।

রাখাল। তাঁর কাছেও বুদ্ধদেবের কথা তুলেছিল, পরমহংসদেব বল্‌লেন, "বুদ্ধদেব অবতার, তাঁর সঙ্গে কি ধরা—। বড় ঘরের বড় কথা। কালী বলেছিল, তাঁর শক্তি ত সব। সেই শক্তিতেই ঈশ্বরের আনন্দ, আর সেই শক্তিতেই ত বিষয়ানন্দ হয়"—

---

* ইনি স্বামী অভেদানন্দ; ইনি এক্ষণে Americaর New york নগরে আছেন। তখন ইনি অন্যান্য ভক্তের ন্যায় ঠাকুরের সেবাকার্য্যে ছিলেন। ইনি একাকী এক ঘরে ধ্যান-পাঠাদি করিতে ভাল বাসিতেন, তাই ইহাঁকে সকলে কালী তপস্বী বলিয়া আহ্লাদ করিয়া ডাকিতেন।

মাষ্টার। ইনি কি বল্লেন?

রাখাল। ইনি বল্‌লেন সে কি? সন্তান-উৎপাদনের শক্তি আর ঈশ্বর-লাভের শক্তি কি এক?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ—ভক্তসঙ্গে।

[কামিনীকাঞ্চন।]

বাগানের সেই দোতলার "হল"-ঘরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শরীর উত্তরোত্তর অসুস্থ হইতেছে; আজ আবার ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার ও ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত দেখিতে আসিয়াছেন;—যদি চিকিৎসার দ্বারা কোন উপকার হয়।

ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, ভবনাথ ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা আছেন।

বাগানটি পাকপাড়ার বাবুদের। ভাড়া দিতে হয়—প্রায় ৬০৲। ৬৫৲ টাকা। ছোকরা ভক্তেরা প্রায় বাগানেই থাকেন। তাঁহারাই নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করেন। গৃহী ভক্তেরা সর্ব্বদা আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। তাঁহাদেরও নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করিবার ইচ্ছা। কিন্তু সকলেই কর্ম্মে বদ্ধ—কোন না কোন কর্ম্ম করিতে হয়। সর্ব্বদা ওখানে থাকিয়া সেবা করিতে পারেন না। বাগানের খরচ চালাইবার জন্য যাহার যাহা শক্তি ঠাকুরের সেবার্থ প্রদান করেন, অধিকাংশ খরচ সুরেন্দ্র দেন। তাঁহারই নামে বাগানভাড়ার লেখাপড়া হইয়াছে, একটি পাচক ব্রাহ্মণ ও একটি দাসী সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তার সরকার ইত্যাদির প্রতি) বড় খরচা হচ্ছে।

ডাক্তার। (ভক্তদিগকে দেখাইয়া) তা এরা সব প্রস্তুত। বাগানের খরচ সমস্ত দিতে এদের কোন কষ্ট নাই। (ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি) এখন দেখ কাঞ্চন চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) বল্ না?

ঠাকুর নরেন্দ্রকে উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। নরেন্দ্র চুপ করিয়া আছেন। ডাক্তার আবার কথা কহিতে লাগিলেন।

ডাক্তার। কাঞ্চন চাই। আবার কামিনীও চাই।

রাজেন্দ্র ডাক্তার। এঁর পরিবার বেঁদে বেড়ে দিচ্ছেন।

ডাক্তার সরকার। (ঠাকুরের প্রতি) দেখলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বড় জঞ্জাল।

ডাক্তার সরকার। জঞ্জাল না থাক্‌লে ত সবই পরমহংস।

শ্রীরামকৃষ্ণ। স্ত্রীলোক গায়ে ঠেক্‌লে অসুখ হয়; যেখানে ঠেকে, সেখানটা ঝন্ ঝন্ করে, যেন শিঙি মাছে কাঁটা বিদ্‌লো।

ডাক্তার। তা বিশ্বাস হয়, তবে না হ'লে চলে কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। টাকা হাতে করলে হাত বেঁকে যায়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে, ঈশ্বরের সেবা—সাধুভক্তের সেবা করে, তাতে দোষ নাই।

"স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা। তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ—স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন,এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না; সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হলে তবে বিদ্যার সংসার করতে পারে, ঈশ্বরদর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।"

* * *

হোমিওপ্যাথি (Homœopathy) ঔষধ খাইয়া ঠাকুর কয়দিন একটু ভাল আছেন।

রাজেন্দ্র। সেরে উঠে আপনার হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি করতে হবে। আর তা না হলে বেঁচেই বা কি ফল ?

(সকলের হাস্য।)

নরেন্দ্র। Nothing like leather ! যে মুচির কাজ করে, সে বলে, চামড়ার মত উৎকৃষ্ট জিনিস এ জগতে আর কিছু নাই।

(সকলের হাস্য।)

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারেরা চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কামিনী সম্বন্ধে আপনার অবস্থা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। এরা কামিনী কাঞ্চন না হলে চলে না বল্‌ছে। আমার যে কি অবস্থা, তা জানে না।

"মেয়েদের গায়ে হাত লাগলে হাত আড়ষ্ট ঝন্ ঝন্ করে।"

"যদি আত্মীয়তা করে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে, সে আড়ালের ও দিকে যাবার জো নাই।"

"ঘরে একলা বসে আছি, এমন সময় কোন মেয়ে এসে পড়ে, তা হলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে, আর সেই মেয়েকে মা বলে জ্ঞান হবে।"

মাষ্টার অবাক হইয়া ঠাকুরের বিছানার কাছে বসিয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। বিছানা হইতে একটু দূরে নরেন্দ্র ভবনাথের সহিত কথা কহিতেছেন। ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন। কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করিতেছেন। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে বেশী পারেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভবনাথের জন্য বড় চিন্তিত থাকেন; কেন না, ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন। ভবনাথের বয়স ২৩।২৪ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। ওকে খুব সাহস দে।

নরেন্দ্র ও ভবনাথ ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর ইসারা করিয়া আবার ভবনাথকে বলিতে লাগিলেন,—

"খুব বীরপুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস্‌নে। শিকনি ফেল্‌তে ফেলতে কান্না।

(নরেন্দ্র, ভবনাথ ও মাষ্টারের হাস্য।)

ভগবানেতে মন ঠিক রাখবি; যে বীরপুরুষ, সে "রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।" পরিবারের সঙ্গে কেবল 'ঈশ্বরীয় কথা কবি'।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ইসারা করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন,—

"আজ এখানে খাস্।"

ভবনাথ বলিলেন,—"যে আজ্ঞে। আমি বেশ আছি।"

স্থরেন্দ্র আসিয়া বসিয়াছেন, বৈশাখ মাস। ভক্তেরা ঠাকুরকে সন্ধ্যার পর

রোজ মালা আনিয়া দেন। সেই মালাগুলি ঠাকুর এক একটি করিয়া গলায় ধারণ করেন।

সুরেন্দ্র নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দুইগাছি মালা দিলেন। সুরেন্দ্রও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই মালা মস্তকে ধারণ করিয়া গলায় পরিলেন।

সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এইবার সুরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তিনি বিদায় গ্রহণ করিবেন, যাইবার সময় ভবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, খস্‌খসের পরদা টাঙ্গিয়ে দিও।

বড় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। ঠাকুরের উপরের হলঘর দিনের বেলায় বড় গরম হয়। তাই সুরেন্দ্র খস্‌খসের পরদা করিয়া আনিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে কাশীপুরের বাগানে।

কাশীপুরের বাগান। ঠাকুর রামকৃষ্ণ উপরের হলঘরে বসিয়া আছেন। সম্মুখে হীরানন্দ, মাষ্টার, আরও দু' একটি ভক্ত, আর হীরানন্দের সঙ্গে দুই জন বন্ধু আসিয়াছেন। হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী; কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানে এতদিন ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। সিন্ধুদেশ কলিকাতা হইতে প্রায় এগার শত ক্রোশ হইবে। হীরানন্দকে দেখিবার জন্য ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

ঠাকুর হীরানন্দের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মাষ্টারকে ইঙ্গিত করিলেন, যেন বলিতেছেন, ছোকরাটি খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আলাপ আছে?

মাষ্টার। আজ্ঞে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দ ও মাষ্টারের প্রতি)। তোমরা একটু কথা কও, আমি শুনি।

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরেন্দ্র আছে, তাকে ডেকে আন।

নরেন্দ্র উপরে আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র ও হীরানন্দের প্রতি)। একটু দু' জনে কথা কও।

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া তিনি কথা আরম্ভ করিলেন।

হীরানন্দ (নরেন্দ্রের প্রতি)। আচ্ছা, ভক্তের দুঃখ কেন?

হীরানন্দের কথাগুলি যেন মধুর ন্যায় মিষ্ট। কথাগুলি যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এঁর হৃদয় প্রেমপূর্ণ।

নরেন্দ্র। The scheme of the universe is devilish. I could created a better world. এ জগতের বন্দোবস্ত দেখে বোধ হয় যে শয়তানে করেছে, আমি এর চেয়ে ভাল জগৎ সৃষ্টি করতে পারতাম।

হীরানন্দ। দুঃখ না থাকলে কি সুখ বোধ হয়?

নরেন্দ্র। I am giving no scheme of the universe but simply my opinion of the present scheme. জগৎ কি উপাদানে সৃষ্টি করতে হবে, আমি তা বলছিনে। আমি বলছি,—যে বন্দোবস্ত সামনে দেখছি, সে বন্দোবস্ত ভাল নয়।

"তবে একটা বিশ্বাস করলে সব চুকে যায়: our only refuge is in panthyism. সবই ঈশ্বর,—এই বিশ্বাস হলেই চুকে যায়। আমিই সব করছি।

হীরানন্দ। ও কথা বলা সোজা।

নরেন্দ্র।

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ১ ॥

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু-
র্নবা সপ্তধাতুর্নবা পঞ্চকোশঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং নচোপস্থপায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ২ ॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।

ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ৩ ॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ৪ ॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ৫ ॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্
ন চাসংগতং নৈব মুক্তির্নমেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ৬ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নির্ব্বাণষট্‌কম্

হীরানন্দ। বেশ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ হীরানন্দকে ইসারা করিলেন, ইহার জবাব দাও।

হীরানন্দ। এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তা।

হে ঈশ্বর! আমি তোমার দাস,—তাতেও ঈশ্বরানুভব হয়, আর সেই আমি সোঽহং,—তাতেও ঈশ্বরানুভব।

একটি দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়, আর নানা দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়

সকলে চুপ করিয়া আছেন। হীরানন্দ নরেন্দ্রকে বলিলেন, একটু গান বলুন।

নরেন্দ্র সুর করিয়া গাইতে লাগিলেন,—

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

ঠাকুর যেই শুনিলেন,—"অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ,"—অমনই আস্তে আস্তে বলিতেছেন, আহা! আর ইসারা করিয়া দেখাইতেছেন, এইটি যোগীর লক্ষণ।

নরেন্দ্র কৌপীনপঞ্চক শেষ করিতেছেন,—

দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

নরেন্দ্র আবার গাইতেছেন,—

পরিপূর্ণমানন্দং
অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহ বাচং
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আর ঐটে—"যো কুছ্ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।"

নরেন্দ্র ঐ গানটি গাইতে লাগিলেন।—

তুঝসে হামনে দিলকো লাগায়া
যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়॥

এক তুঝকো আপনা পায়া যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়
দেলকী মকা সবকী মকী তু কোনসা দিল হ্যায় জিস্ মে নাহি তু
হরি এক দিলমে তুনে সমায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
কেয়া মুলায়েক কেয়া ইনসানি, কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান
যেসা চাহা তুনে বানায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
কাবামে থেয়া আউর দয়ের মে কেয়া, তেরে পরাস্তস্ হারগী সবজা
আজে তেরে শীর সভোঁনে ঝোপয়া, যো কুছ হ্যায় সোতুহি হ্যায়
আসমেসে ফর্স জমীতক, আউর জমীনসে আর্স বরীতক
সোচা সমঝা দেখা ভলা, তু যেসা ন যোই ঢুঁড় নিকালা।
আব হয়ে সমঝমে জফরদি আয়া, হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

"হরি এক দিলমে" এই কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে আছেন—তিনি অন্তর্য্যামী।

"যাঁহা যায় দেখা তুনজয়ায়া যো কুছ হ্যায় সব্ তুঁহি হ্যায়।" হীরানন্দ এইটি শুনিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন,— সব তুঁহি হ্যায়। এখন তুঁহু তুঁহু। আমি নয় তুমি।

নরেন্দ্র। Give me one and I will give you a million. (আমি যদি এক পাই, তা' হলে নিযুত কোটি এ সব অনায়াসে কর্‌তে পারি—(অর্থাৎ ১এর পর শূন্য বসাইয়া।) তুমিও আমি, আমিও তুমি; আমি বই আর কিছু নাই।

এই বলিয়া নরেন্দ্র অষ্টাবক্রসংহিতা হইতে কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আবার সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি, নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) যেন খাপখোলা তরোয়ার নিয়ে বেড়াচ্চে।

(মাষ্টারের প্রতি, হীরানন্দকে দেখাইয়া) কি শান্ত! রোজার কাছে জাতসাপ যেমন ফণা ধরে চুপ করে থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুহ্যকথা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ অন্তর্মুখ। কাছে হীরানন্দ ও মাষ্টার বসিয়া আছেন। ঘর নিস্তব্ধ।

ঠাকুরের শরীরে অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণা; ভক্তেরা যখন এক একবার দেখেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ঠাকুর কিন্তু সকলকেই ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। বসিয়া আছেন। সহাস্য বদন।

ভক্তেরা ফুল ও মালা আনিয়া দিয়াছেন। ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ, তাঁহারই বুঝি পূজা করিতেছেন। এই যে ফুল লইয়া মাথায় দিতেছেন। তাহার পরে কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিদেশে। যেন একটি বালক ফুল লইয়া খেলা করিতেছে।

ঠাকুরের যখন ঈশ্বরীয় ভাব উপস্থিত হয়, তখন বলেন যে, শরীরের মধ্যে

মহাবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়াছে। মহাবায়ু উঠিলে ঈশ্বরের অনুভূতি হয়,—সর্ব্বদা বলেন।

এইবার মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। বায়ু কখন উঠেছে জানি না।

"এখন বালকভাব। তাই ফুল নিয়ে এই রকম কচ্ছি। কি দেখছি জান? শরীরটা যেন বাঁখারিসাজান কাপড়মোড়া, সেইটে নড়ছে। ভিতরে এক জন আছে বলে তাই নড়ছে।

"যেন কুমড়োশাঁস বীচিফেলা। ভিতরে কামাদি-আসক্তি কিছুই নাই। ভিতর সব পরিষ্কার। আর—

ঠাকুরের বলিতে কষ্ট হইতেছে। বড় দুর্ব্বল। মাষ্টার তাড়াতাড়ি ঠাকুর কি বলিতে যাইতেছেন একটা আন্দাজ করিয়া বলিলেন,—"আর অন্তরে ভগবান দেখছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্তরে বাহিরে দুই দেখছি, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ কেবল একটা খোল আশ্রয় করে' এই খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন। এইটি দেখছি।

মাষ্টার ও হীরানন্দ এই ব্রহ্মদর্শনকথা শুনিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও হীরানন্দের প্রতি)। তোমাদের সব আত্মীয় বোধ হয়। কেউ পর বোধ হয় না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও যোগাবস্থা।

"সব দেখছি একটা একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে।"

দেখছি যখন তাঁতে মনের যোগ হয়, তখন কষ্ট একধারে পড়ে থাকে। *

"এখন কেবল দেখছি একটা চামড়াঢাকা অখণ্ড আর এক পাশে গলার ঘাটা পড়ে রয়েছে।

ঠাকুর আবার চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন,

---

* যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

জড়ের সত্তা চৈতন্যলয়, আর চৈতন্যর সত্তা জড়লয়। শরীরের রোগ হলে' বোধ হয় আমার রোগ হয়েছে।

হীরানন্দ ঐ কথাটি বুঝিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিলেন। তাই মাষ্টার বলিতেছেন,—

"গরম জলে হাত পুড়ে গেলে বলে, জলে হাত পুড়ে গেল। কিন্তু তা নয়, heatএতে হাত পুড়ে গেছে।

*

হীরানন্দ (ঠাকুরের প্রতি)। আপনি বলুন, কেন ভক্ত কষ্ট পায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের কষ্ট।

ঠাকুর আবার কি বলিবেন। উভয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন—"বুঝতে পারলে।"

মাষ্টার আস্তে আস্তে হীরানন্দকে কি বলিতেছেন—

মাষ্টার। লোকশিক্ষার জন্যে। নজির। এত দেহের কষ্টমধ্যে ঈশ্বরে মনের ষোল আনা যোগ।

হীরানন্দ। হাঁ যেমন Christএর crucifiction। তবে এই mystery এঁকে কেন যন্ত্রণা?

মাষ্টার। ঠাকুর যেমন বলেন, মার ইচ্ছা। এখানে তাঁর এইরূপই খেলা।

ইহারা দুই জন আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর ইসারা করিয়া হীরানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হীরানন্দ ইসারা বুঝিতে না পারাতে ঠাকুর আবার ইসারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কি বলছে?

হীরানন্দ। ইনি লোকশিক্ষার কথা বলছেন

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও কথা অনুমানের বই ত নয়.

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও হীরানন্দের প্রতি)। অবস্থা বদলাচ্ছে, মনে করিছি চৈতন্য হউক, সকলকে বলব না। কলিতে পাপ বেশী, সেই সব পাপ এসে পড়ে।

মাষ্টার (হীরানন্দের প্রতি)। সময় না দেখে বলবেন না। যার চৈতন্য হবার সময় হবে, তাকে বলবেন।

রিপুর উত্তেজনা।

ষড়রিপু, ষড়ধাতু, ষড়ৈশ্বর্য্য, ষড়ানন প্রভৃতি ছ'য়ের কোঠায় শাস্ত্রের একরাশি বস্তু আছে। তাহাদের মধ্যে "ষড়রিপু" সর্ব্বাপেক্ষা পরীক্ষিত ও সমাদৃত। গীতায় একটি শ্লোক আছে,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"—তৃতীয় অধ্যায়, ৬২।৬৩

মিষ্টার গৌরচন্দ্র জর্ম্মণি প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, গীতা একখানি সার গ্রন্থ। অতি পরিতাপের বিষয় এই যে, গৌরচন্দ্র বহুদিন বিদেশে থাকিয়া বাঙ্গালা প্রায় একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অর্থাৎ, মোটামুটী কথা কহিতে পারিতেন বটে, কিন্তু কখনও হয় ত এক আধটি দরকারী কথা ভুলিয়া গিয়া বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকিতেন, এবং উপায়বিহীন হইয়া হয় ত—

১ হাত পা নাড়িয়া সারিয়া দিতেন, কিংবা
২। অন্য একটি উপাদেয় কথা তৎপরিবর্ত্তে বসাইয়া দিতেন।

যখন মিষ্টার গৌরচন্দ্র ভারতবর্ষে পুনঃ পদার্পণ করিলেন, তখন মিস্ মন্দাকিনী প্রবল ফুটফুটে মেয়ে। একটা গাল লাল, এবং অন্য একটি ঈষৎপাণ্ডুবর্ণ, (one cheek red, one cheek pale) হোমিওপাথীমতে এটা 'ক্যামোমিলা'র 'সিমটম্' (লক্ষণ)। মিষ্টার গৌরচন্দ্রের মতে মিস্ মন্দাকিনী নায়িকার আদর্শ। (Perfect type of heroine) অর্থাৎ, মন্দাকিনীকে নায়িকাস্বরূপ গ্রহণ করিলে ছয়টা রিপুর কোনটারই উত্তেজনা হইবার সম্ভাবনা নাই। ধীরে ধীরে অবিশ্রান্তভাবে তাহাই লক্ষ্য করিয়া গৌরচন্দ্র মন্দাকিনীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

মন্দাকিনী একটি বিষয়। গৌরচন্দ্র তাহার করিলেন ধ্যান। ইহাতে আসক্তির উৎপত্তি হইবার খুব সম্ভাবনা। কেন না, মন্দাকিনী যুবতী। কিন্তু

আসক্তি নামক পদার্থের উৎপত্তি অনেকটা মানসিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আসক্তি যে প্রত্যেক বিষয়ের উপর হইবে, এমন কোনও কথা নাই।

গৌরচন্দ্র দেখিলেন, মিস্ মন্দার গলা কিঞ্চিৎ বেতর খাট। গলার স্বর, ভাঙ্গা হারমোনিয়মের খাম্বাজের "নি" যেমন, প্রায় তেমনই, মধ্যে মধ্যে ষ্টিক্ (stick) করে। হাব ভাব ভঙ্গী প্রভৃতিতে মন্দাকিনী জড় পদার্থের ন্যায়। অর্থাৎ উত্তেজনা না পাইলে উত্তেজিত হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পুনর্ব্বার বলিবার কারণ এই যে, গৌরচন্দ্র কোনও প্রকারের উত্তেজনা দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। উত্তেজনা দিলে প্রস্তর পর্য্যন্ত চৈতন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য। ইহা আচার্য্য বসুর আবিষ্কারে প্রমাণিত হইয়াছে। আবর্ত্তন প্রণালীতে, প্রত্যেক প্রকারের জড় উত্তেজনা পাইতে পাইতে, অবশেষে কারণ না থাকিলেও, উত্তেজিত হইয়া উঠে। নিহিত শক্তিকে (Potential Energy) ক্রিয়মাণ করিতে হইলে প্রকৃতি খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া জড়কে রকমারি রূপে সজীব করিয়া তুলেন। মানবপ্রকৃতি হইতে জড়ের ব্যবধান কত দূর, তাহা গৌরচন্দ্র পরীক্ষা করিতে বসিয়াছিলেন। সুতরাং,

২

গৌরচন্দ্র মন্দাকিনীকে বলিলেন, আপনার সহিত·········করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম।" গৌরচন্দ্র "আলাপ" কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহা হাত মুখ নাড়িয়া বুঝাইয়া দিলেন।

মিস্। আপনি আমাদিগের প্রতিবাসী, এবং আপনার ভগ্নী আমার শৈশবের সহচরী। আমরা একই স্কুলে পড়িতাম। আপনার হাতে ওখানা কি?

মিঃ গৌর। ভগবদ্গীতার নোটবুক।

মিস্। আপনি বোধ হয় মূল সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন?

মিঃ গৌর। এবং বিজ্ঞান। উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। অনেক সংস্কৃত কথা বৈজ্ঞানিক রকমের। বাঙ্গালা ভাষায় তেমনটি হয় না। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণেরই কর্ত্তব্য যে, বিজ্ঞানের দুরূহ শব্দগুলির প্রতিশব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে সংগঠন করিয়া দেশীয় সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করেন।

মিস্। অতি সদুদ্দেশ্য।

গৌরচন্দ্র। আমি সম্প্রতি ষড়রিপু সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

মিস্। কোনটা?

গৌর। সব কয়টা। আমার বিবেচনায় ছয়টা রিপু একত্র উত্তেজিত হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ গীতায় আছে। কর্ম্মক্ষেত্রেও দেখা যায়। যখন কাম প্রবল হয়, ক্রোধ হয় না; ক্রোধ হইলে লোভ হয় না; কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য ......এবং কামনা একই পদার্থ কি না।

গৌরচন্দ্র "প্রণয়" কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই হাত মুখ নাড়িয়া সারিলেন, এবং পুনরায় বলিলেন, "মূল কথাটা ভুলিয়া গিয়াছি। Love বলিয়া একটা কথা আছে, তাহার প্রতিশব্দ কি?"

মন্দাকিনী। প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা। আপনি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু নচেৎ—

গৌর। নচেৎ কি?

মন্দাকিনী। নচেৎ—নতুবা—আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে,—

তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল।

গৌর। আপনার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। প্রতিশব্দ, প্রতিবিম্ব, প্রতিশোধ প্রভৃতির ক্ষমতা সকলের হয় না। আপনি যদি আমার সহকারী অধ্যাপক হইতেন, তাহা হইলে আমি যথেষ্ট......হইতাম।

মন্দাকিনী। কৃতজ্ঞ?

গৌরচন্দ্র। ঠিক তাহাই।

গৌরচন্দ্র যে বিষয়টির ধ্যান করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে কামনার লেশমাত্র নাই। কিন্তু মিস্ মন্দাকিনীর সঙ্গলাভের চেষ্টা হইল কেন? ইহার মধ্যে উত্তেজনার কোনও লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া গৌরচন্দ্রের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। শারীরিক কামনা ও মানসিক কামনা, উভয়ের ক্ষেত্র বোধ হয় এক নয়। জ্ঞানলিপ্সা প্রভৃতি মানসিক কামনা। বোধ হয় গৌরচন্দ্র যাহা চাহেন, মন্দাকিনীর মধ্যে তাহা আছে। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা মন্দাকিনীর মধ্যে বর্ত্তমান। তিনি যাহা জানেন না, এমন অনেক বিষয় মন্দাকিনী জানেন। এই মানসিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জগতে প্রয়োজনীয়। "অতএব একবারে বলিয়া ফেলা ভাল"।

গৌর। আপনার (হাত মুখ নাড়িয়া)....করিবার কোন আপত্তি আছে?

"বিবাহ" কথাটা গৌরচন্দ্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মন্দাকিনী। আপনি আলাপন না করিলেই হইল।

গৌর। আলাপন আর কি

মন্দাকিনী। উত্তেজনা প্রভৃতি।

গৌর। মোটেই না।

সুতরাং উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

এই যে বিবাহের ইচ্ছা, এটা কি কাম? অবশ্য টীকাকার কিছু বলেন নাই। তাহা কখনই হইতে পারে না। কামের অর্থ স্বতন্ত্র।

[illegible] কামের অর্থ ধ্যান করিয়া গৌরের ক্রোধ উপস্থিত হইল। আমি [illegible] লাভ করিতে চাহি নাই, অথচ ঘাড়ে এ আপদ আসিয়া জুটিল কেন? আর তাঁহারই বা আক্কেল কি? এক কথায় এত বড় ব্যাপার সম্পাদন করিতে সম্মত হইলেন কেন? কি ছোট নজর!

সকাল বেলার 'চা' হইতে সন্ধ্যাবেলার হার্ম্মোনিয়ম পর্য্যন্ত সকলই মিঃ গৌরের নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। গৌরচন্দ্র বলিলেন, "তোমার হার্ম্মোনিয়ম বাজান রাখ।"

মন্দাকিনী। আমাকে জ্বালাতন করিও না। জ্বালাতনের প্রতিশব্দ উত্তেজনা।

গৌরচন্দ্র। প্রতিশব্দ যাহাই হউক না কেন, সারাদিন চীৎকার, আলাপ, হাস্যপরিহাস ও হার্ম্মোনিয়মের প্যাঁ প্যাঁ ধ্বনি আমার ভাল লাগে না।

৪

মন্দাকিনী বুঝিলেন, মিঃ গৌরচন্দ্রের মোহ হইবার উপক্রম হইয়াছে। হার্ম্মোনিয়ম, হাস্য, পরিহাস প্রভৃতি বন্ধ হইল। বাটীর মধ্যে কঠিন নীরবতা প্রতিষ্ঠিত হইল।

মন্দাকিনী সখী বিমলাকে ডাকিলেন। বিমলা প্রতিবাসী যুগল বাবুর নব-পরিণীতা সহধর্ম্মিণী। বড় রসিকা। বিমলা আসিয়া নিস্তব্ধ প্রকোষ্ঠে মন্দাকিনীর সহিত পরামর্শ করিল। গৌরচন্দ্র দেখিয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা বিমলা গান গাহিল। গৌরচন্দ্রের শুনিবার সাধ হইল। ক্রমে গান পর্দ্দায় পর্দ্দায় যত দূর উঠিল, গৌরচন্দ্রের শুনিবার লোভ তত দূর বর্দ্ধিত হইল। গৌরচন্দ্র মোহিত হইলেন, এবং মনে করিলেন, "মোহ" হইতেই কি "মোহিত"?

গৌরচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিয়া মন্দাকিনীর ঘরে গেলেন, এবং বলিলেন, "আর একটি গান না।"

মন্দাকিনী। তোমার স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছে

বিমলা। (সহাস্যে) কিন্তু বুদ্ধিনাশ হয় নাই।

গৌরচন্দ্র শয্যায় শুইয়া ভাবিলেন—"এইবার" "প্রণশ্যতি" নাকি ?

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ"—গৌরচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, একই জিনিস। অমুকের উপর কামনা হইলে, অন্য অমুকের ক্রোধ হয়। অন্য অমুক যদি প্রবলা হন, তবে পূর্ব্বোক্ত অমুকের উপর লোভ হয়, এবং কি করিয়া তাহাকে পাইব, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া বুদ্ধিভ্রংশ হয়। গৌরচন্দ্রের মন্দাকিনীর উপর রাগ হইল, কিন্তু ভয়ও সম্পূর্ণ ছিল, সুতরাং মোহাক্রান্ত হইয়া "প্রণশ্যতি"র ভীতিময় স্বপ্ন দেখিলেন।

ছাগল প্রভৃতি যখন মানুষের বাগানে চুরি করিয়া লাউ কুমড়া খাইতে যায়, তখন লাঠি খাইলেই পলাইয়া আসে। কিন্তু লাঠি খাওয়া, পলাইয়া আসা, এবং পুনর্ব্বার যাওয়া, এ তিনটা অভ্যাসই সমানভাবে বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং তাহারা পুনঃপুনঃ আসে, যায়, পুনঃপুনঃ লাঠি খায়।

মানবের পক্ষে একটু স্বতন্ত্র। তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়। দুই একবার লাঠি খাইতে খাইতে একটা মোহ আসিয়া পড়ে। বুদ্ধি যোগায় না। বুদ্ধি না জুটিলেই মোহ। যদি বুদ্ধি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে বলে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত। এরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে।

মিষ্টার ঘোষ গৌরের বন্ধু। গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপায় কি ?"

ঘোষ। তোমার বুদ্ধি কি একেবারে লোপ পাইয়াছে ?

গৌর। বুদ্ধি বিলক্ষণ আছে, কিন্তু তাঁহার কাছে চালাকী করিবার যো নাই।

ঘোষ। দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ কর।

গৌর। সেটা কাপুরুষতা।

ঘোষ। তবে উত্তেজনা ছাড়িয়া দাও।

গৌর। পূর্ব্বেই তাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।

ঘোষ। তুমি গাধা। তোমার অহঙ্কার নাই। যার অহঙ্কার নাই, তাহার উত্তেজনা থাকিলেও সে টের পায় না।

গৌর বুঝিলেন, ঠিক তাই। বুঝিয়া তাঁহার অহঙ্কার হইল। তিনি গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। মন্দাকিনী এই সাংসারিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া

হাসিলেন, এবং স্বামীর বদন চুম্বন করিলেন। গৌর বলিলেন, "মন্দা! তুমি রমণীরত্ন—তোমার······পাওয়া যায় না।"

"তুলনা" শব্দটি গৌর ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মন্দাকিনী। কেন? বিমলা।

গৌর নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"ওঃ ভারি, আর কি! অমন ঢের দেখেছি।"

কিন্তু গৌর দেখিলেন যে, অহঙ্কারটার মধ্যে পরের ভাল জিনিসটি দেখিলে একটু কেমন কেমন বোধ হইত। মন্দাকিনী বলিলেন, "ওটা মাৎসর্য্য। প্রতি-শব্দ—পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি।" গৌর বলিলেন, "লোভ নয় ত?" মন্দা বলিলেন, "না।"

সহযোগী সাহিত্য।

নিষিদ্ধ নগরী লাসা।

প্রাচ্যভাষাবিৎ রুস পরিব্রাজক M. G. T. Tsybikov রুসিয়ার রাজকীয় ভৌগোলিক সভার আদেশক্রমে তিব্বতযাত্রা করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি লাসা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে বিঘ্ন-বিহত হইয়া, যথাসময়ে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারেন নাই। গতবর্ষের প্রায় মধ্যভাগে তিনি উরগাস্থিত রুস রাজদূত-নিবাসে উপনীত হন। গত ফেব্রুয়ারী মাসের "ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন" নামক সাময়িকপত্রে তাঁহার বিবিধ তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সাহিত্যের তিব্বততত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম।—

যাত্রা।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এক দল বণিক্ ও তীর্থযাত্রী গোমগোমের আমদ মঠ হইতে লাসা অভিমুখে যাত্রা করিল। এই যাত্রিদলে কতিপয় আমাদ। লামা ও মঙ্গোলীয় বণিক ছিলেন। যাত্রিদলের লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৭০ জন। আমিও সামান্য তীর্থযাত্রীর বেশে তাহাদিগের সঙ্গী হইলাম। ১: আমদো হইতে আনীত দুই শত অশ্ব ও অন্য ভারবাহী আমাদিগের ভ্রমণ-সম্ভার বহন করিতেছিল। বিশ্রাম ও রজনীযাপনার্থ আমাদিগের সঙ্গে ১৭টি বস্ত্রাবাস ছিল। ২২ দিনে আমরা উত্তর তিব্বতের জনশূন্য মালভূমি উত্তীর্ণ হইয়া ব্যোমস্পর্শী শৈলমালার উত্তরপ্রান্তবাহিনী স্থানচু নদীর তীর-ভূমিতে বস্ত্রাবাস সন্নিবেশিত করিলাম। সর্ব্বপ্রথম এইখানেই আমাদিগের সহিত মধ্য

তিব্বতের অধিবাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিল। বিদেশীয়দিগের গতিরোধ ও তাহাদিগের আগমনসংবাদ রাজপুরুষদিগকে প্রদান করিবার জন্ম এই প্রদেশে কয়েকটি থানা আছে। প্রথম থানার নিকট উপস্থিত হইলে আমাদিগের গতি রুদ্ধ হইল। থানার সৈনিকেরা আমাদিগের তাম্বুতে আসিয়া আমাদিগকে সাধারণ তীর্থযাত্রী বণিক্‌দল দেখিয়া আর কিছু বলিল না। সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কেহ স্থানীয় দ্রব্যাদির বিনিময়ে বণিকদিগের নিকট হইতে সামান্ত সামান্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে লাগিল, আর কেহ বা পণ্যসম্ভারস্খলিত দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিবার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। সুবিখ্যাত রুস পরিব্রাজক P. M. Przhevalsky তৃতীয়বার মধ্য এসিয়া ভ্রমণকালে এই স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন।

চারিবার বাত্যবিদীর্ণ পথ অতিবাহনের পর আমরা নাকচু মঠে পঁহুছিলাম। ঐ স্থলে গৃহহীন যাযাবর অধিবাসীদিগের দুই জন শাসনকর্ত্তা অবস্থিতি করেন। ইঁহাদিগের এক জনের নাম "খানবো", অর্থাৎ পুরোহিত। আর এক জনের নাম "জানসাল", অর্থাৎ সাধারণ লোক। ইঁহারা এই প্রদেশের অধিবাসীদিগের শাসন, করসংগ্রহ, থানাসমূহের পর্য্যবেক্ষণ ও সন্দিগ্ধচরিত্র পথিকদিগের পরীক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

পথিক-পরীক্ষা।

আমার প্রতিও ইঁহাদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছিল; কিন্তু আমাদিগের দলের পূর্ব্বেই মঙ্গোলীয়দিগের সহিত কয়েক জন বৌরিয়াট অঞ্চলের লোক আছে বলিয়া সংবাদ প্রদান করাতে এ যাত্রা নিষ্কৃতিলাভ করিলাম। ইদানীং বৌরিয়াট অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে কর্ত্তৃপক্ষ তিব্বত-প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিলেন। তথাপি "খানবো" মহাশয় আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দর্শনী আদায় করিলেন। রজতখণ্ডের শুভ্রজ্যোতিতে তাঁহার হৃদয়ের সন্দেহ-অন্ধকার দূরীভূত হইল। আমি লাসা গমনের অনুমতি পাইলাম। তিন মাস পর্য্যটনের পর আমরা ১৬ই অগষ্ট লাসায় পঁহুছিলাম।

লাসা অথবা লাধান অর্থে দেবভূমি বা দেবপূর্ণ স্থান। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে Khan

দেবভূমি।

Sroutszan-Gambo এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। শুনা যায়, তাঁহার মহিষীগণের মধ্যে দুইটি মহিলা বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের এক জন চীনরাজদুহিতা, অপরা নেপালরাজপুত্রী। পতিগৃহে আগমনকালে এই রমণীযুগল বুদ্ধ শাক্যমুনির প্রতিমা আনিয়াছিলেন। এই প্রতিমাযুগলের প্রতিষ্ঠার্থ লাসায় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। খাঁ মহোদয় শৈলশিখরে স্বীয় নিবাসনিকেতন সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে এক্ষণে তিব্বতের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ব বিষয়ের অধিনেতা দালাই লামার সুরম্য প্রাসাদ শোভা পাইতেছে। সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূমির উপরিভাগে লাসা নগর বিনির্ম্মিত হইয়াছে। নগরের একপ্রান্তে উইচু নদীর কলসঙ্গীতমুখর প্রবাহ, অন্ত দিকে উইচুর দক্ষিণতীরবর্ত্তী উন্নত পর্ব্বতমালা। গোধলা প্রাসাদ হিসাবের মধ্যে না ধরিলে দালাই লামার প্রাসাদ প্রায় বৃত্তাকার বলা যাইতে পারে। এই হর্ম্ম্যবৃত্তের ব্যাস এক মাইল হইবে। প্রাসাদশ্রেণীর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের উপবনরাজি, গোধলার সন্নিহিত

স্থান ও অপর দুইটি প্রাসাদসমেত এই বৃত্তের পরিধি অন্যূন পঁচিশ মাইল। নগর পরিবেষ্টন পূর্ব্বক যে বৃত্তাকার রাজপথ শোভা পাইতেছে, তাহার দৈর্ঘ্য কিন্তু আট মাইলের অধিক হইবে না। ভক্তদল ক্রমাগত "দণ্ডী" দিতে দিতে এই পথে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। "দণ্ডী" দিবার সময় হস্তরক্ষার্থ যাত্রীদিগকে কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কিন্তু এই যাত্রীদিগের ভক্তি প্রগাঢ় বলিয়া পরিগণিত হয় না। সময় সময় পুণ্যপ্রয়াসী তীর্থযাত্রীরা তিন হইতে সাতবার পর্য্যন্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে পক্ষকাল সময় লাগে, এবং ৪২ হাজার বার "দণ্ডী" দিতে হয়।

নগরের দৃশ্য।

তিব্বতবাসীরা বৃক্ষ ও তরুবীথি-পরিবৃত নগরাঙ্গণ (Square) ও উপবনের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাহাদিগের রাজধানী লাসার দূরদৃশ্য বড় হৃদয়হারী। বিশেষতঃ বসন্ত বা শরৎকালে প্রধান মন্দিরযুগলের স্বর্ণশীর্ষ ও সমুজ্জ্বল হর্ম্ম্যরাজির শুভ্র প্রাচীরশ্রেণী যখন রবিকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া কুসুমাকীর্ণ উপবন-মধ্যে ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে, তখন সে দৃশ্য দেখিলে সকলেরই চিত্ত মুগ্ধ হয়। কিন্তু পথিকেরা নগরোপকণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর অতি সঙ্কীর্ণ বক্রপথে প্রবেশ করিলে নগরীর দূরদৃশ্যপ্রসূত শোভার ইন্দ্রজাল সহসা অপনীত হয়। বর্ষাকালে নগরের পথগুলি পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত হয়। এবং সঞ্চিত কর্দ্দমময় জলে পার্ব্বতীয় গো-মেষাদির শব ভাসিতে থাকে।

নগরের অধিষ্ঠানক্ষেত্র সমতলভূমি প্রতিবৎসর গিরিনিঃসৃত নির্ঝরজলে ও উচ্ছ্বসিত নদীপ্রবাহে জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়। তজ্জন্য নগররক্ষার্থ নগরের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে খাল নিখাত ও বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে।

নগরের সাধারণ অধিবাসীদিগের গৃহ শিলাখণ্ড ও অদগ্ধ ইষ্টকে নির্ম্মিত। নগর ভিন্ন

নাগরিকদিগের গৃহ।

অন্য সর্ব্বত্র একতল গৃহই দৃষ্টিগোচর হয়। নগরের গৃহসমূহ দুই বা ততোধিক তল উচ্চ। গৃহের বাতায়নমালা প্রায়শঃ আবরণশূন্য। কেবল গ্রীষ্ম ও শীতকালে, মসলিন, কেলিকো অথবা কাগজের দ্বারা বাতায়নগুলি কথঞ্চিৎ আবৃত করা হয়। রন্ধনশালায় "অগ্নিস্থান" বা চুল্লী আছে। কিন্তু রন্ধনের সময় ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে তন্মধ্যে আগুন জ্বালা হয় না।

নগরের মধ্যস্থলে বুদ্ধমন্দির। মন্দিরমধ্যে বুদ্ধদেবের বিরাট মূর্ত্তি বিরাজমান।

মন্দির ও মূর্ত্তি।

মন্দিরটি সমচতুষ্কোণ, উহার পরিমাণ প্রায় চারিশত বর্গ ফিট। এই দ্বিতল মন্দিরে চৈনিক প্রথায় নির্ম্মিত চারিটি গিল্‌টি করা ছাদ আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে দ্বার ও গবাক্ষ বিদ্যমান। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কক্ষনিচয় অন্ধকারময় ও বর্ত্তিকালোকে আলোকিত। এই কক্ষসমূহে বুদ্ধের নানাপ্রকার মূর্ত্তিসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। কক্ষের মধ্যস্থলে বহুমূল্য চন্দ্রাতপতলে বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধেরা ভক্তিসহকারে এই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকে। মূর্ত্তিটি পিত্তলনির্ম্মিত। বুদ্ধের স্কন্ধ ও শীর্ষদেশ মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণভূষণে অলঙ্কৃত। সাধারণ বুদ্ধমূর্ত্তিসমূহে এরূপ অলঙ্কার

দেখিতে পাওয়া যায় না। মূর্ত্তির মুখমণ্ডল মাজ্জিত স্বর্ণ দ্বারা পরিশোভিত। রেণুর আকারে স্বর্ণসমূহ মুখমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দেবমূর্ত্তির সম্মুখে কাষ্ঠময় দীপাধারে ঘৃতপরিপূর্ণ স্বর্ণ-দীপাবলী অবিশ্রান্ত জ্বলিতেছে। দেবতার প্রীতিকামনায় ভক্তবৃন্দ এই দীপনিচয় দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছে। মন্দিরমধ্যবর্ত্তী অবলোকিতেশ্বর ও নারীজাতির অধিষ্ঠাত্রী বাল-লামো দেবীর মূর্ত্তিযুগলও অনুরূপ ভক্তিসহকারে অর্চ্চিত হইয়া থাকে। "স্বর্ণ পানীয়" নামক যবসুরা দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে ক্রমাগত ঢালিয়া দেওয়া হয়। দেবমন্দিরবাসী ইন্দুর-দিগের ভূরি ভোজনের জন্য গৃহতলে প্রচুর পরিমাণে যব ছড়াইয়া দেওয়া হয়। মূষিকেরা দেব-মূর্ত্তির পরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে পরমসুখে বাস করে। দেবালয়বাসী মূষিকের মৃতদেহ এ দেশে গর্ভবতী রমণীদিগের পক্ষে পরম উপকারী বলিয়া পরিগণিত। লোকে শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী মঙ্গোলিয়া ও আমদ হইতে প্রসূতিদিগের জন্য ইন্দুরের মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই দেবমন্দির ভিন্ন অন্যত্র ইন্দুরের এরূপ আদর নাই। * * *

তিব্বতীয় রাজাদিগের প্রাচীন প্রাসাদ, নগরের অতীত ইতিহাসের স্মরণ চিহ্নস্বরূপ বহুযত্ন-সহকারে রক্ষিত হইয়াছে। দালাই লামা তিব্বত রাজ্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিব্বতীয় রাজবংশের শেষ নরপতি এই প্রাসাদে বাস করিতেন। রাজধানীর মধ্যে কেবল এই প্রাসাদটি সুধাধবলিত নহে। বোধ করি, প্রাসাদের পৌরাণিক গাম্ভীর্য্যনাশের আশঙ্কায় রাজপুরুষেরা এরূপ ব্যবস্থা করিয়া-ছেন।

পুরাতন প্রাসাদ।

নগরের পশ্চিম প্রান্তে হর্ম্ম্যশ্রেণী ভেদ করিয়া বোধলা বা দালাই লামার প্রাসাদ উত্থিত হইয়াছে। শিলাময় উচ্চভূমির উপর লামার প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। বহুপূর্ব্বকালে প্রাসাদনির্ম্মাণ আরব্ধ হয়, কিন্তু তাহার পর উহার অনেক অংশ পুনর্গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত পঞ্চম লামা অথবন লরসন কাঝিয়া মাটসোর জীবনকালে অথবা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে বোধলার "লোহিত প্রাসাদ" নামক অংশ নির্ম্মিত হয়। প্রাসাদটি যে প্রথমে দুর্গরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহা উহার গঠনপ্রণালী দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এখনও তিব্বতভূমি বহুসংখ্যক প্রাসাদ দুর্গের ভগ্নাবশেষে আকীর্ণ। এই প্রাসাদটিও সেই দুর্গনিচয়ের অন্যতম। বোধ করি, বোধলার নির্ম্মাণে পূর্ব্বকথিত দুর্গসমূহের উপকরণরাশি ব্যবহৃত হওয়াতে উহারা এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। বোধলা প্রাসাদ ১৪ শত ফিট দীর্ঘ, নয় অথবা দশ তল উচ্চ। দুর্গের সম্মুখ ও পার্শ্বদেশ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। পশ্চাদ্ভাগ পর্ব্বত সুরক্ষিত। এই প্রাসাদনির্ম্মাণে তিব্বতীয়েরা দেশকালের উপযোগী হর্ম্ম্যকৌশল ও কলা-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে। প্রাসাদটি তিব্বতীয় শিল্পবৈভবে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। প্রাসাদের কারুকার্য্যসমূহের মধ্যে পঞ্চম দালাই লামার স্বর্ণময় স্মৃতিলিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দালাই লামার বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার প্রাসাদের "লোহিত প্রাসাদে" সংরক্ষিত। দালাই লামা এই লোহিত প্রাসাদে বাস করেন। এই প্রাসাদটি নামে "লোহিত" হইলেও, প্রকৃতপক্ষে, উহা ধূসরবর্ণে অনুরঞ্জিত। প্রাসাদের অন্যান্য অংশে কর্ম্মচারী, পরিচারক ও লামার শিষ্যবর্গের

বোধলা।

বাস। তদ্ভিন্ন পাঁচ শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই প্রাসাদে অবস্থান করেন। ধর্ম্মানুমোদিত বিবিধ অনুষ্ঠান ব্যতীত দালাই লামার দীর্ঘজীবন ও কল্যাণকামনায় প্রার্থনা পাঠ ইঁহাদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

পর্ব্বতপার্শ্বস্থ একটি প্রাঙ্গণে টাঁকশাল, বিচারালয় ও কারাগৃহ দেখিতে পাইলাম। এই প্রাঙ্গণের কিঞ্চিৎ দূরে তিব্বতীয় চিকিৎসা-বিদ্যালয় বা "মানবা দাতাসন"। দালাই লামার বৃত্তিভোগী ৬০ জন শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। শৈলমালার নিম্নতর প্রদেশে চৈনিক বৌদ্ধদিগের মন্দির ও দুইটি প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাসাদযুগলের একতর দালাই লামার নিদাঘনিবাস। লাসায় তান্ত্রিকবিদ্যাশিক্ষার্থ দুইটি প্রধান বিভাগ আছে।

লাসাকে একপ্রকার নারী-নগর বলা যাইতে পারে। পুরোহিতদিগকে বাদ দিলে নগরের

নারী-নগর।

অধিবাসি-সংখ্যা দশ সহস্রের অধিক হইবে না। এই অধিবাসীদিগের দুই-তৃতীয়াংশ রমণী। দুইটি প্রধান মঠের সান্নিধ্য ও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহ উপলক্ষে তীর্থযাত্রী ও পল্লীবাসিগণের সমাগমবশতঃ নগরটি জনাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

বৃহৎ মন্দিরের চারি পার্শ্বে ও নগরের গৃহসমূহের সর্ব্বনিম্ন তলে বাজার বসে। রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী "ফাঁকা জায়গা" ও নগরাঙ্গণসমূহে বিপণীমালা বিদ্যমান। নেপালী ও কাশ্মীরীদিগের দোকান ভিন্ন আর সকল বিপণীতেই রমণীরা ব্যবসায়ের হিসাব ও কাগজপত্র রাখে। শুধু লাসা কেন, সমগ্র তিব্বতদেশকে নারীদেশ বলা যাইতে পারে। কৌমারব্রতধারী পুরুষদিগের সংখ্যাবাহুল্য দেশে রমণীপ্রাধান্যের কারণ। তজ্জন্য দেশের অধিকাংশ রমণীই ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়গত স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। এ দেশে বহুপত্যাত্মক ও বহুপত্ন্যা-

বিবাহ।

ত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে। একই রমণীর সহিত কতিপয় সহোদরের এবং একমাত্র পুরুষের সহিত কতিপয় সহোদরা ভগিনীর বিবাহ এ দেশে পবিত্র ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত।

বোধ করি, তিব্বত ভিন্ন অন্য কোনও দেশে বিষয়কর্ম্মে নারীদিগের এরূপ প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না। নারীদিগের সংস্রবশূন্য কোন প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য তিব্বতে প্রচলিত আছে বলিয়া আমার মনে পড়ে না। রমণীরা পুরুষের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও অনেক বৃহৎ বৃহৎ কাজ স্বাধীনভাবে সম্পাদন করিয়া থাকে।

নূতন দালাই লামা নির্ব্বাচন এ দেশের একটি পরম কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। প্রথম

লামা-নির্ব্বাচন।

লামাপদপ্রার্থী তিন জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম তিনখানি টিকিটের উপর লিখিয়া টিকিট তিনখানি একটি স্বর্ণাধারের মধ্যে রক্ষিত হয়। অতঃপর স্বর্ণপাত্রটি বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক নানা মঠ হইতে সমাগত পুরোহিতেরা "পুনরবতার-নির্দ্দেশক" উৎসব সম্পাদন করে। উৎসবান্তে স্বর্ণপাত্রটি বোথলা প্রাসাদে নীত ও সম্রাটের নামাঙ্কিত কাষ্ঠফলকের নিকট সংস্থাপিত হয়। বোথলা-প্রাসাদে উৎসবস্থলে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, প্রধান মঠসমূহের পুরোহিতগণের প্রতিনিধি ও

স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। স্বর্ণপাত্র রাজনামাঙ্কিত কনকসমীপে সংস্থাপিত হইবার পর রাজপ্রতিনিধি দুইটি ভোজন-শলাকায় (Chopstick) সাহায্যে পাত্র হইতে একখানি টিকিট উত্তোলন করেন। এইরূপে লামানির্ব্বাচন শেষ হইলে সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত বালককে দালাইলামার পদে অভিষিক্ত করা হয়। অভিষেকের পর হইতে বালকের প্রতি পদোচিত সম্মানও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। খ্যাতনামাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে এই বালক দালাইলামার শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বালককে অতি অল্প বয়স হইতে পঠন ও লিপিবিদ্যা শিক্ষা দেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বালককে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং যাহাতে সে ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা তত্ত্বের মীমাংসায় পারদর্শী হইতে পারে, তজ্জন্য প্রধান প্রধান মঠের অধ্যক্ষেরা স্ব স্ব মঠ হইতে এক জন সন্ন্যাসীকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। এইরূপে নিরূপিত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে দালাই লামা অন্যান্য লামাদিগের ন্যায় ধর্ম্মসংক্রান্ত উচ্চতম উপাধি লাভ করেন। লামা মঠসমূহের অধ্যক্ষবর্গকে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন; তজ্জন্য পরীক্ষকগণ বিশেষ সতর্কতাসহকারে পরীক্ষা-প্রশ্নের নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন।

শিক্ষা।

বর্ত্তমান দালাইলামা বিংশ বা দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ছয় জন লামা দালাইলামার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ছয় সাত বৎসর হইল, বর্ত্তমান দালাই লামার সহিত তাঁহার অভিভাবক তিব্বতীয় বিখ্যাত "পুনরবতারে"র রাজনৈতিক বিরোধ উপস্থিত হয়। লামা মহোদয় এই বিরোধে জয়লাভ করিয়া আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দালাইলামারা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। ক্ষমতাগর্ব্বদৃপ্ত অভিভাবক অথবা তাঁহার প্রতিযোগীরাই স্বার্থসাধনমানসে তাঁহাদিগের প্রাণবধ করিয়াছিল। অভিভাবক দৈবানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া দালাইলামা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। অতঃপর তাঁহার বিপুল ভূমিসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে নিজগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে এক দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল, লামার অভিভাবকের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে; তাহার মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান লামা পরম উৎসাহশীল ও সহৃদয় ব্যক্তি। তিনি তিব্বতের শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া প্রাণদণ্ড রহিত করেন। দালাইলামার অধীন "দেবাশোন" নামক মন্ত্রিসভার হস্তে দেশের শাসন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে। চীন সম্রাট এই সভার চারি জন প্রধান সদস্যকে মনোনীত করেন। তিব্বতীয় ধর্ম্মাধিকরণে বিচার বিক্রীত হয়, এবং গবর্মেণ্টের সমুদয় কার্য্যই উৎকোচের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কশাঘাত ও নির্য্যাতনের সাহায্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের অপরাধের অনুসন্ধান সম্পাদিত হয়। নির্য্যাতনের মধ্যে অপরাধীর গাত্রে প্রজ্বলিত লাক্ষার তরল বিন্দুক্ষেপণই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। কশাঘাত, কারাবাস, দাসরূপে নির্ব্বাসন, দৃষ্টিনাশ, অঙ্গুলিচ্ছেদন ও চিরশৃঙ্খলবহন প্রভৃতি দণ্ড অপরাধীদিগের প্রতি বিহিত হইয়া থাকে।

শাসনপ্রণালী।

গবর্মেণ্টের ব্যয়ে চারি সহস্র সেনা রাজ্যরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে। তরবারি, বন্দুক, তীর ও ধনু ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র। পক্ষীর পুচ্ছে ইহাদিগের মস্তক শোভিত। কেহ কেহ ক্ষুদ্র কলঙ্ক ও বর্ম্ম ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের সামরিক শিক্ষা অতি হীন। সৈনিকেরা গ্রামেই বাস করে, কেবল মধ্যে মধ্যে ব্যূহাভ্যাস ও অস্ত্রকৌশল শিক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে নগরে আসে। এই সেনাবল পদাতিক ও অশ্বারোহী এই দুই ভাগে বিভক্ত। মধ্য তিব্বতের অধিবাসীরা সমরবিমুখ, উহারা সেনাবিভাগে কাজ করিতে ভালবাসে না। পূর্ব্বতিব্বতের গৃহহীন যাযাবর জাতিরা শান্তপ্রকৃতি অধিবাসীদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনকালে যাহাতে কাহারও শোণিতপাত করিতে না হয়, তৎপ্রতি ইহাদিগের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। সাধারণতঃ ভয়প্রদর্শনে কার্য্যসিদ্ধি হইলে ইহারা বলপ্রয়োগ করিতে চাহে না। গৃহস্থেরা সামান্য সাহস প্রকাশ করিয়া উহাদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেই উহারা পলায়ন করে।

সামরিক-শক্তি।

সম্প্রতি তিব্বতের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় দ্রব্যের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের মুদ্রা এখন তিব্বতীয় মুদ্রার সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। তিব্বত হইতে ভারতবর্ষে মেষলোম, চমরী-পুচ্ছ, লবণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতির আমদানী হয়। পশ্চিম চীন হইতে অশ্ব ও গর্দ্দভ আনীত হইয়া থাকে।

তিব্বতীয়েরা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে দেশজাত নানাবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। দরিদ্রদিগের বস্ত্র সাধারণতঃ শুক্ল ; কারণ, শুক্ল বস্ত্রই স্বল্পমূল্য। সৈনিকেরা ঘননীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করে। সম্পত্তিপন্ন লোকেরা রক্তবর্ণ, রাজা ও রাজপুরুষেরা পীতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। তিব্বতীয়েরা বসন ভূষণ সম্বন্ধে অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয়। ইহারা স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মুক্তা, প্রবাল ও অন্যান্য মণিনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ করে।

পরিধেয়।

যব বা গমের রুটী অধিবাসীদিগের প্রধান খাদ্য। চা অথবা যবসুরার সহিত এই রুটি মিশ্রিত করা হয়। তদ্ভিন্ন খাদ্যের মধ্যে মূলাই সর্ব্বত্র প্রচুর পাওয়া যায়। যবচূর্ণের সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূলার কুচি মিশাইয়া এ দেশে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয়। এই ব্যঞ্জন তিব্বতবাসীর প্রিয় বস্তু। মরিচচূর্ণ মিশাইয়াও মূলার ব্যঞ্জন রাঁধা হয়, কিন্তু সে কেবল অর্থশালী লোকদিগের ভোগ্যদ্রব্য। তিব্বতীয়েরা আমমাংস অথবা অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস খাইতে ভালবাসে। গোমাংস অপেক্ষা ইয়াক, মেষ ও শূকরমাংসই তিব্বতীয়দিগের সমধিক প্রীতিকর। দরিদ্রেরা মৎস্য ভোজন করে। কিন্তু পক্ষিমাংস কেহই খায় না। ডিমের জন্যই এখানকার লোকে কুক্কুট পুষিয়া থাকে। পবিত্র প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবার জন্যই কেবল নবনীত ব্যবহৃত হয়। তক্র বা ঘোল তীব্বতীয়দিগের পরম প্রিয় পানীয়। অধিবাসীরা নরনারী-নির্ব্বিশেষে প্রচুর-পরিমাণে যবসুরা পান করিয়া থাকে। যবসুরার অত্যন্ত মত্ততা জন্মে, এবং ইহার মূল্যও অত্যন্ত সুলভ। তিব্বতবাসীরা "পাইপের" সাহায্যে তাম্রকূট-ধূম পান করে।

খাদ্য।

মঠের সন্ন্যাসীরা নস্য ব্যবহার করেন। তিব্বতে তামাক অতি দুর্লভ, তজ্জন্য ধূমপান-কালে তামাকের সহিত অন্য বৃক্ষপত্র মিশ্রিত হয়।

তিব্বতীয়েরা অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন এবং ভাবপ্রবণ। ইহারা জীবনের প্রত্যেক ঘটনার কারণ জানিবার জন্য লামা অথবা গণকদিগের শরণাগত হইয়া থাকে। উহারা পীড়ার সময় ঔষধ অপেক্ষা লামাপ্রদত্ত একটি মন্ত্রকেই অধিক কার্য্যকারী বলিয়া মনে করে, এবং রোগীর নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য এক জন লামাকে ডাকিয়া আনে। সময়ে সময়ে তিব্বতীয়েরা আমোদপ্রমোদে যোগদান করে। পর্ব্বাহ বা উৎসব উপলক্ষে উহারা নাচিয়া গাহিয়া যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করে। তিব্বতীয়দিগের অভাব সীমাবদ্ধ। আমি যখন তিব্বতে ছিলাম, তখন স্থানীয় মুদ্রার মূল্য দশ সেণ্ট ছিল। সমস্ত দিন উপাসনা করিয়া এক জন লামা যদি এক মুদ্রা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে অতি উচ্চ পারিশ্রমিক পাইয়াছেন মনে করেন। পল্লীগ্রামে নিপুণ সূত্রধরেরা প্রত্যহ সাত সেণ্ট পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয়। সাধারণ শ্রমজীবী ও শ্রমজীবিনীরা দৈনিক দুই বা তিন সেণ্টের অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। পরিচারকেরা প্রায়ই কোনও বেতন পায় না, প্রভু-প্রদত্ত অন্নবস্ত্রই তাহাদিগের পারিশ্রমিক।

লাসায় ভিক্ষাবৃত্তির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। যে সকল হতভাগা রাজদণ্ডে নষ্টদৃষ্টি, ছিন্নহস্ত বা চিরনিগড়বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, ভিক্ষাই তাহাদিগের একমাত্র উপজীবিকা। এ দেশে ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় নহে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ পুরোহিতেরা, ভিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করে না।

মুসলমান-শিক্ষাসমিতি।

বঙ্গীয় মুসলমানসমাজের চিন্তাশীল পরিচালকবর্গ এত দিন স্বজাতির উন্নতি-সাধনকামনায় বিবিধ আন্দোলন ও আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এবার তাঁহাদের অধ্যবসায়ে মুসলমান-শিক্ষাসমিতি নামে এক মহাসভা গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি রাজসাহীতে তাহার প্রথম অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজসাহীর অধিবাসিবর্গের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; শতকরা ৮০ জন মুসলমান। তন্মধ্যে ধনী বা সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সংখ্যা অধিক না হইলেও, রাজসাহীর মুসলমান অধিবাসিবর্গ অনেকদিন হইতে পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছেন; কেহ কেহ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার উচ্চশিক্ষালাভেও যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রমেই রাজসাহীতে মুসলমান-শিক্ষাসমিতির প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে; তদুপলক্ষে নানা স্থানের মুসলমান প্রতিনিধি-

গণ দুই দিবসের জন্য রাজসাহীতে সমবেত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের বক্তৃতা-শ্রবণের জন্য সভামণ্ডপ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা হাই-কোর্টের সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত মৌলবী সাম্‌সুল হুদা সাহেব সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া যথাযোগ্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার উর্দ্দু ও ইংরাজী বক্তৃতার আদ্যন্ত সদ্ভাবে ও আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের অশেষগুণালঙ্কৃতা নবাব বেগম সাহেবার সুযোগ্য জামাতা শ্রীযুক্ত মিরজা সুজাতালী বেগ খাঁ বাহাদুর ও অন্যান্য সুশিক্ষিত প্রতিনিধিগণও এই মহাসভার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন। নওয়াখালির প্রতিনিধি প্রথম অধিবেশনদিবসেই বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া পর-লোকে গমন করায়, হর্ষকোলাহল বিষাদব্যথায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি শেষ পর্য্যন্ত সভার কার্য্য যথাযোগ্য ধীরতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে বিলাতপ্রত্যাগত সুশিক্ষিত মুসলমান ব্যারিষ্টারগণকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই; স্বনামখ্যাত সম্ভ্রান্ত জমীদারবর্গের সংখ্যাও অধিক হয় নাই। কিন্তু যে সকল স্বজাতিহিতৈষী মুসলমান বক্তা ও লেখক নানা ভাবে মুসলমান-সমাজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সভাস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন। দুই চারিটি উর্দ্দু ও ইংরাজী বক্তৃতা ভিন্ন সমস্ত কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হইয়াছিল। যে সকল উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতার আবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা রচনাগৌরবে বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের অধিকারী। প্রতিনিধিগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; বন্যাস্রোতের ন্যায় যে জনস্রোত সভাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তাহা অপসৃত হইয়াছে; রাজসাহী কলেজের ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে সভামণ্ডপ স্থানান্তরিত হইয়া তাহা আবার বালক-বৃন্দের শৈশবসুলভ হাস্যকৌতুকে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু বঙ্গবাসী মুসলমানের নিকট রাজসাহীর সেই সম্মিলন-ক্ষেত্র চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

আনন্দকোলাহলে আত্মহারা হইয়া সময়ের উত্তেজনায় অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন; পদ্যে গদ্যে মুসলমানগৌরবের অতীত কাহিনী কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্ষণকালের জন্য বর্ত্তমান অবসন্ন অবস্থা বিস্মৃত হইয়া আশার উজ্জ্বল আলোকে জনসাধারণের বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ধীরভাবে অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখিলে মুসলমান-শিক্ষাসমিতির পক্ষে আত্মশ্লাঘায় সময়ক্ষয় করিয়া সম্মুখের দুর্গম পথকে সরল বা সহজ পথ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলোক প্রজ্বলিত

করিতে হইলে যে বিপুল শক্তির প্রয়োজন, তাহা কোনও সমাজের পক্ষেই অনায়াসসাধ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মুসলমানসমাজের ন্যায় অসহায় সমাজের পক্ষে তাহা অধিকতর আয়াসসাধ্য ব্যাপার। বক্তৃতায় বা প্রবন্ধ-রচনায় উৎসাহের পরিচয় প্রদান করা কঠিন নহে; সে বিষয়ে মুসলমানগণ অল্পদিনের মধ্যে যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাহাতেই কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত সমাজ-হিতৈষীর প্রাণপণ চেষ্টাও পদে পদে ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা আছে। দীর্ঘকালের অক্লান্ত অধ্যবসায় ভিন্ন সহসা কোন প্রত্যক্ষ ফল সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অসহিষ্ণু জনসাধারণ তাহা না বুঝিয়া অল্প দিনেই ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়ে। আমাদের অনেক চেষ্টা এই কারণে অল্পকালের মধ্যেই অবসন্ন হইয়া যায়। বীজবপন করিয়াই জনসাধারণ ফলভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে; হাতে হাতে ফল পাইতে বিলম্ব ঘটিবামাত্র তাহারা একে একে কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না করিয়াই, ইহাতে কিছু হইবে না বলিয়া, স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অধঃপতিত জাতির আত্মোন্নতিসাধনের পক্ষে এই অসহিষ্ণুতা প্রবল অন্তরায়। মুসলমানের প্রাণের স্পন্দন এখনও তিরোহিত হয় নাই; এখনও আত্মোৎসর্গে স্বজাতির কল্যাণসাধন করিবেন বলিয়া অনেকে প্রবলপ্রতাপে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। এ সকল যদি মায়ামরীচিকা না হইয়া আন্তরিক দৃঢ় সংকল্পের পরিচায়ক হয়, তবে মুসলমান-শিক্ষাসমিতির দ্বারা বাঙ্গালী মুসলমানসমাজের অজ্ঞানান্ধকার কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।

যাঁহারা এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। বাঙ্গালী এখন হিন্দু মুসলমান নামক দুই শাখায় বিভক্ত; উভয়ের উন্নতি ভিন্ন বাঙ্গালীর উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। তজ্জন্য হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। সদ্ভাবসংস্থাপনের জন্য উভয় সমাজের পরিচালকবর্গের আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। হিন্দু মুসলমানের অতীত ইতিহাস যেরূপ হউক না কেন, তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ এক সূত্রে গ্রথিত। এখন আর হিন্দু মুসলমানের দেশগত স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য নাই; এখন উভয়েই বাঙ্গালী। এ সময়ে মুসলমানসমাজকে প্রকৃত পথে চালিত করিতে হইলে, স্বদেশপ্রীতি বর্দ্ধিত করিতে হইবে। স্বদেশপ্রীতিই ইউরোপ আমেরিকার আধুনিক অভ্যুদয়ের মূল; স্বজাতিপ্রীতি এসিয়াবাসী সমস্ত পুরা-

তন জাতির অধঃপতনের মূল। স্বজাতিপ্রীতি অতিমাত্রায় উন্নতিলাভ করিলে অন্য জাতির প্রতি অপ্রীতি উৎপন্ন করিয়া মানবসমাজকে স্বজাতিগৌরবান্ধ করে। তাহাতে কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে না। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হইলে, কাহারও উন্নতিলাভের আশা নাই। বক্তৃতার উত্তেজনায়, করতালির উদ্দীপনায় অনেকে মনে করিতে পারেন,—মুসলমানকে ছাড়িয়া হিন্দু এবং হিন্দুকে ছাড়িয়া মুসলমান স্বতন্ত্রভাবে সমুন্নত হইতে পারিবে। সেদিন চলিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালীকে উন্নতি-লাভ করিতে হইলে হিন্দু মুসলমানে গলাগলি ধরিয়া উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক কার্য্যে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সহায়তার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রতি দিবসের জীবনযাত্রা এই সহায়তা ভিন্ন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। আত্মোন্নতিসাধনের উপায়-উদ্ভাবনের জন্য ধীরভাবে চিন্তা করিলে এই সরল সত্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

বাঙ্গালী মুসলমানগণের অধিকাংশই নিরক্ষর। তাহারা কৃষি বা শিল্প-কার্য্যে যৎসামান্য জীবিকার্জ্জন করিয়া কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহাদের দারিদ্র্যই তাহাদের উন্নতিলাভের প্রবল অন্তরায়। তাহাদের শিক্ষার উন্নতিসাধন করিতে হইলে অবস্থার উন্নতিসাধনের উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। সভাসমিতি চাঁদা তুলিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে পারে, বৃত্তি ও পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহদান করিতে পারে, অল্পসংখ্যক দরিদ্র ছাত্রের পাঠের ব্যয়নির্ব্বাহেরও যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা সাধন করিতে পারে। কিন্তু পিতামাতা অসমর্থ হইলে সভাসমিতি তাহাদের সন্তান-গণকে সুশিক্ষিত করিতে সমর্থ হয় না। দরিদ্র মুসলমান বালক শৈশবেই শ্রম-বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পিতামাতার সহায়তা করিতে বাধ্য হয়। তাহার পক্ষে বিদ্যালয়ে গমন করিবার সময় কোথায়? এই শ্রেণীর মুসলমান বালকের সংখ্যাই অধিক। অধিক বলিয়াই বহুসংখ্যক পাঠশালা থাকিতেও পল্লীবাসী মুসলমান বালক তাহার ফলভোগ করিতে পারিতেছে না। পাঠশালার পাঠের ব্যয় যৎসামান্য। সে ব্যয় না লাগিলেও, দরিদ্র মুসলমান বালক পাঠশালায় গমন করিতে পারিবে না। কারণ, তাহাকে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার চালা-ইতে হইবে;—অগ্রে অন্নচিন্তা, পরে পাঠশালার শিক্ষা। এই শ্রেণীর বালক-দিগের জন্য শিল্পশিক্ষা প্রচলিত করিয়া, শিক্ষাকালে কিছু কিছু উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, ইহারা ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া ক্রমে

উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে এরূপ শিল্পবিদ্যালয় কোথায়? মুসলমান-শিক্ষাসমিতি শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে পরিমাণ অর্থসংগ্রহের আশা করিতে পারেন, তাহা সমুদ্রের তুলনায় বিন্দুমাত্র জল। তাহাতে প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা না করিলে, দুই একটি মুসলমানের উপকার হইতে পারে, জনসাধারণের কিছুমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

মুসলমানসমাজ দীন দরিদ্র হইলেও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী অর্থব্যয় করিয়া সন্তানগণকে শিক্ষাদান করিতে পারেন। এবং নানা রূপে শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। আর এক শ্রেণী একেবারেই অসমর্থ। শিক্ষাসমিতির চেষ্টায় যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তদ্দ্বারা কোন্ শ্রেণীর বালকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করাই যেন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। এ বিষয়ে মুসলমানসমাজের পরিচালকগণ অবশ্যই ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। পল্লীবাসী দীনহীন অশিক্ষিত মুসলমানের মুখের দিকে না চাহিয়া, নগরবাসী সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উন্নতিসাধনের চেষ্টায় অগ্রসর হইলে, অল্প দিনের মধ্যেই জনসাধারণ শিক্ষাসমিতির সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িবে। এবারকার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া তাহারা বুঝিয়া গিয়াছে, এত দিন পরে তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রধান পুরুষগণ তাহাদের দুর্দ্দশামোচনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাই তাহারা আশায় উৎফুল্ল হইয়া যথাসাধ্য চাঁদা দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহারা যদি দেখিতে পায়,—মুসলমান শিক্ষাসমিতির সকল চেষ্টা সকল উদ্যম কেবল উচ্চশ্রেণীর উন্নতিসাধনের দিকেই ধাবিত হইতেছে, তাহা হইলে তাহারা শীঘ্রই এই শ্রেণীর সভা সমিতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। মুসলমান-শিক্ষাসমিতি কোন্ পথের পথিক হইবেন, তাহার উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

মুসলমানের মধ্যে প্রতিভাশালী বালকের অভাব নাই। তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া তাহাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের জন্য শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গভাষার উপর নির্ভর না করিলে মুসলমানের শিক্ষার উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। অল্পসংখ্যক মুসলমানই ইংরাজী শিক্ষার ফল লাভ করিতে সমর্থ; আরও অল্পসংখ্যক লোকে পারসীক ও আরবীক ভাষা অধ্যয়ন করিতে লালায়িত। অধিকাংশের জন্য বাঙ্গালা ভাষাই প্রধান অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই ভাষার ভিতর দিয়া

সকল তত্ত্বই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যে সকল মুসলমান লেখক বঙ্গসাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের বিচারবুদ্ধির উপর ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা কেবল উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়া সময়ক্ষয় করিলে মুসলমান বালকগণ অন্তঃসারশূন্য ও স্বজাতিগৌরবান্ধ হইয়াই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইবে। তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে যাহাতে সদ্ভাবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞানপিপাসু করে, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে। পুরাকালের মুসলমান যেমন তরবারিহস্তে দেশ বিদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেইরূপ লেখনীহস্তে দেশ বিদেশের জ্ঞান-সঞ্চয়ে যত্নশীল হইয়া অল্পকালের মধ্যে জ্ঞানগৌরবেও সমুন্নত হইয়াছিলেন। সে জ্ঞানপিপাসা এখন শান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে নব্য বঙ্গের মুসলমানের বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ভিতর দিয়া আস্ফালনের আড়ম্বর ফুটিয়া উঠিতেছে।

পুরাকালের মুসলমানগণ কোন্ দেশ হইতে কোন্ জ্ঞানের সঞ্চয় করিয়া তাহার কত দূর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তাহার একখানি সুলিখিত ইতিহাস-সঙ্কলনের জন্য অগ্রসর হইলে, মুসলমান লেখকগণ স্বজাতির অশেষ কল্যাণ-সাধন করিতে পারেন। যে পথে পুরাকালের মুসলমানশিক্ষা সমুন্নত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগেও সেই পথেই মুসলমানের শিক্ষা সমুন্নত হইতে পারে। যে ব্যক্তি শিক্ষার জন্য ব্যাকুল, তাহাকে বিনয়ী হইতে হইবে। যেখানে বিদ্যা, সেইখানেই বিনীত ছাত্রের ন্যায় তাহাকে অধিগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মুসলমানধর্ম্মের আবির্ভাবের সমসময়ে মুসলমানের সাহিত্যে অল্প পুস্তকই দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তখন তাহাদের জ্ঞান অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্পদিনেই মুসলমান সুশিক্ষিত হইয়া পৃথিবীতে জ্ঞানসাম্রাজ্যবিস্তারের সহায়তা করিয়াছিল। তাহাদের তুলনায় বাঙ্গালার মুসলমানসমাজ অনেক বিষয়ে সুশিক্ষিত। যাহা আছে, তাহাকে ভিত্তি করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে, আবার অল্পকালেই শিক্ষার উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

কোনও জাতি বা সমাজকে শিক্ষায় সমুন্নত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষারই আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হইলে মুসলমানসমাজের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার আশা নাই। তজ্জন্য শিক্ষাসমিতি স্ত্রীশিক্ষাপ্রচলনের সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানসমাজে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের পক্ষে নানা বাধা

উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে। তাহা কালে ধীরে ধীরে তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও আপাততঃ স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের চেষ্টা সহজে সফল হইবার আশা নাই। তথাপি বালিকাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষিত করিবার সম্ভাবনা আছে। অন্তঃপুরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার উদ্যোগ করিবেন, শিক্ষাসমিতি এইরূপ সংকল্প করিয়াছেন। কি ভাবে তাহা সাধিত হইবে, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

চরিত্রবলে বলীয়ান না হইলে কোনও জাতি বা সমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। মুসলমান-শিক্ষাসমিতি তজ্জন্য ধর্ম্মনীতি শিখাইবার ব্যবস্থা করিবেন, সংকল্প করিয়াছেন। এই শিক্ষা যেমন মানবসমাজের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, এই শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা সেইরূপ দুরূহ ব্যাপার। বক্তৃতা ও পাঠ্য পুস্তকের সহায়তায় বালকগণের মধ্যে সচ্চরিত্রতার বীজবপন করা একেবারে অসম্ভব নহে। পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালক অনেক সাধু সংকল্প গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা অল্পদিনের মধ্যেই বিস্মৃত হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত দ্বারা চরিত্রগঠনের চেষ্টা এখনও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুচিত সমাদর লাভ করে নাই। মুখে নীতিশিক্ষার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তজ্জন্য নানা উপায়-উদ্ভাবনে নিযুক্ত থাকিয়াও এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় নানা কারণে প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই। মুসলমান-শিক্ষাসমিতি কি ভাবে সেই উপায়ের উদ্ভাবন করিবেন, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মুসলমান বালকগণের নীতিশিক্ষার জন্য অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল নির্দ্দিষ্ট হউক, এবং উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক লিখিত হউক,—এইরূপ সাধারণ ভাবের একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই মুসলমান-শিক্ষাসমিতি আপাততঃ নীরব হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হইবার আশা নাই। তদ্দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মের বহিরঙ্গের অনুষ্ঠানগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবার সুবিধা ঘটিলেও ঘটিতে পারে। কিন্তু বহিরঙ্গের অনুষ্ঠানে কোনও জাতি বা সমাজ চরিত্রবল উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় না। ভোগলিপ্সা মানুষকে নিয়ত আত্মম্ভরী করিয়া চরিত্রস্খলনে উৎসাহদান করে। তাহার প্রতিকূলে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া মানবসমাজকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্যই শিক্ষার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য চিরসংযুক্ত রাখিয়া ত্যাগের অভ্যাসে ভোগের উদ্দীপনাকে নিরস্ত করিতে হয়। মুসলমানসমাজে ভোগলিপ্সা প্রবল বলিয়া কেহ কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া আপন আপন স্বার্থরক্ষার্থ অন্ধ হইয়া ঈর্ষা

হ্রাসে চরিত্রহীনতার নানা উদাহরণ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে মুসলমানের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। স্বার্থের প্রবল উত্তেজনায় সংসারের সকল সম্বন্ধের পবিত্রভাব বিস্মৃত হইয়া স্বগণ, স্বজাতি ও স্বদেশকে বহুবার পদবিদলিত করিয়া মুসলমান আপনার অধঃপতন টানিয়া আনিয়াছে। এই স্বার্থময় মূলপ্রকৃতির গতি পরিবর্ত্তন করা অনায়াসসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য শিক্ষাসমিতির অধিবেশনে অনেকে আক্ষেপোক্তির সহিত বলিয়া গিয়াছেন,—যাঁহারা সম্পন্ন মুসলমান, তাঁহারা ভোগসুখে নিমগ্ন হইয়া স্বজাতির উন্নতিকামনায় পরাঙ্মুখ। ইহাকে তর্ক করিয়া উড়াইয়া দিয়া, মুসলমানসমাজে কোন দোষ বা ত্রুটি নাই বলিয়া অলীক আন্দোলন করিলে, সকল সাধু চেষ্টাই বিফল হইয়া পড়িবে। মুসলমানসমাজের অধঃপতনের মূল কারণ কি কি, মুসলমানসমাজের উন্নতি-লাভের অন্তরায় কোন্ দিকে,—সে সকল কথা সর্ব্বদা বিচার করিয়া শিক্ষা-সমিতিকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। মুসলমানসমাজে দোষ ত্রুটি না থাকিলে তাহার অধঃপতন হইবে কেন? মুসলমানসমাজ যে অধঃপতিত হইয়াছে, সে কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? এই অধঃপতিত সমাজের প্রকৃত মঙ্গলকামনায় যাঁহারা সংস্কারসাধনের চেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা সুচিকিৎসকের ন্যায় রোগের মূল নির্ণয় করিয়া ঔষধপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। সভাপতি মহাশয় স্বয়ং তাহার পথপ্রদর্শন করিবার জন্য মুক্তকণ্ঠে অনেক দোষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

যে জাতির অতীত ইতিহাস নাই, তাহার পক্ষে উন্নতিলাভ করিবার সময়ে অতীতগৌরবস্মৃতি কাহাকেও গর্ব্বান্ধ করিতে পারে না। যাহা ভাল, তাহাই আগ্রহে গ্রহণ করিবার জন্য, যাহা মন্দ, তাহা যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিবার জন্য, সকলেই নিরুদ্বেগে যত্ন করিতে পারে। যে জাতির অতীতগৌরবের ইতিহাস আছে, তাহারা সেকালের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া স্বজাতির বর্ত্তমান দোষ ত্রুটি দেখিয়াও দেখিতে চেষ্টা করে না; বরং অনেক সময়ে বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া দোষকে গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যাহারা উন্নতিসাধন-কামনায় অগ্রসর, তাহাদিগকে এই প্রবল বাধা অতিক্রম করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্কভাবে পদক্ষেপ করিতে হইবে। কোন্ পথ প্রকৃত পথ—তাহার আবিষ্কার করা কঠিন নহে। সেই পথে অগ্রসর হওয়াই কঠিন। তাহা সাধনা ও অধ্য-বসায়ে সিদ্ধ হয়। আত্মোন্নতির পথ নিরতিশয় সরল পথ, তাহা প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সমাজের সম্মুখে নিয়ত উন্মুক্ত সে পথে অগ্রসর হইবার জন্য দৃঢ়নিষ্ঠা

থাকিলে, সকলেই আত্মোন্নতিসাধন করিতে পারে। আন্তরিক দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিলে, তাহার সম্মুখ হইতে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাও ধূলার ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। আন্তরিক দৃঢ় সংকল্প মুসলমান-শিক্ষাসমিতিকে কর্ত্তব্যপালনে যত্নশীল না করিলে, সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইবে। যাঁহারা মুসলমান-শিক্ষাবিস্তারের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন, তাঁহাদের স্কন্ধে বড় গুরুভার নিপতিত হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহাদিগকে অকুতোভয়ে সেই গুরুভারবহনের শক্তি দান করুন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।

রমণী।

১

হিমালয়বক্ষে বিরাজিত একটি উপত্যকায় একটি সুন্দর সহর কিরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু সে সহরে যে আসে, সেই প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। কয়েক জন পেন্সনপ্রাপ্ত সাহেব এই স্থানটিতে বাস্তভিটা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই কারণে সহরটিতে বিস্তর শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও মহিলার সমাগম হইত। সিমলায় যখন মরসুম পড়ে, এখানকার জনকোলাহল তখনই বাড়িয়া উঠে। বিশেষতঃ, যে বৎসর বায়ুসেবনের হুজুক বৃদ্ধি হইত, সে বৎসর বাঙ্গালীটোলাটি একেবারে গুলজার হইত। বাঙ্গলা দেশের অনেক বড়লোকই সেই উপলক্ষে সেখানে পদার্পণ করিতেন। আমি বড়লোক নহি, এবং বায়ুভক্ষণেরও আমার কোন আবশ্যক ছিল না, তবু আমি এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি। সখ করিয়া নহে; প্রায় কোন স্থানেই দুই মাসের বেশী থাকিতে প্রবৃত্তি হয় না, এখানে আমি ছয় মাস আছি।—মন টিকিয়াছে কি না সে কথা কোন দিনও চিন্তা করি নাই।

একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গলো আমার বাসগৃহ। দূর অরণ্য হইতে বায়ুর হিল্লোল আসিয়া পুরাতন সুখের স্মৃতি মনের মধ্যে জাগাইয়া যায়; মধ্যে মধ্যে আরণ্য কুসুমের সৌরভে আমার বাঙ্গলোখানি আচ্ছন্ন হয়, এবং বাতায়নপথে গিরিশৃঙ্গের সহিত ধূমকান্তি মেঘের আলিঙ্গন দেখিতে দেখিতে যেন কোনও দূর স্বপ্নরাজ্যে ভাসিয়া যাই। আমার অতৃপ্ত কামনা পাহাড়ের বাহিরে বহিঃপৃথিবীর মধ্যে ব্যাপ্ত হইবার সুবিধা না পাইয়া যেন সেই সংকীর্ণ স্থানটিতে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু আমার কি হইয়াছে, আমি ঠিক বুঝিতে পারি না।

আমি বাঙ্গলোয় আরও দুইটি প্রাণীর সহিত একত্র বাস করি; এক জন সেই দেশীয় একটি ভৃত্য, নাম লখিয়া; সে বহুরূপী। কখন ভৃত্য, কখন পাচক, কখন দরোয়ান, আরদালীগিরিও যে তাহাকে দুই এক বার করিতে হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না; লুচি ভাজিতে ও জুতা ব্রস করিতে সে সমান তৎপর। আমার অন্য সহচরটির নাম রামচরণ, সে আমার পিতামহের আমলের ভৃত্য।

রামচরণের বাল্য জীবনের ইতিহাসটি করুণরসসিক্ত। সে আমার পিতার বয়সী। সে যখন আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল, শুনিয়াছি, তখন তাহার বয়স তের বৎসর। এখন তাহার পেন্সন লইবার বয়স হইয়াছে, পঞ্চান্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সে শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাদের পরিচর্য্যা করিবে, এইরূপ সংকল্পই স্থির করিয়াছে। পিতামহ আশ্রিতবৎসল ছিলেন, তিনি রামচরণকে একটি বাড়ী দিয়াছিলেন, রামচরণের বিবাহও তিনি দিয়া যান। কিন্তু হতভাগ্যের গার্হস্থ্য সুখ স্থায়ী হইল না। রামচরণের হস্তে তাহার পত্নী মুক্তকেশী একটি পুত্রসন্তান উপহার দিয়া বিধাতার আহ্বানে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মাতৃহীন শিশুকেও বাঁচাইতে পারা গেল না। রামচরণ অশ্রু মুছিয়া আমার পিতামহের কাছে আসিয়া বলিল, "জেঠামশায়! সংসারধর্ম্ম সব শেষ করে এসেছি; এই ঘরের চাবি নেন, আমার আর বাড়ী ঘরে দরকার নেই, বৈঠকখানার এক কোণেই পড়ে থাক্‌বো।" পিতামহ কথাটা বুঝিলেন, দাস দাসীর বেদনাবোধের শক্তি নষ্ট করিবার মত বিদ্যা বুদ্ধি তাঁহার ছিল না, তিনি বলিলেন, "কি বলবো বাবা! তোকে সংসারী করবার জন্যে আমরা যথা-সাধ্য করেছি।" শোক কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে তাহার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দিয়াছিল, আর একটি দারপরিগ্রহ করিলে তাহার সংসারধর্ম্ম পুনর্ব্বার বজায় হইতে পারে। রামচরণ সে কথার কোনও উত্তর দিত না, সে আমার ভগিনী সুরবালাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিত, "এদের নিয়েই আমার সংসার!"

আমি সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইলে রামচরণই আমাকে কোলে তুলিয়া লয়; সংসারে আসিয়া মাতৃক্রোড় হইতে সর্ব্বপ্রথম তাহার ক্রোড়েই আশ্রয় লাভ করি। মা আমার স্বর্গে গিয়াছেন। এখনও কত সময় রামচরণের স্নেহের কোলে মাথা রাখিয়া দগ্ধ জীবন শান্ত করি। রামচরণের নিকট আমি এখনও খোকা বাবু!

আমার স্নেহময়ী ভগিনী সুরবালাকেও রামচরণ কম ভালবাসিত না,

কিন্তু সুরবালার জন্য রামচরণের কোন আক্ষেপ নাই। সুরবালাকে রামচরণ ননি বলিয়া ডাকিত। ননির জন্য সময়ে সময়ে তাহার মন কেমন করিত। কিন্তু ননি সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত; আমার ভগিনীপতি ভবেশ বাবু এক জন বড় ডেপুটী; দুই হস্তে উড়াইবার মত পৈত্রিক সম্পত্তি থাকা সত্বেও তিনি কেন চাকরী করেন, সে রহস্য আমি কখনও ভেদ করিবার চেষ্টা করি নাই। বোধ করি, রায় বাহাদুর খেতাবই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য নহে। যাহা হউক, সুরবালা যোগ্য পাত্রেই পড়িয়াছে। সুরবালা সংসারের কর্ত্রী, আমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভগিনীপতি তাহাকে তাঁহার উপরওয়ালা ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা অধিক ভয় করিতেন।

আমি যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন বৈশাখ মাস। অপরাহ্ণে হঠাৎ মেঘ করিয়া বৃষ্টি আসিল; বাঙ্গলোর সাসীগুলা বন্ধ করিয়া আমি একখান নেয়ারের খাটে শুইয়া শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলাম, তাহা তখন কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও বলিতে পারিতাম না।

রামচরণ আমার মাথার কাছে বসিয়া দেশে আমাদের বাগানে এবার কি পরিমাণে আম ফলিয়াছে, তাহারই আলোচনা লইয়া ব্যস্ত ছিল। সে কথা দুই একবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল,—শেষে রামচরণ উঠিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিল, একটা জলের ঝাপ্‌টা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রামচরণ জানালা বন্ধ করিয়া আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল, বলিল, "খোকাবাবু! তোমার পায়ে একটু হাত বুলোই?" আমার চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বোধ করি পূর্ব্বকথা রামচরণের মনে পড়িয়া গেল; সে বলিল, "খোকাবাবু! অন্নের জন্যে এমন সাজান সংসারটা নষ্ট কল্লে! এ আপশোষ মলেও ত আমার যাবে না!"

রামচরণ আমার সংসারত্যাগের কারণ জানিত। পৃথিবীতে আমরা তিন জন মাত্র লোক ইহা জানিতাম, রামচরণ, আমি, আর—আর এক জন। সে কে, তাহা একটু ভাঙ্গিয়া বলিলে কথাটা বুঝিতে পারা যাইবে।

২

সে অনেক পূর্ব্বকার কথা—প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বের। আমার বয়স এখন সাতাশ বৎসর; এখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. নামক চক্রচিহ্নিত শিক্ষিত যুবক। কিন্তু যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি এই তুচ্ছ জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত

করিয়াছিল, তাহা ঠিক দশ বৎসর পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বের সহিত আজিকার দিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

সতের বৎসর বয়সের যে উৎসাহ, উদ্যম, যে প্রফুল্লতা, যে হৃদয়ভরা স্ফূর্ত্তি,—তাহার তুলনা দুর্লভ। বর্ষাজলপুষ্ট লতার শ্যামলতা, প্রভাতপদ্মের বর্ণের অরুণিমা, শরতের পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র কিরণে যূথিকার হাসি, এ সকল অনেকবার দেখিয়াছি, কখন কখন মুগ্ধও হইয়াছি। কিন্তু নারীমুখের সৌন্দর্য্য কি, তাহা তখন ঠিক বুঝিতে পারিতাম না; যে সৌন্দর্য্য চিত্তকে চিরদিন মরীচিকার মত উৎক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যে মিশাইয়া যায়, তাহার মহিমা তখনও আমি অনুভব করিতে পারি নাই।

সতের বৎসর বয়সে এল্‌. এ. পাশ করিয়া আমি সুরবালার শ্বশুরবাড়ী যাই সুরবালার বয়স তখন পনের বৎসর। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে সুরবালার বিবাহ হইয়াছিল। আমার ভগিনীপতি ভবেশ বাবু তখন বি.এ. পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সিতে এম্‌. এ. পড়িতেন। পূজার ছুটিতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন, আমি পূজার অবকাশে সুরবালাকে দেখিতে তাঁহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম।

আমি ভবেশ বাবুদের বাড়ী উপস্থিত হইলে, ভবেশ বাবু আমাকে আদর করিয়া একেবারে অন্দরমহলে লইয়া চলিলেন। তাঁহার শয়নকক্ষে দুখানি চেয়ারে আমরা মুখোমুখী হইয়া গল্প করিতেছি, এমন সময়ে একটি যুবতী—যুবতী কি কিশোরী ঠিক বলিতে পারি না—সুরবালার প্রায় সমবয়স্কা একটি সুন্দরী "দাদা বড় মজা হয়েছে!" বলিয়া উন্মুক্তহাস্যে যেন হঠাৎ কঙ্কটি ঝঙ্কারিত করিয়া বিদ্যুতের মত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং হঠাৎ আমাকে দেখিয়া মুখখানি লাল করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাসি ও ব্যস্ততা মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইল। এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইয়া মুখখানি নত করিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। তাহার দাদা তাহাকে ফিরাইবার জন্য কতবার ডাকিলেন, দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহাকে ডাকিলেন, সুন্দরী ফিরিল না। ভবেশ বাবু বলিলেন, "রমণীর বড় লজ্জা, তোমাকে দেখেও লজ্জা!" তাঁহার হাস্যময় মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

আমি জানিতাম, রমণী কে। রমণী ভবেশ বাবুর কনিষ্ঠা সহোদরা, রমণী বিধবা, সে সংবাদও রাখিতাম। পূর্ব্বে আর কখনও ভবেশ বাবুদের বাড়ী যাই নাই। রমণীকে এই সর্ব্বপ্রথম দেখিলাম।

কিন্তু কি দেখিলাম! এমন আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

দেখিয়া বোধ হইল, ঘনকৃষ্ণ মেঘের ভিতর বিজলী খেলিয়া গেল; সেই চকিত বিদ্যুতের আলোকে আমার বোধ হইল, আমার সতের বৎসরের আলোকহীন উজ্জ্বলতাহীন যৌবনের রুদ্ধ কক্ষে কে যেন বাতি জ্বালিয়া আলোকিত করিয়া গেল।

তিন দিন পরে ভবেশ বাবুর বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। কিন্তু দেখিলাম, তিন দিনের মধ্যেই আমার মনের মধ্যে একটা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বিপ্লবের কারণও বুঝিলাম, ফলও ভোগ করিতে লাগিলাম, কিন্তু মন সংযত করিবার পক্ষে কোন যুক্তিই কাজে লাগাইতে পারিলাম না। রক্তমাংসের শরীর ভেদ করিয়া যে ছুরিকা মনের উপর দাগ বসাইয়া যায়— তাহার তীক্ষ্ণতা একটি মুহূর্ত্তেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।—রমণীকে ভুলিতে পারিলাম না!

বাড়ী ফিরিয়াও রমণীর কথাই মনে জাগিতে লাগিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল, মনকে নানা কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম— কোনও ফল হইল না। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও অবসন্ন হইলাম। এক মাসও উত্তীর্ণ হইল না, আমি সুরবালাকে দেখিতে আবার ভবেশ বাবুর বাড়ী চলিলাম। সত্যই কি সুরবালাকে দেখিতে?—সুরবালার বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে দেখিতে যাই নাই; সে কথাও মনে পড়িল। আত্মসুখের জন্য আমাকেও আত্মপ্রবঞ্চনার দাসত্ব করিতে হইল।

সে দিন প্রথমেই বাহিরের ঘরেই ভবেশ বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তাহার পর ভবেশ বাবু অন্দরে যাইবার জন্য উঠিলেন, গল্প করিতে করিতে চলিলেন, আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। লজ্জা আসিয়া প্রতিপদে বাধা দিতে লাগিল। ভবেশ বাবু আমাকে লইয়া একেবারে তাঁহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। রমণী তখন টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একখানি বহি পড়িতেছিল। দরজার সম্মুখে আমি, ভবেশ বাবু ভিতরে—রমণী পলাইতে না পারিয়া হাঁফাইয়া উঠিল। মুখখানি অবনত করিল। আমি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। তাহাতে এমন একটা সলজ্জ কোমলতা মাখান ছিল যে,— আমার নূতন করিয়া মনে হইল, এ অপরূপ সুন্দরী, রমণী বিধবা? বিধাতার এ কি বিচার!

সে দিন আমাদের পরিচয়মাত্র। ক্রমে অধিক আলাপে রমণীর সঙ্কোচ দূর হইল। আমার নিকট তাহার কুণ্ঠিতভাব রহিল না; আমি মধ্যে

মধ্যে সুরবালাকে দেখিতে যাইতাম। আমাকে দেখিয়া রমণী কোন প্রকার হর্ষপ্রকাশ করিত না, নিজের গাম্ভীর্য্য দ্বারা আপনাকে অবগুণ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহার নয়নের ব্যাকুলতা সে লুকাইতে পারিত না; অন্যমনস্কতা ঢাকিবার জন্য তাহাকে জোর করিয়া সকল কাজে মন দিতে হইত।

পাঁচ ছয় মাস পরে কথায় কথায় রমণীর কাছে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিলাম। রমণী ধীরভাবে সকল কথা শুনিল, কোনও উত্তর না করিয়া মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কেবল সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

শরীর অবসন্ন, মন ভারাক্রান্ত, কোনও কর্ম্মে উৎসাহ নাই। বাবা আমাকে দারজিলিং পাঠাইলেন; রামচরণ আমার শুশ্রূষার জন্য সঙ্গে চলিল। দিনকতক বাড়ীর কোনও খবর পাই নাই। শেষে এক প্রিয় বন্ধুর পত্রে অবগত হইলাম, বাবার হাতের কাজকর্ম্ম বড় মন্দা, তিনি আমার বিবাহের জন্য একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজিতেছেন। বন্ধুর পত্র পাঠ করিয়া একটু হাসিলাম।—রামচরণ আমার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, সে আমার হাসি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"পত্রে কোন সুখবর আছে নাকি খোকা বাবু?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বাবা যে আমার বিয়ের যোগাড় কচ্ছেন, রামচরণ! ফলারটা বুঝি এবার খেলি!"

রামচরণ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আর ফলার! তোমার যে গতিক,—দেখিযা আমার বড়ই ভাবনা হইয়াছে।"

৩

দিন কত পরে দারজিলিংএ একখানি পত্র পাইলাম। অপরিচিত অক্ষর, দেখিয়াই স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর চিনিতে পারিলাম। আমাকে কে পত্র লিখিল? কতক কৌতুকে কতক আগ্রহে পত্রখানি খুলিলাম; দেখিলাম, পত্রশেষে রমণীর স্বাক্ষর! রমণী আমাকে পত্র লিখিয়াছে। কখনও মনে করি নাই, রমণীর নিকট হইতে পত্র পাইব।

পত্রখানি এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম।

"অনাথ বাবু,

"দাদাকে পত্র লিখিয়াছ, তাহা পড়িয়াছি। তোমার শরীরের এখন যে রকম অবস্থা, তাহাতে তোমার কিছুদিন দারজিলিংএ থাকা উচিত। পড়িয়া পড়িয়াই

শরীরটি নষ্ট করিয়াছ। বৌদিদি তোমার জন্য বড় ভাবিতেছেন। তুমি ভাল আছ শুনিতে পাইলেই সুখী হইব। দারজিলিংএ কত দিন থাকিবে?

"তোমার মনের অবস্থা শোচনীয়, তাহা বুঝিয়াছি। দারজিলিং যাইবার পূর্ব্বে আমাকে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহার কোনও উত্তর পাও নাই। অভাগিনী আমি কি উত্তর দিব? আমি বালবিধবা, বিবাহের কথা মনে নাই, স্বামীর মুখও মনে পড়ে না। সে কথা মনে না পড়াতে কোন দুঃখও ছিল না, পিতৃগৃহে আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটাইতেছিলাম, সেই ভাবে জীবন কাটাইলেই কি ভাল ছিল না?

"কিন্তু তাহা কাটিল না। আমি তোমাকে দেখিলাম। না দেখিলেই বোধ হয় ভাল ছিল। কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। তুমি আমাকে ভালবাস, তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে, হিন্দুবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, তাহা আমি অনেকবার শুনিয়াছি। কিন্তু ইহজীবনে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। পৃথিবীতে আমার আর সংসারী হওয়া হইবে না। সমাজের ভয়ে এ কথা লিখিতেছি না। কলঙ্কের ভয়ে মানুষ জীবনের সকল কামনা পরিত্যাগ করে না। তথাপি বলিতেছি, সংসারের এ ব্যাপারে আর তোমার সহিত দেখা হইবে না। পর পারের জন্য অপেক্ষা করিতে পার? যদি পার, তবে আবার দেখা দিও। তাহা কি এতই কঠিন? আমি ত তাহা মনে করি না।

রমণী।"

দুইবার তিনবার পত্রখানি পাঠ করিলাম। রমণী-হৃদয়ের রহস্য কিছু বুঝিতাম না। পরাজিত হইয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলাম। বিপুল চেষ্টায় মন সংযত করিয়া বলিলাম, তাহাই হউক, তাহাই হউক, ইহলোকে এই পর্য্যন্ত; পরলোকে আমার শান্তি। ইহলোকের এ গণ্ডীটুকুই অতিক্রম করিতে আর কত দিনই বা অপেক্ষা করিতে হইবে?

যথাসময়ে রমণীকে সে কথা জানাইলাম।

৪

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক উমেদার আমাকে তাঁহাদের কন্যারত্ন-সম্প্রদানের প্রস্তাব করিয়া বাবাকে ধরিয়াছিলেন। কেন বিবাহ করিব না, সে কৈফিয়ৎ পিতার কাছে দিলাম না। জলের মত দিন কাটিতে লাগিল — সব কয়টা দিন এক সঙ্গে কাটিলেই বাঁচিতাম।

পূর্ব্বের মত মধ্যে মধ্যে ভবেশ বাবুর বাড়ী যাই, রমণী পূর্ব্বের ন্যায় হাসিয়া কথা কয়, গল্প করে, কিন্তু কখনও ভাবান্তর দেখি নাই। আমারও শিক্ষা হইয়াছিল—আমিও কোন দিন অন্য চিন্তা করি নাই। প্রেমের আকর্ষণ আমাকে রমণীর নিকট টানিয়া আনিত, কিন্তু মোহ সেই দেবীর সম্মুখে আমাকে বিহ্বল করিতে পারিত না। রমণী যখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন তাহাকে আমার ছায়া বলিয়া অনুভব করিতাম, কিন্তু মনের কোণেও বিন্দুমাত্র পার্থিব কামনার উদয় হইত না। রমণীর দৃষ্টান্তে আমি মন সংযত করিয়াছিলাম।

মাস ছয়েক পরে বাবা সংসারের কাজ শেষ করিয়া স্বর্গে গেলেন; মা ত অনেক পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন। বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে আমি, আর রামচরণ।

বাবার মৃত্যুর পর রামচরণ আমাকে বিবাহ করিবার জন্য আর একবার ভাল করিয়া ধরিল। আমার সেই এক উত্তর,—একটু নীরব হাসি। বেচারা বৃদ্ধ আমার কথা কি বুঝিবে?

ভবেশ বাবুই এখন আমার একরকম অভিভাবক হইয়া উঠিলেন; পূর্ব্বেই এম্. এ. পাশ করিয়াছিলাম। তাঁহার ইচ্ছা, আমি উকীল হই, না হয় ডেপুটী-গিরি পরীক্ষা দিই। সংসারী হইবার জন্য ভবেশ বাবু পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; আমার প্রিয়তমা ভগিনী সুরবালা আমাকে সংসারে উদাসীন দেখিয়া একটু চোখের জলও ফেলিল। আমি কখনও দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াই, কখনও বা কয়েক মাস নির্জ্জনে পড়াশুনা করি। জীবন যখন বড় বৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হয়, তখন ভবেশ বাবুর বাড়ীতে গিয়া সুরবালার দুই বৎসরের ছেলে 'বুড়ো'কে কোলে পিঠে লইয়া আমোদ করি।

একদিন অপরাহ্নে বাড়ীতে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছি, এমন সময় ভবেশ বাবুর এক পত্র পাইলাম, তিন দিন হইতে রমণীর জ্বর, বিকারের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। সেই দিনই আমি রমণীকে দেখিতে ভবেশ বাবুর বাড়ী যাত্রা করিলাম।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ভবেশ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। রমণীর শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ভবেশ বাবু ও সুরবালা রমণীর শয্যাপ্রান্তে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। ডাক্তার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে রমণীকে দেখিয়া গিয়া-

ছেন, জীবনের আশা অতি অল্প, রাত্রি কাটে কি না, সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সব কথা শুনিলাম। রমণীর শয্যাপ্রান্তে বিহ্বলভাবে বসিয়া ধীরে ধীরে সকল কথা শুনিতে পাইলাম। আমার বক্ষে রক্তস্রোত স্তম্ভিত হইয়া গেল, ব্যাকুলদৃষ্টিতে আমি একবার ইহলোকের পর পারের সেই যাত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম। তখন রমণীর সংজ্ঞা বিলুপ্ত; সেই দিন অপরাহ্ণ হইতেই রমণী অজ্ঞান।—আমি মাথায় হাত দিয়া সেই একই স্থানে একই ভাবে বসিয়া রহিলাম। সমস্ত দিনের পথশ্রমে দেহ অবসন্ন হইয়াছিল, মানসিক দুশ্চিন্তা দেহের অবসাদকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

রাত্রি প্রায় একটার সময় একবার রমণীর জ্ঞানসঞ্চার হইল। মনে হইল, চারি দিকে চাহিয়া সে যেন কাহাকে খুঁজিতেছে।

পাশ ফিরাইয়া দিলে রমণী আমাকে দেখিতে পাইল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার চক্ষে একটি অলৌকিক তীব্রজ্যোতি দেখিতে পাইলাম। ইহলোকের প্রান্তসীমায় সমুপস্থিত মরণাহত কোনও নর বা নারীর চক্ষে তেমন জ্যোতি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। রমণী অতি ধীরে আমার হাতখানি তাহার উভয় হস্তের মধ্যে টানিয়া লইল। একবার তাহার ওষ্ঠ নড়িল, যেন কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কথা ওষ্ঠ অতিক্রম করিতে পারিল না, আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রমণী! কথা কহিতে কি বড় কষ্ট হইতেছে?" রমণী ক্ষীণস্বরে বলিল, "কষ্ট? না, কষ্ট কিছুই না। আমি চলিলাম। জানি, একদিন তুমিও আসিবে।"

রাত্রিশেষে সব শেষ হইয়া গেল। সুরবালা রমণীর বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। রমণীর মৃত্যুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন পাণ্ডুর মুখের দিকে আমি আর চাহিতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে রাজপথে আসিলাম। আকাশে চাঁদের আলো, বাতাসে ফুলের গন্ধ, বিজন রাজপথ, স্তব্ধ প্রকৃতি যেন নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন। আমি উন্মত্তের ন্যায় পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলাম। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিলাম। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ লোহিত হইয়া উঠিল; চন্দ্রকিরণ মলিন হইয়া গেল; বনান্তরালে বিহঙ্গের পক্ষোদ্দোলন কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল; মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া সুশীতল সমীরণপ্রবাহ নিদ্রাতুর বিশ্বের নিশ্বাসের মত বহিয়া গেল; চরাচর ধ্বনিত করিয়া আমার হৃদয় মথিত করিয়া কেবল একটা কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" যেন রাত্রি

ঊষার রক্তিম অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বলিতেছে, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" আকাশের চন্দ্র পশ্চিমগগনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ম্লানদৃষ্টিতে ধরণীর দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" নৈশ বায়ু বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া শুষ্কপত্র উড়াইয়া খোলা মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিতে চলিতে বলিতেছে, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" জীবজগতের সুপ্তি যেন পূর্ব্ব দিকে অঙ্গুলিপ্রসারণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" আমার জীবনের দিন কবে ফুরাইবে? কবে আমি এ কথা বলিতে পারিব?

৫

সমস্ত দিন পথে পথে কাটিয়া গেল। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, পথশ্রমে কষ্ট নাই। আমি রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিলাম। দ্বারে আঘাত করিতেই রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; আমাকে দেখিয়া সে স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিয়া উঠিল, "খোকাবাবু! এত রাত্রে তুমি কোথা হ'তে আস্‌চো—খবর সব ভাল ত?"—রামচরণ প্রদীপ জ্বালিল।

দীপালোকে রামচরণ আমার মুখ দেখিয়া দুই হাত সরিয়া গেল; স্তম্ভিতের মত ক্ষণকাল আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; শেষে ব্যাকুলভাবে বলিল, "খোকাবাবু! তোমার এ অবস্থা কেন? কি হ'য়েছে খোকাবাবু?"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, রামচরণকে সকল কথা—আমার জীবনের গুপ্ত ইতিহাস বলিয়া হৃদয়ভার লঘু করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া রামচরণ কাঁদিয়া ফেলিল; কথা কহিতে পারিল না। আমি হাত পা ধুইয়া শয্যায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলাম। প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম, রমণী আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—"আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, উন্মুক্ত গবাক্ষপথে অরুণের রক্তিমালোক আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, বৃদ্ধ রামচরণ আমার শিয়রে বসিয়া সস্নেহে আমার মস্তকে হাত বুলাইতেছে।—জীবনটাকেই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল।

বাড়ীতে আর মন টিকিল না। বাড়ীতে চাবি লাগাইয়া দাসদাসীদের বিদায় দিয়া আমি দেশভ্রমণের আয়োজন করিলাম। মূল্যবান্ জিনিসপত্র যাহা কিছু ছিল, সমস্ত সুরবালার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। কোম্পানীর কাগজ, অলঙ্কারপত্র, পৈত্রিক সম্পত্তির দলীলাদি সমস্ত সুরবালাকে দান করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জানাইলাম, সংসারের সহিত আমার আর কোনও

সম্বন্ধ নাই; যে কয়টি দিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে—দেশপর্য্যটন করিব। রামচরণ স্বয়ং সমস্ত জিনিস ও আমার পত্র সুরবালাকে দিয়া আসিল।

কিছু টাকাকড়ি লইয়া রামচরণকে সঙ্গে লইয়া আমি এক সপ্তাহমধ্যে দেশ-ত্যাগ করিলাম। রামচরণকে সুরবালার কাছে গিয়া থাকিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার হুকুম তামিল করে নাই, সজলচক্ষে বলিয়াছিল, "খোকাবাবু! আমিই তোমাকে কোলে পীঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি, এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, এত কঠিন দণ্ড দিতে চাও? বিদেশে তোমাকে দেখিবে শুনিবে কে?—এ বুড়োকে ছাড়িয়া যাইও না।"

তাই রামচরণ সেই দিন হইতে ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। আজ আমি স্বদেশ হইতে বহু দূরে পর্ব্বতের নিভৃত বক্ষের একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গলোয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার আর কত বিলম্ব, তাহা জানি না; কিন্তু আর কতকাল এমন লক্ষ্যহীনভাবে শ্রান্ত জীবন-ভার বহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইব?—রমণীর সেই অন্তিম কথা দিবানিশি আমার কানে আসিয়া বাজিতেছে। আজও এই দিবা-অবসানে দুর্গম গিরিপ্রান্তে আমার এই ক্ষুদ্র রুদ্ধদ্বার শয়নকক্ষে, জগতের পরপ্রান্তবাসিনী, আমার জীবন-মরণের সাধনার ধন, আমার ইহলোকের আলোক ও পরলোকের অবলম্বন, আমার উভয় লোকের সর্ব্বস্ব—প্রেমময়ী ধৈর্য্যময়ী মহিমময়ী রমণীর সেই আশ্বাসবাণী ঐ আর্দ্র বায়ুহিল্লোলে ও বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ শব্দে ভাসিয়া আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; আমার দেহ কণ্টকিত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আমার মনের ভাব মুখে প্রকাশিত না হউক, আমার অন্তরের ভাব অন্তরে অনুভব করিয়াই বৃদ্ধ রামচরণ আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "খোকাবাবু! এ পাহাড়ে মুলুক আর ত ভাল লাগে না; চল, দেশে যাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যেতে হবে রামচরণ, দেশেই যাব; বোধ করি, তার আর বেশী বিলম্ব নাই, কিন্তু এবার তোমাকে ফেলে একাই যাব।"

রামচরণ বোধ হয় কথাটা বুঝিল; হাসিয়া বলিল, "খোকাবাবু! আমিই আগে যাব। আমি আগে না গেলে তোমার জন্য সংসার সাজিয়ে রাখ্‌বে কে? এ বুড়োকে ছেড়ে তোমার এক দণ্ডও চল্‌বে না যে।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। ফাল্গুন। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু "কোলাপুর" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দাক্ষিণাত্যের অনেক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "মুক্তি" নামক গল্পটি কোনও ফরাসী রচনার ইংরাজী অনুবাদ হইতে বাঙ্গালা 'ছাঁচে' ঢালিয়াছেন। দেশী ছাঁচ, কিন্তু গড়ন বিলাতী। ত্রিংশদ্বর্ষীয়া বিড়ালাক্ষী কামুকীর কাহিনী। চারু বাবুর নির্ব্বাচনরুচির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ "প্রাণবাদের বিকাশ" প্রবন্ধে বিলাতী মতেরই অনুসরণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষের "আসামী সাহিত্যে বাঙ্গালা ভাষা" নামক নিবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত,—অনুশীলনযোগ্য। লেখক বলিতেছেন,—"যেমন বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি ভিন্নদেশীয় কথা প্রবেশ করিয়াছে, * * * তেমনই অনেকগুলি বিভিন্ন অনার্য্য ভাষার বাক্যাবলী অসমীয়া ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। যখন মুসলমানী ভাষা বাঙ্গালার রাজভাষা ছিল, তৎকালে আরবী ও পারস্য কথা, এবং বর্ত্তমানে ইংরাজী রাজভাষা বলিয়া অনেক ইংরাজী কথা বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং এ প্রকার পার্থক্য হেতু দুইটি ভাষার পার্থক্য অনুমিত হইতে পারে না। ব্রাউন সাহেবের মতে, আসামী ভাষায় শতকরা ৫টি মগ, ৭টি অকা, ১টি শামট, ১টি আরবী, ২৩ মিশমি এবং ৬৩টি সংস্কৃত শব্দ। অসমীয়া ভাষার সংস্কৃতমূলক শব্দগুলির আকার ও পরিচ্ছদ বাঙ্গালার ন্যায়। যদিও অকা, মগ, মিশমী প্রভৃতি জাতীয় শব্দ প্রবেশ করাতে লিঙ্গ, বচন, কারকাদিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি এক জন বাঙ্গালাভিজ্ঞ অসমীয়া লেখকের মতে,—'বাঙ্গালা এবং অসমীয়া দুইটি ভাষাই সংস্কৃতমূলক ভাষা, তজ্জন্য অসমীয়া ভাষার উন্নতি করিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার দিকেই পরিণতি দাঁড়াইবে; শেষে উভয় ভাষাই একীকৃত হইবে'।" বিচ্ছিন্ন পরাধীন দেশে ভাষার ভেদ অপেক্ষা সমতা ও একতাই একান্ত প্রার্থনীয়। প্রাদেশিক ভাষার ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ অন্তরায় যত শীঘ্র তিরোহিত হয়, সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গল তত সন্নিহিত হইবে, তাহা অসংকোচে নির্দ্দেশ করা যায়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "হোলী গীত" একটি ক্ষুদ্র রমণীয় রচনা। "পরিপূর্ণ বসন্তে নবকিশলয়শোভিত, নানাবর্ণ কুসুমে রঞ্জিত, নবমুঞ্জরামোদিত প্রকৃতির আনন্দতরঙ্গ নরনারীর হৃদয়ে হিল্লোলিত হইত; হোলী সেই আনন্দের উৎসব। * * * হোলীগীত যেমন শ্রুতিমধুর, সেইরূপ কবিত্বপূর্ণ।" লেখকের মতে,—

"রঙ্গে হো হো হোরী।
খেলত নওল কিশোরী॥
বাজত তাল, রবাব পাখোয়াজ
সখিগণ ঘন করতারি।
কুঙ্কুম চন্দন আবির উড়ত ঘন
বরিখত রঙ্গ পিচকারী॥

দুঁহু দুঁহু খেলন সমর প্রবন্ধহি
দুঁহু পর দুঁহু পর জোরি।
জিতকুঁ জিতলু মন দুঁহুঁ জন গণজন,
সখীগণ ভণ বব জোরি॥
ক্ষণে ক্ষণে স্থকিত বদন দুহু নিরখে
যৈছন চাঁদ চকোরী।
তঁহি শিবরাম দাস মন-আনন্দে
হেরি হাসে থোরি থোরি॥"

এই গানটিতে বিশেষত্ব আছে।—"হোলির এত গান শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই একটি চরণে—রঙ্গে হো হো হোরী—যেমন হোরীর সমুদয় আনন্দ, মুক্তকণ্ঠে আনন্দধ্বনি, রঙ্গের ছড়াছড়ি বর্ণিত হইয়াছে, একপ যে কোনও গানে হইয়াছে, তাহা ত স্মরণ হয় না।" হিমারণ্য-ভ্রমণকারী পরিব্রাজক "ধর্ম্মশালা শৈলের" বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র "ইসলামে মনুষ্যসৃষ্টি" নামক প্রবন্ধে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধ সচরাচর সুখপাঠ্য হয় না। কিন্তু লেখক সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মিত্র মহাশয় বলেন,—"ইস্‌লামের অনেক কথা বাইবেলের রূপান্তর-মাত্র। আখ্যানগুলি প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বোধ হয়। উভয়েই হয় ত ভিন্ন সাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল সামগ্রীগুলি নিজ নিজ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। পাছে পুনঃপুনঃ চর্ব্বিত হইয়া অস্থিসার হইয়া যায়, সেই জন্য বোধ হয় নিষিদ্ধ আপেল ফল ইসলামে নিষিদ্ধ গোধূম হইয়াছে।" তাহার পর,—"মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ে বাইবেল ও ইস্‌লামের অনেকটা এক মত। তবে হিন্দু শাস্ত্রে যেমন নানা মুনির নানা মত, মুসলমানের হদিসও সেই প্রকার। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এ সকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ অনেক গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া স্বনামখ্যাত মীর খুন্দ্‌ তাঁহার চিরস্মরণীয় রউজৎ-উস-সফা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" লেখক এই গ্রন্থ হইতে মানবসৃষ্টির মুসলমানী কাহিনীর সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক রচিত "আমাদের জ্যোতিষ" নামক গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। উপসংহারে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—"হিন্দুর জ্যোতিষ হিন্দু জাতির মৌলিক উদ্ভাবন, আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, আমাদেরই ভাবোন্মেষের ফল! আমাদের জ্যোতিষ কেবল জ্ঞান বিজ্ঞানের হিসাবে অধীত, অথবা ভিন্ন জাতি হইতে লব্ধ বলা যায় না। আমাদের জাতীয় চিত্তের বিকাশের সহিত ইহা আমাদের জীবনের প্রত্যেক গ্রন্থিতে গ্রথিত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে ভাব ধর্ম্মের সূত্রে গ্রথিত, তাহা পরকীয় লব্ধ বলিয়া মনে করাও ধৃষ্টতা। তবে আমাদের জ্যোতিষ যে বিজ্ঞানের হিসাবে পরিপক্ব নহে, তাহা নিশ্চয়।" যে ভাব ধর্ম্মের সূত্রে গ্রথিত, তাহা 'পরকীয় লব্ধ' মনে করা ধৃষ্টতা হইতে পারে, কিন্তু অনেক জাতির মধ্যে 'ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত ভাব' যে 'পরকীয় লব্ধ,' তাহার প্রমাণ বিরল নয়। লেখকের 'স্থায়' ও যুক্তির সামঞ্জস্য করিতে পারিলাম না।

ভারতী। স্বর্গ-প্রয়াণ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন দাসগুপ্ত "আমার লাগিয়া" নামক একটি কবিতা লিখিয়াছেন। "স্বর্গ-প্রয়াণ" আমরা দেখি নাই। কবি বলিতেছেন,—

না লাগে আঁচড় গা,
কণ্টকে না ফুটে পা,
থাক সুখে সকলে বাঁচিয়া,—
পড়ুক অশনি মাথে,

ক্ষতি নাহি কা'রো তাতে,
আমি যদি যাই গো মরিয়া।"

'অশনি' 'মাথে' পড়িলে আর কাহারও ক্ষতি নাই বটে, কিন্তু যাহার মাথায় পড়ে, তাহার হাতে হাতে কবির 'স্বর্গ-প্রয়াণ' ফলিয়া যায়। ইহার উপর আর কথা চলে না। এই 'কবিতা'টি ভারতীর সর্ব্বপ্রথম পৃষ্ঠার অধিষ্ঠিত হইয়াছে! শ্রীযুক্ত ইমদাদুল হকের "মোস্‌লেম্ জগতে বিজ্ঞানচর্চ্চা" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর "উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান" একটি চলনসই নক্সা। লেখিকার 'দৃষ্টি' যেরূপ প্রখর, লেখনী সেরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তিনী নহে। যাহা দেখা যায়, যাহা ঘটে, সবই লিখিবার যোগ্য নহে। যাহা অন্যের উপভোগ্য হইতে পারে, লিখিবার আগে তাহা নির্ণয় করিতে হয়। তাহার পরে, বক্তব্য বিষয়টি সাজাইয়া কলাকৌশলরূপ স্পর্শমণির স্পর্শে তাহাকে সুবর্ণে পরিণত করা যায়। দৃষ্ট বিষয়ের উলঙ্গ বিবরণ বা নীরস তালিকাই সাহিত্যরসের নির্ঝর হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "উজির নুরুদ্দিন" নামক একটি গল্প লিখিয়াছেন। গল্পটি অদ্ভুত, ভাষা আরও অদ্ভুত। গল্পটিতে দীনেশ বাবুর পণ্ডশ্রমের প্রশংসা করিবার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকিলে আমরা আনন্দ লাভ করিতাম। কাপিলাশ্রম হইতে "পর্য্যবেক্ষক" নামধারী "বেদে পৃথিবীর গতি" নামক সারগর্ভ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পৃথিবীর গতির প্রমাণ শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতার,—

'সমাববর্ত্তি পৃথিবী সমুষা সমুসূর্য্যঃ।
সমু বিশ্বমিদং জগৎ॥'—২০ অঃ। ২৩

এই শ্রুতিতে বিদ্যমান। অর্থ,—"পৃথিবী সম্যক্ আবর্ত্তন করিতেছে, উষা বা দিবস, সূর্য এবং সমস্ত জগৎও আবর্ত্তন করিতেছে।" পর্য্যবেক্ষক বলেন, "মহীধর স্বীয় কালের সংস্কার অনুযায়ী পৃথিবীর আবর্ত্তনের অর্থবোধ করিতে না পারিয়া সম্যক আবর্ত্তনের ভাবার্থ 'নাশ হব' এইরূপ মনে করিয়াছেন, কিন্তু তাহা না করিলে কিছু ক্ষতি হয় না। পৃথিব্যাদি সচল একূপ করিলেও অর্থের সঙ্গতি হয়।" বৈদিক পণ্ডিতেরাই ইহার সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। লেখক বলিতেছেন, "ঐতরেয় আরণ্যকে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যের প্রকৃত উদয় বা অস্ত নাই।" লেখক ঋগ্বেদের যে ঋকটি মাধ্যাকর্ষণের সূচক বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা কর্ত্তব্য। তিনি সংক্ষেপে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে কোনও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "ছোটনাগপুরের উৎসবাবলী"র বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের "প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য" উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ধরণী" নামক কবিতাটিতে স্বর্গ "প্রেয়সী" ও বল্লরী "সুরভিমাখা নটী" হইয়াছে, এবং "তুঙ্গ অচল হইতে মহা জলধি প্রভৃতিরও অভাব নাই। স্বর্গ যখন "প্রেয়সী" এবং লেখনী যখন অত্যন্ত "প্রেয়সী" হইয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে, কলমটি যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হয়। আর লিখিতে নাই। তখনও যদি কলমের নাচ না থামে, তাহা হইলে সহিষ্ণু ধরণীও চঞ্চল হইয়া উঠেন, চারু বাবু তাহার প্রমাণ দিতেছেন। চারু বাবু বলেন, "যত দিন হেতা থাকিব ধাতা এমনি সুখে কাটিব।" কি কাটিবেন? পদ্যপাঠে পড়িয়াছিলাম,—

"উঁই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার,
যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার।"

কবিরা 'উঁই আর ইঁদুর' নন, অথচ যখন তখন কবিতা কাটিয়া ছার খার করিবেন? 'বসন্ত" নামক রহস্য-কবিতাটির মিলে বাহাদুরী আছে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

বিবিধ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ হইয়া মজঃফরপুরে গিয়াছিলেন। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। আমাদের আন্তরিক কামনা, কবিবর সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করুন। রবীন্দ্র বাবু সম্প্রতি বিবাহের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কাশীধামে গিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় তিন মাস শয্যাগত ছিলেন। আনন্দের বিষয় এই, এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন। আশা করি, তিনি অচিরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন। নিখিল বাবু এখন বহরমপুরে অবস্থিতি করিতেছেন।

নিখিল বাবুর অসুস্থতাবশতঃ "মহারাজ নন্দকুমার ও নবকৃষ্ণ" প্রবন্ধ সাহিত্যে আর প্রকাশিত হয় নাই। তিনি সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হইলে "নন্দকুমার ও নবকৃষ্ণ" সাহিত্যে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে।

নিখিল বাবুর রচিত ও সাহিত্য-পরিষদের গঠিত "দ্বাদশ ভৌমিক" আগামী বর্ষে সাহিত্যে প্রকাশিত হইবে। নিখিল বাবু "প্রতাপাদিত্য" সম্বন্ধে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাও অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

প্রসিদ্ধ নাটক-কার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ষ্টারের জন্য একখানি নূতন 'কমিডী' লিখিতেছেন। অমৃত বাবুর ভক্তগণ বহুদিন 'ও রসে বঞ্চিত', আমরা সাগ্রহে অমৃত বাবুর নূতন গ্রন্থ ও তাহার অভিনয় দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছি। অমৃত বাবু হাস্যরসের নির্ঝর, তবু আমরা এত দিন বিন্দুলাভে বঞ্চিত, ইহা বিচিত্র বলিয়া মনে হয়। অমৃত বাবুর সদানন্দ চরিত্রে এতটা নিষ্ঠুরতা সঙ্গত হয় না।

১৩১১ সালে সাহিত্য-পরিষদে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। টাকীর সুশিক্ষিত জমীদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্. এ., বি. এল্. গত পাঁচ বৎসর পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। এবার প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ. পরিষদের সম্পাদকতা গ্রহণ করিতেছেন। পরিষদের কার্য্যসৌকর্য্যের জন্য আর এক জন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইতেছেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরিষদের সম্পাদক হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু বলিতে কি, আমাদের হর্ষে বিষাদ উপস্থিত। রামেন্দ্র বাবু পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদন-ভার পরিত্যাগ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? রামেন্দ্র বাবুর অবকাশ অল্প, এক সঙ্গে পরিষৎ ও পত্রিকার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে তিনি অসমর্থ। এই জন্য বিশ্বকোষ ও কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু পত্রিকার সম্পাদক হইতেছেন।

রামেন্দ্র বাবু পরিষৎ-পত্রিকার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। পত্রিকা প্রায় ডুবিয়াছিল, তিনি সেই ডোবা নৌকা ভাসাইয়াই নিরস্ত হন নাই; নিপুণ কর্ণধারের ন্যায় কায়মনোবাক্যে তাহাকে এত দিন লক্ষ্যের

পথে চালাইয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহাকে ছাড়িতে কেবল কষ্ট নয়, পত্রিকার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একটু শঙ্কারও উদয় হইতেছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "বিশ্বকোষ" আছে; "কায়স্থ-পত্রিকাও" অল্প ভার নহে। তাঁহারও অবকাশ অল্প। তথাপি যখন তিনি স্বেচ্ছায় এ ভার গ্রহণ করিতেছেন, তখন আশা করা যায়,—তিনি পরিষৎ-পত্রিকার গৌরবরক্ষায় সমর্থ হইবেন। এ ক্ষেত্রে রামেন্দ্র বাবুর অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী এম্. এ. শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় এখন কটকে বাস করিতেছেন; এবং দেখিতেছি, মধ্যে মধ্যে "বনপথে" ও পর্ব্বতশিখরে যাত্রা করিতেছেন। অনেকে হয় ত জানেন না, ক্ষীরোদ বাবু এক জন শিকারী। মনে হইতেছে, ছাপরায় থাকিতে তিনি প্রথম বন্দুক ধরেন। সে আজ দশ এগার বৎসরের কথা। শিকার, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও স্নেহসিক্ত পরিবারটি লইয়া ক্ষীরোদ বাবু কর্ম্মক্লান্ত জীবন স্নিগ্ধ করিতেছেন। বিজ্ঞান ও শিকার পাশাপাশি থাকিতে পারে। কিন্তু কবিতা? অথবা, শিকারের ফলেই পৃথিবীর আদিকাব্য—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্. এ, বি. এল্. "গীতায় ঈশ্বরতত্ত্ব" পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতেছেন। গ্রন্থখানি এখনও মুদ্রাযন্ত্রের কবলিত। হীরেন্দ্র বাবুর কতিপয় ইংরাজী দার্শনিক প্রবন্ধও শীঘ্র প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

রাজসাহী সহরে সাহিত্যের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট,—দেখিবার যোগ্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রাজসাহীর অনেক সদনুষ্ঠানের মূল। রাজসাহীতে একটি সখের নাট্যশালা আছে। অক্ষয় বাবু তাহার—কি বলিব—'গিরিশ ঘোষ'। অর্থাৎ, স্বয়ং অভিনয় করেন,—অভিনয় শিক্ষা দেন, আবার নাটক লেখেন! তাহাতেও নিস্তার নাই, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার 'কল্পনা' করেন। ঐতিহাসিক অক্ষয় বাবু নাটক লেখেন, সংবাদটি নূতন নয়? 'রিয়াজুস্ সালাতিন' নাটক বা 'বিনয় পিটকং' প্রহসন নয়, এই রঙ্গমঞ্চে অক্ষয় বাবুর রচিত "বাসবদত্তা" প্রভৃতির অভিনয় হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন হইল, সুকবি শশধর রায়ের "রাঘববিজয়" কাব্যখানি অক্ষয় বাবু নাটকাকারে পরিণত করিয়া রাজসাহীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াছেন। নাট্য-সম্প্রদায় সম্প্রতি রাঘববিজয়ের অভিনয়ে টিকিট বিক্রয় করিয়া জাপান যুদ্ধে বিপন্ন জাপানীগণের সাহায্যকল্পে প্রায় দুই শত টাকা সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন।

সংবাদটি কোনও স্বদেশী সংবাদপত্রে দেখিতে পাই নাই। কোনও বন্ধুর পত্রে অবগত হইলাম। কিন্তু হাওয়াই দ্বীপে 'এক গাভী ও তাহার তিন পুচ্ছ' প্রভৃতির খবর ইঁহারা সমস্বরে সরবরাহ করিয়া থাকেন। কলিকাতার সঙ্গীতসমাজ,—ভাঙ্গা দল সঙ্গীত-সমিতি কি করিতেছেন? তাঁহারা পথ-প্রদর্শক হইলে অনেক সখের দল এই পথের পথিক হইতে পারে, এবং জাপানী চাঁদাও পরিমাণে কিছু বাড়িতে পারে। দুর্ভিক্ষের সময় কুম্ভকর্ণের মত অত গিলিয়াছি, জাপানের বিপদের সময় কৃতজ্ঞতার নিদর্শন দুই এক হাজার—দুই এক বিন্দু। আমাদের লজ্জা নাই।